শিশু-বিশ্বকোষ : চতুর্থ খণ্ড

ফ থেকে ম

শিশু-বিশ্বকোষ

১৭৭৮ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফরাসি দেশে নানা উত্তাল ঘটনাধারা ফরাসি বিপ্লব নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এই বিপ্লবের ফলে ফরাসি দেশে সামন্ত যুগের পুরানো বিধি-বিধান পাল্টে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে এবং রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সম্মিলিত সামাজিক আধিপত্যের অবসান হয়।

আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ফরেনসিক মেডিসিন বা লিগাল মেডিসিন বলা হয়। ফরেনসিক মেডিসিন মেডিক্যাল জুরিস্‌প্রুডেন্স নামেও পরিচিত।

জীবানুনাশক পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা কে ? — আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং।

পৃথিবীর এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী-নাবিক। ১৪৫১ সালে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে তাঁর জন্ম। তিনিই ১৫০১ সালে বর্তমান আমেরিকা মহাদেশের ভূখণ্ডটিকে 'মহাদেশ' বলে শনাক্ত করেন। তাঁর সম্মানে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ হয়েছে। তাঁর নাম কী ? —আমেরিগো ভেস্‌পুচি।

শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয়, সারা ভারতবর্ষে প্রথম গ্র্যাজুয়েট এক বাঙালি সন্তান, পাস করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই তিনি সরকারি চাকুরি পেয়ে যান। ১৮৫৮ সালের ৬ই আগস্ট তিনি বাংলা সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। তাঁর নাম ? —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিখ্যাত এক সঙ্গীতস্রষ্টা ও মহত্তম সিম্ফনি রচয়িতা। ত্রিশ বছর বয়স হতে না হতেই তাঁর কানের ও স্নায়ুর রোগ

(বাকি অংশ শেষ প্রচ্ছদের ফ্ল্যাপে

www.pathagar.com

দেখা দেয়। ১৮০২ সালের দিকে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর কানে শোনার ক্ষমতা লোপ পেতে বসেছে। সে এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। তিনি সঙ্গীত সৃষ্টি করছেন অথচ নিজেই তা শুনতে পাচ্ছেন না। বন্ধ হল তাঁর ঘোরাফেরা, লোকের সঙ্গে কথা বলা। সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন গভীর নির্জনতায়। কে এই সঙ্গীত স্রষ্টা ? —লুড্‌ভিগ ফান্‌ বেটোফেন্‌।

বাংলাদেশের দীর্ঘতম সড়ক-সেতু এখন পর্যন্ত কোনটি ? ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাউসিয়া-দাউদকান্দির মধ্যবর্তী স্থানে মেঘনা-গোমতী নদীর মিলনমোহনার উপর অবস্থিত মেঘনা-গোমতী সেতু।

ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সামাজ, সভ্যতা, উদ্ভিদজগৎ, প্রণিজগৎসহ জ্ঞানের সকল শাখার এমনি সব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়বস্তু নিয়ে শিশু - বিশ্বকোষের চতুর্থ খণ্ড ভুক্তি-বিষয়গুলোকে মানববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি—প্রধানত এই তিন বিভাগে ভাগ করে নিয়ে জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যরাজি এখানে তুলে আনা হয়েছে। বাংলা বর্ণক্রম অনুসারে বিন্যস্ত শিশু-বিশ্বকোষের এই খণ্ডে ফ থেকে ম বর্ণের মোট ৭৬১টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিভাগ অনুসারে ভুক্তি বিষয়ের সংখ্যা এরকম :

বিভাগ	মূলভুক্তি	দ্রষ্টব্যভুক্তি	মোট
মানববিদ্যা	২১৫	৮৭	৩০২
সমাজবিজ্ঞান	১৮৮	৭১	২৫৯
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১৫৭	৪৩	২০০
মোট ভুক্তি	৫৬০	২০১	৭৬১

মূল্য : ৳ ২২৫.০০

ISBN : 984-09-0397-7

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ : ৪র্থ খণ্ড

বাশিশুএ ৩৯৭

প্রকাশক : গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণ : বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস লিঃ, ৪৬/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৪, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

মূল্য : ৳ ২২৫.০০

SHISHU-BISWAKOSH (Children's Encyclopaedia) Vol - 4. Publisher : Golam Kibria, Director, Bangladesh Shishu Academy, Old High Court Compound, Dhaka-1000, Bangladesh. Date of Publication : September 1997

Price : Tk. 225.00
US $ 12.00

ISBN : 984-09-0397-7

প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান

ছবি এঁকেছেন : রফিকুন নবী, শেখ আফজাল, মো. মনিরুজ্জামান

আলোকচিত্রের জন্য কৃতজ্ঞতা : তৌহিদুন নবী, শিহাব উদ্দিন, আলী হায়দার

---

www.pathagar.com

চতুর্থ খণ্ড

শিশু-বিশ্বকোষ

ফ থেকে ম

সম্পাদনা পরিষদ

আবদুল্লাহ আল-মুতী—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
আহমদ রফিক—সমাজবিজ্ঞান
মনসুর মুসা—মানববিদ্যা
হায়াৎ মামুদ—শৈলী সম্পাদক ও সমন্বয়ক
রফিকুন নবী—শিল্প সম্পাদক ৪র্থ খণ্ড

প্রকল্প পরিচালক
গোলাম কিবরিয়া
প্রকল্প সহযোগী
বিপ্রদাশ বড়ুয়া
মো. নাজিমউদ্দিন
ব্যবস্থাপনা সহযোগী
সুজন বড়ুয়া
মুদ্রণ সহায়ক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
টিপু কিবরিয়া

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ ব্যবহারের পদ্ধতি

ক. সকল ভুক্তি (entry) অভিধানগ্রন্থের সাদৃশ্যে বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে। সেই অনুক্রম নিম্নরূপ :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ						
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ						
ট	ঠ	ড	ড়	ঢ	ঢ়	ণ				
ত	ৎ	থ	দ	ধ	ন					
প	ফ	ব	ভ	ম						
য	য়	র	´(রেফ্)	ল						
শ	ষ	স	হ							

খ. ইলেক্, ফলা ও কার এবং হসন্ত সংযুক্তির ক্রমিক উদাহরণ :

অ	অং	অঃ	অঁ	অক	অক্ত	অক্ক ইত্যাদি		
ক	কই	কউ	কও	কং	কঃ	কঁ		
ক ক	ককা	ককি	ককী	ককু	ককূ	ককৃ	ককে	ককৈ
	ককো	ককৌ	কক্					
কক্ক...	কক্ত...	কক্ব...	কক্য...	কক্র...	কক্ল...	কক্ষ		
কখ...	কঠ...	কড...	কড়...	কঢ...	কঢ়...	কণ...	কত...	কৎ...
	কথ...	কদ...	কধ...	কন...	কপ...	কফ...	কব...	কভ...
	কম...	কয...	কয়...	কর...	করৌ...	কর্...	কর্ক...	কর্ক্...
	কর্কট...	কর্হ...						
কল	কশ	কষ	কস	কহ...	কহৌ	ইত্যাদি		

www.pathagar.com

গ. দেশী বা বিদেশী যে কোনো নামের ক্ষেত্রে চলতি রেওয়াজ মানা হয়েছে : নামটি আমরা সচরাচর যেমন বলে থাকি, অর্থাৎ নামের যে অংশটি প্রধানত মনে রাখি ভুক্তিতে সেভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে বিদেশী নাম খুঁজবার একটা স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে—পদবি ধরে খোঁজা। আমরা সে নিয়মও মেনেছি; যেমন—উইলিয়াম শেক্সপীয়র, আলবার্ট আইনস্টাইন, জিগমুণ্ড ফ্রয়েড ইত্যাদি নাম পেতে হলে উইলিয়াম, আলবার্ট, জিগমুণ্ড ইত্যাদি না খুঁজে তাঁদের বংশগত পদবি (Surname বা family name) শেক্সপীয়র, আইনস্টাইন, ফ্রয়েড ইত্যাদি খুঁজে দেখতে হবে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কাজী নজরুল ইসলামকে পেতে হলে ঠাকুর বা ইসলাম খুঁজলে পাওয়া যাবে না, 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাজী' খুঁজে বের করতে হবে। অন্য দিকে আতাউল গনি ওসমানী কি সঙ্গীতজ্ঞ আলাউদ্দিন খাঁ-কে পেতে হলে ওসমানী (যেহেতু নামের এই অংশটুকুই সবাই জানেন) এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন (যেহেতু এঁদের নামের পূর্বে সর্বদা আমরা 'ওস্তাদ' বলে থাকি) খুঁজতে হবে।

ঘ. ভুক্তির ভিতরে কোথাও দ্র থাকলে বুঝতে হবে যে এর পূর্ববর্তী শব্দটির জন্য পৃথক ভুক্তি যথাস্থানে রয়েছে। যেমন ধরা যাক—'ওদিসি' ভুক্তির রচনাতে হোমার, মহাকাব্য, ভার্জিল, ঈনীদ ও জয়েস শব্দগুলোর পরে দ্র মুদ্রিত হয়েছে; এর অর্থ, এই বিশ্বকোষের নির্দিষ্ট খণ্ডের ভিতরে উপর্যুক্ত পাঁচটি ভুক্তিতে এসব প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। কখনো-বা একটি ভুক্তির জন্য অন্য ভুক্তির শিরোনামের পাশে দ্র লিখে তা দেখবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ঙ. ভুক্তির ভিতরে ব্যবহৃত শব্দসঙ্কেত নিম্নরূপ :

আ.	=	আলায়হিস্ সালাম
আনু.	=	আনুমানিক
কিমি	=	কিলোমিটার
কেজি	=	কিলোগ্রাম
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
খ্রি. পূ.	=	খ্রিস্টপূর্বাব্দ
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার
দ্র	=	দ্রষ্টব্য
ফা.	=	ফারেনহাইট
ব.	=	বঙ্গাব্দ
মি.	=	মিটার
মিমি	=	মিলিমিটার
মো.	=	মোহাম্মদ
রা.	=	রাদি'য়াল্লাহু আন্‌হু
শা.	=	শাসনকাল
স.	=	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
সিসি	=	কিউবিক সেণ্টিমিটার
সে.	=	সেণ্টিগ্রেড / সেলসিয়াস
সেমি	=	সেণ্টিমিটার

www.pathagar.com

লেখকদের নাম-সঙ্কেত

অ. ব.	=	অজয় বড়ুয়া
আ. আ.	=	ড. আলী আসগর
আ. আ. মু.	=	ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী
আ. আ. হা.	=	ডা. আফরোজা আখতার হালিদা
আ. ই.	=	আমীরুল ইসলাম
আ. ক.	=	অধ্যাপক আহমদ কবির
আ. কা.	=	আবু কায়সার
আ. ন. ম. আ. র.	=	ডা. আ. ন. ম. আমিনুর রহমান
আ. মা.	=	আহমাদ মাযহার
আ. র.	=	ডা. আহমদ রফিক
আ. হ. খ.	=	আবদুল হক খন্দকার
আ. হা.	=	আবুল হাসানাত
আ. হু.	=	আখতার হুসেন
আজ. ই.	=	আজহার ইসলাম
ক. গো.	=	ড. করুণাময় গোস্বামী
ক. চৌ.	=	অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
কা. আ. আ.	=	কাজী আবদুল আলীম
কা. ম.	=	কাজী মদিনা
খু. জা.	=	অধ্যাপক খুরশীদ জাহান
টি. কি.	=	টিপু কিবরিয়া
ত. চ.	=	তপন চক্রবর্তী
নি. অ.	=	নিরঞ্জন অধিকারী
ফ. মা.	=	ফরহাদ মাহমুদ
ফ. র.	=	ফরিদুর রহমান
ফা. ন.	=	ফারুক নওয়াজ
ব. চৌ.	=	ডা. এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী
বি. ব.	=	বিপ্রদাশ বড়ুয়া
ম. আ.	=	মতলুব আলী
ম. আ. খা.	=	মনসুর আহমদ খান
ম. মু.	=	অধ্যাপক মনসুর মুসা
ম. র.	=	মনজুরুর রহমান
ম. হ.	=	মফিদুল হক
মা. র.	=	ডা. মাসউদুর রহমান
মু. আ.	=	মুহাম্মদ আলী
মু. ই.	=	ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
মু. এ.	=	মুহাম্মদ এলতাসউদ্দিন
মু. মা.	=	মুস্তাফা মাসুদ
মু. হা.	=	মুনির হাসান
মে. খা.	=	মেহ্জাবীন খান
মো. ই.	=	মোহাম্মদ ইবরাহিম
মো. হো.	=	মোস্তফা হোসেইন
র. শা.	=	রহীম শাহ্
র. হা.	=	রশীদ হায়দার
রু. হা.	=	ডা. এস. কে. রুহুল হাসিন
শ. আ.	=	শফিউল আলম
শ. আহ.	=	শফি আহমেদ
শ. খা.	=	শরীফ খান
শা. চৌ.	=	শামসুদ্দিন চৌধুরী
শা. ত.	=	ড. শাহজাহান তপন
শা. হ.	=	শামসুল হক
শু. চৌ.	=	ডা. শুভাগত চৌধুরী
স. রা.	=	ড. সত্যব্রত রায়
সা. এ.	=	ডা. সাইফুদ্দীন একরাম
সি. আ.	=	সিরাজউদ্দীন আহমেদ
সি. না. হ.	=	ডা. সিকদার নাজমুল হক
সু. ব.	=	সুব্রত বড়ুয়া
সুজ. ব.	=	সুজন বড়ুয়া
সে. এ.	=	সেতারা এলিন
সে. শা.	=	সেলিনা শাহজাহান
সে. হো.	=	সেলিনা হোসেন
সৈ. আ. ই.	=	সৈয়দ আমীরুল ইসলাম
সৌ. মা.	=	সৌম্য মামুদ
হা. খা.	=	অধ্যাপক হাশেম খান
হা. মা.	=	ড. হায়াৎ মামুদ
হা. র.	=	হাসানুর রহমান
হো. আ.	=	হোসনে আরা

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা ....

www.pathagar.com

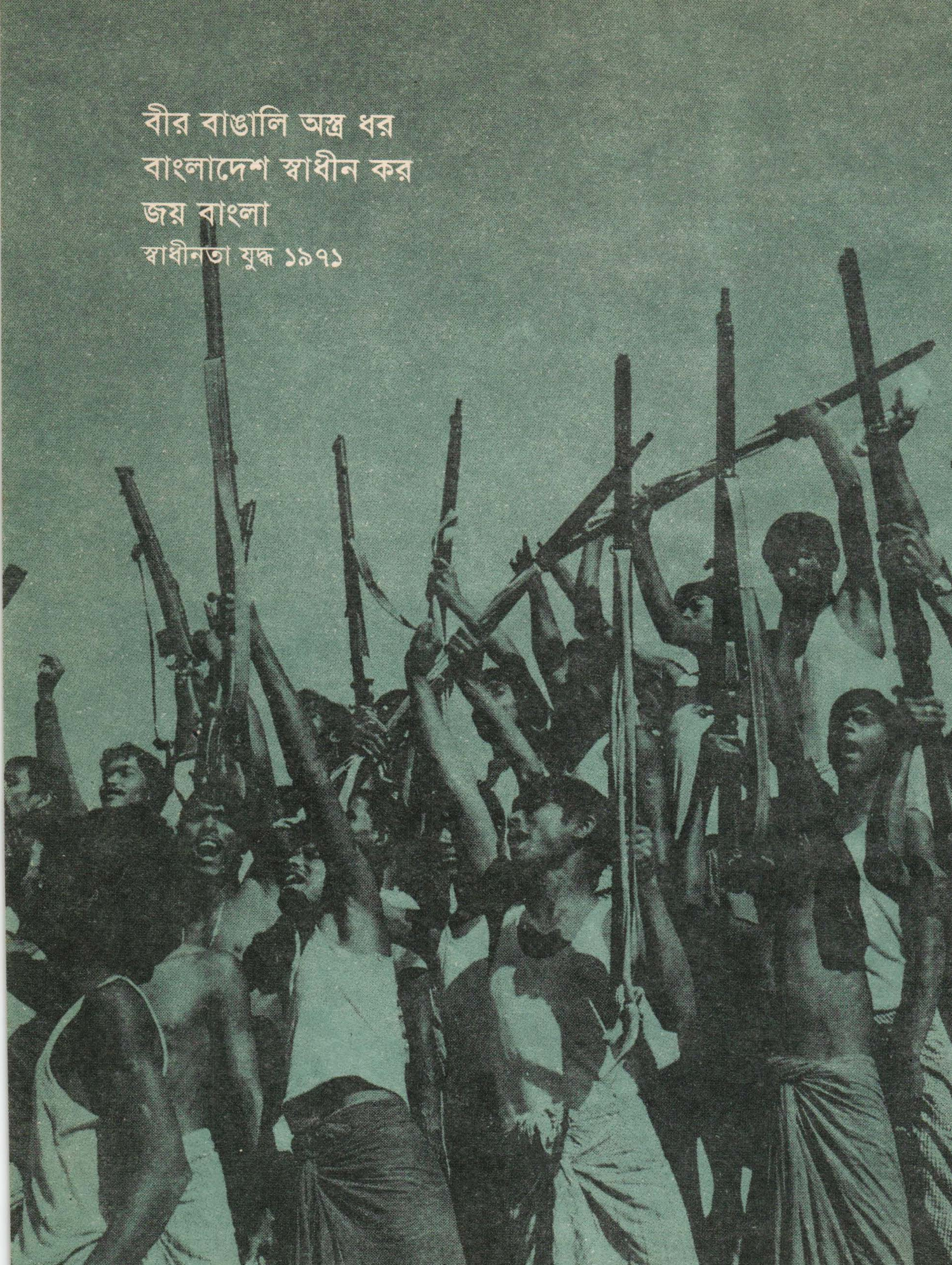

www.pathagar.com

ফ

ফকির গরীবুল্লাহ [অষ্টাদশ শতাব্দী]

ফকির গরীবুল্লাহ হুগলি জেলার (তখনকার বর্ধমান জেলার ভিতরে) বালিয়া পরগনার অন্তর্গত হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী। গরীবুল্লাহ সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর পিতার নাম শাহ্ দুন্দীর ['সাহা দুন্দি']। তথ্যের অভাবে গরীবুল্লাহর সময় নির্ণয় করা দুরূহ। তাঁর রচনা কোনগুলো তা নিয়েও মতবিরোধ আছে। তবে 'আমির হামজা' প্রথম পর্ব তাঁর রচনা। ফকির গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ-জোলেখা' (দ্র) নামে একটি কাব্য আছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ মনে করেন, কাব্যটি ১৭৬৫ সালের পরে রচিত। ঐতিহাসিকেরা বলেন, আঠারো শতকের মধ্যভাগে ফকির গরীবুল্লাহ কয়েকটি পুঁথি রচনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে : 'ইউসুফ-জোলেখা', 'আমির হামজা', 'জঙ্গনামা', 'সোনাভান' ও 'সত্যপীরের পুঁথি'।

তাঁর জন্মের মতো মৃত্যুরও কোনো সঠিক সাল, তারিখ, দিন পাওয়া যায় না।

আ. হা.

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বঙ্গদেশে (দ্র) ফকির ও সন্ন্যাসীদের জীবনযাপন ও কাজের পরিধি ছিল মুক্ত ও স্বাধীন। কোম্পানিশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের স্বাধীনতায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। যেমন মুসলিম ফকিরদের বিভিন্ন দরগায় যাওয়া বা আউলিয়াদের মাজার জিয়ারত ছিল পুণ্যের কাজ, হিন্দু সন্ন্যাসীদেরও বিভিন্ন তীর্থস্থানে যোগদান ছিল পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। কোম্পানি সরকারের আইনব্যবস্থা এই ধরনের ধর্মীয় কাজে যোগদানে বাধা দিতে থাকে। শুধু ১৭৭২ সালে ফকির নেতা মজনু শাহ (দ্র) রানী ভবানীর কাছে চিঠি লিখে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে ইংরেজ সরকার তাদের তীর্থস্থানে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করছে।

এ ছাড়া অর্থনৈতিকভাবেও নিপীড়িত হয়েছে ফকির-সন্ন্যাসীরা। কোম্পানিশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা দ্বিগুণ রাজস্ব আদায় করার জন্য সাধারণ মানুষের উপর জুলুম করত। উপরন্তু সেই সময় একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ ছাড়াও ফকির-সন্ন্যাসীগণ অর্থনৈতিক নিপীড়নেরও শিকার হয়েছে। রাজস্ববৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষের কারণে কর আদায়ে জবরদস্তি তাদেরকে অসন্তোষের শেষ সীমায় নিয়ে যায়।

উপরোক্ত কারণে ১৭৬০ সালে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক (দ্র)। পরবর্তী সময়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ভূমিহীন কৃষক, এক শ্রেণীর জমিদার যাঁরা সম্পত্তি হারিয়েছিলেন ও বেকার সৈন্যদল। এদের কার্যকলাপের মধ্যে ছিল কোম্পানির কুঠি, জমিদারের কাছারি, নায়েব-গোমস্তার বাড়িঘর ইত্যাদি আক্রমণ। এ ছাড়াও এরা কোম্পানির রপ্তানিবাণিজ্যে সহায়তাকারী দেশী বানিয়াদের নৌকা আক্রমণ করত, সৈন্যবাহিনীর মালামাল পরিবহণে বাধাসৃষ্টি করত এবং যোগাযোগব্যবস্থা নষ্ট করে দিত। এদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত তরবারি, বর্শা, গাদা বন্দুক, লাঠি ইত্যাদি।

গ্রামের সাধারণ মানুষ এদেরকে সহযোগিতা করত। কোম্পানির সৈন্যদলের খবরাখবর গ্রামবাসী এদের কাছে পৌঁছে দিত।

১৭৬৩ সালে বিদ্রোহীরা সর্বপ্রথম ব্যারাক ও কোম্পানির বাণিজ্যকুঠি আক্রমণ করে। একই বছরে ঢাকার (দ্র) ফ্যাক্টরি আক্রমণ করে দখল করে নেয়। পরে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট ফকিরদের কবল থেকে ফ্যাক্টরি উদ্ধার করেন। এভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জেলায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ, পূর্ণিয়া ইত্যাদি জেলায় বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে। সমগ্র উত্তরবঙ্গ ছিল বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র। ফলে কোম্পানিসরকার প্রত্যেক জেলায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে বাধ্য হয়।

১৭৮৭ সালে কানপুর জেলার আখনপুরে বিদ্রোহের অবিসংবাদিত নেতা ফকির মজনু শাহের মৃত্যু হলে মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ ও পরাগল শাহ প্রমুখ নেতৃত্ব দেন।

১৭৬৩ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ফকির-

www.pathagar.com

সন্ন্যাসীদের এইসব বিদ্রোহ চলতে থাকে। ১৮০০ সালের পর থেকে এই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে থেমে যায়।

সে. হো.

ফজলুল হক, আবুল কাসেম [১৮৭৩—১৯৬২]

কৃষক-প্রজাহিতৈষী রাজনীতিবিদ। তিনি 'শেরে বাংলা' (বাংলার বাঘ) নামে অধিক পরিচিত। ১৮৭৩ সালের ২৬শে অক্টোবর বরিশাল জেলার (বর্তমানে ঝালকাটি) রাজাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বরিশাল জেলার চাখার গ্রামে। পিতা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন বরিশাল জেলার এক জন খ্যাতনামা উকিল।

ফজলুল হক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বরিশাল জেলা স্কুল এবং কলিকাতার (দ্র) প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) পড়াশোনার পর তিনি ১৮৯৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে গণিতশাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯৭ সালে ডিস্টিংশনসহ বি. এল. পাস করে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (দ্র) সহকারী হিসাবে কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসা শুরু করেন। তার পর কিছুকাল কলেজে অধ্যাপনা এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি করে ১৯১১ সালে আবার হাইকোর্টের আইনব্যবসায় ফিরে আসেন। ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৫ সালে তিনি কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯১৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (দ্র) সেক্রেটারি এবং ১৯১৯ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের (দ্র) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তিনি স্বরাজ্য পার্টির নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (দ্র) সঙ্গে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে চুক্তিটি সম্পাদন করেন।

১৯২৪ সালে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী হন। এ সময় কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বহু উদ্যোগগ্রহণ করেন। তাঁর উদ্যোগে পরবর্তী কালে কলিকাতা লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ, ঢাকার তেজগাঁয়ে বেঙ্গল অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট বা কৃষি শিক্ষালয়, চাখার

www.pathagar.com

কলেজ, ইডেন গার্লস কলেজ ছাত্রীনিবাস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া তিনি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলমান ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং মুসলিম এডুকেশনাল ফাণ্ড গঠন করেন।

১৯৩৫ সালে ফজলুল হক কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

১৯৩৭ সালে বাংলায় মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টির (দ্র) কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে ফজলুল হক এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি ঋণসালিসী বোর্ড গঠন করেন এবং দরিদ্র কৃষকের উচ্চহারের সুদ মওকুফ করে দিয়ে তাদের ঋণ পরিশোধের সুযোগ করে দেন।

১৯৩৭ সালে লখ্‌নৌ শহরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে ফজলুল হকের অনলবর্ষী ও বীরত্বব্যঞ্জক বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে লখ্‌নৌবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে 'শের-এ-বাংলা' বা 'শেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৩৮ সালে ফজলুল হক প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করেন। এর পর তিনি বিনা ক্ষতিপূরণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (দ্র) বা জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা চালাতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে ফ্লাউড কমিশন (দ্র) নামে ভূমি-রাজস্ব তদন্ত কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী কালে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ হয়। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনী আইন পাশ করেন। এর মাধ্যমে চক্রবৃদ্ধি সুদ বন্ধ হয়।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (দ্র) উত্থাপন করেন। তাঁর এই প্রস্তাব পরে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত হয়।

মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র (দ্র) সঙ্গে মতবিরোধ ঘটার কারণে ফজলুল হক ১৯৪১ সালে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে সরে দাঁড়ান। এর পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ফজলুল হক স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯৫২ সালে তাঁকে পূর্ব-পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৩ সালে তিনি কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠন করেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দি ও মওলানা ভাসানীর (দ্র) সঙ্গে মিলে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট (দ্র) বিপুলভোটে জয়ী হলে তিনি পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের সময় ফজলুল হক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর হন।

আইনবিদ ও পার্লামেণ্টারিয়ান হিসাবে ফজলুল হক

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

এক জন আদর্শ মানুষ ছিলেন। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি ও ফার্সি ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাঁর বাগ্মিতা, স্মৃতিশক্তি, সাহসিকতা ও দানশীলতা সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল তিনি ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

ফজলে লোহানী [১৯২৭—১৯৮৫]

সম্পাদক ও জনপ্রিয় টেলিভিশন উপস্থাপক। জন্ম ১৯২৭ সালে, কলিকাতায় (দ্র)। বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে আই. এসসি. পাশ করে বি. এসসি. ক্লাসে ভর্তি হলেও ফাইনাল পরীক্ষা দেন নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্রের জন্ম হলে তিনি ঢাকায় (দ্র) চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) ভর্তি হন। কিন্তু নানাবিধ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার দরুন তাঁর পক্ষে বি. এসসি. পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি ঘটে। কিন্তু তাঁর জানার আগ্রহ ছিল অফুরন্ত। তিনি অল্পবয়সেই সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করেছিলেন।

ফজলে লোহানীর প্রতিভা ছিল বিভিন্নমুখী। ১৯৪৯ সালে তিনি সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম ব্যঙ্গধর্মী মাসিক পত্রিকা 'অগত্যা' (দ্র) প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন এই সাময়িকীর সম্পাদক। এই সময় তিনি স্বসম্পাদিত পত্রিকা ছাড়াও উভয় বাংলায় প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা, ছোটগল্প, ফিচার ও নানাবিধ রচনা প্রকাশ করেন। বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনে (দ্র) তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী হন, বি বি সি (দ্র) বেতারে কিছুকাল কাজ করেন। তার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি ভাসানী ন্যাপ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা নির্বাচিত হন।

ফজলে লোহানী বাংলাদেশ টেলিভিশনের (দ্র) উপস্থাপক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এর মূলে ছিল মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'যদি কিছু মনে না করেন' শীর্ষক একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের অনবদ্য উপস্থাপনা। জনপ্রিয় টিভি ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

'পেনশন' নামে একটি রুচিশীল চলচ্চিত্রের প্রযোজকের দায়িত্বও পালন করেন ফজলে লোহানী। তিনি ১৯৮৫ সালের ৩০শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

ফজিলতুন্নেসা [১৮৯৯—১৯৭৭]

শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। তিনি ১৮৯৯ সালে টাঙ্গাইলের করটিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মুসলমান মহিলা হিসাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এর পর তিনি একই বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলেত যান।

ফজিলতুন্নেসা বিলেত থেকে ফিরে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৫ সালে কলিকাতার (দ্র) বেথুন কলেজে গণিতের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

লেখালেখিতেও তিনি খুব সক্রিয় ছিলেন। 'সওগাত' ও 'শিখা' (দ্র) পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। তাঁর লেখায় নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির বাণী পাওয়া যায়।

ফজিলতুন্নেসা ১৯৭৭ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

র. শা.

ফটকিরি (alum)

একযোজী (বা ধাতুর মতো ক্রিয়ামূলক) ধাতু এবং তিনযোজী

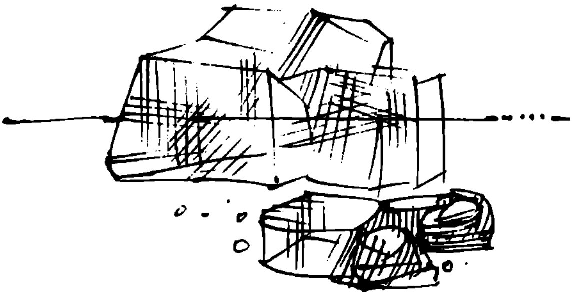

ধাতুর যুগ্ম সালফেটকে ফটকিরি বা ফিটকিরি বলে। এর সঙ্গে ২৪ অণু কেলাসপানি থাকে। একে ইংরেজিতে

www.pathagar.com

অ্যালাম বলে; অ্যালামের সাধারণ সঙ্কেত— $M'_2SO_4 \cdot M'_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$

এখানে M একযোজী ক্যাটায়ন।

M' তিনযোজী ক্যাটায়ন।

বাণিজ্যিকভাবে পটাসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম অ্যালাম $[K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O]$ —পটাস অ্যালাম বা সাধারণ ফটকিরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের জলীয় দ্রবণে পটাসিয়াম সালফেট মিশিয়ে পটাস অ্যালাম তৈরি করা হয়। এ দ্রবণকে গাঢ় ও ঠাণ্ডা করলে পটাস অ্যালামের স্ফটিক পাওয়া যায়।

ফটকিরি সাদা দানাদার কঠিন পদার্থ। তাপ দিলে এর কেলাসপানি উবে যায়। এটা পানিতে দ্রবণীয় এবং এর দ্রবণ অম্লধর্মী।

অন্যান্য ফটকিরির মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম-অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O]$, ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2SO_4 \cdot Fe_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O]$, সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সালফেট $[(Na_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O]$, পটাসিয়াম-ক্রোমিয়াম সালফেট $[(K_2SO_4 \cdot Cr_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O]$ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অনেক কাজে ফটকিরি ব্যবহার করা হয়। যেমন— কাগজ (দ্র) তৈরিতে, কাপড় রঙ করতে, অগ্নিনিরোধ-যন্ত্রে, পানি (দ্র) বিশুদ্ধ করতে ইত্যাদি। পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ফটকিরিকে পানিতে দ্রবীভূত করা হয়। এরা জৈব অপদ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারি দানার সৃষ্টি করে এবং পানির নিচে তলানিরূপে জমা হয়। দাড়ি কামানোর পর রক্তপাত বন্ধ করার জন্যও অনেকে ফটকিরি ব্যবহার করে থাকেন।

সা. এ.

ফটোকপিয়ার (photocopier)

ফটোকপিয়ার হল এমন একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে ফটোকপি করা যায়। এই যন্ত্র দিয়ে তরল কালি ব্যবহার না করে কোনো প্রমাণপত্র বা বইয়ের পৃষ্ঠা বা দলিল ইত্যাদির হুবহু নকল বা কপি করা যায়। ফটোকপিয়ারে স্থির বিদ্যুৎকে কাজে লাগানো হয়। এই কপি করার ব্যাপারটি নির্ভর করে সেলেনিয়াম নামক একটি মৌলিক পদার্থের ধর্মের উপর। সেলিনিয়ামের বিশেষ ধর্মটি হল, যখন এর উপর আলোকরশ্মি পড়ে তখন এর বৈদ্যুতিক রোধ হঠাৎ করে কমে যায়। এই মেশিনে কোনো সনদপত্র, প্রমাণপত্র বা বইয়ের পৃষ্ঠা কপি করার সময় মেশিনচালক ঐ পৃষ্ঠাটিকে একটি আনুভূমিক কাচের জানালার উপর উপুড় করে রাখেন। সুইচ টিপে মেশিনটি চালু করার পর একটি উজ্জ্বল আলো প্রমাণপত্র বা বইয়ের পৃষ্ঠার উপর জ্বলে ওঠে। এর ফলে প্রমাণপত্রটির প্রতিবিম্ব একটি লেন্সের ভিতর দিয়ে অভিক্ষিপ্ত হয়ে সেলিনিয়ামের প্রলেপ লাগানো একটি অতি মসৃণ পাত বা চোঙাকৃতি ড্রামের উপর পড়ে। এই পাত বা ড্রামটি স্থির বিদ্যুৎ দ্বারা চার্জযুক্ত বা আহিত হয়। প্রমাণপত্রের সাদা অংশ থেকে প্রতিফলিত আলো পাত বা ড্রামের যে অংশে পড়ে সে অংশের বৈদ্যুতিক রোধ কমে যায়। কারণ ঐ অংশ থেকে

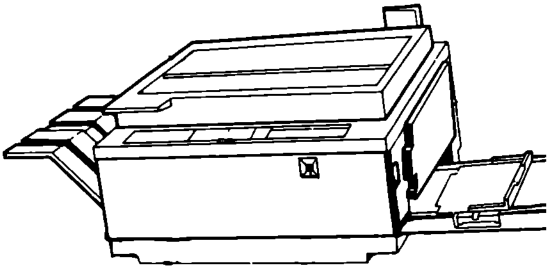

চার্জ মাটিতে চলে যায়। প্রমাণপত্রের কালো অংশ থেকে কোনো আলো পাত বা ড্রামে পৌঁছায় না। ফলে ঐ অংশের চার্জের কোনো পরিবর্তন হয় না। এই যন্ত্রের প্লেট বা ড্রামটিকে বিশেষ ধরনের গুঁড়াকালি দিয়ে আবৃত করা হয়। প্লেটের যে অংশে চার্জ থাকে সে অংশে গুঁড়াকালি লেগে থাকে। ফলে প্রমাণপত্রের একটি প্রতিবিম্ব সেলিনিয়ামপ্লেটে বা ড্রামের গুঁড়াকালিতে তৈরি হয়। এর পর এক খণ্ড সাদা কাগজ এই প্লেট বা ড্রামে চেপে ধরার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ কাগজে প্লেট বা ড্রামের বিপরীতধর্মী চার্জ আবিষ্ট হয়। এই চার্জ প্লেটের কালির গুঁড়োকে আকর্ষণ করে। সেলিনিয়ামপ্লেট

www.pathagar.com

বা ড্রাম থেকে কালির গুঁড়ো এসে সাদা কাগজের গায়ে লেগে যায়। ফলে প্রমাণপত্র থেকে সৃষ্ট প্রতিবিম্বটি প্লেট বা ড্রাম থেকে সাদা কাগজে স্থানান্তরিত হয় এবং মেশিনে উত্তপ্ত করার ফলে গুঁড়োকালি গলে কাগজের গায়ে আটকে যায় এবং তখন মূল কপির একটি প্রতিলিপি তৈরি হয়ে যায়।

শা. ত.

ফটোগ্রাফি (photography)

Photos মানে আলো ও graphics মানে আঁকা অর্থাৎ আলো দিয়ে আঁকা—আলোকচিত্রণ। ১৮৩৯ সালে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ স্যার জন হার্শেল (Sir John Herschel) সর্বপ্রথম ফটোগ্রাফি শব্দটি ব্যবহার করেন। অবশ্য ফটোগ্রাফির ইতিহাস এর অনেক আগের। লেওনার্দো দা ভিঞ্চির (দ্র) আমলে ক্যামেরা (দ্র) ব্যবহার করে ছবি তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল।

প্রতিফলিত আলো পড়লে তাতে বস্তুর প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। পরে হাইপো নামে এক প্রকার রসায়ন ব্যবহার করে ঐ ছবিকে দীর্ঘস্থায়ী করা হয়।

১৯৮৮ সালে জর্জ ঈস্টম্যানের (George Eastman) কোডাক ক্যামেরা প্রবর্তনের পরপরই সেলুলয়েডের (দ্র) ওপর ফিল্ম (দ্র) তৈরি শুরু হয়। বর্তমানে সেলুলয়েডে ছবি তুলে পরে সেটিকে কাগজে রূপ দেওয়ার পদ্ধতিই বেশি প্রচলিত। তবে, কোনো কোনো ক্যামেরায় সরাসরি আলোকসংবেদী কাগজে ছবি তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় পোলারয়েড (দ্র) ক্যামেরা।

এক শ' বছর আগে একটি ফটো তোলার জন্য এক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হত। বর্তমানে এক সেকেণ্ডের পনেরো লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়েই একটি ছবি তোলা সম্ভব।

মু. হা.

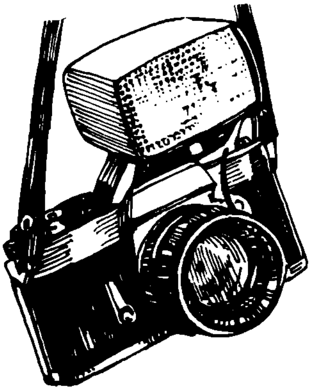

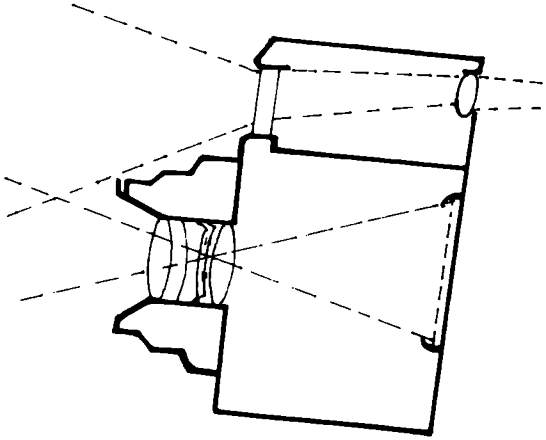

ফটোগ্রাফির বর্তমান পর্যায়ে উত্তরণের সঙ্গে এনজেলো সোলা, জোসেফ নিসেফোর নিয়েপ্স্ (Joseph Nicéphore Niepce), লুই জাক্ মঁদে দাগ্যার্ (Louis Jacques Mondé Daguerre), জোসেফ পিট্স্, জর্জ ঈস্টম্যান প্রভৃতি বিজ্ঞানী-গবেষকদের অবদান রয়েছে।

প্রথমত একটি আলোকসংবেদী কাগজ তৈরি করা হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইডে ডুবিয়ে শুকানোর পর আবার সিলভার নাইট্রেটে ডোবালে কাগজটিতে সিলভার ক্লোরাইডের একটি প্রলেপ পড়ে। এর ওপর বস্তু থেকে

ফটোসেল (photocell)

যে ডিভাইস বা সংযুক্তি আলো বা যে কোনো বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ (দ্র) থেকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত তৈরি করতে পারে তাকে ফটোইলেক্ট্রিক সেল বা ফটোসেল বলা হয়। মূলত ফটোইলেক্ট্রিক সেল এমন ব্যবস্থা, যেখানে আলোকতড়িৎক্রিয়া (ফটোইলেক্ট্রিক এফেক্ট) দ্বারা দু'টি ইলেক্ট্রোডের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন করা হয়। যথোপযুক্ত কম্পাঙ্কের (দ্র) আলো কোনো ধাতবপৃষ্ঠে পতিত হয়ে

www.pathagar.com

ধাতবপৃষ্ঠ থেকে ইলেক্ট্রন (দ্র) বেরিয়ে এলে তাকে আলোকতড়িৎক্রিয়া বলে। বর্তমানে যে ফটোসেল ব্যবহৃত হয় তা কাজ করে ফটোপরিবাহিতার উপর ভিত্তি করে। দু'টি সংযোগবিন্দু বা স্পর্শবিন্দুর (contacts) মধ্যে একটি অর্ধপরিবাহী বস্তুকে রেখে ভোল্টেজ দেওয়া হয়। আলো বা তড়িৎচৌম্বক বিকিরণের অনুপস্থিতিতে বিদ্যুৎপ্রবাহ খুব সামান্য হয়, কিন্তু বস্তুটিতে আলোক বা যে কোনো বিদ্যুৎচৌম্বক বিকিরণ পড়লে রোধ কমে যায় এবং বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিকিরণের তীব্রতা যত বাড়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বা কারেন্ট তত বাড়ে। ফটোকণ্ডাক্টিভ সেল অবলোহিত অঞ্চলেও ব্যবহার করা যায়। অন্যান্য ফটোসেলের একটি হল ফটোডায়োড। ফটোসেল ও ফটোইলেক্ট্রিক সেল আজকাল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিনেমায় (দ্র) ছবি দেখার সঙ্গে আমরা যে শব্দ শুনতে পাই তা উৎপন্ন হয় একটি বিশেষ সাউণ্ডট্র্যাকের ভিতর আলোর কিরণ গিয়ে ফটোসেল-এ পড়ার জন্য। এলার্ম, ফটোগ্রাফিক এক্সপোজার মিটার এবং রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রিটলাইট স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'অন' করার কাজে ফটোসেল ব্যবহৃত হয়।

ত্রুটিপূর্ণ জিনিস শনাক্ত করার কাজেও ফটোসেল ব্যবহৃত হয়।

শা. ত.

ফতেহ লোহানী [১৯২০—১৯৭৫]

অভিনেতা, চলচ্চিত্র-পরিচালক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অনুবাদক। বেতারের অনুষ্ঠানপ্রযোজক হিসাবেও বিশেষ খ্যাত ছিলেন। জন্ম বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার কাউলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, ১৯২০ সালের ৭ই মে।

ফতেহ লোহানী কলিকাতার (দ্র) বিশপ ক্যাথিড্রাল মিশন হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও রিপন কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে নাট্য ও চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৪৩ সালে কিরণকুমার নাম গ্রহণ করে ওবায়েদ উল হক পরিচালিত 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। আবুল মনসুর আহমদ (দ্র) সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক বিভাগ সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেন কিছুকাল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্রের জন্ম হলে ফতেহ লোহানী ঢাকায় চলে আসেন এবং স্থানীয় বেতার- কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হন। পাশাপাশি ১৯৪৯ সালে 'অগত্যা' (দ্র) নামের যে বিখ্যাত রম্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক সাময়িকী তাঁর অনুজ ফজলে লোহানীর (দ্র) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, ফতেহ লোহানী ছিলেন তার অন্যতম নেপথ্য উদ্যোক্তা ও পরিচালক। পত্রিকাটির পরিচালনা- পরিষদের পরিচিতিতে ছাপার অক্ষরে অবশ্য তাঁকে উল্লেখ করা হত 'সাধারণ উপদেষ্টা' হিসাবে।

১৯৫০ সালে তিনি লণ্ডনে যান এবং সেখানকার ওল্ডভিক থিয়েটার নাট্যস্কুলে নাটকপ্রযোজনা বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এর পাশাপাশি ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সদস্য হিসাবে বিশ্বের বহু বিখ্যাত ধ্রুপদী চলচ্চিত্র দেখারও দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন।

সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের (দ্র) মাটিতে সীমিত সুযোগ–সুবিধা কাজে লাগিয়ে মুষ্টিমেয় যে ক'জন ব্যক্তিত্ব চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হন, ফতেহ লোহানী তাঁদের অন্যতম। তাঁর নির্মিত 'আকাশ ও মাটি' এবং 'আসিয়া' এ দেশের চলচ্চিত্রনির্মাণপ্রয়াসের ভিতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। তাঁর পরিচালিত 'আসিয়া' ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত হয়।

ফতেহ লোহানীর প্রতিভা ছিল বিভিন্নমুখী। তিনি তৎকালীন ঢাকা বেতারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও তাতে অংশগ্রহণ করে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হন এবং চলচ্চিত্রে চরিত্রাভিনেতা হিসাবে অভিনয় করে দর্শকনন্দিত হন। আবৃত্তিকার হিসাবেও তিনি শক্তিমত্তার পরিচয় দেন। অনুবাদক হিসাবে, বিশেষত মার্কিন ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের (দ্র) 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি' গ্রন্থের বাংলা রূপান্তরে তাঁর মুন্সিয়ানা সকলের মনোযোগ ও প্রশংসা লাভ

www.pathagar.com

করে। বেশ কিছু ছোটগল্প ও ব্যঙ্গধর্মী নিবন্ধেরও রচয়িতা তিনি। তবে তাঁর এসব রচনা সংগ্রহ করে কোনো বই এখনো ছাপা হয় নি। ১৯৭৫ সালের ৭ই এপ্রিল ফতেহ লোহানী মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

ফতোয়া

বিশুদ্ধ আরবি উচ্চারণ— ফৎওয়া। আভিধানিক অর্থ আইন সম্বন্ধীয় মত, বিধিসঙ্গত মীমাংসা। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্‌র বিধান বা ব্যবস্থা, ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ইসলামী শরীয়তের আলোকে প্রদত্ত বিধান। তবে, ইসলামী আইনবিশেষজ্ঞ বা মুফ্‌তী কর্তৃক জারিকৃত বা প্রদত্ত এ ধরনের বিধান কোনো হীন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা কুরআন (দ্র)-হাদিসের (দ্র) বিধান বা ইসলামের কল্যাণী মর্মবাণীর পরিপন্থী হলে তা যথার্থ ফতোয়া হিসাবে গণ্য হয় না। বস্তুত ইসলামী আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের বিভিন্ন দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল, শান্তিময়, কল্যাণময় করাই ফতোয়ার উদ্দেশ্য।

ফতোয়ার অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ অনেক সময় ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টির কারণ হয়।

মু. মা.

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, নওয়াব [১৮৩৪—১৯০৩]

সমাজহিতৈষী মহিলা ও সাহিত্যিক। ১৮৩৪ সালে কুমিল্লা জেলার লাকসামের পশ্চিম গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি নিজের নামের বানান লিখতেন 'ফয়জুন্নেছা'। তাঁর পিতার নাম আহমদ আলী চৌধুরী ও মাতার নাম আরফান্নেসা চৌধুরানী।

পারিবারিক পরিবেশে কঠিন পর্দাপ্রথার মধ্যে ফয়জুন ওস্তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরিবারের সবাই উর্দু ভাষায় কথা বললেও বাংলার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। তিনি নিবিড়ভাবে বাংলা চর্চা করেন। আরবি, ফার্সি, উর্দু আর সংস্কৃত ভাষায়ও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

মোহাম্মদ গাজী চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ফয়জুনের বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। কারণ তিনি ছিলেন গাজী চৌধুরীর দ্বিতীয় স্ত্রী। অশান্তির কারণে ফয়জুন এক পর্যায়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে পিতার বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হন। বাকি জীবন তিনি এখানেই কাটিয়ে দেন। ১৮৮৫ সালে মায়ের মৃত্যুর পর তিনিই জমিদারি তদারকির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিবাহবিচ্ছেদের পর ফয়জুন সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজে ও আর্ত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে তিনি নারী-সমাজের অগ্রগতির পথ রচনার চেষ্টা চালাতে থাকেন। ১৮৭৩ সালে তিনি নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কুমিল্লায় 'ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। এ ছাড়া নিজ গ্রামে একটি সিনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন করেন, যা পরে ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হয়। তিনি ১৮৯৩ সালে কেবল মেয়েদের চিকিৎসার জন্য 'ফয়জুন্নেসা জেনানা হাসপাতাল' নামে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। লাকসাম দাতব্য চিকিৎসালয়ও তাঁর দানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৯ সালে কুমিল্লা কলেজ স্থাপনে অর্থসাহায্য ছাড়াও তিনি রাস্তাঘাট ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে অর্থসাহায্য প্রদান করেন।

ফয়জুন মক্কায় হজ্বব্রত পালন করতে গিয়ে সেখানে একটি স্কুল ও বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের অনেক সম্পত্তি তিনি ওয়াক্‌ফ্‌ (দ্র) করে যান, যা থেকে দরিদ্র, মেধাবী ছাত্ররা এখনো অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে।

উর্দুভাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ফয়জুনের জ্ঞানচর্চার ভাষা ছিল বাংলা। বাংলায় তিনি সাহিত্যচর্চাও করেন। ১৮৭৬ সালে 'রূপজালাল' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি আসলে তাঁর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনেরই রূপক কাহিনী।

জনহিতকর কাজে বিপুল অর্থ দানের স্বীকৃতিতে ফয়জুন মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ১৮৮৯ সালে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপমহাদেশের মহিলাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র এই খেতাব লাভের গৌরব অর্জন করেন।

১৯০৩ সালে ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী পরলোকগমন করেন।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ [১৯১১—১৯৮৪]

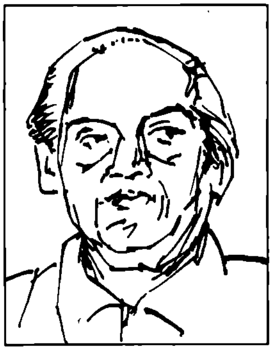

আধুনিক উর্দু কবিতার খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বমানবপ্রগতি ও মুক্তিচেতনার অন্যতম অগ্রদূত। তিনি ১৯১১ সালে পাকিস্তানের (দ্র) শিয়ালকোটের এক ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ইংরেজি ও আরবি ভাষা-সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কেম্ব্রিজেও তিনি কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন।

শিক্ষাজীবনশেষে ফয়েজ আহমদ অধ্যাপনা পেশায় যোগ দেন। লাহোর ও অমৃতসরের বিভিন্ন কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর ১৯৪১ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তিন বছরের মধ্যে দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে তিনি কর্নেল পদমর্যাদায় উন্নীত হলেও ১৯৪৭ সালে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। এর পর তিনি 'পাকিস্তান টাইম্‌স্' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর যোগ্য সম্পাদনায় কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি দেশের একটি প্রধান সংবাদপত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খানের (দ্র) সামরিক সরকার এই সংবাদপত্রের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে তিনি সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজ আফ্রো-এশীয় সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আফ্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাজে তিনি দীর্ঘদিন বৈরুত ও মস্কোয় অবস্থান করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও তিনি ঐ ইউনিয়নের মুখপত্র 'লোটাস' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

কাব্যচর্চার সূচনাপর্ব থেকেই ফয়েজ আহমদ ফয়েজ রোম্যান্টিক বিপ্লবী ধারার কবি ছিলেন। আধুনিক মনন ও সংগ্রামী জীবনচেতনার সঙ্গে ঐতিহ্যের নিবিড় সংযোগ ঘটিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক কাব্যধারা। তাঁর কাব্যপ্রকৃতি ও কবিসত্তা বিকশিত হয়েছে বৈরী পরিবেশের মধ্যে। দেশবিভাগের পর থেকেই তিনি ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন নিপীড়নের শিকার হন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যেমন বার বার কারারুদ্ধ হয়েছেন, তেমনি বার বার নিষিদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতা। তাঁর অনেক কবিতা রচিত হয়েছে কারাগারে। তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হল : 'নকশে ফরিয়াদী' (অভিযোগ চিত্রমালা), 'দস্‌তে সবা' (বাতাসের হাত), 'যিন্দাননামা' (কারালিপি), 'দস্‌তে তহে সঙ্গ' (পাথরের নিচে হাত), 'সরে ওয়াদী সিনা' (সিনাই উপত্যকার প্রান্তে), 'শামে শহরে ইয়ারাঁ' (প্রিয়জন নগরীর সন্ধ্যা)।

তাঁর অনেক কবিতা বাংলাতেও অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

ফরয্‌

'ফরয্‌' আরবি শব্দ। অর্থ অবশ্যপালনীয় বা অবশ্যকরণীয় বিষয়, কাজ বা আদেশ-নিষেধ। ইসলামী পরিভাষায় পবিত্র কুরআনের (দ্র) বিধান মেনে চলা 'ফরয্‌' বা অবশ্যপালনীয়। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, পবিত্র কুরআনে যেসকল বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে, যেসকল আদেশ-নিষেধ ও দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, এক জন মুসলমানের জন্য সেসব অবশ্যপালনীয় আইন। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত (পাঁচ বার) নামায (দ্র), রমযানের রোজা (দ্র), সামর্থ্যবানের জন্য হজ্ব (দ্র) ও যাকাত (দ্র) আদায়, আল্লাহ্‌র (দ্র) একত্বে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস ইত্যাদি।

'ফরয্‌' পালন করলে সওয়াব বা পুণ্য হয়। অন্যথায় আল্লাহ্‌র শাস্তি অনিবার্য বলে কুরআন ও হাদিসসূত্রে জানা যায়।

মু. মা.

ফর্‌রুখ আহমদ [১৯১৮—১৯৭৪]

বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কবি। তিনি ১৯১৮ সালের ১০ই জুন যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

খুলনা জেলা স্কুল থেকে ১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর ফর্‌রুখ আহমদ কলিকাতার (দ্র) রিপন কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৩৯ সালে আই. এ. পাশ করেন। এরপর স্কটিশ চার্চ কলেজে অনার্সসহ দর্শনশাস্ত্র

www.pathagar.com

এবং সেন্ট পল্‌স্ কলেজে অনার্সসহ ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।

কলেজজীবনে তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং কলিকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতি-জগতের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-সুহৃদবর্গের অন্যতম ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কবি ফর্‌রুখ আহমদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত জীবন তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে তিনি মার্ক্সবাদী দর্শন, দ্বিতীয় পর্বে এম. এন. রায়ের (দ্র) র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট আদর্শ এবং শেষকালে দ্বি-জাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তান আন্দোলনের (দ্র) মতবাদের অনুসারী ছিলেন। তাঁর কবিজীবনও এই তিনটি বিশ্বাস ও আদর্শগত অধ্যায়কে ঘিরে আবর্তিত, পরিবর্তিত ও সম্প্রসারিত।

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সরকারি পদসহ মাসিক 'মোহাম্মদী' (দ্র) পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে এবং পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্রের জন্ম হলে ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বেতারকেন্দ্রে 'স্টাফ রাইটার' পদে নিযুক্ত থেকে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। কর্মজীবনে তিনি বামপন্থী রাজনীতি ত্যাগ করেছিলেন।

ফর্‌রুখ আহমদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আদর্শের প্রতি অটুট অবিচল থাকলেও ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং ধর্মীয় কুসংস্কার ও পাকিস্তানের অপরিণামদর্শী রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে লেখনী-অভিযান পরিচালনা করতে দ্বিধা করেন নি। তবে ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি তাঁর বিশ্বাসই কাজ করেছে, কিন্তু ধর্মকে তিনি কখনো রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন নি।

ফর্‌রুখ আহমদের কবিজীবন ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও এর ভাবজাগরণবাদী আদর্শের অনুসারী। এই ধর্মের উদারনৈতিকতা দ্বারাও তাঁর কবিজীবন ও কবিতা অনুপ্রাণিত। তাঁর কবিতায় আরবি-ফার্সি শব্দের প্রাচুর্য থাকলেও তা এক নতুন ও স্বতন্ত্র কাব্যশৈলীর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

তিনি তাঁর সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ যেসব পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছেন, সেগুলো হল : কবিতায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬০), পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬৬) এবং ইউনেস্কো পুরস্কার। তিনি মরণোত্তর 'একুশে পদক'ও লাভ করেছেন। ফর্‌রুখ আহমদের রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— কাব্যগ্রন্থ : 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), 'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২), 'বন্য স্বপ্নেরা' ও 'হাবেদা মরুর কাহিনী'; কাব্যনাট্য : 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬৫), 'হাতেমতায়ী' (১৯৬৬); শিশুসাহিত্য : 'পাখীর বাসা' (১৯৬৫), 'নতুন লেখা' (১৯৬৯), 'হরফের ছড়া' (১৯৭০) এবং 'ছড়ার আসর' (১৯৭০)।

ফর্‌রুখ আহমদ ১৯৭৪ সালের ১৯শে অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

ফরায়েজি আন্দোলন

ফরিদপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলে হাজী শরীয়তউল্লাহ (দ্র) পরিচালিত ধর্মসংস্কার আন্দোলন, যা পরে একই সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রও অর্জন করেছিল। ফরয্ (দ্র) অর্থাৎ অবশ্যপালনীয় কথাটি থেকে ফরায়েজি শব্দের উৎপত্তি।

এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও অনুশাসন পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলা এবং সব ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকর, মহাজন ও স্থানীয় প্রশাসনের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করাও ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। স্বভাবতই এই আন্দোলন ক্রমে ইংরেজবিরোধী রূপ গ্রহণ করে।

হাজী শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে সূচিত এই আন্দোলনের প্রতি কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর সমর্থন গড়ে উঠতে থাকে। তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলন

www.pathagar.com

সমর্থনকারীরা 'ফরায়েজি' নামে এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সংঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়।

হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ মহসিন ওরফে দুদুমিয়া (দ্র) প্রকৃতপক্ষে ফরায়েজি আন্দোলনকে কৃষকদের মুক্তি-আন্দোলনে পরিণত করেন। তিনি ঘোষণা করেন : 'সমস্ত জমি আল্লাহ্‌র'; সুতরাং জমিদার খাজনা পেতে পারে না।

কিন্তু জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ প্রশাসনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ফরায়েজি আন্দোলন বেশি দিন টিকে থাকতে পারে নি। দুদুমিয়ার মৃতুর পর ক্রমশ এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

কা. ম.

ফরাসি বিপ্লব

১৭৭৮ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফরাসি দেশে নানা উত্তাল ঘটনাধারা ফরাসি বিপ্লব নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এই বিপ্লবের ফলে ফরাসি দেশে সামন্ত যুগের পুরানো বিধি-বিধান পাল্টে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে এবং রাজতন্ত্র (দ্র), অভিজাততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সম্মিলিত সামাজিক আধিপত্যের অবসান হয়।

ইতিহাসবিদগণ সাধারণভাবে ফরাসি বিপ্লবের যেসব কারণ নির্দেশ করে থাকেন সেগুলো হল : ১. গোটা ইউরোপে (দ্র) তৎকালীন ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং জনগণের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ছিল না; ২. ধনী ও নতুন বিকাশ লাভ করা বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় কোনো ধরনের অংশ ছিল না; ৩. চাষীরা ছিল সচেতন এবং সামন্তব্যবস্থায় তাদের দুর্গতির অন্ত ছিল না; ৪. সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা যেসব দার্শনিক বলতেন তাঁদের বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল; ৫. আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে ফরাসি সহায়তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রায় শূন্য করে তুলেছিল।

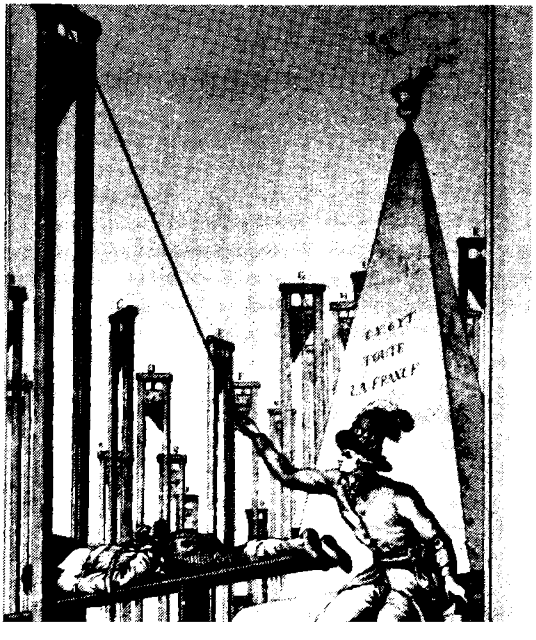

সব মিলিয়ে সঙ্কট ঘনিয়ে আসছিল নানা দিক থেকে, পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠছিল সবাই। ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় চাচ্ছিল তাদের ক্ষমতা জোরদার করে নিতে। পক্ষান্তরে রাজা যখন এস্টেট্‌স্ জেনারেল বা অধিকতর ব্যাপকভিত্তিক পরামর্শক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন, তখন সাধারণ জনের প্রতিনিধিরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করল। ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা এবং আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ ফরাসি দার্শনিক ও লেখকবৃন্দ— ভল্‌ত্যার (দ্র), রুসো (দ্র)—পুরানো বিধানকে বাতিল করে ব্যক্তি-অধিকার ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের পক্ষে জোরালো মত প্রচার করছিলেন। ত্রিমুখী এই টানাপোড়েনে শেষ অবধি থার্ড এস্টেট্‌স্ বা জনগণের পক্ষের শক্তি নিজেদেরকে জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদ হিসাবে ঘোষণা করে এবং একটি লিখিত ফরাসি সংবিধান প্রণয়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল্ (দ্র) দুর্গ আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয় এবং আজও এই তারিখটি বিশ্বব্যাপী ফরাসি বিপ্লবের দিন হিসাবে পালিত হয়। বাস্তিলের পতনের পর তৎকালীন ব্রিটিশ রাজদূত

পাশের ছবি : ফরাসি বিপ্লবের সময় ব্যবহৃত বিশেষ ধরণের হাঁড়িকাঠ 'গিলোটিন'। নিচের ছবি : ফরাসি বিপ্লবের সময়ে একটি সভা (অঙ্কিত চিত্র)

বলেছিলেন, "আজ থেকে ফ্রান্স হয়ে উঠল স্বাধীন দেশ, সম্রাট হলেন সীমিত অর্থে রাজা এবং অন্যান্য দেশের মতো অভিজাতেরা নেমে এলেন সাধারণের স্তরে।"

নতুন জাতীয় পরিষদের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল সামন্তবাদের (দ্র) অবসান সংক্রান্ত ডিক্রি এবং মানুষের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণকারী ফরাসি বিপ্লব নানা জটিলতার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে নেপোলিয়নের (দ্র) অভ্যুদয়ে আবার একনায়কী ব্যবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর কোনো কিছুই আর আগের মতো ছিল না। বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলার শক্তি নেপোলিয়নেরও ছিল না। অভিজাতশ্রেণী ও ধর্মগুরুরা বিপ্লবের পূর্বের ক্ষমতা আর ফিরে পায় নি। মধ্যশ্রেণী ও কৃষকদের বর্ধিত অধিকার ও অর্জনকে সমীহ করে চলতে হয়েছিল সবাইকে। সবচেয়ে বড় কথা, বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুগ যুগ ধরে প্রেরণাসঞ্চারী হয়ে আছে ফরাসি বিপ্লব।

ম. হ.

ফরাসি শিল্পকলা

ফরাসি দেশীয় শিল্পকলা পৃথিবীর শিল্পজগতের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। তাই ফরাসি শিল্পকলার ঐতিহাসিক গুরুত যেমন, সাধারণভাবে শিল্পবৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও তা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। ফরাসি দেশ তথা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস (দ্র) বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাকেন্দ্র হিসাবে সুবিদিত। সেখানে অবস্থিত লুভ্র্ (দ্র) জাদুঘর শিল্পকলার বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীবিখ্যাত।

ফরাসি দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন বহু নামজাদা শিল্পী। শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় তাঁদের প্রচুর অবদান রয়েছে। দুই শতাধিক বছর পূর্বে, ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে সংঘটিত হয়েছিল এক বিপ্লব, যা সে দেশের অসহায় নিপীড়িত জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনা 'ফরাসি বিপ্লব' (দ্র) নামে অভিহিত। এই বিপ্লবের পর ফরাসি দেশ-সহ সারা বিশ্বের শিল্পকলার অঙ্গন নতুন পথে মোড় নেয়। শিল্পীরা ছবি আঁকেন, ভাস্কর্য নির্মাণ করেন ঐ বিপ্লবকে কেন্দ্র করে।

পরবর্তী কালে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রান্সের এক দল শিল্পী, যাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে 'ইম্প্রেশনিস্ট গ্রুপ' বলে, তাঁরা ইম্প্রেশনিজ্‌ম্ বা প্রতিচ্ছায়াবাদ নামে এক

নৌকায় মধ্যাহ্নভোজ—১৮৮১
শিল্পী : পিয়ের্ ওগুস্ত্ রেনোয়া

পাণ্ডানাস গাছের নিচে
শিল্পী : পল গোগ্যাঁ

উপরে : শিল্পী এদুয়ার্ মানের একটি শিল্পকর্ম, নিচে : শিল্পী এদ্গার্ দেগার শিল্পকর্ম—নাচের ক্লাস–১৮৭৪

www.pathagar.com

মুঁলা রুজ—১৮৯২. শিল্পী : তুলুজ-লোত্রেক

নবধারার শিল্প-আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন। ঐ ইম্প্রেশনিস্ট আর্ট (দ্র) বর্তমানের যাবতীয় আধুনিক শিল্পধারার সূচনা ঘটায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ সময়কাল থেকে বহুকাল পর্যন্ত ফ্রান্স ও তার রাজধানী প্যারিস ইউরোপীয় শিল্পকলার কেন্দ্রভূমি হিসাবে বিবেচিত হত। আর এ কথাও সর্বজনবিদিত যে সেই সময়কালে ফ্রান্স শিল্পের দেশ হিসাবে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিল। ১৬৪৩ সালে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা চতুর্দশ লুই। তাঁর সময় থেকেই ফরাসি দেশে শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিকাশের পথ খুলে গিয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ফরাসি শিল্পকলা বিপ্লবপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছিল। ফরাসি দেশীয় শিল্পীরা এবং যেসমস্ত বিদেশী তখন সেখানে ছিলেন তাঁরা বাস্তববাদী ঢঙে ছবি আঁকতেন, কল্পিত দৃশ্যচিত্রও আঁকতেন। সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে স্মরণীয় নিকোলা পুস্যাঁ, (১৫৯৩/৪–১৬৬৫), ক্লোদ্ লর‍্যাঁ (১৬০০-১৬৮২), অঁতোয়ান ওয়াতো (১৬৮৪-১৭২১), জঁ বাপ্তিস্ত্ শার্দ্যাঁ (১৬৯৯-১৭৭৯) এবং ফ্রঁসোয়া বুশে (১৭০৩-১৭৭০) প্রমুখের নাম।

বিপ্লবের পর সারা দেশ জুড়ে শিল্পকলার ক্ষেত্রে শুরু হয় কর্মতৎপরতা। সরকারি শিল্পকলা একাডেমীও সেখানে আগের চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। শিল্পীদের ব্যাপকভাবে শিল্পচর্চার নানা প্রতিবন্ধকতাও দূর হয়। আগে সরকারি বার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনীতে, ফরাসি ভাষায় সালঁ [salon], খুব কম সংখ্যক নির্ধারিত শিল্পী-কর্মী অংশ নিতে পারতেন, কিন্তু পরে হাজার হাজার শিল্পী সালঁতে সমবেত হন।

সেই সময়ের শিল্পীরা 'নব্য ধ্রুপদবাদী' শিল্পী বলে পরিচিত ছিলেন। নেতৃস্থানীয় শিল্পস্রষ্টা ছিলেন জাক্ লুই দাভিদ (১৭২৮–১৮২৫)। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলি হচ্ছে

রবিবারের বিকেল—১৮৮৪-৮৬. শিল্পী : জর্জ স্যরা

'হোরেশিয়দের শপথ', 'মারার হত্যা', 'টেনিস কোর্টের প্রতিজ্ঞা', 'নেপোলিয়নের অভিষেক', 'সক্রেটিসের মৃত্যু' প্রভৃতি। দাভিদের শিষ্য ছিলেন অঁতোয়ান জঁ গ্রো (১৭৭১–১৮৩৫) ও জঁ ওগুস্ত্ দমিনিক্ অ্যাঁগ্রে (১৭৮০-১৮৬৭)। তাঁরাও বিখ্যাত শিল্পী। পরবর্তী শিল্পস্রষ্টা ইউজ্যান দ্যলাক্রোয়া (১৭৯৮-১৮৬৩) ছিলেন ফরাসি চিত্রশিল্প ও সাহিত্যজগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিখ্যাত দু'টি ছবি 'মৃত্যুশয্যায় সাদানা পুলুস' ও 'লেডি লিবার্টি লিভিং দ্য পিপল্'।

এর পর উল্লেখ্য ফরাসি ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পীদের কথা। এই শিল্পধারা অনুসরণ করতে গিয়ে শিল্পীরা প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতির সীমাবদ্ধতা ছাপিয়ে সম্পূর্ণ অভিনব চিত্রশিল্পের উদ্ভাবন করেন। এতদিন ঘরের ভেতরে বসে কাজ চলত। এবারে ঘর থেকে শিল্পীরা বেরিয়ে এলেন, দৃশ্যাবলি রচনা করলেন সামনে দেখা দৃশ্যের অনুসরণে। আলো এবং আলোর প্রতিক্রিয়া রঙের উপর কীভাবে কতটা হয় তা নিয়ে এই শিল্পীরা গবেষণা করলেন। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন ক্লোদ্ মনে (১৮৪০–১৯২৬), কামিই পিসারো (১৮৩১–১৯০৩) এবং আলফ্রে সিস্লি (১৮৩৯–৯৯)। ফরাসি ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে অন্যান্যরা হলেন এদুয়ার্ মানে (১৮৩২–৮৩), এদ্‌গার্ দেগা (১৮৩৪–১৯১৭), পল্ সেজান্ (১৮৩৯–১৯০৬) (দ্র), পিয়ের্ ওগুস্ত্ রেনোয়া

www.pathagar.com

(১৮৪১-১৯১৯) (দ্র), পল্ গোগ্যাঁ (১৮৪৮-১৯০৩) (দ্র) ও অঁরি দ্য তুলুজ্ লোত্রেক্ (১৮৬৪-১৯০১)।

নানাভাবে ফরাসি শিল্পের কাছে বিশ্বের শিল্পাঙ্গন ঋণী। ফরাসি বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত শিল্পকলা আর ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় শিল্পান্দোলন ইম্প্রেশনিজ্ম্ দু'য়েরই স্থায়ী প্রভাবের প্রতিফলন রয়েছে সর্বত্র।

ম. আ.

ফরাসি সাহিত্য

আমরা ফরাসি সাহিত্যের অভ্যুদয় লক্ষ করি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে। তখন বীরত্বব্যঞ্জক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী নিয়ে বেশ কিছু গাথা-কাব্য রচিত হয়। তার পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন এক জন শক্তিমান কবি। তাঁর নাম ফ্রাঁসোয়া ভিইও (Villon)। ষোড়শ শতকে আবির্ভূত হন প্রতিভাবান, ব্যঙ্গধর্মী রচনায় পারদর্শী গদ্যলেখক রাব্লে (Rabelais) এবং প্রাবন্ধিক মঁত্যাইন্ (Montaigne)। মঁত্যাইন্কে অনেকে আধুনিক প্রবন্ধসাহিত্যের জনক বলে বিবেচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি সাহিত্য একাধিক শাখায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তিন জন নাট্যকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন ট্র্যাজিক নাট্যকার কর্নেই (Corneille) ও রাসিন্ (Racine) এবং ব্যঙ্গ-কৌতুকের রাজা কমিক নাট্যকার মলিয়্যার্ (দ্র)। মলিয়্যারের নাটক বাংলাদেশ (দ্র)-সহ পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশে, মূলে কিংবা রূপান্তরে, আজও নিয়মিত মঞ্চস্থ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা গদ্যের ক্ষেত্রেও দু'জন বিশেষ প্রতিভাবান লেখককে পাই। এক জন হলেন ঔপন্যাসিক বাল্জাক্ (দ্র), আরেক জন দার্শনিক দেকার্তে (Descartes)। গদ্যরচয়িতাদের মধ্যে লা রশ্ফুকোর (la Rochefoucauld) নামও উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীকে অনেকে ফরাসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছেন।

ফরাসি সাহিত্যের অঙ্গনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন ভল্ত্যার (দ্র) ও রুসোর (দ্র) মতো বিশ্ববিখ্যাত কালজয়ী লেখক। এ দু'জনের রচনায় সর্বপ্রকার অন্যায় ও কপটতার তীব্র বিরোধিতা এবং মানুষের যাবতীয় শৃঙ্খলমুক্তির বিষয় প্রাধান্য পায় এবং ঐ সব রচনা ফরাসি বিপ্লবে প্রেরণাদায়ী ভূমিকা পালন করে।

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবিতা ও কথাসাহিত্যের অঙ্গনে দেখা দিলেন এক ঝাঁক উজ্জ্বল সাহিত্যিক, যাঁদের রচনা পরবর্তী কালে সমগ্র পৃথিবীর আধুনিক লেখককুলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। এঁদের মধ্যে কবিতার অঙ্গনে আছেন বোদ্ল্যার (দ্র), র‍্যাঁবো (Rimbaud) ও মালার্মে (Mallarmé) আর কথাসাহিত্যের অঙ্গনে আছেন 'লে মিজেরাব্ল্'-এর লেখক ভিক্তর উগো (দ্র), 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'-এর লেখক আলেক্সাঁদ্র দ্যুমা (দ্র), 'মাদাম বোভারি'র লেখক গুস্তাভ্ ফ্লোবের্ (দ্র), 'জার্মিনাল'-এর লেখক এমিল্ জোলা (দ্র), 'পেঙ্গুইন আয়ল্যাণ্ড'-এর লেখক আনাতোল্ ফ্রাঁস্ (দ্র) এবং বহু সাড়াজাগানো গল্পের লেখক মোপাসাঁ (দ্র), যাঁর ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের অনুপম সম্পদরূপে সর্বজনপ্রশংসিত।

ভিক্তর উগো

আলেক্সাঁদ্র দ্যুমা

শার্ল বোদ্ল্যার

আল্বের কাম্যু

বিংশ শতাব্দীতে কবিতার ক্ষেত্রে আমরা গোড়ার দিকে পাই গিওম্ আপোলিন্যার (Guillaume Apollinaire), এবং কিছু পরে স্যাঁ-ঝন্ পের্সকে। এই শতাব্দীতে কতিপয় প্রতিভাদীপ্ত শক্তিশালী সাহিত্যিক ফরাসি কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ ও নাটককে তাঁদের অবদান দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন ঔপন্যাসিক রম্যাঁ রলাঁ (দ্র) ও মার্সেল্ প্রুস্ত্, দার্শনিক অঁরি বের্গ্সঁ (দ্র), ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক কবি অঁদ্রে জিদ্ (দ্র), ঔপন্যাসিক, দার্শনিক ও নাট্যকার জঁ পল্ সার্ত্র্ (দ্র), নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক আল্বের্ কাম্যু (দ্র) এবং নাট্যকার জঁ আনুই (Jean

www.pathagar.com

Anouilh)।

বেশ কয়েক জন ফরাসি লেখক নোবেল পুরস্কারে (দ্র) ভূষিত হয়েছেন। রম্যাঁ রলাঁ এ পুরস্কার লাভ করেন ১৯১৫ সালে, আনাতোল্ ফ্রাঁস ১৯২১ সালে, অঁরি বের্গসঁ ১৯২৭ সালে, অঁদ্রে জিদ্ ১৯৪৭ সালে, আল্‌বের্ কাম্যু ১৯৫৭ সালে, স্যাঁ-ঝন্ পের্স্ ১৯৬০ সালে এবং জঁ পল্ সার্ত্র্ ১৯৬৪ সালে। তবে সার্ত্র্ নীতিগত কারণে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন।

ক. চৌ.

ফরেনসিক মেডিসিন (forensic medicine)

আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ফরেনসিক মেডিসিন বা লিগাল মেডিসিন (Legal Medicine) বলা হয়। ফরেনসিক মেডিসিন 'মেডিকেল জুরিস্‌প্রুডেন্স' (Medical Jurisprudence) নামেও পরিচিত।

বিভিন্ন রকম অস্বাভাবিক মৃত্যু, যেমন—খুন, দুর্ঘটনা বা পানিতে ডুবে মৃত্যু, বিষপানে মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে আদালতে চিকিৎসকের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন ফরেনসিক মেডিসিনের অন্তর্ভুক্ত। কোনো অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো দায়িত্বশীল সংস্থার ক্ষেত্রেও (যেমন জীবনবীমা সংস্থা) চিকিৎসকের চিকিৎসাজ্ঞানপ্রসূত সাক্ষ্য দানের প্রয়োজন হতে পারে।

ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃত বয়স নিরূপণ, দুর্ঘটনাজনিত ও রোগজনিত মৃত্যুর পার্থক্য নির্ণয়, মৃত্যুর সময়কাল নিরূপণ, মৃত্যুর পূর্বে ও পরে সংঘটিত আঘাতের পার্থক্য নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ফরেনসিক মেডিসিনের প্রয়োগ রয়েছে। ফরেনসিক মেডিসিনের ক্ষেত্রে পোস্ট-মর্টেম (দ্র) অর্থাৎ মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ এবং পরীক্ষা দ্বারা মৃত্যুর কারণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সি. না. হ.

ফরেস্ট, লি ডি ইলেক্ট্রনিক্স দ্র

ফরোয়ার্ড ব্লক (Forward Block)

মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (দ্র) রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু (দ্র) এই দলটি গড়ে তোলেন। তিনি মনে করতেন, কংগ্রেস হচ্ছে নানা পরস্পরবিরোধী মতাবলম্বী নেতা ও কর্মীদের এক রাজনৈতিক মঞ্চবিশেষ। তাই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে স্বাধীনতাসংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালের মে মাসে তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক দলটির জন্ম দেন। দল গঠনের

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

সময় তিনি ঘোষণা দেন যে এর লক্ষ্য হচ্ছে কংগ্রেসের তৎপরতাকে চাঙ্গা করা, তার বিরোধিতা নয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালের ৯ই জুলাই কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সুভাষচন্দ্র 'নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবসে' অংশগ্রহণ করলে তাঁকে কংগ্রেস থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং এই ঘটনার পর থেকে ফরোয়ার্ড ব্লকের তৎপরতা ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ভারতের নাগপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় একটি সম্মেলনের মাধ্যমে একে তিনি একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে ঘোষণা করেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের লক্ষ্য ছিল : দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আপসহীন সংগ্রাম, একটি পুরোপুরি আধুনিক ও সমাজবাদী রাষ্ট্র কায়েম, দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ব্যাপক শিল্পোৎপাদন, ধর্মোপাসনার ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সকলের জন্য সমান অধিকার, ভারতীয় সমাজের সর্বশ্রেণীর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ভারতে সংবিধান গঠনে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রয়োগ।

ফরোয়ার্ড ব্লকের তৎপরতা এক সময় অবিভক্ত বাংলায় জঙ্গীরূপ ধারণ করেছিল, বিশেষত ১৯৪০ সালের পর থেকে। সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে দলটির সাংগঠনিক

www.pathagar.com

কাঠামো ও রাজনৈতিক শক্তি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। দলটি কখনোই সর্বভারতীয় চরিত্র অর্জন করতে পারে নি। এর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল অবিভক্ত বঙ্গদেশ। বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের শরিক দল।

আ. হ.

ফর্মুলা (formula)

দুই বা ততোধিক মৌলের (দ্র) নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু (দ্র) রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যৌগ অণু (দ্র) গঠন করে। যৌগ অণুর ভেতরের বিভিন্ন মৌলের প্রতীক এবং তাদের পরমাণুর সংখ্যা বা অনুপাত সংক্ষেপে প্রকাশ করাকে যৌগের ফর্মুলা বলে। যেমন—হাইড্রোজেনের (দ্র) দু'টি পরমাণু অক্সিজেনের (দ্র) একটি পারমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অণু পানি গঠন করে। তাই পানির সঙ্কেত বা ফর্মুলা হল H_2O. সাধারণত নিম্নোক্ত চার রকমের ফর্মুলার ব্যবহার করা হয় :

১. স্থূল ফর্মুলা (Empirical formula)
যৌগের অণুর ভেতরের বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর আসল সংখ্যা না বুঝিয়ে শুধু তাদের ক্ষুদ্রতম অনুপাত প্রকাশ করার জন্য স্থূল সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়। যেমন—গ্লুকোজের ($C_6H_{12}O_6$) স্থূল সঙ্কেত CH_2O।

২. রাসায়নিক ফর্মুলা (Chemical formula)
যৌগের অণুর ভেতরের মৌলের যোজ্যতাভিত্তিক সঙ্কেতকে রাসায়নিক সঙ্কেত বলে। যেমন—অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সঙ্কেত Al_2O_3।

৩. আণবিক ফর্মুলা (Molecular formula)
যৌগের অণুর ভেতরের বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য আণবিক সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়। যেমন—কপার সালফেটের আণবিক সঙ্কেত $CuSO_4$ বা $CuSO_4.H_2O$ বা $CuSO_4.5H_2O$ হতে পারে। সবক্ষেত্রে সাধারণ যোজ্যতার সাহায্যে আণবিক সঙ্কেত লেখা যায় না। প্রস্তুতপ্রণালী এবং অন্যান্য উপাদানের ওপর যৌগের অণুর গঠন নির্ভর করে।

৪. গাঠনিক ফর্মুলা (Structural formula)
গাঠনিক ফর্মুলার সাহায্যে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের অণুর ভেতরে বিভিন্ন পরমাণু একে অপরের সঙ্গে যেভাবে যুক্ত থাকে, তা প্রতীক এবং হাইফেন চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়। যেমন-সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)-এর গাঠনিক সঙ্কেত :

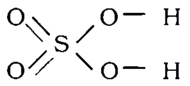

অবশ্য আসল গাঠনিক সঙ্কেতের সাহায্যে অণুর আকৃতি এবং পাশাপাশি দুই পরমাণুর মাঝখানের কৌণিক দূরত্ব প্রকাশ করা যায়।

সা. এ.

ফর্ম্যাল্ডিহাইড (formaldehyde)

অ্যালডিহাইড শ্রেণীর বিভিন্ন জৈব যৌগের মধ্যে সবচেয়ে সরল অ্যালডিহাইডের নাম ফর্ম্যাল্ডিহাইড। এর ফর্মুলা H-C(H) = O। এটা এত বেশি বিক্রিয়াশীল যৌগ যে বিশুদ্ধ অবস্থায় একে আলাদা করা এবং ব্যবহার করা খুব কঠিন। এ জন্য বাজারে ফর্মালিন নামে এর জলীয় দ্রবণ কিনতে পাওয়া যায়। প্যারাফর্ম্যাল্ডিহাইড বা প্যারাফর্ম নামে এর কঠিন পলিমারও (দ্র) পাওয়া যায়।

গবেষণাগারে ক্যালসিয়াম ফর্মেটকে পাতন করে ফর্ম্যাল্ডিহাইড তৈরি করা হয়। তৈরি ফর্ম্যাল্ডিহাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করে দ্রবণ হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। শিল্পক্ষেত্রে সাধারণত মিথাইল অ্যালকোহল ও মিথেন (দ্র) থেকে এটা তৈরি করা হয়।

ফর্ম্যাল্ডিহাইড একটি তীব্র গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। একে সহজেই তরলে পরিণত করা যায়। এটা পানিতে অতিমাত্রায় দ্রবণীয়। ফর্ম্যাল্ডিহাইডের শতকরা ৪০ ভাগ জলীয় দ্রবণকে ফর্মালিন বলে। আসলে ফর্মালিনে ৪০% ফর্ম্যাল্ডিহাইড ছাড়া ৮% মিথাইল অ্যালকোহলও থাকে। জীবদেহ সংরক্ষণ এবং শবব্যবচ্ছেদের জন্য মানুষের মরদেহ সংরক্ষণে ফর্মালিন ব্যবহার করা হয়।

কৃত্রিম রেজিন (দ্র) তৈরির জন্য ফর্ম্যাল্ডিহাইডের ব্যবহার রয়েছে। ফেনল, ইউরিয়া (দ্র) এবং মেলামাইনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে আঠা (adhessive) তৈরির জন্যও এটা ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া কাপড়, রঙ, ঔষধ, কাগজ (দ্র), চামড়াশিল্প এবং জীবাণু (দ্র) ও পোকা-মাকড় মারার কাজে ফর্ম্যাল্ডিহাইড ব্যবহার করা হয়।

সা. এ.

www.pathagar.com

ফল

উদ্ভিদদেহে ফুলের গর্ভাশয় পরিপক্ব হয়ে এককভাবে (আম, লিচু) বা এর রসালো বৃতি (চালতা) বা রসালো পুষ্পাক্ষ (আপেল) বা সম্পূর্ণ মঞ্জরি (কাঁঠাল) সহযোগে যে একক গুচ্ছ গঠিত হয় তার নাম ফল। একটি আদর্শ ফলের প্রধান অংশ দু'টি – ফলত্বক ও বীজ (নিষেককৃত পরিপক্ব ডিম্বক)। একটি ফলের ভেতরে এক বা একাধিক বীজ থাকতে পারে।

ফুলের কোন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে তার উপর নির্ভর করে ফলকে প্রকৃত ফল ও অপ্রকৃত ফল—এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কেবল ফুলের গর্ভাশয় যখন ফলে পরিণত হয়, তখন তাকে প্রকৃত ফল (যেমন আম) বলে। ফুলের গর্ভাশয় ও অন্য অংশ যখন একত্রে ফলে পরিণত হয়, তখন তাকে অপ্রকৃত ফল (যেমন নাসপাতি, ডুমুর ও চালতা) বলে।

কোন প্রকার গর্ভাশয় থেকে ও একক ফুল বা ফুলের মঞ্জরি থেকে ফলটি উৎপন্ন হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ফলকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—১. সরল ফল, ২. যৌগিক ফল ও ৩. গুচ্ছ ফল।

বিদারী ফল বলে। এগুলো পাঁচ ভাগে বিভক্ত : যেমন—ক. লিগিউম বা পড (মটর), খ. ফলিকল (আকন্দ), গ. সিলিকুয়া (সরিষা), ঘ. ক্যাপসুল (ঢেঁড়স) ও ঙ. সাইজোকার্প (ধনিয়া বা রেড়ি)।

নিরস অবিদারী ফল : যে নীরস ফল পাকার পর আপনা থেকে ফেটে যায় না (যেমন সূর্যমুখী, ধান ও গম), তাকে নীরস অবিদারী ফল বলা হয়।

সরস ফল : যে ফলের ফলত্বক পুরু ও রসালো, সেই ফলকে সরস ফল বলে। এ ধরনের ফল পাকলেও ফাটে না। সরস ফলের স্তর তিনটি। যেমন—বহিঃত্বক, মধ্যত্বক ও অন্তঃত্বক।

সরস ফল সাত প্রকার। এগুলো হচ্ছে –ক. ড্রুপ (আম ও কুল), খ. বেরি (বেগুন), গ. পোম (আপেল ও নাসপাতি), ঘ. পেপো (কুমড়া ও শসা), ঙ. অ্যাম্ফিসারকা (বেল ও কদবেল), চ. পাইরেনি, ছ. হেস্পেরিডিয়াম (লেবু, কমলা ও বাতাবি লেবু)

১. সরল ফল : যে ফল একটি মাত্র গর্ভাশয় থেকে (একক বা সংযুক্ত) উৎপন্ন হয় তাকে সরল ফল বলে। সরল ফল নীরস ফল (মটর, ধান প্রভৃতি) ও সরস ফল (আম, কমলা প্রভৃতি) এ দু' ভাগে বিভক্ত।

নীরস ফল : যে ফলের ফলত্বক পাতলা এবং ফল পাকলে তা শুকিয়ে যায়, তার নাম নীরস ফল। নীরস ফল বিদারী ও অবিদারী—এ দু'ভাগে বিভক্ত। যেসব নীরস ফল পাকলে আপনা থেকেই ফেটে যায় সেগুলোকে নীরস

২. যৌগিক ফল : একটি পুরো মঞ্জরি যখন একটি ফলে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক ফল বলে। যৌগিক ফল সরোসিস (কাঁঠাল ও তুঁত) ও সাইকোনাস (ডুমুর, বট ও অশ্বত্থ)—এ দু'ভাগে বিভক্ত।

৩. গুচ্ছফল : একটি মাত্র ফুল থেকে উৎপন্ন একগুচ্ছ ফলকে গুচ্ছফল বলা হয়। যেমন—ছাগলবটি, কাঁঠালিচাঁপা, আকন্দ ও রাস্পবেরি।

মু. আ.

ফলিক অ্যাসিড ভিটামিন দ্র

www.pathagar.com

ফস্‌ফরাস্ (phosphorus)

ফস্‌ফরাস্ একটি অধাতব মৌলিক পদার্থ। হেনিগ ব্রাণ্ড (Hennig Brandt) নামে জার্মানির এক রসায়নবিদ ১৬৬৯ সালে মূত্র থেকে ফস্‌ফরাস্ আবিষ্কার করেন। অন্ধকারে এটি মৃদু আভা বিকিরণ করে বলে বিজ্ঞানী ব্রাণ্ড এটির নামকরণ করেন ফস্‌ফরাস্ (অর্থাৎ দীপ্তিমান)। ফসফরাস একটি অত্যন্ত সক্রিয় মৌলিক পদার্থ। প্রকৃতিতে তাই এটি অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। ক্যালসিয়াম (দ্র), ফস্‌ফরাস্ ও অক্সিজেন (দ্র) সহকারে গঠিত ক্যালসিয়াম ফসফেট নামক খনিজ থেকে ফস্‌ফরাস্ উৎপন্ন হয়। জীবজন্তুর হাড় ফস্‌ফরাসের একটি প্রধান উৎস। হাড়ের কঠিন অংশের প্রধান উপাদান হল ক্যালসিয়াম ফসফেট। ডিমের কুসুম, দুধ (দ্র), দৈ, মাছ (দ্র) প্রভৃতিতে এবং শিমের (দ্র) মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফস্‌ফরাস্ থাকে। ধর্ম : গন্ধকের (দ্র) মতো ফস্‌ফরাস্‌ও দানা-বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। এটির কেলাস দু'ধরনের – শ্বেত বা পীত ফস্‌ফরাস্ (Yellow phosphorus) ও লোহিত বা লাল ফস্‌ফরাস্ (Red phosphorus)। বালু এবং কোক (দ্র)-এর সঙ্গে ক্যালসিয়াম ফসফেট খনিজ মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে শ্বেত ফস্‌ফরাস্ পাওয়া যায়। শ্বেত ফস্‌ফরাস্ সামান্য অস্বচ্ছ ও মোমের মতো নরম হয়। বাতাসের সংস্পর্শে শ্বেত ফস্‌ফরাস্ সাধারণ উষ্ণতায় ধীরে ধীরে হালকা সবুজ দীপ্তি নিয়ে জ্বলতে থাকে। অন্ধকারে ফস্‌ফরাসের আভা বিকিরণের কারণ হল এটাই। এ কারণে ফস্‌ফরাস্‌কে অন্ধকারে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। পানিতে ফস্‌ফরাস্ অদ্রবণীয় কিন্তু কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবণীয়। শ্বেত ফস্‌ফরাস্ খুবই বিষাক্ত এবং হাতে ধরলে তা এমনই বিষাক্ত ঘায়ের সৃষ্টি করে যা সহজে সারে না, সারতে অনেক দিন দরকার হয়। শ্বেত ফস্‌ফরাস্‌কে অক্সিজেনশূন্য পাত্রে (নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিবেশে) ২৫০ সে. উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে তা লোহিত বা লাল ফস্‌ফরাসে পরিণত হয়। এটির কোনো গন্ধ বা দীপ্তি নেই এবং এটি সহজে জ্বলে না। লাল ফস্‌ফরাস্ অনেক কম বিষাক্ত এবং পানি বা কার্বন ডাই–সালফাইডে দ্রবণীয় নয়।

মাছের মধ্যে কিছু ফস্‌ফরাস্ থাকে। পানির নিচে গাছপালা পচলে হাইড্রোজেনের (দ্র) সঙ্গে এই ফস্‌ফরাস্ মিশে ফস্‌ফিন (phosphine) নামক একটি বিষাক্ত গ্যাসে পরিণত হয়। বাতাসের সংস্পর্শে এই গ্যাসটি আপনাআপনি জ্বলে ওঠে। জলাভূমিতে কখনো কখনো রাতের বেলা এই ফসফিনকে জ্বলতে দেখা যায়। একেই বলে 'আলেয়া' (দ্র)।

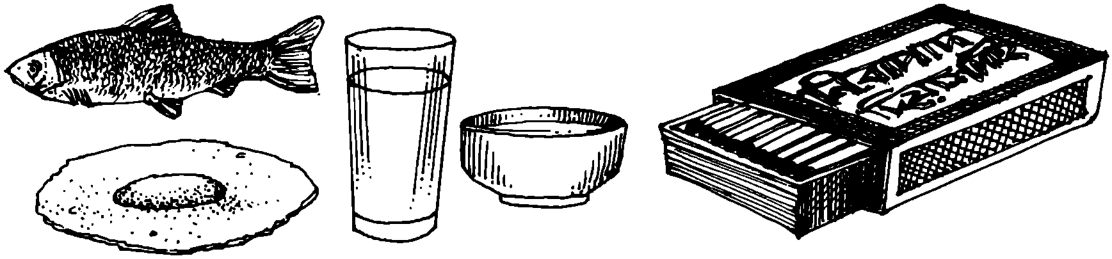

ফসফেট সার ও সুপার ফসফেট (super phosphate) তৈরি করতে ফস্‌ফরাস্ দরকার হয়। যুদ্ধের সময় আগুনে বোমা তৈরি করতে এবং ধোঁয়া সৃষ্টি করে শত্রুর নিকট থেকে লুকিয়ে থাকতেও ফস্‌ফরাস্ ব্যবহৃত হয়।

দিয়াশলাই শিল্পে প্রচুর লাল ফস্‌ফরাস্ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত ম্যাচবাক্সের দুই পাশের কাগজে লাল ফস্‌ফরাস্, অ্যান্টিমনি সালফাইড ও কাচচূর্ণ শিরিসের আঠা দিয়ে আটকানো থাকে। ম্যাচের কাঠির মাথায় লাগানো থাকে গন্ধক (দ্র), পটাসিয়াম ক্লোরেট, পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট এবং আরো কিছু ভিন্ন পদার্থ। কাঠির গায়ে সোহাগার (দ্র) দ্রবণ লাগানো থাকলে নেভার পর লাল আভা বা আগুন থাকে না। যেসব দিয়াশলাইয়ের কাঠি খসখসে কোনো জিনিসে ঘষলে জ্বলে ওঠে, তাদের মাথায় ফস্‌ফরাস্ ডাই সালফাইড লাগানো থাকে।

আ. হ. খ.

www.pathagar.com

ফা-হিয়েন

ভারত (দ্র)-পরিভ্রমণকারী চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিত। তাঁর আবির্ভাব ও জীবনকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৩৫৮ থেকে ৪৩৫ অব্দের মধ্যে। তিনি চীনের শান-সি জনপদভুক্ত ফিং-ইয়াং-এর অন্তর্গত উ-ইয়াং নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। 'ফা-হিয়েন' তাঁর ধর্মীয় নাম, পারিবারিক নাম 'কুং'।

ফা-হিয়েন বাল্যকালেই দীক্ষা নিয়ে বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেন। বুদ্ধের জীবনদর্শন ও বিনয়পিটক সম্পর্কে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তাই বৌদ্ধধর্মের (দ্র) মৌলিক অনুশাসন ও বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহের জন্য তিনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ পরিদর্শনে বের হন।

ফা-হিয়েন ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ৪০০-৪০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) চার সদস্যের এক ভিক্ষুদলের সঙ্গে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তাঁরা আরো একটি ভারতগামী ভিক্ষুদলের সাক্ষাৎ পান। নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সঙ্গীদের অনেকে উদ্যম হারিয়ে ফেললেও দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ফা-হিয়েন শেষ পর্যন্ত ভারতে এসে উপস্থিত হন।

এর পর ফা-হিয়েন প্রায় একাকী ভারতের উড্ডিয়ান, সুবাস্তু, পুরুষপুর, তক্ষশীলা নগর, মথুরা, কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তী, কপিলবাস্তু, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, বারাণসী প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চা-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি পাটলীপুত্রে তিন বছর অবস্থান করে বৌদ্ধশাস্ত্রের বিভিন্ন পুঁথি সংগ্রহ, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা এবং পুঁথি ও অনুশাসনসমূহ নকল করেন। এখান থেকে তাম্রলিপ্তিতে গিয়ে বুদ্ধমূর্তির ছবি ও নকশা অঙ্কনের কাজে মনোনিবেশ করে দুই বছর কাটিয়ে তিনি সমুদ্রপথে সিংহল (দ্র) যান। সেখান থেকে কিছু বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদি সংগ্রহ করে এক বছর পর যবদ্বীপ (বর্তমানে জাভা) হয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তিনি ৪১১ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ৪১৪ খ্রি.) স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে ফা-হিয়েন তাঁর সংগৃহীত বৌদ্ধশাস্ত্র ও পুঁথিগুলো চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি মোট সাতটি বই রচনা করেন বলে জানা যায়। এগুলোর মধ্যে ছয়টি সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের চীনা অনুবাদ। অন্যটি তাঁর ভারতভ্রমণ বিষয়ক মৌলিক রচনা। এর নাম ফো-কুয়ো-

www.pathagar.com

কিং (বৌদ্ধ রাজ্যসমূহের প্রমাণলিপি)। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এটিই প্রথম চৈনিক বিবরণ। এই গ্রন্থ থেকে প্রাচীন ভারতের আচার–অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, সামাজিক জীবনযাত্রা, প্রত্নতাত্ত্বিক অবস্থা, প্রকৃতি ও মানুষ ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে এটি ছিল প্রেরণার উৎস ও গাইডবুক। ভারত থেকে তাঁর সংগৃহীত বিভিন্ন বৌদ্ধমন্দির ও বুদ্ধমূর্তির মাপ, চিত্র ও নমুনা চীনে বৌদ্ধমন্দির ও মূর্তি নির্মাণে দিঙনির্দেশনা যোগায়।

দক্ষিণ চীনের অন্তর্গত কিং-চিউ নামক স্থানে 'সু-য়ু-সিন-সে' সংঘারামে বিরাশি (মতান্তরে অষ্টাশি) বছর বয়সে ফা-হিয়েনের মৃত্যু হয়। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক সাল জানা যায় নি।

সুজ. ব.

ফাইলেরিয়া কৃমিরোগ দ্র

ফাউস্ট্ (Faust)

ফাউস্ট্ হল মধ্যযুগের (দ্র) উপকথার এক বিস্ময়কর চরিত্র, যদিও ফাউস্ট্ শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সবার মনে জেগে ওঠে জার্মান সাহিত্যিক গোয়টের (দ্র) অমর সৃষ্টি 'ফাউস্ট্' কাব্যনাটকের কথা। দু'খণ্ডে সমাপ্ত ফাউস্ট্-এ গোয়টে মানবজীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা গভীর দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সেসব প্রশ্ন চিরকালীন ও সর্বজনীন। গোয়টের চিন্তার সম্ভার, ভাষার সৌকর্য ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা ফাউস্ট্‌কে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির মর্যাদা এনে দিয়েছে।

বিশ্বসাহিত্যে ফাউস্ট্ বিষয়বস্তুর পৌনঃপুনিক ব্যবহার আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মধ্যযুগের উপকথায় আমরা দেখি যে এক ব্যক্তি শয়তানের কাছে তার আত্মা বিক্রি করে দিচ্ছে। ষোড়শ শতকের কোনো এক সময় কাহিনীটি ইওহান্ ফাউস্ট্ নামক বাস্তব জীবনের এক ভ্রাম্যমাণ জাদুকরের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তাকে নিয়ে একটি গ্রন্থও রচিত হয়। সেখানে জাদুবিদ্যায় অতুলনীয় দক্ষতা লাভের জন্য শয়তানের সঙ্গে জাদুকরের একটি চুক্তি সম্পাদনের উল্লেখ আছে। পরবর্তী সময়ে ক্ষমতার জন্য, বিত্তের জন্য, জ্ঞানের জন্য শয়তানের সঙ্গে মানুষের চুক্তিবদ্ধ হবার ক্ষেত্রে ফাউস্ট্ এক প্রতিনিধিত্বশীল নাম হয়ে ওঠে। ইংরেজ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো তাঁর 'ড. ফস্টাসের করুণ ইতিহাস' (সাধারণত 'ডক্টর ফস্টাস' নামে পরিচিত) নাটকে ফাউস্ট্ বিষয়বস্তু নিয়ে প্রথম উন্নতমানের সাহিত্য সৃষ্টি করেন। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৬০৪ সালে। বিংশ শতাব্দীতেও ফাউস্টের বিষয়বস্তু সক্রিয় রয়েছে। নোবেল পুরস্কার (দ্র) বিজয়ী জার্মান কথাসাহিত্যিক টোমাস মান (দ্র) 'ডোক্টর ফাউস্টুস' নামে একটি দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করেন। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। তবে বিশ্বসাহিত্যে এখন পর্যন্ত গোয়টের 'ফাউস্ট্'ই সবচাইতে বেশি পরিচিত ও আদৃত। বাংলাসহ পৃথিবীর (দ্র) নানা ভাষায় গোয়টের ফাউস্ট্ অনূদিত হয়েছে।

ক. চৌ.

ফাতিমা (রা.), হযরত [৬০৫—৬৩৩]

হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর কন্যা এবং হযরত আলী (রা.)-র স্ত্রী; হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর মা। ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মা ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)। বদরের যুদ্ধ (দ্র), মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের (দ্র) পর (হিজরি দ্বিতীয়/তৃতীয় সনে) হযরত আলী (রা.)-র সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মহানবীর সন্তানদের মধ্যে ফাতিমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সে জন্য পিতার ইন্তেকালের পর ফাতিমা (রা.) শোকে মোহ্যমান হয়ে পড়েন। মহানবীর ইন্তেকালের অল্পকাল পরে ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহাম

বিখ্যাত পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানীর (রা.) (দ্র) মৃত্যুবার্ষিকী। ৫৬১ হিজরি সালের রবিউস্‌সানি মাসের ১১ তারিখে গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী (রা.) ইন্তেকাল করেন। তিনি কাদিরিয়া তরিকার প্রবর্তক এবং সাধক রূপে মুসলিম বিশ্বে বিশেষভাবে সম্মানিত। তাঁর অগণিত ভক্ত তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ওয়াজ-মাহফিল, তাঁর জীবনাদর্শ আলোচনা অনুষ্ঠান, দোয়া-

www.pathagar.com

জিকির ইত্যাদির আয়োজন করে থাকেন। বাংলাদেশ-সহ সকল মুসলিম দেশে এই দিনটি একটি পবিত্র দিন হিসাবে উদযাপিত হয়।

মো. ই.

ফারাক্কা বাঁধ

বাংলাদেশ (দ্র) ও ভারতের (দ্র) অভিন্ন জলপথ গঙ্গা নদীর (দ্র) ওপর ভারতীয় এলাকায় নির্মিত বাঁধ 'ফারাক্কা বাঁধ' নামে পরিচিত। এটি বাংলাদেশের রাজশাহী সীমান্ত থেকে ১১ মাইল পশ্চিমে এবং ভারতের কলিকাতা (দ্র) থেকে দু'শ' মাইল উত্তরে অবস্থিত। ফারাক্কা বাঁধের দৈর্ঘ্য ৭,৩৬৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। এই বাঁধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অভিমুখে পানির প্রবাহকে প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। বাংলাদেশ অভিমুখে পানিপ্রবাহকে প্রত্যাহার করে ভারতের ভাগীরথী-হুগলি নদীতে নিয়ে যাওয়ার কাজে এই বাঁধ ব্যবহার করা হয়। এর জন্য ভারত ফারাক্কা থেকে ভাগীরথী-হুগলি পর্যন্ত ২৩·৮ মাইল লম্বা ফিডার ক্যানেল তৈরি করেছে। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে ভারত গঙ্গা নদীর পানি প্রত্যাহার শুরু করেছে।

ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার করার ফলে বাংলাদেশে এর বিরূপ প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বাঁধ ব্যবহারের পূর্বে পানিসরবরাহ ছিল ৬৫ হাজার থেকে ৭৫ হাজার কিউসেক। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসেই দেখা গেল যে গঙ্গা নদীর বাংলাদেশ অংশে পানির প্রবাহ অস্বাভাবিক রকম কমে গেছে। জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজের (দ্র) কাছে পানির প্রবাহ সাধারণত ৯৫,০০০ কিউসেক থাকে। কিন্তু উক্ত সময় পানির প্রবাহ ছিল মাত্র ৫৪,০০০ কিউসেক। স্বাভাবিক সময়ে পানির সর্বনিম্ন প্রবাহ ৬৪,০০০ কিউসেক থাকার কথা। কিন্তু উক্ত বছর পানির প্রবাহ দাঁড়ায় ২৩,২০০ কিউসেক-এ। এর পরিমাণ পরবর্তী বছরগুলোতে আরো কমে গেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রয়োজন ৬০ হাজার থেকে ৭০ হাজার কিউসেক পানি, অথচ সরবরাহ হচ্ছে মাত্র ১৩ হাজার কিউসেক।

এর ফলে বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ-হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। নদী-নালা শুকিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে বর্ষাকালে দেখা দিচ্ছে অস্বাভাবিক বন্যা। গড়াই ও মাথাভাঙ্গা নদীর মতো অনেক নদী পলিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পলির স্তরও ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে।

ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ আন্তর্জাতিক নদী-আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আন্তর্জাতিক নদীর পানির ব্যবহার আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের তার সীমানায় অবস্থিত নদীর পানি সদ্ব্যবহারের যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।

বাংলাদেশে ফারাক্কার প্রতিক্রিয়ার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মওলানা ভাসানী (দ্র) ১৯৭৬ সালের ১৬ই মে রাজশাহী থেকে ফারাক্কা অভিমুখে লং মার্চের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিবাদের নিরসন ঘটে ১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে দু'দেশের মধ্যে এক পানি-চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া ৩০ বৎসর মেয়াদি এই চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেন ভারতীয় রাজধানী নয়াদিল্লীতে। চুক্তি অনুযায়ী এখন থেকে বাংলাদেশ ন্যূনতম ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে।

মো. হো.

ফার্ন (fern)

টেরিডোফাইট্-এর অন্তর্গত ফিলিকেলিস্ বর্গের সদস্যসমূহকে একত্রে ফার্ন বলা হয়। এরা বহুবর্ষজীবী অপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। কেবল বিষুবীয় অঞ্চলেই ছয় হাজারেরও বেশি সংখ্যক প্রজাতির ফার্ন জন্মে। ছায়াঘেরা পাহাড়ি ও সমতল ভূমির স্যাঁতসেতে পরিবেশে এদের প্রায় ২০০টি প্রজাতি চোখে পড়ে।

প্রাথমিক প্রত্নতাত্ত্বিক যুগে বৃক্ষফার্নের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়লাখনির উৎপত্তিতে এরা সহায়তা করেছে। আধুনিক যুগে ছোট ছোট বীরুৎ জাতীয় ফার্ন, লতানে ফার্ন এবং বৃক্ষ জাতীয় ফার্ন বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। টেরিস্ (Pteris), ড্রিয়প্টেরিস্ (Dryopteris), পলিপোডিয়াম্

www.pathagar.com

(Polypodium), ড্রাইনেরিয়া (Dryneria) প্রভৃতি গণ (genus) ফার্নের উদাহরণ। উষ্ণমণ্ডলীয় অতীব মনোরম ফার্নের মধ্যে *অ্যাস্‌প্লেনিয়াম নিডাস্‌ (Asplenium nidus)*, *অ্যাটেরিডিয়াম্‌ অ্যাকুইলিনাম্‌ (Ateriduim acquilinum)* এবং *অস্‌মাণ্ডা রিগালিস্‌ (Osmunda regalis)* উল্লেখযোগ্য।

পাতার সৌন্দর্যের জন্য ফার্ন বেশ সমাদৃত হয়ে থাকে। কাঠের বড় টুকরো বা ঝুড়িতে এদের ঝুলিয়ে রাখা হয়।

ফার্ন রেণুধর বা স্পোরোফাইটিক (sporophytic) উদ্ভিদ। মূল, কাণ্ড ও পাতায় এদের দেহ বিভক্ত। ফার্নের কাণ্ড রাইজোম (rhizome) জাতীয়। এদের পাতা বড়। ফার্নের পরিবহণতন্ত্র আছে। এদের যৌনাঙ্গ বহুকোষবিশিষ্ট এবং বন্ধ্যা কোষপ্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত। এদের পাতায় রেণুস্থলী উৎপন্ন হয়। অঙ্গজ জনন, অযৌন জনন এবং যৌন জননের মাধ্যমে এরা বংশবিস্তার করে।

ফার্নের পাতা ফুলের তোড়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো জাতের ফার্ন টেবিলে বা ট্রেতে রাখলে সুন্দর দেখায়। ঘরে ফার্ন রাখলে সৌন্দর্য বাড়ে। মাঝে মাঝে তা রোদে দিতে হয়।

মু. আ.

ফার্মাকোপিয়া / ভেষজসংহিতা / ভেষজকোষ

ভেষজ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ভেষজগ্রন্থের নাম 'ফার্মাকোপিয়া' (pharmacopoeia), বাংলায় বলা হয় ভেষজসংহিতা বা ভেষজকোষ। চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত ভেষজের বিবরণ, গুণাগুণ, ক্রিয়া ও বিষক্রিয়ার উল্লেখ ছাড়াও ফার্মাকোপিয়ায় ঔষধের প্রস্তুতপ্রণালি, ফর্মুলা, ব্যবহার ও মাত্রা, তৈরি ঔষধের গুণাগুণ, শুদ্ধতা, পরিমাণ ইত্যাদির গুণগত ও পরিমাণগত পরীক্ষার বিধিনির্দেশের বিবরণ থাকে। ঔষধ তৈরি ও তার মান রক্ষার কাজে ভেষজকোষ উপকারী সহায়ক গ্রন্থ।

প্রাচীন কালেও এ ধরনের ভেষজসংহিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। আরবদের তৈরি ভেষজকোষ দীর্ঘদিন ইউরোপে (দ্র) ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক কালে অধিকাংশ উন্নত দেশেরই নিজস্ব 'ফার্মাকোপিয়া' রয়েছে, যা সেসব দেশে ঔষধ প্রস্তুত ও ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে এদের মধ্যে 'ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া' (সংক্ষেপে বি.পি.) এবং 'ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়া' (সংক্ষেপে ইউ. এস. পি). সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভেষজকোষ হিসাবে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এ ছাড়াও রয়েছে একই বিষয়ে আন্তর্জাতিক ফার্মাকোপিয়া (বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (দ্র) কর্তৃক প্রকাশিত), ব্রিটেনের ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'একস্ট্রা ফার্মাকোপিয়া' ইত্যাদি।

নিত্যনতুন গবেষণাভিত্তিক ভেষজজ্ঞানের আলোকে কয়েক বছর পর পর ভেষজকোষ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে থাকে। ভেষজী (ফার্মাসিস্ট), চিকিৎসক, ঔষধ প্রস্তুতকারক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফার্মাকোপিয়া ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে এখনো কোনো ফার্মাকোপিয়া সঙ্কলিত হয় নি।

আ. র.

ফার্মাকোলজি ভেষজবিদ্যা দ্র

ফার্মি, এন্‌রিকো [১৯০১—১৯৫৪]

এন্‌রিকো ফার্মি (Enrico Fermi)১৯০১ সালে ইতালির রোমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে পিসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং মাত্র ২৬ বছর বয়সে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিযুক্ত হন। তিনি নিউক্লীয় ফিশান আবিষ্কার করেন এবং প্রথম নিউক্লীয় রিয়্যাক্টর (যা পারমাণবিক চুল্লি নামে পরিচিত)-এর নকশা প্রণয়ন করেন ও এর বিকাশ ঘটান। ১৯৪২ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোয়াশ কোর্টে ফার্মির প্রথম নিউক্লীয় রিয়্যাক্টর নির্মিত হয় এবং তা পরীক্ষা করা হয়। এর ফলে নিউক্লীয় শক্তি–যুগের সূচনা হয়। ১৯৩২ সালে তিনি বিটাক্ষয়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইলেক্ট্রনের (দ্র) মতো প্রাথমিক কণিকাসমূহ মেনে চলে এমন সংখ্যাতাত্ত্বিক সূত্র বা নিয়ম আবিষ্কার করেন। যেসব কণিকা তাঁর এই সংখ্যাতাত্ত্বিক সূত্র মেনে চলে তাদের বলা

www.pathagar.com

হয় ফার্মিয়ন। ইলেক্ট্রন, প্রোটন (দ্র) ও নিউট্রন (দ্র) দিয়ে যে কোনো নির্মাণসামগ্রী তৈরি হয়। এসব কণিকাকে বলা হয় ফার্মিয়ন। ১৯৩৮ সালে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) চলে আসেন এবং সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করেন। এখানে তিনি নিউক্লীয় রিয়্যাক্টরের উপর কাজ করেন এবং প্রথম নিউক্লীয় রিয়্যাক্টর তৈরি করেন। নিউক্লীয় রিয়্যাক্টর আবিষ্কারের এক বছর পর ফার্মি নিউ মেক্সিকোর লস আলামোসে যান এবং পরমাণুবোমা (দ্র) তৈরিতে সহায়তা করেন।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন এনরিকো ফার্মি। তাত্ত্বিক ও পরীক্ষণবিজ্ঞানী হিসাবে খুব কম ব্যক্তিই তাঁর মতো ছিলেন। তিনি ২৫০টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

শা. ত.

ফার্স্ট এইড (first-aid)

দুর্ঘটনা, আকস্মিক অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট জরুরি অবস্থায় অকুস্থলে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সহায়তায়

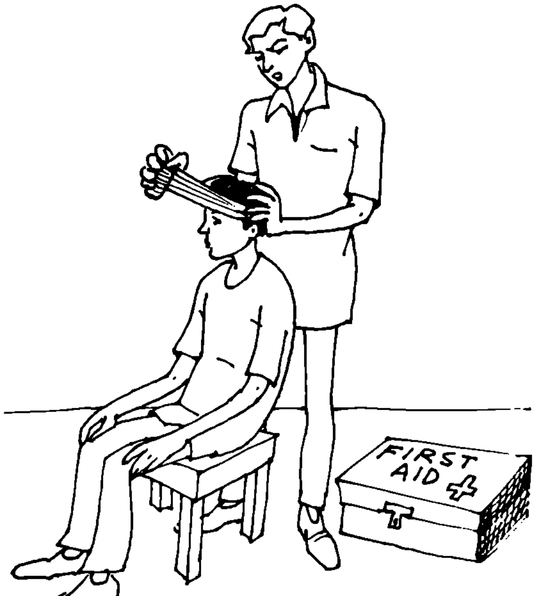

তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রদানের নাম 'ফার্স্ট এইড', আক্ষরিক অর্থে প্রাথমিক সাহায্যদান।

চিকিৎসক বা যথাযথ চিকিৎসাব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে ফার্স্ট এইড 'জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত। রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস সচল রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি ফার্স্ট এইড-এর প্রধান লক্ষ্য। সাধারণত শক (shock), অবিরাম রক্তক্ষরণ, শ্বাসকষ্ট, পুড়ে যাওয়া, গুরুতর অস্থিভঙ্গ (ফ্র্যাকচার), মাথায় আঘাত, পানিতে ডুবে যাওয়া, দেহের অপরিহার্য অঙ্গে বা অন্যত্র গভীর ক্ষত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফার্স্ট এইডের প্রয়োজন হয়।

ফার্স্ট এইডের কাজ জীবনরক্ষণ সংক্রান্ত জরুরি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত বলে এ সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা উচিত। যেমন বড় ধরনের ধমনী (দ্র) বা শিরা (দ্র) ছিঁড়ে গেলে দ্রুত রক্তক্ষরণের ফলেই মৃত্যু ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাময়িক রক্তপাত বন্ধ করা জরুরি হয়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহত অঙ্গ উপরে তুলে, সম্ভব হলে হৃদ্‌যন্ত্রের চেয়ে উঁচু-তলে রেখে এবং ক্ষতস্থানে চাপ প্রয়োগ করে রক্তপাত বন্ধ করা সম্ভব। তবে অনভিজ্ঞ হাতে কখনো 'টুর্নিকেট' (tourniquet) বা বন্ধনী ব্যবহার করা ঠিক নয়।

অধিকাংশ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শক-এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। তেমন অবস্থায় মাথায় বা বুকে আঘাত না থাকলে পায়ের দিকটা উঁচু করে মাথা অপেক্ষাকৃত নিচু তলে রাখা দরকার যাতে মস্তিষ্কে রক্তসরবরাহ অব্যাহত থাকে। পোড়া-ঘা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। ফার্স্ট এইড-এর গুরুত্ব এইখানে।

আ. র.

ফাস্ট, হাওয়ার্ড্ [১৯১৪—১৯৯৬]

মার্কিন ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, কবি, নাট্যকার ও সাহিত্য-সমালোচক। ফাস্ট্ (Howard Fast) ১৯১৪ সালে নিউ-ইয়র্কের(দ্র) এক দরিদ্র শ্রমিকপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৩০-এর দশকের সূচনায় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) জুড়ে চলছে তীব্র আর্থিক সঙ্কট ও মন্দা, তখন তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে কাজের আশায় বিদেশে পাড়ি জমান। এ সময় আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার (দ্র) বহু দেশ ঘুরে বেড়ান তিনি। এসব দেশের মানুষ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং সমাজব্যবস্থা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁর অনেক রচনায় এসব অভিজ্ঞতা বিধৃত আছে।

হাওয়ার্ড্ ফাস্টের প্রথম উপন্যাস Two Valleys (দুই

www.pathagar.com

উপত্যকা) যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো।

বিদেশের মাটিতে জীবন ধারণের উপযোগী অর্থ উপার্জনে সক্ষম না হওয়ায় ১৯৩৩ সালে তিনি আবার নিউ-ইয়র্কে ফিরে আসেন। এসেই তিনি যোগ দেন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিতে। এ জন্য তাঁকে তৎকালীন মার্কিন সরকারের রোষানলের শিকার হতে হয় এবং ভোগ করতে হয় নির্যাতন, বেশ কয়েক বার জেলও খাটতে হয়। অবশ্য পরবর্তী কালে সাম্যবাদী আদর্শ থেকে তিনি সরে আসেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্রব ত্যাগ করে উদার মানবতাবাদের প্রচারক হয়ে ওঠেন। ফাস্টের কমিউনিজমের সমালোচনামূলক গ্রন্থের নাম 'দি নেকেড গড'।

হাওয়ার্ড ফাস্ট্ তাঁর সাহিত্যকর্মের ভেতর দিয়ে নিপীড়িত মানুষের, তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রায় সমুদয় রচনাকর্ম প্রকাশিত ও বহুল পঠিত। 'রোড টু ফ্রিডম', 'দ্য লাস্ট ফ্রন্টিয়ার', 'স্পার্টাকাস', 'সাক্কো ভানজেত্তি' এবং 'লোলাগ্রেগ' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম। বেশ কিছু ছোটগল্পের রচয়িতা তিনি। 'দ্য টল হাণ্টার' ও 'টনি অ্যাণ্ড দ্য ওয়াণ্ডারফুল ডোর' নামের দু'টি অনুপম কিশোর-উপন্যাসের জন্যও তিনি খ্যাতিমান।

হাওয়ার্ড্ ফাস্ট্ ১৯৯৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

ফিউচারিজ্‌ম্ ফুতুরিজ্‌ম্ দ্র

ফিউশন (fusion)

যে বিক্রিয়ায় দু'টি হালকা নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারি একটি নিউক্লিয়াস গঠন করে তাকে ফিউশন বলে। এই প্রক্রিয়ায় অত্যধিক শক্তি বের হয়। ফিউশন ঘটার জন্য উচ্চতাপের প্রয়োজন হয়। এই বিক্রিয়াকে তাপ- নিউক্লীয় বিক্রিয়াও বলে। সূর্য (দ্র) মহাবিশ্বের সকল শক্তির উৎস। সূর্যে শক্তি উৎপন্ন হয় ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে। সেখানে হাইড্রোজেন (দ্র) পরমাণু ফিউশনিত হয়ে হিলিয়াম (দ্র) পরমাণু (দ্র) গঠন করে। এই কাজটি দু'টি বিক্রিয়ায় ঘটে—একটা প্রোটন-প্রোটন চক্র এবং অপরটি কার্বন-চক্র। তাপ- নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় যে চক্র সূর্য ও সূর্যের ন্যায় অন্যান্য নক্ষত্রে শক্তি উৎপাদন করে, তা হল প্রোটন-প্রোটন চক্র। নক্ষত্রে সংঘটিত তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়ার দ্বিতীয় চক্র হল কার্বন-চক্র। ফিউশন প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। বাণিজ্যিক শক্তি উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে সাফল্যজনক ফিউশন বিক্রিয়া হল দু'টি ডয়টেরন মিলিত হয়ে একটি ট্রাইটন এবং একটি প্রোটন (দ্র) অথবা একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এবং একটি নিউট্রন (দ্র) সৃষ্টি।

শা. ত.

ফিজিওথেরাপি (physiotherapy, physical therapy)

ফিজিওথেরাপি প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কালের প্রাকৃতিক চিকিৎসার আধুনিক রূপ এবং বর্তমানে 'ফিজিক্যাল মেডিসিন' নামে চিকিৎসাবিদ্যার (দ্র) একটি শাখা হিসাবে স্বীকৃত। এই চিকিৎসাব্যবস্থায় দেহকাঠামোর রোগ বা আঘাতজনিত পঙ্গুত্ব ও দুর্বলতা নিরাময়ের জন্য ব্যায়াম এবং আলো, তাপ, বিদ্যুৎ কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান ও ম্যাসাজের সাহায্য নেওয়া হয়। ফিজিও থেরাপি বিশেষ বিজ্ঞান হিসাবে প্রথম ব্যবহৃত হয় প্রথম মহাযুদ্ধে (দ্র) আহত সৈনিকদের জন্য। ম্যাসাজ, রৌদ্রস্নান, উষ্ণ স্নান ইত্যাদি প্রক্রিয়া প্রাচীন কাল থেকেই চিকিৎসাব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ফিজিওথেরাপির প্রধান উদ্দেশ্য দৈহিক পঙ্গুত্ব দূর করা, দীর্ঘস্থায়ী রোগের পর বা দুর্ঘটনার পর দাঁড়ানো, হাঁটাচলা, অঙ্গের কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে আনা, শল্যবিদ্যা (দ্র) বা অন্য কোনো কারণে সৃষ্ট ব্যথার নিরাময় ঘটানো, মাংসপেশির শক্তি ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি।

ফিজিওথেরাপিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা বিভিন্ন চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। যেমন অস্থিসন্ধি রোগের (দ্র) ব্যথা কমানোর জন্য তাপ ব্যবহার করা হয়; গরম পানি, আলো ইত্যাদি তাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়; ব্যথা কমানো ও রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করার জন্য ম্যাসাজ বা গাত্রমর্দন করা হয়; কোষকলার (দ্র) গভীরে তাপ সঞ্চালনের জন্য ইনফ্রা-রেড রশ্মি, শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি ও আলট্রাসাউণ্ড (দ্র) ওয়েভ ব্যবহার করা হয়। অস্থিসন্ধির রোগ (বিশেষ করে বাতরোগ), পক্ষাঘাত, পেশির রোগ এবং অনুরূপ দৈহিক অসুবিধার

www.pathagar.com

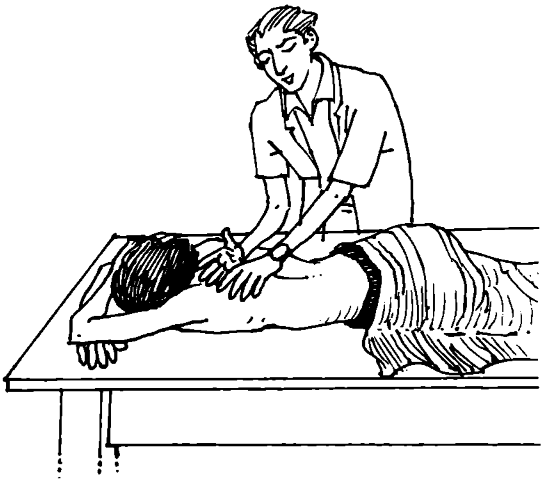

চিকিৎসায় ফিজিওথেরাপির ব্যবহার সর্বাধিক।

আ. আ. হা.

ফিটকিরি ফটকিরি দ্র
ফিতা কৃমি কৃমিরোগ দ্র

ফিনিসীয় সভ্যতা

আধুনিক সিরিয়া, লেবানন এবং ইসরায়েল-এর তীরভূমি প্রাচীন কালে ফিনিসিয়া (Phoenicia) নামে পরিচিত ছিল। পূর্বে লেবানন পর্বতমালা এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের (দ্র) মধ্যবর্তী স্থান এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী কালের কেনান নামে পরিচিত ভূমিই ফিনিসিয়া। এই নামটি গ্রিকদের দেওয়া। তবে কেনান অঞ্চলের বলে তারা কখনো কখনো কেনানী নামেও পরিচিত। এমনকি তাদের প্রধান নগর সিডোন থেকে এরা সিডোনীয় নামেও অভিহিত হয়। তাদের ভাষা সেমিটিক ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ফিনিসীয়রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নগররাষ্ট্রে বাস করত। নগরগুলো ঐক্যবদ্ধ করে তারা কোনো একক বড় রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে নি। সমুদ্রতীরের বাসিন্দা হিসাবে তারা দক্ষ নাবিক এবং নৌচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যেও ছিল পারঙ্গম। বাণিজ্যের স্বার্থে প্রাচীন মিশরের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফলে তারা পারস্পরিকভাবে একে অপরকে সাংস্কৃতিক দিকেও প্রভাবিত করেছিল। ব্যাবিলনের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা (দ্র) ফিনিসীয়দের খুবই প্রভাবিত করে। তারা ব্যাবিলনীয়দের কিউনিফর্ম (দ্র) লিখনপদ্ধতি গ্রহণ করে এবং পুরাকাহিনীগুলো সারা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় বাণিজ্য করতে গিয়ে ছড়িয়ে দেয়, যেমন মহাপ্লাবনের কাহিনী।

খ্রিস্টপূর্ব এগারো শতক থেকে ফিনিসীয়রা স্বাধীনভাবে প্রায় আড়াই শ' বছর অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করে। সারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তাদের প্রভাবাধীনে চলে আসে। জিব্রাল্টার প্রণালীর উভয় পাশ পর্যন্ত এ প্রভাব বিস্তৃত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে তারা সম্ভবত আফ্রিকা (দ্র) পরিভ্রমণ করে। আফ্রিকার উত্তরে অবস্থিত কার্থেজ ছিল তাদের প্রধান উপনিবেশ এবং বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র। ফিনিসীয়দের উপনিবেশগুলোও মূল মাতৃনগরগুলোর মতো করেই তৈরি হত। বহু কারিগর-শিল্পশ্রমিক, ব্যবসায়ী ও নাবিক সেখানে বসবাস করত। ফিনিসিয়ায় অবস্থিত সিডোন, টায়ার ইত্যাদি নগর বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে তৎকালে জগদ্বিখ্যাত হয়ে ওঠে। মদ, তেল, সিডার কাঠ, বস্ত্র, কাচ (দ্র) এবং ময়ূরী রঙ তাদের প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব নয় শতকের মাঝামাঝি অ্যাসেরীয়গণ ফিনিসিয়ার নগরগুলো দখল করে নেয়। পরে এগুলো অধিকৃত হয় ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা। এর পরে পারসিকেরা তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। তবে পারসিকদের সময় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নৌ-দক্ষতার কাজকর্ম পুরোদমে চলে। অতঃপর ফিনিসীয়রা গ্রিকদের অধীনে চলে যায় এবং গ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ৬৪ খ্রিস্টাব্দে রোমানেরা ফিনিসীয়দের আবাসস্থলকে

একটি রিলিফ শিল্পকর্ম

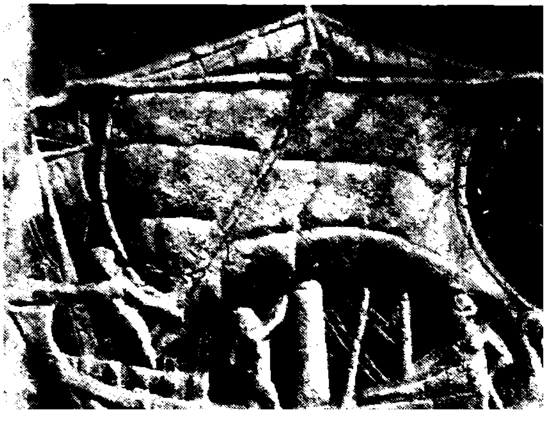

www.pathagar.com

প্রদেশে পরিণত করে এবং বৈরুত নামক স্থানে একটি আইন বিদ্যালয় স্থাপন করে। খ্রিস্টীয় ছয় শতকের দিকে আরবেরা ফিনিসিয়া অঞ্চল দখল করে। বিভিন্ন দেশের দ্বারা এভাবে বিজিত হতে হতে ফিনিসীয়রা তাদের আদি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু বিশ্বে তাদের বিশেষ দু'টি অবদান অনস্বীকার্য: এক, সভ্যতার ধারক হিসাবে নানা স্থানে তা বিস্তৃত করা এবং দুই, তাদের অক্ষর থেকে গ্রিক অক্ষরের উদ্ভব, যা থেকে পরবর্তী রোমান এবং ইউরোপীয় বর্ণমালার উৎপত্তি।

সৈ. আ. ই.

ফিফথ কলাম পঞ্চম বাহিনী দ্র

ফিফা

ফেদেরসিয়ঁ অ্যাঁতর্নাসিওনাল দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়াসিঅঁ (Fédération Internationale de Football Association)। সংক্ষিপ্ত নাম ফিফা (FIFA)।

১৯০৪ সালের ২১শে মে প্যারিসে (দ্র) ফ্রান্স, বেলজিয়াম, স্পেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড—এই ছয়টি দেশের প্রতিনিধিরা 'ফিফা' গঠন করেন। ১৯২০ সালে 'ফিফা' বিশ্বকাপের ধারণাটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে।

ফিফা (FIFA) শুধু বিশ্বকাপ পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বকাপ ফুটবলের নিয়ম-কানুন তৈরির সব দায়িত্ব এই সংস্থার ওপর। বর্তমানে ফুটবলের সকল প্রতিযোগিতাই 'ফিফা'-আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

'ফিফা' গঠিত হবার আগে থেকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ফুটবল অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে, অলিম্পিক ফুটবল বিশ্বপর্যায়ের হলেও বিশ্বকাপের মর্যাদায় তাকে অভিহিত করা যায় না। অলিম্পিকে শুধু অপেশাদার খেলোয়াড়েরাই অংশ নেয়। অপর দিকে 'ফিফা' আয়োজিত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের সেরা পেশাদার খেলোয়াড়েরাই অংশ নিতে পারে।

তিন-তিন বার বিজয়ী হওয়ায় জুল্ রিম্ (দ্র) বিশ্বকাপ ব্রাজিলের হাতে চিরদিনের জন্য চলে যাওয়ার পর ছত্রিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের আঠারো ক্যারেট সোনা দিয়ে মোড়া ফিফা কাপ বা বিশ্বকাপ নির্মিত হয়। এই কাপের মডেল তৈরি করেন শিল্পী সিলভিয় গাজনীয়। ১৯৭৪ সাল থেকে 'ফিফা' কাপের প্রচলন হয়। তিন বার কোনো দেশ জয়ী হলে জুল্ রিম্ কাপের মতো চিরতরে কাপ অর্জনের নিয়মটি এখন আর নেই। ফলে প্রতিবারই একই বিশ্বকাপ ঘুরে ফিরে বিভিন্ন বিজয়ী দলের হাতে আসে।

ফা. ন.

ফিফা বিশ্বকাপ

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে ফিফা (দ্র)।

ফিফা ১৯০৪ সালে গঠিত হয়। ১৯২০ সালে এন্টওয়ার্প সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে প্রতি চার বছরে একবার বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ফরাসি ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি জুল্ রিম্ (দ্র) বিশ্বকাপ ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন দলকে একটি সোনার কাপ প্রদান করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁর নামানুসারে এই প্রতিযোগিতার নামকরণ করা হয় জুল্ রিম্ কাপ। আরো ঘোষণা করা হয়, যে দেশ সর্বপ্রথম তিন বার জুল রিম্ কাপ জয় করবে, চিরতরে কাপটি তাদের প্রদান করা হবে।

বিশ্বকাপ ফুটবল ১৯৩০ সালে আর্জেন্টিনায় শুরু হয়। প্রতি চার বছর অন্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মাঝে অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) কারণে ১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৭০ সালে ব্রাজিল তৃতীয় বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়ে জুল্ রিম্ কাপটি চিরতরে অর্জন করে। এক ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট নয় পাউণ্ড ওজনের এই কাপটিতে স্বর্ণের

www.pathagar.com

পরিমাণ ছিল প্রায় চার পাউণ্ড। ফ্রান্সের প্রখ্যাত ভাস্কর আবেল লাফ্‌রিওর কাপটি নির্মাণ করেন।

ব্রাজিল জুল্‌ রিম্‌ কাপ চিরতরে অর্জন করলেও প্রতিযোগিতা কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় নি। ১৯৭৪ সাল থেকে নতুন নামে ও নতুন কাপ নিয়ে প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকে। জুল্‌ রিম্‌ কাপের স্থলে প্রতিযোগিতার নতুন নাম হয় ফিফা বিশ্বকাপ। ২০ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট নতুন কাপটিও সোনার তৈরি। এর ওজন এগারো পাউণ্ড । নতুন নিয়ম অনুযায়ী বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলকে কিছু সময়ের জন্য কাপটি দেওয়া হয়। কাপটি ফেরত নিয়ে পরিবর্তে একটি প্রতিকৃতি এবং সমপরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়।

ফিফা বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (চার বার) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল। আর্জেণ্টিনা, ইতালি ও জার্মানি তিন বার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। একটি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোল করার কৃতিত্ব ফ্রান্সের জুস্ত্‌ ফঁত্যান্‌ (Juste Fontaine)-এর। ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপে তিনি তেরোটি গোল করেন।

এক খেলায় সবচেয়ে বেশি গোল করেন রাশিয়ার গয়কোচফ্‌। ১৯৯৪ সালে ফিফা বিশ্বকাপে তিনি ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে একাই পাঁচটি গোল করেন। ঐ খেলায় তাঁর দেশ রাশিয়া (দ্র) ৬-০ গোলে জয়লাভ করে। পনেরোটি ফাইনালের মধ্যে ১৯৫৮ সালে ব্রাজিল সবচেয়ে বেশি ব্যবধানে (৫-২ গোলে) সুইডেনকে পরাজিত করে।

বিশ্বকাপবিজয়ী অধিনায়কদের তালিকা :

সাল	নাম	দেশ
১৯৩০	নাসাজি	উরুগুয়ে
১৯৩৪	কোম্বি	ইতালি
১৯৩৮	মেয়াজা	ইতালি
১৯৫০	ভারেলা	উরুগুয়ে
১৯৫৪	ওয়াল্টার	প. জার্মানি
১৯৫৮	বেলিনি	ব্রাজিল
১৯৬২	গিলমার	ব্রাজিল
১৯৬৬	ববি মূর	ইংল্যাণ্ড
১৯৭০	আলবার্তো	ব্রাজিল
১৯৭৪	বেকেন বাওয়ার	প. জার্মানি
১৯৭৮	প্যাসারেলা	আর্জেণ্টিনা
১৯৮২	দিনো জফ	ইতালি
১৯৮৬	মারাদোনা	আর্জেণ্টিনা
১৯৯০	লোথার ম্যাথুজ	জার্মানি
১৯৯৪	রাই	ব্রাজিল

টি. কি.

ফিরিঙ্গি

'ফিরিঙ্গি' শব্দের উৎপত্তি বড় চমকপ্রদ।

পশ্চিম ইউরোপীয় লোকদের বহু পূর্বে এক সময়ে ফ্রাঙ্ক (Frank) বা ফ্রাঙ্গ (Frang) বলা হত। আরবি উচ্চারণে তা ফ্রাঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই শব্দটি আরো পরে ইরানিদের মুখে ফার্সি ভাষায় হয়ে যায় 'ফিরাঙ্গি'। তখন এই শব্দের সাধারণ অর্থ ছিল ইউরোপীয়।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজেরাই প্রথম

আসে। তাই তাদের বলা হতে লাগল 'ফিরাঙ্গি'। এ শব্দটিই পরে 'ফিরিঙ্গি' উচ্চারণে দাঁড়িয়ে যায়।

অর্থাৎ বাংলায় 'ফিরিঙ্গি' শব্দের আদি অর্থ পর্তুগিজ হিসাবেই চালু হয়েছিল। পরে ইউরোপীয় সাহেব মাত্রকেই 'ফিরিঙ্গি' বলা চালু হয়। এই অনুষঙ্গেই দেশীয় খ্রিস্টানদের 'মেটে ফিরিঙ্গি' নামের উদ্ভব ঘটে।

হা. মা.

ফিরিশতা

আল্লাহ্‌র বাণীবাহক, দূত এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত অশরীরী সত্তা।

ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী মহাবিশ্ব ও যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ্‌। তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা ও পালনকর্তা। সৃষ্টির

www.pathagar.com

এই মহা আয়োজন তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই বিরাট কর্মকাণ্ডে তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে ফিরিশতারা নিয়োজিত।

আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে যে ফিরিশতা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রসূলের নিকট এসেছেন, তাঁর নাম জিব্রাইল। উল্লেখ্য, এই ফিরিশতার মাধ্যমেই হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) হেরা গুহায় (দ্র) প্রথম ঐশীবাণী এবং পরে তেইশ বছর ধরে কুরআনের (দ্র) বাণী লাভ করেন। জীবের প্রাণহরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতার নাম আজরাইল। মহাপ্রলয় বা পৃথিবী ধ্বংস করে কিয়ামত (দ্র) সংঘটনের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতার নাম ইস্রাফিল। বৃষ্টি, উর্বরতা, ফল-ফসলের ফিরিশতা হলেন মিকাইল। এ ছাড়া আরো অসংখ্য ফিরিশতা আছেন বলে জানা যায়।

মু. মা.

ফিলাটেলি ডাকটিকিট সংগ্রহ দ্র

ফিলিপ্‌স্‌ পুরস্কার

সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বেসরকারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ মানের পুরস্কার। ফিলিপ্‌স্‌ (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর অর্থানুকূল্যে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০ হাজার টাকা। এর সঙ্গে একটি সম্মাননাপত্রও দেওয়া হয়।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতাক্ষেত্রে সৃজনশীল অবদান রাখার জন্য বছরে বাংলাদেশের (দ্র) এক জন লেখক ও এক জন সাংবাদিককে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এক বছরের (বৈশাখ থেকে চৈত্র) মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পত্রিকায় মুদ্রিত বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সেরা নিবন্ধ-প্রতিবেদনের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৮৮ সালে প্রথম ফিলিপ্‌স্‌ পুরস্কার সেরা কাব্যগ্রন্থের জন্য এক জন কবিকে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সাহিত্যক্ষেত্রে ছোটগল্প ও উপন্যাস শাখাতেও এই পুরস্কার দেওয়া হয়। গত কয়েক বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয় নি।

ফা. ন.

ফিল্ম (film)

ফটো তোলার সময় ক্যামেরায় (দ্র) ব্যবহৃত এক ধরনের স্বচ্ছ স্ট্রিপ বা পাত। এই স্ট্রিপে এক ধরনের আলোকসংবেদী রাসায়নিক পদার্থের (কোনো সিলভার যৌগ) প্রলেপ দেওয়া থাকে বলে স্ট্রিপ এই আলোকসংবেদী হয়। এর ফলে ফিল্মে ছবির প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। ছবি তোলার পর ফিল্মটি ক্যামেরা থেকে বের করে নেওয়া হয় এবং এতে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ যোগ করা হয়। একে বলা হয় ডেভেলপিং ও ফিক্সিং। এই প্রক্রিয়ার ফলে ছবির নেগেটিভ পাওয়া যায়। ছবির নেগেটিভে হালকা অংশকে গাঢ় এবং গাঢ় অংশকে হালকা

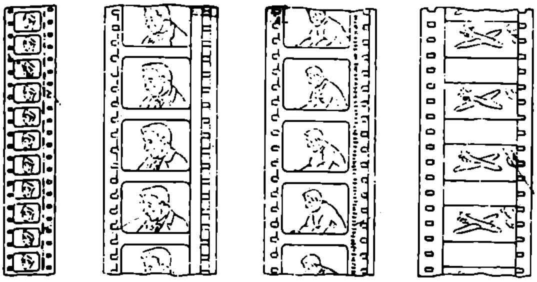

দেখায়। যেমন, মানুষের কালো চুলকে নেগেটিভে দেখাবে হালকা বা সাদাটে, নেগেটিভ পজিটিভ বা মূল ছবির উল্টো। নেগেটিভের ভেতর দিয়ে কোনো আলোকসংবেদী কাগজে আলো ফেলে ছবি প্রিন্ট করা হয়। ছবিতে হালকা অংশ হালকা এবং গাঢ় অংশ গাঢ় দেখায়। ছবি ডেভেলপ ও প্রিন্ট করাকে বলা হয় প্রসেসিং। ফিল্ম–ক্যামেরাতে একই ফিল্ম–স্ট্রিপে পরপর অনেকগুলো ছবি তোলা হয়। এই ফিল্ম–স্ট্রিপকে যখন কোনো প্রজেক্টরে দেখানো হয়, তখন চলচ্চিত্র (দ্র) বা চলমান ছবি দেখা যায়।

শা. ত.

ফিশন্‌ (fission)

কোনো ভারি নিউক্লিয়াসের প্রায় সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত হওয়াকে বলা হয় ফিশন্‌। এটি আসলে নিউক্লীয় ফিশন। কোনো পরমাণু (দ্র) যখন ভেঙে যায়, তখন এর ভাঙা টুকরোগুলো অত্যন্ত দ্রুতবেগে পরস্পর থেকে ছিটকে পড়ে। এই ছিটকে পড়া টুকরোগুলোর গতিশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। 'পাওয়ার স্টেশনে' এই তাপশক্তি নানান প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যায়। পরমাণু-বোমার (দ্র) ধ্বংসাত্মক কাজেও এই তাপ ব্যবহার করা যায়। সাধারণত

www.pathagar.com

ভারি নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন (দ্র) দ্বারা আঘাত করে নিউক্লিয়াসের বিভাজন বা ফিশন্ ঘটানো হয়। নিউক্লীয় ফিশনে নিউক্লিয়াসের ভাঙা টুকরো (যারা নিজেরাও কোনো পদার্থের নিউক্লিয়াস) ছাড়াও পাওয়া যায় নিউট্রন (দ্র), গামা রশ্মি (দ্র) ও তাপশক্তি। প্রতি ফিশনে প্রায় ২০০ মেগাইলেক্ট্রন ভোল্ট শক্তি নির্গত হয়। নিউক্লীয় ফিশনে উৎপন্ন পদার্থগুলো সাধারণত অত্যধিক তেজস্ক্রিয় হয়। ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে এটি জেনন ($_{54}Xe^{140}$) ও স্ট্রনসিয়াম ($_{38}Sr^{94}$) নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয়। এই ফিশন্-প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পরমাণু-বোমা তৈরি। কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলবিক্রিয়া বা 'চেইন রিয়্যাকশন' দ্বারা পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পরমাণু বোমার সকল শক্তি এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরণ দ্বারা মুক্ত হয়। ফিশন্ চেইন রিয়্যাকশনকে নিউক্লীয় রিয়্যাক্টরে (পরমাণুচুল্লি নামে বেশি পরিচিত) নিয়ন্ত্রণ করে শক্তি উৎপাদন করা হয় এবং এই শক্তি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে এই শক্তির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। নিউক্লীয় শক্তি উৎপাদক এই কেন্দ্রগুলোকে নিউক্লীয় পাওয়ার স্টেশন বলা হয়।

শা. ত.

ফুকন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন দ্র

ফুটবল (football)

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় আকর্ষণীয় খেলা ফুটবল, যার আধুনিক নামকরণ করা হয়েছে 'সকার' (soccer)। ফুটবল খেলার উৎপত্তি নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বিভিন্ন নামে এই খেলাটি প্রাচীন পারস্য, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রিস, চীন (দ্র) ও ইংল্যাণ্ডে (দ্র) প্রচলিত ছিল। তবে আধুনিক ফুটবলের জনক বলতে ইংল্যাণ্ডকেই বোঝায়। মধ্যযুগের শেষ দিকে এক জন ইংরেজ জে. সি. থ্রিং-ই প্রথম ফুটবল খেলার লিখিত আইন-কানুনের প্রবর্তন করেন। ১৮৪৮ সালে বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়েরা কেম্ব্রিজে মিলিত হয়ে ফুটবল খেলার আইন-কানুন তৈরি করেন। এগুলোকে কেম্ব্রিজ রুল বলে। ১৯০৪ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন বা ফিফা (দ্র) গঠিত হয়। এই ফেডারেশনই বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ১৯০৬

সাল থেকে ফুটবল অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এখনো তা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এশিয়ান গেম্সে (দ্র) এটা ১৯৫১ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৩০ সাল হতে ফুটবলের বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ছাড়া আগা খান গোল্ড কাপ (১৯৫৮), পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্ট্স্ গোল্ড কাপ নামে পরিচিত, শেরে বাংলা কাপ, ডামফ (DAMF) বা ঢাকা মেট্রোপেলিটান ফুটবল কাপ, প্রতি জেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবল লীগ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃস্কুল, আন্তঃবোর্ড, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা ছাড়া কিছু শহীদ স্মৃতি ফুটবল এবং সেনাবাহিনী, পুলিশ, বি ডি আর, আনসার ইত্যাদির নিজস্ব লীগ বা নক্ আউট পদ্ধতির খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফুটবল খেলার মাঠ সবচেয়ে বড় ১৩০ গজ লম্বা ও ১০০ গজ চওড়া এবং সবচেয়ে ছোট ১০০X৫০ গজের হবে। বর্তমানে ১৩৬টি দেশ ফিফার সদস্য।

দেশে ফুটবল খেলায় দু'টি ক্রীড়া-ক্লাবের মধ্যে ভীষণ

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সম্মানের লড়াই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দর্শকেরাও দুই দলের সমর্থক হয়ে পড়েছেন। ক্লাব দু'টি হচ্ছে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (দ্র) ও আবাহনী ক্রীড়াচক্র (দ্র)। স্বাধীনতা-উত্তর কালে ১৯৭২ হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোহামেডান স্পোর্টিং ১০ বার, আবাহনী ক্রীড়াচক্র ১০ বার, বি আই ডি সি এবং বি জে এম সি ১ বার করে লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

কা. আ. আ.

ফুড পয়জনিং (food poisoning)

খাবারে জীবাণুদূষণ, বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদানযুক্ত খাবার গ্রহণ, বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীর মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে খাদ্যের বিষক্রিয়া বা ফুড পয়জনিং দেখা দেয়।

ফুড পয়জনিং-এর জন্য দায়ী জীবাণুর (দ্র) মধ্যে 'সালমোনেলা' (Salmonella), 'স্ট্যাফাইলোকক্কাস' (Staphylococcus), 'ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম' (Clostridium botulinum) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ফুড পয়জনিং স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট হয়। তবে এ জাতীয় ফুড পয়জনিংয়ের তীব্রতা যথেষ্ট কম এবং দ্রুত নিরাময়যোগ্য। ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক জীবাণু এক ধরনের গুরুতর ফুড পয়জনিং সৃষ্টি করে, যা বটুলিজ্‌ম্ (Botulism) নামে পরিচিত।

কোনো কোনো ধাতব রাসায়নিক, যেমন— জিঙ্ক, কপার, লেড, আর্সেনিক, পারদ (দ্র) ইত্যাদি দ্বারা দূষিত খাবার গ্রহণেও ফুড পয়জনিং দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন বিষাক্ত উদ্ভিদ, যেমন— ব্যাঙের ছাতা (mushroom), ওয়াটার হেমলক (water hemlock) ইত্যাদি খাওয়ার ফলে এবং কোনো কোনো মাছ, যেমন— শেল মাছ (Shell Fish), পটকা মাছ ইত্যাদি ভক্ষণেও ফুড পয়জনিং দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফুড পয়জনিংয়ে আক্রান্ত হলে বমি, বমিবমি ভাব, ডায়রিয়া (দ্র), খিঁচুনি, মৃদু জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কখনো কখনো শরীরের নির্দিষ্ট কোনো মাংশপেশিও অবশ হয়ে যেতে পারে।

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার প্রস্তুত, সংরক্ষণ এবং বিশুদ্ধ

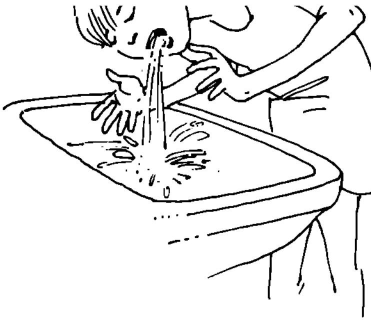

খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ফুড পয়জনিং প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সি. না. হ.

ফুতুরিজ্‌ম্ ভবিষ্যবাদ দ্র

ফুল

প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন সুন্দর বস্তুরাজির মধ্যে ফুল অন্যতম। ফুল ভালবাসে না এমন মানুষ বোধ হয় নেই। ফুল রূপান্তরিত শাখা অথবা বীজ উৎপন্নকারী উদ্ভিদের (দ্র) একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক অংশ। ফুল থেকে ফল (দ্র) হয়, আবার ফলের মধ্যে থাকে বীজ এবং সেই বীজ থেকে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ হয়।

ফুল কতকগুলো পুষ্পপত্রের সমন্বয়। সাধারণ ফুলে চারটি চক্রে পুষ্পপত্রগুলো পুষ্পাধার (থ্যালামাস) নামক ছোট দণ্ডের ওপর সজ্জিত থাকে। জবা (দ্র), ধুতুরা (দ্র), গোলাপ (দ্র) এ ধরনের উদ্ভিদ। এদের ফুল উভলিঙ্গের। অর্থাৎ একই ফুলে পুং কেশর ও গর্ভকেশর দুইই থাকে। কিন্তু লাউ, কুমড়া (দ্র) প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুল একলিঙ্গের, অর্থাৎ এই সব ফুল স্ত্রী অথবা পুং-ফুল হয়ে থাকে।

ফুলের দল বা পাপড়ির বর্ণ, আকৃতি ও গন্ধ মনোহর হয়। কোনো কোনো ফুলের গন্ধ ভাল নাও হতে পারে। আবার অনেক ফুলে গন্ধও নেই। ফুলের লাল, নীল, বেগুনি, হলুদ, কমলা রঙ হয় রঞ্জক (পিগমেন্ট) দ্রব্যের জন্য। কোনো কোনো ফুল হয় বড়, কোনো কোনো ফুল হয় খুবই ছোট।

ফুলের বর্ণ বা গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অথবা মধু বা পরাগরেণুর লোভে মৌমাছি (দ্র), প্রজাপতি (দ্র) ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ (দ্র) এক ফুল থেকে অন্য ফুলে যাওয়ার সময় পরাগযোগ ঘটায়। এভাবে ফুল থেকে ফল হয়। এমনকি তুচ্ছ অনামী ঘাসেও ফুল হয়। তবে ঢেঁকিশাক, শুশনিশাক

www.pathagar.com

প্রভৃতি কিছু কিছু অপুষ্পক উদ্ভিদও আছে। আবার ফুল থাকে ফলের মতো সবুজ খোলের ভেতরে; এ জন্য ডুমুর, বট (দ্র), পাকুড়, অশ্বত্থের (দ্র) ফুল দেখা যায় না। এসব ফলের বীজ কচি থাকা অবস্থায় খোলসটা ভাঙলে ফুল দেখা যায়, তা পাকলে ভেতরের ফুল বীজ হয়ে যায়। অর্কিড, ক্যাকটাস, বাঁশ (দ্র), আখ (দ্র), গোলাপ (দ্র), রজনীগন্ধা (দ্র) ও আমের (দ্র) ফুলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সৌন্দর্যের দিক থেকেও তারা আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। আবার ব্যাঙের ছাতার (দ্র) পুরোটিকেই ফুল বলা যায়।

পৃথিবীর (দ্র) সবচেয়ে বড় ফুলের নাম রাফ্লেসিয়া আর্নোল্ডিয়াঈ (Rafflesia arnoldii)। এই ফুলটি প্রস্থে ৩ ফুট পর্যন্ত হয়। ওজন ১০ কেজিও হতে পারে। এর গাছটি কিন্তু ফুলের চেয়ে ছোট এবং অন্য উদ্ভিদের শেকড়ে পরভোজী উদ্ভিদ হিসাবে তা জন্মায়। এই ফুল পাওয়া যায় মালয়েশিয়ায়। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট ফুলের উদ্ভিদের নাম আরসিওথোবিয়াম। এটিও উদ্ভিদের ওপর পরভোজী হিসাবে জন্মে থাকে। পৃথিবীর স্থলভাগে যেমন ফুল আছে, তেমনি পানির নিচে সাগর-মহাসাগরেও অনেক ফুল আছে। শুধু আকাশে ফুল ফোটে না বলে আমরা জানি, তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মহাকাশে নানা জাতের গাছপালা ও বীজ নিয়ে পরীক্ষা করে ফুল ফোটানো হয়েছে।

বি. ব.

ফুলকপি

ক্রুসিফেরি (Cruciferae) পরিবারভুক্ত বাংলাদেশের (দ্র) শীতকালীন জনপ্রিয় ফুল-সবজি। এর ইংরেজি নাম কলিফ্লাওয়ার (cauliflower) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ব্রাসিকা ওলারেসিয়া ভ্যার বট্রিটিস্ (Brassica oleracea var botrytis)*। ইতালি বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সম্ভবত এর উৎপত্তি। ফুলকপির অপ্রস্ফুটিত বড় আকারের পুষ্পমঞ্জরিকে সবজি হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই এর চাষ করা হয়। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকেই সাধারণত বাংলাদেশের বাজারে ফুলকপি আসে। শীতপ্রধান দেশে অবশ্য গ্রীষ্মকালেও এর চাষ করা হয়।

বিদেশ থেকে আমদানিকৃত স্নোবল, জায়েন্ট স্নোবল, ডালিয়া ও পার্ল প্রভৃতি জাতের ফুলকপি উন্নত জাতের। এগুলোর ফলনও ভাল। চাষের সময়ভেদে ফুলকপির আগাম, মধ্যমৌসুমী ও নাবী জাত আছে। আর্লি স্নোবল, আর্লি পাটনা, পুশা দীপালি, কার্তিকা ও অগ্রহায়ণী আগাম জাত। মধ্যমৌসুমী জাতের মধ্যে স্নোবল এক্স, স্নোবল ওয়াই, পৌষালু, রাক্ষুসী ও হোয়াইট টপ উল্লেখযোগ্য।

নাবী জাতের মধ্যে ইউনিক স্নোবল, হোয়াইট মাউন্টেন, মাঘী ও মাঘী বেনারসী ভাল ফলন দিয়ে থাকে। চারা সংগ্রহ করে তা জমিতে লাগানোর পর জাতভেদে ৫০-৯০ দিনের

www.pathagar.com

মধ্যে ফুলকপি সংগ্রহ করা হয়।

ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন (দ্র) 'বি' এবং প্রোটিন আছে। ভাজি তরকারি ও ঝোল তরকারি হিসাবে ফুলকপি খাওয়া হয়।

মু. আ.

ফুলকি শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

ফুলকুঁড়ি শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

ফুলকুঁড়ির আসর শিশুসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

ফুসফুস শ্বসনতন্ত্র দ্র

ফেন্সিং অসিচালনা / তলোয়ার খেলা দ্র

ফেমিনিজম নারীবাদী আন্দোলন দ্র

ফেরদৌসী [আনু. ৯৩৪—১০২০]

আবুল কাসিম মনসুর ফেরদৌসীর জন্ম আনুমানিক ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ও মৃত্যু ১০২০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর রচিত 'শাহনামা' (দ্র) তাঁকে বিশ্বসাহিত্যে অমর করে রেখেছে। তিনি এই মহাকাব্যের(দ্র) মাধ্যমে ইরানকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব নেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর অশেষ পরিশ্রম করে তিনি এই মহাকাব্য সমাপ্ত করেন। তুর্কি বংশোদ্ভূত গজনীর অধিপতি সুলতান মাহমুদের (দ্র) ফরমায়েশ মতো ফেরদৌসী এই মহাকাব্য রচনা শুরু করেন বলে ধারণা করা হলেও আসলে তা সত্য নয়। ৮০ বছর বয়সে তিনি এই মহাকাব্য রচনা শেষ করেন। তিনি যৌবনে তাঁর জন্মভূমি তূসে বসে ইরানের প্রাচীন রাজা-বাদশাহের এক কাহিনী গদ্যে লিখতে শুরু করেন এবং সম্ভবত তা সম্পূর্ণও করেন। কিন্তু পরে কবি দাকীকীর প্রভাবে তিনি তাঁর কাহিনীকে ছন্দোবদ্ধ পদ্যে লিখতে থাকেন। তিনি ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে 'শাহনামা' রচনা শুরু করেন। সুলতান মাহমুদ ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান ছিলেন তুর্কি। এ জন্য ফেরদৌসী ইরানকে গজনীর সুলতানের অধীনে কোনো দিন মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে তিনি সুলতানের গুণগ্রাহিতার মূল্য দিতেন। এ জন্য ক্ষমতাসীনের প্রশস্তি 'শাহনামা'য় থাকলেও ইরানের বীর ও বাদশা-সম্রাটদের কাহিনীই মুখ্য বিষয়। ফেরদৌসী সুলতান মাহমুদের রাজসভার কবি

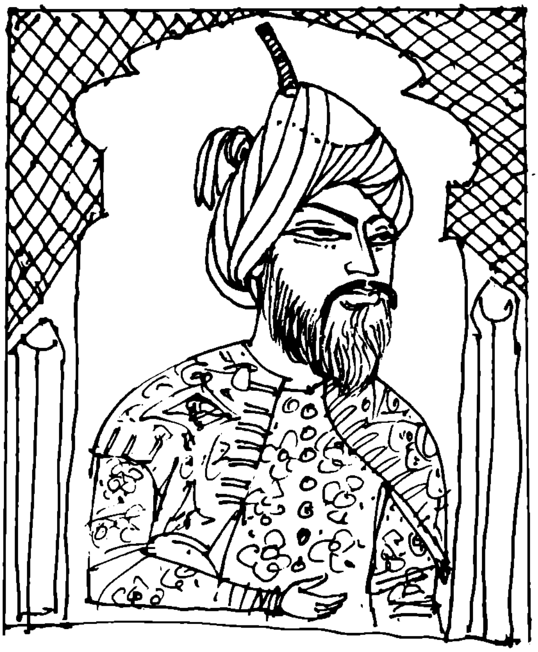

ছিলেন। তিনি ইরানের এক সম্ভ্রান্ত চাষী পরিবারের সন্তান ছিলেন।

কথিত আছে, ভারত থেকে কোনো এক যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তন করার সময় উজির হাসান মৈমুন্দী সুলতান মাহমুদের সামনে 'শাহনামা'র একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। শ্লোকটির কাব্যিক সৌন্দর্য সুলতানকে চমকিত করে। সুলতান উজিরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে ঐ শ্লোকের রচয়িতা ফেরদৌসী। কিন্তু তার পূর্বেই ফেরদৌসী সুলতানের রোষে পড়ে গেছেন। শ্লোক শুনে সুলতান নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং তখুনি কবির গৃহে ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। সুলতানের অনুচরগণ যখন সেই স্বর্ণমুদ্রাসহ কবির জন্মভূমি তূস নগরে প্রবেশ করে, তখন কবির মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে সমাধিক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলছিলেন তাঁর ভক্তগণ। সুলতানের পারিতোষিক কবির একমাত্র কন্যার সামনে রাখা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন নি বলে লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। কারণ এর আগে কবিকে 'শাহনামা'র ৬০ হাজার শ্লোকের জন্য ঐ পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও সম্রাট রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিলেন রাজকোষ থেকে। কবি সেই মুদ্রা থেকে

www.pathagar.com

রাজবাড়ির দূত ও গোসলখানার হেফাজতকারীকে ৪০ হাজার মুদ্রা দান করে দেন। বাকি ২০ হাজার মুদ্রায় এক গ্লাস পানীয় (ফুকা) কিনে এর বিক্রেতাকে দান করেন। এই ব্যবহারে সুলতান ক্রুদ্ধ হলেও কবি তাঁকে শান্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার পরেই তীব্র একখানা কবিতা লিখে কবি পালিয়ে যান। এই কবিতা 'শাহনামা'র মূল অংশের প্রথমেই স্থান পেয়েছে।

সম্পূর্ণ 'শাহনামা' বাংলায় অনুবাদ করেন মনিরউদ্দীন ইউসুফ (দ্র) এবং ১৯৯১ সালে বাংলা একাডেমী (দ্র) থেকে তা ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

বি. ব.

ফেলুদা সত্যজিৎ রায় দ্র

ফোটন (photon)

বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষুদ্রতম শক্তিগুচ্ছ; আলোক কোয়ান্টাম নামেও পরিচিত। কোয়ান্টাম তত্ত্ব (দ্র) অনুযায়ী আলো বা যে কোনো বিকিরণ (দ্র) কোনো অবিচ্ছিন্ন বিকিরণ নয়, বরং ক্ষুদ্রকায় শক্তিগুচ্ছ (energy packet) হিসাবে গুচ্ছাকারে বিকিরিত হয়। এসব ক্ষুদ্রকায় শক্তিগুচ্ছই হল কোয়ান্টাম।

১৯০০ সালে মাক্স প্লাঙ্ক (Max Planck : ১৮৫৮-১৯৪৭) প্রথম কোয়ান্টাম ধারণা প্রকাশ করেন এবং ১৯০৫ সালে আলোকবিদ্যুৎক্রিয়া (Photoelectric effect) ব্যাখ্যা করার জন্য আলবার্ট আইনস্টাইন (দ্র) আলোক কোয়ান্টাম তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ করেন।

উচ্চতর গামা রশ্মি (দ্র), এক্স রশ্মি থেকে শুরু করে দৃশ্যমান আলো বা অবলোহিত রশ্মি, প্রতিটি কম্পাঙ্কেরই (দ্র) ফোটন রয়েছে। ফোটনের শক্তি বিকিরণের কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভর করে। যে কোনো কম্পাঙ্কের ফোটনের শক্তি নিম্নের সূত্র থেকে পাওয়া যায়—

শক্তি = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক × বিকিরণের কম্পাঙ্ক।

ফোটন অবপারমাণবিক কণাজগতে বোসন (Boson) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ ও স্থির ভর নেই এবং এর স্পিন বা ঘূর্ণনসংখ্যা এক। বিদ্যুৎচৌম্বকীয় বলের বাহন হল ফোটন।

একটি ১০০ ওয়াটের বিজলিবাতি প্রতি সেকেণ্ডে ২.৫×১০^{২০} টি ফোটন বিকিরণ করে।

মু. হা.

ফোনোগ্রাফ গ্রামোফোন দ্র

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

১৮০০ সালের ১৮ই আগস্ট কলিকাতায় (দ্র) এই কলেজ (Fort William College) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসন, ব্যবসা ও ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশে লর্ড ওয়েলেসলি এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ এই কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। ভাড়া করা বাড়িতে ছাত্রাবাস ছিল। এই উপমহাদেশের বেশ কয়েকটি ভাষার গদ্যরূপ প্রবর্তন করেছে এই কলেজের পণ্ডিত ও মুনশিগণ। বাংলা গদ্য-ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা অনন্য। উইলিয়াম কেরির (দ্র) রচিত বাংলা ব্যাকরণ বঙ্গভাষায় লিখিত ব্যাকরণের অন্যতম গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে (দ্র) প্রকাশিত প্রথম গদ্যগ্রন্থটির রচয়িতা তিনি ছিলেন। সংলাপধর্মী এই গ্রন্থের নাম ছিল 'কথোপকথন'। একই বছর বাঙালি লেখকের লেখা প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায়। লেখক ছিলেন রামরাম বসু (দ্র)। দু'টি গ্রন্থেরই প্রকাশকাল ১৮০১ সাল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক কেরি ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ব্যক্তি। কেরি বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ের বইও রচনা করেন। তিনি ১৩টি ভাষার প্রতিশব্দ নিয়ে একটি অভিধান রচনা করেন। এর পাণ্ডুলিপির একটি অংশ আগুনে পুড়ে গেলে তিনি তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারেন নি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায়, বিশেষ করে কেরির অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত বাংলা ভাষায় (দ্র) কিংবা বাংলা ভাষা বিষয়ে প্রকাশিত বইগুলো হচ্ছে উইলিয়াম কেরির 'কথোপকথন' (১৮০১), 'A Grammar of the Bengalee Language' (১৮০১), রামরাম বসুর লেখা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অনূদিত 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), গোলকনাথ শর্মা অনূদিত 'হিতোপদেশ' (১৮০২), রামরাম বসুর লেখা 'লিপিমালা' (১৮০২), কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' (১৮০২), কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (১৮০২), কেরি অনূদিত বাংলা বাইবেল (১৮০১), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য

www.pathagar.com

চরিত্রং' (১৮০৮), চণ্ডীচরণ মুনশী অনূদিত 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), মৃত্যুঞ্জয় অনূদিত 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), কেরি সংগৃহীত 'ইতিহাসমালা' (১৮১২), কেরি সঙ্কলিত 'The Bengali-English Dictionary' (১৮১৫), হরপ্রসাদ রায় অনূদিত 'পুরুষ-পরীক্ষা' (১৮১৫), রামকিশোর তর্কচূড়ামণি অনূদিত 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), মোহনপ্রসাদ ঠাকুর সঙ্কলিত 'A Vocabulary Bengalee and English' (১৮১০), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুবাদগ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩) প্রভৃতি।

কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হলেও এ জন্য উইলিয়াম কেরির অবদানকেই প্রধান বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। কেরি শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে গিয়ে যে সমস্যায় পড়েন তা কাটিয়ে ওঠার জন্যই তিনি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা গদ্যের বিবর্তনের এই সময়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও লক্ষণীয়। বিরাম-চিহ্নের প্রয়োগ এবং বাংলায় আরবি, ফার্সি ও ইংরেজি শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে এই নিরীক্ষা চলে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থাগারটি এ দেশের প্রথম গণগ্রন্থাগারের গৌরব অর্জন করেছে। কলিকাতায় বসবাসকারী অনেক ইউরোপীয় এই গ্রন্থাগারে বই দান করেছেন। ওয়েলেসলি শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে টিপু সুলতানকে (দ্র) পরাজিত করার পর তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরির বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি এনে প্রথমে এই গ্রন্থাগারে রেখেছিলেন। ১৮০৫ সাল থেকে এই গ্রন্থাগারটি গণগ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়। ১৮১৮ সালে তার সংগ্রহসংখ্যা ছিল সাড়ে ১১ হাজার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গণগ্রন্থাগার থেকে পাঠকদের চাহিদা মতো বই ধার দেওয়া হত।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ শুধু ইউরোপীয়দের শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

কর্তৃপক্ষের নতুন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৪ সালের ২৪শে জানুয়ারি কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়।

মো. হো.

ফোর্ম্যান্, জর্জ [১৯৪৮—]

বক্সিং-এ বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। সবচেয়ে বেশি বয়সে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন।

ফোর্ম্যানের (George Foreman) জন্ম ১৯৪৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি, আমেরিকায়। তিনি মোট দু'বার বক্সিং-এ বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেন। তিনি প্রথম বার চ্যাম্পিয়ন হন ১৯৭৩ সালে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জো ফ্রেজিয়ার। প্রথম রাউণ্ডেই জো ফ্রেজিয়ারকে নক আউট করেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালের ৩০শে অক্টোবর ফোর্ম্যান্ মোহাম্মদ আলীর (দ্র) কাছে পরাজিত হয়ে শিরোপা হারান।

১৯৭৭ সালে তরুণ বক্সার জিমি ইয়ং-এর কাছে পরাজিত হয়ে ফোর্ম্যান্ বক্সিং থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর পর ফোর্ম্যান্ যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন।

১৯৮৭ সালে আবার তিনি বক্সিং-এর জগতে ফিরে আসেন। একটানা ২৪টি ম্যাচে (২৩টি নক আউট, ১টি পয়েন্টের ব্যবধানে) বিজয়ী হয়ে তিনি তৎকালীন বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ইভাণ্ডার হলিফিল্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ১৯৯১ সালের ১৯শে এপ্রিল হলিফিল্ডের কাছে পরাজিত হয়ে জর্জ্ ফোর্ম্যান্ দ্বিতীয় বারের মতো বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হবার সুযোগ হারান। এর পর তিনি ধারাভাষ্য প্রদান, মডেলিং,

www.pathagar.com

অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কিন্তু ১৯৯৪ সালে হঠাৎ করে তিনি বিশ্ব হেভিওয়েট শিরোপাধারী ২৬ বছর বয়সী মাইকেল মুরারকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন। বক্সিংযোদ্ধারা ফোর্ম্যানের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। বিশ্ব বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনও প্রথমে অসম শক্তির এই লড়াইকে অনুমোদন করতে চায় নি। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়। কোর্টের রায় ফোর্ম্যানের পক্ষে যায় এবং ১৯৯৪ সালের ৫ই নভেম্বর লড়াইয়ের দিন ধার্য হয়। সেই লড়াইয়ে জর্জ্ ফোর্ম্যান্ মাইকেল মুরারকে পরাজিত করে বিশ্ব হেভিওয়েট শিরোপা পুনরুদ্ধার করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ৪৫ বছর বয়সে এই কৃতিত্ব অর্জন করে তিনি ৪৩ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। এর আগে সবচেয়ে বেশি বয়সী বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন জার্সি জো ওয়াল্কট্ (Jersey Joe Walcott)। ১৯৫১ সালে তিনি ৩৭ বছর ৫ মাস বয়সে এজার্ড চার্লস্কে পরাজিত করে বিশ্ব হেভিওয়েট শিরোপা অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘ ৪৩ বছর পর ফোর্ম্যান্ সেই রেকর্ড ভঙ্গ করে বক্সিং-এর ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

টি. কি.

ফ্যাক্স

ফ্যাক্সিমিলি টেলিগ্রাফি (Facsimile telegraphy) কথাটিকে সংক্ষেপে বলে ফ্যাক্স (Fax)। রেডিও-তরঙ্গ বা টেলিফোন-তারের সাহায্যে কোনো তথ্য, লেখার ছবি ইত্যাদি প্রেরণকে ফ্যাক্সিমিলি টেলিগ্রাফি বা ফ্যাক্স বলে। টেলিফোনব্যবস্থার সঙ্গে ফ্যাক্স মেশিন সংযুক্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রেরক ও গ্রাহক উভয় টেলিফোনেই সংযুক্ত থাকে একটি করে ফ্যাক্স মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে তথ্য, ছবি, লেখা ইত্যাদিকে সঙ্কেতে পরিণত করে পাঠানো হয়। গ্রাহক ফ্যাক্স মেশিন এই সঙ্কেত গ্রহণ করে তাকে আবার মূল তথ্য, ছবি বা লেখায় রূপান্তরিত করে। একই ফ্যাক্স মেশিন দ্বারা সঙ্কেত প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়।

শা. ত.

ফ্যাটি অ্যাসিড তেল-চর্বি দ্র

ফ্যারাডে, মাইকেল [১৭৯১—১৮৬৭]

মাইকেল ফ্যারাডের (Michael Faraday) জন্ম ১৭৯১ সালে। তাঁর পিতা ছিলেন লণ্ডনের এক জন কামার। ফ্যারাডে ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় পুত্রসন্তান। তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তাই মাত্র তেরো বছর বয়সেই একটি বই-বাঁধাইয়ের কারখানায় শিক্ষানবিশ হিসাবে তাঁকে কাজ শুরু করতে হয়। কারখানার মালিক বেশ ভাল লোক ছিলেন। তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফ্যারাডেকে বই পড়ার অনুমতি দেন। এই সময় ফ্যারাডে 'রসায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা' নামে একটি বই পড়ে ফেলেন। প্রায় একই সাথে তিনি বিশ্বকোষে বিদ্যুৎ সম্পর্কে একটি লেখাও পড়ে শেষ করেন। এতে বিজ্ঞান বিষয়ে আরো বেশি কিছু জানার আগ্রহ তাঁর বেড়ে যায়। তখন তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে স্যার হামফ্রি ডেভির (দ্র) বক্তৃতা শুনতে যেতেন।

স্যার হামফ্রি ডেভির বক্তৃতা শুনতে শুনতে তিনি সেগুলো লিখে রাখতেন সংক্ষেপে। তারপর বাড়ি ফিরে গুছিয়ে লিখতেন আবার। ২১ বছর বয়সে তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে একটি চাকরি চেয়ে স্যার হামফ্রি ডেভির কাছে চিঠি লিখলেন। চিঠির সাথে ডেভির বক্তৃতার কপিগুলোও পাঠালেন। স্যার ডেভি ছিলেন তখন রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের সভাপতি। বাইশ বছর বয়সে সেখানে চাকরি পেলেন ফ্যারাডে। পদ ল্যাবরেটরির সহকারী, বেতন সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং। তাঁকে প্রতিদিন ছ'জন বিজ্ঞানীর কাজের জন্য ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ঠিক করে দিতে হত। তারপর সময় মিলত তাঁর নিজের কাজ করার। তিনি কাজ করছিলেন বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে। ১৮২১ সালে ফ্যারডে তাঁর কাজের বিষয় নিয়ে 'হিস্টরিক্যাল স্কেচেস অব ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিজ্ম্' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে তিনি বিদ্যুৎ (দ্র) ও চুম্বকের (দ্র) মধ্যেকার সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর ফ্যারাডের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২৩ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এর দু'বছর পর তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের পরিচালক পদে নির্বাচিত হন। তড়িৎ-চুম্বকীয় বল বা ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ফোর্স এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ বা ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ইণ্ডাক্শন্

www.pathagar.com

সম্পর্কে তাঁর মৌলিক আবিষ্কারই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মূল ভিত্তি। তাঁর গবেষণার সূত্র ধরেই আবিষ্কৃত হয়েছে বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র 'ডায়নামো' এবং 'জেনারেটর'। ফ্যারাডে তাই তড়িৎ-বিজ্ঞানের জনক হিসাবেই সমধিক পরিচিত। যুগান্তকারী আবিষ্কারের জনক বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে ১৮৬৭ সালে পরলোক গমন করেন।

সু. ব.

ফ্যারিংস্ শ্বসনতন্ত্র দ্র

ফ্যাসিবাদ

ইংরেজি 'ফ্যাসিজ্‌ম্' (fascism) শব্দের বাংলা। ইতালিতে ১৯১৯ সালে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন শুরু হয় এবং এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিলে এর পুরোধা বেনিতো মুসোলিনি (দ্র) ইতালির স্বৈরাচারী শাসনকর্তা (১৯২২-৪৩) হয়ে বসেন। ইতালিতে শুরু হলেও ফ্যাসিবাদ পরে অন্যান্য দেশেও ছড়ায়। স্বৈরতন্ত্রী উপায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মডেল হিসাবে একে গ্রহণ করে জার্মানি, স্পেন ও জাপান (দ্র)। একনায়কতন্ত্রী শাসন যখন নিজ ক্ষমতার দম্ভে কোনো অন্যায় করতেই দ্বিধা করে না, অপর রাষ্ট্রের ওপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, ভিন্ন রাষ্ট্র দখল করে নেয়, তখন তাকে 'ফ্যাসিবাদ' বলে শনাক্ত করা হয়।

'ফ্যাসিবাদ' কথাটির তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক এবং সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইউরোপে মধ্যযুগ (দ্র) শেষ হবার পর নানা ধরনের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে (রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, পুঁজিবাদের উদ্ভব, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদি) যেতে যেতে মানুষ ক্রমশ 'আধুনিক' মানুষে রূপলাভ করেছে। নানা উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে যেতে হলেও মানবসভ্যতার ইতিহাস অগ্রগতিরই ইতিহাস। এই পথ চলার ভিতরে মৌলিক অনেক ধ্যানধারণা-দর্শন-বিশ্বাস ইত্যাদি মানব জাতি অর্জন করেছে, যেমন : যুক্তিনিষ্ঠা, মানুষের অপার সম্ভাবনায় বিশ্বাস, মানুষের প্রাণের মূল্য ও মর্যাদায় বিশ্বাস, বিভিন্ন বিরুদ্ধাচারী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কেও সহিষ্ণুতা, গণসমর্থিত সরকারের উপর আস্থা স্থাপন, জনগণের প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধ, চিন্তা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, সমালোচনা করার স্বাধীনতা ও গ্রহণের সহিষ্ণুতা, সর্বজনীন শিক্ষা, আইনের ও নিয়মের শাসন এবং নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা, বিশ্বশান্তির জন্য আগ্রহ। ফ্যাসিবাদ হল এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে; যুক্তির স্থানে আবেগ, সমষ্টিকে নিয়ে চিন্তার স্থলে আত্মচিন্তা, শ্রেণীসাম্যের বদলে দুর্বলের ওপর শক্তি ও শক্তের প্রভুত্ব, আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে না এসে বাহুবলে নিজের মত জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া, অন্যের মতামতকে উপেক্ষা করা ও নিজের মতামত অন্যকে মেনে নিতে বাধ্য করা, নিজের ক্ষমতা বাড়ানো ও স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য যুদ্ধবিগ্রহকে ভাল কাজ মনে করা, জাতিভেদের যৌক্তিকতা মান্য করে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করা—এই সব কিছুরই সম্মিলিত রূপের নাম এক কথায় ফ্যাসিবাদ।

স্বভাবতই ফ্যাসিবাদ যেমন সমাজতন্ত্রের (দ্র) বিরোধী তেমনি গণতন্ত্রেরও (দ্র) বিরোধী। রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত করার জন্য ফ্যাসিবাদ প্রচার করতে থাকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভাবধারা—'আমার জাতি সবার সেরা'। আসলে, জাতীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সকল ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে ফ্যাসিবাদ স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে।

ফ্যাসিবাদের আক্রমণ জাতীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। সে অন্য দেশ ও জাতিকে আক্রমণ করে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (দ্র) শুরু হয়েছিল ফ্যাসিবাদী জার্মানির পরদেশ আক্রমণ ও জবরদখলের জঙ্গী নীতি থেকেই। পরবর্তী

বেনিতো মুসোলিনি *আডোল্‌ফ্ হিটলার*

www.pathagar.com

২য় মহাযুদ্ধের সময় গ্যাস চেম্বারে বন্দি করে নারী ও শিশুদের নিয়ে যাচ্ছে ফ্যাসিবাদী জার্মান বাহিনী

কালে জার্মানির সঙ্গে ইতালি ও জাপান মিলিত হয়ে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তি তৈরি করে। অকল্পনীয় ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংসলীলা ও জীবননাশের পর এই শক্তি পরাভূত হয়েছিল জার্মানির পরাজয়ে ও জাপানের আত্মসমর্পণে।

ফ্যাসিবাদ সম্পূর্ণত ও চূড়ান্তভাবে মানবতাবিরোধী এক মতাদর্শ হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেছে বলে তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

হা. মা.

ফ্রয়েড্, জিগমুণ্ড্ [১৮৫৬—১৯৩৯]

ভিয়েনাবাসী মনোবিজ্ঞানী। সাইকো-অ্যানালিসিসের জনক। ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) মতে, মানুষ অবচেতনপ্রবণতা এবং সংস্কারের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সে অর্থে সে স্বাধীন নয়। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানুষের অবচেতন মনের রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস পান। তাঁর প্রবর্তিত ধারণা নিজের সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপকাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

ফ্রয়েডের জন্ম মোরাভিয়ার ফ্রেইবার্গ-এ (সাবেক চেকোস্লোভাকিয়ার প্রিবোর) ১৮৫৬ সালের ৬ই মে, এক ইহুদি পরিবারে। শৈশবেই পিতামাতার সঙ্গে তাঁকে প্রথমে চলে আসতে হয় জার্মানির লাইপ্‌ৎসিগ্ শহরে, পরে সেখান থেকে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়। এখানে ফ্রয়েডের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। প্রথমে তিনি আইন পড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে আত্মনিয়োগ করেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের (দ্র) গবেষণায়। ফ্রয়েড এবং ইওসেফ্ ব্রয়ের তাঁদের চিকিৎসাপদ্ধতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যৌথভাবে ১৮৯৫ সালে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ইংরেজি অনুবাদে তার নাম 'স্টাডিজ ইন হিস্টিরিয়া'। এতে বর্ণিত 'ক্যাথারটিক প্রসেস' বা 'বিরেচক পদ্ধতি' নামে পরিচিত রোগনিরাময় - পদ্ধতিকেই সাধারণত 'সাইকো-অ্যানালিসিস'-এর ভিত্তি বলে মনে করা হয়।

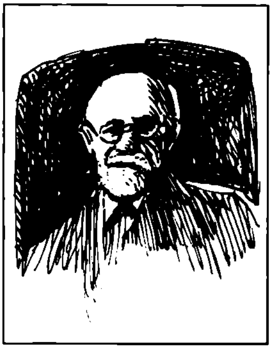

বিজ্ঞানীমহল থেকে ফ্রয়েড কোনো স্বীকৃতি না পেলেও ১৯৩০ সালে সাহিত্যের জন্য গোয়টে (দ্র) পুরস্কার পান এবং ১৯৩৬ সালে রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় নাৎসি (দ্র)-বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করে নিলে ফ্রয়েড ইংল্যাণ্ডে (দ্র) চলে আসেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর।

ফ্রয়েডের স্মরণীয় গ্রন্থাবলি 'দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিমস্'(১৯০০), 'টোটেম অ্যাণ্ড ট্যাবু' (১৯১৩) এবং 'দ্য ইগো অ্যাণ্ড ইড' (১৯২৩) ইত্যাদি।

আ. হু.

ফ্রাঁস্, আনাতোল্ [১৮৪৪—১৯২৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকপাল ফরাসি সাহিত্যিক, হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি-বিশেষজ্ঞ, গ্রন্থাগারিক, সমালোচক, সম্পাদক এবং ফরাসি একাডেমীর বিশিষ্ট সভ্য আনাতোল্ ফ্রাঁস্ (Anatole France)। এই নাম তাঁর ছদ্মনাম, আসল নাম ছিল আনাতোল্ ফ্রাঁসোয়া তিবো (Anatole Francois Thibault)। জন্ম ১৮৪৪ সালে, প্যারিসে।

১৮৮১ সালে তাঁর উপন্যাস 'ল্য ক্রিম্ দ্য সিল্‌ভেস্ত্র্ বনার্' (সিল্‌ভেস্ত্র্ বনারের অপরাধ) প্রকাশিত হলে তিনি ফরাসি সাহিত্য-পাঠকদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ল্য লিভ্র্ দ্য মনামি' (আমার বন্ধুর বই)। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ 'ল্য ইস্তোয়ার কঁতাপরেন্' (১৮৯৭-১৯০১), 'ক্রাঙ্কবিয়্' (১৯০১) এবং 'লিল্ দে প্যাঁগুঅ্যাঁ' (পেঙ্গুইন আইল্যাণ্ড)

www.pathagar.com

(১৯০৮)। তাঁর রচনাকর্ম ভল্‌ত্যারের রচনা দ্বারা প্রভাবিত বলে তাঁকে 'বিংশ শতাব্দীর ভল্‌ত্যার্' বলেও অভিহিত করা হয়।

মানবতাবাদের জয়গানে মুখর আনাতোল্ ফ্রাঁসের সাহিত্যকর্ম। ১৯২১ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯২৪ সালে।

আ. হু.

ফ্রুক্টোজ (fructose)

ফ্রুক্টোজ একটি সরল চিনি (দ্র) বা মনোস্যাকারাইড। আমরা চা কিংবা কফিতে যে চিনি (সুক্রোজ) ব্যবহার করি, ফ্রুক্টোজ তার চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি। এটা ডি-ফ্রুক্টোজ, ডিফ্রুক্টোপাইরানোজ বা লেভুলোজ নামেও পরিচিত। মুক্ত অবস্থায় পাওয়া গেলেও এটি সাধারণত ফলের রস এবং মধুতে ডি-গ্লুকোজ এবং সুক্রোজের সঙ্গে মেশানো থাকে। গ্লুকোজ থেকে ফ্রুক্টোজের পার্থক্য হচ্ছে—এটি একটি পেন্টাহাইড্রক্সি-২-কিটোন [$CH_2OH(CHOH)_3COCH_2OH$] (দ্র) অ্যালডিহাইড নয়।

ফ্রুক্টোজের ফসফেটযুক্ত যৌগ কার্বোহাইড্রেট (দ্র) বিপাকের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ডায়াবেটিস (দ্র) রোগ এবং যকৃতের (দ্র) ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ফ্রুক্টোজ ব্যবহারের ক্ষমতা প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে।

সা. এ.

ফ্রেওন (freon)

কার্বন (দ্র), ক্লোরিন ও ফ্লুরিন (দ্র) সমন্বয়ে গঠিত এক শ্রেণীর কৃত্রিম জৈব যৌগ। রাসায়নিক নাম ক্লোরোফ্লুরো-কার্বন। বাণিজ্যিক নাম ফ্রেওন। দু'টি বহুল ব্যবহৃত ফ্রেওন হল ট্রাইক্লোরো-ফ্লুরো-মিথেন ($CFCl_3$) বা F-11এবং ডাইক্লোরো-ডাইফ্লুরো-মিথেন (CF_2Cl_2) বা F-12। রিফ্রিজারেটর (দ্র) এবং এয়ারকণ্ডিশনারে শীতলক হিসাবে, ফার্নিচারের প্লাস্টিক-ফোম তৈরিতে ফ্রেওন ব্যবহৃত হয়।

F-11 এবং F-12 গ্যাসের কোনো বিষক্রিয়া নেই; উচ্চ ঘনত্ব, নিম্ন স্ফুটনাঙ্ক ও নিম্ন সান্দ্রতাযুক্ত অদাহ্য এই গ্যাস (দ্র) সহজেই গ্যাস থেকে তরল এবং তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু ফ্রেওন পরোক্ষভাবে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। পৃথিবীতে ব্যবহৃত F-11এবং F-12 গ্যাস ছাড়া পেলেই ধীরে ধীরে ওজোন (দ্র) স্তরে উঠে আসে। অতিবেগুনি রশ্মির (দ্র) প্রভাবে ফ্রেওন ভেঙে ক্লোরিন মুক্ত হয় এবং ওজোন-অণুকে ভেঙে ফেলে। এভাবে ওজোন স্তরে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি অধিক মাত্রায় পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে, যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর। ওজোন স্তর এই রশ্মি প্রতিহত করে।

১৯৭৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফ্রেওন উৎপাদন নিষিদ্ধ করেছেন। ফ্রেওন উৎপাদনকারী Du Pont Company ১৯৮৮ সাল থেকে বিকল্প উৎপাদনের মাধ্যমে ফ্রেওন উৎপাদন বন্ধ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে।

স. রা.

ফ্রেস্কো ইতালীয় চিত্রকলা দ্র

ফ্র্যাঙ্কলিন্, বেঞ্জামিন্ [১৭০৬—১৭৯০]

বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্ (Benjamin Franklin) ছিলেন আমেরিকার এক জন রাজনীতিবিদ ও বিজ্ঞানী, তড়িৎবিজ্ঞানের এক জন পথিকৃৎ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতালড়াইয়ের তীব্র সমর্থক ছিলেন। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) সংবিধান রচনায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন।

রাষ্ট্রনেতা ও বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাত ফ্র্যাঙ্কলিন্ ১৭০৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি নিউ ইংল্যাণ্ডের বোস্টন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্র্যাঙ্কলিন্ ছিলেন তাঁর বাবার পঞ্চদশতম সন্তান। তাঁর বাবার সাবান তৈরির ব্যবসা ছিল। স্কুলের খরচ চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না বলে ফ্র্যাঙ্কলিন্‌কে তিনি ব্যবসাকাজে লাগিয়ে দেন। পড়াশোনায় ফ্র্যাঙ্কলিনের অদম্য আগ্রহ দেখে বাবা তাঁকে ছাপাখানার ব্যবসায় নিয়োজিত

www.pathagar.com

করেন। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো সে সময়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিদ্যুৎ নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ১৭৫২ সালে তিনি তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বৈদ্যুতিক পরীক্ষণটি সম্পন্ন করেন। এই পরীক্ষণে তিনি প্রমাণ করেন যে বজ্রপাত (lightning) একটি বৈদ্যুতিক ঘটনা। ফ্র্যাঙ্কলিন্ই প্রথম ঘরবাড়িকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা করার জন্য বজ্রপাতের বিদ্যুৎপরিবাহীর (অর্থাৎ যাকে সাধারণভাবে বজ্রপাতনিরোধক বলা হয়) নকশা করেন। বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্ সব সময় দেশের মানুষের কল্যাণ করার উপায় নিয়ে ভাবতেন। দেশের মানুষের কাছেও তিনি তাই পেয়েছেন অগাধ শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই বিজ্ঞানী ১৭৯০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অসামান্য অবদান ও মানবকল্যাণকর কাজের জন্য বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্ পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবেন।

হো. আ.

ফ্র্যাঙ্কেন্স্টাইন্ (Frankenstein)

বীভৎস রসের উপন্যাস, অনেকটা 'ড্রাকুলা'র (দ্র) মতোই। তবে, ড্রাকুলার গল্পের উদ্দেশ্য কেবলই ভয় দেখানো। ফ্র্যাঙ্কেন্স্টাইন্ কাহিনীর ভিতরে এক ধরনের গভীর তত্ত্বকথা আছে।

বইটির সম্পূর্ণ নাম Frankenstein; or, The Modern Prometheus হলেও শুধুই ফ্র্যাঙ্কেন্স্টাইন্ নামেই

মেরি শেলি

সবখানে পরিচিত। আসলে বলা উচিত ফ্রাঙ্কেন্শ্টাইন্, কারণ এই চরিত্রটি ইংরেজ নয়, জার্মান। বইটি ইংরেজি বলে ইংরেজি উচ্চারণেই নামটি স্বাভাবিকভাবেই চালু হয়ে গেছে।

ফ্র্যাঙ্কেন্স্টাইন্ নামে এক জার্মান ছাত্র-গবেষক মৃতদেহের মধ্যে প্রাণসঞ্চারের বিজ্ঞান আয়ত্ত করে ফেলে। তখন এক মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার পর সে দেখে যে মৃত ঠিকই জীবিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে দানবে রূপান্তরিত হয়ে বেঁচে উঠেছে। প্রচণ্ড শক্তিধর এবং দেখতে কুৎসিত এই দানবের মনটি কিন্তু দয়ার্দ্র, সুন্দর। তা হলে কি হবে, ফ্র্যাঙ্কেন্স্টাইন্ নিজে ভয় পেয়ে তার সঙ্গে এত দুর্ব্যবহার শুরু করল যে ঐ দানব শেষকালে হিংস্র হয়ে গিয়ে তার স্রষ্টার স্ত্রী ও ভাইকে খুন করে বসল। অবশেষে নিজের তৈরি দানবকে নিয়ে ফ্র্যাঙ্কেন্স্টাইন্ মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করে উত্তর মেরু অঞ্চলে যায় এবং সেখানেই উভয়ে মারা পড়ে।

'ফ্র্যাঙ্কেন্স্টাইন্' উপন্যাসের লেখক মেরি উওল্স্টোন্ক্র্যাফ্ট্ শেলি (১৭৯৭-১৮৫১), কবি শেলির (দ্র) দ্বিতীয় স্ত্রী। তিনি বিদূষী ছিলেন। তাঁর বাবা-মা উভয়েই

স্বনামধন্য চিন্তাবিদ ও ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৮১৬ সালে এক ঘরোয়া আড্ডায় ভুতুড়ে গল্প লেখা নিয়ে তর্ক জমে ওঠে কবি শেলি, তাঁর স্ত্রী মেরি, শেলির বন্ধু কবি লর্ড বায়রন (দ্র) আর বায়রনের চিকিৎসক পলিডোরির মধ্যে। ঐ তর্কেরই ফসল এই উপন্যাস। মেরি আরো কিছু বই লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন ফ্র্যাঙ্কেন্স্টাইনের স্রষ্টা হিসাবে। গল্পটি অবিশ্বাস্য ও ভুতুড়েও বটে। কিন্তু তার পরেও আমাদের দয়া হয়, মনের মধ্যে কষ্ট জাগে ঐ নামহীন দানবটির জন্য। আর আমাদের রাগও হয় ফ্রাঙ্কেন্শ্টাইন্

www.pathagar.com

নামের ঐ তরুণ বিজ্ঞানীটির ওপর।

হা. মা.

ফ্লাউড কমিশন

বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (দ্র) ১৯৩৮ সালের ৫ই নভেম্বর স্যার ফ্র্যান্সিস ফ্লাউড-এর নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত।

নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে ফ্লাউড কমিশন গঠন করা হয় :

১. স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড (চেয়ারম্যান)
২. স্যার বিজয়চাঁদ মাহতাব মহারাজাধিরাজ বাহাদুর
৩. খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন এম. এল. এ.
৪. খান বাহাদুর হাশেম আলী খান এম. এল. এ.
৫. এস.এম. মসিহ্ বার-অ্যাট-ল
৬. খান বাহাদুর এম. এ. মোমেন
৭. স্যার মন্মথনাথ মুখার্জি
৮. ড. রাধাকুমার মুখার্জি এম. এল. এ.
৯. রাজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
১০. স্যার এফ. এ. সচমে

এস. এম. মসিহ্ কমিশনে যোগ দেন নি এবং স্যার মন্মথনাথ মুখার্জি পদত্যাগ করেন। তাঁদের স্থলে আবুল কাসেম, নূরউদ্দিন আহমেদ ও অনুকূলচন্দ্র দাস এম. এল. এ-কে কমিশনের সদস্য নিযুক্ত করা হয়। এম. ও. কার্টারকে কমিশনের সেক্রেটারি এবং হেবোর্নওয়েলকে বিশেষ অফিসার নিয়োগ করা হয়। ফ্লাউড কমিশনের তদন্তের প্রধান বিষয় ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (দ্র) আলোকে বাংলার বর্তমান ভূমিব্যবস্থা পরীক্ষা করা এবং জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করা।

কয়েক দফা বৈঠকের পর কমিশন ১৯৪০ সালের ২১শে মার্চ ছয় খণ্ডে তাঁদের ঐতিহাসিক "ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট" বাংলার সরকারের নিকট পেশ করেন। জমিদারদের প্রতিনিধি বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মাহতাব, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. রাধাকুমার মুখার্জি ও এফ. এ. সচমে কমিশনের রিপোর্টের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার ফ্লাউড এবং অধিকাংশ সদস্য ফজলুল হকের (দ্র) প্রভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবসানের সুপারিশ করেন।

ফ্লাউড কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বাংলার কৃষকদের শোচনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারদের অত্যাচার আর শোষণের ফলে তারা গরিব হতে বাধ্য হয়েছে। জমিদারশ্রেণী উচ্চ হারে রাজস্ব ও আবোয়াব আদায় করে। কৃষির উন্নতির জন্য তাদের কোনো অবদান নেই।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট সারা ভারতে জমিদারিপ্রথার মূলে কঠোর আঘাত হানে। কিন্তু ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে দেশবিভাগের পূর্বে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নি। পাকিস্তান (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৫০ সালে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ করে। মুসলিম লীগ (দ্র) আইন পাশ করলেও তার কার্যকারিতা তখন স্থগিত থাকে। ১৯৫৪ সালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে জমিদারি উচ্ছেদ শুরু করেন এবং আওয়ামী লীগের (দ্র) শাসনকালে (১৯৫৬—৫৮) জমিদারি দখলকাজ সমাপ্ত হয়।

সি. আ.

ফ্লাজেলা ইউগ্লেনা দ্র

ফ্লুরিন (fluorine)

ঈষৎ হলুদ রঙের একটি বিষাক্ত গ্যাস (দ্র)। পর্যায় সারণীর গ্রুপ VIIA-এর হ্যালোজেন সদস্যদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে হাল্কা এবং সকল মৌলের (দ্র) মধ্যে সবচেয়ে বিক্রিয়াশীল। এর প্রতীক F; পারমাণবিক ওজন ১৮.৯৯ এবং পারমাণবিক সংখ্যা ৯। ফ্লুরোস্পার (CaF_2) থেকে ফ্লুরিন নামটি এসেছে। ফ্লুরোস্পার শব্দটি আবার ল্যাটিন fluo (অর্থাৎ flow) শব্দ থেকে এসেছে।

১৬৭০ সালের দিকে জার্মান বিজ্ঞানী হাইন্‌রিশ্ শ্‌হ্বান্‌হার্ড (Heinrich Schwanhard) লক্ষ করেন যে কোনো শক্তিশালী অ্যাসিডের (দ্র) সঙ্গে ফ্লুরোস্পার মেশালে তা দিয়ে কাচের (দ্র) ওপর দাগ কাটা যায়। এ বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড (HF) তৈরি হয়, যা অত্যন্ত ক্ষয়কারী বস্তু এবং এখনো কাচের ওপর লেখার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। যদিও হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড আবিষ্কারের

www.pathagar.com

কৃতিত্ব সুইডেনের কার্ল্ এস. শিলে (Carl S. Scheele)-কে দেওয়া হয়, তবে মনে হয় তিনি এবং তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীগণ একে ফ্লুরোস্পারের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বিবেচনা করতেন। অ্যাসিডটির আসল রূপ উনিশ শতকের আগে কেউ বুঝতে পারেন নি। ফ্লুরোস্পারের অজানা মৌলটিকে শনাক্ত করার জন্য ফ্রান্সের এদ্‌মঁ ফ্রেমি (Edmond Fremy) এবং ইংল্যাণ্ডের জর্জ্ গোর্ (George Gore) ইলেক্ট্রোলাইসিস্ করার চেষ্টা করেন। অবশেষে ১৮৮৬ সালে ফ্রেমির ছাত্র অঁরি মোয়াসঁ (Henry Moissan) এ কাজে সফল হন।

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের মধ্যে প্রচুর ফ্লুরিন বর্তমান। কিন্তু এটা অত্যন্ত সক্রিয় মৌল হওয়ায় বিশুদ্ধ অবস্থায় একে পাওয়া যায় না। সাগর (দ্র), নদী (দ্র), হ্রদ (দ্র)ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উৎসজাত পানি (দ্র), হাড়, দাঁত, রক্ত (দ্র) এবং সকল উদ্ভিদে ফ্লুরিন রয়েছে। প্রকৃতিতে ফ্লুরিনের প্রধান উৎস ফ্লুরোস্পার (CaF_2) বা ফ্লুরাইট, ক্রায়োলাইট (Na_3AlF_6) এবং ফ্লুরো-অ্যাপাটাইট [$CaF_2 . 3Ca_3(PO_4)_2$]। ইলিনয় এবং কেন্টাকিতে প্রচুর ফ্লুরোস্পার পাওয়া যায়। গ্রিনল্যাণ্ড এবং আইসল্যাণ্ডে প্রচুর ক্রায়োলাইট পাওয়া যায়।

ফ্লুরিন দ্বিপারমাণবিক গ্যাসরূপে বিরাজ করে। ফ্লুরিন-পরমাণুর বাইরের অক্ষে ৭টি ইলেক্ট্রন (দ্র) থাকে এবং স্থিতিশীলতার জন্য এর আরো একটি ইলেক্ট্রন প্রয়োজন। এ জন্য ফ্লুরিনের যোজ্যতা −১। এটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস (দ্র) (হিলিয়াম, নিওন, আর্গন) ছাড়া আর সকল মৌলের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে। ফ্লুরিনের লবণকে ফ্লুরাইড বলা হয়।

পটাসিয়াম ফ্লুরাইড এবং হাইড্রোজেন ফ্লুরাইডের মিশ্রণকে ইলেক্ট্রোলাইসিস্ করে ফ্লুরিন তৈরি করা হয়। বিশেষ ধরনের ইস্পাতনির্মিত কিংবা টেফলনের আস্তরণযুক্ত পাত্রে একে জমা রাখা হয়।

১৯২০-এর দশকে আমেরিকার জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন প্রথম প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফ্লুরিনযুক্ত যৌগ ব্যবহার শুরু করে। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CCl_2F_2) উদ্ভাবনের ফলে এর আরো প্রসার ঘটে। কারণ ক্লোরোফ্লুরোকার্বন দাহ্য নয়, ক্ষয়কারক নয় এবং বিষাক্ত নয়। এটা সহজে গলে এবং কম তাপমাত্রায় ফোটে। শিগগিরই অ্যারোসোল প্রপেল্যান্টে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ব্যবহার করা হতে থাকে। ১৯৭৭ সালের পর থেকে এর ব্যবহার কমে যায়। কারণ এটা বায়ুমণ্ডলের ওজোন (দ্র) স্তরের ক্ষয়সাধন করে। ফলে অনেক দেশ শীতক এবং প্রপেল্যান্টরূপে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) টেট্রাফ্লুরোইথিলিন-এর পলিমার টেফলন (teflon) আবিষ্কারের পর থেকে ফ্লুরিনের চাহিদা প্রচুর বেড়ে গেছে। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির জন্য দরকারী ইউরেনিয়াম আইসোটোপ আলাদা করার জন্যও ফ্লুরিনের দরকার হয়।

জীবাণুনাশক ও কীটনাশক (দ্র)-রূপে এবং বাংলাদেশে ওয়াসার পানিতে মেশানোর জন্য সোডিয়াম ফ্লুরাইড ব্যবহার করা হয়।. সোডিয়াম ফ্লুরাইড চিত্রকর্ম সংরক্ষণের জন্য যেমন কাজে লাগে, তেমনই দন্তক্ষয় (দ্র)-রোধের জন্যও এটা প্রয়োজনীয়।

সা. এ.

ফ্লাইং সসার ইউ এফ ও দ্র

ফ্লেমিং, আলেক্‌জাণ্ডার [১৮৮১—১৯৫৫]

আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং (Sir Alexander Fleming) ছিলেন স্কটল্যাণ্ডনিবাসী চিকিৎসক ও জীবাণুতত্ত্ববিদ। তিনি সর্বপ্রথম জীবাণুনাশক পেনিসিলিন (দ্র) আবিষ্কার করে খ্যাতিমান হয়ে আছেন।

আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিংয়ের জন্ম ১৮৮১ সালের ৬ই আগস্ট একটি কৃষকপরিবারে। তিনি ১৯০৬ সালে সেন্ট মরিস হাসপাতাল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। চিকিৎসক হলেও জীবাণুতত্ত্বের দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল সবচাইতে বেশি। তাই জীবাণু (দ্র) সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি সারা জীবন গবেষণা করে গেছেন। ১৯২৮ সালে তিনি আবিষ্কার করেন বিশেষ এক ধরনের ছত্রাকে জীবন-রক্ষাকারী পেনিসিলিনের অস্তিত্ব।

আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন আকস্মিক এক ঘটনাক্রমে। স্ট্যাফাইলোকক্কাস (staphylococcus) নামক জীবাণু নিয়ে কাজ করতে গিয়েই তিনি

www.pathagar.com

এমন এক ধরনের ছত্রাকের সন্ধান পান, যার জীবাণুনাশক ক্ষমতা রয়েছে। ছত্রাকটির নাম 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম' (penicillium notatum)।

আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং সর্বপ্রথম পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেও একে মানবদেহে ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় নিয়ে আসেন দু'জন বিজ্ঞানী—হাওয়ার্ড ফ্লোরি (Sir Howard Walter Florey : ১৮৯৮–১৯৬৮) ও আর্নস্ট্ চেইন (Ernst Boris Chain : ১৯০৬–১৯৭৯)। ১৯৩৮ সালে এঁরা পেনিসিলিনের নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধীকরণের কাজ সম্পন্ন করেন। ফলে এ দু'জন বিজ্ঞানী ও আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং-এর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ১৯৪৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। পেনিসিলিন আবিষ্কার ছিল চিকিৎসাজগতের জন্য এক নতুন দিগন্তের সন্ধান।

আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং নোবেল পুরস্কার ছাড়াও তাঁর গবেষণাকর্মের জন্য পেয়েছিলেন আরো স্বীকৃতি ও সম্মান। ১৯৪৩ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৪ সালে নাইট (Knight) উপাধিতে ভূষিত হন।

স্যার আলেক্‌জাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯৫৫ সালের ১১ই মার্চ লণ্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

সি. না. হ.

ফ্লোবের্, গুস্তাভ্ [১৮২১—১৮৮০]

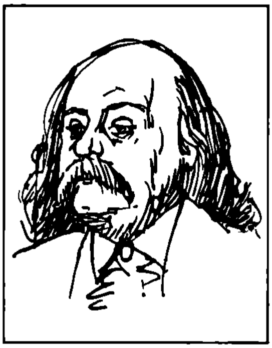

বিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক ফ্লোবের্ (Gustave Flaubert) ১৮২১ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক জন শল্যচিকিৎসক।

প্যারিসে (দ্র) আইন অধ্যয়নকালে গুস্তাভ্ ফ্লোবেরের সঙ্গে তৎকালীন রোম্যান্টিক লেখকগোষ্ঠীর পরিচয় ঘটে এবং অচিরকালের মধ্যে তিনি মহান ফরাসি লেখক ভিক্তর্ উগোর (দ্র) ভক্ত হয়ে ওঠেন।

১৮৪৩ সালে ফ্লোবের্ স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হন। নিরাময়ের জন্য তিনি ক্রোয়াসে (Croisset) নামে তাঁর গ্রামের বাড়িতে বিশ্রাম লাভের জন্য যান। এই সময় একঘেয়ে ক্লান্তিকর জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য তিনি গভীরভাবে সাহিত্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

ফ্লোবেরের খুব একটা ভ্রমণের শখ ছিল না। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় ক্রোয়াসেতে এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মনোবিজ্ঞানে প্রাণিবিজ্ঞানের মতো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা এবং যে নিয়মে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, সেটা আবিষ্কার করাই ছিল তাঁর সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে নিরপেক্ষ করতে চাইতেন। তিনি উপন্যাস রচনার আগে চরিত্রকে বস্তুনিষ্ঠ করার তাগিদে আবশ্যক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে ব্যাপক গবেষণাকাজে লিপ্ত হতেন। তবে নিরপেক্ষতার দাবি সত্ত্বেও তাঁর অধিকাংশ রচনার ভিতর দিয়ে ফরাসি বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণীর প্রতি তাঁর ঘৃণাই প্রকাশ পেয়েছে।

গুস্তাভ্ ফ্লোবেরের সাহিত্যিক আদর্শ ছিল অতীব শৃঙ্খলাপূর্ণ ও কঠোর। কোনো সাহিত্যকর্মে আঙ্গিককেই তিনি চূড়ান্ত জ্ঞান করতেন। বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনে তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কথা সুবিদিত। তাই বিশ্বসাহিত্যের নিপুণ গদ্যশিল্পী হিসাবে তিনি অসামান্য মর্যাদার অধিকারী। ফরাসি ও বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল লেখক গী দ্য মোপাসাঁর (দ্র) সাহিত্যগুরু হিসাবেও তিনি সমধিক খ্যাত।

তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মাদাম বোভারি', 'সালাম্বো' এবং 'লেদুকাসিঅঁ সঁতিমন্তাল্' (অর্থাৎ সেন্টিমেন্টাল এডুকেশন) ইত্যাদি। এ ছাড়া কিছু নাটক ও ছোটগল্পেরও রচয়িতা তিনি।

গুস্তাভ্ ফ্লোবের ১৮৮০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

ফ্লোরেন্টাইন শিল্পকলা

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে (দ্র) যে রেনেসাঁস (দ্র) বা পুনর্জাগরণ ঘটে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে, তার প্রাণকেন্দ্র ছিল ইতালি। ইতালির কেন্দ্রে অবস্থিত ফ্লোরেন্স নগরীতেই এই রেনেসাঁসের সর্বাধিক তোড়জোড় দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে শিল্পকলার ক্ষেত্রটিতে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল এই ফ্লোরেন্সকে কেন্দ্র করে। এত বেশি

www.pathagar.com

ইতালীয় রেনেসাঁর অন্যতম প্রধান শিল্পী জত্তোর একটি শিল্পকর্ম

ক্ষেত্রটিকে তাই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা ও স্মরণ করা হয়ে থাকে। ঐ শিল্পসম্ভারকে এক কথায় 'ফ্লোরেন্টাইন স্কুল অফ আর্ট' বলা হয়ে থাকে। ফ্লোরেন্টাইন চিত্রশিল্প তারই প্রধান অংশ। পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পস্রষ্টা লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (দ্র), যাঁকে পৃথিবীর মহামানবদের এক জন হিসাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে এবং বিখ্যাত 'মোনা লিসা' (দ্র) ছবিটির যিনি স্রষ্টা, তাঁর জন্ম ফ্লোরেন্সের ভিঞ্চি নামক স্থানে। শিল্পজগতের আরেক জন শক্তিমান পুরুষ হলেন মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনারোতি (দ্র) যিনি একাধারে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর, সিস্তিন চ্যাপেলের ছাদে অঙ্কিত দেয়ালচিত্র যাঁর অসাধারণ কীর্তি, তিনিও ফ্লোরেন্টাইন এলাকার ক্যাপ্রেসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ফ্লোরেন্টাইন শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন সেই কালেরই এক জন শিল্পবোদ্ধা ও সমালোচক জিওর্জো ভাসারি (Giorgio Vasari : ১৫১১–১৫৭৪)। ফ্লোরেন্স ও রোমে তিনি তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেন চিত্রশিল্পী হিসাবেও। তবে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের বিষয়ে নানা তথ্যের আকরগ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে।

প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র ফ্লোরেন্স ১৩৪৩ সাল থেকে শিল্পকলায় সাফল্যের পথে যাত্রা শুরু করে। সেখানকার ব্যবসায়ী ও

সংখ্যক চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর অর্থাৎ চারুশিল্পীকে একসঙ্গে আর কোথাও এভাবে সমবেত হয়ে কাজ করতে দেখা যায় নি। শিল্পকলার ইতিহাসে ফ্লোরেন্স নগরীর শিল্পচর্চার

ফ্লোরেন্টাইন শিল্পধারার স্মরণীয় শিল্পী ফ্রা এনজেলিকোর একটি শিল্পকর্ম

www.pathagar.com

ধনিক সম্প্রদায় শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে প্রথম থেকেই। আর সেখানে প্রচলিত গতানুগতিক পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে শিল্পকর্মীরা রেনেসাঁসের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদ্ভাবন করেন এক গতিশীল মানবতাবাদী শিল্পধারা।

স্মরণীয় প্রধান চিত্রশিল্পীরা হলেন গিয়োতো বা জত্তো (Giotto : ১২৭৬-১৩৩৭), ফ্রা এনজেলিকো (Fra Angellico : ১৪০০-১৪৫৫), মাজাচ্চো (Masaccio : ১৪০১-১৪২৮), পিয়েরো দেল্লা ফ্রাঞ্চেস্কা (Piero Della Francesca : ১৪১৬-১৪৯২), ও সান্দ্রো বত্তিচেল্লি (Sandro Botticelli : ১৪৪৪/৫-১৫১০) প্রমুখ।

রেনেসাঁসের সামগ্রিক সাফল্যের পেছনে ফ্লোরেন্টাইন চিত্রকলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ম. আ.

ফ্লোয়েম্ (phloem)

উদ্ভিদদেহের অন্যতম জটিল কলা। প্রজাতিভেদে বিভিন্ন উদ্ভিদে (দ্র)-এর উপাদানগুলো বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এর উপাদানসংখ্যা চারটি। সেগুলো হচ্ছে সীভ্ নল, সঙ্গিকোষ, ফ্লোয়েম্ প্যারেন্কাইমা ও বাস্ট তন্তু। সকল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এ উপাদানগুলো একত্রে

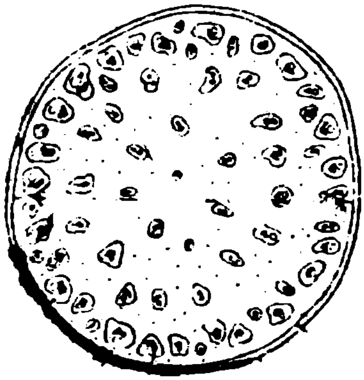

থাকে না। নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও টেরিডোফাইট্ (দ্র)-এর ফ্লোয়েমে কেবল সীভ্ নল্ ও ফ্লোয়েম থাকে। তবে একবীজপত্রী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে সীভ্ নল্ ও সঙ্গিকোষ থাকে।

ক. সীভ্ নল্ : এটি বিশেষ এক ধরনের নল। এক সারি লম্বা ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত সজীব কোষের প্রস্থের প্রাচীরের বিলুপ্তির কোষপ্রাচীরটি চালুনির মতো ছিদ্রযুক্ত হয় বলে একে সীভ্ প্লেট্ বলা হয়। নগ্নবীজী উদ্ভিদ ও টেরিডোফাইটের ক্ষেত্রে সীভ্ প্লেট্গুলো পার্শ্ববর্তী প্রাচীরেও দেখতে পাওয়া যায় এবং কখনো কখনো বাঁকাভাবে থাকে।

প্রতিটি সীভ্ নলে একটি করে সুস্পষ্ট কেন্দ্রস্থিত ভ্যাকিউল্ ও বাইরের দিকের সাইটোপ্লাজ্ম্-এর পারস্পরিক সংযোগ স্থাপিত হয়। কোষরসে প্রোটিন দ্রবীভূত থেকে সীভ্ নলকে আঠালো করে। পাতা থেকে তৈরি কার্বোহাইড্রেট (দ্র) ও প্রোটিন কাণ্ডের ভিতর দিয়ে মূলে ও অন্যান্য অংশে পরিচালিত করা সীভ্ নলের প্রধান কাজ।

মাঝে মধ্যে ক্যালাস্ ও ক্যালাস্ প্যাড্ নামক এক ধরনের বর্ণহীন, উজ্জ্বল, কেলাসিত কার্বোহাইড্রেট পদার্থ সীভ্ প্লেটের উপর জমা হয়ে সীভ নলের কাজ সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্যালাস্ স্থায়ীভাবে সীভ্ নলের কাজ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য সাময়িকভাবে বন্ধ হলে তা দ্রবীভূত হয় এবং সীভ্ নল আবার কার্যকর হওয়ার সুযোগ পায়।

খ. সঙ্গিকোষ : সীভ্ নলের সঙ্গে দীর্ঘ সামঞ্জস্যহীন ও বিশেষ ধরনের প্যারেন্কাইমা কোষের নাম সঙ্গিকোষ। প্রত্যেক সঙ্গিকোষের ভেতরে দানাদার সাইটোপ্লাজ্ম্, ছোট আকারের ভ্যাকিউল্ ও একটি সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস্ থাকে। তবে এতে কখনোই কোনো স্টার্চদানা থাকে না। সব রকম আবৃতবীজী উদ্ভিদে সঙ্গিকোষ আছে, তবে নগ্নবীজী উদ্ভিদে ও টেরিডোফাইট্-এ তা নেই। সীভ্ নলকে খাদ্য সংবহনে সহায়তা করাই এর কাজ বলে মনে করা হয়।

গ. ফ্লোয়েম্ প্যারেন্কাইমা : এর কোষগুলো আদি ক্যাম্বিয়াম্ থেকে গঠিত হওয়ার সময় খাড়াভাবে এবং পরে বিস্তারের দিকে বাড়ে। এর প্রধান কাজ শর্করা ও ব্যাপ্তিশীল প্রোটিন সংবহন করা, সঞ্চার করা এবং সীভ্ নল থেকে মজ্জাংশ ও জাইলেম্ প্যারেন্কাইমায় খাদ্য সংবহন করা।

গ. বাস্ট্ তন্তু : এ ধরনের উপাদান সাধারণত আবৃতবীজী উদ্ভিদের গৌণ ফ্লোয়েমে থাকে। টেরিডোফাইট-এ, কিছু নগ্নবীজী উদ্ভিদে এবং কিছু কোমল কাণ্ডের আবৃতবীজী উদ্ভিদে বাস্ট্ তন্তু থাকে না।

মু. আ.

www.pathagar.com

ব

বক (heron)

বকের প্রজাতি-উপপ্রজাতি হচ্ছে ৬৪ রকমের। বিশ্বের সবচেয়ে বড় হচ্ছে ধূসর বক (গ্রে হেরন)—৯০ সেন্টিমিটার। ছোট হচ্ছে ক্ষুদে বক (লিট্‌ল হেরন)— ৩৫ সেন্টিমিটার। বকের বৈজ্ঞানিক নাম *Ardeidae*। বকের লম্বা পা, লম্বা ঘাড়, লম্বা ও তীক্ষ্ণধার ঠোঁট। দেহও লম্বা। লম্বাটে লেজ।

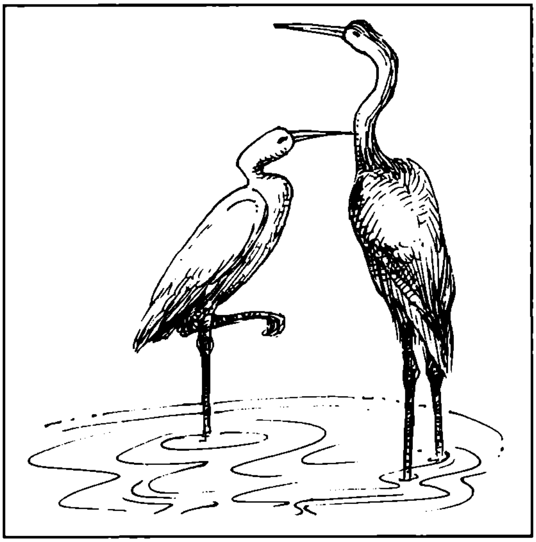

উজ্জ্বল চোখ। লাল-হলুদ পা। অনেকের বাহারি পালক ও ঝুঁটি হয়।

বক প্রায় ক্ষেত্রেই সাদা, বাদামি, ফিকে হলুদ, সবুজ, পিঙ্গল ইত্যাদি রঙের হয়।

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নলঘোঙা (বিটার্ন : bittern), নিশি বক (নাইট হেরন), গো বক (ক্যাট্‌ল্ ইগরেট : cattle egret), বেগুনি বক (পার্পল্ হেরন) ও কাণি বক (পণ্ড হেরন)।

বক মাছ (দ্র), সাপ (দ্র), ব্যাঙ (দ্র), পোকা-মাকড়, গবাদিপশুর পরজীবী (দ্র) কীট, কেঁচো (দ্র) ইত্যাদি খায়। শিকারের জন্য জলের কিনারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। নিশি বক নিশাচর।

বকেরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে। অনেকে কলোনির মতো বাসা করে। ইংরেজি 'V' আকারে দলবদ্ধভাবে ওড়ে। চাপা মাথা। মাথা গুঁজে ওড়ে। বাসার উপাদান ডালপালা। ৩/৪টি ডিম হয়। বাচ্চারা একে অপরকে ঠুক্‌রিয়ে অনেক সময় অন্ধ করে দেয়। অনেকে শীতে পরিযায়ী বা দেশান্তরী হয়। ৮–১৫ বছর বাঁচে।

বাংলাদেশের (দ্র) উল্লেখযোগ্য বক হচ্ছে কাণি বক, ধূসর বক, বেগুনি বক ও নিশি বক।

শ. খা.

বক্সা দুর্গ

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামীদের বন্দি করে রাখার জন্য একটি বন্দিশালা।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৯০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত এই বক্সা দুর্গকে ১৮৮২ সাল নাগাদ পরিণত করা হয় ইংরেজদের একটি সেনানিবাসে, ব্যবহৃত হতে থাকে সীমান্ত প্রহরার কাজে। ১৯৩০-এর দশকে ইংরেজবিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে বাংলার বিপজ্জনক বন্দিদের এখানে আটক করে রাখার জন্য বক্সা সেনানিবাসকে একটি সৈন্যপরিবেষ্টিত সুরক্ষিত কারাগারে পরিণত করা হয়।

বিভিন্ন সময়ে এখানে যাঁদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ (দ্র), অরুণ গুহ, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, অনিল রায়, মেজর সত্যগুপ্ত এবং ভূপতি মজুমদার প্রমুখ। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে যাবতীয় ভীতি উপেক্ষা করে বন্দি বিপ্লবীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) জন্মজয়ন্তী পালন করেছিলেন এই বক্সা দুর্গে।

বর্তমানে এই বন্দিশালাটি পরিত্যক্ত, ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

আ. হু.

বক্সার বিদ্রোহ

১৮৯৯ ও ১৯০০ সালে বিদেশীদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের পরিচালিত আন্দোলনই বক্সার বিদ্রোহ নামে পরিচিত। চীনের একটি গুপ্ত সমিতি এই আন্দোলনের সংগঠক। চীনা

www.pathagar.com

বন্দি বক্সার বিদ্রোহী

ভাষায় এর নাম ই-হো-চুয়ান।

চীনের বন্দরগুলোর ওপর বিদেশী রাষ্ট্রের দখল প্রতিষ্ঠা, চীনে বিদেশীদের রেলপথ নির্মাণের অধিকার লাভ, সর্বত্র মিশনারিদের জোরজবরদস্তি কায়েম ইত্যাদি কারণে বিদেশীদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে চীনের জনগণ বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ে। 'সাম্রাজ্য রক্ষা করো, বিদেশীদের খতম করো' এই ছিল তাদের স্লোগান।

শানতুং প্রদেশে প্রথম বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। বিদ্রোহীদের দেশপ্রেম দেখে কিছু উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার তাদের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানান। আন্দোলনের এক পর্যায়ে বিদ্রোহীদের হাতে এক জন জার্মান মন্ত্রী নিহত হন। বিদ্রোহীরা পিকিং অবরোধ করে রাখে। বিদেশী শক্তিগুলোর মিলিত বাহিনী পিকিং-এ অবস্থিত বিদেশী দূতাবাস রক্ষার জন্য অগ্রসর হলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। অ্যাডমিরাল সিমুর-এর নেতৃত্বে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর বিদেশী সৈন্যবাহিনী পিকিং অধিকার করে এবং অবরুদ্ধ বিদেশীদের মুক্ত করে। ১৯০১ সালে বক্সার প্রোটোকল নামে একটি চুক্তির মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। তবে চুক্তির শর্তানুযায়ী চীন সরকারকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয় এবং ৩৩ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

সুজ. ব.

বখতিয়ার খলজি [? —১২০৬]

পুরো নাম ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার ছিলেন জাতিতে তুর্কি এবং বংশে খলজি। তাঁর জন্মভূমি আফগানিস্তান। ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভারতে (দ্র) আসেন এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা হুশামউদ্দিনের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে হুশামউদ্দিন তাঁকে ভগবৎ ও ভুঁইলি নামক দু'টি পরগণার জায়গির প্রদান করেন। এখানে থেকে তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর সাহায্যে ১১৯৯ সালে তিনি বিহার (দ্র) জয় করেন।

এ সময় বাংলার রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজধানী ছিল গৌড় (দ্র)। কিন্তু তিনি থাকতেন নদীয়া বা নবদ্বীপে।

ইতিহাসবিদ মিনহাজ-ই সিরাজের মতে বখতিয়ার খলজি সোজা পথে না গিয়ে ছোটনাগপুরের দুর্গম পাহাড়ি পথ ধরে নদীয়ায় প্রবেশ করেন এবং মাত্র ১৭ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে (১২০১ খ্রি. মতান্তরে ১২০৩ খ্রি.) নদীয়া জয় করেন। মূল বাহিনী তখন পেছনে।

রাজা লক্ষ্মণ সেন এই আকস্মিক আক্রমণে ভয় পেয়ে প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। এরপর বখতিয়ার গৌড় অধিকার করেন। এভাবে বঙ্গদেশে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গদেশ জয়ের পর বখতিয়ার খলজি তিব্বত অভিযান শুরু করেন। তাঁর এই অভিযান ব্যর্থ হয়। কিছুদিন পর রোগাক্রান্ত হয়ে দিনাজপুর জেলার দেবকোট নামক স্থানে ১২০৬ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

খু. জা.

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮—১৮৯৪]

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের (দ্র) সবচাইতে উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

সাহিত্যিক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বাংলা উপন্যাসের (দ্র) প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তা ছাড়া তিনি এক জন অসাধারণ গদ্যশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। শুধু সাহিত্যিক হিসাবেই নয়, এক জন মনীষী ও চিন্তাবিদ হিসাবেও তাঁর উচ্চ খ্যাতি রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ সালের ২৬শে জুন তারিখে (বাংলা ১৩ই আষাঢ় ১২৪৫) চব্বিশ পরগণায় কাঁটালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দুর্গাসুন্দরী তাঁর মা। যাদবচন্দ্র ছিলেন এক জন ডেপুটি কালেক্টর। বঙ্কিমেরা চার ভাই—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র (দ্র), বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র যাদবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। ছোটবেলা থেকে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। গ্রামের গুরু মহাশয়ের কাছে তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। ছয় বছর বয়সে তিনি পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুর আসেন এবং মেদিনীপুর ইংরেজি স্কুলে পড়েন। ১৮৪৯ সালে এগারো বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি মহসীন কলেজে ভর্তি হন এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়াশোনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে পুরস্কার ও বৃত্তি পান। ১৮৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে আইন পড়ার জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) ভর্তি হন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ঐ বছরই এন্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষার সূচনা করে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এর পরের বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বারের মতো বি. এ. পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। বঙ্কিমচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং যথারীতি পাশ করেন। তেরো জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র দু'জন পাশ করেছিলেন— বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হয়েছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ বি. এ.। শুধু বাঙালিদের মধ্যে কেন, সারা ভারতবর্ষে তিনি হলেন প্রথম গ্র্যাজুয়েট। এ এক অনন্য ঐতিহাসিক সম্মান। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র সরকারি চাকুরি পেয়ে যান। ১৮৫৮ সালের ৬ই আগস্ট তিনি বাংলা সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। তেত্রিশ বছর চাকুরি করে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরিজীবনে তিনি বাংলা সরকারের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছিলেন। সে আমলে বাঙালিদের (দ্র) মধ্যে এত উঁচু পদে কেউ ওঠেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের সবাই উঁচু পদে চাকুরি করতেন, পিতা ও অপর ভাইয়েরা প্রত্যেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আমলা হিসাবে কাজ করেছেন। বিচারকাজে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠার সুনাম ছিল। কারো সঙ্গে আপস করেন নি, কাউকে খাতিরও করেন নি। এ কারণে ওপরওয়ালা ইংরেজ প্রশাসকদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। তিনি শাসক ইংরেজদের দেখতে পারতেন না। তবু, কর্মদক্ষতার জন্য তিনি রায় বাহাদুর ও সি-আই-ই (C.I.E= Companion of the Order of the Indian Fmpire) এ দুটো সরকারি খেতাব পেয়েছিলেন।

সেকালের রীতি অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র এগারো বছর বয়সে এক পাঁচ বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর প্রথম স্ত্রী মোহিনী মারা যাওয়াতে ১৮৬০ সালে বাইশ বছর বয়সে বঙ্কিম আবার বিয়ে করেন। বঙ্কিমের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম রাজলক্ষ্মী দেবী। বঙ্কিমের তিন মেয়ে, তাঁদের কোনো পুত্র ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর ডায়াবেটিস (দ্র) রোগ হয়েছিল। সে আমলে এ রোগের তেমন কোনো ঔষধ ছিল না। এ রোগ খুব বেড়ে যাওয়ার কারণে ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় নিজের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মারা যান।

বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চপদস্থ আমলা ছিলেন বটে, কিন্তু সবাই তাঁকে চেনেন এক জন অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক হিসাবে। তাঁর কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক ঋণ। বাংলা ভাষা যে একটি অতি শক্তিশালী ভাষা এবং সকল ভাব প্রকাশের উপযোগী, সেটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখনী দ্বারা বুঝিয়ে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তিনি খুব ভালভাবে পড়েছিলেন।

www.pathagar.com

এই পড়াশোনা মাতৃভাষার সেবায় কাজে লাগল। হুগলি কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (দ্র) ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর আরেক বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের (দ্র) সঙ্গে কবিতাপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনি জয়ীও হন। বড় হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে গদ্য লেখায় মনোযোগী হন। তবু বঙ্কিমের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হল একটি কাব্য, নাম 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' (১৮৫৬)। তিনি Rajmohan's Wife নামে একটি ইংরেজি উপন্যাস লেখেন (১৮৬৪)। এর পরই তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিই বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ছড়িয়ে দেয়। এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনাকৌশলের অনেক প্রশংসা হয়। প্রকৃত বিচারে এটি প্রথম বাংলা উপন্যাস। এর আগে প্যারীচাঁদ মিত্রের (দ্র) 'আলালের ঘরের দুলাল' বেরিয়েছে (১৮৫৮), কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল'কে সার্থক উপন্যাস বলা যায় না। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর বঙ্কিমচন্দ্র একে একে আরো উপন্যাস রচনা করেন। তিনি চৌদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' ছাড়া তাঁর অন্য উপন্যাসগুলোর নাম : 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৭), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' ১৮৮৭)।

আমাদের দেশে উপন্যাস ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রই উপন্যাসের জন্মদাতা। ইংরেজি নভেলের আদর্শে তিনি বাংলা উপন্যাস লেখেন। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসে ইতিহাসের কাহিনী আছে। তবে ইতিহাসের ঘটনা নয়, মানুষের কথাই লিখেছেন তিনি। সমকালীন সমস্যার কথাও তাঁর উপন্যাসে আছে, আর আছে দেশভক্তি। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'বন্দে মাতরম্' গানটি আছে।

উপন্যাস ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখে গেছেন। সেগুলির মধ্যে আছে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, সমালোচনা, ব্যঙ্গরচনা, সমাজ ও ধর্মবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা, জীবনী ইত্যাদি। এই সব রচনায় বঙ্কিমের জ্ঞান, মনীষা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমের কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম : 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬), 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' (১৮৭৭), 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৮৯), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ ১৮৭৭, ২য় ভাগ ১৮৯২), 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক দৃষ্টি দিয়ে হিন্দুধর্মের (দ্র) ব্যাখ্যা করেন। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী লেখক। তাঁকে হিতবাদী লেখকও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ সাহিত্যরচনা জাতি ও মানুষের মঙ্গলের জন্য— এই আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ইউরোপের (দ্র) তিন দার্শনিক মিল (দ্র), বেন্থাম্ (দ্র) ও কোঁৎ (দ্র)-এর অনুসারী ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র একটি বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটির নাম 'বঙ্গদর্শন'। ১৮৭২ সালে এই পত্রিকা বের হয়। ইংরেজিশিক্ষিত আধুনিক বাঙালি লেখকেরা এই পত্রিকায় লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও নিয়মিত লিখতেন এই পত্রিকায়। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য গঠনে এই পত্রিকার অবদান অনেক।

বাংলা উপন্যাসের জন্য, গদ্যরীতির জন্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ছোটদের জন্য তিনি খুব সুন্দর একটি রচনাবইও লিখে গেছেন। বইটির নাম 'সহজ রচনা শিক্ষা'।

আ. ক.

বঙ্গদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্র

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন [১৯০৫—১৯১১]

বঙ্গভঙ্গকে রদ করার যে আন্দোলন হয়েছিল তারই নাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

ভারতের (দ্র) বড়লাট লর্ড কার্জন (দ্র) ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য এর পেছনে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্তর- ও পূর্ব- বাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে এক নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। নতুন প্রদেশের রাজধানী নির্দিষ্ট হয় ঢাকায় (দ্র)। মোগল আমলে

www.pathagar.com

লর্ড কার্জন

ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হবার প্রায় দুই শত বছর পর ঢাকা আবার রাজধানী শহরে পরিণত হবার সুযোগ পেল।

ইতিপূর্বে কলিকাতা (দ্র) বাংলাদেশের রাজধানী থাকায় পূর্ব-বাংলা বরাবরই অবহেলিত থেকেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই এলাকার মানুষ অনুন্নত থেকেছে। তাই বঙ্গভঙ্গের ফলে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষা, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার আশায় বঙ্গবিভাগকে স্বাগত জানায়।

কিন্তু কলিকাতার অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গবিভাগকে মেনে নেয় নি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (দ্র) উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। অপর দিকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণ ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র (দ্র) নেতৃত্বে নবগঠিত প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত টিকিয়ে রাখার জন্য আন্দোলন চালাতে থাকে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলন এতই জোরালো হয়ে ওঠে যে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করে।

বিযুক্ত বাংলা আবার জোড়া লাগে বটে, কিন্তু অবিকল পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় না।

কা. ম.

বঙ্গাব্দ অব্দ দ্র

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা

১৯১৮ সালের ১৬ই জুন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র হিসাবে 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' আত্মপ্রকাশ করে। ৪৭/২ মির্জাপুর স্ট্রিট, কলিকাতা (দ্র) থেকে প্রকাশিত এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (দ্র) এবং মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। প্রথম সংখ্যার প্রকাশক ছিলেন আবু লোহানী। মেটকাফ প্রেস থেকে এই পত্রিকা মুদ্রণের দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণচৈতন্য দাস। পত্রিকার দাম রাখা হয়েছিল ছ' আনা এবং এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮০। প্রথম সংখ্যা ১০০০ কপি ছাপা হয়। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন শাহাদাৎ হোসেন এবং তৃতীয় সংখ্যাতেই প্রকাশক হন কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ (দ্র)। তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকা প্রকাশের ভার নেন ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা থেকে প্রকাশস্থল সরে আসে ৩২ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতায়। পত্রিকাটি পাঠকমহলে এমন সাড়া জাগায় যে প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার ১৫০০ কপি বিক্রি হয়ে গেলে ১৯১৮ সালের ১০ই এপ্রিল এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাতে হয়। প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা থেকে অবশ্য ২০০০ কপি করে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার মুদ্রণসংখ্যা ২২০০-তে উঠলেও তৃতীয় বর্ষ থেকে পত্রিকার সার্কুলেশন ১০০০-এ নেমে আসে। পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

থেকে পত্রিকার মুদ্রণসংখ্যা ৪০০ থেকে ৬০০-র মধ্যে ওঠা-নামা করেছে। 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার দাম ছিল ৮ আনা বা পঞ্চাশ পয়সা। চতুর্থ সংখ্যার দাম ১২ আনা বা ৭৫ পয়সা। দ্বিতীয় বর্ষে এর দাম হয় ছ' আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে দাম আবার দু' আনা বেড়ে আট আনা হয়, পঞ্চম বর্ষে আবার ছ' আনা হয়।

www.pathagar.com

সমিতির সদস্যদের জন্য পত্রিকার বার্ষিক মূল্য প্রথমে ছিল এক টাকা। তৃতীয় বর্ষ থেকে তা বিনামূল্যে দেওয়া শুরু হয়। ১৯২১ সালের জুন মাসে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) যোগ দিলে পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ থেকে সম্পাদনার ভার পড়ে মোজাম্মেল হকের ওপর। ১৯২৩ সালের ১লা নভেম্বর ৬ষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের পর 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' বন্ধ হয়ে যায়।

আ. কা.

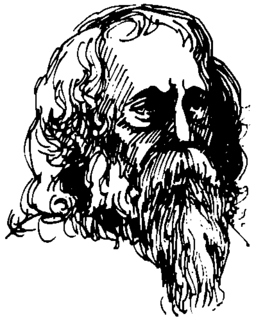

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

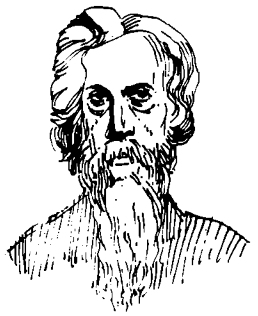

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বাংলা সাহিত্যের (দ্র) উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ সালে এল. লিউটার্ড ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর উদ্যোগে 'বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচার' স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে প্রতি রবিবারে এবং পরে পাক্ষিক ভিত্তিতে একাডেমীর সভা অনুষ্ঠিত হত। সভার নামই শুধু নয়, কার্যবিবরণীও ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ হত এবং 'দ্য বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচার' নামে একাডেমীর মুখপত্রের অধিকাংশ রচনাও ছিল ইংরেজি ভাষায় লেখা। একাডেমীর কার্যক্রমে ইংরেজিবাহুল্যে কোনো কোনো সদস্য আপত্তি প্রকাশ করেন এবং উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবানুসারে একাডেমীর নামে পরিবর্তন ঘটিয়ে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' করা হয়। তবে একাডেমীর মুখপত্র 'দ্য বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচার' এবং 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' এই দুই নামেই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৯৯—১৯০০ সালে একাডেমীর ৩৪৮ জন সদস্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), রজনীকান্ত গুপ্ত (দ্র), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (দ্র), নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (দ্র) প্রমুখ ছিলেন।

বাংলা ভাষার (দ্র) সমৃদ্ধির ইতিহাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষার বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা, সংস্কৃত, আরবি ও ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ পরিষদের অন্যতম অবদান। এ ছাড়াও দুর্লভ বাংলা রচনা, সাহিত্য ও গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ পরিষদের নিয়মিত কর্মসূচিরই অঙ্গ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'বাংলা শব্দকোষ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (দ্র) 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ও 'সাহিত্য-সাধক- চরিতমালা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত প্রকাশনা 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় পরিভাষাসহ বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বহু অসাধারণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় প্রাচীন মুদ্রা, পাথর এবং ধাতুমূর্তি, তাম্রশাসন, প্রাচীন চিত্র, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তলিপি, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, পাণ্ডুলিপি এবং প্রাচীন দলিল সংরক্ষিত আছে।

সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (দ্র), রমেশচন্দ্র দত্ত (দ্র), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (দ্র), বিনয়কৃষ্ণ

www.pathagar.com

দেব, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমসুন্দর বসু ও যতীন্দ্রনাথ পালের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ ছাড়াও দুর্লভ প্রাচীনগ্রন্থাবলির সংগ্রহ রয়েছে। পুঁথিশালায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের একমাত্র পুঁথিটি এবং তিব্বতী তাঞ্জুর (দ্র) ও কাঞ্জুর গ্রন্থমালার পুঁথিসহ প্রায় সাত হাজার পুঁথি রয়েছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নিজস্ব তহবিল থেকে গ্রন্থ প্রকাশ, পদক ও পুরস্কার প্রদান এবং দুস্থ সাহিত্যিকদের অর্থসাহায্য প্রদান করে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে।

মে. খা.

বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal)

ভারত মহাসাগরেরই (দ্র) একটি অংশ। এর উত্তরে বাংলাদেশ (দ্র) ও ভারত (দ্র), পশ্চিমে ভারত ও শ্রীলঙ্কা (দ্র), দক্ষিণে ভারত মহাসাগর (দ্র) এবং পূর্বে বার্মা (মায়ানমার) (দ্র) ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এর ঠিক দক্ষিণে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার (দ্র) সুমাত্রা দ্বীপ। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগরকে আন্দামান সাগর থেকে আলাদা করেছে।

আন্তর্জাতিক মাপ অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমার পশ্চিম প্রান্ত ধরা হয়েছে শ্রীলঙ্কার সর্বদক্ষিণ বিন্দু ডণ্ড্রা হেড (Dondra Hd.)কে আর পূর্ব প্রান্ত ধরা হয়েছে সুমাত্রা দ্বীপের সর্বউত্তর বিন্দুকে। একটি সরলরেখার দ্বারা এই দু'টি বিন্দু যোগ করলে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে যে সীমানা পাওয়া যায়, তার মোটামুটি আয়তন ২২,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার বা ৮,৪৯,৪২০ বর্গমাইল। সমগ্র সাগরের গড় গভীরতা ২,৬০০ মিটার, অর্থাৎ আড়াই কিলোমিটারেরও একটু বেশি। সবচেয়ে গভীর জায়গাটির গভীরতা প্রায় ৫,৩০০ মিটার অর্থাৎ পাঁচ কিলোমিটারের ওপরে।

বঙ্গোপসাগরের স্রোতধারা বিভিন্ন এলাকার নদী-সমুদ্রস্রোত দ্বারা প্রভাবিত হয়। মৌসুমী বায়ু (দ্র) শুরু হলে ভারত মহাসাগর থেকে সমুদ্রস্রোত বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। এ ছাড়া পশ্চিম দিকে ভারতের কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী, মহানন্দা, উত্তর দিকে গঙ্গা (দ্র)-ব্রহ্মপুত্রের (দ্র) ব-দ্বীপপথে মেঘনা (দ্র)-সহ অনেকগুলো ছোট ছোট শাখানদী এবং মায়ানমারের ইরাবতী ও বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের

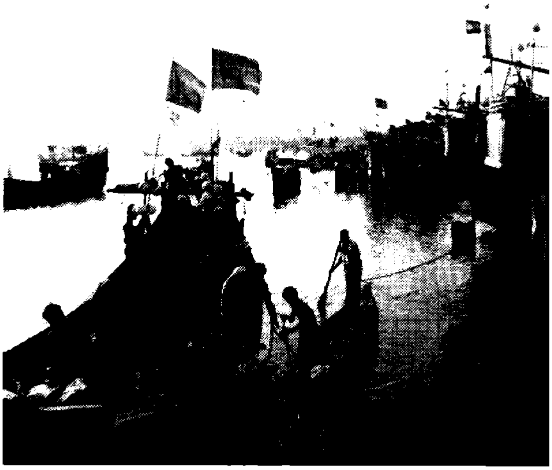

বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ শিকার করে এনে কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে তোলার দৃশ্য

নাফ নদীর স্রোতবৈশিষ্ট্যের প্রভাবও বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ে। কারণ বঙ্গোপসাগরে যে অসংখ্য নদী এসে পড়েছে তাদের মধ্যে এগুলোই প্রধান এবং দুরন্ত নদী।

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একমাত্র প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ (দ্র) ছাড়াও মহেশখালি, কুতুবদিয়া, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, মনপুরা ইত্যাদি বড় বড় দ্বীপ রয়েছে। ওদিকে গঙ্গানদীর ব-দ্বীপ এলাকায় গড়ে উঠেছে সুন্দরবন (দ্র)।

বঙ্গোপসাগর মাৎস্য সম্পদে ভরপুর। এর বুকে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ (দ্র) ও ১০ প্রজাতির চিংড়ি (দ্র) পাওয়া

www.pathagar.com

যায়। মাছের মধ্যে ইলিশ (দ্র), লইটা, ছুরি, মাইট্যা, চাঁদা, পোয়া, লাখ্যা, কোরাল, ফাইস্যা, রূপচাঁদা, ঈল (দ্র), হাঙর, শাকোচ উল্লেখযোগ্য। দেশী নৌকা আর ট্রলারের সাহায্যে মাছ আহরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। উপকূলের অনেক লোক শুঁটকি মাছ তৈরির মাধ্যমেও জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যান্য সম্পদের মধ্যে শঙ্খ (দ্র), ঝিনুক (দ্র), শামুকও এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উপকূলের মানুষেরা এখান থেকে নুন সংগ্রহ করলেও বঙ্গোপসাগরের জলে লবণাংশ অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় কম।

বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বিখ্যাত বন্দরগুলোর মধ্যে ভারতের কলিকাতা (দ্র) ও মাদ্রাজ, শ্রীলঙ্কার (দ্র) কলম্বো, মায়ানমারের (দ্র) রেঙ্গুন ও আকিয়াব এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম (দ্র) ও মংলা বন্দর উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার (দ্র) বঙ্গোপসাগরের তীরেই অবস্থিত।

বঙ্গোপসাগরের ত্রিকোণাকৃতি ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এখানে প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়। এতে বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূলের মানুষের ব্যাপক জীবন ও সম্পদহানি ঘটে।

সুজ. ব.

বজ্রপাত

মেঘের (দ্র) ভিতরে সঞ্চিত বিদ্যুৎ (দ্র) এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হওয়ার ফলে হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানিসহ

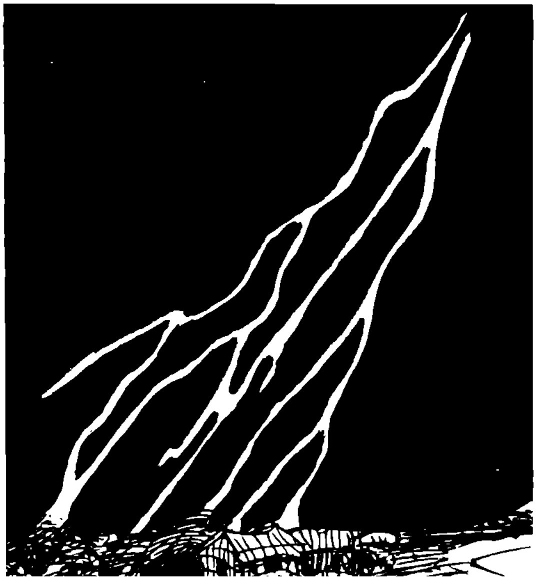

উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং বায়ু প্রসারিত হয়। এর ফলে যে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে বজ্রপাত বলা হয়। বজ্রপাত এবং বিজলি চমকানোর ঘটনা একই সময়ে ঘটলেও বজ্রের শব্দ বিজলি চমকানো দেখতে পাওয়ার অনেক পরে শোনা যায়। কারণ আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে অনেক বেশি। বিজলি চমকানো দেখতে পাওয়া এবং বজ্রপাতের শব্দ শোনার মধ্যে প্রতি ৫ সেকেণ্ড পার্থক্যের জন্য মেঘের দূরত্ব সাধারণত ১.৬ কি. মি. (১ মাইল) হয়ে থাকে।

সা. এ.

বট

এই উপমহাদেশের নিজস্ব গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম *ফিকাস বেঙ্গলেনসিস (Ficus bengalensis)*, গোত্র আর্টিকাসি (Articaceae)। বিশাল আকৃতি, উচ্চতায় ৭০–১০০ ফুট।

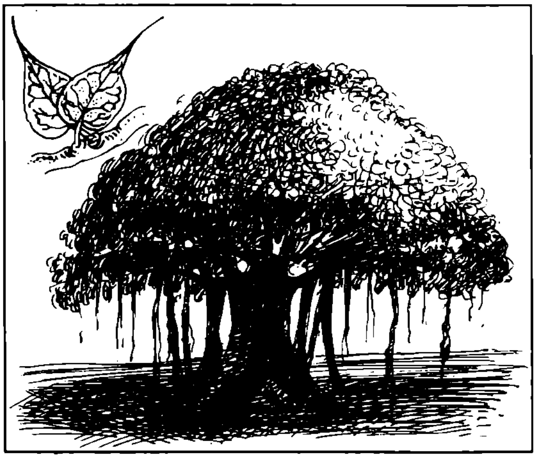

শাখা থেকে ঝুরি নেমে পরে কাণ্ডে পরিণত হয়। এভাবে অপরিমেয়ভাবে বাড়তে পারলে এক সময় মূল কাণ্ড কোনটি তা আর চেনার উপায় থাকে না। পাতা চওড়াভাবে ডিম্বাকৃতি, বয়স্ক অবস্থায় মসৃণ ও চকচকে, বেশ মজবুত ও চামড়াসদৃশ, কিনারা নিটোল, মূল ও আগা কম-বেশি গোলাকার। ওপরটা ঘন সবুজ, তলদেশ একটু ম্লান। বসন্তে পাতা ঝরা শুরু হয় ও ফুল হয়, বর্ষায় পাকে। ফুল ও ফল ছোট ছোট। ফল বলতে যা দেখা যায় তা আসলে সঠিক অর্থে ফল নয়, শত শত ফুল মিলে লাল চামড়ার নিচে জড়ো হয়ে থাকে। তাকে একটা থলে বলা যায়। ডুমুর, পাকুড়,

www.pathagar.com

অশ্বত্থ (দ্র) প্রভৃতি এই গোত্রের, সবারই এরকম ফল। প্রথমে এই ফল সবুজ ও শক্ত থাকে, পাকলে লাল ও নরম হয়ে যায়। এ ফল পাখি ও হনুমানের প্রিয় খাবার। বহু পোকা ও পিঁপড়া (দ্র) বটফল ঘিরে থাকে। পাখিরা ফল খেয়ে এখানে-ওখানে মলত্যাগ করে এবং তার মধ্যে দু-চারটিরই শুধু চারা হয়। গাছতলায় চারা হয় না। অন্য গাছ, দালান-কোঠা, ভাঙা দেয়াল ও দেউলে চারা হয়। অন্য গাছ ও দেয়ালকে এই চারা বড় হয়ে নষ্ট করে ফেলে। বট থেকে এক রকম ঘন সাদা কষ বের হয়, এ জন্য এর নাম ক্ষীরিবৃক্ষ। এই ক্ষীর নানা রোগের ঔষধ। কথিত আছে, মহাবীর আলেকজাণ্ডার (দ্র) ভারতবর্ষে এসে একটি বিশাল বটগাছের তলায় তাঁর সাত হাজার সৈন্যের ছাউনি ফেলেছিলেন।

পথের ধার ও খোলা মাঠের জন্য বট আদর্শ গাছ।

বি. ব.

বটতলার পুঁথি / সাহিত্য

'বটতলার পুঁথি' বা 'বটতলার সাহিত্য' বললে এখন সকলেই বুঝে থাকেন এমন এক ধরনের বই যার ভাষা ও বিষয়বস্তু বাজে বা নিতান্তই সাধারণ এবং তা যাতে ছাপা হয়েছে সেই কাগজ, কালি, ছাপার হরফ সবই অত্যন্ত নিম্নমানের ও এতে মুদ্রণপ্রমাদও যথেষ্ট।

কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বটতলার পুঁথি ছাপাখানার প্রথম যুগে অল্পশিক্ষিত দরিদ্র বাঙালিকে স্বল্পমূল্যে ভাল বইয়ের যে যোগান দিয়েছে তাতে বাঙালির চিরঋণী হয়ে থাকার কথা। বটতলার বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কম দাম। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই এবং রচনারীতি ও বিষয়বস্তু সবই ভাল-খারাপ দু'রকমই ছিল, কিন্তু বই যেমনই হোক দাম কম রাখা হত যাতে সবাই কিনতে পারে। প্রথম দিকে ছাপা হল ধর্মপুস্তক ও ধর্ম সম্পর্কিত নানা কাহিনী। পরে পাঠ্যপুস্তক যেমন ছাপা হয়েছে তেমনি হয়েছে নানা রুচি ও মানের গল্প-উপন্যাস-কবিতা ইত্যাদি। মুসলমানি পুঁথি (এক ধরনের ধর্মকথা বিষয়ক কাব্য যা আরবি-ফার্সি-উর্দু বইয়ের মতো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে পৃষ্ঠা উল্টে পড়তে হয়) সবই ছাপা হত এখানে।

কলিকাতায় শোভাবাজার নামে একটি অঞ্চল আছে। ঊনবিংশ শতকে সেখানে একটি বিশাল বটগাছ ছিল। তার তলায় কবিগান-যাত্রা ইত্যাদি হত। জায়গাটি ক্রমশ হাটে পরিণত হয়। চারপাশে নানা ধরনের দোকানপশারি গজিয়ে ওঠে। প্রধানত জমে ওঠে ছাপাখানার ব্যবসা।

বটতলার হাট এলাকা থেকে ছাপা বই বা মুসলমানি পুঁথি সবই তখন পরিচিতি লাভ করে বটতলার পুঁথি বা বটতলার বই হিসাবে। এখানে প্রথম ছাপাখানা বসানো হয়েছিল ১৮১৭/১৮ সালের দিকে। বিশ্বনাথ দেবের সেই প্রেসে (সেকালে আজকালকার মতো প্রেসের নাম রাখা চালু হয় নি) ভারতচন্দ্রের (দ্র) কাব্য আর অঙ্কের বই ছাপা হয়েছিল। পরে সারা মহল্লাই ছাপাখানাপাড়ায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। অধ্যাপক সুকুমার সেনের (দ্র) মতে বটতলা ছাপাখানার স্বর্ণযুগ ছিল ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ সাল। সবচেয়ে মজার কথা, যা বটতলা অঞ্চলে ছাপা নয় তেমন বইও চালু ছিল বটতলার বই হিসাবে। অর্থাৎ সস্তা বই মানেই বটতলার বই।

বিখ্যাত লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যুগে বটতলার এক জন অন্যতম প্রকাশক ছিলেন। বটতলা থেকে কলিকাতার কলেজ স্ট্রিটের বর্তমান বিখ্যাত বই-পাড়ার দূরত্ব বেশি নয়। কলেজ স্ট্রিটের সম্ভ্রান্ত বই প্রকাশকদের পূর্বপুরুষদের অনেকে এই বটতলা থেকেই তাঁদের প্রাথমিক বইব্যবসা শুরু করেছিলেন।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, বটতলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রকাশক ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ও প্রীতির সম্পর্কও ছিল। বটতলায় প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান প্রকাশক এবং শিয়ালদহ ও মেছুয়াবাজার এলাকায় ছিল পূর্ববঙ্গের মুসলমান প্রকাশকদের প্রাধান্য। শুধু তাই নয়, এখানকার হিন্দু প্রকাশকেরা যেমন ইসলামী সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী ছিলেন, তেমনি মুসলমান প্রকাশকেরাও ছেপেছেন বহু হিন্দু লেখক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গের বইপত্র। জানা যায়, বটতলায় মুসলমান লেখক ও প্রকাশকদের সংখ্যা হিন্দু লেখক ও প্রকাশকদের চাইতে কম ছিল না।

কেবল বই প্রকাশনার ভেতরেই বটতলার প্রকাশকদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁদের ভ্রাম্যমাণ সেল্‌স্‌ম্যান বা ক্যান্‌ভাসারও ছিল। বইয়ের বোঁচকা কাঁধে করে তারা শুধু শহরের অলিগলিই নয়, গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরেও বই বিক্রি করত।

তবে বটতলা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য তার চরিত্র ও

www.pathagar.com

মর্যাদা কিছুটা হলেও হারায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে। এই সময় দেশীয় উঠতি ধনিক-বণিক শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্য নানা ধরনের নিম্নরুচির সাহিত্যও সৃষ্টি হতে থাকে। সেসব গ্রন্থ প্রকাশনারও হিড়িক পড়ে এই সময়কালে। 'বটতলার সাহিত্য' কথাটির ভেতর দিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের যে অভিব্যক্তি ঘটেছে তার সূচনা সম্ভবত এখান থেকেই।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক প্রকাশনায়, তার প্রচার ও প্রসারে এবং বিপণনে বটতলার সাহিত্যের কিংবা তার সীমানাভুক্ত প্রকাশকদের অবদান অনস্বীকার্য।

আ. হু.

বটুকেশ্বর দত্ত [১৯০৮—১৯৬৫]

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী ও সংগঠক। তিনি ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমানের ওয়াড়ি। পিতার নাম গোষ্ঠবিহারী দত্ত।

বটুকেশ্বর দত্ত ১৯২৫ সালে কানপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৬ সালে জীবিকা অন্বেষণে কলিকাতায় (দ্র) এসে তিনি দর্জির কাজ শেখেন। এ সময় তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট বিপ্লবী ভগৎ সিং (দ্র) ও চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁদের উৎসাহে 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি' নামক বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন।

বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল বিদেশী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে দিল্লির পার্লামেণ্ট ভবনের গ্যালারি থেকে দু'টি বোমা ছোঁড়েন ও কিছু প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেন এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি তুলে গ্রেফতার বরণ করেন। এর পর প্রহসনমূলক বিচারে তাঁদেরকে দ্বীপান্তরের দণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৩৮ সালে বটুকেশ্বর দত্ত জেল থেকে মুক্তি পান। কিন্তু বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪২ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত গৃহে অন্তরীণ থাকেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারজীবনে প্রবেশ করেন এবং শেষ জীবনে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

তিনি ১৯৬৫ সালের ১৯শে জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

বড়দিন ক্রিসমাস/বড়দিন দ্র
বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী দ্র

বড়ু চণ্ডীদাস

বৈষ্ণব পদকার চণ্ডীদাসের নাম বাংলা সাহিত্যে (দ্র) অমর হয়ে আছে। পণ্ডিতেরা একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। ১৯০৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর (দ্র) এক জন কর্মকর্তা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ(১৮৬৫–১৯৫২) পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুর গ্রামের এক গৃহস্থবাড়ির গোয়ালঘরের মাচায় একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথিটির প্রথম ও শেষ দিকে দু'একটি পাতা নেই।

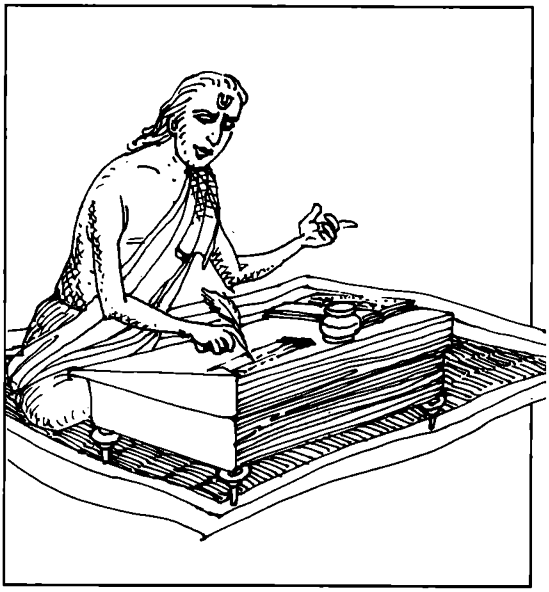

পুঁথির এ কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়াতে পুঁথির নাম পাওয়া যায় নি। কবির নাম পাওয়া গিয়েছিল রচনার ভিতরে। নাম অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, সংক্ষেপে বড়ু চণ্ডীদাস। বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ নিজেই পুঁথিটি সম্পাদনা করেন এবং নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (দ্র)। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত বলে পুঁথির নাম এরকম দেওয়া হয়েছিল।

এই পুঁথি আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলা সাহিত্যের গবেষকেরা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে মধ্যযুগে লিখিত বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন বলতে চান। পুঁথিটির ভাষাভঙ্গি পুরানো, কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে'র ভাষার চেয়েও পুরানো। কৃত্তিবাসের (দ্র) 'রামায়ণ' (দ্র) লেখা হয়েছে পনেরো শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিছু মুসলিম শব্দ পাওয়া গেছে। এতে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়, পুঁথিটি মুসলমানদের বাংলাদেশ বিজয়ের (১২০০-১২০৪ সালে) পরের রচনা। পণ্ডিতেরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে পনেরো শতকের প্রথম দিকের রচনা বলেছেন। এই বিচারে এই পুঁথির রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবি।

বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস কয় জন এ নিয়ে সুন্দর গবেষণা করেছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (দ্র)। তিনি নানা ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ ও সাক্ষ্য উপস্থিত করে বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে বড়ু চণ্ডীদাসের জীবনকাল ১৩৭০-১৪৩৩। তা হলে বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের (দ্র) আগের কবি। চৈতন্যের জীবনীগ্রন্থ পড়ে জানা যায়, তিনি জয়দেব (দ্র), বিদ্যাপতি (দ্র) ও চণ্ডীদাসের (দ্র) পদ শুনে খুব আনন্দ পেতেন। কিন্তু সেই চণ্ডীদাস তা হলে নিশ্চয়ই বড়ু চণ্ডীদাস নন। কারণ বড়ু চণ্ডীদাস পদাবলী রচনা করেছেন এ কথা পণ্ডিতেরা বলেন না। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথি শ্রীচৈতন্য শুনতেন বলে মনে হয় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়বস্তু বৈষ্ণব সাধনার উপযোগী নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে স্থূল কাহিনী। এ কাহিনী শুনে মনে ঈশ্বরের অনুভূতি জাগে না।

'বড়ু' শব্দের অর্থ নিয়েও বিতর্ক আছে। কেউ বলেছেন, এটি সংস্কৃত শব্দ এবং এর অর্থ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। কেউ বলেছেন, এর অর্থ কায়স্থ। সম্ভবত 'বড়ু' সম্মানজনক উপাধি হবে।

বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। বড়ু চণ্ডীদাস বাসলি দেবীর সেবক। 'বাসলি' বলতে দেবী চণ্ডীকেও বোঝায়, সরস্বতীকেও বোঝায়। বড়ু চণ্ডীদাসের বাসলি হল চণ্ডী। এই বাসলির নির্দেশেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লিখেছেন এ কথা বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর গ্রন্থে বার বার বলেছেন। ছাতনা গ্রামে বাসলি তথা চণ্ডী দেবীর মন্দির আছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' একটি মানবিক কাহিনী। এটি একটি লোকগাথা। এ কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদাবলীর মতো ধর্মীয় রূপক নয়, অর্থাৎ তারা ভক্ত ও ভগবান নয়। তারা সাধারণ মানব ও মানবী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তেরোটি 'খণ্ড' আছে অর্থাৎ সর্গ বা অধ্যায় আছে। খণ্ডগুলোর নাম—জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, কালীয় দমন, বস্ত্র, হার, বাণ, বংশী, বিরহ। কাব্যের চরিত্র তিনটি—রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি। রাধা ও কৃষ্ণের মিলনে সাহায্য করেছে বড়ায়ি। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। সাজানোর কৌশলে নাটকীয় গুণ আছে। এক পণ্ডিত কাব্যটিকে নাট-পাঁচালি বলেছেন। অর্থাৎ পুতুলনাচের সঙ্গে কাব্যটি গেয়ে শোনানো হত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পাঠ করলে বোঝা যায়, বড়ু চণ্ডীদাস এক জন শিক্ষিত সচেতন কবি। জয়দেব ও বিদ্যাপতির কবিতা তিনি ভালভাবে পড়েছেন মনে হয়; কারণ ঐ দুই মানবিক ধারার কবির মতো তিনিও মানুষের কবিতা লিখেছেন।

আ. ক.

বদরের যুদ্ধ

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মক্কা (দ্র) থেকে মদিনায় (দ্র) হিজরতের (দ্র) দ্বিতীয় বছরে (৬২৪ খ্রি.) মক্কার অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মুসলমান বাহিনী জয়লাভ করে।

হযরত মুহম্মদ (স.) সঙ্গী-সাথীসহ মদিনায় হিজরতের পরও মক্কার অবিশ্বাসীরা নিশ্চিত ও নিরাপদ বোধ করতে পারে নি। তারা তাই ইসলামকে তার প্রাথমিক ও অসংগঠিত অবস্থায় নির্মূল করে দেওয়াই সঙ্গত মনে করে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে।

বদর নামক প্রান্তরে উভয় দল মুখোমুখি হয়। এই অসম যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীতে ছিল মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য, ৭০টি উট, ২টি ঘোড়া, ৬০টি বর্ম এবং অল্প সংখ্যক তরবারি। মক্কাবাহিনীতে ছিল ১ হাজার উট, ১০০ সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য, ৬০০ বর্ম এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৩০০জন পদাতিক সৈন্য।

হযরত মুহম্মদ (স.)-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এই যুদ্ধে বিরাট ও সুসজ্জিত মক্কাবাহিনী ক্ষুদ্র মুসলিম-বাহিনীর নিকট

www.pathagar.com

পরাজিত হয়।

এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হলে ইসলামের অগ্রযাত্রা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যেত বলে এই যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং 'চূড়ান্ত মীমাংসাকারী' যুদ্ধ হিসাবে অভিহিত করা হয়।

মু. মা.

বদ্রীনাথ

হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ভারতের (দ্র) উত্তর প্রদেশে গাড়োয়াল জেলায় অবস্থিত। ৭,০৭৩ মিটার উঁচু বদ্রীনাথ পর্বত। এরই একটি ঢালে ৩,১২২ মিটার ওপরে অলকানন্দা নদীর দক্ষিণ তীরে প্রতিষ্ঠিত ১৫ মিটার উঁচু মন্দির। মন্দিরে বিষ্ণুর মূর্তি আছে। এ ছাড়া রয়েছে লক্ষ্মীর মন্দির। স্থানটি শীতকালে চার মাস বরফে ঢাকা থাকে।

পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ এবং 'মহাভারতে' (দ্র) বদ্রীনাথের বহু উল্লেখ আছে। পুরাণ মতে, কাছেই বেদব্যাসের আশ্রম ছিল। এই ব্যাস বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন। শোনা যায়, এখানকার শান্ত-গম্ভীর পরিবেশেই শঙ্করাচার্য (দ্র) আত্মজ্ঞান অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

নি. অ.

বন

চাষের অযোগ্য নানা প্রকারের গাছপালায় পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল, যেখানে অসংখ্য কীটপতঙ্গ (দ্র), উচ্চতর সরীসৃপ (দ্র)-পাখি (দ্র) ও বিচিত্র জীবজন্তু বিচরণ করে, সে অঞ্চলকে বন বলা হয়। বনের শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন গরম ও বৃষ্টিবহুল জায়গায় উষ্ণ আর্দ্র বৃষ্টিবহুল বনাঞ্চল গড়ে ওঠে। একে ইংরেজিতে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট (tropical rain forest) বলে। এখানে নানা জাতের উঁচু বৃক্ষ এবং বৃক্ষের গায়ে নানা রকম লতানে গাছ দেখা যায়। অন্য দিকে যেসব অঞ্চলে বছরে বৃষ্টিপাত গড়ে ২৫৪ সেন্টিমিটার সেখানে চিরসবুজ বৃক্ষের বন (evergreen rain forest) সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের (দ্র) সিলেট (দ্র), চট্টগ্রাম (দ্র) ও পার্বত্য চট্টগ্রামে (দ্র) চিরহরিৎ বা চিরসবুজ বৃক্ষের বন আছে। এই সব বৃক্ষের সব পাতা কোনো সময়ে একেবারে ঝরে পড়ে না। আবার চিরসবুজ বৃক্ষের বনের কিছু অংশকে বৃষ্টিভেজা চিরসবুজ বৃক্ষের বন (moist evergreen forest) বলা হয়। এখানে বন আরো বেশি ঘন হয়। চিরসবুজ বনেরই আরেক অংশের নাম মিশ্র চিরসবুজ বন (mixed evergreen forest)। এখানে অনেক গাছের পাতা শুকনো মৌসুমে একেবারে ঝরে যায়। পাশাপাশি চিরসবুজ গাছ যেমন নাগকেশর, চিকরাশী, কামদেব ইত্যাদির পাতা ঝরে না। পাতাঝরা বনের (deciduous forest) দৃষ্টান্ত হল শাল (দ্র) ও সেগুন (দ্র) বন। বাংলাদেশের দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলে খুলনা (দ্র) ও পটুয়াখালীর সুন্দরবন (দ্র) চিরসবুজ জোয়ার অরণ্যের (evergreen tidal forest) প্রধান দৃষ্টান্ত। সুন্দরবনের মাটি লবণাক্ত। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মাটি কম নোনা বলে সেখানে সবচেয়ে ভাল চিরসবুজ সুন্দরী বৃক্ষ জন্মায় প্রচুর। সমুদ্রতটের জোয়ার অরণ্যকে বলা হয় ম্যাঙ্গ্রোভ (দ্র) বন। কক্সবাজারের (দ্র) সমুদ্রোপকূলেও

www.pathagar.com

ম্যাঙ্গ্রোভ বন আছে যদিও এখানে সুন্দরী বৃক্ষ জন্মে না।

ত. চ.

বনরুই

নাম বনরুই হলেও রুই মাছের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা স্তন্যপায়ী (দ্র) প্রাণী। বড়, শক্ত আঁশযুক্ত খানিকটা রুইয়ের মতো দেখতে বলে এদের স্থানীয় নাম

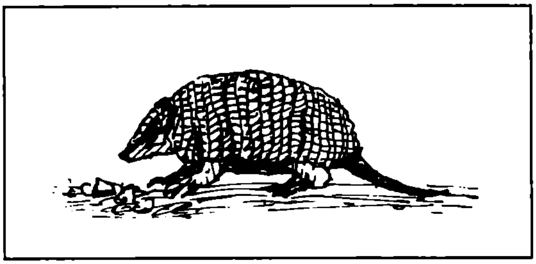

বনরুই রাখা হয়েছে। ইংরেজিতে এর নাম 'অ্যান্ট ইটার', যার বাংলা অর্থ পিপীলিকাভুক। এরা প্রধানত পিঁপড়া (দ্র) খেয়ে জীবনধারণ করে বলেই এদের পিঁপড়াভুক বলা হয়। প্রাণীটি দৈর্ঘ্যে এক মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পা বেশ খাটো, লেজ লম্বা। লেজ দিয়ে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরতে পারে। দেহের আঁশবিশিষ্ট পুরু শক্ত ঢাল মাথা থেকে লেজ ও বুক পর্যন্ত প্রায় ঢেকে ফেলে। এদের দাঁত নেই। নিচের চোয়াল একেবারে পাতলা ফালির মতো। দেহের সবচেয়ে লম্বা অঙ্গ হল জিহ্বা। জিহ্বাকে ৪০ সেমি দূরত্বে ছুঁড়ে দিয়ে ওরা পিঁপড়া ধরতে পারে। জিহ্বা আঠালো। আঠালো জিহ্বায় পিঁপড়া (দ্র) আটকে যায়। এদের গতি খুবই মন্থর। সবচেয়ে বড় বনরুই ওজনে ২-৩ কেজি হয়ে থাকে। এরা ভীতু স্বভাবের প্রাণী। একটু ভয় পেলে ওরা মুখ গুটিয়ে বলের আকার ধারণ করে। লম্বা লেজ দিয়ে দেহের চারপাশে ঘের দেয়। এ অবস্থা থেকে ওদেরকে সহজে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায় না। বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পারলে এরা ধীরে সুস্থে মাথা বের করে। বুকের কোমল অংশে গুটি কয় লোম থাকে। পেশির সাহায্যে বনরুই নাক ও কানের ছিদ্র বন্ধ করে। ওদের সামনের পায়ের নখর বেশ বড় ও বাঁকানো, শক্তও বটে। এই নখর দিয়ে ওরা অনায়াসে মাটি খুঁড়তে পারে। বনরুই ১০ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

ত. চ.

বনাপার্ৎ, নাপলিয়ঁ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দ্র

বন্দরনায়েক, সলোমন ওয়েস্ট্ [১৮৯৯—১৯৫৯]

আজকের শ্রীলঙ্কা এবং সাবেক সিংহলের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পূর্ণ নাম সলোমন ওয়েস্ট্ রিজ্ওয়ে দিয়াস্ বন্দরনায়েক। জন্ম ১৮৯৯ সালের ৮ই জানুয়ারি।

ধনী ভূস্বামীর পুত্র বন্দরনায়েক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং আইনজীবীর পেশা বেছে নেন। ১৯৪৭ সালে সিংহল (দ্র) স্বাধীন হলে নতুন প্রতিনিধিসভার নেতা নির্বাচিত হন এবং স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

১৯৫১ সালে তিনি ক্ষমতাসীন ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি এবং সরকার থেকে পদত্যাগ করেন, গড়ে তোলেন 'শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি'। ১৯৫৬ সালে ৪টি বামপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠন করেন পিপল্স্ ইউনাইটেড ফ্রন্ট। শেষোক্ত দলটিই ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করলে বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতির দৃঢ় অনুসারী হলেও তিনি স্বদেশে ছিলেন সিংহলী জাতীয়তাবাদের কট্টর সমর্থক। ফলে বৃহত্তর তামিল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শুরু হয় তাঁর বৈরিতার সম্পর্ক।

১৯৫৯ সালে বন্দরনায়েক এক জন আততায়ীর হাতে নিহত হন।

আ. হু.

বন্দে আলী মিয়া [১৯০৬—১৯৭৯]

কবি, ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক। তিনি ১৯০৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে তিনি কলিকাতা আর্ট একাডেমীতে ভর্তি হন। কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

বন্দে আলী মিয়া ১৯২৫ সালে দৈনিক 'ইসলাম দর্শন'

www.pathagar.com

পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন। পরে অবশ্য তিনি শিক্ষকতাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের পর বন্দে আলী মিয়া তৎকালীন পূর্ববঙ্গে চলে আসেন এবং নিজ গ্রাম রাধানগরে বসবাস করতে থাকেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি 'কিশোর পরাগ', 'শিশু বার্ষিকী', 'জ্ঞানের আলো' নামে ছোটদের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে তিনি ঢাকা বেতারে যোগদান করেন এবং পরে রাজশাহী বেতারে তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

বন্দে আলী মিয়া সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রায় এক শত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয় হল গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ সৌন্দর্য। শিল্পমাধুর্যে সহজ সরল সাদামাটা প্রকাশই তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ হল 'ময়নামতীর চর' (১৯৩২), 'অনুরাগ' (১৯৩২), ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা হল 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা' (১৯৪০), 'কামাল আতাতুর্ক' (১৯৪০), 'বোকা জামাই' (১৯৪১), 'ছোটদের নজরুল', 'শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা' (১৩৬৩ ব.), 'ছোটদের বিষাদসিন্ধু' (১৯৩৯) ইত্যাদি। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'ময়নামতীর চর' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শিশুসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বন্দে আলী মিয়া ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) এবং ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৯ সালের ২৭শে জুন তিনি রাজশাহীতে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

বন্যা

নদীর পানি আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে নদীর উভয় কূল প্লাবিত করে প্রবাহিত হলে তখন তাকে বন্যা বলে। মৃদু বন্যায় কৃষিজমিতে নতুন পলি সঞ্চিত হয় এবং জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পানি যখন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তখন প্রবল বন্যার সৃষ্টি হয়ে দেশের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। এই বন্যায় প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশের (দ্র) বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয় এবং অসংখ্য মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণহানি ছাড়াও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ও ফসল বিনষ্ট হয়। প্রায় প্রতি বছরই পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে এই উপ-মহাদেশের কোনো না কোনো অংশে বন্যা হয়ে থাকে এবং তাতে মানুষের চরম দুর্দশা নেমে আসে। বন্যার ফলে পথ-ঘাট ভেঙে গিয়ে যোগাযোগব্যবস্থার দারুণ ক্ষতি হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায়। বন্যাকবলিত এলাকায় কোনো কোনো বছর কলেরা (দ্র), আমাশয় (দ্র) ও টাইফয়েড জ্বর (দ্র) মহামারী আকার ধারণ করে। তা ছাড়া বন্যার প্রকোপে নদীর ভাঙ্গনে প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় এবং নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নৌপরিবহণের অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

নানা কারণে বন্যা হয়ে থাকে—যেমন, অত্যধিক বৃষ্টি, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া, খালের অভাব, নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টি, আঁকাবাঁকা নদী, বরফগলা পানি, নদীর স্বল্পতা, জোয়ার-ভাটা (দ্র) ইত্যাদি প্রধান। বাংলাদেশে বন্যার প্রধান কারণ নদী-তলদেশের ভরাট হওয়া এবং মাঝে-মধ্যে অত্যধিক বৃষ্টি।

তা হলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করা সম্ভব ? নদীর তলদেশকে ড্রেজার দিয়ে গভীর করলে নদীর পানিবহনক্ষমতা বেড়ে যায়, ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। অধিক সংখ্যক খাল কেটে, সমুদ্রের উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ দিয়েও বন্যা ও লোনা পানির হাত থেকে শস্যক্ষেত্র রক্ষা করা সম্ভব। তা ছাড়া নদীর গতি পরিবর্তন করে রেলপথ বা সড়কপথ নির্মাণের সময় যাতে পানি নিষ্কাশনের কোনো অসুবিধা না হয় সে দিকে লক্ষ রাখলে অনেক ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। বাংলাদেশ সরকারও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ঢাকা-ডেমরা-নারায়ণগঞ্জ বাঁধ পরিকল্পনা, ব্রহ্মপুত্রের ডান তীরের বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ,

www.pathagar.com

সমুদ্র-উপকূলবর্তী বাঁধ পরিকল্পনা, উত্তর বঙ্গের তিস্তা বাঁধ পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রধান।

মু. এ.

ববি মুর [১৯৪১—১৯৯৩]

ইংল্যাণ্ডের ফুটবল (দ্র)-তারকা। ১৯৪১ সালে ইংল্যাণ্ডের লণ্ডনে (দ্র) ববি মুরের জন্ম।

স্থানীয় লিটন স্কুলে পড়ার সময় ফুটবলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি খেলায় মেতে ওঠেন। জীবনে এক জন বড় খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্নে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ফুটবলের আধুনিক কলাকৌশল শেখার কাজে মন দেন।

১৯৫৮ সালে ১৭ বছর বয়সে ববি মুর ওয়েস্টহাম ইউনাইটেড-এর হয়ে পেশাদারি ফুটবলে আত্মপ্রকাশ করেন। অবশ্য এর আগে ১৯৫৭ সালে ইংল্যাণ্ড যুব দলে খেলে সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।

১৯৬০ সালে ববি মুর ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলে স্থান করে নেন। বিশ্বকাপ ফুটবলে অভিষিক্ত হন ১৯৬২ সালে। তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্টহাম ইউনাইটেড ১৯৬৪ সালে এফ. এ. কাপ এবং পরের বছর ক্লাব উইনার্স কাপ জয়ী হয়।

১৯৬৬ সালে ববি মুরের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড প্রথম ও শেষ বার বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব অর্জন করে। ১৯৭০ সালেও তিনি ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক মনোনীত হন। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে দোকান থেকে ব্রেসলেট চুরির দায়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করলে অধিনায়কত্ব থেকে বাদ পড়েন, যদিও বিশ্বকাপে খেলার জন্য পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

রক্ষণভাগের এই নামী খেলোয়াড় ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক আসর থেকে অবসর নিলেও ঘরোয়া ফুটবলে অংশ নেন ১৯৭৭ পর্যন্ত। ১৯৯৩ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অ. ব.

বয় স্কাউট্স্ (Boy Scouts)

সাত বছরের বেশি বয়সী বালকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন, যা খেলাধুলা ও সামাজিক সেবাকর্মের মাধ্যমে তাদের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক বিকাশসাধনে সহায়তা করে এবং তাদের আত্মপ্রত্যয়ী ও সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা দেয়। এটি মূলত একটি আন্দোলন। এর বাণী (motto) হল—'প্রস্তুত হও' এবং স্লোগান হল—'প্রতিদিন একটি করে ভাল কাজ কর'।

স্কাউটেরা স্কাউট্ শপথ এবং স্কাউট্ আইন কঠোরভাবে মেনে চলে। এসব আইন তাদের পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, সৌহার্দ্য, সৌজন্য, সাহসিকতা, বিশ্বস্ততা, শ্রদ্ধাশীলতা,

www.pathagar.com

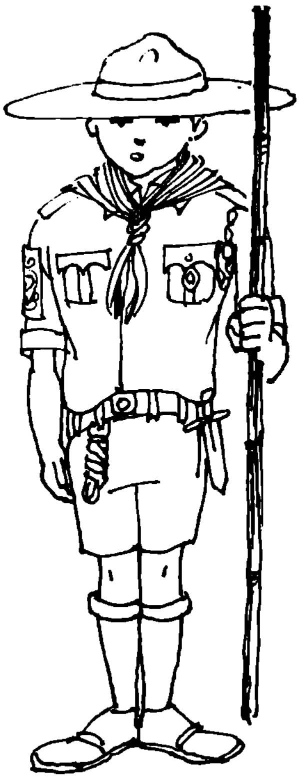

হস্তশিল্পকেন্দ্রে স্কাউট্-কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য স্কাউট্দের বিশেষ অভিজ্ঞানসূচক পুরস্কার দেওয়া হয়।

আট জনের বেশি স্কাউট্ মিলে পর্যবেক্ষক দল এবং চার জন মিলে সচরাচর 'বাহিনী' গঠন করতে পারে। স্কাউট্দের বিশেষ ধরনের ইউনিফর্ম পরার নিয়ম আছে। তবে এই ইউনিফর্ম একেক দেশে একেক রকম হতে পারে। স্কাউট্ দল সাধারণত সপ্তাহের এক দিন বৈঠকে মিলিত হয়। প্রতি চার বছর অন্তর বিভিন্ন জাতির স্কাউট্দের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক জ্যামবোরী (Jamboree) অর্থাৎ বিশাল আনন্দ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রিটিশ সেনাবিভাগের অফিসার স্যার রবার্ট ব্যাডেন-পাওয়েল ১৯০৮ সালে ব্রাউন্সি দ্বীপে বয় স্কাউট্ আন্দোলনের সূচনা করেন। পরে লর্ড ব্যাডেন-পাওয়েল এর নেতৃত্ব দেন। প্রথমে মাত্র ২০ জন বালক নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এখন বিশ্বের ৮৬টিরও বেশি দেশে স্কাউটের সংখ্যা ১ কোটির ওপর। বাংলাদেশেও (দ্র) স্কাউট্ আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ লাভ করেছে।

সুজ. ব.

মিতব্যয়িতা, নির্ভরযোগ্যতা ও আনুগত্য ইত্যাদি মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং পশু-পাখি-জীব জগতের প্রতি দয়াবান হতে শেখায়।

বয়ঃসীমা অনুসারে কার্যদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য সম্পূর্ণ স্কাউট্ক্রমকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়। ৭ থেকে ১১ বছর বয়সী বালকদের জন্য প্রাথমিক স্তর (Cub Scout বা Brownie). ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের স্তর—স্কাউট্স্ বা গাইড্স্, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের স্তর—দুঃসাহসী (Venturers) এবং ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের স্তর—দিগ্বিজয়ী (Rovers)।

ধারাবাহিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এতে ধাপে ধাপে উন্নতির বিধান প্রচলিত আছে। সঙ্কেত জ্ঞাপন, শিবির স্থাপন, দড়ির গিঁট বাঁধা ও দড়ি পাকানো, নৌযাত্রা, প্রাথমিক চিকিৎসা, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্কাউট্দের দক্ষতা যাচাই করা হয়। সাধারণত মাঠে-ময়দানে-বনে ও

বয়স্কশিক্ষা

আভিধানিক অর্থে বয়স্কদের জন্য যে শিক্ষা তা-ই 'বয়স্কশিক্ষা'। সে-অর্থে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল বয়স্ক ব্যক্তির শিক্ষাই হল বয়স্কশিক্ষা। কিন্তু প্রচলিত ও প্রকৃত অর্থে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যেসব নারীপুরুষ যথাসময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে লেখাপড়ার সুযোগ পায় নি এবং যাদের এখন আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ নেই, যাদের কোনো প্রকার সাক্ষরতাজ্ঞান নেই, তাদের সাক্ষর করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা তা-ই 'বয়স্কশিক্ষা'।

বয়স্কশিক্ষা এক দিকে সমাজকে নিরক্ষরতামুক্ত করা ও অন্য দিকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার পরিপূরক শিক্ষা। প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের নির্দিষ্ট বয়স যারা অতিক্রম করেছে সেই সব বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জনের উপযোগী

www.pathagar.com

শিক্ষাকার্যক্রমকে বয়স্ক শিক্ষা বলা হয়।

বয়স্কশিক্ষা প্রধানত অনানুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল বয়স্ক নিরক্ষরদের— ১. ব্যবহারিক সাক্ষরতা অর্জনে সহায়তা করা। ২. দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি এখনো নিরক্ষর। ১৯৯১ সালের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৩৪.৬। এই হার অত্যন্ত কম। সুতরাং দেশের এক বিপুল সংখ্যক বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে ন্যূনতম শিক্ষা দিতে না পারলে দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। তাই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি কর্মক্ষম, কুসংস্কারমুক্ত ও সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরিতে বয়স্কশিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। উল্লেখ্য যে সমাজের বয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়েরই জন্য শিক্ষার সমান গুরুত্ব রয়েছে। বয়স্করা যেহেতু পরিবার ও সমাজে গুরুত্ব পান, তাই শিক্ষা পেলে পরিবারের অন্যান্যের শিক্ষার মূল্য তাঁরা বুঝতে পারেন এবং অন্যদের শিক্ষালাভের জন্য উৎসাহিত হন। পরোক্ষভাবে বয়স্ক শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষাকে এভাবে এগিয়ে নেয়।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে (দ্র) (১৯৭৪) বয়স্কশিক্ষার ব্যাপকতা নির্ধারণ করে বলা হয়েছে—'প্রবহমাণ শিক্ষাধারার আজীবন চর্চা ও নবতর অভিজ্ঞতা অর্জন বয়স্কশিক্ষার অন্তর্গত।' সেই আলোকে বয়স্কশিক্ষার আওতা ও বিষয়বস্তু হচ্ছে—

১. সাক্ষরতা ও বুনিয়াদী শিক্ষা (যার সুযোগ থেকে বর্তমান বয়স্করা শৈশবকালে বঞ্চিত হয়েছে)।
২. স্বাস্থ্যসচেতনতা ও সামাজিক গুণাবলি।
৩. কর্মমুখী শিক্ষা (বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, যা এক জন বয়স্ককে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়)।
৪. ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা শিক্ষা, দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ, দৈনন্দিন জীবনের বিজ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার।

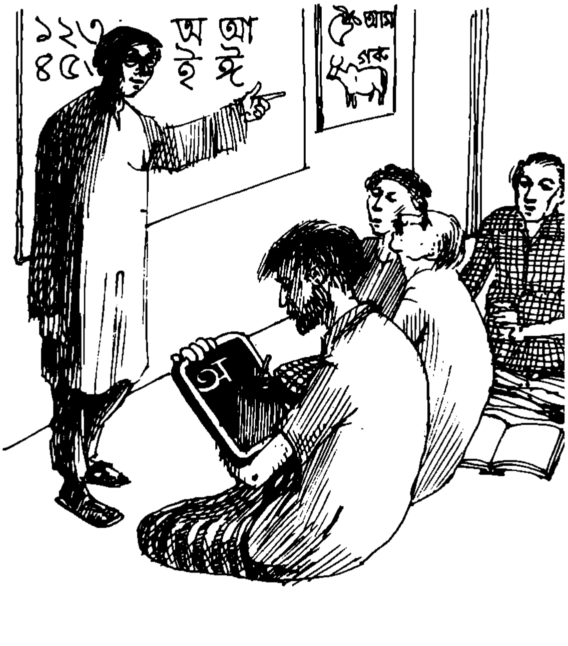

বাংলাদেশে বয়স্কশিক্ষার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ধারণা করা হয়, সর্বপ্রথম ১৯১৮ সালে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দেশে বয়স্কশিক্ষার ধারা শুরু হয়। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে বয়স্কশিক্ষার কিছুটা বিকাশ ঘটলেও ১৯৫৪ সাল থেকে আমাদের দেশে বয়স্কশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

আমাদের দেশে বয়স্কশিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইংরেজ বংশোদ্ভূত এক জন আই. সি. এস. অফিসার এইচ. জি. এস. বিভারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে বাংলা শিখেছিলেন এবং বাঙালিদের মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালে ঢাকায় বয়স্কদের জন্য একটি সাক্ষরতাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৬২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে বরেণ্য সমাজকর্মী, প্রাক্তন আই. সি. এস. অফিসার ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে বয়স্কশিক্ষার সূচনা হয়। কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরিকল্পিতভাবে বয়স্কশিক্ষা কর্মসূচি হাতে নেয়। এ দেশে বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন ও বিস্তারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁদের নাম উল্লেখ করার মতো তাঁরা

www.pathagar.com

হলেন মরহুম মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস (প্রাক্তন সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক), মোহাম্মদ ফেরদাউস খান (প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক) ও আবুল কাশেম সন্দ্বীপ।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রমের অধীনে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক ও সুপরিকল্পিতভাবে বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের অধীনে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রম ও তিন খণ্ড প্রাইমার প্রণীত হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য প্রণীত হয়েছে শিক্ষক-সহায়িকা। কিছু কিছু এন জি ও (N G O) বয়স্ক-শিক্ষার জন্য নিজেরাই প্রাইমার ও শিক্ষক-নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। সবার লক্ষ্য হল দু' হাজার সালের মধ্যে দেশের ৬২ শতাংশ বয়স্ক নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করে তোলা।

শ. আ.

বয়া (buoy)

এই ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ 'বয়' হলেও বাংলায় আমরা 'বয়া' বলি। জলপথে চলতে গেলেই মাঝে মাঝে চোখে পড়ে ভাসমান ড্রামের মতো বিভিন্ন আকৃতি ও রঙের এক ধরনের বস্তু। এগুলোকে লম্বা শিকল দ্বারা নোঙরের সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থানে পানির উপর ভাসিয়ে রাখা হয়। এগুলোকে

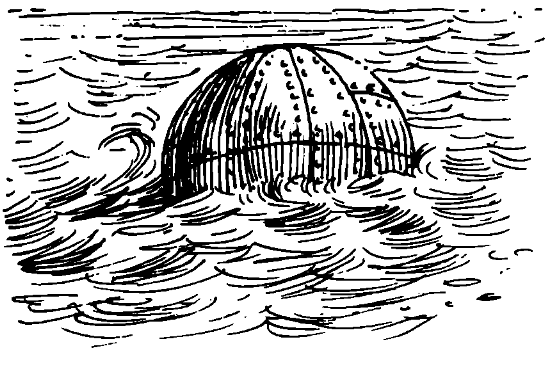

বলে বয়া। বয়া নৌচালনায় পথের দিঙ্‌নির্দেশ দিয়ে নাবিকদের নিরাপদে বন্দরে পৌঁছতে সাহায্য করে। সব নৌযানে পথের কোথায় কোন্ বয়া আছে তার একটি চার্ট থাকে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর বয়া ব্যবহৃত হয়।

লাল রঙের বয়া থাকে পোতাশ্রয়ে প্রবেশপথের ডান দিকে, কালো বয়া থাকে বাম দিকে। কালো এবং সাদা ডোরাটানা বয়া খাড়ির গভীরতম অংশ নির্দেশ করে। লাল-কালোর আড়াআড়ি ডোরাচিহ্নিত বয়া বিপজ্জনক স্থান বোঝায়।

আকৃতি অনুসারে বয়ার বিভিন্ন নাম হয়। যেমন পানির মধ্যে ভাসমান বাঁশ বা কাঠের তৈরি জাহাজের (দ্র) মাস্তুলের মতো দেখতে, নাম—স্পার (spar) বয়া। তেলের ড্রামের মতো উপরিভাগে সমতল বয়ার নাম ক্যান্ (can) বয়া। উপরিতল মোচাকৃতি, নাম—নান্ (nun) বয়া। সাধারণত ক্যান্ বয়া কালো এবং নান্ বয়া লাল রঙের। কোনো কোনো বয়া আলোকসঙ্কেত দেয়। আলোর বর্ণ এবং উজ্জ্বলতার পার্থক্য থেকে নাবিকেরা নির্দেশ বুঝতে পারেন। এক ধরনের বয়া শব্দসঙ্কেত বা হুইসেল দেয়। সব ধরনের বয়াকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : যেগুলো নোঙ্গর করার স্থানে বা বন্দরে ব্যবহৃত হয় সেগুলো মুরিং (mooring) বয়া; যেগুলো গভীর সমুদ্র বা নদীপথের নির্দেশ দেয় সেগুলো নেভিগেশনাল (navigational) বয়া।

স. রা.

বরকতুল্লাহ্, মোহাম্মদ [১৮৯৮—১৯৭৫]

দর্শনাশ্রয়ী ও মননশীল প্রবন্ধ রচয়িতা। ফার্সি সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ হিসাবেও তিনি সবিশেষ খ্যাত। জন্ম পাবনা জেলার সাজাদপুরের ঘোড়াশালে, ১৮৯৮ সালের ২রা মার্চ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বি. এ. (অনার্স) ও ১৯২০ সালে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২২ সালে পাশ করেন বি. এল.। কিন্তু উকিল হয়েও কখনো আইন ব্যবসা করেন নি। পেশাগত জীবনে একাধিক উচ্চপদস্থ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেমন— ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও. কালেক্টরেট্ ও ডেপুটি সেক্রেটারি ইত্যাদি। বাংলা একাডেমীর (দ্র) প্রথম মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন।

আধুনিক কালের বাঙালি মুসলমান লেখকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম দার্শনিক ভাবনাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দু'খণ্ডে রচিত 'পারস্য-প্রতিভা'

www.pathagar.com

(১৯২৪ ও ১৯৩২) তাঁর স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' (১৯৪০), 'কারবালা' (১৯৫৫) ও 'নবীগৃহ সংবাদ' (১৯৫৫) ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রবন্ধ-গবেষণা কর্মে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬০ সালে লাভ করেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) এবং ১৯৬৩ সালে দাউদ পুরস্কার।

১৯৭৫ সালের ২রা নভেম্বর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

বরফ

জমাটবাঁধা পানি হল বরফ। বরফ বর্ণহীন কেলাসাকৃতির ও কঠিন ভঙ্গুর পদার্থ। পানি জমাট বাঁধার সময় তার আয়তন বেড়ে যায় বলে বরফ পানির উপরেই ভাসে। শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় পানি বরফে পরিণত হয়। তাপে বরফ গলে। তাপ বাড়লে বরফ তো গলবেই। পৃথিবীতে (দ্র) তিন বার বরফ-যুগ এসেছিল। পৃথিবীর প্রথম বরফ-যুগ ৬০-৭০ কোটি বছর আগে প্রিক্যাম্ব্রিয়ান কালে, দ্বিতীয় বরফ-যুগ প্যালিওজোইক কালের শেষে ২৫ কোটি বছর আগে, শেষ বরফ-যুগ প্লিস্টোসিন কালে আসে। শেষ যুগকে বৃহৎ বরফ-যুগ বলা হয়। প্লিওসিন কালে ৫ লক্ষ বছরেরও আগে এই বরফ যুগের শুরু। দ্বিতীয় বরফ-যুগে দক্ষিণ গোলার্ধ বরফে ঢেকে যায় এবং শেষ বরফ-যুগে ঢেকে যায় উত্তর আমেরিকা (দ্র) ও ইউরোপের (দ্র) উত্তর দিকের সমগ্র ভূখণ্ড।

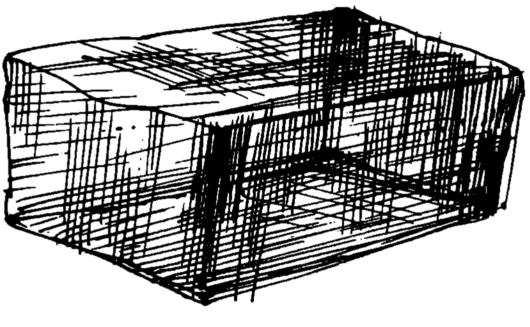

গ্লেসিয়ার (glacier) বা হিমবাহের (দ্র) বিচ্ছিন্ন অংশকে আইসবার্গ (iceberg) বা হিমশৈল বলে। হিমশৈল সমুদ্রের পানিতে ডুবে থাকে এবং পানি (দ্র) বা বায়ুর প্রবাহ যেদিকে সেদিকে ধাবিত হয়। হিমশৈলের নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র পানির উপরে থাকে। হিমশৈল আকারে বিশাল হয়ে থাকে। জাহাজের নাবিকেরা এর বিশালত্ব অনুমান করতে না পেরে বিপদ ঘটায়। বিশাল টাইটানিক (দ্র) জাহাজ হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ১৯১২ সালে ডুবে যায়। অবশ্য এখন নাবিকেরা নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে হিমশৈলের আকার, গতি ইত্যাদি আগেভাগে জানার কৌশল আয়ত্ত করেছে। নদী (দ্র) ও সমুদ্রের বরফ কেটে নৌযান ও জাহাজের (দ্র) গতিপথ মুক্ত রাখা হয়। বরফ কাটার জাহাজকে আইসব্রেকার বা বরফকাটা জাহাজ বলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) একটি পরমাণুশক্তিচালিত বরফকাটা জাহাজের নাম ছিল 'লেনিন'। এটিই পৃথিবীর এ ধরনের প্রথম জাহাজ। 'লেনিন' ৬ ইঞ্চি বা প্রায় ১৫ সেমি পুরু বরফস্তর কাটার উপযুক্ত ছিল। এটি ১৯৫৮ সালে চালু করা হয়।

ত. চ.

বরিশাল বিভাগ

বাংলাদেশের (দ্র) একটি বিভাগ। বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, ভোলা, বরগুনা ও পিরোজপুর—মোট ৬টি জেলা নিয়ে এই বিভাগ গঠিত হয়। এই বিভাগের আয়তন মোট ১৩,২৯৭ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই বিভাগের মোট লোকসংখ্যা ৭৭,৫৭,০০০ জন।

'সাগরকন্যা' নামে পরিচিত এই বিভাগে অনেক নদীনালা আছে। সাগরতীরবর্তী হওয়ায় এবং অধিক নদী থাকার কারণে এই বিভাগের প্রধান যাতায়াতমাধ্যম নৌযান। বিভাগের বৃহত্তম নদী মেঘনা (দ্র) ও পদ্মার (দ্র) শাখা-প্রশাখা বিভাগের সমগ্র এলাকাকে জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী কুয়াকাটা বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। কুয়াকাটা থেকে সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্ত দেখা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে কুয়াকাটার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তবে এই বিভাগে কোনো রেললাইন নেই। এই বিভাগের পশ্চিম দিকে বাগেরহাট জেলা, পূর্ব দিকে নোয়াখালি ও লক্ষ্মীপুর জেলা, উত্তর দিকে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর

www.pathagar.com

জেলা, উত্তর-পূর্ব দিকে চাঁদপুর জেলা অবস্থিত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর (দ্র)।

সুন্দরবনের (দ্র) কাছাকাছি এই বিভাগে গাছগাছড়ার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। কড়ুই, গামারি, কেওড়া, পশুর, হরিতকী, সোনালি কাঠ এবং গোলপাতা এগুলোর মধ্যে প্রধান। এক সময় এই বিভাগে প্রচুর হিংস্র জানোয়ার দেখা যেত। এখন বন্য প্রাণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিভাগের দক্ষিণাংশে দেশের একমাত্র জেলা-দ্বীপ ভোলা।

এই বিভাগে ১টি মেডিক্যাল কলেজ, ১টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ১টি কৃষি কলেজ, ৫২টি কলেজ, ৯৫২টি হাই স্কুল, ৩,৯২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৭৩৯টি মাদ্রাসা আছে। এই বিভাগে এক সময় শিক্ষিত জনসংখ্যার হার ছিল বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (দ্র), কবি জীবনানন্দ দাশ (দ্র) ও বেগম সুফিয়া কামালের জন্মস্থান বরিশাল।

মো. হো.

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

এই প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরটি রাজশাহী শহরের কেন্দ্রস্থলে সদর হাসপাতালের সামনে অবস্থিত। এটি একটি ঐতিহাসিক এবং তথ্যসমৃদ্ধ জাদুঘর। লোকমুখে সাধারণভাবে এর পরিচিতি 'বরেন্দ্র মিউজিয়াম' নামে। নাটোর দিঘাপতিয়ার জমিদার স্বনামধন্য বিদ্যোৎসাহী কুমার শরৎকুমার রায় ১৯১০ সালে এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আরো যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁরা হলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (দ্র) আর খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ। তা ছাড়া এঁদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' এই জাদুঘরের উন্নতিকল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের তথা বাংলার ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণই ছিল জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

এই জাদুঘরভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন লর্ড কারমাইকেল ১৯১৬ সালের ১৩ই নভেম্বর। লর্ড রোনাল্ড ১৯১৯ সালের ২৭শে নভেম্বর এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

১৯৬৪ সালের ১০ই অক্টোবর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বিশ্ববিদ্যালয় এর দায়িত্বভার নিয়ে এই ঐতিহাসিক মিউজিয়ামকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এখানে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের মধ্যে আছে অজস্র শিলালিপি, ধাতব, দারু, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, তাম্রলিপি, সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, তৈজসপত্র ইত্যাদি। এখানে পুরানো দলিলের সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৯ হাজার। আরো আছে প্রাচীন যুগের উল্লেখযোগ্য পোড়ামাটির কাজ, বিভিন্ন মাধ্যমে তৈরি অস্ত্রশস্ত্র, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, চিত্রকলা, আরবি-ফার্সি ভাষায় লেখা দলিলপত্র, হিন্দু ও মুসলিম রাজা-বাদশাদের নানা স্মৃতিচিহ্ন, চন্দ্রগুপ্ত, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ও জালালুদ্দীন মোহাম্মদ আকবরের (দ্র) স্বর্ণমুদ্রা, সম্রাট শাহজাহান (দ্র), সম্রাট আওরঙ্গজেব (দ্র), সম্রাট আকবর (দ্র) ও সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের আমলের রৌপ্যমুদ্রা, শেরশাহের কামান, হাতে লেখা পবিত্র কুরআন শরীফ (দ্র) ইত্যাদি। ৪৫০০খানি সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় রচিত পুঁথি আধুনিক পদ্ধতিতে এখানে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এই জাদুঘরে একটি পাঠাগারও আছে। এখানে রক্ষিত সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান দুর্লভ গ্রন্থ ও সাময়িকীর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। দেশ-বিদেশ থেকে আগত পণ্ডিত, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রী এই পাঠাগার ব্যবহার করে উপকৃত হন।

ম. আ. খা.

বর্গী

ফার্সি 'বার্গী' থেকে বর্গী শব্দ এসেছে। শিবাজীর (দ্র) কালে মারাঠা সেনাদলে বর্গী ও শিলেদার বলে বিভাজন ছিল। বর্গীরা সরকার থেকে অশ্ব ও অস্ত্র পেত, শিলেদারেরা নিজ নিজ অশ্ব ও অস্ত্রসহ যুদ্ধে যেত। পদমর্যাদায় বর্গীরা উচ্চতর ছিল, সেনাবাহিনীতেও তারা সংখ্যাধিক ছিল। ২৫ জন অশ্বারোহীর দায়িত্বপ্রাপ্তকে হাবলদার বলা হত। পাঁচ জন হাবলদারের উপরে এক জন জুমলাদার থাকতেন। আবার এক জন হাজারীর অধীনে দশ জন জুমলাদার থাকতেন, পাঁচ জন হাজারী এক জন পাঁচ হাজারীর অধীনে থাকতেন।

www.pathagar.com

নবাব আলীবর্দী খাঁর (দ্র) শাসনকালে (১৭৪২) একদল অশ্বারোহী ভাস্কররাম কোলহাতকরের অধীনে বাংলায় এসে উপদ্রব শুরু করে। এভাবে বর্গীর হাঙ্গামা শুরু হয়ে প্রায় এক দশক কাল স্থায়ী হয়। তারা ওড়িষ্যা থেকে নবাব আলীবর্দী খাঁর ফেরার পথে শিবির ঘেরাও করে এবং আলীবর্দী খাঁ বেষ্টনী ভেদ করে মুক্ত হয়ে বর্গীদের পাল্টা তাড়া করেন। বর্গীরা পথে মুর্শিদাবাদ ও কাটোয়ায় লুটপাট করে। বালেশ্বরের যুদ্ধে হেরে গিয়ে বর্গীদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত পলায়ন করেন। এর পরে প্রতি বছর এই আক্রমণ, লুণ্ঠন, উপদ্রব নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। নবাব আলীবর্দী দিল্লির বাদশাহের মধ্যস্থতায় পেশোয়া বালাজী বাজীরাওকে রাজস্বের এক চতুর্থাংশ দিতে স্বীকার করেন, যদিও তাতে উপদ্রব বন্ধ হয় নি। ১৭৪৪ সালে সন্ধির ছল করে তিনি বর্গী সেনাপতি ভাস্করকে আমন্ত্রণ করে সদলে হত্যা করেন। পরে এক বছর বিরতি দিয়ে পুনরায় উপদ্রব শুরু হলে নবাব ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী নবাব মারাঠাদেরকে ওড়িষ্যার অধিকারসহ বাংলার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ হিসাবে বারো লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। বর্গীর অত্যাচারে মেদিনীপুর ও বর্ধমান ধ্বংস হয়। বাংলাদেশেও (দ্র) ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও কলিকাতা (দ্র) কখনো আক্রান্ত হয় নি, ইংরেজেরা বর্গীর আক্রমণ থেকে কলিকাতা রক্ষার জন্য 'মারাঠা ডিচ' খনন শুরু করেন। খনন সমাপ্ত না হতেই বর্গীর অত্যাচার বন্ধ হয়।

শা. চৌ.

বর্ণালি

সাধারণ আলোকরশ্মি যখন কোনো প্রিজ্‌ম্ বা প্রতিসরণ-গ্রেটিং-এর ভিতর দিয়ে যায় তখন সেটি নানা বর্ণে ভাগ হয়ে পড়ে। এভাবে ফালি ফালি রঙ পরপর সাজানো হয়ে যায়।

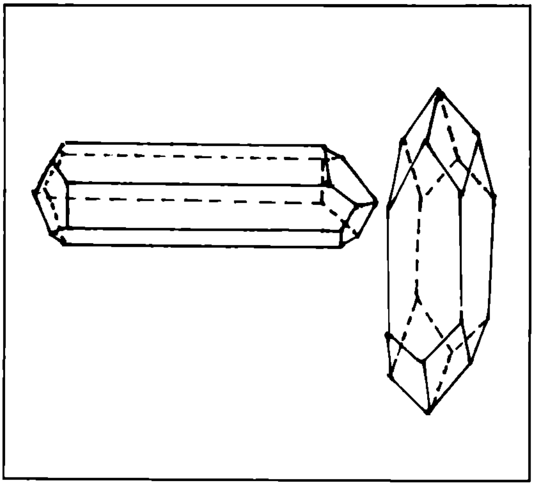

www.pathagar.com

বর্ণালির যে অংশ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তার এক প্রান্তে থাকে বেগুনি ও অপর দিকে থাকে লাল রঙ। এই দুই রঙের মাঝখানে থাকে অন্যান্য রঙ। আলোকরশ্মির এই বিভিন্ন রঙে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে সাত রঙের যে সমাহার ঘটে তাকেই বলে বর্ণালি। বর্ণালিতে পরপর যেসব রঙ সাজানো থাকে সেগুলি হচ্ছে বেগুনি, বেগুনি-নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। প্রিজ্‌ম্‌ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর পথ বেঁকে যায়। এই বেঁকে যাওয়া কম-বেশি হয় সাদা আলোর মধ্যেকার বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের আলোর কারণে।

সু. ব.

বর্মা / বার্মা মায়ানমার দ্র

বর্ষপঞ্জি / ইয়ার বুক

বর্ষপঞ্জি বা Year-book বললে দিন-মাসের ঘটনাপঞ্জির ইতিবৃত্ত বা সংগ্রহ বোঝায়। জ্যোতিষ্ক সম্পর্কিত ও অন্যান্য তথ্যসমৃদ্ধ তালিকা বা নির্ঘণ্টকেও বর্ষপঞ্জি বলা হয়। লিপি (দ্র) আবিষ্কারের সময় থেকে এক ধরনের নির্ঘণ্ট চালু ছিল।

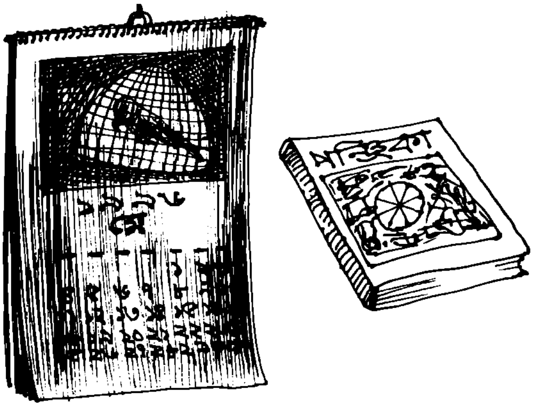

এগুলোতে থাকত ধর্মীয় উৎসব ও ঋতুপরিবর্তনের খবর। মধ্যযুগে (দ্র) পালাপার্বণ, ঋতু প্রভৃতি নানা প্রকার উপায়ে নির্দেশ করা হত। ১৫ শতকে ইউরোপে (দ্র) প্রথম বর্ষপঞ্জি প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে বর্ষপঞ্জির দ্রুত প্রসার ঘটে। জার্মান গণিতশাস্ত্রী ও জ্যোতির্বিদ রিজিওমণ্টানুস্ (Regiomontanus : ১৪৩৬–৭৬) বর্ষপঞ্জিপ্রণেতাদের অন্যতম। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিতে বর্ষপঞ্জি তৈরি করেন। এ ধরনের বর্ষপঞ্জিতে ভবিষ্যদ্বাণী থাকত।

আঠারো শতকের শেষ ভাগে বৈজ্ঞানিক বর্ষপঞ্জির দেখা পাওয়া যায়। বিভিন্ন বার্ষিক উৎসব, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ, পারিবারিক উপদেশ, হাস্য-রসাত্মক গল্প-কবিতা নিয়ে জনপ্রিয় বর্ষপঞ্জির প্রচলন হয় সতেরো ও আঠারো শতকে। উনিশ ও বিশ শতকে আমেরিকায় (দ্র) রান্নাঘর নিয়েও বর্ষপঞ্জি প্রকাশিত হয়। বিশ শতকে বাংলা ভাষায় (দ্র) প্রকাশিত যেসব বর্ষপঞ্জি বা পঞ্জিকা জনপ্রিয় হয়, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। যেমন— গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা, পি. এম. বাগচীর পঞ্জিকা, মোহাম্মদী পঞ্জিকা ও লোকনাথ পঞ্জিকা।

আ. হা.

বর্ষাবাস চীবর ও কঠিন চীবর দ্র

বল (force)

পদার্থবিজ্ঞানে (দ্র) বল এমন একটি সত্তা যা স্থির বস্তুকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা গতিশীল বস্তুর গতির (দ্র) পরিবর্তন করে বা করতে চায়; সংক্ষেপে যা বস্তুর জাড্যগুণের পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চায় তা-ই বল। অতি ক্ষুদ্র পারমাণবিক কণিকার বন্ধন থেকে মহাবিশ্বের (দ্র) গ্রহনক্ষত্রসমূহের আকর্ষণ—সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে বল ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন প্রকার বলকে চারটি মৌলিক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : মহাকর্ষ বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল, দুর্বল নিউক্লীয় বল এবং প্রবল নিউক্লীয় বল।

মহাকর্ষ হচ্ছে মহাবিশ্বের যে কোনো দূরত্বে অবস্থিত দু'টি বস্তুর মধ্যের আকর্ষণ বল (যেমন সূর্য (দ্র) ও পৃথিবীর মধ্যে)। তড়িৎ-চুম্বকীয় বল মহাকর্ষ বল থেকে লক্ষ গুণ শক্তিশালী, কিন্তু এর কার্যক্ষমতা অল্প দূরত্বের মধ্যে সীমিত। তড়িৎ-চুম্বকীয় বল তড়িৎ এবং চুম্বক-বল সৃষ্টি করে। পরমাণুসমূহের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে অণু (দ্র) সৃষ্টি হয়। পরমাণুসমূহের মধ্যে দুই ধরনের বল ক্রিয়াশীল। একটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ইলেক্ট্রনকে ধরে রাখে, অন্যটি মৌল কণিকা সমন্বয়ে নিউক্লিয়াস গঠন করে; এরা যথাক্রমে দুর্বল নিউক্লীয় বল এবং প্রবল নিউক্লীয় বল। এই বল তড়িৎ-চুম্বকীয় বল থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ শক্তিশালী।

www.pathagar.com

বস্তুর উপর বলের প্রভাব নিয়ে আইজাক নিউটন (দ্র) সর্বপ্রথম তিনটি সূত্র দেন। এগুলোকে নিউটনের গতিসূত্র বলে। বল একটি ভেক্টররাশি। বলের একক নিউটন (দ্র)। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় বল নিয়ে আলোচনা করা হয় তা হল বলবিদ্যা।

স. রা.

বলকান

ইউরোপ (দ্র) মহাদেশে বলকান একটি অঞ্চলের নাম। শব্দটি তুর্কি, এর অর্থ পার্বত্যাঞ্চল। ভৌগোলিক পরিভাষায় বলকান হল একটি 'উপদ্বীপ'।

সাধারণভাবে বলকান (The Balkans) অঞ্চল বলতে বোঝা যায় আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ।

হা. মা.

বলধা গার্ডেন

ঢাকার (দ্র) ওয়ারী এলাকায় খ্রিস্টান গোরস্থানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। নবাব স্ট্রিটের দু'দিকে এর দু'টি বাগান। দু'টি বাগানই আয়তাকার। ঢাকা জেলার বলধার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৯০৯ সালে এই বোটানিক্যাল গার্ডেনের সূচনা করেন। এখানে তাঁর বাসগৃহও ছিল। ১৯২৫ সালে তিনি এখানে পারিবারিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৬ সালে সাইকি (Psyche) নামক দক্ষিণ অংশের বাগান রচনা সমাপ্ত করেন। উত্তর অংশের নাম সিবিলি (Cybele), শুরু করেন ১৯৩৮ সালে। ১৯৪০ সালে নকশা অনুযায়ী এই বাগান রচনা সমাপ্ত করেন। বৃক্ষপ্রেমিক জমিদার এতে তৃপ্ত হন। কিন্তু এই বছর তাঁর একমাত্র পুত্র আততায়ীর হাতে নিহত হলে তিনি ভীষণ আঘাত পান। ভগ্ন হৃদয়ে ১৯৪৩ সালের ১৩ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। সিবিলিতে তাঁর পুত্র ও তাঁর সমাধি- ফলক রয়েছে। পুত্রের চিতার ওপর লেখা একটি করুণ শোকগাথা আছে।

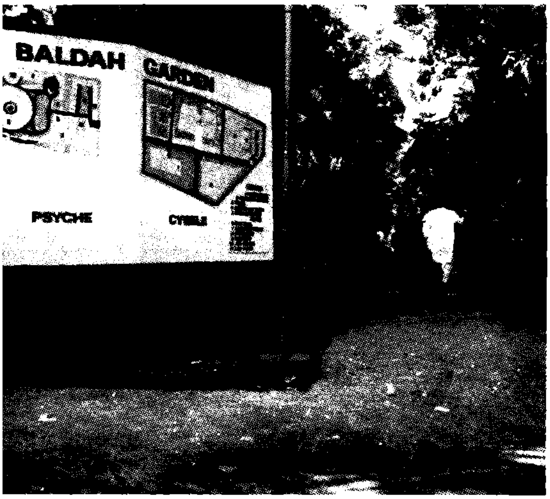

সাইকি বাগান দু' ভাগে বিভক্ত। বাগানে ঢোকার পর আছে শাপলা ও পদ্মের পুকুর। এখানে দুর্লভ জাতের শাপলা রয়েছে। পাশে আলোয় (Aloe) ঘরে আছে ঘৃতকুমারী। তারপর আছে আমাজান লিলি ও পদ্মপুকুর। তারপর বিভিন্ন জাতের অর্কিড ও ক্যাকটাসের দুর্লভ সংগ্রহ-ঘর। পাশেই আছে জমিদারের বাড়ি ও জাদুঘর। এখন সেসব বাগানের অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তারপর একটু এগিয়ে গেলেই শারদ মল্লিকা, প্যাপিরাস (দ্র), মাধবী, কুর্চি, জুঁই, চামেলির সমৃদ্ধ বাগান। সেখানে একটা ছোট সবুজ চত্বরের মাঝখানে আছে চারদিকে তাকসমৃদ্ধ পিরামিড। এই তাকে থরে থরে সাজানো আছে ক্যাকটাস। এই তাক বেয়ে দর্শকেরা সর্বোচ্চ তাকে উঠতে পারে। তারপর আছে ছোট একটি ক্যাকটাস-ঘর ও সর্বদক্ষিণে অন্ধকার ঘরে আছে নানা জাতের ফার্নের গাছ। ফার্ন-ঘরের ভেতর সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে চমৎকার পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। এই বাগানে আছে কয়েকটি বড় বড় দুর্লভ গাছ, যেমন—আফ্রিকান বকুল, নাগলিঙ্গম, অশোক (দ্র), স্বর্ণ-অশোক, লতাবট, বিচিত্র বকুল প্রভৃতি। অর্কিড-ঘর থাইল্যাণ্ড (দ্র) থেকে নানা রকম অর্কিড এনে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

সিবিলিতে ঢুকে প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত। রাস্তার দু' দিকে আছে উদয়পদ্ম বা ম্যাগনোলিয়া। বাঁ পাশে শঙ্খনিধি পুকুরে চারদিকে তাক আছে আর আছে দু'দিকে দুটি শানবাঁধানো ঘাট। পুকুরের উত্তর দিকে জমিদারের ছেলের সমাধির ওপর শোকগাথা। এখানে পৌঁছলে বিষাদে মন ভরে যায়।

এই বাগানে দু'টি ঘর আছে, একটিতে অর্কিড ও অন্যটিতে চারাগাছের ভাণ্ডার। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে আছে

www.pathagar.com

বলধা গার্ডেনের অন্যতম আকর্ষণ শঙ্খ পুকুরের সিঁড়ি

দোতলা ছোট্ট বাড়ি ও ঝুলন্ত বারান্দা, আছে সূর্য ঘড়ি। বাগানে দুর্লভ জাতের নানা গাছের মধ্যে আছে মাধবীলতা, মুচকুন্দ বা কনকচাঁপা, পারুল, রাজ অশোক, অশোক, পিয়াল, পান্থপাদপ, শতায়ুউদ্ভিদ, দু'রকম কেয়া, আমহার্স্টিয়া, ব্রাউনিয়া (বা পাখিফুল), কৃষ্ণবট। এখানকার গোলাপ (দ্র) এক সময় উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার ক্যামেলিয়া দেখে রবীন্দ্রনাথ (দ্র) তাঁর বিখ্যাত 'ক্যামেলিয়া' কবিতা লেখেন।

এই বাগানে আফ্রিকার এক অঞ্চল থেকে এসেছে নীলমোর, যা মিশরের মমি (দ্র) সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হত। ক্যামেলিয়া এসেছে জাপান থেকে, গোলাপ এসেছে ইংল্যাণ্ড থেকে, আরারুট এসেছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপ-দেশ থেকে, নানা রকম ক্যাকটাস ও ফণীমনসা এসেছে মেক্সিকো থেকে। এ ছাড়া আফগানিস্তান, জাভা, শ্রীলঙ্কা (দ্র), বার্মা (দ্র), ব্রাজিল, আমেরিকা (দ্র), মধ্যপ্রাচ্য (দ্র) এবং ভারত (দ্র) থেকে এসেছে দুর্লভ সব সংগ্রহ। এত ছোট জায়গায় এত দুর্লভ জাতের গাছ বাংলাদেশের (দ্র) আর কোথাও নেই। শুধু বাংলাদেশে নয়, এ ধরনের ছোট ও চমৎকার বোটানিক্যাল গার্ডেন খুব কম দেশেই দেখা যায়। বাগানের বিভিন্ন জায়গায় উঁচুনিচু পথ, ঝোপ ও গেট সৃষ্টিও বৈশিষ্ট্যময়। এত কিছুর মধ্যেও মাঝে মাঝে ঘাসে-ভরা ছোট ছোট জায়গা আছে।

বাগানের সঙ্গে জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণের সুপার অমৃতলাল আচার্যের নাম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। জমিদারের মৃত্যুর পর তিনিই এই বাগানের যত্ন নিতেন। এই বাগানের দায়িত্ব ১৯৫১ সালে ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে যায়। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে এই বাগান সরকারের বনবিভাগের অধীনে যায়। বলধা গার্ডেন সপ্তাহের সব দিন খোলা থাকে। প্রবেশমূল্য ৩ টাকা।

বলধা গার্ডেন ঢাকার একটি আকর্ষণ ও অত্যন্ত মূল্যবান গাছপালার সংগ্রহশালা। বলধার জাদুঘরের সামগ্রী এখন জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

বি. ব.

বলপয়েন্ট কলম (ball-point pen)

এখনকার যে বলপয়েন্ট কলম তার উদ্ভব প্রায় ১০০ বছর আগে। ১৮৮৮ সালে জন এইচ. লাউড্ নামের এক জন আমেরিকান প্রথম বলপয়েন্ট কলমের পেটেন্ট নেন। তাঁর উদ্ভাবিত কলমে লিখতে হলে খসখসে কাগজের প্রয়োজন হত। ১৮৯৫ সাল থেকে ঐ কলমের বাজারজাতকরণ শুরু হলেও সেগুলো তেমন বাজার পায় নি।

আর্জেন্টিনায় বসবাসরত হাঙ্গেরিয়ান লাজলো বিরো (Lazlo Biro) লাউডের কলমের দুর্বলতাগুলো দূরীভূত করে এর প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। 'বিরো' নামের এই কলমের সাহায্যে মসৃণ কাগজে লেখা সম্ভব হয়। ১৯৩০

www.pathagar.com

সালে 'বিরো' বলপয়েন্ট কলম ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর প্রায় সারা পৃথিবীতে (দ্র) ছড়িয়ে পড়ে। হালে অন্য যে কোনো কলমের চেয়ে বলপয়েন্ট কলম অনেক বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এক যুক্তরাষ্ট্রেই (দ্র) বছরে ২০০ কোটি বলপয়েন্ট প্রস্তুত করা হয়, যার বিপরীতে ফাউন্টেন পেন বা ঝর্ণাকলম তৈরি হয় মাত্র ১ কোটি ১০ লাখ!

বলপয়েন্ট কলমের লেখার মুখটিতে রয়েছে ০.৭–১ মিলিমিটার ব্যাসের একটি ধাতব বল। একটি সকেটের ওপর বলটি এমনভাবে বসানো থাকে, যাতে তা সহজে ঘুরতে পারে। নির্দিষ্ট স্থানে রাখার জন্য সকেটটিকে একটি ধাতব পয়েন্ট দ্বারা আটকে রাখা হয়। লেখার সময় বল ঘুরতে থাকে, সকেটের ছিদ্র দিয়ে টিউব থেকে কালি ক্যাপিলারি প্রভাবে বলের মাথায় চলে আসে। বলপয়েন্ট কলমে বিশেষ ধরনের ঘন, সহজে শুকিয়ে যায় এমন কালি ব্যবহার করা হয়। বলসহ কালির টিউবটিকে একটি ধাতু বা প্লাস্টিকের আবরণ দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়।

দামের দিক থেকে দু' তিন টাকার বলপয়েন্ট কলম যেমন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তেমনি আছে কয়েক হাজার টাকা দামেরও।

মু. হা.

বলরেখা

কোনো বলক্ষেত্রের কাল্পনিক রেখা, যার সাহায্যে ক্ষেত্রের দিক ও প্রাবল্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

চৌম্বক বলরেখার সাহায্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের (দ্র) প্রাবল্য ও অভিমুখ এবং বৈদ্যুতিক বলরেখা দ্বারা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রাবল্য ও অভিমুখ সম্পর্কে জানা যায়। কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি বিচ্ছিন্ন উত্তর মেরুকে মুক্তাবস্থায় স্থাপন করলে মেরুটি যে পথে পরিভ্রমণ করে তাকে চৌম্বক বলরেখা বলে। এরকম কোনো বৈদ্যুতিক বা তড়িৎক্ষেত্রে কোনো একক পজিটিভ বা ধনাত্মক চার্জ (দ্র)-কে স্থাপন করলে এটি যে পথে পরিভ্রমণ করে তাকে বৈদ্যুতিক বলরেখা বলে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের বেলায় বলরেখাকে বলের টিউবও (tube of force) বলে। চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে বলরেখার সঙ্গে অঙ্কিত স্পর্শক চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের দিক নির্দেশ করে এবং বলরেখার সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত এক বর্গসেন্টিমিটার ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান নির্দেশ করে। চৌম্বক বলরেখা চুম্বকের বাইরে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে এবং চুম্বকের ভিতরে দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরুর দিকে যায়। বৈদ্যুতিক বলরেখা ধনাত্মক চার্জ থেকে বের হয়ে ঋণাত্মক চার্জে শেষ হয়। পরিবাহীর (দ্র) ভিতরে কোনো বৈদ্যুতিক বলরেখা থাকে না।

শা. ত.

বলশেভিক পার্টি

নির্বাসিত রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির মূল বা প্রধান অংশের নাম বলশেভিক। রুশ ভাষায় 'বল্‌শেভিক্‌' অর্থ 'সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য'।

১৯০৩ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল

ভ্লাদিমির ইলিচ্‌ লেনিন

ডেমোক্রেটিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির মুখপত্র 'ইস্‌ক্রা'র (এই শব্দের অর্থ স্ফুলিঙ্গ) সম্পাদকমণ্ডলী কাদের নিয়ে গঠন করা হবে, সে বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হয়। লেনিনের অনুগত গ্রুপের উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট প্রদত্ত হলে তাঁরা পরিচিত হয়ে ওঠেন 'বলশেভিক' অর্থাৎ 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' গ্রুপ হিসাবে। অবশ্য, ঐ একই কংগ্রেসে অন্যান্য বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেনিন (দ্র) ও তাঁর অনুগত গ্রুপ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভে ব্যর্থ হন।

'ইস্‌ক্রা'র সম্পাদকমণ্ডলী গঠনে যাঁরা কম ভোট পান,

www.pathagar.com

এর পর থেকে তাঁদের অভিহিত করা হতে থাকে 'মেন্‌শেভিক্' অর্থাৎ 'সংখ্যালঘিষ্ঠ' গ্রুপ বলে। ১৯১২ সাল পর্যন্ত সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে বলশেভিকেরা মূলধারা (র‍্যাডিক্যাল) হিসাবে থাকলেও, এর পরপরই তাঁরা প্রাগে অনুষ্ঠিত এক কংগ্রেসে পৃথক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর তথা রুশ বিপ্লবের (দ্র) মাধ্যমে বলশেভিকেরা রাশিয়ায় ক্ষমতাসীন হন।

আ. হ.

বলীখেলা

কুস্তি খেলা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন— গ্রেকোরোমান পদ্ধতি, ফ্রি স্টাইল পদ্ধতি, পেশাদারি ফ্রি স্টাইল বা জাপানের সুমো (দ্র) কুস্তি খেলা।

বাংলাদেশে (দ্র) চট্টগ্রাম (দ্র) অঞ্চলে বিশেষ এক প্রকারের কুস্তি খেলা উৎসব-পার্বণে, মেলাতে ও বাৎসরিক ঈদের পরের দিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই খেলাকে 'বলীখেলা' বলে। এই পদ্ধতির কুস্তি খেলায় শক্তি ও প্যাঁচ-কায়দাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। চট্টগ্রামের লালদিঘির পাড়ে অনুষ্ঠেয় আবদুল জব্বারের বলী খেলা চট্টগ্রাম অঞ্চলের

একটি জননন্দিত চিত্তবিনোদনমূলক প্রতিযোগিতা। এতে শ্রেষ্ঠ বলী হওয়ার গৌরব যিনি লাভ করেন, তিনি সম্মান ও অর্থপুরস্কার পেয়ে থাকেন।

কা. আ. আ.

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বড়ু চণ্ডীদাস দ্র

বসন্ত রোগ (pox)

'পক্স ভাইরাসের' আক্রমণে দু' ধরনের বসন্ত রোগ দেখা দেয়। ভেরিসেলা (varicella) জাতীয় ভাইরাসের দ্বারা জলবসন্ত (chicken pox) এবং ভেরিওলা (variola) জাতীয় ভাইরাসের দ্বারা গুটিবসন্ত (small pox) সৃষ্টি হয়। সব বয়সেই বসন্ত রোগ দেখা দিতে পারে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে জলবসন্তের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। কেউ একবার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তার শরীরে এ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে ওঠে, দ্বিতীয় বার আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

বসন্ত রোগের শুরুতে গায়ে জ্বর দেখা দেয় এবং ত্বকে পীড়কা বা র‍্যাশ (rash) সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে এই পীড়কা ফুসকুড়িতে পরিণত হয়। ফুসকুড়ি ফেটে যাওয়ার পর তা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এবং ত্বকে ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয় যা ত্বকের সৌন্দর্যহানি ঘটায়।

বসন্ত বায়ুবাহিত রোগ। শ্বাসের মাধ্যমে এ রোগের ভাইরাস দেহে প্রবেশ করে। তবে ফুসকুড়ির রস (discharge)-এর সংস্পর্শেও সুস্থ শরীরে রোগের বিস্তার ঘটে।

বসন্ত রোগীকে পৃথক কক্ষে রাখা উচিত। এর চিকিৎসা প্রধানত লক্ষণনির্ভর। নিরাময়ের উপযোগী কোনো ঔষধ এখনো আবিষ্কৃত হয় নি।

জলবসন্তের তুলনায় গুটিবসন্ত বিপজ্জনক। গুটিবসন্তের মহামারী (দ্র)-তে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হওয়ার ইতিহাস রয়েছে। টিকা (দ্র) গ্রহণের মাধ্যমে গুটিবসন্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু জলবসন্তের কোনো টিকা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে মানববিশ্ব এখন গুটিবসন্তের আক্রমণ থেকে মুক্ত।

সি. না. হ.

www.pathagar.com

বসুবন্ধু অভিধর্মকোষ ও অসঙ্গ দ্র

বসুবিহার

বগুড়ার মহাস্থানগড়ের (দ্র) ৪ মাইল পশ্চিমে একটি বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। লোকজন এটি কিসের ধ্বংসস্তূপ তা জানত না। পণ্ডিতদের মধ্যেও এ নিয়ে বিতর্ক ছিল। এক জন ইংরেজ অনুসন্ধানবিশারদ এই বিতর্কের অবসান ঘটান। তাঁর নাম স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (Sir Alexander Cunningham)। তিনি চীনা পরিব্রাজক হিউএন-ৎসাঙ (দ্র)-এর বিবরণী পাঠ করে দেখতে পান যে এটি একটি বৌদ্ধ বিহার। চীনা পরিব্রাজক চীনা ভাষায় এর নাম উল্লেখ করেছেন পো-শি-পো। এই পো-শি-পো বিহারের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায় বসুবিহারে। এটি ছিল একটি বিরাট সংঘারাম। আয়তন, বুরুজ ও পটমণ্ডপের উচ্চতার জন্য এই বিহার বিখ্যাত ছিল। এখানে কমপক্ষে ৭০০ জন ভিক্ষু অবস্থান করতে পারতেন। পূর্বাঞ্চল থেকে বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে জ্ঞানচর্চার জন্য আসতেন। কথিত আছে, এ সংঘারামের অদূরে বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্রাট অশোক (দ্র) নাকি সেখানে একটি স্তূপ নির্মাণ করান।

বসুবিহারের আয়তন ৭০০ x ৬০০ ফুট। এই ধ্বংসস্তূপের দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে প্রায় ২০০ ফুট চওড়া একটি প্রসারিত অংশ আছে। এটাকে 'বসন কোর্ট' দুর্গ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। দুর্গটি নির্মাণ করান গিয়াসউদ্দিন আয়াজ।

বসুবিহার যে গ্রামে অবস্থিত সে গ্রামটির নামও বিহার। খননকার্যের ফলে এখানে ৮০০টি মূল্যবান দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রোঞ্জের বৌদ্ধমূর্তি, পোড়ামাটির ফলক, পোড়ামাটির সীল, নক্সাকরা ইট, মূল্যবান প্রস্তরগুটিকা, মাটির পাত্র, আরো কত কি! মাটির ফলকগুলোতে অর্ধমানব, অর্ধমৎস্য, অর্ধমানব-অর্ধপুষ্প, কিন্নর-কিন্নরী, গ্রামের সাধারণ মানুষ, জীব-জন্তু ইত্যাদির চিত্র আছে। হাতি (দ্র), হরিণ (দ্র), সিংহ (দ্র), হংসী, ময়ূর (দ্র) এসবও আছে। বসুবিহার একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতেরা এ গ্রামে এসে এ বিহার দেখে অবাক হয়ে যান। কত আগে এ দেশের মানুষ উন্নত সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলেন তা ভেবে অবাক হতে হয়।

বসুবিহার—পাশাপাশি দু'টি বিহারের ধ্বংসাবশেষ

ম. মু.

বস্তুবাদ

বাংলায় বস্তুবাদ ও বস্তুতান্ত্রিকতা সমার্থক। ইংরেজি materialism শব্দের পরিভাষা করা হয়েছে বস্তুবাদ। প্রাচীন ভারতে লোকায়ত দর্শন (দ্র)বা চার্বাকে বস্তুবাদের প্রকাশ।

বস্তুবাদ সাধারণভাবে যা বোঝাতে চায় তা হল : পৃথিবীতে (দ্র) বস্তুই একমাত্র সত্য, আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারি যার আকার ও আয়তন আছে এবং যা নির্দিষ্ট কোনো স্থান (space) ও সময় (time) জুড়ে থাকে। অর্থাৎ বাস্তব জগৎ ও বাস্তব সত্যের বাইরে আর কিছুর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। এর সরল অর্থ এই যে মন চেতনা কল্পনা ইত্যাদি গৌণ বিষয় এবং বিশ্ব মানেই হল বস্তুজগৎ যা শাশ্বত। এ থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, স্রষ্টা বা ঈশ্বর বা আমাদের বোধের অতীত কোনো শক্তি বিশ্ব সৃষ্টি করে নি। স্বাভাবিকভাবেই, প্রমাণিত নয় বা প্রমাণ করা যায় না এমন কোনো কিছুকেই বস্তুবাদ স্বীকার করে না।

বিশ্বপ্রপঞ্চের রহস্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বস্তুবাদ যে-মত বা দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত করে তা মৌলিক ও প্রধান। এর বিপরীতে ভাববাদও (দ্র) সমপরিমাণে মৌলিক ও প্রধান বলেই এ দুই ভাবধারার মধ্যে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত বিরোধ চলে আসছে। মানুষের মেধাবিকাশের সময় থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ভাববাদের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসেই মানুষ বস্তুবাদ খুঁজে পেয়েছে।

প্রাচীন ভারত (দ্র), চীন (দ্র) ও গ্রিসের সমাজে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত (দ্র) ও মানুষের অভিজ্ঞতাভিত্তিক অন্যান্য জ্ঞান বিকাশ লাভ করায় সেখানে বস্তুবাদের প্রথম উদ্ভব ঘটে। মন-নিরপেক্ষভাবেই বস্তুজগৎ অস্তিত্বময়—এই ছিল প্রাচীন বস্তুবাদের ধারণা। জগতে বৈচিত্র্যের মূলে

www.pathagar.com

কার্ল মার্ক্স

কোনো একক নিশ্চয়ই আছে এবং সে একক অবশ্যই 'বস্তু'। ভারতে চার্বাক (দ্র); চীনে লাও-ৎসু (দ্র), ওয়াংচু; গ্রিসে হেরাক্লিটাস (দ্র), এনাক্সাগোরাস, এম্পিডোক্লেস, এপিকিউরাস (দ্র) প্রমুখ দার্শনিক বস্তুবাদের প্রবক্তা ছিলেন।

ইউরোপে মধ্যযুগে (দ্র) বস্তুবাদ দর্শন তার এলাকা বাড়িয়ে নেয়। মনকেও সে 'বস্তু' হিসাবে গণ্য করে। ফলে, বোধের জগৎও তখন বিবেচনার মধ্যে এসে পড়ল। তাই এ সময়ের বস্তুবাদ ধর্মীয় প্রকৃতিবাদের রূপ গ্রহণ করেছিল। সর্ববস্তুতে স্রষ্টা বা ঈশ্বর প্রকাশিত এবং প্রকৃতি ও ঈশ্বর উভয়ই নিত্যসত্য—ধারণাটি ছিল এই।

ইউরোপে পুঁজিবাদ (দ্র) বিকশিত হবার কালে বস্তুবাদী দর্শনের পরবর্তী বিকাশ ঘটে। মধ্যযুগের চেয়ে এ সময়ে বস্তুবাদ স্পষ্টতর ও অধিকতর প্রভাবশালী ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ ১৭শ-১৮শ শতকে বিজ্ঞান, যান্ত্রিক কৃৎকৌশল ও অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নতির ফলে সমাজের চেহারা পাল্টে গিয়েছিল। এ সময়ের দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস এবং প্রকৃতিকে মূল সত্তা হিসাবে গ্রহণ করে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও যাজকপ্রাধান্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের টমাস হব্‌স্ (দ্র), জন্ লক্ ও ফ্রান্সিস বেকন (দ্র), ইতালির গালিলেও গালিলেই (দ্র), হল্যাণ্ডের স্পিনোজা (দ্র) এবং ফ্রান্সের পিয়ের গাসঁন্দি (Pierre Gassendi) এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের ধারণার মধ্যেও যেটুকু প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় বা ত্রুটি ছিল তা কাটিয়ে ওঠেন অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদী দার্শনিক দেনি দিদ্‌রো (Denis Diderot), ক্লোদ্ এল্‌ভেতিউ (Claude Helvetius) ও দ'ওল্‌বাক্ (d' Holbach)।

বস্তুবাদ সম্পর্কে পরবর্তী প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন জার্মানির ল্যুড্‌ভিগ্ ফয়েরবাখ্ (Ludwig Feurbach) এবং তাঁর চিন্তাধারা নিয়েই এই দর্শনকে চরম পরিণতির পথে নিয়ে যান তাঁরই সমসাময়িক আরেক জন জার্মান দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক-বিপ্লবী। তাঁর নাম কার্ল মার্ক্স (দ্র)।

কার্ল মার্ক্স ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ইনিও জার্মান, ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌স্ (দ্র) উভয়ে মিলে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। দর্শন হিসাবে বস্তুবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে এঁদের বিশ্বসংসারের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে।

হা. মা.

বহুরূপতা

আমরা জানি, প্রতিটি মৌলিক পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতিতে কয়েকটি মৌলিক পদার্থ আছে যাদের রাসায়নিক ধর্ম মোটামুটি অভিন্ন হলেও ভৌত ধর্ম এক নয়। একই মৌলের ভৌত ধর্মের বিভিন্নতাকে বলা হয় বহুরূপতা। যেসব মৌলের (দ্র) বহুরূপতা থাকে তাদের বহুরূপী মৌল বলে। যেমন—অক্সিজেন (দ্র), কার্বন (দ্র), সালফার (দ্র), ফসফরাস (দ্র), সিলিকন (দ্র), টিন ইত্যাদি।

অক্সিজেনের দু'টি রূপ—অক্সিজেন (দ্র) আমাদের অতি পরিচিত বায়ুমণ্ডলের (দ্র) একটি গ্যাস (দ্র), অন্যটি ওজোন (দ্র)। বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে ওজোনের একটি হালকা স্তর ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে (দ্র)। কার্বনের রূপভেদ সবচাইতে বেশি। এদের দানাদার এবং অদানাদার এই প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শক্ত এবং স্বচ্ছ কার্বন হচ্ছে হীরক (দ্র), নরম এবং ধূসর কালো বর্ণের কার্বন হচ্ছে গ্রাফাইট (দ্র); কার্বনের অন্য রূপ হল কাঠকয়লা, খনিজ কয়লা, গুঁড়ো কয়লা, কালি, ঝুল ইত্যাদি।

বহুরূপী মৌল তাদের কেলাস (দ্র) গঠনে বিভিন্নতা প্রদর্শন করে। গ্যাসীয় বহুরূপী মৌল তাদের আণবিক গঠনে বিভিন্নতা দেখায়। যেমন—সাধারণ অক্সিজেনে দু'টি পরমাণু (দ্র) এবং ওজোনে তিনটি পরমাণু দ্বারা অণু (দ্র) গঠিত হয়। সাধারণ অক্সিজেনের গন্ধ নেই, ওজোনের বিশেষ ধরনের তীব্র গন্ধ আছে।

স. রা.

বাইজান্টাইন সভ্যতা

বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সভ্যতা। সিরিয়া, মিশর ও প্যালেস্টাইনকে নিয়ে গঠিত পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য (Byzantine empire) নামে

www.pathagar.com

পরিচিত। রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র হিসাবেও এটি ইতিহাসখ্যাত। এর প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট কন্সটান্টাইন ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে। রাজধানী ছিল কন্সটান্টিনোপল। প্রাচীন গ্রিক নগরী বাইজানশিয়ামের ওপর এর প্রতিষ্ঠা বলেই এর নামকরণ করা হয়েছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য।

ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ানের শাসনামলে বাইজান্টাইন শিল্পকলা, স্থাপত্যশিল্প ও চারুকলার চরম বিকাশ ঘটে। এসবেরই সমাহারে এই সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং ক্রমে তা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়। এই সভ্যতার বিকাশে গ্রিক সভ্যতা (দ্র) ও প্রাচ্য সভ্যতারও প্রভূত অবদান রয়েছে।

বাইজান্টাইন চারুকলার উদ্ভব ঘটে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে। গ্রিক হেলেনিক ও প্রাচ্য ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এই শিল্পরীতির ক্ষেত্রে গঠনসৌকর্যের চাইতে অলঙ্কারবাহুল্যই প্রধান বৈশিষ্ট্য। ৫২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করে রোমান সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনেন। তিনি রোমান আইন লিপিবদ্ধ এবং তা সময়োপযোগী করেও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি গ্রিক ভাষাকে তাঁর সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করেন। এই সময় বহু অমূল্য ইতিহাস ও সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হয়। বাইজান্টাইনদের 'ইনস্টিটিউট', 'কোড' এবং 'ডাইজেস্ট অব জাস্টিনিয়ান' মানবসংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এই সময় নাগাদই বাইজান্টাইন চারুকলারও স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। পাথর ও পোড়ামাটির ওপর অঙ্কিত চিত্রাবলি এই সময় বিশেষভাবে বিকাশলাভ করে। মধ্য-ইতালির রাভেনাতে ষষ্ঠ শতকে নির্মিত গির্জা (দ্র)-গুলোর মোজাইককর্ম এর অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাইজানশিয়াম অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপল রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার পর থেকে (৩৩০ খ্রি.) এখানে স্থাপত্যশিল্পেরও চরম বিকাশ ঘটে। এই স্থাপত্যরীতি পরে গ্রিস ও অন্যান্য বলকান (দ্র) দেশের মাধ্যমে এশিয়া মাইনর (দ্র) ও রাশিয়ায় (দ্র) ছড়িয়ে পড়ে। ইতালির রাভেনার সান্ ভিতালে (San Vitale) গির্জা ও প্রসিদ্ধ হাজিয়া সোফিয়া (Hagia Sophia) এই স্থাপত্যরীতির অন্তর্গত। এর বিকাশের দ্বিতীয় স্তর প্রভাবিত হয় প্রাচ্যের স্থাপত্য আদর্শ দ্বারা এবং এই অনুপম নিদর্শন ভেনিসে অবস্থিত সেন্ট মার্ক্ গির্জা। পরবর্তী স্তরে এই রীতি আরো অলঙ্কার-বহুল হয়ে ওঠে। মস্কোর ক্যাথিড্রাল গড়ে ওঠে এই রীতি ব্যবহার করেই।

বাইজান্টাইন সঙ্গীতকলা একটি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। এর মূল অংশ জুড়ে রয়েছে খ্রিস্টের স্তোত্র বা ধর্মীয় প্রার্থনা সংবলিত গান।

তুর্কিদের দ্বারা ১৪৫৩ সালে কন্সটান্টিনোপল অধিকারের ভেতর দিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

আ. হু.

বাইন মাছ   ঈল দ্র

বাইনারি সংখ্যাপদ্ধতি (Binary Number System)

সংখ্যা গণনার একটি পদ্ধতি, যেখানে যে কোনো সংখ্যাকে ২-এর ঘাত হিসাবে প্রকাশ করা হয়। প্রচলিত দশমিক পদ্ধতির সংখ্যা ১০-এর ঘাত হিসাবে বিবেচিত এবং এই পদ্ধতিতে ০,১,২...৯ পর্যন্ত মোট ১০টি অঙ্ক (digit) রয়েছে। বাইনারি পদ্ধতিতে ০ এবং ১ এই দুটো অঙ্ক।

দশমিক পদ্ধতিতে কয়েকটি সংখ্যা ও এর বাইনারি রূপ নিচে দেওয়া হল :

$৩ = ১ \times ২^{১} + ১ \times ২^{০} = ১১$

$৫ = ১ \times ২^{২} + ০ \times ২^{১} + ১ \times ২^{০} = ১০১$ ইত্যাদি

www.pathagar.com

বাইনারি সংখ্যার যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। এটি বুলিয়ান বীজগণিত নামে পরিচিত।

কম্পিউটার (দ্র)-সহ বিভিন্ন ডিজিটাল সিস্টেমে বাইনারি সংখ্যাপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

একটি বাইনারি অঙ্ককে বলা হয় বিট্ (Bit—Binary Digit)। এরূপ আটটি বিট্-এর সমন্বয়ে তৈরি হয় বাইট (Byte)।

মু. হা.

বাইনোকুলার (binocular)

বাইনোকুলার হল দ্বিনেত্র দূরবীক্ষণ (দ্র) বা দ্বিনেত্র দূরবীন। এক্ষেত্রে দু'টি দূরবীক্ষণকে একত্রে একটি ফ্রেমে আবদ্ধ করা হয় যেন এদের অক্ষদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল থাকে এবং দর্শক দুই চোখে ঠিক মতো লাগাতে পারেন। ১৬০৮ সালে হান্স লিপার্শের (Hans Lippershey) আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণটি

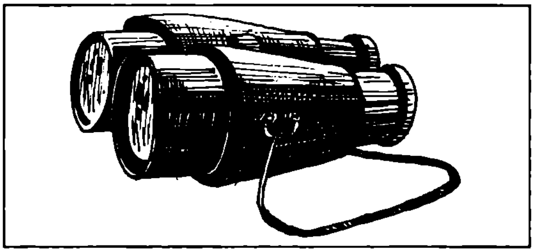

ছিল বাইনোকুলার বা দ্বিনেত্র দূরবীন। টেলিস্কোপ হচ্ছে আরেক রকমের দূরবীক্ষণ যন্ত্র (দ্র)।

কিন্তু তখন এটা তেমন জনপ্রিয়তা পায় নি। ১৮২৩ সালে অপর এক জন ওলন্দাজ জে. ভয়গ্ট্লেণ্ডার (J. Voigtlaender) পুনরায় বাইনোকুলার আবিষ্কার করেন। নাটক বা খেলা দেখার জন্য ব্যবহৃত হয় বলে এর অপর নাম অপেরা গ্লাস (opera glass)। এদের বিবর্ধনক্ষমতা খুব কম। বাইনোকুলারের অবজেক্ট লেন্স ও আইপিস উভয়টিতে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়। বাইনোকুলার নাটক, যাত্রা বা খেলাধুলা দেখতে ব্যবহৃত হলেও এর বিবর্ধনক্ষমতা কম থাকায় শিকার বা সামরিক কাজে তা ব্যবহৃত হয় না।

শা. ত.

বাইবেল (Bible)

যিশুখ্রিস্টের (দ্র) অনুসারীদের ধর্মগ্রন্থ। বাইবেলের দু'টি অংশ— পূর্ববিধান (Old Testament : ওল্ড টেস্টামেন্ট) ও নববিধান (New Testament : নিউ টেস্টামেন্ট)। পূর্ববিধানের মহর্ষিরা এবং নববিধানের খ্রিস্টশিষ্যেরা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে বাইবেলের বিভিন্ন অংশ লিপিবদ্ধ করেছেন। বাইবেলের মূল বিষয় মানবজাতির পরিত্রাণের কথা। পরিত্রাতা যিশুখ্রিস্টই উভয় বিধানের কেন্দ্র। পূর্ববিধানের মধ্যে আছে আশা, নববিধানে রয়েছে আদর্শ। পূর্ববিধানে আছে হিব্রু ভাষায় লিখিত ৩৮টি পুস্তক এবং গ্রিক ভাষায় লিখিত ৭টি পুস্তক।

পূর্ববিধানের শুরুতে রয়েছে জগৎসৃষ্টির বিবরণ, প্রথম নর-নারীর বিবরণ, মানবজাতির পাপে স্বর্গ থেকে পতন ইত্যাদি। পূর্ববিধান অংশে আছে প্রাগৈতিহাসিক কাল। এতে ঈশ্বরপ্রেরিত এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। নববিধানে সেই মহাপুরুষ হলেন স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট। নববিধানে আছে প্রথম খ্রিস্টাব্দে চলিত গ্রিক ভাষায় রচিত ২৭টি পুস্তক। পুস্তকগুলোর নাম হল— মথি, মার্ক, লূক, যোহন, রোমীয়, করিন্থীয়, গালাতীয়, ইফিষীয়, ফিলিপীয়, কলসীয় ইত্যাদি। নববিধানের শুরুতে যিশুখ্রিস্টের বংশাবলির পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর যিশুর জন্ম ও শিশুকালের বর্ণনা আছে।

বাইবেলের পূর্ববিধান রচনার কালে দেশে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা পূর্ববিধানে প্রচলিত। বাইবেলের বিষয়ও মানবজাতি তথা ঈশ্বরের মনোনীত ইসরায়েল জাতির পরিত্রাণের ইতিহাস।

বিশ্বে ধাতব টাইপে মুদ্রিত প্রথম বই গুটেন্বার্গ্ (দ্র) বাইবেল। বাইবেল পৃথিবীতে সর্বাধিক বিক্রিত বই। আর কোনো পুস্তকের এতগুলো ভাষায় অনুবাদের এত অধিক

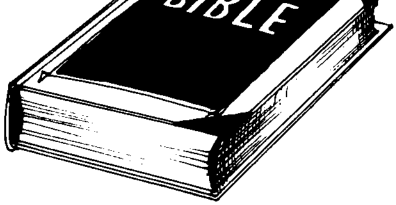

www.pathagar.com

তিনেক ভাষার মধ্যে বাংলার মর্যাদা প্রথম কয়েকটি ভাষার মধ্যে। এই ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বহু মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যে ভাষা-আন্দোলন (দ্র) সংগঠিত হয়, তাতে প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন বরকত, সালাম, রফিক, শফিক ও জব্বার। তাঁদের স্মরণে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে 'শহীদ দিবস' (দ্র) উদ্‌যাপন করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দিনে বাংলা ভাষার শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন।

বাংলা ভাষার লিখিত রূপে নিম্নবর্ণিত বর্ণমালা ও চিহ্ন ব্যবহৃত হয় :

স্বরবর্ণ (১১) ব্যঞ্জন বর্ণ (৩৮) :

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড-ড় ঢ-ঢ় ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য-য় র ল

শ ষ স হ

= ৪৯

তা ছাড়া া ি ী ু ূ ৃ ে ৈ ো ৌ ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

এই লিপির জন্ম হয়েছে প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী (দ্র) ও খরোষ্ঠী লিপি থেকে। অব্যবহিত পূর্বরূপের নাম কুটিল লিপি (দ্র)। বাংলা লিপির ধ্বনিবিন্যাসের শৃঙ্খলা উল্লেখ করার মতো। বাংলা ভাষার উচ্চারিত রূপে মূল স্বরধ্বনি সাতটি, যেমন—ই এ এ্যা আ অ ও উ =৭। এগুলোর অবস্থান নিচের চিত্রে দেওয়া হল :

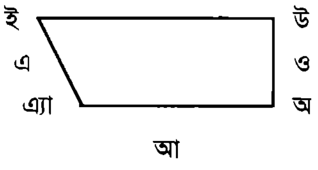

মূল ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো নিম্নরূপ :

উচ্চারণস্থান

উচ্চারণপ্রক্রিয়া			ওষ্ঠ্য	দন্ত্য	দন্তমূলীয়	মূর্ধন্য	তালব্য	কণ্ঠ	কণ্ঠনালী
স্পৃষ্ট ধ্বনি	অঘোষ	অল্পপ্রাণ	প্	ত্		ট্	চ্	ক্	
		মহাপ্রাণ	ফ্	থ্		ঠ্	ছ্	খ্	
	ঘোষ	অল্পপ্রাণ	ব্	দ্		ড্	জ্	গ্	
		মহাপ্রাণ	ভ্	ধ্		ঢ্	ঝ্	ঘ্	
উষ্মধ্বনি					স্		শ্		হ্
নাসিক্য			ম্		ন্			ঙ	
রণিত ধ্বনি					র্				
তাড়নজাত		অল্পপ্রাণ				ড়্			
		মহাপ্রাণ				ঢ়্			
পার্শ্বিক ধ্বনি						ল			

ম. মু.

বাংলা মাস মাস দ্র

বাংলা লিপি অক্ষর দ্র

বাংলা সাহিত্য

ইতিহাস থেকে জানা যায়, এক সময় পশ্চিমবঙ্গ-সহ আমাদের এই বাংলাদেশ বিভিন্ন শাসকের অধীনে আসে। রাজা শশাঙ্কের (দ্র) মৃত্যুর পর (৬৩৫ খ্রি.) প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর আক্রমণে দেশে গোলযোগ দেখা দেয়, তাতে বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যেরও বিপর্যয় আসে। এরকম বিপর্যয় পরেও আসে। পাল রাজাদের আবির্ভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আবার নির্বিঘ্ন হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তনের ইতিহাসকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন—

১. প্রাচীন যুগ—৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
২. মধ্যযুগ—১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ।
৩. আধুনিক যুগ—১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময়।

তবে বারো শতকের শুরুতে তুর্কিরা এ দেশ আক্রমণ করলে দেশে যে অরাজকতা দেখা দেয়, তাতে দেশের সাহিত্যচর্চাও বিঘ্নিত হয়। সে জন্য ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

১. প্রাচীন যুগ

এককালে ব্রাহ্মণেরা যেমন সংস্কৃত ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যের চর্চা করতেন, তেমনি বৌদ্ধরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। কিন্তু বাংলা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হলে বৌদ্ধরা তাদের পুঁথিপত্রাদিসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ওড়িষ্যা, আসাম ও নেপালে (দ্র) আশ্রয় নেয়। সে জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (দ্র) ১৯০৭ সালে নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে একটি বাংলা পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথিটি 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' বা চর্যাপদ (দ্র) নামে পরিচিত। এটিই প্রাচীন বাংলার একমাত্র নিদর্শন। তবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা তখন নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ায় চর্যাপদের ভাষায় ওড়িষ্যা, আসাম ও বিহারের ভাষাবৈশিষ্ট্যও দেখা যায়।

চর্যাপদে শবরীপা, লুইপা, ভুসুকপা, কাহ্নপাদ (দ্র) প্রমুখ তেইশ জন কবির সাতচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে। এই সব কবি জাতিতে বৌদ্ধ ছিলেন। এঁদের সিদ্ধাচার্য বলা হত। এঁরা বাংলা ভাষায় পদ লিখলেও এঁদের ভাষায় কিছু রহস্য ও হেঁয়ালি দেখা যায়। এগুলির আসল অর্থ অনেক সময় উদ্ধার করা বেশ কঠিন। ভাষার এই আলো-আঁধারী বৈশিষ্ট্যের জন্য চর্যার ভাষাকে 'সন্ধ্যা' ভাষাও বলা হয়। পদগুলোতে সেই সময়ের বাঙালির জীবন ও সমাজের ছবি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে।

২. মধ্যযুগ

তুর্কি মুসলমানদের হঠাৎ আক্রমণে বঙ্গদেশ তখন ভীষণ দুর্যোগের মুখোমুখি। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ তখন শেষ, শুরু হয়েছে মধ্যযুগ। তবে তুর্কি আক্রমণের পরে প্রায় দেড় শ' বছর বাংলা সাহিত্য নিষ্ফলা থাকে। শিবের গান ও চণ্ডীর গান ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। তুর্কি ধ্বংসচিত্র হিসাবে রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক একটি কবিতা পাওয়া যায়। তাও হয়তো পরবর্তী কালের রচনা। কাজেই বাংলা সাহিত্যর তখন বড়ই দুর্দিন।

১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ সময়টিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'মুসলিম যুগ' বলা হয়। এ সময় মুসলিম ইলিয়াস শাহী শাসনকর্তাদের উৎসাহ ও প্রেরণায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি ঘটে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে 'আদি মধ্যযুগ' ও 'অন্ত্য মধ্যযুগ'—এ দু'ভাগে ভাগ করলে আদি মধ্যযুগের একমাত্র সাহিত্যনিদর্শন মেলে বড়ু চণ্ডীদাসের (দ্র) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (দ্র) কাব্য। এ পুঁথি আবিষ্কার করেন পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। এর ভাষা ও লিপি খুব পুরানো। পুঁথিটির প্রথম পাতা এবং মাঝখানের ও শেষের কয়েকটি পাতা নেই। পুঁথির বিষয় হিন্দু পুরাণের রাধা ও কৃষ্ণের কাহিনী। বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়াও পরবর্তী কালে বিদ্যাপতি (দ্র), চণ্ডীদাস (দ্র), গোবিন্দদাস (দ্র), জ্ঞানদাস (দ্র) প্রমুখ কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করে গেছেন।

অন্ত্য মধ্যযুগে যদু বা জালালউদ্দীনের আমলে (১৪১৮–১৪৩৭) কবি কৃত্তিবাস (দ্র) 'রামায়ণ (দ্র)' কাব্য রচনা করেন। রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের আমলে (১৪৫৯–১৪৭৩) মালাধর বসু, যিনি গুণরাজ খাঁ উপাধি পেয়েছিলেন, ভাগবত অনুবাদ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের (দ্র) জীবনী অবলম্বনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস প্রমুখ কবি কাব্যে জীবনী সাহিত্য (দ্র) রচনা করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে 'সঞ্জয়' কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রমুখ কবি 'মহাভারত' (দ্র) অনুবাদ করেন। আসলে মুসলমান শাসকগণ হিন্দু পুরাণের কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন। অনেক পরে কাশীরাম দাসও (দ্র) মহাভারত অনুবাদ করেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে বাংলা মঙ্গলকাব্য (দ্র)। মঙ্গলকাব্যের তিনটি ভাগ—মনসামঙ্গল (দ্র), চণ্ডীমঙ্গল (দ্র) ও ধর্মমঙ্গল (দ্র)। এ ছাড়া শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ও রায়মঙ্গলের নাম উল্লেখ করা যায়। মঙ্গলকাব্যগুলো আসলে হিন্দু দেবদেবীদের মহিমা প্রচারের জন্য রচিত। মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবি বিজয় গুপ্ত (দ্র) চণ্ডীমঙ্গলের কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (দ্র) এবং কালিকামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র (দ্র) রায়গুণাকর। ধর্মমঙ্গলের বিশিষ্ট কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। আসলে ভাষার বৈভবে ও বাস্তব রস পরিবেশনের দিক থেকে মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান

ইরান-তুরানের বিভিন্ন গল্প-উপাখ্যান অনুবাদের মাধ্যমে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা। মধ্যযুগের মুসলিম অবদানকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করলে

www.pathagar.com

সংখ্যক সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। সাধারণ অনুবাদে বাইবেলের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০০০, শব্দসংখ্যা ৭,৫০,০০০। বাইবেলে অধ্যায়ের পদবিভাগ সর্বত্র সমান নয়। পদের শব্দসংখ্যা দুই থেকে পঞ্চাশের অধিক পর্যন্ত হয়।

বাইবেল বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় ১৮০০ সালে। উইলিয়াম কেরি (দ্র)-এর নামকরণ করেন 'মঙ্গল-সমাচার মতীয়ের রচিত'। কেরি-রচিত সম্পূর্ণ নববিধান প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে। ১৮০৯ সালে তা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণের নাম 'পবিত্র বাইবেল' পুরাতন ও নতুন নিয়ম। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা : পুরাতন নিয়ম ১৩৭৩ এবং নতুন নিয়ম ৪৪৪ পৃষ্ঠা।

বি. ব.

বাউল বাউল সাহিত্য দ্র

বাউল সাহিত্য

গায়ে আলখাল্লা, হাতে একতারা এরকম মানুষকে অনেকে দেখে থাকবে। এরা বাউল। আলখাল্লা ছাড়াও কৌপীনপরা একতারা হাতের বাউলও আছে। বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক আছে। তবে বাউলেরা জাতের ধার ধারে না। ইসলাম (দ্র) বা হিন্দুধর্মের (দ্র) আচারও তারা মানে না। তারা প্রেমের ও মানবতার বাণী প্রচার করে। মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর হোক এটি তাদের মনের কথা, এটি তাদের গানের কথা। বাউলেরা উদার ধর্মসাধক। পণ্ডিতদের মতে, সতেরো শতকে বাংলাদেশে (দ্র) বাউল মতের উদ্ভব হয়েছে। এ মতের প্রবর্তক হলেন আউল চাঁদ ও মাধববিবি। এ শতকে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলেন বীরভদ্র নামের এক বৈষ্ণব মহাজন। বীরভদ্র বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্যদেবের (দ্র) শিষ্য নিত্যানন্দের পুত্র। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া-পাবনা এলাকা থেকে শুরু করে পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম-বোলপুর পর্যন্ত বাউলের দেখা মেলে। বাউলদের মধ্যে গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই রকমই আছে। বাউলেরা গুরু মানে, গুরুর প্রতি তাদের ভক্তি অটল। গুরুর আখড়াতে তাদের সাধনা চলে।

'আউল' শব্দ থেকে 'বাউল' হয়েছে এ কথা কেউ কেউ বলেন। অন্য মতও আছে। কেউ বলেন, 'বাতুল' থেকে 'বাউল' হয়েছে; কারো মতে, 'বজ্রী' থেকে, কারো মতে 'বজ্রকুল' থেকে 'বাউল' হয়েছে। বাউল একটি ধর্মমত। এ মতের ভিত্তি রয়েছে বাংলাদেশের মাটিতে, আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলার বৈষ্ণবধর্মের (দ্র) ও ইরানের সুফিবাদের (দ্র) প্রভাব। বাউলেরা আত্মাকে খুব গুরুত্ব দেয়। কেননা তারা মনে করে, আত্মাকে জানলেই পরমাত্মা বা সৃষ্টিকর্তাকে জানা যায়। আত্মা বাস করে দেহের মধ্যে। সে জন্য বাউলেরা দেহকে পবিত্র মনে করে। বাউলদের মতে, দেহ হল খাঁচা আর আত্মা হল পাখি। বাউল কবি লালন সাঁই (দ্র) একটি পরিচিত ও জনপ্রিয় গানে এই কথাটি খুব চমৎকার করে বলেছেন—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।

বাউলদের গানই বাউল সাহিত্য এবং বাউল মত ও দর্শনকে কেন্দ্র করে এ সাহিত্য রচিত হয়েছে। বাউলেরা অশিক্ষিত, সে জন্য বাউল সাহিত্যকে লোক-সাহিত্যের

শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। অশিক্ষিত হলেও বাউলেরা জীবন সম্বন্ধে অনেক গূঢ় ও গভীর কথা বলেছেন। বাউল মত সতেরো শতকে জন্ম নিলেও উনিশ শতকে লালন সাঁইয়ের গানের জন্যই বাউল সাহিত্যের জনপ্রিয়তা। লালন শ্রেষ্ঠ বাউল-সাধক এবং শ্রেষ্ঠ বাউল গান-রচয়িতা। লালনের আগে কেউ বাউল গান লিখেছেন বলে জানা যায় না। লালন দীর্ঘজীবী ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। কুষ্টিয়া শহরের কাছাকাছি ছেঁউড়িয়াতে তাঁর আখড়া ছিল। লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের (দ্র) সাক্ষাৎ হয়েছিল এরকম জনশ্রুতি আছে। বলা হয়, লালনের লক্ষ লক্ষ অনুসারী ছিল এবং লালন প্রায় হাজার দুই গান বেঁধেছিলেন। লালন ছাড়া আরো অনেক বাউল কবি আছেন। কারো কারো মতে, বাউল কবিদের সংখ্যা তিন শ'র বেশি। অন্যান্য বাউল কবিরা হলেন পাগলা কানাই, শেখ মদন, গঙ্গারাম, পাঞ্জু সাঁই, দুদ্দু সাঁই, পদ্মলোচন, যাদুবিন্দু, পাঁচু, গোপাল গোঁসাই, বাখের সাঁই, এরফান সাঁই, শীতলং সাঁই, সিরাজ সাঁই এবং আরো অনেকে। রবীন্দ্রনাথ (দ্র) বাউল গানের ভক্ত ছিলেন। তাঁর গানে বাউলদের উদাস-করা বৈরাগী সুরের প্রভাব আছে। বাউলের ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মানুষের ধর্ম বলে প্রশংসা করেছেন। বাউল সাহিত্য প্রেমমূলক, উদার ও মানবতাবাদী। বাউল সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা।

আ. ক.

বাংলা আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি দ্র

বাংলা একাডেমী

বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের (দ্র) জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে-যেসব তরুণ আত্মাহুতি দেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার দাবি উঠলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) কোর্ট (তদানীন্তন সিণ্ডিকেট) এই লক্ষ্য সাধনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা কারণে তার বাস্তব রূপায়ণ তখন সম্ভব হয় নি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের (দ্র) একুশ দফা (দ্র) দাবির অন্যতম দাবি ছিল বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা। নির্বাচনে জয়ী হবার পর যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ববাংলার মুখ্য মন্ত্রীর (নুরুল আমিন) সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'-এ (বটতলা সংলগ্ন দ্বিতল ভবন, পরে ত্রিতল হয়েছে) বসেই যেহেতু বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র চলে, সেহেতু সেই বাসভবনকেই এর কার্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমান বাংলা একাডেমী চত্বরে অন্য যেসব ভবন রয়েছে সেগুলো পরে বিভিন্ন পর্যায়ে নির্মিত হয়েছে।

১৯৫৫ সালের ২৬শে নভেম্বর পূর্ববাংলা সরকার বাংলা একাডেমীর 'প্রিপারেটরি কমিটি' গঠন করে একটি আদেশ জারি করেন। ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল পূর্ব-পাকিস্তান আইন পরিষদে 'দ্য বেঙ্গলি একাডেমী অ্যাক্ট ১৯৫৭' গৃহীত হলে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মর্যাদা লাভ করে। ১০ই আগস্ট (১৯৫৭) এই আইন বলবৎ হয়।

বাংলা একাডেমীর কাজ শুরু হয় প্রাথমিকভাবে গবেষণা বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, সঙ্কলন ও প্রকাশনা বিভাগ এবং সংস্কৃতি বিভাগ নামে ৪টি বিভাগ নিয়ে। ১৯৫৭ সালের ১৮ই মে একাডেমীর কার্যক্রম পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে ৪টি বিভাগের পরিবর্তে ৬টি বিভাগ চালু করা হয়। বিভাগগুলো হল ১. গবেষণা বিভাগ, ২. অনুবাদ বিভাগ ৩. সঙ্কলন বিভাগ, ৪. প্রকাশনা ও বিক্রয় বিভাগ, ৫. সংস্কৃতি বিভাগ, ৬. গ্রন্থাগার বিভাগ। ১৯৬০ সালের ২৬শে জুলাই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার 'দ্য বেঙ্গলি একাডেমী (এমেণ্ডমেণ্ট) অর্ডিন্যান্স' জারি করলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বেশ কিছু রদবদল ঘটে এবং এর ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরো জোরদার হয়।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পর ১৯৭২ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি 'দ্য বাংলা একাডেমী অর্ডার, ১৯৭২' জারি করেন। এই আদেশবলে 'কেন্দ্রীয় বাঙ্লা উন্নয়ন বোর্ড' (দ্র) বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। ঐ একই আদেশে এর বিভাগসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করে ৭টি করা হয়। বর্তমানে এই সংস্থা পরিচালিত হচ্ছে সরকারের ১৯৭৮ সালের ৬ই জুন জারিকৃত 'দ্য বেঙ্গলি একাডেমী অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮' অনুযায়ী। তবে ১৯৮৩ সালের ২৫শে মে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের এক আদেশবলে একাডেমীর বিভাগের সংখ্যা কমিয়ে ৪টি করা হয়। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর এই ৪টি বিভাগ

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী

রয়েছে ৪ জন পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে এবং এর গ্রন্থাগারের দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালকের মর্যাদাসম্পন্ন এক জন প্রধান গ্রন্থাগারিক। একাডেমীর বর্তমান বিভাগগুলো হচ্ছে : ১. গবেষণা, সঙ্কলন ও ফোকলোর বিভাগ; ২. ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ; ৩. পাঠ্যপুস্তক বিভাগ; ৪. প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। এই ৪টি বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৪টি উপবিভাগ, মহাপরিচালক ও সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি উপবিভাগ এবং গ্রন্থাগার সমন্বয়ে বাংলা একাডেমীর বর্তমান কর্মতৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে। মহাপরিচালক এই সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি (দ্র) উপলক্ষে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা এবং সাহিত্যজগতের মনীষী ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম বিষয়ে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় জীবনব্যাপী সাহিত্যিক অবদানের জন্য প্রতি বছর একাধিক সাহিত্যিককে পুরস্কার প্রদানও এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা-স্তরের পাঠ্যপুস্তক, প্রয়াত লেখকদের জীবনী ও রচনাবলি প্রকাশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণাবৃত্তি প্রদান, লোকসাহিত্য চর্চা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান, বিভিন্ন বিষয়ে অভিধান রচনা ও প্রকাশ, বিদেশী ভাষায় রচিত গ্রন্থ বাংলায় এবং বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করাও বাংলা একাডেমীর উল্লেখযোগ্য কাজ। একাডেমীর গ্রন্থাগারটি সংগ্রহের দিক থেকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র (দ্র) নামে প্রতিষ্ঠিত 'শহীদুল্লাহ গবেষণাকক্ষে' সংরক্ষিত নানা দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি গবেষকদের জন্য খুবই সহায়ক।

একাডেমী নিয়মিতভাবে ৬টি সাময়িকী প্রকাশ করে থাকে। যথা : ত্রৈমাসিক 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ত্রৈমাসিক 'উত্তরাধিকার', কিশোরদের জন্য ষান্মাসিক 'ধান শালিকের দেশ', ষান্মাসিক 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞানপত্রিকা', ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ষান্মাসিক 'বাংলা একাডেমী জার্নাল' এবং বাংলা একাডেমীর চলতি কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত বুলেটিন মাসিক 'লেখা'। এসবের পাশাপাশি ১৯৭৮ সাল থেকে বাংলা একাডেমী চত্বরে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাসব্যাপী অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম (দ্র), রাজশাহী

www.pathagar.com

(দ্র), খুলনা (দ্র), কুষ্টিয়া ও সিলেটে (দ্র) বাংলা একাডেমীর ৫টি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

আ. হু.

বাংলা একাডেমী পুরস্কার

বাংলা একাডেমী পুরস্কার সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলাদেশের (দ্র) জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ সম্মানজনক স্বীকৃতি। বাংলা একাডেমী ১৯৬০ সালে এই পুরস্কার প্রবর্তন করে। সাহিত্যক্ষেত্রে সার্বিক অবদানের জন্য কবি– সাহিত্যিকেরা এই পুরস্কারে ভূষিত হন। এই পুরস্কার প্রবর্তনের প্রথম বছর থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শাখায় বছরে সর্বোচ্চ ৯ জনকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। শাখাগুলি হল উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কাব্য ও শিশুসাহিত্য।

১৯৮৫ সালে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় নি। ১৯৮৬ সাল থেকে বছরে দু'জন লেখককে সার্বিক সাহিত্যকর্মের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের নিয়ম করা হয়।

ফা. ন.

বাংলা ভাষা

বংশক্রমিক শ্রেণীবিভাজন অনুসারে বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর (দ্র) নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্যতম সদস্য। এর নিকটতম সহোদরা ভাষা হল অহমিয়া ও ওড়িয়া।

বাংলা ভাষা পৃথিবীতে (দ্র) পঞ্চম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা। (মান্দারিন ৮২ কোটি ৭০ লক্ষ, হিন্দি ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ, স্প্যানিশ ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ, ইংরেজি ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ) বর্তমানে প্রায় ২০ থেকে ২৫ কোটি লোক মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ব্যবহার করে। এই ভাষা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা। ভারতের (দ্র) পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে এই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রচলিত আছে। এ ছাড়া আসাম, মণিপুর, বিহার, ওড়িষ্যা ও আরাকানে বসবাসকারী বাংলাভাষী মানুষেরও মাতৃভাষা বাংলা। ভারতবর্ষের ষোলটি 'জাতীয় ভাষা'র অন্যতম হল বাংলা। উল্লেখ্য, উপমহাদেশের বাইরে যুক্তরাজ্য (দ্র), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), কানাডা এবং আরব দেশসমূহে বহু বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে। ফলে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে। বি বি সি (দ্র), ভয়েস অব আমেরিকা (দ্র) সহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলা ভাষায় বেতার কার্যক্রম প্রচারিত হয়।

সংস্কৃত ভাষা (দ্র) পৃথিবীর মানুষের অন্যতম মনন-সম্পদ। বাংলা ভাষা সেই সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্যে লালিত। ফলে ধ্বনিবিন্যাস, লিখনরীতি ও প্রকাশক্ষমতায় বাংলা দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান ভাষা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে বাংলা বিশ্লেষণাত্মক ভাষা, সংস্কৃতের মতো সংশ্লেষণাত্মক নয়। এই ভাষার পদক্রম অত্যন্ত নমনীয়। ফার্সি ভাষার বাক্যবিন্যাস ও শব্দসম্পদ বাংলা ভাষাকে প্রভাবিত করেছে।

একটি বাক্যকে রীতিগত প্রয়োজনে বিভিন্ন পদক্রমে বিন্যাস করা যায়। যেমন, 'আমি কাল বাড়ি যাব'—এই সরল বাক্যটিকে যথাক্রমে নিম্নলিখিতভাবে অদলবদল করা যায় :

কাল আমি বাড়ি যাব
কাল আমি যাব বাড়ি
কাল বাড়ি যাব আমি
বাড়ি যাব কাল আমি
বাড়ি যাব আমি কাল
বাড়ি কাল আমি যাব
যাব আমি কাল বাড়ি
যাব কাল বাড়ি আমি
যাব বাড়ি কাল আমি
যাব বাড়ি আমি কাল
আমি যাব কাল বাড়ি
আমি যাব বাড়ি কাল
আমি কাল বাড়ি যাব

পদক্রমের এই নমনীয়তা বাংলা ভাষায় রীতিগত সমৃদ্ধি এনেছে। বাংলা ভাষা এখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্যে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে বাংলা ভাষা ধারণাগত সম্পদে ঐশ্বর্যবান। বৈষ্ণব মত ও ব্রাহ্ম মত বিশ্লেষণের মাধ্যম ও বাংলাদেশের সংবিধানের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে বাংলা ভাষা বিশ্লেষণাত্মক গুণাবলি অর্জন করেছে অপরিমিত। এই ভাষায় সাহিত্যসাধনা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) নোবেল পুরস্কার (দ্র) পাওয়াতে এই ভাষা আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছে। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসও এর গর্বের বস্তু। পৃথিবীর হাজার

www.pathagar.com

খ্রিস্টীয় পনেরো শতকের আদি কবি শাহ মুহম্মদ সগীর (দ্র) ও জৈনুদ্দীনের নাম পাই। ষোল শতকের কবি সাবিরিদ খান ও দৌলত উজীর বাহরাম খানের (দ্র) নাম কে না জানে? এঁদের কাব্যে যে-কবিত্ব, তার বাইরে আছে পাণ্ডিত্যের সংযোগ। তবে খ্রিস্টীয় সতেরো শতক হচ্ছে মধ্যযুগের মুসলিম অবদানের শ্রেষ্ঠ বিকাশের সময়। 'পদ্মাবতী' (দ্র) কাব্যের কবি আলাওল (দ্র) এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি। কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও নীতিকথার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। তিনি আরাকান বা রোসাঙ্গে থেকে কাব্যচর্চা করেছেন।

বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বে রাজা রামমোহন রায় (দ্র), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (দ্র), অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (দ্র) পণ্ডিতবর্গ, যথা উইলিয়াম কেরি (দ্র) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু (দ্র) এবং সম্বাদ কৌমুদী, সম্বাদ প্রভাকর ইত্যাদি পত্রপত্রিকা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

মহাকাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (দ্র), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র), নবীনচন্দ্র সেন (দ্র) ও কবি কায়কোবাদের (দ্র) নাম স্মরণীয়। বিশেষ করে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যের ধারায় লিখিত হলেও এতে মানবভাগ্যের কথাই বড় হয়ে উঠেছে।

রাজা রামমোহন রায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আঠারো শতকের মুসলিম কাব্যের ধারাটি দোভাষী বা মিশ্র ভাষারীতিতে অর্থাৎ হিন্দি-উর্দু-বাংলা মেশানো পুঁথিতে রূপ নেয়। এটিই দোভাষী সাহিত্য (দ্র)। এ সময় ইংরেজদের আগমনের কালে মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও কলিকাতায় (দ্র) একটি স্বতন্ত্র ধারার মুসলিম সাহিত্যসমাজ গড়ে ওঠে। ফকির গরীবুল্লাহ (দ্র) ও সৈয়দ হামজা দোভাষী পুঁথির শ্রেষ্ঠ কবি। অবশ্য উনিশ শতক পর্যন্ত এ ধারাটি বজায় থাকে।

৩. আধুনিক যুগ

উনিশ শতক থেকেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু হয়। বাংলাদেশে ইংরেজেরা তখন তাদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের সংস্পর্শে বাঙালির জীবনে নবচেতনা আসে। বাংলা সাহিত্যেও পুরানো ধারার পরিবর্তে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। নতুনকে স্বাগত জানিয়ে বাংলা গদ্যের জন্ম হয়; পদ্য নতুন পথে বাঁক নেয়; নাটকে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে নতুনের জয়বার্তা যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে দুঃখের কথা এই যে শরীয়তি শিক্ষায় দীক্ষিত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ তখন পর্যন্ত নিজেদেরকে পুঁথির জগতেই আটকে রেখেছিলেন। ইংরেজের শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরে থেকে নতুনকে বরণ করার শক্তি তাঁদের আয়ত্তে ছিল না।

বাংলা গদ্যের পথ ধরেই বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। অনুমান করা হয়, বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হানা ক্যাথেরিন ম্যলেন্সের (Hannah Catherine Mullens) 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। পরে উপন্যাসে প্রায় নবযুগ আনেন 'কপালকুণ্ডলা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইত্যাদি উপন্যাসের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দ্র)। অবশ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের (দ্র) 'আলালের ঘরের দুলাল'ও একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

www.pathagar.com

মীর মশাররফ হোসেন

দীনবন্ধু মিত্র

কাজী নজরুল ইসলাম

জসীম উদ্‌দীন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

'বিষাদ-সিন্ধু' (দ্র) উপন্যাসের লেখক মীর মশাররফ হোসেনও (দ্র) এ সময়ের এক জন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। তা ছাড়া রয়েছেন রমেশচন্দ্র দত্ত (দ্র), দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে, 'চোখের বালি', 'গোরা' ইত্যাদি উপন্যাসের লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই (দ্র) পরবর্তী কালে মানুষের মনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন ধরনের উপন্যাস রচনা করেন।

আরো পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দ্র) 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' ইত্যাদি উপন্যাসে মানুষের জীবন ও সমাজকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। এই সময়ের মুসলিম ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মোহাম্মদ নজিবর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (দ্র) নাম উল্লেখযোগ্য।

বিচ্ছিন্ন কবিতার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (দ্র) কবিগানের (দ্র) ঢঙে কবিতা লেখেন। তবে বাংলা গীতিকবিতার সূচনা হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর (দ্র) দ্বারা। 'সোনার তরী', 'কল্পনা', 'বলাকা' ইত্যাদি কাব্যের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গীতিকবিতাকে অনেক দূর এগিয়ে দেন। তাঁকে অনুসরণ করে অনেকেই তখন গীতিকবিতা লেখেন।

উনিশ শতকের বাংলা নাটকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র (দ্র), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (দ্র), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), অমৃতলাল বসু এবং তাঁদের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (দ্র) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৩০-এর পরে বাংলা কবিতা নতুন মোড় নেয়। তখন গদ্যকবিতার ঢঙে কবিতা লেখার প্রবণতা দেখা দেয়। আরবি-ফার্সি শব্দের মিলনে কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) 'অগ্নিবীণা', 'ছায়ানট' ইত্যাদি ধ্বনি ও ছন্দময় কাব্য লিখে তখন বাংলা কাব্যের জগতে চমক এনেছেন। 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' কাব্যের কবি জসীম উদ্‌দীন (দ্র) পল্লীর জীবনকে আধুনিক চেতনায় নিরীক্ষণ করে কাব্য লেখেন। কবি গোলাম মোস্তফা (দ্র) ও বেগম সুফিয়া কামালও এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি।

আসলে তিরিশের পরবর্তী কবিদের 'রবীন্দ্রবলয়ের কবি'রূপে চিহ্নিত করা হয়। কেননা বিশেষ কয়েক জন ছাড়া তখনকার কবিদের অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই প্রভাবিত। চকিতে কারো কারো মধ্যে কবিতার নতুন আভা দেখা যায়। যেমন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

তিরিশের পরে যাঁরা গদ্যকবিতা লিখে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক রকম বিপ্লব আনেন, তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় কবি বুদ্ধদেব বসু (দ্র), প্রেমেন্দ্র মিত্র (দ্র), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। তবে 'রূপসী বাংলা', 'বনলতা সেন' প্রভৃতি কাব্যের কবি জীবনানন্দ দাশ (দ্র) আরো অনেক বড় মাপের কবি, ঠিক যেমনটা লক্ষ করি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (দ্র), বিষ্ণু দে (দ্র), অমিয় চক্রবর্তী (দ্র), শক্তি চট্টোপাধ্যায় (দ্র) প্রমুখ কবির শিল্পভাবনার মধ্যে।

তিরিশের পরে আধুনিক বাংলা উপন্যাসে নতুন ধারার

www.pathagar.com

ড. মুহম্মদ এনামুল হক

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

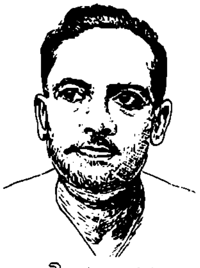

জীবনানন্দ দাশ

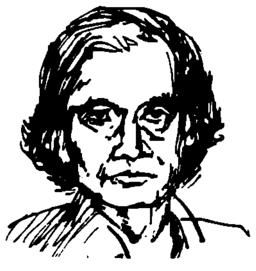

বুদ্ধদেব বসু

সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (দ্র) 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (দ্র) 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'; 'গণদেবতা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (দ্র) 'লালসালু', শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' ইত্যাদি উপন্যাসকে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের অমর সম্পদ।

১৯৪৭-এ ভারত বিভাগের পরে বাংলাদেশের সাহিত্যের ধারাটিও বৈচিত্র্য ও শিল্পমানে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। উপন্যাস, কবিতা ও নাটক ছাড়াও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের প্রবীণ সাহিত্যিকদের যে অবদান তা দেশ-বিদেশের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পর্যায়ে যাঁরা স্মরণীয় তাঁরা হচ্ছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (দ্র), ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (দ্র), অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই (দ্র), অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (দ্র), অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (দ্র), ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ডক্টর আনিসুজ্জামান প্রমুখ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনেকেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁদের সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য তাঁদের রচনা ব্যাপকভাবে পঠিত হওয়া প্রয়োজন।

আ. ই.

বাংলাদেশ

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পৃথিবীর (দ্র) অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র। আয়তন ৫৭,২৯৫ বর্গ মাইল বা ১,৪৮,৩৯৩ বর্গ কিমি। জলসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। উত্তর ও পশ্চিমে ভারত (দ্র), দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর (দ্র) এবং পূর্বে ভারত ও মায়ানমার (দ্র)। দক্ষিণে ৪৪৫ মাইলব্যাপী বঙ্গোপসাগর (দ্র) উপকূল। জনসংখ্যা ১৯৯৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১১ কোটি ১৪ লক্ষ বা ১১.৪ মিলিয়ন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৪০ জন। শিক্ষার হার ২৪.৮%। বাংলাদেশ ২০°৩৪ ও ২৬°৩৮´ উত্তর-অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮°০১ ও ৯২°৪১ পূর্ব-দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—(ক) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি এলাকা, যা সৃষ্টি হয় সাড়ে সাত কোটি বছর আগে; (খ) প্লাইয়েস্টোসিন যুগের চত্তর বা সোপান এলাকা, যা সৃষ্টি হয় ১০ লক্ষ বছর আগে; (গ) নবীন ভূ-তাত্ত্বিক যুগের প্লাবনভূমি এলাকা, যা সৃষ্টি হয় ২৫ হাজার বছর আগে। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এর পুরো নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (ইংরেজিতে People's Republic of Bangladesh)।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'আমার সোনার বাংলা' গানের প্রথম ১০ ছত্র এ দেশের জাতীয় সঙ্গীত (দ্র)। এ দেশের জাতীয় পতাকায় আয়তাকার ঘন সবুজ (বট্‌ল্ গ্রিন) ক্ষেত্রের মাঝখানে গোল লাল সূর্য রয়েছে। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬ এবং গোল সূর্যের ব্যাস পতাকার দৈর্ঘ্যের প্রায় এক পঞ্চমাংশ।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজ
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায় হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভা

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথের একটি গান থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে

www.pathagar.com

রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা

বাংলাদেশের জাতীয় ফুল, ফল, পাখি, মাছ ও জন্তু যথাক্রমে শাপলা (দ্র), কাঁঠাল (দ্র), দোয়েল (দ্র), ইলিশ (দ্র) ও বাঘ (দ্র)। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র)।

বাংলাদেশ এক কক্ষ বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ দ্বারা পরিচালিত। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী সরকার-প্রধান। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা দেশ শাসন করেন। মন্ত্রীদের মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী সচিব থাকে। সচিবেরা দেশের স্থায়ী কর্মচারী।

সমগ্র বাংলাদেশে ৬টি বিভাগ, ২১টি বৃহত্তর এলাকা, ৬৪টি জেলা, ৪৯০টি থানা, ৪৪৫১টি ইউনিয়ন, ৫৯,৯৯০টি মৌজা ও দু'কোটির ওপর পরিবার আছে। এ ছাড়া ৪টি সিটি কর্পোরেশন, ১০৬টি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা রয়েছে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। ধান (দ্র), পাট (দ্র), চা (দ্র) প্রধান ফসল। অন্যান্য ফসলের মধ্যে আখ (দ্র), ডাল (দ্র) তামাক (দ্র), তৈলবীজ, গম (দ্র), কাঁঠাল (দ্র), নারকেল (দ্র), আম (দ্র), কলা (দ্র), আলু (দ্র) ও পান (দ্র) প্রধান। মৎস্যসম্পদের মধ্যে মিঠা পানির ইলিশ (দ্র), রুই, কাতল, শিং, মাগুর, পাঙাশ, চিংড়ি (দ্র) প্রধান। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে ইলিশ, চিংড়ি, চাঁদা, রীটা, লাখ্যা, হাঙর, কোরাল, পোয়া, ছুরি ইত্যাদি প্রধান। খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস একমাত্র গুরুত্বপুর্ণ জ্বালানি সম্পদ। বর্তমানে হরিপুরে তেলের মওজুদ আছে বলে জানা গেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে জ্বালানি ও সার উৎপন্ন হয়। অন্যান্য খনিজ সম্পদের মধ্যে সিলেটের (দ্র) চুনা পাথর (দ্র) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কাচের জন্য বালি, চীনামাটি ও লিগনাইট (lignite) কয়লা পাওয়া যায়। প্রধান শিল্পের মধ্যে আছে পাট ও বস্ত্রশিল্প, পোশাক তৈরির কারখানা, চা, কাগজ (দ্র), সিমেন্ট (দ্র) ও সার কারখানা। প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক, কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চিংড়ি, ইলিশ, কাঁচা ও শুকনো চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য ও নিউজপ্রিন্ট।

বাংলাদেশের রাজধানীর নাম ঢাকা (দ্র)। ঢাকার জনসংখ্যা ৬৮,৪৪,১৩১ জন (১৯৯৪)। চট্টগ্রাম (দ্র) সমুদ্র-বন্দর ও দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। মংলা দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর। খুলনা (দ্র) ও রাজশাহী (দ্র) অপর দু'টি বড় নগরী। কক্সবাজার (দ্র) ও কুয়াকাটা সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান। নদীবন্দরের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল (দ্র), খুলনা, বাঘাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ, সরিষাবাড়ি, ভৈরব বাজার ও আশুগঞ্জ প্রধান। এ দেশে ৬টি ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। শীতকালে গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯° ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০° ডিগ্রি সেলসিয়াস। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° ডিগ্রি ও গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১° ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা (দ্র), মেঘনা (দ্র), যমুনা (দ্র), কর্ণফুলি (দ্র), সুরমা,পসুর ও তিস্তা। এ ছাড়া অন্তত ৭০০ ছোট-বড় নদী রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট (দ্র), যশোর, ঈশ্বরদী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর এবং রাজশাহীতে বিমানবন্দর আছে। তার মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট হল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

www.pathagar.com

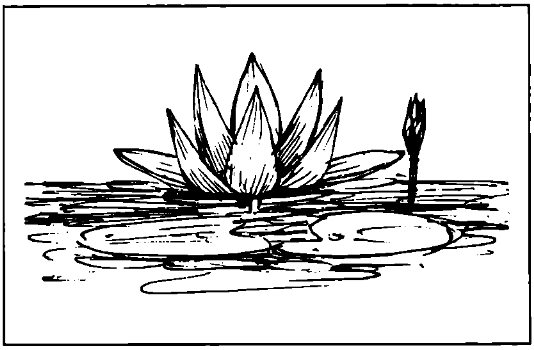

জাতীয় ফুল শাপলা

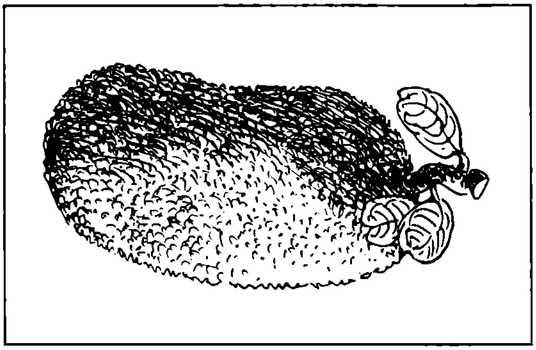

জাতীয় ফল কাঁঠাল

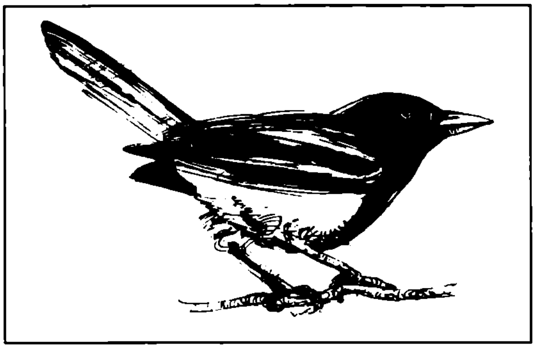

জাতীয় পাখি দোয়েল

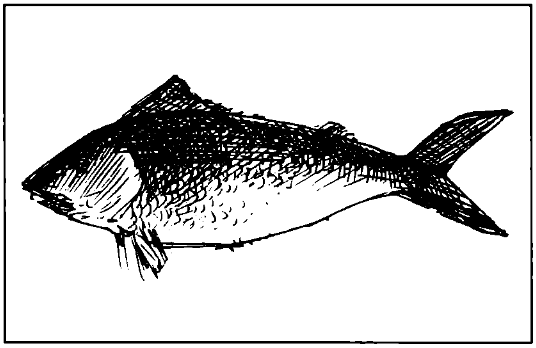

জাতীয় মাছ ইলিশ

টেলিভিশনকেন্দ্র আছে ঢাকায় এবং এর রীলে স্টেশন আছে চট্টগ্রামসহ ১০টি শহরে। বেতারকেন্দ্র আছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীসহ ৯টি শহরে। বিশ্ববিদ্যালয় ১১টি। তার মধ্যে ৬টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১টি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েটসহ মোট ১৩টি মেডিক্যাল কলেজ, ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৯৮৯টি কলেজ, ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ১১,০৯৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪৯,৯৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে (১৯৯৪)। কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রী ৩৬ লক্ষ, প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রী প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ। হাসপাতালের সংখ্যা ৯০৩। ৩,২০৮ জনের জন্য মাথাপিছু ১টি সীট ও ৫,০৫৪ জনপিছু ১ জন ডাক্তার আছে। রেজিস্ট্রীকৃত মোট ডাক্তারের সংখ্যা ২২,৪০০ জন।

বাংলাদেশের অধিবাসীকে বলে বাঙালি, নাগরিকত্ব বাংলাদেশী। বাঙালি মিশ্র জাতি। আজ আমরা যাকে বাংলাদেশ বলি, অতীতে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে তা অভিহিত হত। এক সময় এই অঞ্চল বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল, এবং বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। অধিবাসীদের শরীরে বহু জাতির রক্তের ধারা এসে মিশেছে, তাদের মননে বহু ভাব-চেতনার মিশ্রণ ঘটেছে । একই বাঙালি পরিবারে কালো ও গৌর বর্ণের মানুষ আছে। এ ছাড়া এদের চোখ, চুল, ঠোঁট ও চোয়াল নানা রকম। হাজার হাজার বছরের জনপ্রবাহে এরকম ঘটেছে। এই দেশের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক নাম ভেড্ডিড। বহু প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে জনসমাগম ঘটেছে। আদি ভেড্ডিড বা ভেড্ডা জাতির সঙ্গে মোঙ্গলপ্রতিম জনগোষ্ঠীর ধারা যুক্ত হয়েছে। তারপর পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে আর্যরা সম্ভবত তিন হাজার বছর আগে এসেছে। তারপর এল পারস্য ও তুর্কিস্তান থেকে শক (দ্র)। সেন বংশ (দ্র) এসেছে দক্ষিণ ভারত থেকে। দ্বাদশ শতকের শেষ পাদে এসেছে মুসলমানেরা। সব শেষে এল ইংরেজেরা। এ ছাড়া মোঙ্গল, পর্তুগিজ, আফ্রিকার নিগ্রো-হাবসি ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভোট বর্মীরা এ দেশে এসেছে। এসব জাতির রক্ত বাঙালিদের রক্তে মিশেছে বলে প্রাচীন কাল

www.pathagar.com

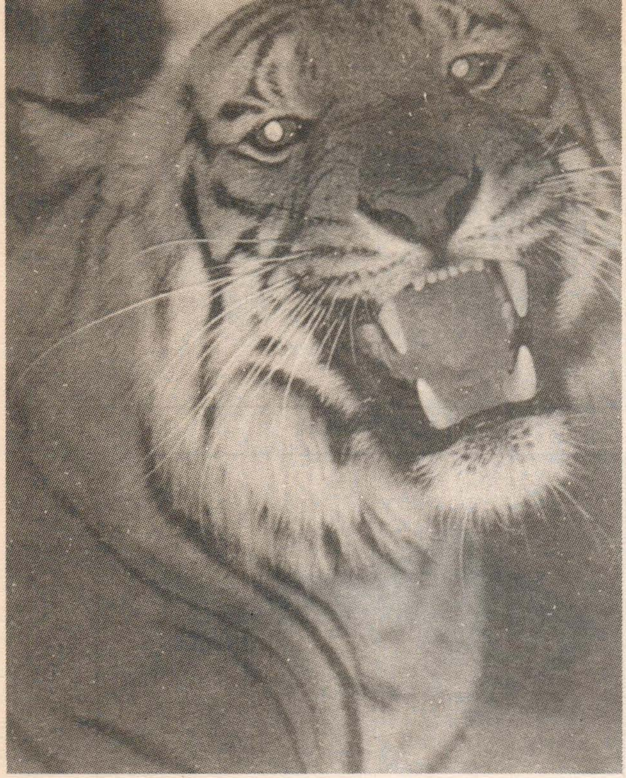

বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

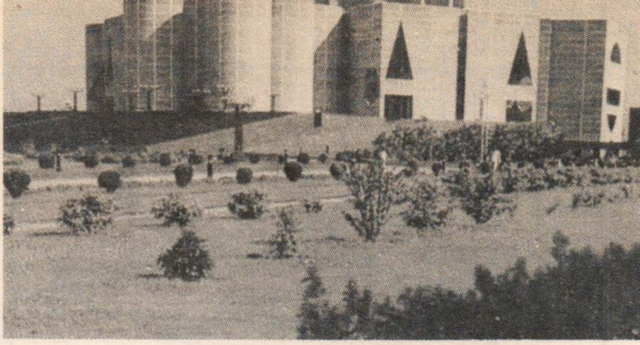

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন

চিরায়ত সাজে বাংলাদেশের উপজাতি মেয়েরা

থেকে আর্যরা বাঙালিদের বলত দস্যু, অসুর, পিশাচ, রাক্ষস, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি। বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত প্রাচীন বৃহত্তর বাংলার কয়েকটি জনপদের নাম বঙ্গ, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, বাঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্রভূমি, তাম্রলিপ্তি, গৌড় (দ্র) প্রভৃতি।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র)। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। পরে ২৬শে মার্চ তাঁর ডাকে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ঐ বছর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান, জৈন ও বাহাই ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থান। এখানে আরো আছে চাকমা (দ্র), মারমা (দ্র), সাঁওতাল (দ্র), মণিপুরী (দ্র), গারো (দ্র), ওঁরাও, রাজবংশী (দ্র), মুরং, পাংকো, বনযোগী, ত্রিপুরা (দ্র), কুকি, নাগা, রাখাইন (দ্র) প্রভৃতি উপজাতি ও আদিবাসী। এদেশের অধিবাসীদের আনুমানিক শতকরা ৯০ জন মুসলমান হলেও নানা ধর্মের মানুষের বাসভূমি এই বাংলাদেশ এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সকল শ্রেণীর অধিবাসীর মহান আত্মত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

বি. ব.

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ দ্র

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

দেশের উন্নয়ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ক একটি বহুমুখী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি তৎকালীন পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর নাম ছিল 'পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স' (পি আই ডি ই)। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে এর দপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকায় (দ্র) স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির এক আদেশবলে এর নতুন নাম-করণ করা হয় 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব

www.pathagar.com

ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ' (Bangladesh Institute of Development Studies = BIDS) বা 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান'। অংশত সরকারপ্রদত্ত সাহায্য, অংশত অন্যান্য দেশী-বিদেশী সংস্থার অর্থানুকূল্যে এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সংস্থাটি ঢাকার শেরে বাংলা নগরে আগরগাঁও-এ অবস্থিত। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজের আওতাভুক্ত জাতীয় উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক আর্থব্যবস্থা, জনগোষ্ঠীর জন্ম-মৃত্যুহার ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা এবং জ্ঞান আহরণ করা, লক্ষ্য হল সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতিসমূহ প্রণয়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা, জরিপ পরিচালনা ও গবেষণাপ্রকল্প গ্রহণ করা, আর্থব্যবস্থা, উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়, জন্ম-মৃত্যু হার ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানভুক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এসব ক্ষেত্রে আধুনিক গবেষণা রীতিপদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্যসরবরাহ ও অন্যান্য পরামর্শসহায়তার ব্যবস্থা করা।

বি আই ডি এস একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বারা এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী। প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হচ্ছেন এর ডিরেক্টর জেনারেল বা মহাপরিচালক। প্রশাসনিক কাজে তাঁকে সহায়তা করেন এর সেক্রেটারি, যিনি ট্রাস্টি বোর্ডেরও সেক্রেটারি। সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনার স্বার্থে ১২ জন সিনিয়র ফেলোও ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন।

বি আই ডি এস-এর গবেষণা পরিচালিত হয়ে থাকে মোট ৫টি বিভাগের মাধ্যমে। প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন ১ জন করে রিসার্চ ডিরেক্টর বা গবেষণা- পরিচালক। বিভাগগুলোর কাজ হচ্ছে— ১. সাধারণ আর্থব্যবস্থা, ২. গ্রামীণ উন্নয়ন, ৩. শিল্প ও ভৌত অবকাঠামো পরিচালনা, ৪. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ৫. জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিষয়ে গবেষণা।

সংস্থার ৭৬ জন অনুমোদিত গবেষকের মধ্যে বর্তমানে স্থায়ী গবেষণাকর্মকর্তার সংখ্যা ৬৩ জন। এঁদের মধ্যে ৩১ জনের বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রি রয়েছে। গবেষণাকর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে গবেষণা পরিচালকের সংখ্যা ৪, সিনিয়র গবেষণাফেলোর সংখ্যা ১৪ এবং সাধারণ গবেষণাফেলোর সংখ্যা ২৫ এবং গবেষণাসহযোগীর সংখ্যা ২০ জন। বি আই ডি এস দেশ-বিদেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এঁদেরকে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা দান করেন পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়।

বিগত কয়েক বছর ধরে এই সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কিছু গবেষণাসংস্থার সঙ্গেও সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। 'দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে সহযোগিতা বিষয়ক গবেষণা কমিটি'র অধীনে এই সহযোগিতাসম্পর্ক পরিচালিত হয়ে থাকে।

বি আই ডি এস-এর গবেষণাকর্মের সহায়ক এক সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তুলেছে। এক লক্ষেরও বেশি গ্রন্থ ও সাময়িকী এবং ২৫ হাজার 'মাইক্রোফিশ্' এর অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্থা দু'টি গবেষণাধর্মী সাময়িকীও প্রকাশ করে থাকে। এদের একটি ইংরেজি ভাষায়, নাম 'দ্য বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, রিসার্চ রিপোর্ট' (ত্রৈমাসিক); এবং বাংলা সাময়িকীটির নাম 'বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা' (ত্রৈমাসিক)। বেশ কিছু ভাষ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ ও গবেষণাপত্রও সংস্থাটি ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে।

এ ছাড়া প্রায় নিয়মিত সভা-সেমিনারের আয়োজনও এর তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত। এগুলোতে দেশ-বিদেশের গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ অংশ নিয়ে থাকেন।

আ. হু.

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল দ্র

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ৫ই এপ্রিল এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এই প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষেপে বি এ আর সি (Bangladesh Agricultural Research Council = BARC) বলে। রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৩২—'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আদেশ ১৯৭৩' বলে এটি গড়ে তোলা হয়। পরবর্তী কালে গণপ্রজাতন্ত্রী

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আদেশ ও নোটিফিকেশন বলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে এর আওতাধীনে আনা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Agricultural Research Institute = BARI) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Rice Research Institute = BRRI). বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Forest Research Institute = BFRI), বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি ইনস্টিটিউট (Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture = BINA) ও বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Jute Research Institute = BJRI)।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষি গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন, সম্প্রসারণ ও এ জন্য তহবিল জোগানো; কৃষি গবেষণার অগ্রাধিকারগুলোকে সময়োপযোগী করার জন্য কৃৎকৌশল গড়ে তোলা, কৃষি গবেষণা কর্মসূচির সমন্বয় সাধন ও মুল্যায়ন করা, কৃষি গবেষণাক্ষেত্রে মানবসম্পদের অবস্থা জরিপ এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উদ্ভাবন করা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এর নীতি নির্ধারণ করে থাকে এর ২৮ সদস্যের গভর্নিং কাউন্সিল। কৃষি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের (ডিভিশন) দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিব এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রধানদের নিয়ে এই কাউন্সিল গঠিত। এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান, মুখ্য নির্বাহী অফিসার গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম যথাযথভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব তাঁরই।

বি এ আর সি তিনটি প্রধান বিভাগ নিয়ে গঠিত। গভর্নিং কাউন্সিল, কমিটি এবং সেক্রেটারিয়েট। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর ঢাকার নতুন বিমানবন্দর সড়কে, ফার্ম গেটের কাছে অবস্থিত।

আ. হ.

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬২ সালে ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদ ৬টি, বিভাগ ৪২টি এবং ইনস্টিটিউট ৫টি। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ছিল ৩,১৮২ জন, শিক্ষক ছিলেন ৩৮০ জন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন ২,৫৭২ জন। আবাসিক হল ছিল ৯টি এবং ঐ শিক্ষাবর্ষে আবাসিক শিক্ষার্থী ছিল ৩,১৯৩ জন।

উক্ত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই ও সাময়িকী ছিল ১,৪৬,০৩৮টি এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৮৪৫ জন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ 'বাকসু' (BACSU= Bangladesh Agricultural University Central Students Union) নামে পরিচিত।

মে. খা.

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য গঠন ও ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি আধুনিক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সামগ্রিক মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৬ সালে ক্যাডেট কলেজের অনুরূপ চারিত্রকাঠামো নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস'। তখন এটি ছিল একটি প্রকল্প। পরবর্তী কালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটিকে সংক্ষেপে BKSP (অর্থাৎ Bangladesh Krira Shiksha Pratishthan) বলা হয়।

ঢাকার অদূরে সাভারে প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। ১০০ একর সমতল ভূমি জুড়ে এর সীমানা বিস্তৃত। ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়েছে। খেলাধুলার পাশাপাশি এখানে সাধারণ শিক্ষা লাভেরও সুযোগ আছে। এখানে আধুনিক পদ্ধতিতে যেমন ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, টেনিস ও ভলিবলে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৭ম থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করারও সুযোগ রয়েছে। তাই প্রশাসনিক কাঠামোগত দিক থেকে প্রতিষ্ঠানটি দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন ক্রীড়া কলেজ ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হলেন মহাপরিচালক। তাঁর অধীনে

www.pathagar.com

দু'জন পরিচালক আছেন। এক জন পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধান করেন আর অন্য জন ক্রীড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। এক জন অধ্যক্ষ এবং ১৬৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত আছেন। ১৫ জন আছেন স্থায়ী কোচ।

এ প্রতিষ্ঠানে ৫টি ফুটবল মাঠ, ২টি হকি মাঠ (এ দু'টির ১টি ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্ট্রোটার্ফ সিস্টেম ৯০ দ্বারা আবৃত), ২টি ক্রিকেটের, ১টি বাস্কেট বলের, ১টি হ্যাণ্ড বলের এবং ২টি টেনিসের মাঠ আছে। এখানে ১৭০০ বর্গমিটার আয়তনের ৪০০০ দর্শকের আসনবিশিষ্ট একটি

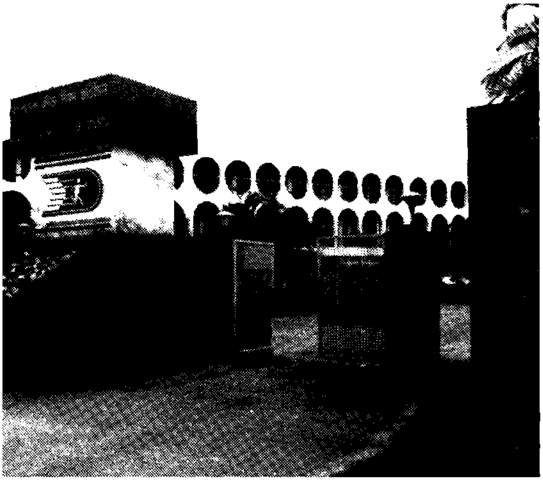

জিমনেশিয়ামও আছে। এতে মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ (দ্র), ব্যাডমিন্টন (দ্র), ভারোত্তলনসহ বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ খেলার সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে উন্মুক্ত জিমনেশিয়াম, ফিজিক্যাল ট্রেনিংগ্রাউণ্ড, অ্যাথলেটিক্স ট্রাক্স, সুইমিং পুল ইত্যাদি। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসিক সুবিধাও আছে।

১৯৮০ সালে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি শুরু হয়। এর পর জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিক সাফল্যের সূত্র ধরে এর অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সের ফুটবল দল ১৯৯০ সালে ডেনমার্ক থেকে ডানা কাপ এবং সুইডেন থেকে গথিয়া কাপ জয় করে আনে। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খেলোয়াড়েরা এখন জাতীয় ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিভা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

সুজ. ব.

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা / বিসিক

'স্বদেশের পণ্য কিনে হও ধন্য'—এই স্লোগান বা আদর্শকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন এবং বিকাশের লক্ষ্যে সরকার প্রতিষ্ঠিত মুখ্য প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৭ সালে সংসদীয় আইনের এক অধ্যাদেশবলে এটি গঠিত হয়। এটি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার (East Pakistan Small and Cottage Industries Corporation বা ইপসিক) উত্তরসূরি প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকার ১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা (Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation= BSIC)-এর মূল দায়িত্ব হল: ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, এই শিল্পখাতে ঋণ সরবরাহ এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসামগ্রীর বিপণনব্যবস্থা নিশ্চিত করা, সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে বা অন্য কোনো সহযোগী কিংবা অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তার সহযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন এবং এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরবর্তী কালে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তর করা সহ এই শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক বিভিন্নমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেশের বিভিন্ন স্থানে 'বিসিক শিল্পনগরী' স্থাপন। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা নাগাদ আরো ২২টি শিল্পনগরী স্থাপন করাও এর লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিমধ্যে এদের অনেকগুলিরই বাস্তবায়ন লক্ষ করা গেছে।

বিসিক-এর 'নকশাকেন্দ্রে'র দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সম্পর্কিত সর্বপ্রকার নকশা-নমুনা উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। এই প্রকল্পের অধীনে নকশা-নমুনা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে।

সংস্থার গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে ইউ এন ডি পি (দ্র) এবং আই এল ও-র সহযোগিতায় প্রচলিত ও অপ্রচলিত গ্রামীণ পণ্যের পুনরুজ্জীবন, শিল্পগুচ্ছভিত্তিক সুবিধা প্রদান, নৈপুণ্য উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, উৎপাদন উন্নয়ন

www.pathagar.com

ও বিপণনে সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

বিসিক-এর মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে ইউ এস এইড (USAID)-এর আর্থিক সহায়তায় দেশের মহিলাদের অর্থনৈতিক ও উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। বর্তমানে ২৭টি উপজেলা (সাবেক) জুড়ে এই প্রকল্পের তৎপরতা বিস্তৃত।

সংস্থাটির সাব-কণ্ট্রাক্টিং সুবিধা প্রদান ও জনসংযোগ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা। বিসিক ইতিমধ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন সম্ভব এমন ১০৬০টি ক্ষুদ্র শিল্প চিহ্নিত করে অগ্রণী ব্যাংকের সহযোগিতায় সেগুলোর বাস্তবায়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

বিসিক-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ হস্তশিল্প বিপণন সংস্থা'র লক্ষ্য হচ্ছে কারু ও হস্তশিল্প দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় ও রপ্তানি করা। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৮টি বিক্রয় ও প্রদর্শনীকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববাজারে দেশীয় পণ্যকে পরিচিত করাই এর মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে এর তরফ থেকে প্রায় নিয়মিত পুস্তিকা, নির্দেশিকা, ক্যাটালগ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সংস্থার 'বিনিয়োগ কর্মসূচি'র অধীনে ইতিমধ্যে বেসরকারি খাতে সর্বমোট ১০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে (এর মধ্যে ৮৫০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র শিল্প খাতে এবং ১৫০ কোটি টাকা কুটিরশিল্প খাতে)।

দেশী-বিদেশী মোট ১০টি ঋণপ্রকল্পের অধীনে এই সংস্থা শিল্প-উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া মোট ৩৫টি বিষয়ে বা ক্ষেত্রে এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।

বিসিক-এর মোট ৪০টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলো ঢাকা (দ্র), চট্টগ্রাম (দ্র), খুলনা (দ্র) ও রাজশাহী (দ্র) সদরে অবস্থিত। সংস্থার শিল্পসহায়ক কেন্দ্র মোট ৩৫টি জেলায় অবস্থিত।

আ. হু.

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর

দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং এর মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার লক্ষ্য থেকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি রাজধানীর শাহবাগের মোড়ে অবস্থিত নতুন ভবনে তার আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করে ১৯৮৩ সালের ১৭ই নভেম্বর। ১৯১৩ সালের ৭ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন ঢাকা যাদুঘরের সমুদয় নিদর্শন অধিগ্রহণ করেই শুরু হয় এর যাত্রা। বর্তমানে এর সংগ্রহে রয়েছে প্রাচীন নিদর্শনাদির এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। জাতীয় যাদুঘরের মুখ্য নির্বাহী অধিকর্তা এর মহাপরিচালক। (জাদুঘর শব্দটি এ ক্ষেত্রে 'যাদুঘর' হিসাবে লিখিত হলেও প্রধানত 'জাদুঘর' বানানেই সকলে লিখে থাকেন।)

বর্তমান যাদুঘরের পূর্বসূরি ঢাকা যাদুঘর প্রতিষ্ঠার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। অবিভক্ত ভারতে ঢাকায় এ জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব করা হয় ১৯১২ সালে। অবশেষে ব্রিটিশ সরকারের অর্থানুকূল্যে ও অনুমোদনক্রমে ঢাকার পুরানো সচিবালয়ে (বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ) দু'টি কক্ষ প্রস্তাবিত যাদুঘরের জন্য বরাদ্দ করা হলে তাতে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির দেওয়া কিছু নিদর্শনসামগ্রী প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়।

যাদুঘর সংক্রান্ত নোটিফিকেশন হয় ১৯১৩ সালের ৫ই মার্চ। আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন একই বছর ৭ই আগস্ট লর্ড কারমাইকেল। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী (দ্র) এর কিউরেটর হিসাবে যোগ দেন। ১৯২০ সালে তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টায় ঢাকার নিমতলি প্রাসাদের বারোদুয়ারিতে যাদুঘর স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত একটানা ৩৩ বছর তিনি ছিলেন ঢাকা যাদুঘরের কিউরেটর। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেন অসংখ্য অমূল্য প্রত্নসম্পদ। বলা যায়, তাঁর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই সুদৃঢ় হয় ঢাকা যাদুঘরের ভিত্তি।

www.pathagar.com

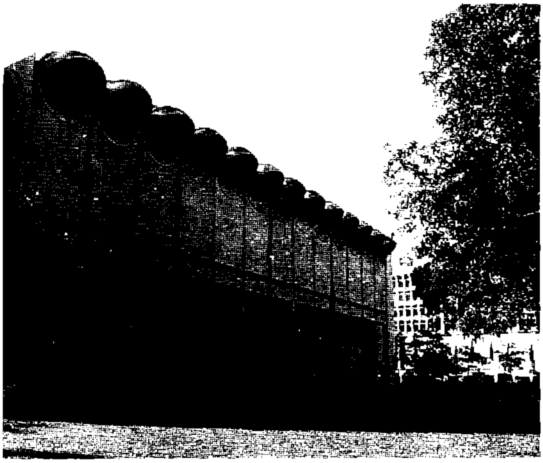

বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মৃত্যুর কয়েক বছর পর এর কিউরেটর হন অধ্যাপক আহমদ হাসান দানি। পরবর্তী কালে এর যে উন্নতি ও বিকাশ, তার মূলে এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯৬৩ সালে বলধা গার্ডেনের (দ্র) জাদুঘরের যাবতীয় নির্দশনসামগ্রী ঢাকা যাদুঘরে প্রদত্ত হলে এর সংগ্রহভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হয়।

১৯৩৬ সালে গঠিত এর পুরানো ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন করে গড়া হলে এর সভাপতি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই যাদুঘর তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র)। এই সময়সীমার মধ্যে এর যে সমৃদ্ধি, সে ক্ষেত্রে এই শিক্ষাপীঠের অবদানও অনস্বীকার্য।

১৯৭০ সালের ২১শে এপ্রিল সরকার 'ঢাকা মিউজিয়াম (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ)' অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে একে স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালের ২রা জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মিউজিয়াম সংক্রান্ত কমিশন গঠন করে। অবশেষে নানা উদ্যোগের পর ঢাকা মিউজিয়ামকে একীভূত করে ১৯৮৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর অধ্যাদেশ ১৯৮৩' জারি করা হয়। বর্তমান যাদুঘরে নিদর্শনসামগ্রীর সংখ্যা ৭০ হাজারেরও বেশি। চারটি বিভাগে এগুলো প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বিভাগগুলো হচ্ছে—১. ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা, ২. জাতিতত্ত্ব ও অলঙ্করণ শিল্পকলা, ৩. সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা এবং ৪. প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ। উল্লিখিত নিদর্শনাদি সুরক্ষার জন্য এখানে রয়েছে একটি সংরক্ষণ-রসায়নাগার।

এ ছাড়া এখানে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার, ফটোগ্রাফি ও অডিও-ভিস্যুয়াল বিভাগ এবং সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য দু'টি ছোট-বড় মিলনায়তনও রয়েছে। জাতীয় যাদুঘরের তিনটি শাখা-যাদুঘর হচ্ছে সিলেটের 'ওসমানী যাদুঘর', ঢাকার 'আহসান মঞ্জিল'(দ্র.) এবং চট্টগ্রামে সার্কিট হাউজে স্থাপিত 'জিয়াউর রহমান স্মৃতি জাদুঘর'। এর অমূল্য সব নিদর্শন দেখতে প্রবেশমূল্য লাগে মাত্র দু' টাকা।

আ. হ.

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল / বি এন পি

১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের (দ্র) উদ্যোগে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে'র (দ্র) ভিত্তিতে এই রাজনৈতিক দলটির প্রতিষ্ঠা ঘটে। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা এবং গণতন্ত্র সুরক্ষিত ও সুসংহত করা, সেই সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ এবং পুনরুজ্জীবিত জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ ও বহিরাক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করাই এই দলের ঘোষিত নীতি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' (দ্র) কথাটির উদ্ভাবক এই দল।

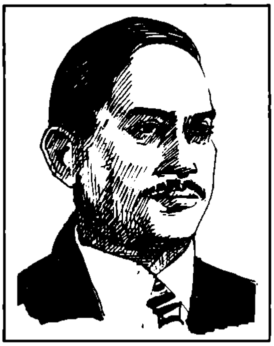

জিয়াউর রহমান

১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জিয়াউর রহমান জয়লাভ করেন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বি

www.pathagar.com

এন পি (BNP = Bangladesh Nationalist Party) গঠন করলে ১৯৭৭ সালের ২১ শে মে তাঁর ঘোষিত উনিশ দফা (দ্র) উন্নয়ন কর্মসূচি দলটির প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

১৯৮১ সালের ৩০শে মে ক্ষমতাসীন অবস্থায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এক রাজনৈতিক-সামরিক ষড়যন্ত্রে নিহত হন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বি এন পি মনোনীত প্রেসিডেন্টপ্রার্থী বিচারপতি আবদুস সাত্তার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভ করেন। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে দেশে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হলে বি এন পি-র নেতৃত্বে আসেন বেগম খালেদা জিয়া। বর্তমানে তিনি দলটির চেয়ারপার্সন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতনের আন্দোলনে বি এন পি প্রভূত অবদান রাখে।

এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভের পর বি এন পি সরকার গঠন করে। দলটির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন।

বি এন পির ঘোষিত লক্ষ্য ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করা, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা, বেসরকারি শিল্প-উন্নয়নের নীতি এবং দেশের সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধন ও প্রেসিডেন্ট জিয়া ঘোষিত ১৯-দফা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

বিরোধীদলের দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিতে গিয়ে বি এন পি রাষ্ট্রপতিপদ্ধতির সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং এ লক্ষ্যে তারা গঠনতন্ত্রও সংশোধন করেছে।

আ. হু.

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা

দেশের মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (দ্র) ১৯৭৬ সালে ঢাকায় জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকায় অবস্থিত। এবং দেশের সব ক'টি জেলায় এর শাখা-অফিস রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করা, মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান এবং নির্যাতিত মহিলাদের আইনগত সুযোগ-সুবিধা দান এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় মহিলা সংস্থা মহিলাদের নানাবিধ বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করে থাকে। এ ছাড়া শহরাঞ্চলের দরিদ্র বেকার মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সংস্থার কর্মসূচি রয়েছে।

খু. জা.

বাংলাদেশ টেলিভিশন

১৯৬৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ডি. আই. টি. (DIT= Dacca Improvement Trust) ভবনের নিচের তলায় কয়েকটি অপরিসর কক্ষে সীমিত সুযোগ–সুবিধা সম্বল করে এর গোড়াপত্তন হয়। কেন্দ্রাধ্যক্ষ ছিলেন জামিল চৌধুরী। এটি পরিচিত ছিল 'পাইলট টেলিভিশন, ঢাকা' নামে। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান (দ্র)। প্রাথমিক অবস্থায় এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠান দেখা যেত শুধু ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী ১০ মাইল ব্যাসার্ধ এলাকায়।

১৯৬৫ সালের ২৫শে মার্চ ঢাকা টেলিভিশন থেকে ৯০ দিনের পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের কাজ শেষ হয়। এর পর পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় 'টেলিভিশন প্রোমোটার্স কোম্পানি লিমিটেড' নামে গঠন করা হয় একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং এর পরিচিত প্রতীক 'পাইলট টেলিভিশন, ঢাকা' পরিবর্তন করে রাখা হয় 'পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস, ঢাকা'। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংস্কার সাধন করা হলে এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। পাশাপাশি গ্রহণ করা হয় ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মধ্যে ছিল প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য ৪টি করে ভি টি আর (ভিডিও টেপ রেকর্ডার) এবং আরো কিছু আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা। এই সব কাজ সম্পন্ন হলে ঢাকা কেন্দ্রের জন্য একটি স্থায়ী ভবন নির্মাণ এবং ঢাকার বাইরে চারটি উপকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

www.pathagar.com

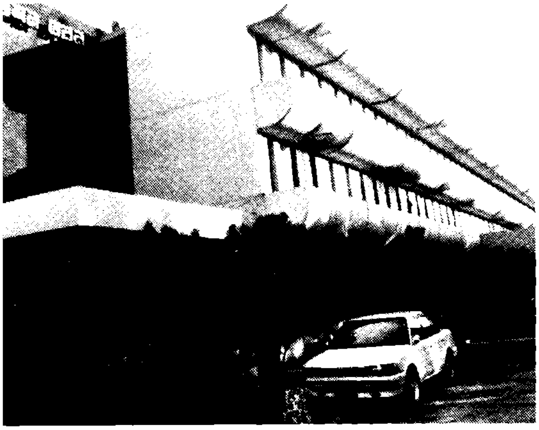

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টেলিভিশনের প্রচারচৌহদ্দি ৫০ মাইলে উন্নীত করা হয়, একই সঙ্গে ঢাকার রামপুরায় এই কেন্দ্রের বর্তমান নতুন ভবন নির্মাণের কাজও শুরু হয়। কিন্তু দেশের তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুখে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে এর নির্মাণকাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত টেলিভিশনের বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ দেশব্যাপী ঘোষিত 'অসহযোগ আন্দোলনের' প্রতি সক্রিয় সমর্থন দিয়ে এতে প্রচারিত যাবতীয় অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। শুধু তাই নয়, পাক সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ২৪শে মার্চ (১৯৭১) ঢাকা টেলিভিশন থেকে কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় নি। ২৬শে মার্চ (১৯৭১) এটি চলে যায় পাক সেনাবাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। তবে এ বছরেরই ১৩ই ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মুখে এর সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ২১শে ডিসেম্বর থেকে ঢাকা টেলিভিশনকেন্দ্র 'বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্পোরেশন, ঢাকা' এই পরিচিতি ধারণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান প্রচারের কাজ শুরু করে। ১৯৭২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত রাষ্ট্রপতির ১১৫ নম্বর আদেশবলে সাবেক পাকিস্তান টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্রের সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা'। রামপুরার বর্তমান আধুনিক যন্ত্রপাতিসজ্জিত ভবনে এর স্থানান্তর ঘটে ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চ। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (দ্র)। এর পর থেকে টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচারকাজ শুরু হয়। রামপুরার নতুন টিভি-ভবনের মূল নকশা-প্রণয়নকারী সুইডেনের প্রখ্যাত স্থপতি পিটার সেস্‌শিং। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (দ্র) এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। তারপর বাংলাদেশ টেলিভিশন সাদাকালোর যুগ থেকে প্রবেশ করে রঙিন যুগে।

১০টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে এর প্রচারকার্যক্রম বর্তমানে দেশব্যাপী সম্প্রসারিত। এ ছাড়াও সি এন এন, বি বি সি টেলিভিশন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে প্রচার করাও বর্তমানে এর সম্প্রসারিত কার্যক্রমের অধীন।

১৯৮৬ সালের ২৫শে মে 'জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ আদেশ' জারির মধ্য দিয়ে রেডিও এবং টেলিভিশনকে একীভূত করা হয়। তবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের কার্যক্রম ও প্রশাসনিক চরিত্র আগের মতোই সরকারি নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে।

আ. হু.

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

১৯৭০ সালের ১লা অক্টোবর সংসদীয় এক ধারাবলে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত একটি সংস্থা হিসাবে এর জন্ম। দেশের খাদ্যচাহিদা পূরণের উত্তরোত্তর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন নতুন ধান উদ্ভাবনের চেষ্টায় এর সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়োজিত। সংক্ষেপে এই সংস্থাকে 'বি আর আর আই (B R R I = Bangladesh Rice Research Institute) বলা হয়ে থাকে। ঢাকার (দ্র) নিকটবর্তী গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে বিশাল এলাকা জুড়ে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে :

ক. ধানের প্রতিটি দিক নিয়ে গবেষণা করা;

খ. প্রকল্প এলাকাগুলোতে যথাযথ কৃষিপ্রযুক্তি হাতে-কলমে প্রয়োগ করা;

গ. ধান উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতি সাধনে কর্মকর্তা ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া;

ঘ. মাটির উর্বরতা সাধন, ফসল বিধ্বংসী কীট-পতঙ্গ চিহ্নিতকরণ ও তাদের নির্মূলকরণে

www.pathagar.com

যথোপযুক্ত ও ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ. ধানের নতুন নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন করা; এবং

চ. দ্রুত ও অধিক ফলনযোগ্য ধান উদ্ভাবন ও উৎপাদনে গবেষণা পরিচালনা এবং এই লক্ষ্য অর্জনে বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দেশের ৬টি অঞ্চলে বি আর আর আই-এর আঞ্চলিক শাখা বা কেন্দ্র রয়েছে। এগুলো অবস্থিত বরিশাল (দ্র), কুমিল্লা, চর চান্দিয়া (সোনাগাজি), হবিগঞ্জ, রাজশাহী (দ্র) ও ফরিদপুরে।

সরকারি ছাড়াও বিদেশী বিভিন্ন সাহায্যসংস্থার অর্থানুকূল্যে এটি পরিচালিত।

১৯৮৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯ ধরনের উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রজাতি উদ্ভাবন করেছে।

আ. হু.

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থান, প্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক নিদর্শনসমূহের সঙ্গে বহির্বিশ্বের এবং দেশের নাগরিকদের পরিচয় করানোর লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

১৯৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে সরকারের জারিকৃত ১৪৩ নম্বর আদেশবলে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্যটন শিল্পের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সরকারের একটি সংস্থা হিসাবে জন্মের পর থেকে এটি কাজ করে আসছে। এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার কর্তৃক সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত এক জন চেয়ারম্যান এবং কমপক্ষে ২ জন ও সর্বাধিক ৪ জন পরিচালক নিয়ে সংস্থাটির পরিচালনা বোর্ড গঠিত।

'আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী, বাংলাদেশকে দেখুন'—এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন তার জন্মলগ্ন থেকেই ঢাকা (দ্র), কক্সবাজার (দ্র), চট্টগ্রাম (দ্র), রাঙ্গামাটি, বগুড়া, রাজশাহী (দ্র), রংপুর ও সিলেট (দ্র) -সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হোটেল, মোটেল, কটেজ, পান্থশালা, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সেগুলোর উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করে চলেছে। কর্পোরেশনের সবগুলো আবাসিক ইউনিটের সর্বমোট শয্যাসংখ্যা বর্তমানে ৭৫২টি। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পর্যটনকেন্দ্রে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রেস্তোরাঁও স্থাপন করা হয়েছে। এসবের অধিকাংশই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এই জাতীয় রেস্তোরাঁর মোট আসনসংখ্যা বর্তমানে ১৩৭৪।

দেশের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র সফরের সুবিধার্থে কর্পোরেশনের উদ্যোগে 'রেন্ট-এ কার' (Rent a Car) প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে পর্যটকদের পরিবহণের জন্য বর্তমানে মাইক্রোবাস, কোস্টার ও জিপসহ মোট ২৯টি গাড়িবহর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ১৯টি পরিবহণযান শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াতের সুবিধার্থে 'লিমুজিন সার্ভিস'ও চালু রয়েছে।

১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে কর্পোরেশন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বল্পকাল স্থায়ী বিমানযাত্রীদের জন্য ঢাকা নগর পরিভ্রমণ কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া ইউরোপীয় ও এশীয় পর্যটকদের জন্যও 'গ্রুপ ট্যুর' কার্যক্রম

চালু করা হয়েছে। এ দু'টি মহাদেশের পর্যটকদের জন্য বাংলাদেশের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার লক্ষ্য থেকে কর্পোরেশন এ দুই মহাদেশের বিভিন্ন পর্যটনসংস্থার সঙ্গেও অব্যাহত যোগাযোগ রেখে চলেছে। পাশাপাশি, ঢাকার শেরাটন হোটেল, হোটেল সোনার গাঁও, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ১টি করে মোট ৪টি পর্যটন তথ্যকেন্দ্রসহ দেশের আরো ১২টি স্থানে এ জাতীয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শেষোক্ত কেন্দ্রগুলো পাহাড়পুর (দ্র), মহাস্থানগড় (দ্র), ময়নামতী, সাগরদাঁড়ি, শিলাইদহ

www.pathagar.com

(দ্র), শাহজাদপুর (দ্র), ত্রিশাল, শ্রীমঙ্গল, মাধবকুণ্ড, সাতক্ষীরা, মুন্সিগঞ্জ ও দিনাজপুরের নীল সাগরে অবস্থিত।

এ ছাড়া ঢাকা নগরের অদূরে 'সালনা' ও 'চন্দ্রা' নামক বনভোজন-উপযোগী দু'টি স্থানের উন্নয়নের পাশাপাশি সংস্থার তরফ থেকে রাঙ্গামাটি পর্যটনকেন্দ্রকে আরো আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য সেখানে দু'টি পাহাড়কে সংযুক্ত করে একটি ঝুলন্ত সেতু এবং কনফারেন্স ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার উপযোগী দুই শত আসনবিশিষ্ট একটি মিলনায়তনও নির্মাণ করা হয়েছে।

পর্যটকের চিত্তবিনোদনের লক্ষ্য থেকে কক্সবাজার (দ্র) পর্যটন কমপ্লেক্সে নানা ধরনের বিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি 'সি-ফুড রেস্তোরাঁ' এবং সৈকত আলোকায়ন-ব্যবস্থাসহ নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার উপযোগী একটি মিলনায়তন।

পর্যটনশিল্পে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ঢাকার মহাখালীতে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটও স্থাপন করা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউট সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন উন্নত সুবিধাসংবলিত 'অবকাশ' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ হোটেল রয়েছে।

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যাতে দেশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করতে পারে, পর্যটন কর্পোরেশন সে ব্যাপারে অতীব মনোযাগী।

আ. হু.

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬২ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদ, ১৫টি বিভাগ ও ২টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪,৩১১ জন শিক্ষার্থী, ৩৮৪ জন শিক্ষক এবং ৯৯১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিলেন। আবাসিক হল ৮টি। ঐ বছর গ্রন্থাগারে বই ও সাময়িকী ছিল ১,০৮,২৩৫টি। আলোচ্য বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৬৫৭ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ

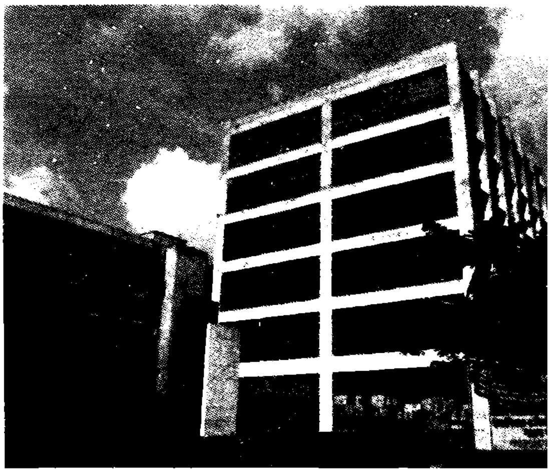

'ইউকসু' নামে পরিচিত।

মে. খা.

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পি আই বি)

কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে প্রশিক্ষণ দেওয়া, সংবাদপত্র অথবা গণসংযোগমাধ্যম-সমূহের সমস্যাদি নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করার লক্ষ্য থেকে ১৯৭৬ সালের ১৮ই আগস্ট বাংলাদেশ সরকারের এক অধ্যাদেশবলে এটি প্রতিষ্ঠিত। এর দপ্তর ঢাকার ৩ নম্বর সার্কিট হাউস রোডে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, সংক্ষেপে পি আই বি (PIB= Press Institute of Bangladesh) পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের একটি স্বায়ত্তশাসিত পরিচালনাবোর্ড রয়েছে। এক জন অবৈতনিক চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এই বোর্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। সংস্থার মহাপরিচালক পদাধিকারবলে সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ ছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সম্পাদক পরিষদ, সংবাদপত্রমালিক সমিতি ও ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দসহ সিনিয়র সাংবাদিকদের মধ্য থেকে দু'জন প্রতিনিধি এবং শিক্ষাবিদ ও জননেতাদের মধ্য থেকে কয়েক জন পিআইবি-র কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও এর দিঙ্‌নির্দেশনার জন্য বোর্ডের সভায় অংশ নিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

সংস্থার মূল লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, বেতার ও টেলিভিশনে কর্মরত সাংবাদিক ও গণসংযোগকর্মীদের সাময়িক প্রশিক্ষণ দেওয়া, তাদের পেশাগত মান বৃদ্ধি করা, আঞ্চলিক পর্যায়ে বিদেশী সংস্থাসমূহের সঙ্গে যৌথভাবে কোর্স, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা। পি আই বি ম্যানিলা ও লণ্ডনভিত্তিক প্যানোস ইনস্টিটিউটের সঙ্গে দু'টি ফিচার সার্ভিস অব্যাহত রেখেছে। 'নিরীক্ষা' নামে একটি মাসিক সাময়িকীও প্রকাশিত হয় তখন থেকে।

পি আই বি কমনওয়েল্থ প্রেস ইউনিয়ন, প্রেস ফাউণ্ডেশন অব এশিয়া ও সিঙ্গাপুরস্থ এশিয়ান ম্যাস কম্যুনিকেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টারের সক্রিয় সদস্য। প্রেস ফাউণ্ডেশন অব এশিয়ার বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর সদস্যপদ লাভ করার পাশাপাশি জাতিসংঘ সংস্থার 'ফোকাল পয়েণ্ট' হিসাবেও কাজ করে থাকে পি আই বি। সংস্থার নিজস্ব আধুনিক ছাপাখানাও রয়েছে, রয়েছে কম্পিউটারাইজ্‌ড টাইপসেটিং সুযোগ-সুবিধা। ইউনেস্কোর (দ্র) সাহায্যে এখানে একটি মাইক্রোফিল্ম ইউনিটও গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীসসমূহের পুরাতন কপি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

সংস্থার পাঠাগারটিও বিষয়সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে সমৃদ্ধ। ৬ হাজারেরও বেশি গ্রন্থ এর সংগ্রহে রয়েছে। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীও এখানে সংরক্ষণ করা হয়।

বর্তমানে পি আই বি'র কাজকর্ম চলে থাকে নতুন ও পুরাতন দু'টি ভবনে। ভবন দু'টির বিভিন্ন কক্ষে রয়েছে ছাপাখানাসহ লেকচার থিয়েটার, পাঠাগার, মাইক্রোফিল্ম ইউনিট ও আলোকচিত্র পরিস্ফুটনের জন্য ডার্করুম। এ ছাড়া দু'টি ভবনের কয়েকটি কক্ষে দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মও চলে থাকে।

পি আই বি পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা যুগিয়ে থাকেন প্রধানত বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক মঞ্জুরি আকারে। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাও সময় সময় একে আর্থিক সমর্থন যুগিয়ে থাকে।

পি আই বি'র অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গণসংযোগ, মুদ্রণ-প্রযুক্তি ও সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণকোর্স এবং সমাজ ও সাংবাদিক সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা। সাংবাদিকেরা যাতে বিদেশেও তাঁদের পেশাগত বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, পি আই বি তারও ব্যবস্থা করে থাকে।

আ. হ.

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, সংবাদপত্র ও সংবাদপরিবেশকদের মান উন্নয়নের লক্ষ্য থেকে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ২৫ নম্বর আইন) অনুসারে ১৯৭৯ সালে এই সংস্থার জন্ম। উল্লিখিত অ্যাক্টের ২৩ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী সরকার ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'প্রেস কাউন্সিল রুল্‌স্, ১৯৮০' এবং অ্যাক্টের ২৪ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী প্রেস কাউন্সিল ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে 'প্রেস কাউন্সিল রেগুলেশন, ১৯৮০' প্রণয়ন করে। এই সংস্থার দপ্তর ঢাকার ১০/এ সার্কিট হাউস রোডে অবস্থিত।

প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টের ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী এক জন চেয়ারম্যান এবং ১৪ জন সদস্যের (অবৈতনিক) সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত। সুপ্রীম কোর্টের এক জন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত অথবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হবার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন এক জন ব্যক্তি এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়ে থাকেন। কাউন্সিলের ১৪ জন অবৈতনিক সদস্যের মধ্যে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের ৩ জন, সংবাদপত্র পরিষদ এবং কাউন্সিল অব এডিটরস্-এর ৩ জন প্রতিনিধি মনোনীত করে থাকেন এর চেয়ারম্যান। এ ছাড়া স্পীকার মনোনীত করে থাকেন জাতীয় সংসদের এক জন সদস্য, আরো আছেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বাংলা একাডেমী (দ্র) থেকে এক জন করে প্রতিনিধি। কাউন্সিল অ্যাক্টের ৫ নম্বর ধারার বিধান অনুযায়ী সংস্থাটির চেয়ারম্যান ৩ বছর মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। তিনি এর সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকেন এবং সরকারের

www.pathagar.com

ধার্যকৃত হারে বেতন ও আনুষঙ্গিক ভাতাদি পেয়ে থাকেন।

প্রেস কাউন্সিল বর্তমানে নিম্নলিখিত ১০টি কমিটির মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। কমিটিগুলো হল : ১. জুডিশিয়াল কমিটি, ২. নিয়োগ কমিটি, ৩. শৃঙ্খলা কমিটি, ৪. অর্থ কমিটি, ৫. আইন মূল্যায়ন কমিটি, ৬. রুল্স্ কমিটি, ৭. সেমিনার কমিটি, ৮. প্রকাশনা কমিটি, ৯. আচরণবিধি কমিটি ও ১০. নিউজপেপার স্ট্যাণ্ডিং কমিটি।

প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টের ১১ (বি) ধারা অনুযায়ী সংবাদপত্র, সংবাদসংস্থাসমূহ এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় যে আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মোট ২১টি আচরণবিধি। এসবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে : ক. সত্য ঘটনা এবং মতামতকে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা; খ. পাঠককে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনো ঘটনাকে বিকৃত না করা; গ. মূল ভাষ্যে অথবা শিরোনামে কোনো সংবাদকে বিকৃত বা অসাধুভাবে চিহ্নিত না করা; এবং ঘ. মূল সংবাদের ওপর মতামত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা।

সংস্থার অ্যাক্টের ১২ নম্বর ধারা এবং ১৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী এর ক্ষমতা নিম্নরূপ :

কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদসংস্থা সাংবাদিকতার নীতিমালার মান বা সাধারণ রুচির বিরুদ্ধে কিছু করলে কিংবা সাংবাদিকতার নীতিমালার বিধি লঙ্ঘন করলে কাউন্সিল ঐ রূপ আচরণকারীদের বক্তব্য পেশের সুযোগ দিয়ে তার (কাউন্সিলের) আইনবলে প্রণীত প্রবিধি অনুযায়ী তদন্ত চালাতে পারে এবং তদন্তশেষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এ জাতীয় ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অভিযুক্তদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা, তাদের ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করা। এ ছাড়া কাউন্সিলের প্রণীত আচরণবিধি-লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণেরও বিধান রয়েছে। বস্তুত প্রেস কাউন্সিল মূলত একটি কোয়াসি-জুডিশিয়াল সংস্থা। সাংবাদিকতার নীতিমালা ভঙ্গ বা অন্যবিধ কারণে এখানে যেসব মামলা দায়ের করা হয়, সংস্থার চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এর 'জুডিশিয়াল কমিটি' সেসব মামলার যথারীতি শুনানি গ্রহণ করেন এবং রায় প্রদান করেন।

এই সংস্থা ইতিমধ্যে বিষয়সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু গ্রন্থও প্রকাশ করেছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'ডিসিশন অব্ দ্য প্রেস কাউন্সিল অব বাংলাদেশ', 'কমেন্টারি অব দ্য প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪' এবং 'ল'জ রিলেটিং টু প্রেস ইন বাংলাদেশ' ইত্যাদি।

আ. হ.

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

বনসম্পদ সংরক্ষণ, সুপরিচর্যা, নতুন করে বনাঞ্চল সৃষ্টি, বন ও এর আওতাধীন যাবতীয় বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং এইভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ এই প্রতিষ্ঠানটির জন্মের সামান্য পূর্ব-ইতিহাস রয়েছে।

সাবেক পাকিস্তানের (দ্র) কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে এ জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এর একটি শাখা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে (আজকের পাকিস্তান) এবং একটি শাখা ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশ)। পশ্চিম পাকিস্তানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বন উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বনসম্পদ বিষয়ে গবেষণার লক্ষ্য থেকে একটি গবেষণাগার হিসাবে। তখন এর নাম ছিল 'পূর্ব-পাকিস্তান বন গবেষণা ইনস্টিটিউট'। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের (দ্র) জন্ম হলে সরকারের এক কার্যনির্বাহী আদেশবলে একে বন অধিদপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করে নতুন নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট' (Bangladesh Forest Research Institute = BFRI) । এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত চট্টগ্রামে (দ্র)।

বাংলাদেশের বনসম্পদ সীমিত। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত। ফলে ক্রমবর্ধমান হারে বন কেটে গড়ে তোলা হচ্ছে বসত এবং বনকে পরিণত করা হচ্ছে চাষযোগ্য জমিতেও। তাই স্বাভাবিকভাবে বনাঞ্চলের ওপর সৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড চাপ। এ ছাড়া রয়েছে কাঠ ও জ্বালানি কাঠেরও তীব্র চাহিদা। এইভাবে বন উজাড় হওয়ার পটভূমিতে নষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য। এদিকে লক্ষ্য রেখেই বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম ৫টি বনওয়ারি উদ্দেশ্য এবং ১০টি প্রধান বন সেক্টরকে ঘিরে পরিচালিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

এর প্রধান প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান অরণ্যসম্পদ থেকে বনজাত সামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত করা; সরকারি বনাঞ্চল ও বেসরকারি ভবন সংলগ্ন স্থানসমূহে গাছপালার সংখ্যা যত দ্রুত সম্ভব বৃদ্ধি করা; ঝড় (দ্র)-ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও মাটির ক্ষয় রোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা; খাদ্য উৎপাদনের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রায় অবদান রাখা, বন্য প্রাণিকুলকে রক্ষা করা ইত্যাদি।

এই সব লক্ষ্যকে ঘিরে বাস্তব কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে ইনস্টিটিউটের প্রধান দু'টি শাখা রয়েছে—একটি বনজাত সামগ্রী বিষয়ক শাখা, অন্যটি বনব্যবস্থাপনা শাখা। প্রতিটি শাখার সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রধান এক জন করে মুখ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান এক জন ডিরেক্টর বা পরিচালক আছেন। আবার বনজাত সামগ্রী শাখা ৬টি বিভাগ এবং বনব্যবস্থাপনা শাখা ১১টি বিভাগ নিয়ে গঠিত। এ ছাড়াও এর ব্যাপক বিস্তৃত কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক আরো কিছু বিভাগ, উপবিভাগ ও উপশাখা রয়েছে।

আ. হু.

বাংলাদেশ বেতার

দেশের একমাত্র বেতার সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা (দ্র) শহরের নাজিমউদ্দিন রোডের একটি ক্ষুদ্র পরিসরের ভবন থেকে স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটারের সাহায্যে অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে এই অঞ্চলে শুরু হয় এর জয়যাত্রা। '৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এর কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে আসে শাহবাগস্থ (১২১ কাজী নজরুল ইসলাম এভেনিউ) ভবনে। ১৯৮৩ সালের ৩০শে জুলাই শেরে বাংলা নগরস্থ বর্তমান অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বেতার ভবনে এর ঢাকাকেন্দ্র স্থানান্তরিত হলে শাহবাগস্থ সাবেক সম্প্রচার ভবনটি মূলত বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তরে রূপান্তরিত হয়।

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে প্রদত্ত বাঙালি জাতির নিরঙ্কুশ রায়কে উপেক্ষা করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ছলচাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করলে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে দেশব্যাপী শুরু হয়ে যায় অসহযোগ আন্দোলন। বেতারের সকল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাতে সাড়া দিয়ে তাদের সাধ্যমতো দায়িত্ব পালন করে চলেন, প্রচার করতে শুরু করেন দেশপ্রেমমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি। তাঁরা তাঁদের চূড়ান্ত দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন চাকুরিচ্যুতি, জেল-জুলুম, এমনকি জীবনহানির সমূহ ঝুঁকি নিয়ে। এর প্রমাণ— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ; ঐ দিন সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রচণ্ড বাধার মুখে সভাস্থল থেকে সরাসরি সম্প্রচার করতে না পেরে পরদিন অথাৎ ৮ই মার্চ বেতার যোগে তাঁর রেকর্ডকৃত ভাষণ তাঁরা সম্প্রচার করেছিলেন। বেতারযোগে এই ঐতিহাসিক ভাষণ দেশব্যাপী প্রচারিত হওয়ার ফলেই মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

২৫শে মার্চ পাক বাহিনী এই বেতারকেন্দ্র দখল করে নিলে, এর কর্মকর্তা, কর্মচারি ও প্রকৌশলীদের অধিকাংশই আগে-পরে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যোগ দেন, অনেকেই 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' সংগঠনে এবং এর ন' মাসের নৈমিত্তিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে অমূল্য অবদান রাখেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হলে সরকারি এক আদেশবলে এই বেতারকেন্দ্রের নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ বেতার'। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তা বদলে গিয়ে হয় 'রেডিও বাংলাদেশ' (১৯৭৬)। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ (দ্র) সরকার পুনরায় 'বাংলাদেশ বেতার' নামটি পুনর্বহাল করেছে।

বর্তমানে এই সম্প্রচার কেন্দ্রের ঢাকা, চট্টগ্রাম (দ্র), রাজশাহী (দ্র), রংপুর, খুলনা ও সিলেটের (দ্র) ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ছাড়াও ৬টি ইউনিট এবং ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা ও রাঙ্গামাটি প্রেরণকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন দেশীয় ও বহির্দেশীয় কার্যক্রম মিলিয়ে সর্বমোট ৯২ ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। সার্বিক অনুষ্ঠানের মধ্যে গড়ে ৩০ ঘণ্টা বাচনিক অনুষ্ঠান এবং ৬২ ঘণ্টা সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এ ছাড়াও রয়েছে গণশিক্ষা বিষয়ক বা জনসংখ্যা, নিয়ন্ত্রণ সহায়ক অনুষ্ঠানের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় বা বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের কয়েক সহস্র শিল্পীর প্রতিভাবিকাশ ও শিল্পচর্চার এটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্রও।

বাংলাদেশ বেতারের সর্বমোট ১৭টি ট্রান্সমিটার ও

www.pathagar.com

৫৬টি স্টুডিও রয়েছে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে মধ্য ও হ্রস্ব তরঙ্গের ৭টি বিভিন্ন কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটার। ৫টি আর্ন্তজাতিক বেতার ইউনিয়ন, সংস্থা বা সংগঠনের সক্রিয় সদস্য বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে বিশ্বের ৩৯টি বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানবিনিময় চুক্তি রয়েছে। সংস্থাটির সমুদয় কার্যক্রম মূলত ৪টি প্রধান বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিভাগসমূহ হচ্ছে : ১. অনুষ্ঠান, ২. বার্তা ও মনিটরিং, ৩. প্রকৌশল ও ৪. প্রশাসন বিভাগ। মহাপরিচালক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ১৯৮৬ সালের ২৫শে মে জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে বাংলাদেশ বেতারকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানসূচি প্রচারে সহায়ক একটি প্রকাশনাও রয়েছে। 'বেতার বাংলা' নামের এই সাময়িকীটি প্রথম কিছুকাল পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশ পেলেও বর্তমানে মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

আ. হ.

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হলে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান ঢাকার ডেপুটি গভর্নরের আঞ্চলিক অফিসটিকে রাষ্ট্রপতি এক অস্থায়ী আদেশবলে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। এতে ব্যাংকটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে কাজ করার অনুমতি লাভ করে। পরে 'বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২' অনুযায়ী ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে একে স্থায়ীভাবে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক হিসাবে অর্থ-

বাজারের অভিভাবক, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক বিষয়ে এই ব্যাংক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এর প্রথম উদ্দেশ্য হল, দেশের মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, মুদ্রার প্রচলন করা ও মুদ্রামান রক্ষা করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য দেশে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও চাকরির সংস্থান করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। চতুর্থ উদ্দেশ্য, বৃহত্তম জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করা। পঞ্চম উদ্দেশ্য, বিদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সমতা রক্ষা করা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা। প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ শেয়ারের সমুদয় শেয়ার মূলধন সরকারকে বণ্টন করা হয়, অর্থাৎ এটি একটি খাঁটি সরকারি মালিকানায় পরিচালিত ব্যাংক। এর প্রধান অফিস ঢাকায় (দ্র) অবস্থিত। এ ছাড়া চট্টগ্রাম (দ্র), সিলেট (দ্র), বগুড়া, রাজশাহী (দ্র) ও খুলনায় (দ্র) এর ৫টি আঞ্চলিক বা স্থানীয় শাখা আছে। ঢাকায় প্রধান অফিস মতিঝিলে অবস্থিত এবং এর নিচের তলায় একটি স্থানীয় শাখা কাজ করে। শাখাগুলো প্রধান অফিসের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। দেশের যেসব স্থানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো শাখা নেই, সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হয়ে সরকারি ট্রেজারি অথবা সোনালী ব্যাংক কাজ করে।

এই ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদে এক জন গভর্নর, দু'জন ডেপুটি গভর্নর ও আট জন পরিচালক আছেন। গভর্নর এই পরিষদের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরগণ সরকার কর্তৃক তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন। আ. ন. হামিদুল্লাহ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান বিভাগ দু'টি হল ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগ। ইস্যু বিভাগের ওপর দেশে মুদ্রা প্রচারের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পিত। ব্যাংকিং বিভাগ দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং কাজ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হল দেশের সকল ব্যাংকের অভিভাবক ব্যাংক।

বি. ব.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান

কৃষি, বন, মৎস্য, ভূতত্ত্ব, মানচিত্র অঙ্কন, পানিসম্পদ, ভূমি ব্যবহার, আবহাওয়া (দ্র), পরিবেশ (দ্র), ভূগোল (দ্র), সমুদ্রবিজ্ঞান, শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তিকে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা এবং এই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারিক প্রয়োগের উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে। এটি ১৯৯১ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের বা পার্লামেন্টের (দ্র) এক আইনবলে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। সরকারমনোনীত ব্যক্তিবৃন্দকে নিয়ে গঠিত একটি পরিচালনা বোর্ডের অধীনে এর যাবতীয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। এক জন চেয়ারম্যান এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এর কার্যালয় অবস্থিত ঢাকার (দ্র) শেরে বাংলা নগরে। প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত নাম 'স্পারসো' (SPARRSO = Space Research and Remote Research Organization)। এর উদ্যোগে ইতিমধ্যে মহাকাশ ও দূর অনুধাবন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে সংগৃহীত হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যাপক তথ্য, যা বাংলাদেশের (দ্র) সার্বিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি বিভাগ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এর দায়িত্ব হচ্ছে সংগৃহীত তথ্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ্রাউণ্ড স্টেশন, বিশ্লেষক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ফিল্ড সরঞ্জামের তদারকি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ছবি প্রসেস করা। এর অধীনস্থ আলোকচিত্র বিভাগ শুধু সাদাকালো নয়, রঙিন ছবি পরিস্ফুটনেও সক্ষম, যা বিভিন্ন ধরনের গবেষণাকাজে সহায়ক হয়ে থাকে।

'স্পারসো'র কর্মতৎপরতায় বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিদেশী কয়েকটি সংস্থাও, যেমন ইউ এন ডি পি (দ্র), ইউ এস-এইড, ফরাসি সরকার, আই ডি আর সি এবং বিশ্বব্যাংকও অর্থ ও নানাবিধ সহায়তা যুগিয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো পরিচালিত গবেষণাকর্মের ফলাফল সম্পর্কে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থাকে অবহিত করা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করার পাশাপাশি তা নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে মতবিনিময় করা।

আ. হু.

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে বাংলার রাজধানী সোনার গাঁওয়ে এটি অবস্থিত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের লক্ষ্য নিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের (দ্র) একান্ত উদ্যোগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চের এক রেজল্যুশনবলে এটি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান।

রাজধানী ঢাকা (দ্র) থেকে ২৪ কিলোমিটার পূর্ব দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার অভ্যন্তরে সোনারগাঁও থানার প্রাণকেন্দ্র আমিনপুর ইউনিয়নের ইছাপাড়া মৌজায় ১৫০ বিঘা জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে এই ফাউণ্ডেশন। এতে রয়েছে পুরানো জাদুঘরভবন অর্থাৎ সরদারবাড়ি, প্রশাসনিক ও নতুন জাদুঘরভবন, পাঠাগার ও কাফেটেরিয়া ভবন, কারুপল্লী, এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসভবন, বনভোজনের জন্য নির্দিষ্ট ৫টি জায়গা, নৌবিহারের সুবিধাসজ্জিত প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ লেক, ৩টি কাঠের সেতু, ১টি পাকা ব্রিজ, ৭টি পুকুর এবং বিশাল উদ্যান ও ফলের বাগান।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল এর ১০টি গ্যালারি, যা পুরানো সরদারবাড়িতে অবস্থিত। এখানে সংগৃহীত নিদর্শনাদির সংখ্যা ৪ হাজারেরও বেশি। তার মধ্যে গ্যালারিগুলোতে প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে ৮ শ' নিদর্শন। নবনির্মিত জাদুঘরভবনটি উন্মোচিত হলে তাতে নকশীকাঁথা, মসলিন ও জামদানী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

১৯৭৬ সালে আনুষ্ঠানিভাবে কোনো কারুশিল্পের নিদর্শনাদির কাজ শুরু হলে লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির জন্য ব্যাপক সংগ্রহ-অভিযান শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই লক্ষ্যে 'লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর' প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ১৯৮০ সালে 'লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর ও শিল্পগ্রাম' নামে ১৫০ বিঘা জমি জুড়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯০ সালে এর প্রথম পর্যায়ে 'লোক ও কারুশিল্প যাদুঘর' প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। এখনো শিল্পগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়নের অপেক্ষায়। ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সরকার একে ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির

www.pathagar.com

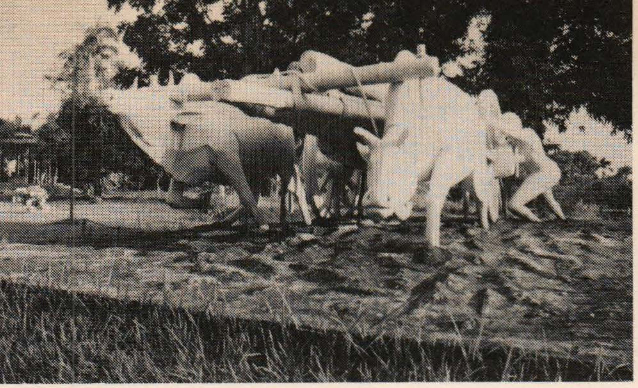

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন প্রাঙ্গণে স্থাপিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম 'শেষ প্রচেষ্টা'র ভাস্কর্যরূপ। নিচে : ফাউণ্ডেশনের ভিতরে রক্ষিত লোকশিল্পের দু'টি নিদর্শন

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউণ্ডেশন

সমুদয় তৎপরতা পরিচালনা ও তদারকির জন্য একটি প্রযত্ন পরিষদ রয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীকে সভাপতি করে মোট ১৪ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত। এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাউণ্ডেশনের পরিচালক। প্রতি তিন বছর অন্তর এই পরিষদ সরকারমনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটির একটি গ্রন্থাগারও আছে। এতে রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাধারণ ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থাদি। এ ছাড়াও এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, সেমিনার এবং জাতীয় ও স্থানীয় ভিত্তিক লোকউৎসব অনুষ্ঠান।

ঢাকার সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম বা কুমিল্লা অভিমুখী বাসে সোনারগাঁও যেতে সময় লাগে মাত্র আধ ঘণ্টা এবং মানুষের প্রবেশমূল্য বাবদ যে কোনো বয়সীর জন্য লাগে মাত্র ২ টাকা।

আ. হু.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদের বা পার্লামেন্টের (দ্র) এক বিধি (অ্যাক্ট) বলে এটি প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ এই জাতীয়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে চারুকলা, সঙ্গীত (দ্র), নৃত্য ও নাট্যকলার ক্ষেত্রে জাতীয় চর্চার বিকাশ ও প্রসার সাধন, পাশাপাশি যুগপ্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্য ও সমকালীন সাংস্কৃতিক প্রবণতা বিষয়ে গবেষণা চালানো, প্রতিভাবান শিল্পীদের সক্রিয় সহায়তা ও স্বীকৃতি প্রদান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার সাধনে সক্রিয় অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দান, সঙ্গীত-উৎসব, সম্মেলন, সেমিনার, নাট্যানুষ্ঠান, চিত্রকলা-প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ, বিতর্কানুষ্ঠান, স্টাডি গ্রুপ পরিচালনা ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন, বিদেশে সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশের শিল্প ও সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ, তেমনি বিদেশী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকেও বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন, তাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন, দেশের নবীন-প্রবীণ চারুশিল্পীদের শিল্পকর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের একই ক্ষেত্রে শিল্পীদের শিল্পকর্মের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান, তেমনি বিদেশেও বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনসহ দেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কৃত করা এবং শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গ্রন্থ, সাময়িকী ও পরিচিতি-জ্ঞাপক স্মরণিকা প্রকাশ করা।

শিল্পকলা একাডেমীর সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা মহাপরিচালক। পাঁচটি বিভাগকে ঘিরে এর কাজের পরিধি বিস্তৃত। বিভাগগুলো হচ্ছে: ১. সঙ্গীত ও নৃত্য; ২. চারুকলা; ৩. নাট্যকলা; ৪. গবেষণা ও প্রকাশনা এবং ৫. প্রশিক্ষণ। এই পাঁচটি বিভাগ পরিচালিত হয় পাঁচ জন পরিচালকের দায়িত্বে।

একাডেমী কার্যালয় ঢাকার (দ্র) সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। এর বিশাল চত্বরে প্রশাসনিক ভবনের পাশাপাশি রয়েছে প্রায় হাজার আসন বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক মঞ্চ। চিত্রকর্ম প্রদর্শনের জন্য গ্যালারি এবং বিভিন্ন বিভাগীয় কক্ষ। প্রত্যেক জেলাতেও রয়েছে এর শাখা, যেগুলোর কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কেন্দ্রীয় ইউনিট হিসাবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

আ. হু.

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

শিশুদের সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (দ্র) উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে সরকারি এক অধ্যাদেশবলে (অধ্যাদেশ নম্বর-৭৪) এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

প্রথমে এর কার্যালয় ছিল সেগুনবাগিচায়। পরে ১৯৭৭ সালে এটি স্থানান্তরিত হয় পুরাতন হাই কোর্ট এলাকার বর্তমান ভবনে।

এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় এক জন চেয়ারম্যানসহ ১২ সদস্যের একটি 'বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট' দ্বারা। এই বোর্ডের সকল সদস্যই সরকার-মনোনীত। পরিচালক এই প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কেন্দ্রীয় ইউনিট হিসাবে তার ৬৪টি জেলা ইউনিটের মাধ্যমে যাবতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে থাকে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রয়েছে স্থানীয় কমিটি। একাডেমীতে শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এসবের মধ্যে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, নৃত্য, সঙ্গীত (দ্র), বাদ্যযন্ত্র (দ্র), অভিনয়কলা, আবৃত্তি এবং ধর্মীয় বিষয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র শিশুদের এসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিনামূল্যে।

১৯৭৮ সাল থেকে শিশু একাডেমী দেশব্যাপী আয়োজন করে আসছে 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা'। বর্ষা ঋতুতে আয়োজন করা হয় 'মৌসুমি প্রতিযোগিতা'। এটিও সারা দেশভিত্তিক। এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে 'শিশু আনন্দমেলা', বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের অংশ গ্রহণ, শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ, শিশু সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল বিদেশে প্রেরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিশুতোষ গ্রন্থের প্রকাশনা ও

www.pathagar.com

বিপণন। এ ছাড়া শিশু-কিশোরদের সুপ্ত সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে দেশের নবীন-প্রবীণ লেখকদের রচনাসম্ভারে শিশু একাডেমী প্রকাশ করে থাকে সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'শিশু'। বাংলা ১৩৯৬ সনে এর পক্ষ থেকে প্রবর্তন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার' (দ্র)। এ ছাড়া একাডেমী অগ্রণী ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে প্রদান করে থাকে প্রতি বাংলা বছরে 'অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য ও শিশু-নাট্য পুরস্কার' (দ্র)।

একাডেমীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শিশু-কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থে সমৃদ্ধ। এর নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা ইউনিটেও রয়েছে গ্রন্থাগার। শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর উদ্যোগে আয়োজন করা হয়ে থাকে গ্রন্থাগার-ভিত্তিক প্রতিযোগিতা।

এর একটি ভবনে গড়ে তোলা হয়েছে 'শিশু জাদুঘর' (দ্র)। দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যেই এর প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যেসব বীর শিশু-কিশোর বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়েছে, এই জাদুঘরে তাদের ছবি, জীবনবৃত্তান্ত এবং তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষিত রয়েছে।

শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন রয়েছে 'জিয়াউর রহমান মিলনায়তন'। পুরোপুরি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্রায় এক হাজার আসনবিশিষ্ট এই মিলনায়তন শিশু-কিশোরদের নানা অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত। এ ছাড়া একাডেমীপ্রাঙ্গণে রয়েছে গণ-অভ্যুত্থান '৬৯ (দ্র)-এর বীর কিশোর শহীদ মতিউর রহমান মল্লিকের (দ্র) নামে "মতিউর মঞ্চ"।

প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন একটি কক্ষে রয়েছে চিকিৎসাকেন্দ্র, যেখান থেকে শিশুদের নিয়মিত রোগ প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা-সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

আ. হু.

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার বাংলা ১৩৯৬ সন থেকে শুরু হয়েছে। শিশুসাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য বছরে এক জন বাংলাদেশী সাহিত্যসেবীকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এক জন কবি বা সাহিত্যিক জীবনে একবার মাত্র এই পুরস্কার লাভ করতে পারবেন। দেশের শিশুসাহিত্যচর্চায় ব্যাপক উৎসাহ প্রদান এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রদত্ত বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এ যাবৎ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের শীর্ষমানের পুরস্কার হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই পুরস্কার মরণোত্তর পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয় না। তবে পুরস্কার বিবেচনাকালের বছরে যদি কেউ মারা যান, তিনি এই পুরস্কার লাভ করতে পারেন।

পুরস্কারের মান নগদ পঁচিশ হাজার টাকা এবং একটি সম্মাননাপত্র।

১৩৯৬ সন থেকে ১৪০২ সন পর্যন্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত সাত জন প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক হচ্ছেন যথাক্রমে সাজেদুল করিম (দ্র), আতোয়ার রহমান, হোসনে আরা, কাজী আবুল কাসেম, রোকনুজ্জামান খান, ফয়েজ আহমদ ও সুকুমার বড়ুয়া।

ফা. ন.

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসস দ্র

বাংলাদেশ সবুজ সেনা শিশুসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) একাডেমী

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন, পররাষ্ট্র ও সচিবালয় ক্যাডারের তরুণ ও মধ্য-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যুৎপত্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান, তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য থেকে ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ঢাকা (দ্র) শহরের কেন্দ্রবিন্দু শাহবাগ এলাকায় মোট ২.৩৫ একর জমির ওপর এর পাঁচতলাবিশিষ্ট প্রধান ভবন, আবাসিক ভবন ও খেলার মাঠ অবস্থিত।

এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রশাসন, সচিবালয় ও পররাষ্ট্র ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে নেতৃত্বদান ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুণাবলি অর্জনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং এর মাধ্যমে তাঁদেরকে দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে এক দল সুশৃঙ্খল, দায়িত্বসচেতন ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

এটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন একটি সমন্বয়ক দফতর। পুরোপুরি সরকারি এই সংস্থার কর্মকাণ্ড-সহায়ক প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যাবলির নীতি নির্ধারণ করে থাকে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়।

একাডেমীর সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এক জন মহাপরিচালক আছেন। তিনি সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার এক জন কর্মকর্তা। কয়েক জন কর্মকর্তা নিয়ে মহাপরিচালকের নেতৃত্বাধীন একটি অনুষদমণ্ডলী রয়েছে। অনুষদমণ্ডলীর সবাই একাডেমীর প্রশিক্ষণকাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বর্তমানে অনুষদভুক্ত সদস্যবৃন্দ প্রধানত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন, পররাষ্ট্র, সচিবালয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং হিসাব ও নিরীক্ষা ক্যাডারভুক্ত। তাঁরা সরকার কর্তৃক প্রেষণে আসেন।

এখানে তিনটি বিভাগের ক্যাডারভুক্ত যেসব নবীন ও মধ্য-পর্যায়ের কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের জন্য আসেন, তাঁদের সবাই সরকারি কর্মকমিশন আয়োজিত দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক নির্বাচিত ও নিয়োজিত হন। প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর মধ্য থেকে মাত্র স্বল্প সংখ্যক মেধাবী প্রার্থী উক্ত তিনটি ক্যাডারে শূন্য পদ অনুযায়ী নিয়োগ পেয়ে থাকেন। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে অন্তত দ্বিতীয় বিভাগের স্নাতক ডিগ্রি।

বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগে ক্যাডারদের বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এই একাডেমী। এখানে শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতার চাইতে প্রায়োগিক বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

একাডেমীর মূল পাঁচতলা ভবনের ডর্মিটরিতে ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থীর বাসস্থানের সুবিধা বিদ্যমান। এর নিজস্ব ২৫০ আসন বিশিষ্ট মিলনায়তন ছাড়াও ডাইনিং রুম ও বিনোদন-কক্ষ রয়েছে। একাডেমীর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত পাঠাগারটিও বিবিধ বিষয়ের গ্রন্থে সমৃদ্ধ।

আ. হু.

বাংলাদেশী জাতীয়তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে যাঁরা জন্মসূত্রে অধিবাসী বা নাগরিক তাঁরা রাষ্ট্রিক জাতীয়তা তথা নাগরিকত্বের পরিচয়ে 'বাংলাদেশী'। বাংলাদেশী জাতীয়তা একজন নাগরিকের নাগরিকত্বের পরিচয় মাত্র।

আ. র.

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাকে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' নামে নতুন পরিচয়ে চিহ্নিত করেছেন। বি এন পি-র (দ্র) রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে এটি গৃহীত।

একটি দেশের জনগণ স্থূল দৃষ্টিতে একটি মিশ্র জনসংখ্যা। এই মিশ্র জনসংখ্যা মিল-গরমিল নিয়ে ধর্মভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক হয়ে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে বসবাসের ফলে তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য গড়ে ওঠে। এই ঐক্য দেশটির প্রেক্ষাপটে গভীরতর হয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলে।

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও বাহাই। আবার ভাষা এবং সংস্কৃতির বৃহত্তম

www.pathagar.com

সংজ্ঞায় বাঙালি (অবশ্য পাহাড়িদের সংস্কৃতি ও ভাষা ভিন্ন)। ভাষা, সংস্কৃতি এবং এই উপমহাদেশে বাংলাদেশের অভ্যুদয় —ইতিহাস হিসাবে এটা এথ্‌নিক বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। কিন্তু সমগ্র জাতীয়তার পরিচয়ে রয়েছে আরো একাধিক উপাদান।

শুধু ধর্মের পরিচয়ে জাতীয়তাবাদ (ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ) বা ভাষার ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ (ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ) সমগ্র নয়, বরং আংশিক জাতীয়তাবাদ। কিন্তু বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের বাঙালি ভাষায় বাঙালি, ধর্মে মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং জাতি হিসাবে বাংলাদেশী।

ব. চৌ.

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

মার্ক্সবাদ-ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক সংগঠন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ৬ই মার্চ নতুন করে গঠিত হয় দলটি। প্রথমে সারা পাকিস্তান ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর অধীনে এর তৎপরতা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও পাকিস্তান সরকারের দমননীতির মুখে তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় নি। ফলে, পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ শাখা প্রায় স্বতন্ত্রভাবেই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে থাকে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দমননীতি, জেল-জলুম এবং এর অসংখ্য নেতা-কর্মীর নামে হুলিয়া ইত্যাদি জারি করা সত্ত্বেও দেশের নিপীড়িত কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায্য অধিকারসহ গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, সুস্থ ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রসারে দলটির নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য।

কমিউনিস্ট পার্টির বহু নেতা-কর্মী ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন (দ্র) এবং ১৯৬২ সালের শিক্ষাসংস্কার ও সামরিক শাসক আইয়ুব খানের (দ্র) বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা রাখেন।

মধ্য-ষাটের দশকে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলনে মত ও পথ নিয়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) ও চীনের (দ্র) মধ্যে যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়, তারই জের হিসাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে যেমন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে, তেমনি পড়ে এর দ্বারা প্রভাবিত প্রকাশ্য ছাত্র, যুব ও কৃষক-শ্রমিক, এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রেও। কমিউনিস্টদের একটি গ্রুপ এই সময় থেকে 'মস্কোপন্থী' এবং অপরটি 'পিকিংপন্থী' হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। অবশ্য 'পিকিংপন্থী' বলে পরিচিত অংশটি পরবর্তী কালে বহুধাবিভক্ত হয়। 'মস্কোপন্থী' অংশটি 'পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি' হিসাবে তার সাংগঠনিক কাঠামো বজায় রাখে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দলটি পালন করে গৌরবময় ভূমিকা। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে মস্কোপন্থী দলটির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি' বা ইংরেজিতে Communist Party of Bangladesh (= CPB)।

মধ্য-আশির দশকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে কমিউনিস্ট সরকারগুলোর পতনের ঘটনা এই দলটির ওপরও প্রভাব ফেলে। '৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে দলটি দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়। একটি গ্রুপ 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি' (সি পি বি) নাম বজায় রেখে 'মার্ক্সবাদের সৃজনশীল বিকাশে'র লক্ষ্যে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। অপর অংশটি অত্যল্পকালের মধ্যেই কমিউনিজমের (দ্র) আদর্শ ত্যাগ করে সামাজিক ন্যায়বিচার তথা মানবতাবাদী রাজনীতির অনুসারী হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুসারী রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়।

আ. হু.

বাংলাদেশের ক্রীড়াসংগঠন ক্রীড়াসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ / স্বাধীনতাযুদ্ধ

বাংলাদেশের(দ্র) মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালে। এই যুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন, বাড়িঘর সহায়-সম্পদ হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের বাঙালি দোসর রাজাকার (দ্র) আল-বদর (দ্র) আল-শাম্‌স্ (দ্র) ও শান্তি কমিটির সদস্যরা স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর যে অত্যাচার করেছে তার তুলনা মেলা ভার।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) হিটলার (দ্র) যে অত্যাচার করেছিল, পাকিস্তানিদের অত্যাচার ছিল তার চাইতেও ভয়ঙ্কর।

কিন্তু কেন মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছিল ? ১৯৪৭ সালে ভারতকে দু'ভাগ করে পাকিস্তান (দ্র) ও ভারত (দ্র) নামে দু'টি দেশ সৃষ্টি করা হয়। পাকিস্তানের দু'টি অংশ পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়। দেশ এক হলেও প্রথম থেকেই লক্ষ করা গেল, পশ্চিম-পাকিস্তানিরা পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ করে গোলাম বানিয়ে রাখার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। এর প্রথম প্রমাণ, বাংলা ভাষার ওপর আঘাত। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব-পাকিস্তান জনসংখ্যায় বেশি হলেও বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি ও সম্মান দেওয়া হয় নি, উর্দু ও ইংরেজিকে সরকারি ভাষারূপে ব্যবহার করার চেষ্টা চলে। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই পাকিস্তানি শাসকদের কাজে ও কথায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর প্রতিবাদে ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ ভাষা-দিবস পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চেই মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ (দ্র) ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' ছাত্ররা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এরই জের হিসাবে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে একুশে ফেব্রুয়ারি (দ্র) তারিখে ছাত্রদের ও বাইশে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি চলে। বহু ছাত্র ও সাধারণ নাগরিক নিহত হন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি এভাবেই তৈরি হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনকে (দ্র) আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনা বলা যায়। দেখা গেছে, ১৯৫৪ সালে বাঙালিরা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় গিয়েও পূর্ব-পাকিস্তানকে শাসন করার অধিকার পায় নি। ১৯৫৬ সালে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র' নামে একটি অবৈজ্ঞানিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর পাকিস্তানের সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান (দ্র) গণতন্ত্র ধ্বংস করে সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন। আইয়ুব খান ক্ষমতায় ছিলেন ১০ বছর। এই সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানকে আরো শোষণ করা হয়, পূর্ব-পাকিস্তানের পাট (দ্র), চা (দ্র), চামড়া দিয়ে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানকে উন্নত করা হয়। আইয়ুবের আমলেই সংঘটিত হয় ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা (দ্র) আন্দোলন। পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করা আর সম্ভব ছিল না বলে ১৯৬৯ সালে ঘটে গণ-অভ্যুত্থান (দ্র)। সেই আন্দোলনে আইয়ুব খান বিদায় নিলে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান (দ্র)।

ইয়াহিয়ার আমলেই অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ (দ্র) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গণতন্ত্রের নিয়ম

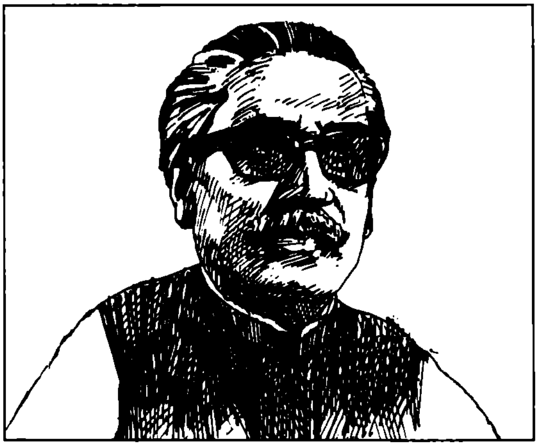

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অনুসারে পাকিস্তানের শাসনভার পাওয়ার কথা আওয়ামী লীগের অর্থাৎ বাঙালির একমাত্র নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র)। কিন্তু পাকিস্তানের মিলিটারি শাসকেরা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই ১লা মার্চ প্রেসিডেন্টের এক ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। ঘোষণা শুনেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিরা প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তানি মিলিটারি শাসকদের ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছিলেন পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো (দ্র)।

মার্চের গোড়া থেকেই ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ আসন্ন। এই পটভূমিতে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসেন আলোচনার উদ্দেশ্যে। আসল উদ্দেশ্য ছিল, আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানি করা। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করেছিল, বাঙালির সপক্ষে কোনো মঙ্গলজনক সংবাদ ঘোষণা করা হবে। কিন্তু পরিবর্তে ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্যাঙ্ক,

www.pathagar.com

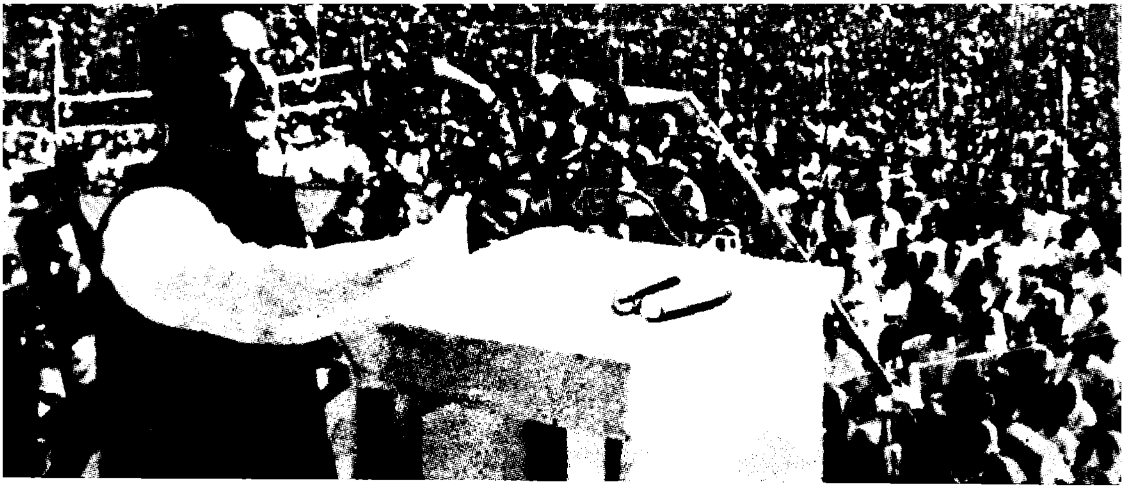

রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

কামান, রকেট, ভারি রাইফেল নিয়ে হঠাৎ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সারা দেশেই একসঙ্গে একই সময়ে আক্রমণ শুরু হয়। প্রথম আক্রমণেই হাজার হাজার বাঙালি শহীদ হন। আক্রমণ হঠাৎ হওয়ায় হতবুদ্ধি বাঙালি প্রথমে সাফল্যের সঙ্গে বাধা দিতে না পারলেও পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআর (অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্‌) -এর সদস্যরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামে (বর্তমান নাম মুজিবনগর) স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রাষ্ট্র ঘোষিত হয় এবং প্রথম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠিত হয়। কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করা হয়।

মুজিবনগরে (দ্র) নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর হতবুদ্ধি ভাব কাটিয়ে বাঙালি জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একত্র হয়ে পরিকল্পনা মাফিক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। অবশ্য উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন জনগণ। এটা হয়ে ওঠে জনযুদ্ধ। গেরিলা যুদ্ধের (দ্র) কায়দায় ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যেমন প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হয়, তেমনি তাদের মনোবলও ভেঙে দেওয়া হয়। এই কাজে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন সাধারণ মানুষ।

এম. এ. জি. ওসমানী

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত (দ্র) প্রথম থেকেই সহায়তা করেছে। ভারতে যেমন আশ্রয় নেয় এক কোটি শরণার্থী, তেমনি সেখানেই হয় মুক্তিবাহিনীর (দ্র) ট্রেনিং। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে জনগণের সহযোগিতা যুক্ত হলে পাকিস্তানের পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তান অপমানজনক পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। যে যুদ্ধ পাকিস্তান চাপিয়ে দিয়েছিল তা শেষ হয়েছিল মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশের জনগণের পরিপূর্ণ

মুক্তিবাহিনীর দামাল যোদ্ধাদের দুরন্ত আক্রমণ

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির সঙ্গে বিভিন্ন ফোর্স ও সেক্টরের অধিনায়কবৃন্দ।

বিজয় অর্জনের মাধ্যমে।

এই যুদ্ধ পরিচালনায় বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র বা সেক্টরে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই সব সেক্টর কমাণ্ডারদের নাম :

১নং সেক্টর : চট্টগ্রাম (দ্র) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত। সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর জিয়াউর রহমান (দ্র) (এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত) ও মেজর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

২নং সেক্টর : নোয়াখালি জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ। সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ও মেজর এ. টি. এম. হায়দার (ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

৩নং সেক্টর : সিলেট (দ্র) জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা। কিশোরগঞ্জ মহকুমা, আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা এবং ঢাকা (দ্র) জেলার অংশবিশেষ। সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) ও মেজর এ. এন. এম. নুরুজ্জামান (ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

৪নং সেক্টর : সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল এবং খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক পর্যন্ত। সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর সি. আর. দত্ত।

৫নং সেক্টর : সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেট জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল। সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর মীর শওকত আলী।

৬নং সেক্টর : সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা। সেক্টর কমাণ্ডার : উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশার।

৭নং সেক্টর : দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বগুড়া, রাজশাহী (দ্র) এবং পাবনা জেলা। সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর কাজী নুরুজ্জামান।

৮নং সেক্টর : সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ। সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর এম. এ. মনজুর (ডিসেম্বর পর্যন্ত) ও সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত)।

www.pathagar.com

৯নং সেক্টর : দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র বরিশাল (দ্র) ও পটুয়াখালী জেলা। সেক্টর কমাণ্ডার : (ক) মেজর এ. জলিল (ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ পর্যন্ত), (খ) মেজর জয়নুল আবেদীন (ডিসেম্বরের অবশিষ্ট দিন), (গ) মেজর এম.এ. মনজুর (ডিসেম্বরের অবশিষ্ট দিনের জন্য অতিরিক্ত সার্বিক দায়িত্ব)।

১০নং সেক্টর : এই সেক্টরের কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। শুধু নৌবাহিনীর কমাণ্ডোদের নিয়ে গঠিত এই সেক্টরের সদস্যদের শত্রুপক্ষের নৌ-যান ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হত। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক কামাণ্ডো নিয়ে এক-একটি গ্রুপ গঠিত হত। যে সেক্টরের এলাকায় কমাণ্ডো অভিযান পরিচালিত হত সেই এলাকার সেক্টর কমাণ্ডারের অধীনে থেকে কমাণ্ডোরা কাজ করত। নৌ–অভিযান শেষ হওয়ার পর কমাণ্ডোরা আবার তাদের ফুল সেক্টর অর্থাৎ ১০ নম্বর সেক্টরে ফিরে আসত।

(সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫-৬)

১১নং সেক্টর : কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ি-আরিচা থেকে ফুলছড়ি-বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা (দ্র) নদী ও তীর-অঞ্চল। সেক্টর কমাণ্ডার : মেজর আবু তাহের (আগস্ট–নভেম্বর) ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম. হামিদুল্লাহ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

র. হা.

বাংলাদেশের শিশুসংগঠন শিশুসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ্র

বাঁশ

ঘাস পর্যায়ভুক্ত বলে বাঁশের মাঝখানে ফাঁপা হয় আর কিছু দূর পর পর থাকে গিঁট। এর বৈজ্ঞানিক নাম *বাম্বুসা বাম্বোস (Bambusa bambos)*, গোত্র গ্রামিনি (Gramineae)। নানা শ্রেণীর নানা রকম বাঁশ হয়। এরা মোট ৪টি ভাগে বিভক্ত, এর মধ্যে ৩০টি গণ এবং ৫৫০টি প্রজাতি দেখা যায়। বাংলাদেশ (দ্র) ও ভারতে (দ্র) ১৩৬ রকম প্রজাতির বাঁশ আছে। এত নামের মধ্যে তলতা, বাসিনি, ভালকো, বেউড় বা কাঁটাবাঁশ, করাইল, বাওয়া, মিরতিঙ্গা, পাইয়া, নল, ডলু উল্লেখযোগ্য।

বর্ষার আরম্ভে বাঁশের কন্দ থেকে কোঁড় বা চারা বের

হয়। কোঁড়টি এক রকম খোলের মধ্যে ঢাকা থাকে, সেই খোল হয় রোমাবৃত। কোঁড়গুলো খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। এই নরম কোঁড় খাওয়া যায়। তলতা বাঁশের কোঁড় খোল ফেলে কুচি-কুচি করে কেটে নুন ও হলুদ মেখে পানিতে ভালভাবে সেদ্ধ করে পানিটা ফেলে দিতে হয়। সেটা শিমবিচি, ডাল (দ্র), পাট (দ্র), শাক বা মাছের (দ্র) সঙ্গে মিশিয়ে রাঁধলে সুস্বাদু হয়। পৃথিবীব্যাপী এর খুব কদর। বাঁশ ১৫-২০ হাত লম্বা হয়। ঘাস (দ্র), নল-খাগড়া সবই বাঁশ পরিবারভুক্ত। কয়েক বছর পরে বাঁশে ফুল হলে পুরো এলাকার বাঁশ নির্বংশ হয়ে যায়।

বাঁশ ওষধিগুণে সমৃদ্ধ। দু' মুঠো করে পাতা গরুকে খাওয়ালে দুধ বেশি পাওয়া যায়। আবার তা গরুর অসুখেও কাজ দেয়। বাঁশের গোড়ার ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত শক্ত ও চকচকে হয়। বাঁশ গৃহস্থালির কাজে অপরিহার্য। জ্বালানি (দ্র) হিসাবে তা ব্যবহৃত হয়। বাঁশ দিয়ে চাষবাসের সরঞ্জাম থেকে ঘরের বেড়া, রান্নার উপকরণ, খুঁটি ও গোলাঘর, ঘরের চাল—কী না হয়। বাঁশের মণ্ড থেকে কাগজ (দ্র) ও রেয়নতন্তু উৎপন্ন হয়। জাপানি ও চীনারা বাঁশের শৌখিন জিনিস তৈরি করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তিতুমীর (দ্র) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য বাঁশের কেল্লা গড়েছিলেন। লাঠিখেলা (দ্র) বাঁশ ছাড়া হয় না। বাঁশ থেকে হয় বেণু বা বাঁশি (দ্র)। মায়ানমার (দ্র), মালয়, থাইল্যাণ্ড (দ্র), চীন (দ্র), জাপান (দ্র), ভারত (দ্র) ও আমাদের দেশে প্রচুর বাঁশ জন্মে।

বি. ব.

www.pathagar.com

বাঁশি

ফুৎকার-বাদ্য বা ফুঁ দিয়ে বাজাবার যন্ত্র। বাঁশ দিয়ে তৈরি—এই অর্থে এর নাম বাঁশি বা বংশী। লৌকিক বাদ্য

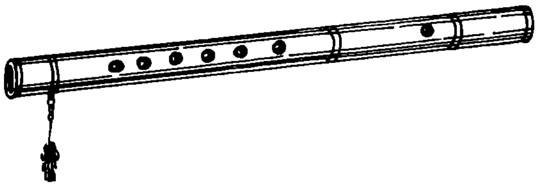

রূপে এর প্রচলন বেশি। তবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতযন্ত্ররূপেও এর প্রচলন আছে। বাঁশি সোজা খাড়াভাবে ধরে ওপরের প্রান্তে তেরচা করে হুইসেলের ছিদ্রের মতো করে কাটা ছিদ্রটি মুখে ঢুকিয়ে তাতে ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে বাজানো হয়। আবার এমন বাঁশি আছে যার নলের ওপরের প্রান্তটি আবদ্ধ, কিন্তু একটু নিচে একটি ছিদ্র থাকে, তাতে ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে বাজাতে হয়। সেই বাঁশিটি খাড়াভাবে ধরা যায় না, ধরতে হয় একটু আড় করে। তাই এর নাম আড় বাঁশি। বাঁশির গায়ে ছিদ্র থাকে, এর নাম স্বর-ছিদ্র। ফুঁ দিয়ে ঢোকানো বাতাস ছিদ্রগুলোয় আঙুল টিপে বের করে বাঁশি বাজানো হয়। ছিদ্রগুলোর অবস্থান ও তা দিয়ে বাতাস বের করার পরিমাণ দিয়ে সুরের তারতম্য হয়। বাঁশি নানা আকারের হয়। একটি বড় আকারের বাঁশি দুই ফুট বা তারও একটু বেশি লম্বা হতে পারে। আবার ছোট আকারের বাঁশি এক ফুটের কম লম্বা হবে। বংশী, বেণু, মুরলী বাঁশিরই নামান্তর। মুরলীরই চলতি নাম আড় বাঁশি। খাড়াভাবে বাজাবার বাঁশিকে সরল বাঁশি বলতেও দেখা যায়। বাঁশি একককভাবে বাজানো হয়, সহগামী যন্ত্ররূপেও বাজানো হয়। বাঁশি আমাদের অতি সুমিষ্ট সঙ্গীতযন্ত্রসমূহের অন্যতম। যদিও বাঁশি বাঁশের নল দিয়েই প্রধানত তৈরি, কাঠ, কাঁসা, রূপা ও সোনা দিয়েও বাঁশি তৈরি হতে পারে।

বাঁশির পাশ্চাত্য নাম ফ্লুট (flute)। পাশ্চাত্যে নানা ধরনের ফ্লুটের প্রচলন আছে। ওবো, অল্টোওবো, ইংলিশ হর্ণ, ক্ল্যারিনেট, বেস ক্ল্যারিনেট, ব্যাসুন, ডাব্‌ল্ ব্যাসুন বা কন্ট্রা ব্যাসুন প্রভৃতি ফ্লুটের প্রকারভেদ। জনপ্রিয় ক্ষুদ্র ফ্লুট বা বংশিকার নাম পিকোলো। তীক্ষ্ণ ধ্বনির জন্য এই ফ্লুট বহুল ব্যবহৃত।

ক. গো.

বাক, পার্ল্ এস [১৮৯২—১৯৭৩]

জীবনবাদী মার্কিন ঔপন্যাসিক। তাঁর পুরো নাম পার্ল্ সিডেন্‌স্ট্রিকার বাক্ (Pearl Sydenstricker Buck)। তিনি ১৮৯২ সালের ২৬শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়ার হিল্‌স্‌বোরোতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন মিশনারি। বাক্ তাঁর ধর্মপ্রচারক পিতা-মাতার সঙ্গে অতি শৈশবেই চীন দেশে যান। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানে কাটান। ফলে ইংরেজি ভাষা শেখার আগে তিনি চীনা ভাষা শিখে ফেলেন। ঐ সময় পর্যন্ত বাক্ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন চীনের জনজীবন।

সতেরো বছর বয়সে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাক্ তাঁর মাতৃভূমি আমেরিকায় ফিরে আসেন। এখানে র‍্যানডল্‌ফ্ মেকলে মহিলা কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর তিনি আবার চীনে ফিরে যান। এখানেই জন্ এস্. বাক্ নামের একজন মিশনারির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

চীনা জীবনের সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় পরিচয় আর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিণতিতেই তাঁর অমর সাহিত্যকর্ম 'গুড্ আর্থ' (Good Earth) উপন্যাসের জন্ম এবং এই উপন্যাসের সুবাদেই পার্ল্ এস. বাক বলতে গেলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ১৯৩২ সালে তিনি পুলিট্‌জার পুরস্কার (দ্র) পান এবং ১৯৩৮ সালে তাঁর সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

পার্ল্ এস. বাক-এর লেখনী দিয়ে আর যেসব উপন্যাসের জন্ম হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্য মাদার' (১৯৩৪), 'সন্স' (১৯৩২), 'দ্য হাউস ডিভাইডেড' (১৯৩৫), 'প্যাভিলিয়ন অব উইমেন', 'ড্রাগন সিড' (১৯৪২) ইত্যাদি। বেশ কিছু স্মরণীয় ছোটগল্পেরও স্রষ্টা তিনি।

পার্ল্ এস. বাক ১৯৭৩ সালের ৬ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

www.pathagar.com

বাকশাল

পুরো নাম 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (Bangladesh Krishak Shramik Awami League) সংক্ষেপে বাকশাল (BAKSHAL)।

১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীবলে বহুদলীয় সংসদীয় সরকারপদ্ধতির পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে এই একক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন বাংলাদেশের (দ্র) তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র)।

বাকশাল-এ একীভূত হয়ে যাওয়া প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল ছিল যথাক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (দ্র), মণি সিংহের (দ্র) নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (দ্র) ও অধ্যাপক মুজফ্ফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ (দ্র)। এ ছাড়া এর বিভিন্ন ফ্রন্ট বা অঙ্গসংগঠনে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন শ্রমিক ও কৃষকের পাশাপাশি দেশের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ছাত্র, যুবক ও বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পী-সাহিত্যিকসহ সমাজের প্রায় সর্বস্তরের নেতা-কর্মী ও প্রতিনিধিবৃন্দ।

বাকশাল-এর আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমবায়ভিত্তিক কৃষিউৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তোলা, শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কল-কারখানা পরিচালনা, সেসবের ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সরকারি প্রশাসন ও বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ এবং পুনর্বিন্যাস সাধন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা কঠোর হস্তে দমন, জনসংখ্যা হ্রাসকরণ পরিকল্পনা জোরদারকরণ, শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্র কায়েম এবং শিল্প-কারখানাসহ ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণ ও শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারসাধন করা

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হলে 'বাকশাল' নামধারী দলটি আর সক্রিয় থাকে না। কিন্তু পরে ১৯৮৭ সালে আওয়ামী লীগের একটি অংশের উদ্যোগে এর পুনরুজ্জীবন ঘটে। তবে ১৯৯১ সালে এর কর্মীরা আওয়ামী লীগে পুনরায় যোগদান করলে বাকশাল-এর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটে।

আ. হ.

বাখ্, ইওহান্ সেবাস্টিয়ান্ [১৬৮৫—১৭৫০]

বিশ্ববিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতকার। জার্মানির এরফুর্ট শহরে ১৬৮৫ সালে জন্ম। অতি শৈশব থেকেই বাখের (Johann Sebastian Bach) প্রবল সঙ্গীতানুরাগ প্রকাশ পায়। পনেরো বছর বয়সে তিনি ল্যুনেবুর্গ শহরে এক কয়ার (choir) দলে যোগ দেন। তিন বছর এই দলে থেকে বাখ্ এক পেশাদার সঙ্গীতদলে চাকুরি নেন। এরপর আর্নস্টাড্ট্-এর এক গির্জায় (দ্র) অর্গ্যান (দ্র)-বাদকের কাজ নেন তিনি। কিন্তু গির্জার সঙ্গীতের জন্য নির্দিষ্ট গৎ না বাজিয়ে মাঝে মাঝে গৎ-এর বাইরে সুরের কাজ করায় বাখ্কে সেখান থেকে বরখাস্ত করা হয়। তবে শীঘ্রই তাঁর সঙ্গীতখ্যাতি বিস্তার লাভ করে এবং তিনি জার্মানির রাজা ফ্রিড্রিশ্-এর দরবার থেকে আমন্ত্রণ পান। সঙ্গীতস্রষ্টা হিসাবে বিপুল খ্যাতি পেলেও বাখের অর্থকষ্ট কোনো দিন ঘোচে নি। দুঃখের ভেতর দিয়েই তাঁর জীবন কাটে। পরিণত বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে এবং ক্রমে তিনি দৃষ্টিশক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেন। ১৭৫০ সালে বাখের মৃত্যু হয়।

বাখের রচনাকর্ম বিপুল। শুধু অর্গ্যানের জন্যই তিনি দুই শতাধিক সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। অন্যান্য যন্ত্রের জন্যও তিনি প্রচুর সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর বেশ কিছু ফিউগে, কান্টাটা ও প্রেলিউড পাওয়া যায়। মানুষের গভীর দুঃখের অনুভূতি বাখের রচনায় অসামান্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ক. গো.

www.pathagar.com

বাখরখানি

ময়দার তৈরি আকারে ছোট এক ধরনের রুটি। তন্দুরে সেঁকে তৈরি করা হয়। মুচমুচে এই রুটি পুরনো ঢাকা (দ্র)-বাসীর আহারগত ঐতিহ্যের অংশবিশেষ, যা একান্তভাবে ঢাকারই সৃষ্টি। এই রুটি কয়েক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা চলে, নষ্ট হয় না। এ রুটির এটিই বিশেষত্ব।

পুরনো ঢাকায় যে রাস্তাটি আগা সাদেক রোড নামে পরিচিত, সেখানে বাস করতেন ঢাকার নায়েবে নাজিম মির লুৎফুল্লাহ ওরফে মুর্শিদ কুলি খাঁর জামাতা মির্জা আগা বাকের। তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইরানি ভদ্রলোকের পুত্র। ইনি বরিশাল (দ্র) জেলার সুজুরগ উম্মেদপুর ও

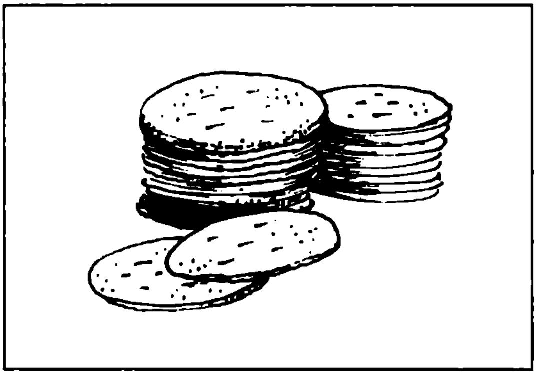

সলিমাবাদ পরগনা দু'টির জমিদার ছিলেন। প্রথম পরগনায় তিনি নিজের নামানুসারে 'বাকেরগঞ্জ' নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিট্রিশ আমলে একটি জেলা প্রতিষ্ঠিত হলে তার নাম রাখা হয় 'বাখরগঞ্জ'। তবে আগা বাকের বরিশাল জেলায় জমিদারি করলেও বসবাস করতেন ঢাকায়। জনশ্রুতি অনুযায়ী, তাঁর নামানুসারেই এই রুটির নামকরণ হয়েছে, কেননা তিনিই এর স্রষ্টা। বাকের থেকে বাখর, তা থেকে বাখরখানি। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই রুটির প্রচলন আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এখনো এটি তৈরি হয় পুরনো ঢাকায় এবং এর প্রচলনও ব্যাপক।

আ. হ.

বাগদাদ চুক্তি

মধ্যপ্রাচ্যে (দ্র) শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার নামে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) উদ্যোগে এবং মার্কিন স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত এই চুক্তি ১৯৫৫ সালে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহরে স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই চুক্তি মধ্যপ্রাচ্য শান্তি চুক্তি সংস্থা (Middle East Treaty Organization) নামে পরিচিত ছিল। এতে স্বাক্ষর করে ইরাক, ইরান, পাকিস্তান (দ্র), তুরস্ক (দ্র) ও ব্রিটেন (দ্র)। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এর প্রধান কার্যালয় ছিল বাগদাদে।

১৯৫৮ সালের পর ইরাক এই চুক্তি বর্জন করলে এর নতুন নাম হয় 'কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা' (Central Treaty Organization = CENTO)। নতুন কার্যালয় স্থাপিত হয় তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায়।

যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর না করেও এর পেছনে প্রধান শক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আ. মা.

বাঘ

বাংলাদেশের (দ্র) জাতীয় পশু। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের (Royal Bengal Tiger) খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বাঘের আটটি উপ-প্রজাতির মধ্যে সুন্দরতম ও রাজকীয় এটি। বাঘ (tiger) বিড়াল পরিবারের বৃহত্তম সদস্য। বৈজ্ঞানিক নাম *প্যানথেরা টাইগ্রিস (Panthera tigris)*। সাইবেরিয়ার উপ-প্রজাতিটি বৃহত্তম, জাভারটি সবচেয়ে ছোট। অবৈধ শিকারের কারণে তিনটি উপ-প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাকিগুলোও বিলুপ্তির পথে।

কালো ডোরাযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের বাঘের চোখ উজ্জ্বল, মাথা গোলাকার, শরীর ১.৪ থেকে ২.৮ মিটার এবং লেজ ৬০ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার লম্বা। প্রায় ৯০ সেন্টিমিটার উঁচু বাঘ ১৮০–২৬০ কেজি হয়। বাংলাদেশ (দ্র), ভারত (দ্র), নেপাল (দ্র), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া (দ্র), সাইবেরিয়া ও চীনের (দ্র) জঙ্গলে বিভিন্ন প্রজাতির বাঘ বাস করে।

বাঘ একা চলতে পছন্দ করে। নিজের নির্দিষ্ট এলাকায় অন্য কোনো বাঘকে ঢুকতে দেয় না। এরা অত্যন্ত দক্ষ শিকারি। হরিণ (দ্র), বানর (দ্র), শূকর, গরু-মহিষ শিকার

www.pathagar.com

করে। সাধারণত ভোরে ও সন্ধ্যা-রাতে শিকার করে। বৃদ্ধ বয়সে অক্ষম হয়ে পড়লে মানুষখেকো হতে পারে। শিকারকে পেছন থেকে আক্রমণ করে।

শরৎকাল বাঘের প্রজননঋতু। এ সময় বাঘ যে হুঙ্কার ছাড়ে তা দু' কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায়। প্রায় ৯৫–১২২ দিন গর্ভধারণের পর বাঘিনী তিন থেকে পাঁচটি অন্ধ ও কালা বাচ্চার জন্ম দেয়। দশ দিন পর চোখ-কান ফোটে। বাঘ বাচ্চাদের খেয়ে ফেলতে পারে বলে বাঘিনী তাদের লুকিয়ে রাখে। বাচ্চারা আঠারো মাস মায়ের সঙ্গে থাকে। বাঘ ১৫–২০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

বাঘা যতীন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্র

বাঙালি

অতি প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশের (দ্র) পালল-ভূমিতে একাধিক নরগোষ্ঠীর মানুষ পৃথিবীর (দ্র) নানা অঞ্চল থেকে বসবাস করতে এসেছে। এদের পারস্পরিক সমন্বয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উদ্ভব। বাঙালি জাতির সর্বপ্রাচীন পূর্বপুরুষ ঠিক কবে এ দেশের মাটিতে বসবাস শুরু করে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত হাতিয়ার ও বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্মসহ যেসব উপকরণ পাওয়া গেছে তাতে ধারণা করা হয় যে বাংলাদেশে মানুষের বসবাস প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকে।

পুরাকালে বাংলাদেশের ভৌগোলিক রূপ এখনকার মতো ছিল না। বাংলাদেশ তখন বঙ্গ, সমতট, পুণ্ড্র ইত্যাদি একাধিক জনপদে বিভক্ত ছিল। নানা কারণে এই সব জনপদের সীমানা বেড়েছে কিংবা কমেছে। তবে ঐতিহাসিক প্রাচীন যুগ পার হয়ে প্রথমে তুর্কি সুলতানদের আমলে এবং পরে মোগল সম্রাট আকবরের (দ্র) রাজত্বকালে এ দেশ 'বাংলা' নামে একটি সমন্বিত ভৌগোলিক সত্তায় পরিণত হয়। এর পরও ইংরেজ রাজত্ব এবং বিদেশী শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে বাংলার ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন ঘটে অবশেষে বর্তমান বাংলাদেশের উদ্ভব।

নৃতাত্ত্বিক বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন অধিবাসীদেরকে আদি-অস্ট্রেলীয় (proto-Austroloid) বলা হয়। এরা এক সময় মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল (দ্র) এবং অস্ট্রেলিয়া (দ্র) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাস করেছে। এরা ছিল মূলত কৃষিজীবী, তবে মাছ ও পশুশিকার করেও এরা জীবন ধারণ করেছে। এদের ভাষা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

আদি-অস্ট্রেলীয়দের পর এসেছে দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্য-নরগোষ্ঠীর মানুষ। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে আকৃতিগত মিলের কারণে এদের এই

www.pathagar.com

নামকরণ। এদের মধ্যে প্রাচীন বাংলার আদি বাসিন্দাদের কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন।

আরো পরে আসে অবৈদিক আর্যভাষী অ্যালপাইন বা অ্যালপোদীনারীয় নরগোষ্ঠীর মানুষ। মূলত এই তিন নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্কর রূপের উদ্ভব। তবে এই প্রাচীন জনতাত্ত্বিক বুনিয়াদে পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে একাধিক নৃতাত্ত্বিক মিশ্রণ ঘটেছে। এদের মধ্যে রয়েছে বৈদিক আর্যভাষী তথা আদি নর্ডিকদের ক্ষীণ ধারা, তুর্কি, পাঠান, মোগল ও আরবি প্রভাব, উপকূলীয় জেলাগুলোতে পর্তুগিজ, মগ, আরাকানি জনগোষ্ঠীর প্রভাব। তবে নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালি জনগোষ্ঠীর গঠনের প্রধান ভিত্তি আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর ধারা।

এভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নৃতাত্ত্বিক সমন্বয়ের পথে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ। সেই সঙ্গে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্যভাষার সমন্বয়ে এবং ভোটবর্মী ও কিরাত জনদের ভাষার সংমিশ্রণে দীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষারও (দ্র) জন্ম।

বাঙালি জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের বাসস্থান বাংলাদেশ। এ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে, মায়ানমারের (দ্র) আরাকানে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে—যেমন যুক্তরাজ্য (দ্র), যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) এবং আরো কোনো কোনো রাষ্ট্রে বাঙালি জাতিসত্তার মানুষ বসবাস করে। বিশ্বজনসংখ্যার ৩.৭৫ শতাংশ বাঙালি।

আ. র.

বাজপাখি (falcon)

বাজ শিকারি পাখি। বিশ্বে ৬১ টি প্রজাতি। বক্র ও ধারালো ঠোঁট। ধারালো নখর। তীক্ষ্ণ চোখ। স্ত্রী-পাখি পুরুষের চেয়ে বড়। ছোঁ মারতে ওস্তাদ। ডাইভ চমৎকার। উড়ন্ত বাদুড়কেও শূন্যে ধরে ফেলে। বৈজ্ঞানিক নাম *Falconidae.*

সবচেয়ে বড় হচ্ছে Gyr falcon; ৬১ সেন্টিমিটার। ছোট হচ্ছে আমেরিকান কেস্ট্রেল; ২০ সেন্টিমিটার।

কেউ কেউ স্থির উড়তে পারে শূন্যে (হোভারিং)। কারো কারো দাঁত আছে।

বন-বাগান, মাঠ, মরুভূমি, সৈকতভূমিসহ পাহাড়ি এলাকায় থাকে। শীতে কেউ কেউ পরিযায়ী বা দেশান্তরী হয়। শহরেও থাকে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লেসার কেস্ট্রেল, রেড ফুটেট ফ্যালকন, মার্লিন (তুরমতি), হবি, পেরিগ্রিন ইত্যাদি।

মাছ (দ্র), সাপ (দ্র), ব্যাঙ (দ্র), ছোট পাখি, টিকটিকি (দ্র), গিরগিটি ইত্যাদি খায়।

কণ্ঠস্বর বিভিন্ন। যেমন হি-জি-হিস, কি কি কিক্, কিরিয়া, কি্ই কিক্।

ডিমের সংখ্যা ২–৬। রঙ হয় ক্রিম, সাদা, বাদামি ইত্যাদি। ৩০ দিনে ডিম ফোটে। প্রথম কয়েক সপ্তাহ পুরুষ স্ত্রীসহ বাচ্চাদের খাওয়ায়। ১০–১২ বছর বাঁচে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বাজপাখি হচ্ছে তুরমতি।

শ. খা

বাতজ্বর (rheumatic fever)

বিশেষ ধরনের স্ট্রেপটোকক্কাই জীবাণুর (দ্র) সংক্রমণে হৃৎপিণ্ডের প্রদাহসহ বিভিন্ন অস্থিসন্ধি এবং তৎসংলগ্ন পেশিতে প্রদাহজনিত কারণে সৃষ্ট জ্বরকে বাতজ্বর বলা হয়।

সাধারণত পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা দেয়। এ রোগে শরীরের বড় বড় অস্থিসন্ধিতে (হাঁটু, গোড়ালি, কব্জি ইত্যাদি) প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে ফুলে যায়। অস্থিসন্ধিতে গুরুতর ব্যথা এবং সার্বক্ষণিক জ্বর দেখা দেয়।

বাতজ্বরগ্রস্ত রোগীর বিশ্রাম এবং দীর্ঘকালীন চিকিৎসা আবশ্যক। চিকিৎসার জন্য রোগীকে পেনিসিলিন (দ্র) গ্রুপের এন্টিবায়োটিক (দ্র) এবং ব্যথার জন্য বেদনানাশক

www.pathagar.com

সেবন করানো হয়। বাতজ্বরের যথার্থ চিকিৎসা না করানো হলে রোগীর হৃৎপিণ্ড (দ্র) আক্রান্ত হতে পারে। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হলে বিশেষ চিকিৎসা দরকার।

সি. না. হ.

বাতাস / বায়ু

ভূমণ্ডলের উপরিভাগের নানাবিধ গ্যাসের (দ্র) সমষ্টি। একে বাংলা ভাষায় বাতাস, বায়ু, হাওয়া, সমীরণ, পবন ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। বাতাস চোখে দেখা যায় না এবং এর স্বাদ ও গন্ধ নেই। এর প্রধান উপাদানগুলো হল : অক্সিজেন (দ্র) শতকরা ২১ ভাগ, নাইট্রোজেন (দ্র) ৭৮ ভাগ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) ও আর্গন (দ্র)-সহ অন্যান্য গ্যাস ১ ভাগ। অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে মিথেন (দ্র), নাইট্রাস অক্সাইড (দ্র), হাইড্রোজেন (দ্র), ওজোন (দ্র), হিলিয়াম (দ্র), ক্রিপটন (krypton), নিয়ন (দ্র), জেনন (zenon) ইত্যাদির নাম করা যায়। এ ছাড়া বাতাসে জলীয় বাষ্পও আছে। সুতরাং বাতাস একটি মিশ্র পদার্থ। পদার্থের সব ধর্মই বাতাসের আছে। যেমন— বাতাস স্থান দখল করে, বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে এবং বাতাসের ওজন আছে। প্রতি লিটার বাতাসের ওজন ১.৩ গ্রাম।

বাতাস সমস্ত পৃথিবীকে (দ্র) চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তবে পৃথিবীর সব জায়গায় বাতাসের উপাদানের পরিমাণ এক রকম নয়। ভূপৃষ্ঠের কাছে বাতাস খুব ঘন আর ওপরের দিকে পাতলা। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার ওপরে পর্যন্ত বাতাস পরিব্যাপ্ত আছে বলে ধারণা করা হয়। এর পাঁচটি স্তর আছে। যথা—ব্যোমমণ্ডল (troposphere), সমতাপ-মণ্ডল (stratosphere), মধ্যমণ্ডল (mesosphere), আয়নমণ্ডল (দ্র), বাহ্য মণ্ডল (exosphere)।

বাতাসই পৃথিবীকে মানুষসহ যাবতীয় প্রাণীর (দ্র) বসবাসের উপযোগী করেছে। জীবজন্তু বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। বাতাসে অক্সিজেন আছে বলেই আগুন জ্বলে আর বাতাসে জলীয় বাষ্প না থাকলে বৃষ্টি হত না। সুতরাং প্রকৃতির এই বিচিত্র সম্ভারের পেছনে বাতাসের ভূমিকা অনেকখানি।

সুজ. ব.

বাদল গুপ্ত [১৯১২—১৯৩০]

ভারতের (দ্র) স্বাধীনতা সংগ্রামের কনিষ্ঠতম যোদ্ধা ও শহীদ। তাঁর প্রকৃত নাম সুধীর গুপ্ত। বাদল তাঁর ডাক নাম। ঢাকার বিক্রমপুরের পূর্বশিমুলিয়া গ্রামে ১৯১২ সালে তাঁর জন্ম। পিতার নাম অবনী গুপ্ত।

বিক্রমপুরের বানরীপাড়া স্কুলের শিক্ষক নিকুঞ্জ সেনের নিকট বাদল স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা লাভ করেন। নিকুঞ্জ সেনের উৎসাহ-উদ্দীপনায় তিনি বিপ্লবী সংগঠন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি. ভি.) বাহিনীতে যোগ দেন। প্রথমে তিনি এই বাহিনীর অ্যাকশান স্কোয়াডের সদস্য হন; পরে তাঁকে লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত করা হয়।

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের অভিযানে অংশগ্রহণকারী তিন বিপ্লবীর মধ্যে বাদল ছিলেন এক জন। তাঁদের সফল আক্রমণের পর অন্য দুই বিপ্লবী বিনয় ও দীনেশের মতো বাদলও আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। শত্রুপক্ষের হাতে বন্দি হবার আগেই বাদল পটাসিয়াম সায়েনাইড বিষ পানে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

বাদশা খান গফ্‌ফার খান, খান আবদুল দ্র

বাদুড়

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভেতর একমাত্র বাদুড়ই উড়তে পারে। খেচর ও নিশাচর। বিশ্বে প্রজাতিসংখ্যা ৯০০-র বেশি। আর্কটিক (দ্র)-অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) বাদে সর্বত্রই আছে।

বাদুড় চোখে দেখতে পায় না বলে মানুষের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। আসলে ওরা চোখে দেখে। Echo-location পদ্ধতিতে শব্দতরঙ্গকেও কাজে লাগায়। পাশ্চাত্য বিশ্বের বহু লোক বাদুড়কে ভয় পায়। অনেক দেশের মানুষ বাদুড়কে দীর্ঘ জীবন, সৌভাগ্য ও সুখের প্রতীক হিসাবে বিশ্বাস করে। বাদুড়ের মল (guano) সার হিসাবে কাজে লাগে। কিম্ভূতকিমাকার মুখের বহু বাদুড়ও আছে।

www.pathagar.com

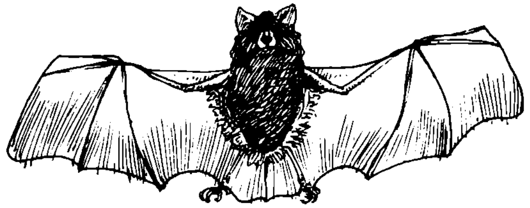

ভালুকমুখো, শিয়ালমুখো, কুকুরমুখো বাদুড়ও আছে। বাদুড়কে বলা হয় উড়ন্ত খেঁকশিয়াল।

ছোট-বড় বহু প্রজাতির বাদুড় আছে। এদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। ছোট ছোট দাঁতগুলো খুবই তীক্ষ্ণ। হজমশক্তি দ্রুত। গোলাকার ছোট কান। পা দুর্বল। পা ও নখের আঙুল থাকে। অনেকে স্থিরভাবে (হোভারিং) উড়তে পারে। ডানাকেই হাত হিসাবে ব্যবহার করে। ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার বেগে উড়তে পারে। চামচিকারা আরো দ্রুতগতিসম্পন্ন।

ভ্যাম্পায়ার, ফল্‌স্ ভ্যাম্পায়ার (ভুয়া ভ্যাম্পায়ার), বাদামি, ফ্রিটেইল্‌ড্, লাল, সিলভার হেয়ার্‌ড্, কলাবাদুড় (ফ্লাইং ফক্স) বিশ্বের উল্লেখযোগ্য বাদুড়।

বাদুড় ফলমূল, কলা (দ্র), বাদাম (দ্র), ফুলের মধু (দ্র), কীটপতঙ্গ (দ্র), ছোট পশুপাখি, এমনকি বাদুড়ও খায়। বড় খায় ছোটকে। ভ্যাম্পায়ার গবাদি পশুর রক্ত (১ দিনে ১৫ মিলিলিটার) খায় চামড়া ফুটো করে। ডাক তীক্ষ্ণ।

বাসা করে না। গাছের ডালে, পাহাড়-পর্বতের গুহার ছাদে উল্টোভাবে ঝুলে থাকে। ১টি থেকে ৩টি বাচ্চা হয়। চামচিকার হয় ৪টি। বাচ্চারা মায়ের বুকে লেপ্টে থাকে। দুধ পান করে। অনেকে কলোনি করে থাকে। বাচ্চা দেওয়ার সময় স্ত্রীরা নার্সারি কলোনি করে।

ভ্যাম্পায়ার জীবাণু পরিবাহী।

সবচেয়ে বড় বাদুড় (hoary bat)-এর ডানার বিস্তার ৪১ সেন্টিমিটার। ছোট বাদুড় ভোমরা পোকার সাইজের। Kitts hog-nosed-এর ওজন ২ গ্রাম মাত্র।

কোনো প্রজাতি ৬–১০, আবার কোনোটি ১০–২৫ বছর বাঁচে।

বাংলাদেশে ভ্যাম্পায়ার নেই, তবে কলাবাদুড়, হলুদ, ভুয়া ভ্যাম্পায়ার, চামচিকা আছে।

শ. খা.

বাদ্যযন্ত্র

কোনো বস্তুতে আঘাত করা হলে বা অন্য কোনো কারণে কোনো বস্তু দ্রুত কাঁপতে থাকলে বস্তুটির সঙ্গের বায়ুতে সেই কাঁপুনির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বায়ুতে এক রকম তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গমালা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আমাদের কানের পর্দায় এসে লাগে। তখন কানের পর্দা স্পন্দিত হয় এবং মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি জাগায়।

ঢোল (দ্র), তবলা (দ্র) ইত্যাদি বস্তুতে আঘাত করলে এভাবেই শব্দ সৃষ্টি হয়। এই আঘাত নির্দিষ্ট তাল (দ্র), লয় (দ্র) ইত্যাদি নিয়ম অনুসরণ করে করা হয়। ফলে সুরধ্বনির

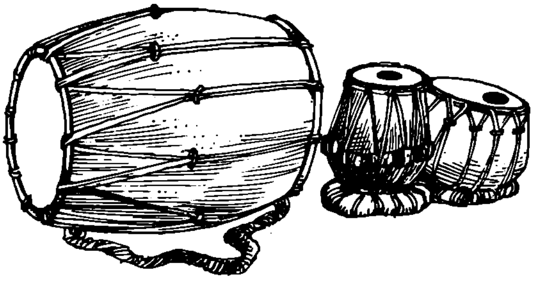

সৃষ্টি হয়। বাদন বা আঘাতের মাধ্যমে তাল-লয়বিশিষ্ট ধ্বনি সৃষ্টি হয় বলে এ ধরনের যন্ত্রগুলিকে বাদ্যযন্ত্র বলা হয়।

সু. ব.

বানর

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের (দ্র) মধ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে মানুষের পরেই নরবানর (ape) ও বানরের (monkey) স্থান। তবে বানর থেকেও নরবানর বুদ্ধিমান এবং এদের লেজ নেই। বানর মানুষের নিকট-আত্মীয় এবং একই বর্গ প্রাইমেটের (primate) সদস্য।

পৃথিবীর (দ্র) ১২৮ প্রজাতির বানরের মধ্যে বাংলাদেশে (দ্র) বাস করে ৮টি। ৫০–৮০ গ্রাম ওজনের পিগমি মার্মোসেট (pygmy marmoset) ক্ষুদ্রতম বানর। শরীর ১৪–১৬ এবং লেজ ১৫–২০ সেন্টিমিটার লম্বা। ৪৫ কেজি ওজনের ম্যানড্রিল (mandrill) বৃহত্তম প্রজাতি। শরীর প্রায় ৯৫ সেমি এবং লেজ ৭৫ সেমি লম্বা। বিজ্ঞানীরা বানরকে দু'

www.pathagar.com

ভাগে ভাগ করেছেন। পশ্চিম গোলার্ধের বানর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় (দ্র) বাস করে। লম্বা লেজটিকে এরা হাত হিসাবে ব্যবহার করে। দাঁতের সংখ্যা বত্রিশ। নাকের ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব বেশি। পূর্ব গোলার্ধের বানর এশিয়া (দ্র) ও আফ্রিকার (দ্র) জঙ্গলে বাস করে। এরা লেজটিকে হাত হিসাবে ব্যবহার করতে পারে না। দাঁতের সংখ্যা ছত্রিশ, নাকের ছিদ্রদ্বয় কাছাকাছি।

কোনো কোনো প্রজাতি সারা জীবন গাছেই কাটায়। বাকিরা গাছে ও ঘাসপূর্ণ ভূমিতে বাস করে। ফুল-ফল, ঘাস (দ্র), পাতা (দ্র), ব্যাঙ (দ্র), পাখি (দ্র), পাখির ডিম, পোকা-মাকড়, গাছের মূল এবং যা পায় তাই খায়। এরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। এক জন দলনেতা দল পরিচালনা করে। দলে ২০ থেকে ১০০টি বানর থাকতে পারে। স্ত্রী-বানর গড়ে ৪.৫–৮ মাস গর্ভধারণের পর একটি বাচ্চা জন্ম দেয়। এরা ২০–৪০ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

বান্দুং সম্মেলন

১৯৫৫ সালের ১৮–২৪শে এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার (দ্র) রাজধানী জাকার্তা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে বান্দুং (Bandung) শহরে এশিয়া (দ্র) ও আফ্রিকার (দ্র) ২৯টি দেশের সরকার-প্রধানের যে শীর্ষ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তা ইতিহাসে বান্দুং সম্মেলন নামে পরিচিত হয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) অবসানের পরপরই বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ভাঙন দেখা দেয় এবং এশিয়া–আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ একে একে স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) এই দুই পরাশক্তির মধ্যে 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ের' (দ্র) তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং গঠিত হয় ন্যাটো (দ্র) ও ওয়ারশ (দ্র) যুদ্ধজোট। সদ্য স্বাধীন দেশসমূহকে বিভিন্ন জোটভুক্ত করার প্রচেষ্টাও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সিয়াটো (দ্র) সেন্টো (দ্র), আনজাস (ANZUS) ইত্যাদি সামরিক জোট গঠনের মাধ্যমে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এইসব দেশকেও শরিক করা হতে থাকে। এমনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে চীনের (দ্র) প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই (দ্র), ভারতের (দ্র) প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (দ্র), ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি আহমেদ সুকার্নো (দ্র), মিশরের রাষ্ট্রপতি গামাল আব্‌দেল্ নাসের (দ্র), যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি ইওসিফ ব্রোজ টিটো (দ্র) প্রমুখ রাষ্ট্রনায়ক বৃহৎ শক্তির তাঁবেদারি থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নতুন ধারণা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবেই আয়োজিত হয় বান্দুং সম্মেলন। সম্মেলনে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইসরায়েল ব্যতীত এশিয়া-আফ্রিকার সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শেষে গৃহীত হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের পঞ্চশীলা (দ্র) নীতি। এই নীতিমালায় গৃহীত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে পরস্পরের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, অনাগ্রাসন, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, সমতাপূর্ণ ও পারস্পরিক সুবিধাজনক সম্পর্ক স্থাপন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সম্মেলনশেষে নেহরু বলেছিলেন, "দুনিয়ার ঘটনাধারায় বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি জনগণের রাজনৈতিক অভ্যুদয়কে প্রকাশ করেছে বান্দুং। বান্দুংকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা এবং মানবেতিহাসের মহান আন্দোলনের অংশ হিসাবে না দেখাটা হবে ইতিহাসের ভ্রান্ত পাঠ নেওয়া।"

বান্দুং সম্মেলন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সমর্থন পেয়েছিল। তবে সদ্য স্বাধীন

www.pathagar.com

দেশের স্বাধীন ভূমিকা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বও তাদের মধ্যে কাজ করেছিল। অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ এই উদ্যোগকে তাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় প্রয়াস হিসাবেই বিবেচনা করেছিল। বান্দুং সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, অনেকে যাকে 'দ্বিতীয় বান্দুং' বলে থাকেন। এভাবেই বিশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে আছে বান্দুং সম্মেলন।

ম. হ.

বাফা বুলবুল চৌধুরী দ্র

বাবর [১৪৮৩—১৫৩০]

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রকৃত নাম জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর। তুর্কি ভাষায় 'বাবর' শব্দের অর্থ সিংহ। বাবর ১৪৮৩ সালে মধ্য-এশিয়ার ফারগানা রাজ্যের রাজধানী আন্দিজানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ওমর শেখ মির্জা।

বাবর মোগল সম্রাট তৈমুর লং (দ্র)-এর বংশধর। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর অনেক নিকট-আত্মীয় তাঁকে ষড়যন্ত্র করে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবর সকলকে পরাজিত করে নিজেকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫০৪ সালে তিনি কাবুল জয় করেন এবং 'বাদশাহ্' উপাধি ধারণ করেন।

১৫২৬ সালে বাবর দিল্লির অদূরে পানিপথ প্রান্তরে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদী (দ্র)-কে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (দ্র) নামে পরিচিত।

বাবরের সাম্রাজ্য পশ্চিমে হীরা (বাহরা) থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে হিমালয় (দ্র) থেকে দক্ষিণে চান্দেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাবর শুধু বীর যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ। তুর্কি (দ্র) ও ফার্সি ভাষায় তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'তুযুক-ই-বাবর' সাহিত্য-ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। জ্ঞানানুশীলন, ধর্মভক্তি, সঙ্গীতানুরাগ, প্রকৃতিপ্রেম, সৌন্দর্যপ্রীতি তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

শাসক হিসাবে বাবর ছিলেন উদার এবং অসাম্প্রদায়িক। ১৫৩০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বাবরের মৃত্যু হয়। প্রথমে তাঁকে আগ্রায় সমাহিত করা হয়। কিন্তু পরে তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁর কবর কাবুলে স্থানান্তর করা হয়।

খু. জা.

বাবা আদমের মসজিদ

বাবা আদমের মসজিদ এদেশের প্রাচীনতম মসজিদগুলির একটি। এর অবস্থান মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপালে। জানা যায়, ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান জালালুদ্দিন ফতে শাহের রাজত্বকালে এই মসজিদ (দ্র) নির্মিত হয়। এর নির্মাতা মালিক কাফুর। নির্মাণকাল ৮৮৮ হিজরির রজব মাসের মধ্যভাগ, আগস্ট ১৪৮৩ সাল।

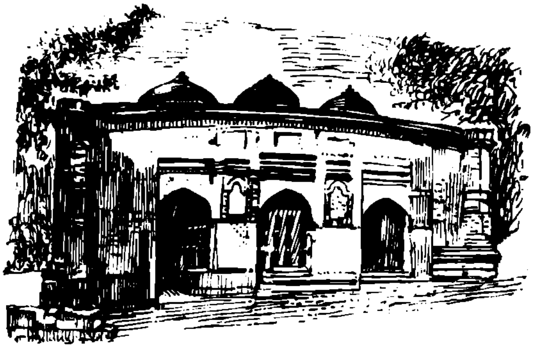

মসজিদের আয়তন ৪৩´ × ৩৬´। দেয়ালগুলি অত্যন্ত পুরু ও মজবুত। এর সুদৃশ্য ছয়টি গম্বুজ এবং চার কোণায় চারটি মিনার রয়েছে। মিনারগুলি আট কোণাকৃতির। বাঁকানো কার্নিস, মসজিদের সম্মুখভাগ এবং পশ্চিম দেয়ালের তিনটি মিহ্‌রাব নানা প্রকার মনোমুগ্ধকর অলঙ্করণে সমৃদ্ধ।

www.pathagar.com

বর্তমানে মসজিদটিতে বেশ কিছু মেরামত ও সংস্কারের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

মসজিদের নাম বাবা আদমের মসজিদ কেন হল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিংবদন্তি অনুসারে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে বাবা আদম নামক জনৈক দরবেশ বিক্রমপুর এলাকায় ইসলাম ধর্ম (দ্র) প্রচার করতে আসেন। রাজা বল্লাল সেন তখন বাংলার শাসনকর্তা। বিক্রমপুরের রামপালে তাঁর রাজধানী। বল্লাল সেনের সঙ্গে সংঘর্ষে বাবা আদম শহীদ হন। কাজীর কসবা গ্রামে তাঁকে সমাহিত করা হয়। সম্ভবত বাবা আদমের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই তাঁর কবরের পাশে পরবর্তী কালে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। তাঁর কবরসন্নিহিত হওয়ায় মসজিদের এরূপ নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন।

মু. মা.

বাবুই

বাবুইকে বলা হয় তাঁতি পাখি। চড়ুইয়ের জাতভাই। এটি একটি ছোট পাখি। প্রজাতি হলুদ, কালো-সাদা, বাদামি, কালো রঙের হয়। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কালোবুক (ব্ল্যাক ক্রেস্টেড উইভার বার্ড), ডোরকাটা বাবুই (স্ট্রিক্‌ড্ বায়া) ও সাধারণ বাবুই।

শস্যদানা, বীজ, কীটপতঙ্গ (দ্র) খায়। এরা গানের পাখি। গলার শব্দ হচ্ছে চিই-ই-ই, কিট্ কিট্। বাসা বাঁধার সময় সমস্বরে ডাকে, ডানা ঝাপটায়।

পাখির বাসার মধ্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা ও সুন্দর

বাবুইয়ের বাসা। মজবুত বুনুনি। এ জন্য এরা ধানের পাতা, খেজুরের কচি পাতা সরু করে কেটে আনে। মরা ঘাস দিয়েও বাসা করে। তাল (দ্র)-নারকেল (দ্র)-বাবলা ইত্যাদি গাছে ওদের বাসা ঝুলে থাকে। দেখতে সাপুড়ের বাঁশির মতো। এতে দু'টি প্রবেশমুখ থাকে। ডিম-বাচ্চার কুটুরি আলাদা। বাসার ভেতরে কাদা লেপ্টে দেয়।

বাবুই দলবদ্ধ হয়ে থাকে। অনেকে বাসা করে নল-খাগড়ার ঝোপে। একটি পুরুষ স্ত্রীকে আকর্ষণ করার জন্য ৫টি পর্যন্ত বাসা বোনে। চড়ুইসদৃশ এই পাখি ১২ বছর পর্যন্ত বাঁচে। বাংলাদেশে (দ্র) ৩ প্রজাতিই আছে।

শ. খা.

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ

বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ বাংলাদেশের (দ্র) সর্ববৃহৎ মসজিদ। স্থাপত্যশৈলী ও নির্মাণকুশলতায় মসজিদটি বিশিষ্ট।

পাকিস্তানের (দ্র) প্রখ্যাত শিল্পপতি লতিফ বাওয়ানি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াহিয়া বাওয়ানির সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এই মসজিদ নির্মাণের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় অন্যান্য সমাজহিতৈষী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা। ১৯৬০ সালের ২৭শে জানুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান (দ্র) এই

www.pathagar.com

মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বায়তুল মুকাররম মসজিদের নকশা প্রণয়ন করেন বিখ্যাত পাকিস্তানি স্থপতি আবুল হুসাইন থারিয়ানি। কর্মতত্ত্বাবধানে ছিলেন তাঁর পুত্র টি. থারিয়ানি। প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন জনাব মনিরুল ইসলাম। মসজিদ-কমপ্লেক্সটির মোট জমির পরিমাণ ৮.৩০ একর। সমগ্র মসজিদভবন সর্বমোট আট তলার হলেও মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত অংশ মোট ছ' তলার। মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের নিচতলায় প্রধান নামায-ঘর, যার সর্বমোট আয়তন ১১,০২৩ বর্গফুট। এই সঙ্গে রয়েছে প্রশস্ত বারান্দা। মসজিদ-কক্ষের পূর্বদিকে প্রসারিত সুবৃহৎ খোলা চত্বর, যার আয়তন ২৯ হাজার বর্গফুট। নামাযের সময় অত্যধিক লোকসমাগম হলে তখন এই চত্বরটি ব্যবহৃত হয়। সুদৃশ্য এবং সুবৃহৎ দু'টি ওযুখানা, শিল্পসুষমামণ্ডিত মিহ্‌রাব, মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সুদৃশ্য গেট, দোকান কমপ্লেক্স, মহিলা নামায-কক্ষ প্রভৃতির সমন্বয়ে এই মসজিদটি একদিকে উপাসনাগৃহ, অন্যদিকে স্থাপত্য-সৌকর্যের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মু. মা.

বায়রন, জর্জ্ গর্ডন্ নোয়েল্ [১৭৮৮—১৮২৪]

জর্জ বায়রনের (George Gordon Noel, 6th Lord Byron) জন্ম লণ্ডনে (দ্র), ১৭৮৮ সালের ২২শে জানুয়ারি। উনবিংশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের(দ্র) এক জন প্রধান কবি তিনি। বাবা ছিলেন সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন। বাবা স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করে ফ্রান্সে চলে যান। মা ছিলেন সম্ভ্রান্তবংশীয়, কিন্তু ভীষণ বদমেজাজি। বায়রনের বাল্যকাল দুঃখ ও দারিদ্র্যে কেটেছে। এবার্ডিন্ গ্রামার স্কুলে পড়াশোনা করার সময়ই তাঁর ভাগ্যচক্র ঘুরে যায়। ১৭৯৮ সালে মামার মৃত্যুতে তিনি Lord উপাধি ও বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন। পরে বিখ্যাত স্কুল হ্যারো ও কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশোনা করেছেন। ক্রিকেট খেলা আর নৌকা চড়া ছিল তাঁর নেশা। ১৮০৯ সালে পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর তিনি House of Lords-এ তাঁর আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু দলীয় রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর অনীহা ছিল। ১৮০৯ সালের জুলাই মাসে তিনি বন্ধু হব্‌হাউসকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে ইউরোপের (দ্র) অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণে বের হন। ১৮১১ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বছরেই তাঁর মা মারা যান। ১৮১৫ সালের ২রা জানুয়ারি বায়রন বিত্তশালী পিতার একমাত্র সুন্দরী কন্যা অ্যানাবেলা মিলবাঙ্ক (Annabella Milbanke)-কে বিবাহ করেন। কিন্তু এই বিবাহ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এক বছর। ১৮১৬ সালেই স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের আইনগত নোটিশ পাঠান। কবির মন-মেজাজ ও ব্যবহারের সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। এই নোটিশ পাবার চারদিন পর বায়রন ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেন এবং আর কোনোদিন ফিরে আসেন নি। তিনি এই ভ্রমণের এক পর্যায়ে কবি শেলির (দ্র) সঙ্গে পরিচিত হন এবং সুইজারল্যাণ্ড ও ভেনিস ভ্রমণে তিনি শেলিদের সঙ্গী ছিলেন। ইতালির নদীতীরে শেলির দাহ-অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে তিনি বিশেষ বিমর্ষ হয়ে পড়েন। বায়রন ১৮২৩ সালে গ্রিসের স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেন এবং এক জন সক্রিয় রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠেন। ১৮২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি অসুস্থ হয়ে পশ্চিম গ্রিসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁকে অবশ্য তাঁর স্বদেশে এনেই সমাহিত করা হয়।

১৮০৭ সালে কেম্ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় বায়রনের Hours of Idleness প্রকাশিত হয়। Edinburgh Review-এ এই রচনার তীব্র সমালোচনা বেরোয়। ১৮১১ সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্য Childe Harold-এর দু'টি canto বা সর্গ এবং Seige of Corinth প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ সালে রাভেনা ভ্রমণের সময় তিনি কয়েকটি নাটক লেখেন—Manfred, Cain, Marino Feliaro, Heaven and Earth প্রভৃতি। বিখ্যাত কবিতা Don Juanও এই সময়কার রচনা। কবি বায়রন তাঁর অসাধারণ কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ব্যক্তিচরিত্র অঙ্কন, ইতিহাসবোধ এবং আবেগপ্রবণতার জন্য ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে এক অক্ষয় স্থান অধিকার করে আছেন।

শ. আহ.

বায়ু বাতাস / বায়ু দ্র

www.pathagar.com

বায়ুচাপ

পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকটে কোনো বিন্দুতে সেই বিন্দুর উপরকার বাতাসের ওজনের দরুন চাপ। প্রতি বর্গমিটার আয়তনের এলাকায় এই চাপের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ নিউটন (দ্র)। কিলোপ্যাস্কেল এককে এর পরিমাণ হচ্ছে ১০০। কোনো স্থানে বায়ুচাপ মাপার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় সেটির নাম ব্যারোমিটার (দ্র)।

সু.ব.

বায়ুদূষণ

আমাদের পৃথিবীর (দ্র) ওপর ছড়িয়ে আছে বাতাস (দ্র) বা বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর আবহমণ্ডলের একটি প্রধান অংশ। এই বাতাস বা বায়ুর বেশির ভাগ হচ্ছে নাইট্রোজেন (দ্র) গ্যাস (দ্র)। এরপর আছে অক্সিজেন (দ্র) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র)। এতে আরো আছে জলীয় বাষ্প এবং নাইট্রোজেন, সালফার (দ্র) ইত্যাদির অক্সাইড (দ্র)। তা ছাড়া আর্গনের (দ্র) মতো কিছু গ্যাসও এতে রয়েছে। বাতাসে এসব গ্যাসের পরিমাণ সুষম অবস্থায় থাকলে সে বাতাসকে বলা হয় নির্মল বায়ু। কিন্তু এই পরিমাণের সুষমতা নষ্ট হলে বায়ু দূষিত হয়ে পড়ে এবং তা আমাদের জীবন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

বায়ু নানা কারণে দূষিত হতে পারে। রাসায়নিক শিল্প-কারখানা, বিভিন্ন যানবাহন ও বিভিন্ন রকম যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলে কার্বন (দ্র), সাল্‌ফার (দ্র) ও নাইট্রোজেন-এর অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন (দ্র) বাতাসে মিশে বায়ু দূষিত করে। এসব ক্ষেত্রে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। একে বলে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া (দ্র)। এ সময় নাইট্রোজেন ও সালফারের অক্সাইড অ্যাসিড-বৃষ্টি হিসাবে পৃথিবীতে নেমে আসে। এতে গাছপালা এবং জলজ প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায়।

বায়ুদূষণের ফলে আমাদের পৃথিবীর চারদিকে যে ওজোন (দ্র)-স্তর আছে তাতে ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। এতে সূর্যের (দ্র) অতিবেগুনি রশ্মি (দ্র) পৃথিবীতে সরাসরি আঘাত হানতে পারে। তা ছাড়া, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মেরুঅঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্র-তলের উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীর অনেক স্থলভাগ পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। অন্য দিকে পৃথিবীর অনেক জায়গায় জলবায়ু (দ্র) ও আবহাওয়া (দ্র) ব্যাপকভাবে বদলে যেতে পারে। এর ফলে কৃষিউৎপাদনে চরম বিপর্যয় দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সু. ব.

বায়ুমণ্ডল বাতাস / বায়ু দ্র

বায়েজিদ বুস্তামি [খ্রি. ৮ম–৯ম শতক]

হযরত বায়েজিদ বুস্তামি (র.) বিখ্যাত সুফিসাধক ও দরবেশ। তিনি চট্টগ্রাম (দ্র) অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম (দ্র) প্রচার করেন।

বায়েজিদ বুস্তামির সঠিক জন্মতারিখ জানা যায় না। তবে অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদে কিংবা নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর জন্ম বলে অনুমান করা হয়। তাঁর জন্মস্থান পূর্ব-ইরানের বুস্তাম শহরে বলে নামের শেষে 'বুস্তামি' সংযুক্ত হয়েছে।

কিংবদন্তি অনুযায়ী, বায়েজিদ বুস্তামি বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে চট্টগ্রামে আসেন। তিনি চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকায় পাহাড়ের চূড়ায় আস্তানা স্থাপন করে চট্টগ্রামসহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জেলায় ইসলাম প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন বলে জানা যায়।

এই মহান সাধক ৮৭৭ সালে নিজ জন্মভূমি বুস্তামে ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

বায়োগ্যাস (biogas)

যে কোনো পচনশীল জৈবপদার্থ (গোবর, মলমূত্র, আবর্জনা, কচুরিপানা, লতাপাতা ইত্যাদি) বাতাসের (দ্র) অনুপস্থিতিতে পচনের ফলে যে গ্যাস (দ্র) উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় বায়োগ্যাস। এর শতকরা ৬০–৭০ ভাগ মিথেন (দ্র), বাকিটা প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র)। মিথেন জ্বালানি (দ্র) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস নির্গমনের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা উন্নত মানের জৈবসার। এতে জৈবপদার্থ, নাইট্রোজেন (দ্র), ফসফরাস (দ্র), পটাসিয়াম (দ্র) ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সংরক্ষিত হয়। বায়োগ্যাসের সাহায্যে রান্না করা ম্যান্ট্‌ল্ জ্বেলে হ্যাজাক জ্বালানো, জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ (দ্র) উৎপাদন করা যায়। আবর্জনা, গবাদি পশুর মলমূত্র যত্রতত্র না ফেলে বায়োগ্যাস প্লান্টে পচানো

www.pathagar.com

হলে দুর্গন্ধ, মশামাছি ও রোগজীবাণুর বিস্তার রোধ হয়।

বায়োগ্যাস প্রস্তুতের জন্য গ্যাস প্লান্ট তৈরি করা হয়। এই প্লান্ট প্রধানত দুই প্রকার। একটি স্থির ডোম, অন্যটি ভাসমান ডোম মডেল। যে বদ্ধ কুয়ার মধ্যে পচনক্রিয়ায় গ্যাস উৎপন্ন হয় তার নাম ডাইজেস্টার। যে অংশে গ্যাস জমা হয় তার নাম গ্যাসহোল্ডার। ভাসমান ডোম মডেলে গ্যাসহোল্ডারটি আংশিক নিমজ্জিত হয়ে ভাসতে থাকে। এটি একটি উপুড় করা ধাতব ড্রাম। স্থির ডোম মডেলে আলাদা গ্যাসহোল্ডার থাকে না। ডাইজেস্টারের উপরের অংশে গ্যাস জমা হয়।

বায়োগ্যাস পরিচ্ছন্ন জ্বালানি। পরিবেশকে দূষণমুক্ত, স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন রাখে।

স. রা.

বারি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল দ্র

বারোজ্, এড্গার্ রাইস্ [১৮৭৫—১৯৫০]

জনপ্রিয় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর লেখক বারোজ (Edgar Rice Burroughs) অ্যাডভেঞ্চার-চরিত্র টারজান (দ্র)-এর স্রষ্টা হিসাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সারা বিশ্বে সুপরিচিত।

এড্গার্ রাইস্ বারোজ্ জন্মেছিলেন আমেরিকার শিকাগো শহরে, ১৮৭৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে। প্রথম জীবনে অনেক কষ্ট করেও ভাল চাকুরি জোগাড় করতে পারেন নি। ১৯১১ সালে উচ্চাশায় বুক বেঁধে পত্রপত্রিকার জন্য গল্প লিখতে শুরু করেন। 'অল্-স্টোরি ম্যাগাজিন' নামে একটি পত্রিকায় ১৯১২ সালে ধারাবাহিকভাবে তাঁর রচিত 'টারজান অব দ্য এপ্স্' (Tarzan of the Apes) প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

তাঁর বই ৫৬টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং পৃথিবী জুড়ে বিক্রি হয়েছে ১০ কোটিরও বেশি কপি। তিনি প্রায় ৭০টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সবই ছিল নানান ধরনের রোমাঞ্চকর কাহিনী। যেমন—বন্য জীবনের রোমাঞ্চ নিয়ে টারজান সিরিজে ২৪টি বই, মাটির নিচের দুনিয়া নিয়ে লেখা পেলুসিডার্ সিরিজে ৭টি বই, 'মঙ্গলগ্রহে জন কার্টার' নামে এক মার্কিনের দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প নিয়ে রচিত 'বার্সুম' সিরিজের অন্তর্গত ১১টি বই, ইত্যাদি।

বারোজ্ ১৯৫০ সালের ১৯শে মার্চ শিকাগো শহরেই মৃত্যুবরণ করেন।

হা. মা.

বারোভুঁইয়া

'বারো ভুঁইয়া' শব্দটি বাংলার ইতিহাসের এক পরিচিত নাম। এই নামে বাংলার কিছু সংখ্যক স্বাধীন জমিদার বা ভূস্বামীকে বোঝানো হত। বাংলায় পাঠান কর্রানী বংশের রাজত্ব দুর্বল

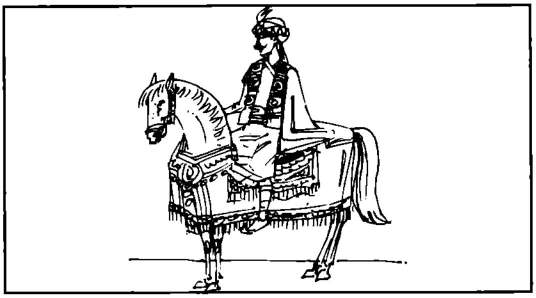

হয়ে পড়লে বাংলাদেশের (দ্র) খুলনা (দ্র), বরিশাল (দ্র), সোনারগাঁও, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট অর্থাৎ বর্তমানের সিলেট (দ্র) প্রভৃতি এলাকায় কিছু সংখ্যক জমিদার স্বাধীন রাজার মতো রাজত্ব করতে থাকেন। ১৫৭৫ সালে মোগল সম্রাট আকবর (দ্র) বাংলা জয় করার পর এসব স্বাধীন 'রাজা' ঈসা খাঁর (দ্র) নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হন এবং মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এঁরাই ইতিহাসে 'বারো ভুঁইয়া' নামে বিখ্যাত, যদিও তাঁদের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে বারো জন ছিল না। এঁদের মধ্যে ঈসা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য (দ্র), লক্ষ্মণ মাণিক্য প্রমুখ বিখ্যাত।

মু. মা.

বার্ক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল দ্র

বার্ন কনভেনশন কপিরাইট দ্র

বার্নিয়ে, ফ্রঁসোয়া [১৬২০— ?]

ভারত (দ্র) পরিভ্রমণকারী ফরাসি পর্যটক। ১৬২০ সালের ২৫শে বা ২৬শে সেপ্টেম্বর বার্নিয়ে (Francois Bernier) ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫২ সালে চিকিৎসাবিদ্যা (দ্র) বিষয়ে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি ডাক্তারি পেশায় যোগ দেন।

www.pathagar.com

১৬৫৬ সালে তিনি প্রাচ্যের দেশসমূহে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে ১৬৫৯ সালে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান।

১৬৫৯ সালের ১২-১৩ মার্চ সম্রাট শাহজাহানের (দ্র) জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহ (দ্র) যখন দেওরার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের (দ্র) কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বার্নিয়ে সুরাট বন্দরে নেমে আমেদাবাদে প্রবেশ করেন। এখানে দারা শিকোহ্‌র সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি এক জন ডাক্তার এই কথা জানতে পেরে দারা শিকোহ্ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু পরে দারা শিকোহ্ সিন্ধুর দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলে বার্নিয়ে কোনো রকমে দিল্লি (দ্র) পৌঁছতে সক্ষম হন। চার বছর তিনি দিল্লিতে অবস্থান করেন।

১৬৬৪ সালের পর বার্নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এ সময় আরেক ফরাসি পর্যটক তাভের্নিয়ে (Jean-Baptiste Tavernier)-র সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৬৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বার্নিয়ে তাভের্নিয়ের সঙ্গে বঙ্গদেশের দিকে যাত্রা করেন। রাজমহল অবধি একসঙ্গে এসে দু' জন আলাদা হয়ে যান। বার্নিয়ে একা কাসিমবাজার হয়ে বঙ্গদেশে উপনীত হন। তারপর এখানে এক মাস কাটিয়ে দক্ষিণে মসুলিপট্টম অভিমুখে যাত্রা করেন।

এ ছাড়া তিনি আরো এক বার বঙ্গদেশে আসেন বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু তার সঠিক সাল-তারিখ জানা যায় না। ১৬৬৭ সালে বার্নিয়ে স্থলপথে দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরে বার্নিয়ে ভারতভ্রমণ বিষয়ে একটি বই লেখেন। এই বইতে তিনি বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও উর্বরতার প্রশংসা করেছেন। তাঁর বইটির নাম 'মোগল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ'। ১৮৯১ সালে আর্চিবল্ড কন্সটেব্‌ল্ (Archibald Constable) মূল ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে Travels in the Mughal Empire নামে প্রকাশ করেন। বার্নিয়ের মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নি।

সুজ. ব.

বার্মা মায়ানমার দ্র

বার্লিন সম্মেলন

ইউরোপীয় শক্তিসমূহের উপনিবেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৮৮৪ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার মাসব্যাপী বার্লিন শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনই বার্লিন সম্মেলন নামে পরিচিত। এটিই ছিল আলোচ্য বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

মূলত মধ্য-আফ্রিকার কঙ্গোয় বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক প্রাধান্যবিস্তারকে কেন্দ্র করে যে বিবাদের সূচনা হয়, তা নিষ্পত্তির জন্য বার্লিন সম্মেলন আহূত হয়েছিল। জার্মান চ্যান্সেলর বিস্‌মার্ক্ (Bismarck) ও ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ফেরির চেষ্টায় চৌদ্দটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। বিস্‌মার্ক্ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

বার্লিন সম্মেলনে কয়েকটি বিরোধের অবসান ঘটে। জার্মান ও ফরাসিদের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক ভাগ-বাঁটোয়ারার পর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। সম্মেলনের চুক্তি অনুসারে ইংল্যাণ্ড নিম্ন-নাইজার অঞ্চলের দখল লাভ করে, পশ্চিম সুদানে ফরাসি আধিপত্য স্বীকৃতি পায় এবং কঙ্গো নদীর অববাহিকায় বেলজিয়ামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত সব দেশের প্রতিনিধিরাই ক্রীতদাস-প্রথা ও দাস-ব্যবসা উচ্ছেদে সম্মত হন।

সুজ. ব.

বাল্‌জাক্, অনরে দ্য [১৭৯৯—১৮৫০]

অনরে দ্য বাল্‌জাক্ (Honoré de Balzac) ফরাসি কথাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বসাহিত্যের কালজয়ী শিল্পী হিসাবে খ্যাত। জন্ম ফ্রান্সে, ১৭৯৯ সালে।

বাল্‌জাকের কয়েক খণ্ডে লেখা উপন্যাস 'দ্য হিউম্যান কমেডি'কে বলা হয় তাঁর সমকালীন সমাজের নিখুঁত ও অনুপম সাহিত্যচিত্র। তাঁর অপর উপন্যাস 'ফাদার গোরিও' ধ্রুপদী সাহিত্যশৈলীর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। 'ড্রোল স্টোরিজ'-এর গল্পগুলিও বাল্‌জাকীয় অননুকরণীয় ভঙ্গিতে লিখিত। একটি নাটকেরও রচয়িতা তিনি। নাম 'স্টেপ মাদার'। বাংলা ভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কিছু রচনাকর্মের অনুবাদ হয়েছে।

বাল্‌জাকের মৃত্যু হয় ১৮৫০ সালে, ফ্রান্সেই।

আ. হু.

বাল্টিক দেশ

বাল্টিক দেশ বা রাষ্ট্র বলতে বোঝায় এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া। এই তিনটি দেশই বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী। পূর্বে এরা সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র।

হা. মা.

www.pathagar.com

বাল্মীকি

'রামায়ণ' (দ্র) মহাকাব্যের রচয়িতা ও ভারতবর্ষের আদি কবি। তিনি প্রচেতা ঋষির বংশধর ও চ্যবন মুনির পুত্র। বনপরিবৃত তমসা নদীর তীরে তাঁর আশ্রম ছিল। যৌবনে তিনি রত্নাকর দস্যু নামে পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্মা (দ্র) ও নারদ তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন এনে দেন। এক সময় রত্নাকর দেবর্ষি নারদকে বধ করতে গেলে নারদ প্রশ্ন করেন, তিনি কি জন্য এই মহাপাপ করছেন। রত্নাকর তখন বলেন, পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের জন্য তিনি এ কাজ করছেন। নারদ তখন সেই স্থানে অপেক্ষা করে রত্নাকর দস্যুকে পিতা-মাতার কাছে প্রেরণ করেন এবং তাঁরা রত্নাকরের পাপের ভাগী হবেন কিনা জেনে আসতে বলেন। রত্নাকর বাড়িতে গিয়ে পিতা-মাতাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা কেউ পাপের ভাগী হবেন না বলে জবাব দেন। তখন রত্নাকরের চৈতন্য উদয় হয়। নারদ রত্নাকরের এতদিনের জমা পাপ স্খালনের জন্য 'রাম নাম' জপ করতে উপদেশ দেন। রাম নাম জপ করতে করতে রত্নাকরের শরীরের চারদিক বল্মীক (বা উই) দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। সেই থেকে তাঁর নাম হয় বাল্মীকি। এই ঘটনার পর একদা নারদ বাল্মীকিকে রামচন্দ্রের কাহিনী শুনিয়ে চলে যান।

একদিন বাল্মীকি ঋষি ভরদ্বাজসহ তমসা নদীর তীরে ভ্রমণ করছিলেন। সে সময় এক জোড়া ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর একটিকে জনৈক ব্যাধ তীরবিদ্ধ করলে ক্রৌঞ্চী করুণ সুরে বিলাপ করতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে শোকাভিভূত বাল্মীকির মুখ থেকে একটি শ্লোক বেরিয়ে আসে। আদি কবিতা নামে খ্যাত এই শ্লোকটি হল—

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।"

অর্থাৎ, "হে নিষাদ! ক্রীড়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের ক্রৌঞ্চকে তুই যে হত্যা করলি তার জন্য তুই জীবনে কোনোদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবি না।"

ব্রহ্মার আদেশে এই নতুন ছন্দে তিনি রামায়ণ রচনা করেন। রামের পত্নী সীতা নির্বাসিতা হয়ে বাল্মীকির আশ্রমে এসে লব ও কুশ নামে যমজ সন্তানের জন্ম দেন। বাল্মীকি তাদের ধনুর্বিদ্যা ও রামায়ণগান শিক্ষা দেন।

বি. ব.

বাসস [বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা]

স্বদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘটিত ঘটনাবলি তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ, সম্পাদনা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেশের সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমসমূহে টেলিপ্রিন্টারযোগে পরিবেশনের লক্ষ্য থেকে ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক আদেশবলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। তদানীন্তন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান (এপিপি)-এর ঢাকা ব্যুরোর নামেমাত্র অবকাঠামোকে সম্বল করে শুরু হয় এর যাত্রা। প্রতিষ্ঠার পর এক বছরের মধ্যে বাসস বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহে আন্তর্জাতিক বার্তাসংস্থা রয়টার, এএফপি এবং পিটিআই-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং সংগৃহীত বিদেশী খবরাদির পাশাপাশি জাতীয় জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলির খবরাদিও পরিবেশন করে চলে দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও গণমাধ্যমসমূহে।

১৯৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল এক সরকারি আদেশবলে তৎকালীন বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনালকে (বিপিআই) বাসস-এর সঙ্গে একীভূত করা হয়।

১৯৭৯ সালের ৩১শে মার্চ বাসসকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি জাতীয় সংবাদসংস্থা হিসাবে রূপ দেওয়ার জন্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান (দ্র) একটি অধ্যাদেশ জারি করলে এটি একটি 'বডি কর্পোরেট' প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। পরবর্তী কালে আইনের মাধ্যমে এটি লাভ করে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা।

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই সংস্থার পরিচালনায় এক জন চেয়ারম্যানসহ ১১ সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রতি তিন বছর অন্তর এই বোর্ডের সদস্যবৃন্দ সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হন। সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক (তিনি বোর্ডেরও সদস্য) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

ঢাকা (দ্র) ও চট্টগ্রামের (দ্র) ৩২টি জাতীয় সংবাদপত্রসহ রেডিও (দ্র), টেলিভিশন (দ্র), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট বা পিআইডি এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ও বাসস-এর সংবাদগ্রাহক। এ ছাড়া সংস্থাটি বর্তমানে রয়টার এবং এএফপি'র কাছ থেকে উন্নততর ডিশ অ্যান্টেনাযোগে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বার্তাসংস্থা 'সিনহুয়া'র কাছ থেকে ভূ-উপগ্রহ যোগাযোগ এবং পিটিআই-এর কাছ থেকে মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী বিশ্বসংবাদ সংগ্রহ করে থাকে।

এ ছাড়া বিভিন্ন দেশের যেসব জাতীয় সংবাদসংস্থার সঙ্গে বাসস-এর সংবাদবিনিময়ের চুক্তি রয়েছে, সেগুলো হল মালয়েশিয়ার 'বার্নামা', যুগোশ্লাভিয়ার 'তানযুগ', ইরানের 'ইর্না', কিউবার 'প্রেস্না লাতিনা', উত্তর কোরিয়ার 'কেসিএনএ', রোমানিয়ার 'আজার প্রেস', ইন্দোনেশিয়ার (দ্র) 'আন্তারা', ইরাকের 'আইএনএ', বুলগেরিয়ার 'বি টিএ', তুরস্কের (দ্র) 'আনাতোলিয়া', থাইল্যাণ্ডের (দ্র) 'টি এন এ' এবং নেপালের (দ্র) 'আর এস এস'। বাসস ৩টি বহুজাতিক সংবাদসংস্থারও সদস্য। এগুলো হল 'নন-এলাইণ্ড নিউজ এজেন্সিজ পুল' (Non-Aligned News Agencies Pool) —সংক্ষেপে এনএএনএপি, 'অর্গানাইজেশন অব এশিয়া-প্যাসিফিক নিউজ এজেন্সি' (Organization of Asia-Pacific News Agency) —সংক্ষেপে ওএএনএ এবং 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক নিউজ এজেন্সি' (International Islamic News Agency) —সংক্ষেপে আইআইএনএ।

বর্তমানে বাসস টি-১০০০ জিমেন্স টেলিপ্রিন্টারযোগে প্রতি মিনিটে ৫০টি শব্দ তার গ্রাহকদের দিতে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে কম্পিউটারপদ্ধতি প্রবর্তন বিষয়ে সংস্থা বর্তমানে প্রকল্প তৈরির কাজে নিয়োজিত।

বাসস-এ বর্তমানে ৫০ জন সাংবাদিক ও ৯১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে রয়েছে এর একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যুরো। খুলনা (দ্র) ও রাজশাহীতে (দ্র) রয়েছেন এক জন করে নিজস্ব প্রতিনিধি। চট্টগ্রাম থেকে টেলিপ্রিন্টার সংযোগের মাধ্যমে এবং খুলনা ও রাজশাহী থেকে টেলেক্স কিংবা টেলিফোনযোগে ঢাকার সদর দফতরে খবর পাঠানো হয়। দেশের বিভিন্ন জেলায় রয়েছেন ১৫ জন খণ্ডকালীন সংবাদদাতা। এর প্রধান দফতরে বেশ কয়েকটি কর্মবিভাগ রয়েছে। যেমন —কেন্দ্রীয় ডেস্ক, বৈদেশিক ডেস্ক, কমার্শিয়াল ডেস্ক, জেলা ডেস্ক ইত্যাদি।

বাসস-এর প্রধান দফতর ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে ৬২/২ পুরানা পল্টনে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় সংবাদপত্র ও অন্যান্য গ্রাহকের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদা এবং সরকারপ্রদত্ত মঞ্জুরি ও অর্থানুকূল্যে।

আ. হ.

বাস্কেটবল (basketball)

বাস্কেটবল মূলত একটি আমেরিকান খেলা। ১৮৯১ সালে ডা. জেমস নেইস্মিথ (James Naismith) ওয়াই. এম. সি-এর প্রশিক্ষক থাকাকালে এই খেলাটি আবিষ্কার করেন। শারীরিক সক্ষমতা আনয়নের জন্য এই খেলাটি খুবই কার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় ধীরে ধীরে অল্প সময়ের মধ্যে সারা বিশ্বে এটা ছড়িয়ে পড়ে। সারা বছর ধরে দেহের উপযুক্ততা রক্ষার এবং অন্যান্য খেলাধুলায় উপযুক্ততার মান সমুন্নত রাখার জন্য এই খেলা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৯০৪ ও ১৯২৮ সালের অলিম্পিক গেম্‌সে (দ্র) এই খেলা প্রদর্শনী হিসাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিক হতে আজ পর্যন্ত এটা চলে আসছে। ১৯৩২ সালে আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা

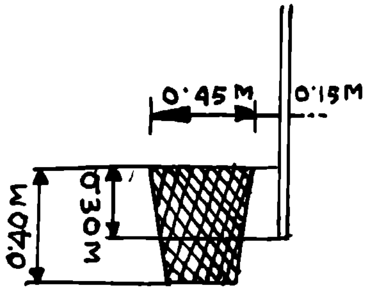

www.pathagar.com

হয়। ১৯৫৭ সালে এটা এশিয়ান গেম্‌সের (দ্র) অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। দৈহিক উচ্চতা এই খেলার জন্য খুব বড় সহায়ক। সাধারণত বাস্কেটবল খেলোয়াড় ৬´ ৪´´ উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। বাংলাদেশে (দ্র) এই খেলা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) পর থেকে প্রসার লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বিভিন্ন শহীদ স্মৃতি লীগ, নক্ আউট ছাড়া বিদ্যায়তনগুলিতে এবং সার্ভিসেস দলের মধ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ খেলা হয়ে থাকে।

কা. আ. আ.

বাস্তিল্ (Bastille)

ফ্রান্সের প্যারিস (দ্র) শহরের ভিতরে কুখ্যাত এক দুর্গ-কারাগার। ফরাসি বিপ্লব (দ্র) শুরু হয়েছিল বাস্তিল দুর্গ-কারাগার দখল করে বন্দিদের মুক্ত করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে (১৪ই জুলাই ১৭৮৯)। প্যারিস শহরকে রক্ষা করার জন্য এই দুর্গের পত্তন হয়েছিল ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে, পরে সপ্তদশ শতকে এটি জেলখানায় পরিণত হয় এবং প্রধানত রাজবন্দিদেরই এখানে রাখা হত। মনীষী ভল্‌ত্যার (দ্র)-কে এই কারাগারে রাখা হয়েছিল। ফরাসিরা এখনো এই দুর্গ পতনের দিন ১৪ই জুলাই তারিখটি 'বাস্তিল দিবস' হিসাবে পালন করে আসছে; এ দিনটি ফ্রান্সে সরকারি ছুটির দিন।

হা. মা.

বাস্তুসংস্থান

মানুষ পৃথিবীতে (দ্র) সুস্থভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য যেসমস্ত জিনিস সংগ্রহ করেছে, বেছে নিয়েছে ও সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে বাড়ি বা বসতি একটি। পৃথিবীর লোকসংখ্যা যখন কম ছিল তখন বাড়ি নিয়ে কোনো ভাবনা ছিল না। বাড়ি নির্মাণের জন্য উপাদান সংগ্রহ করা যেত সহজে এবং জিনিসপত্রের দামও ছিল সস্তা। পৃথিবীতে মানুষ বেড়ে গেছে অনেক বেশি। মানুষ বাড়ছে কিন্তু জমি বা বাড়ি তৈরির প্রাকৃতিক উপকরণ বাড়ছে না। অধিক মানুষের জন্য অধিক বসতি দরকার। ফলে কৃত্রিম উপকরণের দামও নাগালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা। কাজেই এই শতকের শেষের দিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বসতি নির্মাণের উপায় খোঁজা শুরু হয়। বসতি এমন হবে যাতে লোক স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে এবং বাহুল্য যেন না হয়। বাড়িতে জিনিসপাতি এমন কৌশলে ব্যবহার করতে হবে যাতে ব্যয় অধিক না হয় অথচ বাড়িটি মজবুত হবে ও দীর্ঘদিন টিকে থাকবে। বিজ্ঞানীরা এই প্রকল্পের নাম রেখেছেন হাউজিং বা বাস্তুসংস্থান। আগেকার দিনে যে যেখানে পারত ঘর তুলত। ঘরের জায়গা নির্বাচনে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ফলে রাস্তাঘাট নির্মাণ বা চলাচলের ব্যবস্থা নেওয়ার অসুবিধে হত। সমস্যা হত এলাকায় জল নিষ্কাশনে এবং মুক্ত বায়ু চলাচলে। বর্তমানে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা নানা রকম বিজ্ঞানভিত্তিক কলাকৌশল ও সুষ্ঠু চিন্তাভাবনার সাহায্যে বাড়িগুলোকে কম জায়গায়, কম খরচে মজবুত ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। এ ছাড়া এক জনের ঘর প্রতিবেশীর জন্য যেন কোনো রকমের অসুবিধার সৃষ্টি না করে তার দিকে তাঁরা লক্ষ রাখছেন। বিজ্ঞানসম্মত বাস্তুসংস্থান একবিংশ শতাব্দীর জন্য অতি জরুরি।

ত. চ.

বাহ্‌রাম খান দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান দ্র

বাহাই

বাহাই একটি বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর নাম। মির্জা হুসাইন আলী

www.pathagar.com

নূরী, যাঁর উপনাম বা আলঙ্কারিক খেতাব বাহাউল্লাহ্, তাঁর অনুসারীরাই 'বাহাই' নামে পরিচিত।

বাহাউল্লাহ্ উপাধিধারী মির্জা হুসাইন আলী নূরী ইরানের মাজান্দারানের নূর জনপদে জন্মগ্রহণ করেন ১৮১৭ সালের ১২ই নভেম্বর।

'বাহাউল্লাহ্' শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র জ্যোতি বা আলোকচ্ছটা। এই উপাধি গ্রহণ করে তিনি তাঁর পূর্বসূরি 'বাব্' প্রবর্তিত বাবী মতবাদকে কিছুটা সংস্কার করে প্রচার করতে থাকেন।

উল্লেখ্য, 'বাব্'ও প্রকৃতপক্ষে একটি আলঙ্কারিক খেতাব, অর্থ—দরজা। বাব্-এর আসল নাম সৈয়দ আলী মুহম্মদ। গোপন সত্তা বা স্রষ্টার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা বা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবেই 'বাব্' শব্দটি প্রযুক্ত। 'বাব্' উপাধিধারী আলী মুহম্মদ ইসলাম ধর্মের (দ্র) বাহ্য সংস্কার ও আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে তাঁর নিজের চিন্তা ও দর্শনের আলোকে একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ও প্রচার করেন। তাঁর প্রচারিত মতবাদের সার কথা হল : আল্লাহ্ এক, তিনি আলী মুহম্মদের মাধ্যমে প্রতিফলিত হন—যেমন করে আয়নায় কোনো কিছু প্রতিবিম্বিত হয়। এই মতবাদের আরো কিছু স্বতন্ত্র বিধান ও ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান।

বাব্‌প্রবর্তিত এই নতুন ধর্মের প্রতি মির্জা হুসাইন আলী নূরী আকৃষ্ট হন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি এই ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। অচিরেই তিনি বাব্-এর অন্যতম প্রধান শিষ্যরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৫০ সালে মির্জা হুসাইন আলী ওরফে বাহাউল্লাহ নিজেকে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রকাশিত ব্যক্তি বলে দাবি করেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরি বাব্ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মকে সংস্কার করে একে একটি বিশ্বজনীন ধর্মে রূপায়িত করার পরিকল্পনা নেন। বাহাউল্লাহ্‌র মতবাদের মূলকথা হল পরের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা, সকলকে ভালবাসা, বৃহত্তর কল্যাণ ও মঙ্গলের স্বার্থে অম্লান বদনে অবিচার সহ্য করা, বিনয় প্রকাশ ও আর্ত-পীড়িতের সেবা করা। এ ছাড়া এই ধর্মের আরো কিছু সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিঙ্‌নির্দেশনা আছে।

বাহাউল্লাহ্‌র অনুসারীরা অর্থাৎ বাহাইরা সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য এবং তাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন। বাংলাদেশেও এই ধর্মের অনুসারী এবং ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র রয়েছে।

মু. মা.

বাহাদুর শাহ (২য়) [আনু. ১৭৬৮—১৮৬২]

বাহাদুর শাহ (২য়) ছিলেন ইংরেজদের বৃত্তিভোগী নামে-মাত্র এবং সিংহাসনে আরোহণকারী শেষ মোগল সম্রাট। তিনি আনুমানিক ১৭৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দ্বিতীয় আকবর শাহ্।

১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ (দ্র) শুরু হলে বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই শুরু করে।

কিন্তু বিদ্রোহে সিপাহীদের পরাজয় ঘটলে বিদ্রোহীদের সহযোগী হিসাবে বাহাদুর শাহ'র বিচার করা হয়। তাঁর পুত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয় এবং তাঁকে বার্মার (দ্র) রাজধানী রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে নানা দুঃখ-কষ্ট বরণ করে অসহায় অবস্থায় তিনি ১৮৬২ সালের ৭ই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

বাহাদুর শাহ পার্ক

ঢাকার (দ্র) সদরঘাটের অনতিদূরে একটি ঐতিহাসিক স্থান। বর্তমানে এই স্থানটিকে যে রূপে দেখি, ১৯৫৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বলতে গেলে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

আঠারো শতকের শেষের দিকে বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কের বেষ্টিত জায়গা জুড়ে ছিল একটা ভবন—ঢাকায় বসবাসকারী আর্মেনীয়দের ক্লাবঘর। ঢাকার স্থানীয় অধিবাসীরা তার নাম দিয়েছিল 'আন্টাঘর'। এই ঘরের ভেতরে খেলা হত বিলিয়ার্ড। বিলিয়ার্ডের যে বল, তাকেই বলা হত 'আন্টা', মতান্তরে 'আণ্ডা'। সেই থেকে 'আন্টাঘর' নামের উৎপত্তি।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজেরা কিনে নেয় এই 'আন্টাঘর'। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে সেটি জীর্ণ হয়ে পড়লে তাকে ভেঙে ফেলে একটা ময়দানের রূপ দেওয়া হয়। এরপর থেকে এটা পরিচিত হয়ে ওঠে 'আন্টাঘরের ময়দান' নামে।

তবে এই ময়দান শোকাবহ একটি স্মৃতির বিষয় হয়ে

www.pathagar.com

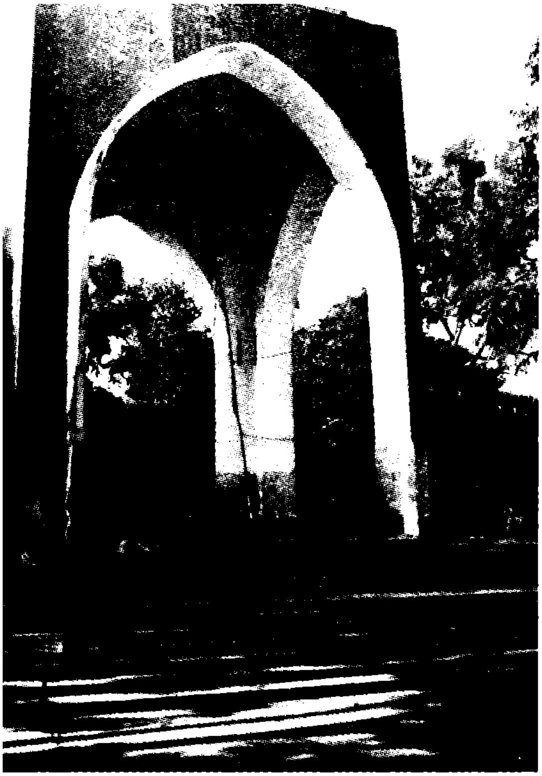

ওঠে ১৮৫৭ সালে। সিপাহি বিদ্রোহের (দ্র) সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইংরেজ সরকার পরপর বেশ কয়েক জন দেশীয় সৈন্যকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে এই মাঠে এনে। এই ঘটনার পর থেকে আণ্টাঘর ময়দান সম্পর্কে চারদিকে প্রচণ্ড ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে নানা ভৌতিক গল্পকাহিনীও। ফলে দিনের বেলাতেও ঢাকাবাসী কেউ সচরাচর এর ধারকাছ দিয়ে যেত না। ১৮৫৮ সালে ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া (দ্র) ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং এই আণ্টাঘর ময়দানেই এ সংক্রান্ত তাঁর ঘোষণা এক বিরাট সমাবেশে পাঠ করে শোনান সেই কালের ঢাকা বিভাগের কমিশনার। সেই থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রানী ভিক্টোরিয়ার নাম অনুযায়ী এর নাম হয় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'।

নওয়াব আবদুল গনি এই পার্কের উন্নয়নে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তাঁর নাতি খাজা হাফিজুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে নবাবের ইংরেজ বন্ধুরা ১৮৮৪ সালে এখানে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করেন।

আবার ১৯৫৭ সালে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহীদের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তৎকালীন 'ঢাকা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট'র (ডি আই টি) উদ্যোগে এই পার্কে বেদি সমেত একটি উঁচু স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয় এবং ভিক্টোরিয়া পার্কের নতুন নাম রাখা হয় ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ (দ্র)-এর নামানুসারে 'বাহাদুর শাহ পার্ক'। ঢাকার জেলাপ্রশাসকের অফিসের কাছে এই উন্মুক্ত চত্বরটি এখন এই নামেই পরিচিত।

আ. হু.

বি আই ডি এস বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্র
বি এ আর সি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল দ্র
বি এন পি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দ্র
বি কে এস পি বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্র

বিউ/ বিজু/ বিঝু

বাংলা বছরের শেষ দুই দিন ও নববর্ষের প্রথম দিনে এই উৎসব পালিত হয়। উত্তর ভারত থেকে আসাম, ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম (দ্র) ও কক্সবাজার (দ্র) পর্যন্ত এবং মায়ানমার (দ্র) থেকে থাইল্যাণ্ড (দ্র) পর্যন্ত এই উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে উদযাপিত হয়। চাকমাদের (দ্র) শ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসবের নাম বিঝু। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদেরও শ্রেষ্ঠ সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব বিউ। আসামে এই উৎসব ৭ দিন ধরে চলে এবং বিজু তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। চাকমারা বাংলা বছরের শেষ দিন 'মূল বিঝু', তার আগের দিন 'ফুল বিঝু' এবং তার পর বছরের প্রথম দিনকে 'গোর্জ্যা পোজ্যা' বলে। ফুল বিঝুর দিন শিশুরা নদীজলে কলাপাতায় ফুল ভাসিয়ে দেয় ও ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। মূল বিঝুর দিন প্রতিটি বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন করা হয়। এতে বিভিন্ন তরকারি দিয়ে নিরামিষ রান্না হয়, তাকে স্থানীয় ভাষায় 'পাঁচন' বলে। ওই পাঁচনে তেতো ও মিষ্টিসহ সব রকম স্বাদের আনাজ মেশানো থাকে। চাকমাদের বিশ্বাস, বছরের শেষ দিন তেতো, মিঠে সব রকম স্বাদের খাবার খেয়ে বর্ষবিদায় করা ভাল। এই দিন তরুণীরা বয়স্কদের জন্য নদী থেকে পানি তোলে। সেই জলে তাঁদের স্নান করিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। সদ্য বিবাহিতরা বর-কনেসহ বাপের বাড়ি বা শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যায়। ছোট ছেলে-মেয়েরা ভিটেয় খৈ, চাল, ধান (দ্র), ভাত ইত্যাদি পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গের (দ্র) জন্য ছিটিয়ে দেয়। নববর্ষের দিন বৌদ্ধবিহারে গিয়ে ফুল দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধপূজা

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের অনুষ্ঠান বিউ

করে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান প্রায় এরকম। ফুল বিউর দিন যে ফুল তোলে তার নাম বিউ ফুল। মার্‌মা (দ্র), রাখাইন (দ্র), ত্রিপুরা (দ্র), চাক, খ্যাং, খুমি, লুসাই, পাংখো, বোম প্রভৃতি উপজাতির জনসাধারণ নিজেদের মতো এই উৎসব পালন করে। প্রত্যেক উপজাতির মধ্যে এই উৎসব নিয়ে গান ও নাচ আছে। মার্‌মা ও রাখাইন যুবক-যুবতীরা এই দিনে জল ছিটানোর উৎসব করে।

বি. ব.

বিকিরণ (radiation)

তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিদ্যুৎ চৌম্বকতরঙ্গ কিংবা চার্জ (দ্র)-যুক্ত বিদ্যুৎ-কণিকার রশ্মি বিচ্ছুরণ 'বিকিরণ' নামে পরিচিত। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাপ সঞ্চালনের যে তিনটি উপায় রয়েছে (পরিবহণ, পরিচালন ও বিকিরণ), এটি সেগুলির একটি।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ তিন রকম অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করে। তিনটির মধ্যে দু'টি রশ্মি আসলে চার্জযুক্ত কণার প্রবাহ। এ দু'টি রশ্মির নাম আলফা রশ্মি এবং বিটা রশ্মি। আলফা (দ্র) রশ্মি পজিটিভ চার্জযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু (দ্র) অর্থাৎ দু'টি প্রোটন (দ্র) এবং দু'টি নিউট্রনের (দ্র) সমষ্টিমাত্র। আর বিটা রশ্মি নেগেটিভ চার্জযুক্ত ইলেক্ট্রন (দ্র)-কণিকা ছাড়া কিছুই নয়। তৃতীয় রশ্মির নাম গামা রশ্মি (দ্র)। এটা এক ধরনের বিদ্যুৎ চৌম্বকতরঙ্গের প্রবাহ। সব রকম বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তির বিকিরণ পদার্থবিজ্ঞানের (দ্র) মৌলিক সূত্র মেনে চলে। যেমন এরা সবাই শূন্যস্থান দিয়ে বিকিরিত হতে পারে এবং এদের গতি আলোর গতির সমান। অন্য বস্তুর সঙ্গে ক্রিয়া না করলে এদের শুধু তরঙ্গদৈর্ঘ্য, তরঙ্গের হার কিংবা শক্তির পরিমাণের সাহায্যে আলাদা করা যায়।

তেজ বিকিরণ এক ধরনের ভৌত শক্তি এবং এটা যে-কোনো বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে। উঁচু মাত্রায় বিকিরণের ফলে মৌলের ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। বিকিরণের ফলে উদ্ভিদ (দ্র) কিংবা প্রাণীর (দ্র) ক্ষতিও হতে পারে।

জীবিত কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মে (দ্র) বিকিরণের ফলে নিউক্লিয়াস এবং ক্রোমোজোমের (দ্র) ক্ষতি হয়। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে কোষ মরে যেতে পারে। সুস্থ মানুষের জন্য এটা ক্ষতিকর হলেও অনেক রকম ক্যান্সারের (দ্র) চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয় অনাকাঙ্ক্ষিত কোষগুলিকে মেরে ফেলার জন্যই। বিকিরণের কোষ-বিধ্বংসী ক্ষমতা জীবাণু (দ্র) ধ্বংসের কাজেও ব্যবহার করা হয়। অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজন এমন অনেক সামগ্রী পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত অর্থাৎ 'স্টেরিলাইজ' করতে বিকিরণের কোনো জুড়ি নেই। কোষের বিভাজনক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে বিকিরণ। অস্থিমজ্জা এর ফলে রক্তকোষ তৈরির ক্ষমতা হারাতে পারে। জননকেন্দ্রের ক্ষতি হলে প্রজননশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিকিরণের ফলে কোষের স্থায়ী পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটতে পারে। মিউটেশনের ফলে নানা রকম বিকলাঙ্গতা এবং ক্যান্সার সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

আমরা এখন আগের তুলনায় ক্রমেই বেশি তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মুখোমুখি হচ্ছি। এক দিকে শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় শক্তির ব্যবহার যেমন বাড়ছে, অন্য দিকে তেমন শক্তিধর দেশগুলির পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা এবং গবেষণাও বাড়ছে। ফলে প্রকৃতিতে বিকিরণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

সা. এ.

বিকিলা, আবেবে [১৯৩২—১৯৭৩]

বিশ্ববিখ্যাত ম্যারাথন (দ্র) দৌড়বিদ। ১৯৩২ সালের ৭ই

www.pathagar.com

আগস্ট বিকিলা (Abebe Bikila) ইথিওপিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট হেইলে সেলাসির (Haile Selassie) ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন।

১৯৬০ সালে যখন অলিম্পিক ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেবে বিকিলা ইথিওপিয়া দলের সদস্য হয়ে ইতালির রোমে গমন করেন, তখন তিনি ছিলেন একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু এই অপরিচিত, রুগ্ণ লোকটিই ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক জিতে তারকাখ্যাতি পান। খালি পায়ে দৌড়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করা সহজ কথা নয়।

১৯৬৪ সালের টোকিও (দ্র) অলিম্পিকের মাত্র এক মাস পূর্বে তিনি অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হলে অস্ত্রোপচার হয়। তার পরও আবেবে বিকিলা দ্বিতীয় বারের মতো ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক জয় করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। বিশ্বে তিনিই একমাত্র দৌড়বিদ, যিনি দু' বার অলিম্পিক ম্যারাথন দৌড়ে বিজয়ী হন।

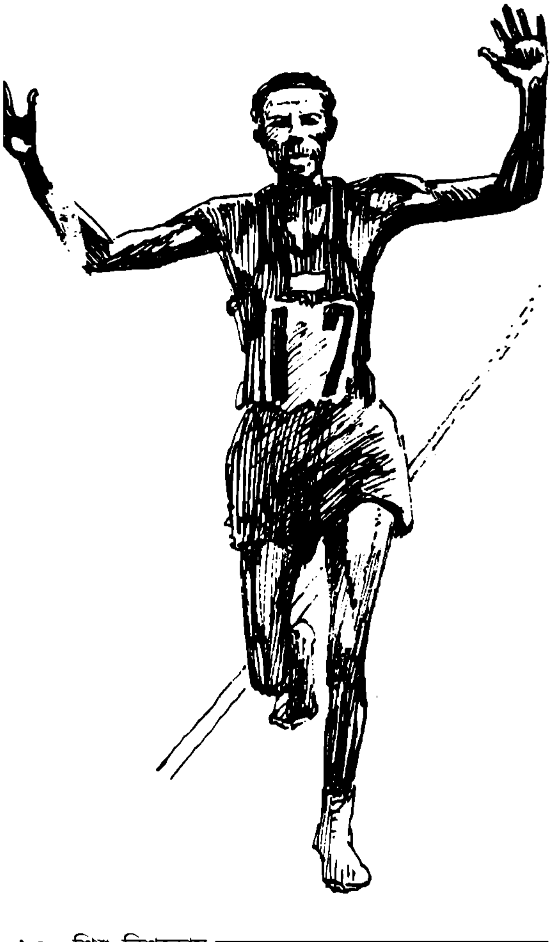

১৯৬৯ সালে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে আবেবে বিকিলার সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল খেলোয়াড়জীবনের দুঃখজনক সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭৩ সালের ২৫শে অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

টি. কি.

বিক্রমসংবৎ অব্দ দ্র

বিক্রমাদিত্য গুপ্তবংশ দ্র

বিগ্ ব্যাঙ তত্ত্ব (Big Bang theory)

এই মহাবিশ্বের (দ্র) সৃষ্টি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে বর্তমান মহাবিশ্বের সকল বস্তু এক সময় একটি বীজাকারে একত্রিত অবস্থায় ছিল। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বা দুই হাজার কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের (big bang) মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সূচনা। বিস্ফোরণের প্রথম তিন মিনিটে বিশ্বসৃষ্টির নানা উপাদান গঠিত হয় এবং তা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে বিস্ফোরণের সঙ্গে পরিচিত, বিগ্ ব্যাঙ-এর সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেখা বিস্ফোরণে বস্তুসমূহ ইতিপূর্বে বিদ্যমান স্থানে (space) ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিগ্ ব্যাঙ-এর সময় কোনো স্থান ছিল না। বরং বিস্ফোরণের ফলে বস্তুসমূহ ছড়িয়ে পড়ার কারণে স্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বসৃষ্টির এই আধুনিক তত্ত্বের সপক্ষে তিনটি জোরালো প্রমাণ রয়েছে। প্রথমত, এই মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিসমূহ পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অর্থাৎ মহাবিশ্ব ক্রমপ্রসারমাণ। এ থেকে বোঝা যায়, এক সময় এগুলো সব একত্রিত অবস্থায় ছিল।

দ্বিতীয়ত, বিগ্ ব্যাঙ-এর সময় মহাবিশ্বের উষ্ণতা ছিল অনেক—কয়েক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার ফলে বর্তমানে ঐ বিকিরণ (দ্র) কমে এসে প্রায় ২.৭ কেল্‌ভিন হবার কথা। ১৯৬৪ সালে দু'জন বেতারপ্রকৌশলী এই নেপথ্য বিকিরণ আবিষ্কার করেন। নেপথ্য বিকিরণের মান বিগ্ ব্যাঙ তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তৃতীয় প্রমাণটি হল বর্তমান মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন (দ্র) ও হিলিয়াম (দ্র) গ্যাসের (দ্র) পরিমাণ। এ দু'য়ের পরিমাণ (দ্র) বিগ্ ব্যাঙ তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মু. হা.

www.pathagar.com

বিজন ভট্টাচার্য [১৯১৫—১৯৭৮]

খ্যাতিমান নাট্য-সংগঠক, নাট্যকার ও অভিনেতা। ১৯১৫ সালের ১৭ই জুলই ফরিদপুরের খানখানাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে প্রথমে কলিকাতার (দ্র) আশুতোষ কলেজে ও পরে রিপন কলেজে পড়াশোনা করেন। এ সময় মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ (দ্র) আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বি. এ. পড়ার সময় রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ায় ছাত্রজীবনের ইতি ঘটে।

শিক্ষক পিতার কর্মসূত্রে বিজন ভট্টাচার্য শৈশবে বিভিন্ন স্থানে ঘোরার সুযোগ পান। সে সময় গ্রামের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা দিকের সঙ্গে পরিচিত হন। বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল তীব্র, যা তাঁর পরবর্তী জীবনের নাট্যচর্চায় একটি বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) শুরুতে বিজন ভট্টাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'অরণি' পত্রিকায় যোগ দেন এবং গল্প, আলোচনা, ফিচার ইত্যাদি লিখতে থাকেন। ১৯৪২ সালে সক্রিয় কর্মী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এ সময় তিনি 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' (দ্র) ফ্যাসীবিরোধ লেখক ও শিল্পীসজ্ঘ স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রগতি লেখক সজ্ঘ (দ্র) ও ভারতীয় গণনাট্য সজ্ঘ (আই পি টি এ) গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

বাংলা গান গাওয়া ও সুর আরোপ করার ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্যের একটি সহজাত ক্ষমতা ছিল। দুঃখ দুর্দশা হতাশা বেদনাসহ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে তিনি প্রকাশ করেছেন নানা পটভূমিকায় লেখা নাটকে। পঞ্চাশের মন্বন্তর (দ্র), ছেচল্লিশের দাঙ্গা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (দ্র), দেশবিভাগ ইত্যাদি ঘটনা তাঁর নাটকে উপজীব্য বিষয় হিসাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' গঠন করে তিনি ১৯৫০ সাল থেকে বিশ বছর ধরে কলিকাতায় নাটক লিখে, অভিনয় করে ও নির্দেশনা দিয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। এর আগে তিনি কিছুদিন বোম্বাইয়ের ফিল্মে অভিনয় ও স্ক্রিপ্ট্ লেখার কাজও করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হল 'নবান্ন', 'জীয়নকন্যা', 'দেবীগর্জন', 'কলঙ্ক', 'গোত্রান্তর', 'জননেতা' ইত্যাদি।

১৯৭০ সালে 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' ছেড়ে বিজন ভট্টাচার্য 'কবচকুণ্ডল' নামে একটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। তিনি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ইত্যাদি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।

নাট্যশিল্পে বিশেষ অবদানের জন্য বিজন ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য একাডেমি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি ১৯৭৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুজ. ব.

বিজয়-কাব্য

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়-কাব্য' একটি বিশেষ শ্রেণীর কাব্য। লৌকিক-অলৌকিক দিগ্বিজয় কাহিনীর মাধ্যমে নায়কের মাহাত্ম্য প্রচারই 'বিজয়-কাব্যে'র বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে 'বিজয়' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'প্রতিপক্ষের পরাজয়', এ ছাড়া আরেকটি অর্থ 'প্রাধান্য' বা 'শ্রেষ্ঠত্ব' এবং অন্য একটি অর্থ 'গমন' বা 'প্রস্থান'। বাংলা বিজয়-কাব্যে 'প্রাধান্য' বা 'শ্রেষ্ঠত্ব' এবং 'গমন' বা 'প্রস্থান' অর্থেই বিজয় শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। 'রসুল বিজয়', 'গাজী-বিজয়' কাব্য এর উদাহরণ। হিন্দু কবিরা বিজয়-কাব্যে দেব-দেবীর মহিমা প্রচার করলেও মুসলমান কবিগণ বিজয়-কাব্যগুলোর মাধ্যমে মূলত ইসলাম ধর্মের (দ্র) মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। মুসলমান কবিগণ তাঁদের কাব্যে ধর্মের সঙ্গে ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুসলমান কবিগণ তাঁদের কাব্যে ইতিহাসকে মূল্য দিয়েছেন। এর অন্যতম উদাহরণ 'গাজী-বিজয়' কাব্য। বাংলার খ্যাতনামা পীর ইসমাইল গাজীর কাহিনী এই কাব্যে প্রচারিত হয়েছে। আর শেখ ফয়জুল্লা তাঁর 'গোরক্ষ-বিজয়' কাব্যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথের কীর্তি প্রচার করে অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

মে. খা.

বিজয় গুপ্ত

বাংলার মধ্যযুগের (দ্র) কবি। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সনাতন ও

www.pathagar.com

মাতা রুক্মিণী। তিনি গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন।

বিজয় গুপ্ত মঙ্গলকাব্যের (দ্র) ধারার প্রাচীন কবিদের অন্যতম। মনসামঙ্গল (দ্র) কাব্যের আদি কবি হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি রয়েছে। তাঁর নিজের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে ১৪১৬ শকাব্দে বা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে হুসেন শাহ যখন গৌড়ের (দ্র) সুলতান, তখন তিনি তাঁর মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানি চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগের রচনা বলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এর বিশেষ মূল্য রয়েছে। কাব্যখানিকে তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনের নিখুঁত চিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়।

তিনি পদ্মপুরাণ কাব্যটি সম্ভবত ১৪৮৪—১৪৮৫ সালে রচনা করেন। এই কাব্যগ্রন্থটি পরে ১৮৯৬ সালে বরিশালে প্রথম ছাপা হয়।

বিজয় গুপ্তের সমগ্র রচনায় একটি বলিষ্ঠ বাস্তব জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন।

সুজ. ব.

বিজয় দিবস

১৬ই ডিসেম্বর দিনটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বিজয় দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৯৭১ সালের এই দিন বিকাল ৪টা ১৯ মিনিটের সময় তৎকালীন ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) পাকিস্তানের (দ্র) পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজী তাঁর ৯৩ হাজার পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্যসহ ভারতের পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেন।

আত্মসমর্পণ ছিল মূলত যৌথ বাহিনীর নিকট। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী একত্রে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, মুক্তিবাহিনী তথা সমস্ত বাঙালি যোদ্ধার অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী (দ্র)।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় জেনারেল ওসমানী ঢাকায় আসতে পারেন নি। তাঁর বদলে এসেছিলেন ডেপুটি চীফ অব স্টাফ এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকার।

১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান লে. জে. নিয়াজী। তাঁর পাশে ভারতের পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা

মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের উল্লাস

www.pathagar.com

তৎকালীন ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বিকাল ৪টায় পাকিস্তানের আত্মসমর্পণপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের নিয়মে এই দিনে পাকিস্তানের চূড়ান্ত পরাজয় হয়ে বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় ঘটে, তাই ১৬ই ডিসেম্বর 'বিজয় দিবস' হিসাবে চিহ্নিত।

র. হা.

বিজলি বাতি

বিদ্যুতের (দ্র) সাহায্যে যে বাতি জ্বালানো হয় তাকে বিজলি বাতি বলা হয়। টমাস আলভা এডিসন (দ্র) এই বিজলি বাতি আবিষ্কার করেন। সাধারণ মানুষ বিজলি বাতি বলতে ইলেক্ট্রিক বাল্‌ব্‌কেই বোঝে। ইলেক্ট্রিক বাল্‌ব্‌ দেখতে নাসপাতি ফলের মতো। দেশীয় পেয়ারার আকৃতির সঙ্গে ইলেক্ট্রিক বাল্‌বের খানিকটা মিল রয়েছে। ইলেক্ট্রিক বাল্‌ব্‌ নাসপাতির মতো দেখতে একটি বায়ুশূন্য কাচপাত্র। এই পাত্রটির গোড়ায় বা নিচের দিকে ধাতব সকেট লাগানো থাকে। এই সকেট বৈদ্যুতিক বা ইলেক্ট্রিক লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়। বাল্‌বের ভেতরে থাকে ধাতব তারের ফিলামেণ্ট। বৈদ্যুতিক বর্তনী বা সার্কিটে এই বাল্‌ব্‌কে সংযুক্ত করলে ফিলামেণ্ট উত্তপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করে। এই আলোই বৈদ্যুতিক আলো। বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্‌ ছাড়াও অনেক রকম বিজলি বাতি রয়েছে। টিউবে আর্গন (দ্র) বা নিয়ন (দ্র) গ্যাস (দ্র) পুরে এক ধরনের বিজলি বাতি তৈরি করা হয়। সাধারণভাবে একে বলা হয় টিউব লাইট। টিউব লাইট স্নিগ্ধ সাদাটে আলো বিকিরণ করে। এই টিউব লাইট ২ ফুট বা ৪ ফুট লম্বা হয়। টিউব লাইট জ্বালাতে স্টার্টারের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বাল্‌বের ভেতর সোডিয়াম বাষ্প পুরে তৈরি হয় সোডিয়াম লাইট। এর আলো হলদে। আরেকটি বিজলি বাতি হল মার্কারি বাল্‌ব্‌। এই বাল্‌বের ভেতরে থাকে পারদের বাষ্প। এ ছাড়া গাড়ির হেডলাইট ও ইণ্ডিকেটর লাইটও বিজলি বাতি। টর্চ লাইটকেও বিজলি বাতি বলা যেতে পারে।

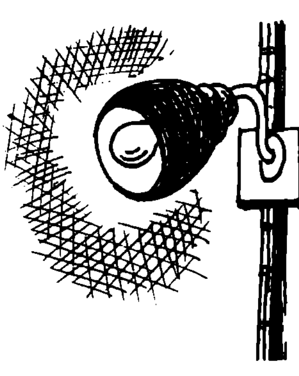

ব্যাটারি (দ্র)-তে উৎপন্ন বিদ্যুতের সাহায্যেও বিজলি বাতি জ্বলে। টর্চলাইট জ্বালানোর কাজে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়।

শা. ত.

বিজু বিউ / বিজু / বিঝু দ্র

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান। কোনো একটি বিষয়ে মানুষ যা জানতে পেরেছে এবং অনবরত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে, সেই বিশেষ ধরনের জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞান একটি যুক্তিসিদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত জ্ঞান। সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এই বিশেষ জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ একটি বিষয়ে যে ধারণা করা হয়, তা কতকগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ নীতির মাধ্যমে হাতে-কলমে যাচাই করে নিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জনের প্রয়াসকে বিজ্ঞান-কর্মকাণ্ড বলা হয়। মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে এই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন বোধ করেছে। মানুষের জীবনযাপনকে নিরাপদ, নির্বাধ ও স্বচ্ছন্দ করার জন্যই প্রথম দিকে মানুষকে প্রকৃতির নানা কর্মকাণ্ডকে জানতে হয়েছে। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মানুষ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছিল। বর্তমানে মানুষ প্রতিনিয়ত যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছে। মানুষের জীবনের অধিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হচ্ছে। অধুনা বিজ্ঞান বলতে কেবল 'বিশেষ জ্ঞান'-কে বোঝানো হয় না। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী মানুষের বিকাশধারায় বিজ্ঞান একটি সুস্থিত পদ্ধতি। আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী বিজ্ঞান হল এমন এক ধরনের পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষ তার পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা বিজ্ঞানের মৌলিক দর্শন ও চিন্তা-চেতনাকে প্রকাশ করে।

ত. চ.

বিজ্ঞান কল্পকথা

ইংরেজি সায়েন্স ফিকশন শব্দের বাংলা হিসাবে 'বিজ্ঞান কল্পকথা' বা কল্পবিজ্ঞান শব্দটি চালু হয়েছে। এর স্রষ্টা

www.pathagar.com

হলেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ. জি. ওয়েল্স্ (দ্র)। ১৮৯৮ সালে ওয়েল্স্ রচনা করেন তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লড্স্।

মননের জগতে সুকুমার সাহিত্যের মতো সায়েন্স ফিকশনেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞান (দ্র) মানুষেরই সৃষ্টি। বিজ্ঞানী তাঁর তত্ত্ব এবং উদ্ভাবনার তাৎপর্য যেখানে সব শ্রেণীর মানুষের মনে পৌঁছে দিতে পারেন, সেখানেই একজন বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনী লেখকের ভূমিকা অনবদ্যরূপে দেখা দেয়।

১৯৪০ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানলেখক আর্থার সি. ক্লার্ককে ব্রিটিশ সেনা বিভাগের রেডার (দ্র) সংক্রান্ত দফতরে কাজ করতে হয়। সে সময়ে বেতারসংযোগব্যবস্থা বিজ্ঞাননির্ভর কাহিনীর লেখক ক্লার্কের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি এক ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহের (দ্র) কথা চিন্তা করলেন তাঁর কল্পকাহিনীর মাধ্যমে। আর সেই বইটি প্রকাশ পাবার মাত্র দশ বছরের মধ্যে মানুষ মহাকাশে স্থাপন করে সত্যিকার কৃত্রিম উপগ্রহ। ১৯৪৫ সালে ক্লার্ক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : ১৯৮০-র দশকে মানুষ ভিন্ন গ্রহে অবতরণে সক্ষম হবে, ২০০০ সালের আগেই মহাশূন্যে উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভব হবে, কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি হবে ২০৬০ সালের মধ্যে, অমরত্বলাভ ঘটবে ২০৯০ সালে, আর চাঁদে নামার সম্ভাবনা ১৯৬৯ সালেই বেশি। শেষের ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রমাণিত হয়েছে। জুল্ ভের্ন (দ্র) রচিত 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' বইটির কল্পনাও পরে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে।

এ যাবৎ রচিত বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনীর মধ্যে তিনটি বিশেষ দিক রয়েছে। এক, মানুষ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন ধারণা আবিষ্কারের প্রয়াস পেল। তা এমন একটা ভবিষ্যৎ, যা গড়ে উঠবে সমসাময়িক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে। দুই, মানুষ নিজেকে একটি গোষ্ঠী অথবা জাতিভুক্ত হিসাবে ভুলতে শিখল। তিন, মানুষ প্রকৃতি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঘটনাবলিকে পাশ না কাটিয়ে তাদের অনুভব করার চেষ্টা করল। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গ্রহণও করল। পরবর্তী কালের রচনায় দেখা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে মানুষকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে।

ভবিষ্যতে মানুষের জীবন ও সমস্যা কি রকম হবে তা সমাধানেরই বা কি উপায় হবে তার আগাম আভাস দেওয়াও বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনীর লেখকের দায়িত্ব। তাই সায়েন্স

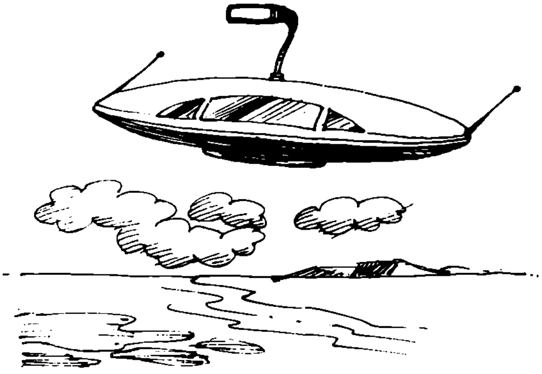

ফিকশন না বলে এ ধরনের রচনাকে এখন বলা হচ্ছে 'ফিউচারিস্টিক লিটারেচার'।

বিশিষ্ট লেখিকা জোয়ানা রাস বলেছেন, সায়েন্স ফিকশন অনেকটা মধ্যযুগীয় চিত্রকলার মতো। এ যেন চোখ দিয়ে দেখা নয়, বরং মানসিক অভিব্যক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াই বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনীর এক জন লেখক কত সহজেই না বৃহস্পতি গ্রহের (দ্র) বিবরণ দিতে পারেন, যে রকম মধ্যযুগের (দ্র) শিল্পী তাঁর তুলির টানে সৃষ্টি করেছিলেন স্বর্গের স্বরূপ। সায়েন্স ফিকশন সম্পর্কে এটাই হয়তো সর্বোত্তম মন্তব্য।

আ. কা.

বিজ্ঞান জাদুঘর

জাদুঘর হল এমন একটি ভবন বা বাড়ি যেখানে সাহিত্য (দ্র), বিজ্ঞান (দ্র), ইতিহাস, ভূতত্ত্ব (দ্র), নৃতত্ত্ব (দ্র) ও বিভিন্ন রকম শিল্পদ্রব্য সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। জাদুঘরের ঐতিহাসিক মূল্য ও মর্যাদা সুপ্রচুর। নানান রকম জাদুঘর রয়েছে। এদের মধ্যে বিজ্ঞান জাদুঘর অন্যতম এবং দর্শকদের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। বিজ্ঞান জাদুঘরে নানা সংগ্রহের সঙ্গে অনেক জীবজন্তুর কঙ্কাল ও জীবাশ্ম থাকে; এ ছাড়া উদ্ভিদের (দ্র) জীবাশ্মও থাকে। এসব কঙ্কাল ও জীবাশ্ম থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে এসব প্রাণী (দ্র) ও উদ্ভিদ কেমন ছিল এবং

www.pathagar.com

কীভাবে তাদের বিবর্তন ঘটেছে। এ ছাড়া বিজ্ঞান জাদুঘরে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতি ও সূত্রের প্রয়োগ প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। বিজ্ঞান জাদুঘর বিজ্ঞান-শিক্ষণের কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেক জাদুঘর স্কুল–কলেজকে বিজ্ঞান-শিক্ষণের উপকরণ ধার দিয়ে থাকে। কোনো কোনো জাদুঘরের সঙ্গে থাকে বিজ্ঞানপুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র, যা থেকে দর্শকগণ বিজ্ঞানের বইও কিনতে পারেন। এরকম একটি পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র লণ্ডনের সায়েন্স মিউজিয়ামের সঙ্গেই রয়েছে।

'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর' (দ্র) নামে বাংলাদেশে একটি বিজ্ঞান জাদুঘর আছে। এই জাদুঘরে প্রধানত দু'টি বিভাগ : জড়বিজ্ঞান গ্যালারি ও জীববিজ্ঞান গ্যালারি। এই জাদুঘরে দেশী-বিদেশী বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার প্রদর্শন ছাড়াও অনেক দেশজ প্রযুক্তি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাসভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে।

বিজ্ঞানক্লাবগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে বিজ্ঞান জাদুঘর। এটি অনেক সময় আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিজ্ঞানক্লাবের কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে। বিজ্ঞান জাদুঘরের অন্যতম উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস ও আবিষ্কারকে জনগণের সামনে তুলে ধরে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা।

শা. ত.

বিজ্ঞাপন

এর শব্দগত অর্থ—জানানো, বিদিতকরণ বা বিশেষভাবে জ্ঞাপন করা। কোনো কিছু সম্পর্কে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করার লক্ষ্য থেকেই আসলে বিজ্ঞাপনের প্রচলন বা ব্যবহার।

বর্তমান শতাব্দীকে বলা হয় বিজ্ঞাপনের যুগ। বিজ্ঞাপন এ যুগে অন্যতম কলাবিদ্যারূপে গণ্য। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের সহায়ক শক্তি হিসাবে বিজ্ঞাপনের সাহায্য জরুরি।

বিজ্ঞাপন অর্থাৎ advertisement-এর সঙ্গে propaganda-র ফারাক আছে। প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচারণার সঙ্গে অতিরঞ্জনের ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে মনগড়া বা অতিরঞ্জিত প্রচারের কোনো সম্পর্ক নেই। একটি দ্রব্যের যথাযথ গুণাগুণ উত্তম ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রচার করাই সৎ বিজ্ঞাপনের মূল লক্ষ্য।

বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের ইতিহাস দীর্ঘদিনের নয়। তবে বিজ্ঞাপনের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। যন্ত্রসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই এর ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি এবং বর্তমানে তা লাভ করেছে বহু বিচিত্র মাত্রা বা রূপ।

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সত্যিকার নবযুগের সূচনা হয় মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত (১৪৪০ খ্রি.) হবার পর থেকে। ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব (দ্র) শুরু হলে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের মাত্রা এত বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায় যে তার জন্য যেমন নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তেমনি এ কাজে প্রচারেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ব্যাপকভাবে। এ ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে ওঠে বিজ্ঞাপন এবং তার ছাপার প্রধানতম বাহনে পরিণত হয় সংবাদপত্র। আর বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞাপন প্রচারের বাহন অসংখ্য : রেডিও (দ্র), টেলিভিশন (দ্র), চলচ্চিত্র (দ্র), বিভিন্ন ভবনের দেয়াল, কাপড়ের ব্যানার, ফেস্টুন, সাময়িকীর পাতা, পোস্টার (দ্র), হোর্ডিং, ক্যালেণ্ডার, স্টিকার, ভিউকার্ড, পোস্টকার্ড, এনভেলপ, নিয়নসাইন বাতি, বেলুন, এমনকি ঘাসের (দ্র) চত্বরসহ পিচঢালা রাস্তার বুক পর্যন্ত।

বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারী সংস্থা এখন পৃথিবীর সব দেশেই একটি বিশেষ প্রভাবশালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদার অধিকারী। এখানে বিচিত্র পেশার লোকজনের কাজের সুযোগও বিদ্যমান। নির্বাহী বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা,

www.pathagar.com

জনসংযোগ কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষক, অঙ্কনশিল্পী, সাহিত্যিক, স্থিরচিত্রগ্রাহক, চলচ্চিত্র পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান, অনুবাদক, টেলিফোন অপারেটর, কম্পিউটার কম্পোজার, সঙ্গীতশিল্পী বা পরিচালক এবং মুদ্রণ বিষয়ক বিশেষজ্ঞের সমবায়েই পরিচালিত হয় একটি বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান।

আ. হু.

বিড়াল

গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে বিড়াল সবচেয়ে আদরণীয়। এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও স্বনির্ভর। বাঘের মাসি বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম *ফেলিস ডোমেস্টিকা (Felis domestica)*। জানা মতে, প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মানুষ বিড়াল পোষা শুরু করে।

বিড়াল স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র)। গড়ে ২৫-৩০ সেন্টিমিটার উঁচু ও তিন-সাত কেজি ওজনের হয়। শরীর লম্বা, মাথা গোলাকার। চোয়াল ছোট হলেও বেশ শক্তিশালী। দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর, অল্প আলোতে ভাল দেখে। শ্রবণশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ। ঘ্রাণশক্তিও তীক্ষ্ণ, নাক ছাড়াও মুখের ভিতরে ঘ্রাণ শনাক্ত করার একটি গ্রন্থি আছে।

এরা অত্যন্ত দক্ষ শিকারি। এর পায়ের নিচে নরম মাংসপিণ্ড থাকায় হাঁটার সময় কোনো শব্দ হয় না। সহজেই ইঁদুর (দ্র) শিকার করতে পারে। মাছ (দ্র)-মাংসসহ খাওয়ার উপযোগী সব কিছুই খায়।

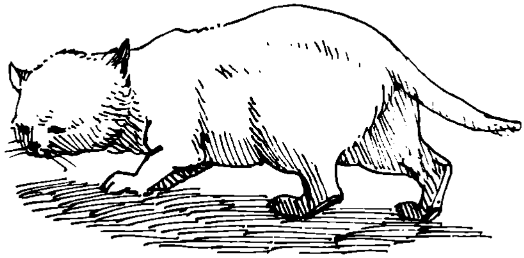

পৃথিবীতে নানা জাতের বিড়াল আছে। আকার, আকৃতি বর্ণে একেকটি একেক রকম। খাটো লোমওয়ালাগুলোর মধ্যে রেক্স, বার্মিজ, আবিসিনিয়ান, সায়ামিজ বিখ্যাত। লম্বা লোমওয়ালাগুলোর মধ্যে পার্সিয়ান, বালিনিজ, হিমালয়ান, টার্কিশ-অ্যাঙ্গেরা নাম-করা।

পুরুষ ও স্ত্রী-বিড়াল যথাক্রমে সাত–আট ও পাঁচ–নয় মাসে প্রজননক্ষম হয়। প্রায় নয় মাস গর্ভধারণের পর স্ত্রী-বিড়াল তিন–পাঁচটি অন্ধ ও কালা বাচ্চার জন্ম দেয়। প্রায় দশ–চোদ্দ দিন মায়ের দুধ পান করার পর চোখ-কান ফোটে। সাধারণত ১০–১৫ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

বিদায় হজ্ব

'বিদায় হজ্ব' বলতে মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর জীবনের শেষ হজ্বকে বোঝায়। হিজরির (দ্র) দশম বছরে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর জীবনের এই শেষ হজ্ব সম্পন্ন করেন। এ বছরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

বিদায় হজ্বের দিনে মহানবী (স.) আরাফাত (দ্র) প্রান্তরে সমবেত লক্ষাধিক মানুষের বিশাল জনসমুদ্রকে লক্ষ করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখে তিনি এই ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ করে তিনি বলেন :

"আজকের এই দিন এবং এই মাস যেমন সকলের নিকট পবিত্র, তোমাদের জীবন ও সম্পদও তেমনি তোমাদের পরস্পরের নিকট পবিত্র।

"তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও তাদের তেমনি অধিকার রয়েছে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।

"অন্যায় ও অবিচার থেকে নিজকে দূরে রাখবে, পাপ অতি ক্ষুদ্র হলেও তা থেকে সাবধান থাকবে।

"ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কিন্তু বলপূর্বক তোমার ধর্ম অন্য ধর্মের অনুসারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে না।

"সকল মুসলমান একে অন্যের ভাই। তোমাদের সকল মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে একটি অখণ্ড ভ্রাতৃসংঘ।

"তোমরা যা খাবে, যা পরবে, দাস-দাসীদেরও তাই খেতে দেবে, পরতে দেবে।

"একের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা চলবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।"

এমনি অনেক মূল্যবান কথা মহানবী (স.) বিদায় হজ্বের ভাষণে উচ্চারণ করেন।

মু. মা.

www.pathagar.com

বিদ্যাপতি [? —১৪৫৫]

বিদ্যাপতি পদাবলী (দ্র) সাহিত্যের সুবিখ্যাত কবি। চণ্ডীদাসের

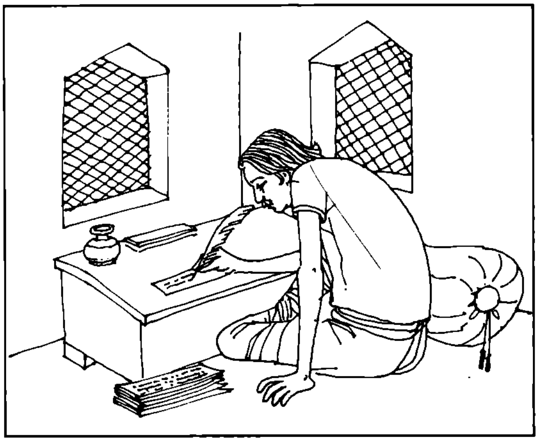

(দ্র) মতো তাঁর নামডাক। তাঁর কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু বিতর্ক আছে। অনুমান করা হয়, তিনি পনেরো শতকের আটের দশক থেকে (অর্থাৎ ১৩৮০-৯০ সালের কোনো এক সময় থেকে) পনেরো শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৪৬০-৭০ সালের কোনো এক সময় পর্যন্ত) জীবিত ছিলেন। এক পণ্ডিতের মতে, তাঁর জন্ম হয় ১৩৬০-৬৫ সালের মধ্যে, আর মৃত্যু হয় ১৪৫৫ সালে। তাঁর জন্মভূমি হল ত্রিহুত অর্থাৎ মিথিলা (দ্র)। এখানকার বিসফী গ্রামে তাঁর জন্ম। মিথিলা পশ্চিমবঙ্গের সীমানার কাছে বিহার প্রদেশের একটি ছোট রাজ্য। পনেরো/ষোল শতকে মিথিলা জ্ঞান ও সংস্কৃতির একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। মিথিলার রাজারাও সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষেরা মিথিলার পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। বড় হয়ে বিদ্যাপতি হন মিথিলার রাজসভার কবি। ভোগীশ্বর, গণেশ্বর, কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, বীরসিংহ, রুদ্রসিংহ প্রমুখ বহু রাজাকে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজসিংহাসনে দেখেছিলেন। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন বলেই এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। সব রাজার অনুগ্রহ ও আদর-যত্ন পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রতি রানীদেরও শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। বিভিন্ন রাজার আদেশে বিদ্যাপতি কীর্তিলতা, কীর্তি পতাকা, পুরুষ পরীক্ষা, গোরক্ষ বিজয়, ভূ-পরিক্রমা, শৈব সর্বস্বসার, গঙ্গা রাজ্যাবলী, বিভাগসার, দান বাক্যাবলী, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী, ব্যাড়ী ভক্তি তরঙ্গিণী ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। এত সব গ্রন্থ রচনা করলেও বিদ্যাপতির প্রধানকীর্তি পদাবলী রচনা। মিথিলার ভাষাকে বলা হয় মৈথিলী। এই ভাষায় বিদ্যাপতি অসংখ্য পদ রচনা করেন। মৈথিলী পরে বাংলা শব্দের মিশ্রণে 'ব্রজবুলি' (দ্র) নাম ধারণ করে। আগে থেকেই বাঙালি ছেলেরা মিথিলাতে পড়তে যেত। তাদের কেউ কেউ সেখান থেকে কবিতায় প্রশিক্ষণ নিয়ে আসত। তারাই মৈথিলীর সঙ্গে বাংলা শব্দ মিশিয়ে 'ব্রজবুলি' ভাষার জন্ম দেয় এবং এটি একটি কৃত্রিম ভাষারূপে গড়ে ওঠে। এই ভাষা কবিতা রচনার জন্য খুবই উপযোগী। সে জন্য বহু কবি এই ভাষায় পদ রচনা করেছেন। এ কালের রবীন্দ্রনাথও (দ্র) এই কৃত্রিম ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে।

বৈষ্ণবেরা ভক্তি তথা প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পেতে চান। বৈষ্ণব কবি পদাবলীতে ঈশ্বরকে পাওয়ার সাধনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন শিবের উপাসক। সুতরাং তাঁর পদে বৈষ্ণবভক্তি পাওয়া যাবে না। তবু বৈষ্ণবেরা তাঁকে আপন জন ভাবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের (দ্র) জীবনীগ্রন্থে জানা যায়, তিনি বিদ্যাপতির পদ শুনে খুব আনন্দ পেতেন। বৈষ্ণব সমাজে বিদ্যাপতির বেশ কদর। অবাঙালি হলেও বাংলার বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে বাঙালি কবিরূপেই মর্যাদা দিয়েছেন। সে জন্য মধ্যযুগের বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিদ্যাপতির নাম স্মরণীয়।

বিদ্যাপতি কত পদ রচনা করেছেন তা সঠিক জানা যায় না। কোনো পণ্ডিত বলেছেন, তিনি প্রায় এক হাজার পদ রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে বাংলা পদও আছে। মনে হয়, বাংলা পদগুলো অন্য কোনো কবির রচনা। কবিরঞ্জন বা ছোট বিদ্যাপতি নামে এক বাঙালি কবি আছেন। তাঁর কবিতাও প্রকৃত বিদ্যাপতির নামে চলতে পারে। বহু অখ্যাত কবিও বিদ্যাপতির নামে কবিতা রচনা করে থাকতে পারেন। পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি নামের মহিমা অবশ্যই আছে।

বিদ্যাপতি উঁচু মানের কবি ও শিল্পী। শব্দে ও ছন্দে তাঁর দক্ষতা খুবই প্রশংসনীয়। বেশ শিক্ষিত ও মার্জিত কবি তিনি। কবিতার ভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি অনেক যত্ন নিয়েছেন। খুব সুন্দর সুন্দর উপমা ও কাব্যালঙ্কার

www.pathagar.com

তৈরি করেছেন তিনি। আর চমৎকার করে এঁকেছেন কিশোরী রাধার চরিত্র। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধার চরিত্র ধর্মীয় মূল্য পেয়েছে। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না, সে জন্য তাঁর অঙ্কিত রাধার চরিত্রে ধর্মের তত্ত্ব নেই। বিদ্যাপতির রাধা পুরোপুরি মানবী।

বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। পদাবলী সাহিত্যের অমর কবি তিনি। তাঁর মতো কবিতা লিখতে চেয়েছেন আরো অনেকে। কিন্তু কেউ বিদ্যাপতি হতে পারেন নি।

আ. ক.

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্র

বিদ্যাসুন্দর

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য মধ্যযুগের শেষ দিকের রচনা। সচরাচর ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের (দ্র) প্রাচীন যুগ, ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ এবং ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত আধুনিক যুগ ধরা

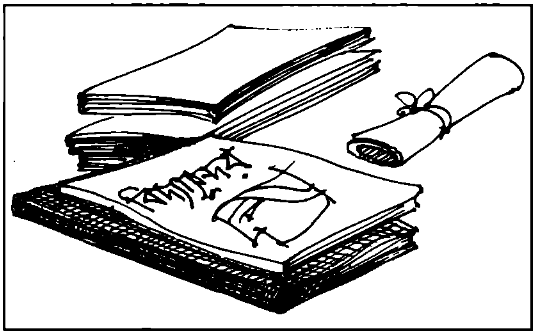

হয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সমস্ত কাব্য ছিল দেব-দেবীকে নিয়ে রচিত। বিদ্যাসুন্দর নর-নারীর প্রণয়কাহিনীমূলক কাব্য। এতে সুন্দর ও বিদ্যা নামক দুই মানব-মানবীর কাহিনী বর্ণিত। এই কাহিনী কাশ্মীরের বিহ্লন রচিত সংস্কৃত কাব্য 'চৌরপঞ্চাশিকা' (দ্র)-র অনুকরণে রচিত। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ। এ ছাড়া সাবিরিদ খাঁ, কবিকঙ্কণ রামপ্রসাদ সেন (দ্র) ও আরো অনেকে এই কাব্য রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র (দ্র) রায় গুণাকর (দ্র) রচিত বিদ্যাসুন্দর শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়েছিল।

বি. ব.

বিদ্যুৎ (electricity)

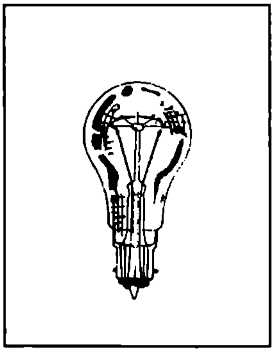

বৈদ্যুতিক চার্জ (দ্র) দ্বারা সঙ্ঘটিত বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে, তাকে ইলেকট্রিসিটি বা তড়িৎবিদ্যা বলা হয়। সাধারণভাবে ইলেকট্রিসিটি বলতে বিদ্যুৎকে বোঝায়। এই বিদ্যুৎ আবার দু'রকম—স্থিরবিদ্যুৎ ও চলবিদ্যুৎ। কোনো স্থানে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বা বৈদ্যুতিক চার্জ যদি ঐ স্থানেই স্থির বা আবদ্ধ থাকে তবে তাকে বলা হয় স্থিরবিদ্যুৎ আর উৎপন্ন বৈদ্যুতিক চার্জ বা বিদ্যুৎ যদি কোনো স্থানে স্থির না থেকে চলমান বা গতিশীল হয় তখন তাকে বলা হয় চলবিদ্যুৎ।

প্রাচীন গ্রিসে অ্যাম্বার (amber) অর্থাৎ তৈলস্ফটিক নামে এক ধরনের পাথর পাওয়া যেত। গ্রিক দার্শনিক থেলিস (Thales : খ্রি. পূ. ৬২৪–৫৬৫ অব্দ) সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষণ করেন যে অ্যাম্বারকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলে এগুলো ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করে। অ্যাম্বার-এর গ্রিক নাম ইলেক্ট্রন (electron) থেকে ইলেকট্রিসিটি বা তড়িৎ বা বিদ্যুৎ কথার উৎপত্তি।

পরবর্তী কালে ড. উইলিয়াম গিলবার্ট (William Gilbert : ১৫৪০–১৬০৩ খ্রি.) দেখতে পান যে অ্যাম্বার ছাড়াও অনেক পদার্থের মধ্যে এই গুণ আছে। যে কারণের প্রভাবে বস্তুতে এই গুণ জন্মায় তাকে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ বলা হয়। ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ বা ইলেক্ট্রনের (দ্র) প্রবাহকে বলা হয় ইলেক্ট্রিক কারেন্ট বা বিদ্যুৎপ্রবাহ। বিদ্যুৎপ্রবাহের একক হল অ্যাম্পেয়ার (দ্র)। আধুনিক সভ্যতা বহুলাংশে বিদ্যুতের কাছে ঋণী। আধুনিক সভ্যতার সর্বত্র রয়েছে বিদ্যুতের ব্যবহার। আলো জ্বালানো, পাখা ঘোরানো, টেলিভিশন (দ্র), ফ্রিজ, ভি সি আর (দ্র) ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র চালাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া কলকারখানা, গাড়ি, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতেও বিদ্যুতের ব্যবহার রয়েছে।

শা. ত.

www.pathagar.com

বিদ্যুৎকোষ / ব্যাটারি (battery)

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষুদ্রাকার যন্ত্র বা কৌশলবিশেষ। এটি একটি বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ডিভাইস যেখানে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। তড়িৎদ্রবের সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে সক্রিয় পদার্থগুলোর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। একাধিক তড়িৎকোষ এক সঙ্গে সংযুক্ত করে ব্যাটারি তৈরি করা হয়।

ব্যাটারি প্রাইমারি বা সেকেণ্ডারি তড়িৎকোষকে সমান্তরাল বা শ্রেণীবদ্ধভাবে সংযুক্ত করে তৈরি করা যায়। শ্রেণীবদ্ধভাবে (একটির পজিটিভ প্রান্ত অপরটির নেগেটিভ প্রান্ত) সংযুক্ত করলে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স (তড়িচ্চালক শক্তি) যথেষ্ট বেড়ে যায়। সমান্তরাল সংযোগের বেলায় (সব ক'টির পজিটিভ প্রান্ত একসঙ্গে এবং নেগেটিভ প্রান্ত এক-সঙ্গে) তড়িচ্চালক শক্তি একটি তড়িৎকোষের সমান হয়, কিন্তু তাদের ধারকত্ব বা সামর্থ্য বেড়ে যায়, অধিক সময় ধরে তড়িৎপ্রবাহ চলে।

গাড়ির ব্যাটারিতে (যাকে অ্যাকুমুলেটর বলা হয়) ২ ভোল্টের ছয়টি সেকেণ্ডারি সেল শ্রেণীবদ্ধভাবে সংযুক্ত থাকে, ফলে ১২ ভোল্ট তড়িচ্চালক শক্তি পাওয়া যায়। টর্চের ব্যাটারি ল্যকঁলাশে (Leclanché) সেলের শুষ্ক বা নির্জলা রূপ। প্রত্যেকটি ব্যাটারির তড়িচ্চালক শক্তি ১.৫ ভোল্ট্ (দ্র)। ব্যাটারির সামর্থ্য বা ধারকত্ব অ্যাম্পেয়ার (দ্র)-ঘণ্টায় নির্দেশ করা হয়। ব্যাটারি ব্যবহারের ফলে এর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো ব্যাটারি পুনরায় চার্জ করে কর্মক্ষম করা যায়।

এ ধরনের ব্যাটারি হল নিকেল-ক্যাডমিয়াম (nickel-cadmium) ব্যাটারি। নিকেল-ক্যাডমিয়াম ব্যাটারি বারংবার চার্জ করা যায় এবং বহুবার ব্যবহার করা যায়। টর্চ জ্বালাতে, মোটরগাড়ি (দ্র) ও নানান রকম খেলনা, রেডিও (দ্র), ক্যাসেট ও টেপ রেকর্ডার (দ্র), টেলিভিশন (দ্র), ভি সি আর (দ্র), ভি সি পি (দ্র) চালানো ইত্যাদি হরেক রকম কাজে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়।

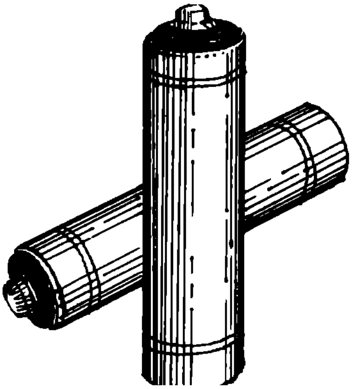

শা. ত.

বিদ্যুৎচুম্বক

বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে কাঁচা লোহার (দ্র) দণ্ডকে চুম্বকে (দ্র) পরিণত করা হলে তাকে বিদ্যুৎচুম্বক বলে। সাধারণত বিদ্যুৎচুম্বক বলতে বুঝি, যে চুম্বকে কাঁচা লোহার দণ্ডের উপর তার পেঁচানো থাকে। যখন তার দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হয়, তখন কাঁচা লোহাটি চুম্বকে পরিণত হয়। তার দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলে লোহাটি আর চুম্বক থাকে না। এ ধরনের বৈদ্যুতিক চুম্বককে অস্থায়ী চুম্বক বলে। লোহার পরিবর্তে ইস্পাত (দ্র) ব্যবহার করলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলেও ইস্পাত চুম্বকই থেকে যায়। এ ধরনের চুম্বককে বলা হয় স্থায়ী বিদ্যুৎচুম্বক। লোহার পেরেক বা সুঁইয়ের উপর অন্তরিত তামার (দ্র) তার পেঁচিয়ে তারের দুই প্রান্ত টর্চ-ব্যাটারির দুই প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করে সহজেই বিদ্যুৎচুম্বক তৈরি করতে পারা যায়। যতক্ষণ ব্যাটারির সঙ্গে তার সংযুক্ত থাকবে ততক্ষণ পেরেক বা সুঁই চুম্বক থাকবে; ব্যাটারির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিলে পেরেক বা সুঁই আর চুম্বক থাকবে না। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, সুইচ, টেলিফোন (দ্র), বৈদ্যুতিক জেনারেটর (দ্র), ধাতব পদার্থ উত্তোলনকারী ক্রেন, সলিনয়েড, লাউড স্পিকার এবং অন্যান্য বহু কাজে বিদ্যুৎচুম্বক ব্যবহৃত হয়।

শা. ত.

বিনয়কৃষ্ণ বসু [১৯০৮—১৯৩০]

বিপ্লবী ও শহীদ। ১৯০৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ঢাকার বিক্রমপুরের রাউথভোগ গ্রামে। পিতা রেবতীমোহন বসু ছিলেন এক জন দক্ষ শিকারি, মাতার নাম ক্ষীরোদবাসিনী দেবী।

বিনয়কৃষ্ণ খুব অল্প বয়সেই সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। নিজের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি. ভি.) বাহিনীর মেজর পদমর্যাদা লাভ করেন। ছাত্র হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী।

১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট বিনয়কৃষ্ণ যখন ঢাকা

www.pathagar.com

মিটফোর্ড স্কুলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র, তখন এই হাসপাতাল-প্রাঙ্গণেই তিনি অসামান্য সাহসিকতার সঙ্গে কেবল একটি রিভলবার দিয়ে বাংলার পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হডসনকে আক্রমণ করেন। তাঁর গুলিতে লোম্যান নিহত ও হডসন গুরুতরভাবে আহত হন।

বিনয়কৃষ্ণ কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সহকর্মীদের সহযোগিতায় নিরাপদে কলিকাতায় (দ্র) চলে যান এবং কিছুকাল আত্মগোপন করে কাটান।

কয়েক মাস পর ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসন ও চার্লস টেগার্টকে হত্যা পরিকল্পনায় দুই সহকর্মী দীনেশ গুপ্ত (দ্র) ও বাদল গুপ্তকে (দ্র) নিয়ে বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ এক আক্রমণ চালান। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অলিন্দে উভয় পক্ষের মধ্যে রীতিমত সম্মুখযুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'অলিন্দ যুদ্ধ' নামে পরিচিত। সিম্পসনসহ কয়েক জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তা এতে নিহত ও আহত হন। কিন্তু শেষ পর্যায়ে শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণের আগে বিনয়কৃষ্ণ নিজেই নিজের মাথায় গুলি ছুঁড়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এর পাঁচ দিন পর অর্থাৎ ১৩ই ডিসেম্বর হাসপাতালে তিনি মারা যান। বিনয়, বাদল ও দীনেশের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কলিকাতার লালদিঘির নাম বিনয়-বাদল-দীনেশবাগ (বি-বা-দী-বাগ) রাখা হয়েছে।

সুজ. ব.

বিনি শিবরাম চক্রবর্তী দ্র
বিবর্তনবাদ চার্ল্স্ ডার্উইন্ দ্র

বি বি সি

প্রথম মহাযুদ্ধে (দ্র) যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেতারের (দ্র) সফল ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ সালে লণ্ডনে (দ্র) ব্যক্তিগত মালিকানায় একটি বেতার কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানিটির নাম ছিল ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের অনুমোদনক্রমে তখন এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে হত কেবল সন্ধ্যার দিকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। ১৯২৩ সালে এটি পরিণত হয় একটি পাবলিক কোম্পানিতে এবং এর নাম দেওয়া হয় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (British Broadcasting Corporation)—সংক্ষেপে বি বি সি (B B C)। বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারে তাকে যে অধিকার দেওয়া হয়, সেটা একচেটিয়াভাবে বহাল থাকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত। তার পরের বছর থেকে ব্রিটেনে (দ্র) চালু হয় বাণিজ্যিক বেতার।

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বি বি সি'র বহির্দেশীয় কার্যক্রম সম্প্রচার শুরু হয়। তখন এর নাম ছিল এম্পায়ার সার্ভিস (Empire Service)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক এক জায়গা থেকে এর সম্প্রচারকাজ চালানো হত সে সময়। কিন্তু ব্রিটেন থেকে প্রথম বহির্দেশীয় অনুষ্ঠান প্রচারের কাজ শুরু হয় ১৯৩৮ সালের ৩রা জানুয়ারি থেকে। প্রথমে দু'টি বিদেশী ভাষায় বহির্দেশীয় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়—আরবি (দ্র) এবং পর্তুগিজ। এই উপমহাদেশের ভাষাগুলোর মধ্যে হিন্দি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় সবার আগে—১৯৪০ সালের ১১ই মে তারিখ থেকে। এরপর পর্যায়ক্রমে শুরু হয় তামিল, বাংলা (দ্র), গুজরাটি, মারাঠি, উর্দু (দ্র) এবং নেপালি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের কাজ।

বি বি সি'র ওয়ার্ল্ড সার্ভিস থেকে বর্তমানে ইংরেজিসহ মোট ৩৬টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রচারিত হয় ইংরেজি ভাষার অনুষ্ঠান—সপ্তাহে মোট ২০৩ ঘণ্টা। তারপরেই আরবির স্থান—সপ্তাহে ৬৩ ঘণ্টা। রুশ ভাষায় (দ্র) অনুষ্ঠান প্রচার-সময়সীমা ৪৬ ঘণ্টা। হিন্দি অনুষ্ঠানের দৈর্ঘ্য ১৪ ঘণ্টা। আর উর্দুর জন্য নির্দিষ্ট পৌনে নয় ঘণ্টা। সবচেয়ে কম সময় বরাদ্দ সিংহলি ভাষার জন্য—সপ্তাহে মাত্র ৫০ মিনিট। বি.বি.সি.'র সদর দফতর অবস্থিত লণ্ডনের WC2B 4PH-এর 'বুশ হাউস'-এ (স্ট্রাণ্ড)।

বি বি সি'র বাংলা বিভাগ চালু হয় ১৯৪১ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েলের (George Orwell) লিখিত একটি বার্তালিপি সম্প্রচারের মাধ্যমে। অরওয়েলের জন্ম ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশে, ১৯০৩ সালে।

এই বেতার সংস্থার স্নায়ুকেন্দ্র হচ্ছে এর বার্তাকক্ষ। এখান থেকে ৩৬টি ভাষার জন্য দিন-রাত সংবাদ বুলেটিন তৈরি হয়। এই কক্ষের সবচাইতে বড় বিবেচনা হচ্ছে প্রাপ্ত খবরের অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান, দ্রুততা এবং নির্ভুলতা। আর

www.pathagar.com

সে কারণেই বিশ্ব জুড়ে বি বি সি সম্প্রচারিত খবরের গুরুত্ব এত বেশি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) চলাকালীন নয় মাস বি বি সি'র খবর ছিল মুক্তিকামী প্রতিটি বাঙালির জীবনে উদ্দীপনাস্বরূপ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এই ঘটনা দু'টি থেকে : উত্তরবঙ্গের পাকশি উপজেলার একটি চায়ের দোকানে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সঙ্গোপনে ভিড় করে স্থানীয় লোকজন দিন-রাত এই বেতারকেন্দ্রের খবর শুনতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই দোকানকে কেন্দ্র করে অচিরেই একটি বাজার গড়ে ওঠে এবং তার নাম রাখা হয় 'বি বি সি'র বাজার। এখনো সেটি ঐ একই নামে পুরোমাত্রায় চালু আছে। পাক সেনাবাহিনীর দোসর আল-বদর (দ্র), আল-শাম্‌স্‌ (দ্র) বাহিনীর লোকজন ১৯৭১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বিবিসি'র ঢাকাস্থ সংবাদদাতা নিজামউদ্দিন আহমদকে তাঁর বাড়ি থেকে অজ্ঞাত স্থানে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তিনি আর ফিরে আসেন নি।

আ. হু.

বিবেকানন্দ, স্বামী [১৮৬৩—১৯০২]

প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। শৈশবে মায়ের কাছে হিন্দুধর্ম (দ্র) বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। পাশাপাশি সঙ্গীত ও ব্যায়াম চর্চা করেন।

যৌবনে দর্শনশাস্ত্র পড়ে আলোড়িত হন। এই সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসের (দ্র) সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। এই সভায় তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা ভারতের ধর্মমত ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্ব জুড়ে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি করে। এরপর তিনি ইউরোপ (দ্র) ও আমেরিকার (দ্র) বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারা প্রচারে মনোনিবেশ করেন। দেশে ফিরে বিবেকানন্দ দেশবাসীকে সচেতন করে তোলার ব্রত গ্রহণ করেন। স্বদেশপ্রেম, ভারতের অতীত গৌরব, কর্তব্য, ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে তিনি মানুষের চেতনায় নতুন ভাবধারার জন্ম দিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, শিক্ষাই সকল শক্তির উৎস। যে শিক্ষা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটাবে, ধর্মের চিরন্তন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে, নীচতা ও ক্ষুদ্রতাকে বিনষ্ট করবে প্রয়োজন সেই শিক্ষার। তিনি চাইতেন, ভারতবাসী আত্মবিশ্বাসে, সসম্মানে বিদেশীদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবার এক নতুন দিগন্ত রচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করেন।

১৮৯৯ সালে তিনি আবার ইউরোপে যান এবং তাঁর আদর্শ প্রচার করেন। দেশে-বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে সমাজসেবার নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ইত্যাদি। তাঁর বই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আ. ই.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯৪—১৯৫০]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের (দ্র) অন্যতম সেরা গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। 'পথের পাঁচালী' (দ্র) উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। এই উপন্যাস অপু নামক এক কল্পনাবিলাসী বালকের কাহিনী। যুবক অপুর কাহিনী পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস 'অপরাজিত'তে। অপুর ছেলের

www.pathagar.com

নাম কাজল। কাজলকে নিয়েও উপন্যাস লিখেছেন বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বলা হয়, অপু হচ্ছে বিভূতিভূষণ নিজেই। নিজের জীবনের কাহিনীকে উপন্যাসের আকারে ঐ দু'টি রচনায় বিভূতিভূষণ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বাংলার গ্রামজীবনের চিত্র ও প্রকৃতির শোভা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতিকে কবির দৃষ্টিতে না দেখলে এত সুন্দর বর্ণনা করা যায় না। বিভূতিভূষণের বর্ণনার গুণে আমাদের নিত্য দেখা ঘাস (দ্র), লতা, গুল্ম, বুনো ফুল ও ফল, পোকা-মাকড়, পাখি (দ্র), পুকুর, নদী (দ্র), মাঠ,রোদ-বৃষ্টি-ঝড় ও চাঁদের আলো রূপকথার মতো স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণও করেছেন অনেক। বিশেষ করে বনেজঙ্গলে ভ্রমণে তিনি আনন্দ পেতেন খুব। তাঁর কয়েকটি ভ্রমণকাহিনীতেও প্রকৃতি ও অরণ্যের চমৎকার বর্ণনা আছে।

বাংলা সাহিত্যের এই বিখ্যাত লেখকের জন্ম হয় ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ (২৮শে ভাদ্র ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে)। জন্মস্থান মামার বাড়ি, কাঁচড়াপাড়ার কাছে মুরাতিহর গ্রাম। বিভূতিভূষণের পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বনগ্রাম মহকুমার বারাকপুর গ্রামে। এই এলাকা আগে বাংলাদেশের (দ্র) যশোর জেলার ভিতরে ছিল। বারাকপুর গ্রামের পাশ দিয়ে ইছামতী নদী প্রবাহিত। ইছামতী নদীর নামেই বিভূতিভূষণ 'ইছামতী' উপন্যাসটি লেখেন। বিভূতিভূষণের পিতা ও মাতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃণালিনী দেবী। মহানন্দ বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে গল্পকথা বলে মানুষকে খুশি করতেন এবং বিনিময়ে যা পেতেন তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাতেন। সংসার মোটেই সচ্ছল ছিল না। এক প্রকার দরিদ্রের সংসার। মহানন্দ ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতার এই স্বভাববৈশিষ্ট্য বিভূতিভূষণও পেয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ তাঁর পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর আরো চার ভাই-বোন ছিল।

বিভূতিভূষণ যখন অষ্টম শ্রেণীতে তখন তাঁর পিতা মারা যান। ফলে সংসার চালাতে খুব অসুবিধা হত। ১৯১৪ সালে বনগ্রাম হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর কলিকাতার (দ্র) রিপন কলেজ থেকে তিনি ১৯১৬ সালে আই. এ. এবং ১৯১৮ সালে বি. এ. পাশ করেন। তিনি কিছু দিন আইনও পড়েছিলেন। পরে সাংসারিক দায়িত্ব এসে পড়াতে পড়াশোনায় ক্ষান্ত দিয়ে চাকুরির সন্ধান করেন। তিনি কর্মজীবনের শুরুতে বেশ কয়েক বছর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে 'গোরক্ষণী সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি নেন। এই চাকুরিতে কাজ ছিল গবাদি পশুকে না মেরে রক্ষা করার জন্য প্রচার চালানো। প্রচারের জন্য বিভূতিভূষণ আসাম, বার্মা (দ্র) প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করেন। এর পরে তাঁর চাকুরি হয় এক জমিদারি এস্টেটে। তিনি এখানে গৃহশিক্ষক ও সেক্রেটারির কাজ করেন। বিহারের ভাগলপুরে এ জমিদারির কিছু তালুক ছিল। বিভূতিভূষণ সে জায়গাতেও কাজ করেন এবং তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' এখানে বসেই লিখেছিলেন।

বিভূতিভূষণ বিয়ে করেন তরুণ বয়সে, ছাত্রাবস্থায়। তাঁর পত্নীর নাম গৌরী। কিন্তু বিয়ের এক বছর পরে দুর্ভাগ্যক্রমে গৌরীর মৃত্যু হয়। পত্নীর শোকে বিভূতিভূষণ পাগলের মতো হয়ে যান। পরে পত্নীর স্মৃতিতে বিহারের ঘাটশিলাতে তিনি একটি বাড়ি কেনেন এবং বাড়িটির নাম দেন 'গৌরীকুঞ্জ'। বহু বৎসর পরে ১৯৪০ সালে বিভূতিভূষণ আবার বিয়ে করেন। দ্বিতীয় পত্নীর নাম রমা। বিভূতিভূষণ ও রমার একটি মাত্র সন্তান তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাদাসও যে এক জন লেখক সেকথা আগে বলা হয়েছে।

চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে বিভূতিভূষণ বারাকপুরে ফিরে আসেন এবং বেশি করে সাহিত্যচর্চায় মন দেন। তিনি অনেক বই লেখেন এ সময়। বারাকপুরেই বিভূতিভূষণ ১লা নভেম্বর ১৯৫০ সালে (১৫ই কার্তিক ১৩৫৭ ব.) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাপ্পান্ন বছর।

বিভূতিভূষণ সারা জীবন প্রচুর লিখেছেন। লিখেছেন অসংখ্য উপন্যাস, গল্প ও ভ্রমণবৃত্তান্ত। তাঁর বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে : উপন্যাস–'পথের পাঁচালী'(১৯২৯), 'অপরাজিত' (১৯৩২), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৯), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪১), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'অনুবর্তন' (১৯৪২),'দেবযান' (১৯৪৪), 'ইছামতী' (১৯৫০), 'অশনি সংকেত' ইত্যাদি; গল্প—'মেঘমল্লার' (১৯৩২), 'মৌরী ফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪),' জন্ম ও মৃত্যু' (১৯৩৮), 'কিন্নরদল'

www.pathagar.com

(১৯৩৮), 'উপলখণ্ড' (১৯৩৫), 'মুখ ও মুখশ্রী' (১৯৪৭), 'কুশল পাহাড়ী' (১৯৫০) ইত্যাদি; ভ্রমণকাহিনী – 'অভিযাত্রিক' (১৯৪২),'স্মৃতির রেখা' (১৯৪২), 'তৃণাঙ্কুর' (১৯৪২), 'ঊর্মিমুখর' (১৯৪৪), 'বনে বাদাড়ে' (১৯৪৫), 'হে অরণ্য কথা কও' (১৯৪৮)।

শিশু-কিশোরদের জন্যও বিভূতিভূষণ অনেক বই লিখেছেন। যেমন—'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৮), 'মরণের ডঙ্কা বাজে' (১৯৫০), 'হীরা মানিক জ্বলে' (১৯৪৬)।

বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায় (দ্র) বিভূতিভূষণের খুব অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিয়ে তাঁর সিনেমাজীবন শুরু করেন। এই সিনেমার জন্য সত্যজিৎ পৃথিবীর নানা দেশ থেকে পুরস্কার পান এবং অসামান্য খ্যাতি লাভ করেন। সত্যজিৎ বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাস অবলম্বনে 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' সিনেমা দু'টি নির্মাণ করেন এবং 'অশনি সংকেত' উপন্যাসেরও চিত্ররূপ দেন। এই সিনেমাগুলোর জন্যও সত্যজিৎ বাইরের দেশ থেকে পুরস্কার ও প্রশংসা পান।

আ. ক.

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্

বাংলাদেশের (দ্র) পতাকাবাহী একমাত্র অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বেসামরিক যাত্রীবাহী বিমানসংস্থা। পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এই সংস্থা একটি কর্পোরেশনরূপে গঠিত। ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

বিমানের বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

১৯৭২ সালে ৪ঠা জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থার গোড়াপত্তন করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই সাবেক 'পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স্' (পিআইএ)-এর নামেমাত্র স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের হাতেগোনা কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সুযোগ-সুবিধা সম্বল করে এর যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য, তৎকালীন পিআইএ-র বহু বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁদের অনেকেই শহীদ হন।

উপহার হিসাবে পাওয়া একটি সেকেলে ডিসি-৩ উড়োজাহাজ দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলেও, সূচনায় এর কার্যক্রম অভ্যন্তরীণ বেসামরিক যাত্রী পরিবহণের মধ্যেই সীমিত ছিল। এর অনতিকাল পরে একটি এফ-২৭ ও একটি ভাড়া করা বোয়িং-৭০৭ উড়োজাহাজের সাহায্যে বিমান তার ঢাকা-লণ্ডন ফ্লাইট চালু করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সালে তিনটি ডিসি-১০-৩০ সংগ্রহ করার মাধ্যমে বিমানের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে সংস্থাটি ৫টি ডিসি-১০-৩০, ২টি এফ-২৮ ও ২টি ব্রিটিশ অ্যারোস্পেসের একটি বহরের অধিকারী।

বিমান বিশ্বের মোট ৩০টিরও বেশি দেশে যাতায়াত করে এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে ১০ লক্ষেরও বেশি বেসামরিক যাত্রী বহন করে থাকে। এর আন্তর্জাতিক রুটের সংখ্যা ২৭টি এবং অভ্যন্তরীণ রুটের সংখ্যা ৭টি। যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের সংখ্যা ১১টি।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স্-এর স্লোগান হচ্ছে

www.pathagar.com

'আকাশে শান্তির নীড়'। এর লোগো বা প্রতীক-চিহ্ন হচ্ছে সূর্যের বুকে উড়ন্ত সাদা সারস। এর বৈমানিক, বিমানবালা ওপ্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৫ হাজার ২শ' ৯০ জন।

এই সংস্থার তরফ থেকে দু'টি সুদৃশ্য সাময়িকী প্রকাশিত হয়ে থাকে। একটির নাম 'দিগন্ত', অন্যটির নাম 'বলাকা'। দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সার্ক (দ্র) দেশসমূহ ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সে জন্য বিমান তাদের জন্য রেয়াতী ভাড়ার ব্যবস্থাও করে থাকে।

আ. হু.

বিম্বিসার

মগধের রাজা। কথিত আছে, তিনি ১৬ বছর বয়সে রাজা হন, ২৯ বছর বয়সে বুদ্ধদেবের (দ্র) উপাসক হন, ৩৬ বছরকাল নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের (দ্র) সহায়তা করে ৬৫ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন। মতান্তরে তিনি বুদ্ধের সমবয়সী। বুদ্ধত্ব লাভ করার দ্বিতীয় বছরে বুদ্ধ যখন মগধরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন রাজা বিম্বিসার তাঁকে যথোচিত সংবর্ধনা দেন। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের নবলব্ধ ধর্ম শ্রবণের জন্য প্রার্থনা করলে বুদ্ধ রাজাকে দান (দ্র), শীল (দ্র) ইত্যাদি সম্পর্কে সরলভাবে শিক্ষা দেন, তারপর বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন। বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ তাঁর ধর্মের নানাবিধ নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করেন। রাজা বিম্বিসারের নির্দেশে বিখ্যাত বৈদ্য জীবক বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হন। রাজা বুদ্ধকে বেণুবন বিহার দান করেন। বিম্বিসারের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ত্বরান্বিত হয়।

বিম্বিসারের রাজধানী ছিল রাজগৃহে। রাজগৃহের বর্তমান নাম রাজগীর। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে তাঁর রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদের সীমানা, বেণুবন বিহার, জীবকের আম্রকানন, পুত্র অজাতশত্রু তাঁকে যে কারাগারে বন্দি করেছিলেন সেই কারাগার ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের বয়স যখন ৭২ বছর তখন রাজা বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন এবং মারা যান। রাজা বিম্বিসার দানশীলরূপে খ্যাত ছিলেন।

বি. ব.

বিয়োগ

যোগের বিপরীত প্রক্রিয়াই বিয়োগ। বিয়োগ হচ্ছে কোনো বস্তু বা সংখ্যা থেকে ঐ বস্তু বা সংখ্যার অংশবিশেষ পৃথক করার বা বাদ দেওয়ার গাণিতিক নিয়ম। যোগপ্রক্রিয়ায় কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ একত্রে মিলে একটি বড় সমগ্র তৈরি হয় আর বিয়োগপ্রক্রিয়ায় সমগ্র থেকে অংশ বিযুক্ত বা বিয়োগ করা বা বাদ দেওয়া হয়। কোনো সমগ্র বা সংখ্যার একটি অংশ জানা থাকলে অপর অজানা অংশটি বের করার জন্য বিয়োগপ্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। সাধারণত কোনো দু'টি বস্তু বা দু'টি সংখ্যার মধ্যে তুলনা বা পার্থক্য নির্ণয় করতে বিয়োগপ্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন—দু'টি টেবিলের মধ্যে কোন্ টেবিলের দৈর্ঘ্য বেশি এবং কত বেশি এরূপ প্রশ্নের জবাব বের করতে বিয়োগপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এবার দেখা যাক, গাণিতিক প্রক্রিয়ায় বিয়োগ কীভাবে করা যায়। যেমন—৩০টি পেন্সিল থেকে ৭টি পেন্সিল বাদ দিলে আর ক'টি থাকবে ? এটি গণিতের নিয়মে লেখা যায় এইভাবে : ৩০—৭ = ২৩টি। এখানে ৩০ বিয়োজক, ৭ বিয়োজ্য, ২৩ বিয়োগফল এবং '—' চিহ্নটি বিয়োগের চিহ্ন। সাধারণত বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করতে হয়। তবে ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগের যদি প্রয়োজন হয়, তখন ছোট সংখ্যাটিকে বড় হিসাবে পরিণত করতে হয়। কোনো সংখ্যা থেকে যদি একই সংখ্যা বারে বারে বিয়োগ করতে হয় তখন বিয়োগের দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য ভাগ (দ্র)-প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

হো. আ.

বিরল গ্যাস গ্যাস, নিষ্ক্রিয় দ্র

বিলাল (রা.), হযরত [? — ৬৪১]

হযরত বিলাল (রা.) প্রথম জীবনে এক জন কৃষ্ণাঙ্গ (হাবশি) ক্রীতদাস ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম (দ্র) গ্রহণ করেন এবং ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

জানা যায়, মক্কার জুমাহ্ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন বিলাল। রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র) মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করলে বিলাল (রা.) তাতে আকৃষ্ট হন এবং গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এ কথা ফাঁস হয়ে গেলে তাঁর ওপর নেমে আসে নির্যাতন। পরে হযরত আবু

www.pathagar.com

বকর সিদ্দিক (রা.) (দ্র) তাঁকে তাঁর মনিবের নিকট থেকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

হযরত বিলাল (রা.) বহু যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (স.)-র সঙ্গী হন এবং যুদ্ধ করেন। বদরের যুদ্ধে (দ্র) তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর কাবা (দ্র) ঘরের ছাদ থেকে আযান দেওয়ার দায়িত্ব পান তিনি। তাঁর আযানের কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

৬৪১ খ্রিস্টাব্দে হযরত বিলাল (রা.) ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

বিশ্বকোষ (encyclopaedia)

এনসাইক্লোপিডিয়ার বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে বিশ্বকোষ। বাংলায় বিশ্বকোষ তুলনামূলকভাবে একটি নতুন শব্দ। ইংরেজি এনসাইক্লোপিডিয়া শব্দটি এসেছে দু'টি গ্রিক শব্দ থেকে : 'এন্‌কাইক্লিওস' অর্থ হল সাধারণ অথবা বৃত্তাকার, আর 'পিডিয়া' অর্থ হল শিক্ষা অথবা জ্ঞান। অর্থাৎ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া শব্দ দ্বারা জ্ঞানের পূর্ণ বৃত্ত বোঝানো

হচ্ছে, যার মধ্যে স্থান পাবে কাব্য (দ্র), সঙ্গীত (দ্র), দর্শন, গণিত (দ্র), বিজ্ঞান (দ্র), ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা (দ্র), শরীরচর্চাসহ সব কিছু। বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত করে পরিবেশন করার চাহিদা থেকেই বিশ্বকোষের ধারণার জন্ম।

ইংরেজি ভাষায় অন্যতম বিখ্যাত বিশ্বকোষ হল 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭১ সালে। তারপর এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, বহু নতুন ভুক্তি এতে যোগ করা হয়েছে এবং আকারে তা অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে 'ব্রিটানিকা জুনিয়র' নামে একটি শিশু-বিশ্বকোষ প্রণয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়, কিন্তু ১৯৩৪ সালের আগে তা বাস্তবায়ন করা যায় নি। পরে ১৯৬৩ সালে 'ব্রিটানিকা জুনিয়র এনসাইক্লোপিডিয়া' এই পরিবর্তিত নামে তা প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ হল রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব সঙ্কলিত 'ভারতকোষ'। এটি প্রকাশিত হয় তিন খণ্ডে, ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে। ১৯০২ সাল থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' নামে যে বিশ্বকোষের কাজ শুরু হয় তা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সতেরো হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিশ্বকোষটি বাইশ খণ্ডে সঙ্কলিত হয়ে ১৯১১ সালে এর প্রকাশনা সম্পন্ন হয়। বাংলা ভাষায় খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের সম্পাদনায় ৪ খণ্ডে একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৯৭২ সালে, 'বাংলা বিশ্বকোষ' নামে।

শিশুদের জন্য বাংলা ভাষায় যেসব বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হল যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'শিশু-ভারতী'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। পরে দশ খণ্ডে প্রকাশিত 'শিশু-ভারতী'-তে ১৯৬৩ সালে আরো একটি সংযোজনী খণ্ড যুক্ত হয়। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (দ্র) থেকে 'জ্ঞানের কথা' নামে বিশ্বকোষের একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী একটি বড় আকারের শিশু-বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এটি প্রকাশিত হলে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হবে বলে আশা করা যায়। এই বইটি তারই অন্তর্গত।

ক. চৌ.

বিশ্বভারতী

'বিশ্বভারতী' রবীন্দ্রনাথের (দ্র) তৈরি একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। কিন্তু এর পরিচয় ও ইতিহাস একটু জটিল। প্রথমেই স্পষ্ট হওয়া দরকার যে শান্তিনিকেতন (দ্র) ও বিশ্বভারতী সমার্থক নয়, ভিন্ন ব্যাপার। শান্তিনিকেতন হল একটি জায়গার নাম, যেখানে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

www.pathagar.com

শ্যামলীর দরজায় রবীন্দ্রনাথ

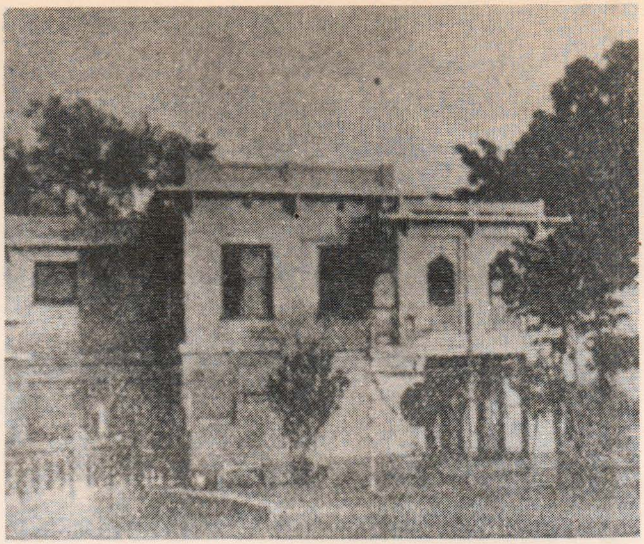

রবীন্দ্রনাথের আমলে উদীচী ভবন

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি গ্রাম বোলপুর, এখন সে গ্রাম অবশ্য মফস্বল শহর। এর অদূরে ভুবনডাঙা গ্রাম। এরই সংলগ্ন প্রান্তর কিনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পিতা 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) নিভৃতে উপাসনা করার জন্য 'শান্তিনিকেতন' বাড়ি তৈরি করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, শুধু ব্রাহ্মধর্মের (দ্র) অনুসারীরাই নন, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তি নিরাকার স্রষ্টার আরাধনা ঐ 'শান্তিনিকেতন' উপাসনালয়ে করতে পারবেন। মহর্ষি আরো ঠিক করেছিলেন যে ওখানে বছরে এক বার ধর্মমেলা হবে এবং অতিথিসৎকারের নিয়মিত ব্যবস্থা ছাড়াও সেখানে থাকবে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় ও একটি পাঠাগার।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার ঐ সম্পত্তি কেনার ৩৭ বছর পরে মহর্ষির অনুমতি নিয়ে ১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে। ছাত্রসংখ্যা পাঁচ-ছ' জনের মতো। আর শিক্ষকও রবীন্দ্রনাথসহ জনা পাঁচেক। শিক্ষাদান সম্পর্কে ব্যাপারটি ছিল কবি ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের এক নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম ২০ বছর সার্থকভাবে চালু থাকার পর ১৯২১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এর নাম পাল্টে 'বিশ্বভারতী' রাখা হয়। ঐ দিন সকালবেলায় শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সভাপতি হয়েছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। ঘটনাটি শুধু একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের অনুষ্ঠান ছিল না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাবে যেমন প্রতিষ্ঠান তেমন এক বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠালগ্ন ছিল ঐ দিন। তিনি চেয়েছিলেন যে 'বিশ্বভারতী' হবে এমন একটি জায়গা, যেখানে সারা বিশ্বের গুণীজনেরা এসে সম্মিলিত হবেন, ভাবনার আদানপ্রদান ঘটবে, মহামানবের মিলনতীর্থ হবে ঐ জায়গা। লেখাপড়ার ডিগ্রি দেওয়া সেখানে মুখ্য কাজ হবে না, ঐ প্রতিষ্ঠান প্রকৃত 'মানুষ' হওয়ার বিদ্যায় 'শিক্ষিত' করবে ছাত্র-ছাত্রীদের। শিক্ষায়তন হিসাবে বিশ্বভারতীর ডিগ্রির কোনো দাম ছিল না চাকুরির ক্ষেত্রে। তবু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে নানা ধর্মের ও নানান ভাষাভাষী ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়তে যেত এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতজনেরাও একের পর এক এসেছেন সেখানে বিশ্বকবির আমন্ত্রণে পড়াতে ও গবেষণা করতে।

বর্তমানে বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের একটি সরকার-স্বীকৃত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ, নাম বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বা Visvabharati University; পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হলেও এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের উপর ন্যস্ত নেই, তা বহন করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ দিক দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছে।

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয়ভাবে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অধিগ্রহণ ও একে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি দানের

www.pathagar.com

পশ্চাতে মহাত্মা গান্ধী (দ্র) ও জওহরলাল নেহরুর (দ্র) প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল।

হা. মা.

বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয়

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সংঘটিত যুদ্ধকে 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাও ইউরোপ থেকে; ক্রমে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তি (দ্র)। এই চুক্তির শর্তগুলো ছিল খুবই একপেশে ও প্রতিহিংসামূলক। এর ফলে পরাজিত দেশগুলোর মনে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে ইউরোপ (দ্র)-আমেরিকার (দ্র) অর্থনৈতিক মন্দাও কারণ হিসাবে যুক্ত হয়।

হিটলার (দ্র) ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধস্পৃহার সঙ্গে জার্মানির রাজনৈতিক উচ্চাশাও বৃদ্ধি পায়। বিশুদ্ধ আর্যরক্তসম্পন্ন জার্মান জাতি বিশ্বে শ্রেষ্ঠ—তাঁর এই প্রচার জার্মানদের অভিভূত করে। এ ছাড়াও তাদের ছিল প্রচণ্ড ইহুদি-বিদ্বেষ। সব মিলিয়ে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। কূট-কৌশলে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের পর ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার হঠাৎ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে বসেন। এর দু'দিন পর জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন (দ্র) ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে বিশ্বের বড় ও শক্তিশালী দেশগুলো ক্রমশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত জার্মানি ও তার সহযোগীদের বলা হত অ্যাক্সিস পাওয়ার্স (Axis Powers) বা অক্ষশক্তি। এর বিরোধী পক্ষের নাম অ্যালিজ (Allies) বা মিত্রশক্তি। অক্ষশক্তির দেশগুলো ছিল জার্মানি, ইতালি, জাপান (দ্র), রোমানিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি। আর মিত্রশক্তির দেশগুলো ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র), হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদি।

যুদ্ধের শুরুতে হিটলারবাহিনীর প্রাথমিক বিজয় সত্ত্বেও ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ তাদের সর্বনাশের সূচনা করে। ক্রমে জার্মান বাহিনী পিছু হটতে থাকে। এক

২য় মহাযুদ্ধের সময় আণবিক বোমায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হিরোশিমা

www.pathagar.com

এক করে মুক্ত হয় যুগোস্লাভিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো।

১৯৪৫ সালের প্রথমভাগে মিত্রশক্তির সৈন্যরা চারদিক থেকে জার্মানিকে ঘিরে ফেলে। ৩০শে এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করেন। এর চারদিন পর জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। এতে ইউরোপের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলেও এশিয়ায় জাপান আত্মসমর্পণ বা সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। হিরোশিমা (দ্র) ও নাগাসাকি (দ্র) শহরে ৬ই ও ৯ই আগস্ট পরমাণু-বোমা (দ্র) নিক্ষিপ্ত হবার পর জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এরপর সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল ব্যাপক ও প্রচণ্ড।

সুজ. ব.

বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম

১৯১৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধ। ইউরোপ (দ্র)-সহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিধর দেশগুলো এই যুদ্ধে জড়িত ছিল বলে একে বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মানি, তুরস্ক (দ্র) ও বুলগেরিয়া এবং অপর পক্ষে ছিল সার্বিয়া, রাশিয়া (দ্র), ফ্রান্স, ব্রিটেন (দ্র), জাপান (দ্র), ইতালি ও আমেরিকা (দ্র)। প্রথম পক্ষকে বলা হত কেন্দ্রীয় শক্তি বা সেন্ট্রাল পাওয়ার্স (Central Powers) এবং দ্বিতীয় পক্ষকে মিত্রশক্তি বা অ্যালাইড পাওয়ার্স (Allied Powers)।

১৯১৪ সালের ২৮শে জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রান্‌ৎস্‌

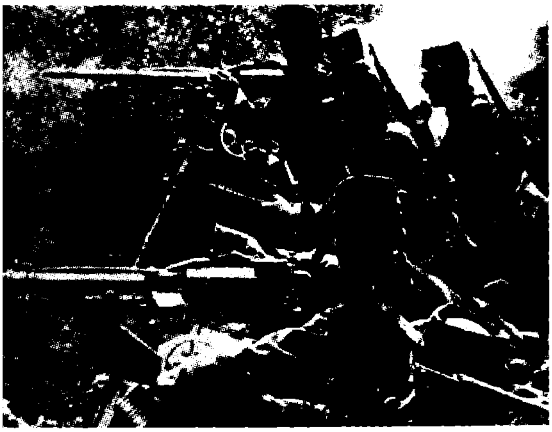

প্রথম মহাযুদ্ধে ফরাসি সৈন্যদলের যুদ্ধাভিযান

ফার্ডিনাণ্ড এক সার্বিয়াবাসীর গুলিতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং ২৮শে জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারপর দু' দেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।

তবে অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ডই কেবল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না। উনিশ শতকের শিল্পবিপ্লবের (দ্র) ফলে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরি পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা, পূর্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঈর্ষা, সন্দেহ ইত্যাদিও ইউরোপের দেশগুলোকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ইন্ধন যোগায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল একই সঙ্গে জলে, স্থলে ও আকাশে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে সর্বপ্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হয়। ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর জার্মানির শান্তি প্রার্থনার পর ১৯১৯ সালের ১০ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ভার্সাই চুক্তির (দ্র) মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে ৮৫ লক্ষ লোক হত এবং ২ কোটি ১০ লক্ষ লোক আহত হয়। আর ব্যয় হয়েছিল ৮ হাজার কোটি ডলার।

সুজ. ব.

বিশ্বশিশু দিবস

প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বের সকল দেশে শিশু-অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে 'বিশ্বশিশু দিবস' পালন করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) বহু শিশু অনাথ ও আশ্রয়হীন হয়। এসব পরিত্যক্ত শিশুকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে লীগ অব নেশন্স (দ্র)-এর জেনেভা কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়, 'মানব জাতির সর্বোত্তম যা-কিছু দেওয়ার আছে শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য'।

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের (দ্র) সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে' শিশু-অধিকার ও নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ ইউনিয়ন ও ইউনিসেফ (দ্র)-এর উদ্যোগে ১৯৫৩ সালের ৫ই অক্টোবর প্রথম বিশ্বশিশু দিবস উদযাপিত হয়। সে বছর বিশ্বের ৪০টি দেশ দিবসটি

www.pathagar.com

বিশ্বশিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

উদ্‌যাপন করে।

১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে গৃহীত হয় শিশুদের নিম্নলিখিত ১০টি অধিকার :

১. জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম অথবা জাতীয়তা নির্বিশেষে শিশুরা এই অধিকার ভোগ করবে।

২. স্বাধীন, মুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশে শিশু বিশেষ নিরাপত্তা ও অবাধ সুযোগ ভোগ করবে।

৩. শিশুর একটি নাম ও জাতীয়তা থাকবে।

৪. শিশুর প্রচুর পুষ্টি, আবাসিক সুবিধা, বিনোদন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ সামাজিক সুবিধা থাকা চাই।

৫. পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শুশ্রূষা, শিক্ষা ও পরিচর্যা দেওয়া হবে।

৬. যতদূর সম্ভব বাবা-মা'র প্রযত্নে ও তত্ত্বাবধানে প্রীতি ও সমঝোতা এবং নিরাপত্তা ও স্নেহময় পরিবেশে শিশু আশ্রয় পাবে।

৭. তাদের স্থানীয় সত্তা বিকাশের সমান সুযোগ এবং বিনা ব্যয়ে শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. শিশু দুর্যোগের সময় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাপত্তা ও ত্রাণ পাবে।

৯. অবজ্ঞা, নিষ্ঠুরতা এবং শোষণের বিরুদ্ধে শিশুকে নিরাপত্তা দিতে হবে।

১০. বর্ণ, ধর্ম বা অন্য যে কোনো ধরনের বৈষম্য থেকে নিরাপত্তা এবং শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিবেশে শিশুকে গড়ে তুলতে হবে।

খু. জা.

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

জাতিসংঘের (দ্র) একটি বিশেষ সংস্থা। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে (দ্র) উন্নত ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে মানবসমাজের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করাই এর মূল উদ্দেশ্য। পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া (দ্র) ও বসন্ত রোগ (দ্র) নির্মূল করাসহ সকল প্রকার রোগ প্রতিরোধ এবং দৈহিক পুষ্টি বর্ধনের ব্যবস্থা গ্রহণ এর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। ইংরেজিতে এর নাম World Health Organisation, সংক্ষেপে WHO।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ১৫৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদ রয়েছে। সদর দপ্তর সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায়। সারা বিশ্বে এর ছয়টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে, যেমন—আলেকজান্দ্রিয়া (মিশর), ব্রাজাভিল্লে (কঙ্গো), কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ম্যানিলা (ফিলিপাইন্স্‌), নয়া দিল্লি (ভারত), এবং ওয়াশিংটন ডি.সি. (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

সুজ. ব.

বিষ

যে সকল রাসায়নিক পদার্থ শরীরে ঢুকলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় কিংবা মৃত্যু হয়, তা বিষ নামে পরিচিত। অনেক বিষাক্ত পদার্থ আছে যা অল্প পরিমাণে এক বার গ্রহণ করলেই মারাত্মক ক্ষতি হয়, যেমন—সায়ানাইড (cyanide), স্ট্রিক্‌নিন (strychnine)। আবার কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থ স্বল্পমাত্রায় অনেক দিন গ্রহণ করলে ক্ষতি হয়, যেমন—সীসা (দ্র)। এ দু'ধরনের বস্তুই বিষ নামে পরিচিত। এমনকি নিরাপদ ঔষধও অতিরিক্ত সেবন করলে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে।

আরো অনেকভাবে বিষের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। কতকগুলো বিষ স্নায়ুউত্তেজকরূপে কাজ করে; যেমন—কোকেন (দ্র), ধুতুরার (দ্র) বিষ, মারিহুয়ানা (marijuana) ইত্যাদি। আবার কতকগুলো বিষ স্নায়ুনিস্তেজক, যেমন—অ্যালকোহল (দ্র), বারবিচুরেট (barbiturate), অর্গানোফসফেট জাতীয় কীটনাশক (দ্র) ঔষধ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

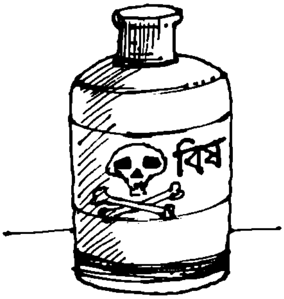

কাজের ধরন অনুসারে কতকগুলো বিষ ক্ষয়কারক, যেমন—অ্যাসিড (দ্র), অ্যালকালি (দ্র); কতকগুলো বিষ রক্তদূষক, যেমন—কার্বন মনক্সাইড (দ্র); আবার কতকগুলো স্নায়ুবিষরূপে কাজ করে, যেমন—কোকেন (cocaine), স্ট্রিক্নিন; অনেক বিষ সরাসরি কোষীয় বিপাক বন্ধ করে দেয়, যেমন—নাইট্রোজেন মাস্টার্ড।

আমাদের দেশে সাধারণত কীটনাশক (দ্র) ঔষধ, ধুতুরা, ঘুমের ঔষধ, সাপের কামড় প্রভৃতির দ্বারা বেশি বিষক্রিয়া ঘটে।

বিষের কাজ শরীরের বিশেষ কোনো স্থানে সীমিত থাকতে পারে; যেমন—চোখ (দ্র), ত্বক (দ্র) কিংবা ফুসফুস (দ্র)। আবার এর প্রতিক্রিয়া সারা শরীরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বিষক্রিয়া তাড়াতাড়ি শনাক্ত না করলে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা না নিলে রোগী মারা যেতে পারে। রোগীর ইতিহাস, শারীরিক পরীক্ষা এবং প্রয়োজন হলে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে বিষ শনাক্ত করা হয়।

বিজ্ঞানের (দ্র) যে শাখায় বিষের প্রকৃতি, উৎস, কাজের ধরন, ক্ষতিকর প্রভাব, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়, তা টক্সিকোলজি (toxicology) নামে পরিচিত।

সা. এ.

বিষাদ-সিন্ধু

মীর মশাররফ হোসেনের (দ্র) ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস। মহরম পর্ব, উদ্ধার পর্ব ও এজিদবধ পর্ব—এই তিন খণ্ডে উপন্যাসটি বিভক্ত। কারবালা প্রান্তরের বিয়োগান্তক ঘটনা অর্থাৎ খলিফার পদের জন্য হযরত মুহম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র এবং হযরত আলীর (দ্র) দুই পুত্র ইমাম হাসান (দ্র) ও ইমাম হোসেনের (দ্র) সঙ্গে মাবিয়ার পুত্র এজিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কূটনীতি, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। হাসান, হোসেন ও এজিদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো অসংখ্য চরিত্র। কাহিনী, বিষয়বৈচিত্র্য ও চরিত্রবিন্যাসে উপন্যাসটি মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি লাভ করেছে। বেদনার গভীরতায় বাংলাভাষীদের জন্য একটি হৃদয়স্পর্শী বিয়োগান্ত অথচ অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। মুসলিম জাতির ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস হলেও এটি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়েরই প্রিয় গ্রন্থ। ইতিহাসাশ্রয়ী হলেও ঘটনা সব সময় প্রকৃত ইতিহাসানুগ হয়ে উঠতে পারে নি। সহজ সাবলীল ভাষা এবং মানবচরিত্র সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতা গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র (দ্র) এইগ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

মে. খা.

বিষুবরেখা / নিরক্ষরেখা

পৃথিবীর (দ্র) দুই প্রান্ত সুমেরু (দ্র) ও কুমেরু (দ্র) বিন্দুদ্বয় থেকে সমান দূরে থেকে পৃথিবীকে ঘিরে পূর্ব-পশ্চিমে যে রেখা কল্পনা করা হয় সেই রেখাটিকে বলে বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা। এই কাল্পনিক রেখা পৃথিবীকে দু'টি গোলার্ধে বিভক্ত করেছে—উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ। ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান মাপা হয় এই রেখার উত্তর ও দক্ষিণে অক্ষাংশমান দ্বারা। বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীকে দুই গোলার্ধে বিভক্তকারী কাল্পনিক তলকে বলে নিরক্ষতল। ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র-সংযোজক রেখা নিরক্ষতলের সঙ্গে যে কোণ সৃষ্টি করে তাই ঐ স্থানের অক্ষাংশমান। বিষুবরেখার উত্তরে অক্ষাংশ (উত্তর), দক্ষিণে অক্ষাংশ (দক্ষিণ) বলা হয়। বিষুবরেখার অক্ষাংশমান শূন্য। তাই এর নাম নিরক্ষ (অর্থাৎ নাই অক্ষ) রেখা। পৃথিবীকে ঘিরে নিরক্ষরেখার দৈর্ঘ্য ৪০,০৭৫.১৬ কিমি অর্থাৎ ২৪,৯০১.৫৫ মাইল।

কোনো স্থানের ধ্রুবতারার (দ্র) উন্নতি কোণ মোটামুটিভাবে ঐ স্থানের অক্ষাংশমানের সমান। নিরক্ষরেখার উন্নতি কোণ ০° অর্থাৎ ঐ স্থান থেকে ধ্রুবতারাকে সর্বদা দিগন্তরেখার সঙ্গে দেখা যায়।

মহাকাশে গ্রহ (দ্র)-নক্ষত্রের (দ্র) অবস্থান পরিমাপের জন্য পৃথিবী এবং মহাশূন্যের সমস্ত বস্তুপুঞ্জকে বেষ্টন করে একটি বৃত্ত কল্পনা করা হয়। একে বলা হয় মহাজাগতিক বিষুবরেখা।

স. রা.

www.pathagar.com

বিষ্ণু

ঈশ্বর সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংসও করেন। যে রূপে তিনি পালন করেন তার নাম বিষ্ণু। হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ-এ বিষ্ণুর প্রশংসা করে এবং রূপ বর্ণনা করে স্তব রচিত হয়েছে। পুরাণেও তাঁর বর্ণনা আছে। বিষ্ণু বিভিন্ন কালে নানা অবতাররূপে পৃথিবীতে এসেছেন। কৃষ্ণ বিষ্ণুরই এক অবতার। বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। তাঁর চার হাত। চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তাঁর বাহন গরুড়।

বিষ্ণুর অস্ত্রের নাম সুদর্শন চক্র। বিষ্ণুর অনেক নাম; যেমন—উপেন্দ্র, কেশব, ত্রিবিক্রম, পুণ্ডরীকাক্ষ, মুরারি ইত্যাদি। বিষ্ণুর যাঁরা উপাসক তাঁদেরকে 'বৈষ্ণব' বলা হয়।

নি. অ.

বিষ্ণু দে [১৯০৯—১৯৮২]

বিষ্ণু দে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের (দ্র) এক জন বিখ্যাত কবি। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) পরে আধুনিক বাংলা কবিতার নতুন ধারা সৃষ্টিতে তাঁরও ভূমিকা আছে। বাংলা সন তের শ' তিরিশের পরে বাংলা কবিতায় নতুন ভাব ও নতুন ভঙ্গি দেখা দেয়। যাঁরা প্রধানত এই নতুন ভাবভঙ্গি এনেছিলেন তাঁদের বলা হয় তিরিশের কবি। বিষ্ণু দে এঁদের এক জন। অন্যেরা হলেন জীবনানন্দ দাশ (দ্র), সুধীন্দ্রনাথ

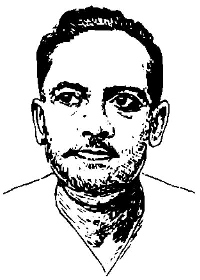

জীবনানন্দ দাশ

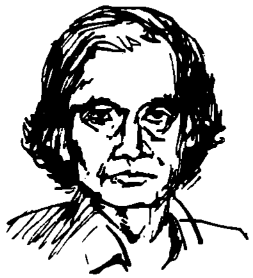

বুদ্ধদেব বসু

দত্ত (দ্র), অমিয় চক্রবর্তী (দ্র), বুদ্ধদেব বসু (দ্র)।

বিষ্ণু দে ১৯০৯ সালের ১৮ই জুলাই (২রা শ্রাবণ, ১২১৬ বাংলা) কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অবিনাশ চন্দ্র দে এবং মায়ের নাম মনোহারিণী দেবী। পিতা ছিলেন উকিল। বিষ্ণু দে কলিকাতারই ছেলে এবং কলিকাতাতে তিনি পুরো জীবন কাটিয়েছেন। ১৯২৭ সালে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল থেকে বিষ্ণু দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩০ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এ. এবং ১৯৩২ সালে সেন্ট পল্‌স্ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। প্রথম থেকেই তিনি ইংরেজিতে খুব ভাল ছিলেন এবং বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজিতে ভাল করার জন্য পুরস্কারও পান। ১৯৩৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে কলিকাতা রিপন কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এখানে তিনি সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসুকে। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবেই বিভিন্ন সরকারি কলেজে চাকুরি করেছেন। ১৯৬৯ সালে চাকুরি থেকে অবসর নেন। তত দিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের এক অতি সম্মানিত কবি। ১৯৮২ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন।

বিষ্ণু দের স্ত্রীর নাম প্রণতি দে। বিষ্ণু দে ও প্রণতির বিয়ে হয়েছিল ১৯৩৪ সালে।

তরুণ বয়স থেকেই বিষ্ণু দে এক জন উদীয়মান কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। কলিকাতায় যেসব নতুন সাহিত্যিকগোষ্ঠী জন্ম নিয়েছিল তাঁদের পত্রিকাতে বিষ্ণু দে লিখতেন। বিষ্ণু দে-ই প্রথম স্পষ্টভাবে বলেন, তরুণ কবিদের রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি

www.pathagar.com

নিজেও 'সাহিত্যপত্র' নামের একটি রুচিশীল পত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৪৮)।

বিষ্ণু দে এক জন সমাজসচেতন কবি ছিলেন। তাঁর কবিতায় মধ্যবিত্ত মানুষের নানা সমস্যা ও সঙ্কটের কথা রূপ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর অনেক বিখ্যাত কবিতা আছে। নাগরিক জীবনের শূন্যতার কথা তিনি তাঁর কবিতায় লিখেছেন। বিষ্ণু দে মার্ক্সবাদের (দ্র) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি সমাজের পরিবর্তনে খুব আশাবাদী ছিলেন। সমাজের পরিবর্তন কামনা করে কবি-সাহিত্যিকেরা 'প্রগতি লেখক সংঘ' গড়ে তুলেছিলেন। এই সংঘের এক জন কর্মী ছিলেন বিষ্ণু দে। বিষ্ণু দের কবিতা পড়লে বোঝা যায়, লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর মনের একটা টান ছিল। সে জন্য আদিবাসীদের (দ্র) জীবন সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। একবার বেশ কিছুদিন সাঁওতালদের এলাকায় ছিলেন তিনি। সাঁওতাল (দ্র) ও ছত্রিশগড়ীদের নিয়ে কবিতাও লিখেছেন। বিষ্ণু দে বিখ্যাত ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়টের দারুণ ভক্ত ছিলেন। তিনি এলিয়টের (দ্র) কবিতা অনুবাদ করেছেন এবং বেশ কয়েক জন আধুনিক ইউরোপীয় কবির কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন। বিখ্যাত বাঙালি চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের (দ্র) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল এবং যামিনী রায়ের চিত্র নিয়ে তিনি ইংরেজি ও বাংলায় বই লিখেছেন। তিনি এক জন মননশীল চিত্রসমালোচক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প ও ভারতীয় চিত্রকলা নিয়ে তাঁর ইংরেজি বই আছে।

বিষ্ণু দে এক জন দক্ষ কবি ছিলেন। শব্দে ও ছন্দে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর কবিতা পড়লে বোঝা যায়, পুরানো সাহিত্য তাঁর বেশ পড়া ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। বিষ্ণু দের কবিতার বইয়ের সংখ্যা বিশের অধিক। কবিতার জন্য তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, নেহরু স্মৃতি পুরস্কার। বিষ্ণু দের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে— 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩), 'চোরাবালি' (১৯৩৭), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৫), 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩), 'আলেখ্য' (১৯৫৮), 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৫৮), 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' (১৯৬৩), 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৬৬), 'সংবাদ মূলত কাব্য' (১৯৬৯) 'রুশতী পঞ্চাশতী' (১৯৬৭)। অনুবাদকাব্য—'এলিয়টের কবিতা' (১৯৫৩), 'হে বিদেশী ফুল' (১৯৫৬), 'মাও সে তুং-এর কবিতা' (১৯৫৮) ইত্যাদি।

কবিতার বই ছাড়া বিষ্ণু দের অনেক গদ্য রচনাও আছে। তিনি এক জন মননশীল প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। তাঁর কয়েকটি ইংরেজি বইও রয়েছে। বিষ্ণু দের প্রবন্ধের বইগুলোর মধ্যে রয়েছে— 'রুচি ও প্রগতি' (১৯৪৬), 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৫২), 'এলামেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' (১৯৫৮), 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা' (১৯৬৫), 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' (১৯৬৭), 'জনসাধারণের রুচি' (১৯৭৫), 'যামিনী রায়' (১৯৭৭) প্রভৃতি।

আ. ক.

বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্র দ্র

বিসিক বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা দ্র

বি সি জি টিকা দ্র

বিস্ফোরক

বিস্ফোরক এমন এক বস্তু যা তাপে বা আঘাতে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায়। কোনো একটি বিস্ফোরক দ্রব্য বিস্ফোরিত হলে এর কঠিন ও তরল পদার্থগুলো গ্যাসে (দ্র) পরিণত হয় এবং প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তপ্ত গ্যাস হঠাৎ আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে। এই বিস্ফোরক সাধারণত পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটা, পাহাড়ের অংশবিশেষ ভেঙে ফেলা, জাহাজের সম্মুখে কোনো ছোটখাটো পাহাড় বা আবর্জনা থাকলে তা উড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের সময় এই বিস্ফোরক বড় বড় শহর ধ্বংস করা, জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া ও শত্রুকে আঘাত হানার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রায় সকল বিস্ফোরকেই যেসব রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় সেগুলো হল : কার্বন (দ্র), হাইড্রোজেন (দ্র), অক্সিজেন (দ্র) ও নাইট্রোজেন (দ্র)। বিস্ফোরণের সময় যেসকল গ্যাস তৈরি হয় সেগুলো হল : কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র), বাষ্প, নাইট্রোজেন, কিছু পরিমাণ কার্বন মনক্সাইড (দ্র) ও হাইড্রোজেন। বিস্ফোরক দু'ধরনের হয়ে থাকে—উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং কম ক্ষমতাসম্পন্ন। উচ্চ

www.pathagar.com

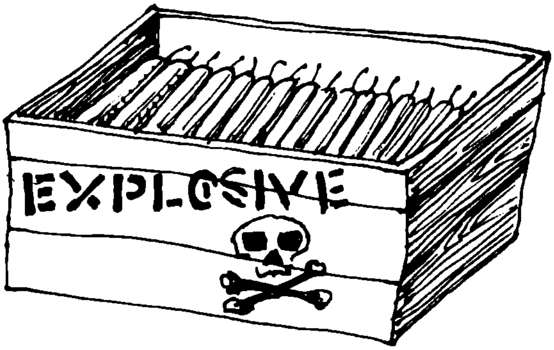

ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরককে কঠিন ও তরল পদার্থ অত্যধিক কম সময়ে গ্যাসে পরিণত হয়। এর বিস্ফোরণের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৬ কিমি (যে বেগে বিস্ফোরণ বিস্ফোরকের মধ্যে দিয়ে যায়)। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরকের মধ্যে নাইট্রোগ্লিসারিন, ট্রাই-নাইট্রো-টলুয়েন (TNT), PETN এবং TNT ও PETN মিশ্রণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিম্ন শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরকের মধ্যে বারুদের নাম উল্লেখ করা যায়। এখানে বিস্ফোরণের বেগ সেকেণ্ডে মাত্র ১ থেকে ৯১ মিটার। এই বিস্ফোরণকে দ্রুত দহন বলা যায়। এই দহনকাজের ঢেউকে 'শক্ ওয়েভ' বলা হয়।

মু. এ.

বিহার

ভারতীয় বৌদ্ধমঠ বা মন্দির। প্রাচীন কালে বিহার বলতে কেবল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় বা বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চাকেন্দ্রকে বোঝাত। যেমন—নালন্দা বিহার (দ্র), ওদন্তপুরী বিহার (দ্র.), সোমপুর বিহার (দ্র), বিক্রমশীলা বিহার ইত্যাদি। এসব বিহার এখন প্রাচীন কীর্তির অংশ। এগুলো বিলুপ্তির পর কালক্রমে 'বিহার' অর্থের অবনতি ঘটেছে। এখন বৌদ্ধদের উপাসনালয় বা সাধারণ বৌদ্ধমঠকে বিহার বলা হয়। যেমন—ঢাকা (দ্র) শহরের কমলাপুরে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার, ময়নামতী বা শালবন বিহার (দ্র), চট্টগ্রামের (দ্র) ফটিকছড়িতে সিলোনীয়া জ্ঞানরত্ন বিহার ইত্যাদি।

বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা বা গ্রামে বিহার স্থাপিত হয়। এক এলাকায় একাধিক বিহারও স্থাপিত হতে পারে। কক্সবাজারের নিকটে রামু-তে এমন একাধিক বিহার রয়েছে। বিহারের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধর্মীয় সকল আচার-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য প্রত্যেক বিহারে কমপক্ষে এক জন ভিক্ষু (দ্র) থাকেন, তাঁকে বিহারাধ্যক্ষ বলা হয়। বিহারাধ্যক্ষের ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ এলাকার বৌদ্ধ অধিবাসীরা বহন করে থাকেন। বিহারের মাধ্যমে এলাকার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই হিসাবে বিহার কেবল বৌদ্ধদের উপাসনালয় নয়, সামাজিক মিলনক্ষেত্রও।

সুজ. ব.

বিহারীলাল চক্রবর্তী [১৮৩৫—১৮৯৪]

বাংলা সাহিত্যের (দ্র) প্রথম আধুনিক গীতিকবি। রবীন্দ্রনাথ (দ্র) শৈশবে তাঁর ভাবশিষ্য ছিলেন। ১৮৩৫ সালের ২৫শে মে কলিকাতায় (দ্র) তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা দীননাথ চক্রবর্তী। স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ না করলেও পারিবারিক উদ্যোগে সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এবং এভাবেই তিনি সাহিত্যসাধনায় উদ্বুদ্ধ হন। ঐ সময়ে 'পূর্ণিমা', 'সাহিত্যসংক্রান্তি' 'অবোধবন্ধু' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে তিনি 'অবোধবন্ধু' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন।

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে বাংলা কবিতায় যখন কেবল মধুসূদন (দ্র)-হেমচন্দ্র (দ্র)-নবীনচন্দ্রের (দ্র) মহাকাব্যের গুরুগম্ভীর ক্লাসিক একটি ধারা প্রবহমাণ ছিল, তখন বিহারীলালের হাতেই বাংলা কবিতার নতুন ধারার বিস্তার ঘটে। গীতিকবিতার (দ্র) বিশুদ্ধ রূপটি বাংলায় তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন।

বিহারীলাল ছিলেন প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ ও অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী। কাব্যনির্মাণেও তাঁর এই ব্যক্তিমানসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। তাঁর কাব্য অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল। এই প্রথম কাব্যে হৃদয়াবেগের পরিচয় পেয়ে গীতিপ্রাণ বাঙালি সমাজ তাঁর প্রবর্তিত গীতিকবিতার নতুন ধারাটিকে লালন করতে শুরু করে। পরবর্তী কালে এই ধারা থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যদর্শনের ভিত্তি রচনার প্রয়াস পান। তাঁর ভাষায় বিহারীলাল আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের 'ভোরের পাখি'।

www.pathagar.com

বিহারীলালের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলো হল—'স্বপ্নদর্শন' (১৮৫৮), 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২) 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) 'নিসর্গসন্দর্শন' (১৮৭০) 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'প্রেম প্রবাহিণী' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯) এবং 'বাউল বিংশতি' ইত্যাদি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসাবে 'সারদামঙ্গল' সুধী সমাজের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে জীবৎকালে তাঁর পাঠকসংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। ১৮৯৪ সালের ২৪শে মে তিনি পরলোক গমন করেন।

সুজ. ব.

বীজগণিত

গণিতের (দ্র) একটি অন্যতম উন্নত স্তর হল বীজগণিত, যা অজানা রাশি নিয়ে কাজ করার পদ্ধতি আলোচনা করে। যেমন—পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সার মুদ্রা মিলে মোট ৩৮.০০ টাকা হয়েছে। উভয় প্রকার মুদ্রার সংখ্যা কত ? এখানে মুদ্রার সংখ্যা অজানা। বীজগণিতের সাহায্যে এই সমস্যাটির সমাধান করা যায়। বীজগণিত হচ্ছে সংখ্যার পরিবর্তে বর্ণ বা প্রতীক ব্যবহার করে অজানা রাশির মান অথবা রাশিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করার গাণিতিক পদ্ধতি।

ইংরেজি অ্যালজেব্রার বাংলা প্রতিশব্দ বীজগণিত। অ্যালজেব্রা (Algebra) শব্দটি এসেছে আরবি 'আল-জাবের' শব্দ থেকে যার অর্থ—ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া। প্রায় ১২০০ বছর আগে মুহম্মদ বিন মুসা রচিত একটি বইয়ে অ্যালজেব্রার অর্থ পাওয়া যায় "কোনো সমীকরণের বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করা"। বীজগণিতে বিভিন্ন অজানা রাশিকে প্রকাশ করার জন্য আমরা X, Y, Z ইত্যাদি ব্যবহার করি। একটি রাশির সঙ্গে আরেকটি রাশির বা রাশিসমূহের সম্পর্ক দেখানোর জন্য বীজগণিতে ব্যবহৃত হয় সমীকরণ। সমীকরণ তৈরির জন্য বিভিন্ন প্রতীক (যেমন $<, >, =$) ব্যবহৃত হয়। সমীকরণে দেখানো সম্পর্ক থেকে অজানা রাশির মান নির্ণয় করা যায়।

দু'টি অজানা রাশির মান নির্ণয়ের জন্য দু'টি সমীকরণের দরকার হয়। মিশরীয়রা বীজগণিত উদ্ভাবন করে বলে জানা গেছে। প্রায় ৪০০০ বছর আগে এক জন মিশরীয় ব্যক্তি (পরিচয় জানা যায় নি) বীজগণিতের কথা লিখেছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (দ্র) প্যাপিরাসে (দ্র) লিখিত খ্রিস্টপূর্ব ১৬৫০ সালের একটি মিশরীয় বীজগণিতের সমস্যা আজও সংরক্ষিত আছে। গণিতের অন্যান্য শাখায় বীজগণিতের ব্যবহার দেখা যায়। পাটীগণিত (দ্র) বা সংখ্যাগণিতে যে সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য, বীজগণিতের প্রতীক ও সূত্রের ব্যবহারে তা হয়ে ওঠে সহজতর। জ্যামিতির (দ্র) বহু সমস্যা সমাধানের জন্য বীজগণিতের দরকার হয়।

হো. আ.

বীট্‌ল্

কীটপতঙ্গের (দ্র) মধ্যে বীট্‌ল্ (beetle) সবচেয়ে পরিচিত। পৃথিবীতে (দ্র) প্রায় তিন লক্ষ প্রজাতির বীট্‌ল্ আছে। এরা সমুদ্র ব্যতীত সর্বত্র বাস করতে পারে। এক জোড়া শক্ত খোলসের পাখা দিয়ে বীট্‌লের শরীর আবৃত থাকে। এ কারণে পতঙ্গজগতে এরা 'আর্মর্‌ড্ ট্যাঙ্ক' নামে পরিচিত। এদের দেহে তিন জোড়া পা থাকে, মাথায় এক জোড়া অ্যান্টেনা (দ্র)।

বিভিন্ন আকার, আকৃতি ও বর্ণের বীট্‌ল্ রয়েছে। কোনোটা সরু ও লম্বা, কোনোটা গোলাকার। বেশির ভাগই বাদামি, কালো বা গাঢ় লাল বর্ণের। 'ফেদার-উইংড বীট্‌ল্' ক্ষুদ্রতম প্রজাতি। মাত্র আধ মিলিমিটার লম্বা। 'আফ্রিকান গলিয়াথ বীট্‌ল্' বৃহত্তম বীট্‌ল্‌দের একটি। তেরো সেন্টিমিটার লম্বা এই বীট্‌ল্‌টির ওজন ৪২ গ্রাম।

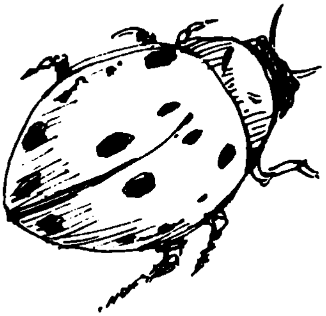

বেশির ভাগ বীট্‌ল্ একাকী বাস করে। তবে বেশ কিছু প্রজাতি নির্দিষ্ট সময় সমাজবদ্ধভাবে থাকে। স্ত্রী-বীট্‌ল্ ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট বেরোয়, এরপর মূককীট, সবশেষে পূর্ণাঙ্গ বীট্‌ল্। বয়স্ক বীট্‌ল্ মাত্র কয়েক মাস বাঁচে।

www.pathagar.com

তবে কোনো কোনো প্রজাতির স্ত্রী-বীট্‌ল্‌ ডিম পাড়ার পর মাত্র কয়েক দিন বাঁচে।

বেশির ভাগ বীট্‌ল্‌ই ফসল, গাছ-গাছড়া ও গুদামজাত খাদ্যশস্যের আপদ হিসাবে পরিচিত। আবার লেডিবাগ্‌ বীট্‌লের মতো কোনো কোনো প্রজাতি ফসলের আপদ বীট্‌ল্‌দের ধ্বংস করে থাকে। কোনো কোনো প্রজাতি মৃত পশুপাখি খেয়ে পরিবেশ নির্মল করে।

আ. ন. ম. আ. র.

বীরবল [? —১৫৯০]

একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। উপস্থিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ রসবোধ, নির্ভীক চরিত্রগুণ এবং সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ইনি সমধিক খ্যাতিমান।

মোগল সম্রাট আকবর (দ্র) তাঁর শাসনামলে (১৫৫৬–১৬০৫) প্রতিভাবান নয় জন কবি, শিল্পী ও চিত্রকরকে অন্তর্ভুক্ত করে 'নবরত্ন' নামে যে বিশেষ সভা গড়ে তুলেছিলেন বীরবল ছিলেন তার অন্যতম 'রত্ন'।

বীরবলের পূর্বনাম ছিল মহেশ দাস। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত এক পল্লীগ্রামে তাঁর জন্ম। তবে তাঁর জন্মসাল ও তারিখ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তি অনুসারে, দিল্লীশ্বর আকবর তাঁর কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীত-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে 'কবিরায়' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁকে তাঁর দরবারে সাদরে স্থান দেন। পরে তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে সম্রাট আকবর তাঁকে পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর পরিমাণ নিষ্কর ভূসম্পত্তি (জায়গির) দান করেন এবং সহস্র সৈন্যবিশিষ্ট বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। এই সময়েই তিনি 'বীরবল' নামে বিখ্যাত হন। তাঁর পারিবারিক নাম 'মহেশ দাস' বিস্মৃতির গর্ভে ঢাকা পড়ে যায়।

বীরবল অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যে রাজকার্য সংক্রান্ত কোনো গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হলে সম্রাট আকবর তার সমাধানে সর্বাগ্রে তাঁকেই পাঠাতেন।

১৫৮৬ সালে আফগানেরা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ তাঁর কাছে সৈন্যসাহায্য চেয়ে পাঠান। বীরবল ঐ সাহায্যকারী সেনাদলের অধিনায়ক হয়ে কাবুলে যান। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আফগানেরা পার্বত্য প্রদেশের চারদিক থেকে সম্রাটের সৈন্যদলকে আক্রমণ করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বীরবল ও জৈন খাঁ তাঁদের সৈন্যদলসহ পশ্চাদপসরণ করে অন্য এক জায়গায় শিবির স্থাপন করেন। আফগান সৈন্যরা রাত্রিবেলা ঐ শিবির আক্রমণ করলে অন্য অনেকের সঙ্গে বীরবলও নিহত হন (১৫৯০)। সম্রাট আকবর বীরবলের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোককাতর হন।

প্রসঙ্গত, 'বীরবল' ছদ্মনাম নিয়ে বাংলা সাহিত্যে (দ্র) এক বিখ্যাত লেখক আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তিনি প্রমথ চৌধুরী (দ্র)।

আ. হু.

বীরউত্তম, বীরপ্রতীক, বীরবিক্রম, বীরশ্রেষ্ঠ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে (দ্র) অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় উপাধি 'বীরশ্রেষ্ঠ'। ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সাত জন বীর সন্তানকে মরণোত্তর 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এঁরা হলেন—

১. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
২. ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ
৩. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর
৪. ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন
৫. সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
৬. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
৭. সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান

১. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ : বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখের জন্ম নড়াইল জেলার মহিষখোলা

www.pathagar.com

গ্রামে, ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি। পিতা মোহাম্মদ আমানত শেখ, মাতা জেন্নাতুন্নেসা। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে হাইস্কুলে ভর্তি হন কিশোর

মুক্তিযুদ্ধের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ

মতিউর রহমান

মুন্সী আবদুর রউফ

মোস্তফা কামাল

মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

মো. হামিদুর রহমান

রুহুল আমিন

নূর মোহাম্মদ শেখ

বয়সে নূর মোহাম্মদ পিতা-মাতাকে হারান। বেশি লেখাপড়া করতে না পারলেও সুঠাম দেহ আর সাহসী মন সম্বল করে ১৯৫৯ সালের ১৪ই মার্চ ভর্তি হন তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ (ই পি আর)-এ। তাঁর কর্মস্থল ছিল দিনাজপুর। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ছুটি উপলক্ষে নিজ গ্রামে এসে দেখেন, পাক-বাহিনী নির্বিচারে নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে চলেছে। তখন তিনি চাকুরিস্থলে ফিরে না গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে (দ্র) যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

দিনটি ছিল ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। যশোরের গোয়ালহাটি গ্রাম। ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদকে অধিনায়ক করে নিরাপত্তার প্রয়োজনে সুতিপুরে একটি স্থায়ী টহল বসানো হয়। নূর মোহাম্মদের সঙ্গে ছিলেন মাত্র চার জন সিপাহি। সকাল সাড়ে ন'টার দিকে পাক- সেনারা হঠাৎ তিন দিক থেকে আক্রমণ করলে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অসম শক্তির এই যুদ্ধে জয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

অগত্যা অধিনায়ক নূর মোহাম্মদ মাত্র একটি এল.এম.জি. (লাইট মেশিনগান) সম্বল করে একাই শত্রুর মোকাবেলা করতে থাকেন যাতে তাঁর অন্য সহযোগীরা নিরাপদে পিছু হটতে পারে। অবশেষে অসামান্য সাহসী এই বীর যোদ্ধা শত্রুর গুলিতে শহীদ হন।

২. **ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ :** ফরিদপুর জেলার বোয়ালখালি থানার সালামতপুর গ্রামে ১৯৪৩-এর মে মাসে বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফের জন্ম। পিতা মুন্সী মেহেদী হোসেন, মা মুকিদুন্নেসা। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর ফলে সংসারের অভাব মোচনের তাগিদে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় ১৯৬৩ সালের মে মাসে ভর্তি হন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ (ই পি আর)-এ।

ল্যান্স নায়েক রউফ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্বে চট্টগ্রামে (দ্র) ১১ উইং-এ চাকুরিরত ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মহালছড়ি জনপথ দিয়ে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর চলাচল প্রতিরোধের জন্য অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি বুড়িঘাট এলাকার চিংড়ি খালের দুই পাড়ে প্রতিরক্ষা-ঘাঁটি গড়ে তোলে। রউফ ছিলেন এই কোম্পানির এক জন যোদ্ধা।

১৯৭১ সালের ৮ই এপ্রিল। দুপুর নাগাদ কামান ও মর্টারের মুহুর্মুহু আওয়াজ শোনা গেল। বুড়িঘাটের মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা-ঘাঁটি লক্ষ করে সাতটি স্পিড বোট ও দু'টি লঞ্চে কিছু পাকিস্তানি সৈন্যকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। উদ্দেশ্য, রাঙ্গামাটি মহালছড়ির জলপথ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎখাত করা। সামান্য অস্ত্র ও ক্ষীণ লোকবল নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা রুখে দাঁড়ালেন। কিন্তু শত্রুর প্রবল শক্তি ও আক্রমণের মুখে সহযোদ্ধাদের অস্ত্র নিয়ে পশ্চদাপসরণের

www.pathagar.com

নির্দেশ দিলেন ল্যান্স নায়েক রউফ। নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন পরিখায়। এই সাহসী যোদ্ধার বিরামহীন গুলিবর্ষণে শত্রুর সাতটি স্পিডবোটই ডুবে যায়। তবু শেষ রক্ষা হয় নি। শত্রুর একটি মর্টারের গোলা এসে পড়ে রউফের ওপর। সঙ্গীদের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে এই সাহসী বীর অবশেষে শাহাদাত বরণ করেন।

৩. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর : বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার রহিমগঞ্জ গ্রামে ১৯৪৮ সালে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের জন্ম। পিতার নাম আবদুল মোতালেব হাওলাদার। মেধাবী ছাত্র জাহাঙ্গীর আই.এসসি. পাশ করেন ১৯৬৬ সালে। পরের বছর ক্যাডেট হিসাবে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীতে যোগ দেন এবং ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ইঞ্জিনিয়ার্স কোরে কমিশন পান। একাত্তরে স্বাধীনতাযুদ্ধ (দ্র) শুরুর সময় তিনি পাকিস্তানে পশ্চিম কারাকোরাম এলাকায় ১৭৩ নম্বর ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটেলিয়নের ক্যাপ্টেন ছিলেন। পাকিস্তানের আটকে-পড়া তিন জন অফিসারসহ সীমান্তরক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে খরস্রোতা মুনাওয়ার নদী পার হয়ে দিল্লি (দ্র)-কলিকাতা (দ্র) ঘুরে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মেহেদীপুরে মুক্তিবাহিনীর ৭নং সেক্টরে সাব-সেক্টর কমাণ্ডার হিসাবে তিনি যোগ দেন।

বিভিন্ন রণাঙ্গনে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শনের কারণে তাঁকে রাজশাহীর (দ্র) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘাঁটি দখলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ১৪ই ডিসেম্বর শীতের ভোরে মাত্র ২০ জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে নৌকাযোগে মহানন্দা নদী পার হলেন। জীবনের পরোয়া না করে পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর দিক থেকে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালালেন। একে একে পরিখা দখল করে দখলদার বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করলেন। কিন্তু হঠাৎ একটি গুলি এসে তাঁর কপালে লাগে। নিমেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এই বীর সন্তান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তির নায়ক ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের মরদেহ শহীদী মর্যাদায় দাফন করা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার ঐতিহাসিক গৌড়ের সোনা মসজিদ (দ্র)-প্রাঙ্গণে।

৪. ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিন : বীরশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার মোহাম্মদ রুহুল আমিনের জন্ম নোয়াখালি জেলার সোনাইমুড়ির বাঘচাপাড়া গ্রামে। পিতা আজহার পাটোয়ারী, মাতা জোলেখা খাতুন।

সংসারের অসচ্ছলতার কারণে হাইস্কুলের পড়া শেষ করেই ১৯৫৩ সালে জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে ১৯৭১ সালের এপ্রিলে চট্টগ্রামে (দ্র) 'পিএনএস বখ্‌তিয়ার' নৌ-ঘাঁটিতে আর্টিফিসার হিসাবে নিয়োজিত থাকাকালে পালিয়ে গিয়ে ভারতের (দ্র) ত্রিপুরাসীমান্ত অতিক্রম করে ২নং সেক্টরে যোগ দেন। নৌ-বাহিনীর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কলিকাতায় এলে রুহুল আমিনকে নবগঠিত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর প্রথম গানবোট দু'টির একটি 'পলাশ'-এর প্রধান ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

মংলা বন্দরে পাকিস্তানি রণতরী 'পিএনএস তিতুমীর' দখল করার উদ্দেশ্যে ১০ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় 'পলাশ' নিয়ে রহুল আমিন মুক্তিফৌজ ও মিত্র বাহিনীর ক'টি গানবোটের সঙ্গে মংলা বন্দরে পৌঁছন। বেলা ১২টায় গানবোটগুলো যখন খুলনা (দ্র) শিপ্‌ইয়ার্ডের কাছাকাছি, তখন তিনটি পাকিস্তানি জঙ্গীবিমান থেকে গানবোটগুলোর উপর গোলাবর্ষণ শুরু হয়। পলাশের অধিনায়ক জাহাজ ত্যাগ করতে আদেশ দিলেও ক্ষুব্ধ রহুল আমিন বোটের ইঞ্জিন সচল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে কামানের ক্রুদের বিমানের দিকে গুলি ছুঁড়তে বলেন। ইতিমধ্যে শত্রুবিমানগুলো পুনরায় পলাশের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করলে রুহুল শহীদ হন। জাহাজ ত্যাগ না করে এই সাহসী বীর জীবনের বিনিময়ে রণতরীকে রক্ষা করা পবিত্র দায়িত্ব মনে করেছিলেন। তাঁর এই সাহস ও দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

৫. সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল : বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ১৯৪৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বর্তমান ভোলা জেলার দৌলতখান থানার পশ্চিম হাজিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাবিবুর রহমান ছিলেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার। পিতার সৈনিকজীবন তাঁকে আকৃষ্ট করে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়ার পর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে ১৯৬৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ভর্তি হন। কুমিল্লায় ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে তাঁর পোস্টিং হয়। ১৯৭১ সালের মার্চের

www.pathagar.com

মাঝামাঝি এই রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠানো হয়।

পঁচিশে মার্চ কালরাত্রি (দ্র) থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৭শে মার্চ এই রেজিমেন্ট পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রেজিমেন্টের ২নং প্লাটুনকে আখাউড়ার দক্ষিণে গঙ্গাসাগরের উত্তরে দরুইন গ্রামে পাঠানো হয়। এই প্লাটুনেই ছিলেন সিপাহি মোস্তফা কামাল। কর্মতৎপরতার জন্য যুদ্ধকালীন সময়েই তাঁকে মৌখিকভাবে ল্যান্স নায়েকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে হিসাবে তিনি ছিলেন দশ জন সৈন্যের সেক্শন কমাণ্ডার।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী দরুইনে উপস্থিত হয়। ১৭ই এপ্রিল দুপুরের দিকে হানাদার বাহিনী প্রবল গুলিবর্ষণ শুরু করলে মোস্তফার ক'জন সঙ্গী শহীদ হন। আত্মরক্ষার জন্য অধিনায়কসহ সবাই পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মোস্তফা স্থানত্যাগ না করে সাহসিকতার সঙ্গে অবিরাম গুলি চালিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুরো কোম্পানিকে পশ্চাদপসরণের সুযোগ করে দেন। এই যুদ্ধে শহীদ হন বীর সৈনিক মোস্তফা কামাল।

৬. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান : বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের জন্ম ১৯৪২ সালের ২৯শে নভেম্বর, ঢাকার (দ্র) আগা সাদেক রোডে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার রামনগর গ্রামে। পিতা মৌলবী আবদুস সামাদ ছিলেন কালেক্টরেটে অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। এর পর পড়তে চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে সারগোদার পাকিস্তান বিমানবাহিনী পাবলিক স্কুলে। ১৯৬১ সালে বিমানবাহিনীতে যোগ দেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি পাকিস্তানিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ১৯৬৩ সালে বৈমানিক হিসাবে কমিশন পান। এরপর রিসালপুরে পাঠানো হয় তাঁকে।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে দু'মাসের ছুটিতে ঢাকায় বেড়াতে আসেন মতিউর রহমান। দেশে অবস্থানকালে ২৫শে মার্চ পাকবাহিনীর হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে মর্মাহত হন। তখনই তিনি মুক্তিযুদ্ধে (দ্র) যোগ দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের চাপে তাঁকে ফিরে যেতে হয় পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মস্থলে। কিন্তু তাঁর মন পড়ে ছিল মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে।

একাত্তর সালের ২০শে আগস্ট অবাঙালি পাইলট অফিসার মিন্হাজ রশীদের কাছ থেকে একটি ব্লু-বার্ড ১৬৬ বিমান ছিনতাই করে উড়ে যাবার সময় থাট্টার অদূরে ভারতীয় সীমান্ত থেকে ৩৫ মাইল দূরে বিমানটি বিধ্বস্ত হয় এবং মতিউর রহমান শহীদ হন। জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে, স্ত্রী-কন্যার কথা ভুলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন এই দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমিক।

৭. সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান : বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমানের জন্ম ১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, যশোর জেলার সীমান্তবর্তী খোরদা খালিশপুরে। পিতা আব্বাস আলী মণ্ডল, মাতা মোসাম্মাৎ কায়সুন্নেসা। প্রথমে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও অভাবের তাড়নায় স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। ১৯৭১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি হামিদুর রহমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ভর্তি হলে তাঁকে পাঠানো হয় চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে প্রশিক্ষণের জন্য। চট্টগ্রামে অবস্থিত প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ২৫শে মার্চের নারকীয় গণহত্যার প্রতিবাদে সশস্ত্র লড়াই শুরু করলে হামিদুর রহমান এই বাহিনীতে যোগ দেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে হামিদুর রহমানের দলকে পাঠানো হয় সিলেটের (দ্র) সীমান্তবর্তী শ্রীমঙ্গল থানার ধলাই গ্রামে। এখানে অবস্থিত সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাক-বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি দখল করা ছিল মুক্তিবাহিনীর জন্য খুবই জরুরি। পরিকল্পনা মতো ২৮শে অক্টোবর ভোরে মুক্তিযোদ্ধারা তিন দিক থেকে আক্রমণ চালায়। কিন্তু শত্রুপক্ষের একটি এল.এম.জি. (লাইট মেশিনগান) এমনভাবে বসানো ছিল যে একে এড়িয়ে সামনে এগুনো ছিল অসম্ভব। হামিদুর রহমান ঐ এল.এম.জি.কে নিষ্ক্রিয় করার দায়িত্ব নিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে যান। ঝাঁপিয়ে পড়েন এল.এম.জি.র অবস্থানের ওপর। শত্রুর এল.এম.জি. স্তব্ধ হল; ঘাঁটি দখল করাও হল এবং তা সম্ভব হল হামিদুর রহমানের আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে। সীমান্তের কাছে আমবাসা গ্রামে বাংলাদেশের এই বীর সন্তান চিরনিদ্রায় শায়িত।

www.pathagar.com

এছাড়া বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিসেনাদের নামের তালিকা নিচে দেওয়া হল :

বীর উত্তম

১।	লেঃ কর্নেল (অস্থায়ী মে.জে.)	মো. আ. রব, এম.এন.এ
২।	মেজর (অস্থায়ী মেজর-জে.)	কে. এম. শফিউল্লাহ
৩।	মেজর ঐ	জিয়াউর রহমান
৪।	মেজর (অস্থায়ী ব্রিগেডিয়ার)	চিত্তরঞ্জন দত্ত
৫।	মেজর (অবসরপ্রাপ্ত)	কাজী নুরুজ্জামান
৬।	" (অস্থায়ী ব্রিগেডিয়ার)	মীর শওকত আলী
৭।	" ঐ	খালেদ মোশারফ
৮।	" (অস্থায়ী কর্নেল)	মোঃ আবুল মঞ্জুর
৯।	" (অস্থায়ী লে. কর্নেল)	আবু তাহের (অবসরপ্রাপ্ত)
১০।	ক্যাপ্টেন (অস্থায়ী কর্নেল)	এ. এম.এম. নুরুজ্জামান
১১।	" (অস্থায়ী মেজর)	মো. রফিকুল ইসলাম
১২।	" (অস্থায়ী মেজর)	আবদুস ছালেক চৌধুরী
১৩।	মেজর	মো. আমিনুল হক
১৪।	লিডার মুক্তিবাহিনী	খাজা নিজাম উদ্দীন (শহীদ)
১৫।	ক্যাপ্টেন (অস্থায়ী মেজর)	হারুন আহমেদ চৌধুরী
১৬।	মেজর	এ. টি. এম. হায়দার
১৭।	ক্যাপ্টেন	এম.এ. গাফফার
১৮।	মেজর	শরীফুল হক
১৯।	ক্যাপ্টেন	মো. শাজাহান (ওমর)
২০।	ক্যাপ্টেন	মাহবুবুর রহমান
২১।	মেজর (অব.)	মো. জিয়াউদ্দীন
২২।	ক্যাপ্টেন	আফতাব কাদের (শহীদ)
২৩।	ক্যাপ্টেন	মাহবুবুর রহমান (শহীদ)
২৪।	ক্যাপ্টেন	সালাহউদ্দীন মমতাজ (মরণোত্তর)
২৫।	ক্যাপ্টেন	মো. আজিজুর রহমান
২৬।	লেফটেন্যান্ট	এস. এম. ইমদাদুল হক (শহীদ)
২৭।	২য় লেফটেন্যান্ট	মো. আনোয়ার হোসেন (শহীদ)
২৮।	লেফটেন্যান্ট	আবু নয়েম মো. সামাদ (শহীদ)
২৯।	সুবেদার	আফতাব আলী
৩০।	সুবেদার	ফয়েজ আহমেদ (শহীদ)
৩১।	না. সুবেদার	বেলায়েত হোসেন (শহীদ)
৩২।	না. সুবেদার	ময়নুল হোসেন (শহীদ)
৩৩।	এন-ওয়াই-এ	হাবিবুর রহমান
৩৪।	হাবিলদার	মো.শাহ আলম (শহীদ)
৩৫।	"	নূরুল আমিন
৩৬।	"	নাদির উদ্দীন (শহীদ)
৩৭।	নায়েক	আ. মান্নান (শহীদ)
৩৮।	ল্যা./ নায়েক	আবদুল লতিফ (শহীদ)
৩৯।	ল্যা./ নায়েক	আ. ছাত্তার
৪০।	সিপাই	নুরুল হক (শহীদ)
৪১।	"	মো. শামসুজ্জামান (শহীদ)
৪২।	" শাফিল মিন (শহীদ)	
৪৩।	সুবেদার	ফজলুর রহমান (শহীদ)
৪৪।	নায়েক সুবেদার	মজিবর রহমান
৪৫।	নায়েক	শফিকউদ্দীন চৌধুরী (শহীদ)
৪৬।	সিপাই	আবু তালেব (ঐ)
৪৭।	"	মো. সালাহউদ্দীন আহমেদ
৪৮।	"	আনোয়ার হোসেন (শহীদ)
৪৯।	"	এরশাদ আলী (শহীদ)
৫০।	নৌ-কমাণ্ডো	মোজাহার উল্লাহ
৫১।	এল/এম	মো. জালাল উদ্দীন
৫২।	ই-আর-এ	মো. আফজাল মিয়া
৫৩।	এম-ই-আই	মো. বদিউল আলম
৫৪।	এ-বি	মো. শফিউল মওলা
৫৫।	সাব/লে.	আ. ওয়াহিদ চৌধুরী
৫৬।	-	মতিউর রহমান
৫৭।	নৌ-কমাণ্ডো	মো. শাহ আলম

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

৫৮।	গ্রু. ক্যা. (এয়ার ভাইসমার্শাল)	এ. কে. খন্দকার
৫৯।	উইং কম. (এয়ার কমোডোর)	এম. কে. বাসার
৬০।	স্কোয়াড্রন লিডার	সুলতান মাহমুদ
৬১।	ফ্লাইট লে.	সামসুল আলম
৬২।	" "	বদরুল আলম
৬৩।	" অফিসার	লিয়াকত আলী খাঁন

মুক্তিবাহিনী

৬৪।	ক্যাপ্টেন	শাহাবুদ্দীন (প্রাক্তন পি. আই. এ)
৬৫।	"	আকরাম (প্রাক্তন পি. আই. এ)

www.pathagar.com

৬৬।	ক্যাপ্টেন	শরফুদ্দিন (প্রাক্তন উদ্ভিদ সংরক্ষণ বৈমানিক)
৬৭।	–	এম. এইচ. সিদ্দিকী (ইঞ্জিনিয়ার)
৬৮।	–	আ. কাদের সিদ্দীকী

বীর বিক্রম

১।	মেজর (অস্থায়ী কর্নেল)	কে. এম. হুদা
২।	" (অস্থায়ী কর্নেল)	আবু সালেহ মো. নাছিম
৩।	মেজর (অস্থায়ী কর্নেল)	সাফাত জামিল
৪।	"	মইনুল হোসেন চৌধুরী
৫।	" (অস্থায়ী লেঃ কর্নেল)	গিয়াসউদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
৬।	ক্যাপ্টেন "	মহসীন উদ্দীন আহমেদ
৭।	" "	আমিন আহমেদ চৌধুরী
৮।	মেজর	এম. এ. আর. আজম চৌধুরী
৯।	" (অস্থায়ী লে. কর্নেল)	মোস্তাফিজুর রহমান
১০।	ক্যাপ্টেন (অস্থায়ী মেজর)	হাফিজউদ্দীন আহমেদ
১১।	"	অলি আহমেদ
১২।	মেজর	জাফর ইমাম
১৩।	ক্যাপ্টেন (অস্থায়ী মেজর)	এ. ওয়াই. এম. মাহফুজুর রহমান
১৪।	" "	মেহ্দী আলী ইমাম
১৫।	" "	এস. এইচ. এম. বি -নুর চৌধুরী
১৬।	" "	ইমামুজ্জামান
১৭।	লেফটেন্যান্ট	এস. আই. এম. নূরুন্নবী খান
১৮।	"	মতিউর রহমান
১৯।	"	আ. মান্নান
২০।	"	গোলাম হেলাল মোরশেদ খান
২১।	"	সমশের মবিন চৌধুরী
২২।	"	আ. রব
২৩।	২য় লেফটেন্যান্ট	শহীদ খন্দকার আজিজুল ইসলাম
২৪।	২য় লেফটেন্যান্ট	মেজবাহউদ্দীন আহমেদ
২৫।	সু / মে	আ. জব্বার পাটোয়ারী
২৬।	সুবেদার	আ. ওহাব
২৭।	"	মো. আ. শুকুর
২৮।	"	আ. করিম
২৯।	"	ওয়ালিউল্লাহ
৩০।	নায়েক / সুবেদার	শহীদ মোঃ আমানুল্লাহ
৩১।	"	মো. ইব্রাহিম
৩২।	নায়েক / সুবেদার	ভুলু মিয়া
৩৩।	"	শহীদ আ. ছালাম
৩৪।	"	এম.এ. মান্নান
৩৫।	"	আ. হক ভূঞা
৩৬।	"	শহীদ ইয়ার আহমেদ
৩৭।	"	আ. মালেক (প্রাক্তন ই পি আর)
৩৮।	"	শহীদ শহীদুল্লা ভূঞা
৩৯।	"	আবদুল হাশেম
৪০।	"	আ. হক
৪১।	"	শহীদ নুর আহমেদ গাজী
৪২।	"	শহীদ মো. আশরাফ আলী খান
৪৩।	"	শামসুল হক
৪৪।	"	জোনাব আলী
৪৫।	হাবিলদার	নুরুল হক
৪৬।	"	শহীদ আ. হালিম
৪৭।	"	শহীদ নুরুল ইসলাম
৪৮।	"	শহীদ রফিকুল ইসলাম
৪৯।	"	শহীদ রুহুল আমিন
৫০।	"	এম. আফজাল হোসেন
৫১।	"	শহীদ রাঙ্গা মিয়া
৫২।	"	শহীদ সাকিমুদ্দীন
৫৩।	"	শহীদ গোলাম রসুল
৫৪।	লে / হাবি.	তাহের
৫৫।	নায়েক	আফসার আলী
৫৬।	"	আ. হক
৫৭।	"	শহীদ মো. আ. মোতালেব
৫৮।	"	শহীদ নুরুজ্জামান
৫৯।	"	তৌহিদুল্লাহ
৬০।	"	আ. রহমান
৬১।	"	শহীদ মো. মহর আলী
৬২।	"	আ. খালেক (প্রাক্তন নৌ-বাহিনী)
৬৩।	"	আ. রব চৌধুরী (মৃত)
৬৪।	ল্যা./না.	মো. মোস্তফা (মৃত)
৬৫।	"	শহীদ সিরাজুল ইসলাম
৬৬।	"	আ. বারেক
৬৭।	"	আবুল কালাম আজাদ

www.pathagar.com

৬৮।	ল্যা./না.	শহীদ দেলোয়ার হোসেন
৬৯।	সিপাই	শহীদ তারাউদ্দীন
৭০।	"	আ. আজিজ
৭১।	"	শহীদ মো. সানাউল্লাহ
৭২।	"	গোলাম মোস্তফা (শহীদ)
৭৩।	"	শহীদ খন্দকার রেজানুর হোসেন
৭৪।	"	হায়দার আলী
৭৫।	"	শহীদ আবুল কালাম আজাদ
৭৬।	"	শহীদ জামালউদ্দীন
৭৭।	"	শহীদ আ. রহিম
৭৮।	"	শহীদ নুরুল ইসলাম ভূঞা
৭৯।	"	শহীদ আ. মান্নান
৮০।	"	শহীদ আলী আশরাফ
৮১।	"	শহীদ মজিবর রহমান
৮২।	"	আ. হক (৯ম ইস্ট বেঙ্গল)
৮৩।	"	শহীদ রমজান আলী (১০ম ঐ)
৮৪।	হাবিলদার	হেমায়েত উদ্দীন
৮৫।	মোজাহিদ	শহীদ নুরুল ইসলাম
৮৬।	"	আ. খালেক (৯ম ইস্ট বেঙ্গল)
৮৭।	"	শহীদ সিরাজুল হক
৮৮।	"	রিয়াজ উদ্দীন (মৃত)
৮৯।	"	ক্যাপ্টেন শহীদ মো. তমিজউদ্দীন
৯০।	আনসার	শহীদ এলাহী বক্স পাটোয়ারী
৯১।	সু. / মেজর	ফকরুদ্দিন আ. চৌধুরী
৯২।	সুবেদার	খন্দকার মতিউর রহমান
৯৩।	"	শহীদ মনিরুজ্জামান
৯৪।	না. / সুবেদার	সুলতান আহমেদ
৯৫।	"	সৈয়দ আমিরুজ্জামান
৯৬।	হাবিলদার	আ. হাকিম
৯৭।	"	শহীদ জামান মিয়া
৯৮।	"	আবদুস সালাম
৯৯।	"	নাজিমুদ্দিন
১০০।	"	ইউ. এক. ঘিং
১০১।	"	আনিস মোল্লাহ
১০২।	"	শহীদ কামরুজ্জামান খলিফা
১০৩।	"	আরব আলী

১০৪।	হাবিলদার	শহীদ মো. নুরুল ইসলাম
১০৫।	"	শহীদ তারিক উল্লাহ
১০৬।	"	শহীদ দেলোয়ার হোসেন
১০৭।	"	শহীদ আজিজুল হক
১০৮।	"	শহীদ মোজাফফর আহমেদ
১০৯।	"	শহীদ আবুল কাসেম
১১০।	নায়েক	শহীদ আবদুল মালেক
১১১।	"	শহীদ শাহ আলী
১১২।	ল্যা. নায়েক	শহীদ মফিজউদ্দিন আহমেদ
১১৩।	"	শহীদ জিল্লুর রহমান
১১৪।	"	শহীদ লিলুমিয়া
১১৫।	"	শহীদ মো. নিজামউদ্দিন
১১৬।	"	আবুল খায়ের
১১৭।	"	শহীদ আ. ছাত্তার
১১৮।	সিপাই	শহীদ আবুল বাসার
১১৯।	"	আবদুল মজিদ
১২০।	"	শহীদ আনসার আলী
১২১।	"	শহীদ মহম্মদ উল্লাহ
১২২।	"	শহীদ আতাহার আলী মল্লিক
১২৩।	"	আবদুল মোতালেব
১২৪।	"	শহীদ সেরাজ মিয়া
১২৫।	"	আবদুল আজিজ
১২৬।	"	মহাম্মদ মহসীন
১২৭।	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	এ.বি. আমিন উল্লাহ শেখ
১২৮।	"	এ.বি. শহীদ এম. এইচ. মোল্লাহ
১২৯।	"	এ.বি. শহীদ মহিবুল্লাহ
১৩০।	" আর.ই.এন.	শহীদ ফরিদউদ্দিন আহমেদ
১৩১।	"	আ. মালিক (সিম্যান)
১৩২।	"	এস.টি.ডব্লিউ. ডি-১ আবদুর রহমান
১৩৩।	"	সাবমেরিনার এ. ডব্লিউ. চৌধুরী
১৩৪।	"	এম.ই-১ শহীদ আ. রকিব মিয়া
১৩৫।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনী	সৈয়দ মনসুর আলী
১৩৬।	পুলিশ কন্সটেবল	শহীদ আ. মান্নান
১৩৭।	"	শহীদ তৌহিদ
১৩৮।	প্রাক্তন পি.এস.পি.	মাহবুবউদ্দিন আহমেদ
১৩৯।	গণ/মুক্তি বাহিনী	মো. শাহজাহান, নৌ-কমাণ্ডো

www.pathagar.com

১৪০।	গণ/মুক্তি বাহিনী	করিমুজ্জামান (শহীদ)
১৪১।	"	মায়া
১৪২।	"	আবুল কাসেম ভূঞা
১৪৩।	"	আবদুস সালাম
১৪৪।	"	আবদুস সবুর খান
১৪৫।	"	স্বপন
১৪৬।	"	কাজী কামালউদ্দীন
১৪৭।	"	মোহাম্মদ রুমি (শহীদ)
১৪৮।	"	জুয়েল (শহীদ)
১৪৯।	"	মোহাম্মদ ছাদি (শহীদ)
১৫০।	"	মো. আবুবকর
১৫১।	"	মো. শাহাবুদ্দীন (শহীদ)
১৫২।	"	মাহমুদ হোসেন (শহীদ)
১৫৩।	"	নীলমণি সরকার (শহীদ)
১৫৪।	"	জগৎ জ্যোতি দাস (শহীদ)
১৫৫।	"	সিরাজুল ইসলাম (শহীদ)
১৫৬।	"	ইয়ামিন চৌধুরী
১৫৭।	"	মতিউর রহমান
১৫৮।	"	আবদুস সামাদ (শহীদ) সাবসেক্টর
১৫৯।	"	এ.টি.এম. হামিদুল হোসাইন
১৬০।	"	অধ্যাপক মি. সিদ্দিক (শহীদ)
১৬১।	"	মো. ইদ্রিস আলী খান
১৬২।	"	মো. খালিদ সাইফুদ্দিন (শহীদ)
১৬৩।	"	এম. এ. মান্নান
১৬৪।	"	তৌফিক এলাহী চৌধুরী
১৬৫।	"	খিজির
১৬৬।	"	আলতাফ হোসাইন (শহীদ)
১৬৭।	"	মো. ইউসুফ
১৬৮।	"	মো. খুররাম (শহীদ)
১৬৯।	"	জালালউদ্দিন (শহীদ)
১৭০।	"	আমানুল্লাহ কবীর (শহীদ)
১৭১।	"	নুর ইসলাম
১৭২।	"	মো. শওকাত আলী সরকার
১৭৩।	"	মো. আবুল কালাম আজাদ
১৭৪।	"	মো. শাহজাহান
১৭৫।	"	মো. হাবিবুর রহমান

বীর প্রতীক

১।	ক্যাপ্টেন (অস্থায়ী লেঃ কর্নেল)	মো. আবদুল মতিন
২।	"	আবু তাহের সালাউদ্দীন
৩।	মেজর	মো. আবদুল মতিন
৪।	"	মো. মতিউর রহমান (ই. রে.)
৫।	"	এম. আইন উদ্দীন
৬।	" (অস্থায়ী লে. কর্নেল)	আকবর হোসেন
৭।	" " " "	মো. নজরুল হক
৮।	" " " "	মো. বজলুল গনি পাটোয়ারী
৯।	ক্যাপ্টেন	মো. আবদুর রশিদ
১০।	"	মো. শহীদুল ইসলাম
১১।	"	সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমেদ
১২।	"	আফতার আহমেদ
১৩।	"	মো. আনোয়ার হোসাইন
১৪।	"	দেলোয়ার হোসেন
১৫।	"	সিতারা বেগম
১৬।	লেফটেন্যান্ট	দিদারুল আলম
১৭।	"	এ.এম. রশিদ চৌধুরী
১৮।	"	সৈয়দ মো. ইব্রাহীম
১৯।	"	এম. হারুনুর রশীদ
২০।	"	ইবনে ফজল বদিউজ্জামান (শহীদ)
২১।	"	মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া
২২।	"	মো. হুমায়ুন কবির চৌধুরী
২৩।	"	মো. শফিকউল্লাহ, এ.ই.সি.
২৪।	২য় লেফটেন্যান্ট	কাজী মাজ্জদ আলী জহির
২৫।	"	মাহবুব আলম
২৬।	"	অলিককুমার গুপ্ত
২৭।	"	মমতাজ হাসান
২৮।	"	সৈয়দ আহমেদ
২৯।	"	কে. এম. আবুবকর
৩০।	"	মিজানুর রহমান মিঞা
৩১।	"	তাহের আহমেদ
৩২।	"	মনজুর আহমেদ
৩৩।	"	সামশুল আলম
৩৪।	"	জমিলউদ্দিন আহম্মদ

www.pathagar.com

৩৫।	২য় লেফটেন্যান্ট	ওয়াকার হোসাইন
৩৬।	"	মাসুদুর রহমান
৩৭।	"	জহিরুল হক খান
৩৮।	"	ওয়ালিউল ইসলাম
৩৯।	"	শওকত আলী
৪০।	"	মোদাসির হোসাইন খান
৪১।	"	রওশন ইয়াজদানি ভূঞা
৪২।	সাব-মেজর	মোহাম্মদ নূরুল হক
৪৩।	"	হারিস মিয়া
৪৪।	২য় লেফটেন্যান্ট	জাহাঙ্গীর ওসমান
৪৫।	সাব-মেজর	আবদুল মজিদ
৪৬।	"	মো. ইদ্রিছ মিঞা
৪৭।	"	নূরুল আজিম চৌধুরী
৪৮।	"	মো. আলী (৮ম ই. রে.)
৪৯।	সুবেদার	মো. আবদুল বসার (শহীদ)
৫০।	"	আবদুল জব্বার
৫১।	"	আলী নেওয়াজ
৫২।	"	মো. হাফিজ
৫৩।	"	জালাল আহমেদ
৫৪।	"	মো. সামসুল হক
৫৫।	"	আবদুল হাকিম
৫৬।	"	করম আলী হাওলাদার
৫৭।	"	বদিউর রহমান
৫৮।	"	আবদুল জব্বার
৫৯।	"	আবুল হাশেম
৬০।	"	চাঁদ মিঞা (২য় ই. রে.)
৬১।	"	এম. এ. মতিন চৌধুরী
৬২।	"	রছিব আলী
৬৩।	"	আফতাব হোসাইন
৬৪।	নায়েক সুবেদার	আবদুল লতিফ
৬৫।	"	আবুল হাশেম
৬৬।	"	মো. আবদুল মমিন (শহীদ)
৬৭।	"	আলতাফ হোসাইন খান
৬৮।	"	মো. নাজিমউদ্দীন
৬৯।	"	মো. হোসাইন
৭০।	"	মঙ্গল মিঞা
৭১।	নায়েক সুবেদার	আবদুল জব্বার খান
৭২।	"	কবির আহমেদ
৭৩।	"	মো. আবদুল কুদ্দুস
৭৪।	"	গিয়াস উদ্দীন
৭৫।	"	মো. রেজাউল হক
৭৬।	"	মনসুর আলী
৭৭।	"	আবদুল জব্বার
৭৮।	"	হোসাইন আলী তালুকদার
৭৯।	"	মুসলিম উদ্দীন (এসি-৮ ই. রে.)
৮০।	"	মুনির আহমেদ খান (১১ ই. রে.)
৮১।	"	কাজী মো. আকমল আলী
৮২।	"	আলী আকবর (৩য় ই. রে.)
৮৩।	"	আবুল কালাম (ঐ)
৮৪।	"	আবদুল হাই (১ম ঐ)
৮৫।	"	তোফায়েল আহমেদ (২য় ঐ)
৮৬।	হাবিলদার	সাইফুদ্দিন
৮৭।	"	রুহুল আমিন
৮৮।	"	আবদুল গফুর
৮৯।	"	আবদুস সোবাহান
৯০।	"	ওয়াজেদ আলী মিঞা
৯১।	"	সফিকুল ইসলাম
৯২।	"	আবদুল লতিফ
৯৩।	"	মোজাম্মেল হক
৯৪।	"	আবু তাহের
৯৫।	"	সিরাজ
৯৬।	"	আবদুল আওয়াল
৯৭।	"	মুনিরুল ইসলাম
৯৮।	"	মুসলেহউদ্দীন
৯৯।	"	আবদুল মালেক
১০০।	"	সাহেব মিয়া
১০১।	"	নুর মোহাম্মদ (শহীদ)
১০২।	"	মো. মকবুল হোসাইন (১ম ই. রে.)
১০৩।	"	মুনির আহমেদ (২য় ঐ)
১০৪।	"	মিজানুর রহমান (ঐ ঐ)
১০৫।	"	সোনা মিঞা (২য় ই. রে.)
১০৬।	নায়েক/ক্লার্ক	মো. বিলালউদ্দীন

www.pathagar.com

১০৭।	নায়েক	সাইদুল আলম
১০৮।	"	আবদুল ওহাব
১০৯।	"	শহীদুল্লাহ
১১০।	"	আবদুল বাতেন
১১১।	"	সিরাজুল হক (শহীদ)
১১২।	"	আবদুল নূর (শহীদ)
১১৩।	"	মো. নাসিরউদ্দীন
১১৪।	"	সিকান্দর আহমেদ
১১৫।	"	গোলাম মোস্তফা
১১৬।	"	আবুল কালাম
১১৭।	"	আবুল বশর
১১৮।	"	তাজুল ইসলাম
১১৯।	"	আবদুর রাজ্জাক
১২০।	"	আলিমুল ইসলাম
১২১।	ল্যান্স নায়েক	আলিমুল ইসলাম
১২২।	"	মতিউর রহমান
১২৩।	"	শাহাবুদ্দীন (শহীদ)
১২৪।	"	শাহ্ জালাল আহমেদ
১২৫।	"	আলি আহমেদ
১২৬।	"	আবদুল মান্নান
১২৭।	"	মো. ইদ্রিছ
১২৮।	সিপাই	আবদুল মান্নান
১২৯।	"	বসীর আহমেদ
১৩০।	"	আবুল হাশেম
১৩১।	"	আবদুল বাতেন
১৩২।	"	আবদুল খালেক
১৩৩।	"	আবদুল মজিদ
১৩৪।	"	মো. আমিন উল্লাহ
১৩৫।	"	গোলাম মোস্তফা
১৩৬।	"	মোহাম্মদ সিদ্দিক
১৩৭।	"	এ.বি.এম. ফয়সুল আলম
১৩৮।	"	মো. ইসমাইল (শহীদ)
১৩৯।	"	খলিলুর রহমান
১৪০।	"	মো. মোস্তফা
১৪১।	"	আবদুল ওয়াহিদ
১৪২।	"	ফারুক আহমেদ পাটোয়ারী
১৪৩।	সিপাই	এনামুল হক
১৪৪।	"	মো. এজাজুল হক খান
১৪৫।	"	আসাদ মিঞা (৮ম ই. রে.)
১৪৬।	"	দেলোয়ার হোসাইন (৯ম ঐ)
১৪৭।	"	আবদুল কাদের (ঐ ঐ)
১৪৮।	"	(শহীদ) আবদুল বাসেত (ঐ ঐ)
১৪৯।	"	(শহীদ)কাজী মোরশেদুল আলম
১৫০।	"	আবদুল কুদ্দুস (শহীদ)
১৫১।	"	আবু মুসলিম
১৫২।	"	রফিকুল ইসলাম
১৫৩।	"	শহীদ বজলু মিয়া
১৫৪।	"	কামালউদ্দিন
১৫৫।	"	শহীদ আমির হোসেন
১৫৬।	"	শহীদ মো. ইসহাক
১৫৭।	"	বাদশা মিয়া (১০ম ই. রে.)
১৫৮।	"	হারুনর রশীদ
১৫৯।	মুজাহিদ	আজিজুল হক
১৬০।	"	মোশারফ হোসেন বেঙ্গল
১৬১।	"	জুলফু মিয়া (৯ম ই. রে.)
১৬২।	"	শহীদ আ. কুদ্দুস গাজী
১৬৩।	"	শহীদ ওয়ালিল হাসান
১৬৪।	"	শহীদ সেরাজুল ইসলাম
১৬৫।	"	আলী আকবর
১৬৬।	"	বাচ্চু মিয়া (৪র্থ ই. রে.)
১৬৭।	"	শহীদ আবদুস সালাম
১৬৮।	প্রাক্তন ই.পি. আর. সুবেদার মেজর	ওসমান গণী
১৬৯।	"	মুজাফফর আহমদ
১৭০।	"	তোবারক উল্লাহ
১৭১।	"	আ. জলিল সিকদার
১৭২।	সুবেদার	খায়রুল বাসার
১৭৩।	"	হাসানউদ্দিন আহমদ
১৭৪।	"	গোলাম মোস্তফা
১৭৫।	"	আহমেদ হোসেন
১৭৬।	"	আবদুল মালেক
১৭৭।	"	গোলাম হোসেন

www.pathagar.com

১৭৮।	সুবেদার	মোজাহারুল হক	২১৪।	নায়েক	শহীদ মো. লোকমান
১৭৯।	"	খুরশীদ আলম	২১৫।	"	মো. আবদুল মান্নান খান
১৮০।	"	মো. আবদুল গণী	২১৬।	"	আবদুল ওয়াহিদ
১৮১।	নায়েক সুবেদার	এস. এ. সিদ্দিক	২১৭।	"	সফিকউদ্দিন আহমেদ
১৮২।	"	আহসান উল্লাহ	২১৮।	"	নজরুল ইসলাম
১৮৩।	"	শেখ সুলেমান	২১৯।	"	আতাহার আলী
১৮৪।	"	আইনুদ্দিন আহম্মদ	২২০।	"	আহম্মদুর রহমান
১৮৫।	"	আ. রৌফ মজুমদার	২২১।	"	আবদুল মালেক
১৮৬।	"	মোহাম্মদ মিয়া ওদয়ান	২২২।	"	জাকির হোসেন
১৮৭।	"	আবদুল মালেক চৌধুরী	২২৩।	"	মোতাহার আলী
১৮৮।	"	নুরুল হুদা	২২৪।	"	শহীদ রসিদ আলী
১৮৯।	"	মকবুল আলী	২২৫।	"	আবদুল ওয়াজেদ
১৯০।	হাবিলদার	মমতাজ মিয়া	২২৬।	"	হাবিবুর রহমান
১৯১।	"	মালু মিয়া	২২৭।	"	তোফায়েল আহমেদ
১৯২।	"	আবু তাহের	২২৮।	"	দুদু মিয়া
১৯৩।	"	মহম্মদ ইব্রাহিম	২২৯।	"	আলী আকবর
১৯৪।	"	মোবারক হোসেন	২৩০।	"	আতাউর রহমান (১ম ই. রে)
১৯৫।	"	আবদুল হালিম	২৩১।	"	আবদুল হক (ঐ ঐ)
১৯৬।	"	সৈয়দ আলী	২৩২।	"	সফিকুর রহমান (ঐ ঐ)
১৯৭।	"	আবদুর রৌফ সরিফ	২৩৩।	"	দেলোয়ার হোসেন
১৯৮।	"	আবদুল হাসেম	২৩৪।	"	দেলয়ার হোসেন
১৯৯।	"	আবদুল হামিদ	২৩৫।	"	মফিজুর রহমান
২০০।	"	আবদুল আওয়াল	২৩৬।	"	নান্নু মিয়া
২০১।	ই পি আর হাবিলদার	আজিজুর রহমান	২৩৭।	"	মোস্তফা কামাল
২০২।	"	ফজলুল হক	২৩৮।	"	গাজী আ. ওয়াহিদ
২০৩।	"	ওয়াজিউল্লাহ	২৩৯।	"	কোরবান উদ্দিন
২০৪।	"	লুৎফর রহমান	২৪০।	"	আবদুল জব্বার
২০৫।	"	আবদুর রহমান	২৪১।	"	সিরাজুল ইসলাম (ই. রে.)
২০৬।	"	ওয়াহিদুর রহমান	২৪২।	"	রবিউল্লাহ (ঐ)
২০৭।	"	আসাদ আলী	২৪৩।	ল্যান্স নায়েক	তাজুল ইসলাম (ঐ)
২০৮।	"	আবদুর রশীদ	২৪৪।	"	ইউসুপ আলী (ঐ)
২০৯।	"	আবুল হোসেন	২৪৫।	"	আ. রহমান (মরণোত্তর) (ঐ)
২১০।	"	শহীদ আবদুল গফফার	২৪৬।	"	আবদুল হাই (ঐ) (ঐ)
২১১।	"	কাজেম আলী হাওলাদার	২৪৭।	সিপাই	মো. মালন খান
২১২।	নায়েক	মো. ইয়াকুব আলী	২৪৮।	"	মো. শাহজাহান
২১৩।	"	সায়েদুল হক	২৪৯।	"	সামসুল হক

www.pathagar.com

২৫০।	সিপাই	শহীদ রবিউল হক	২৮৪।	সার্জেন্ট	সৈয়দ রফিকুল ইসলাম
২৫১।	"	শহীদ মো. শরিফ	২৮৫।	করপোরাল	জয়নাল আবেদীন
২৫২।	"	শহীদ নুরুল হক	২৮৬।	"	আলী আসরাফ
২৫৩।	"	শহীদ গুল মহম্মদ ভূঞা	২৮৭।	"	নজরুল ইসলাম
২৫৪।	"	আবদুল মান্নান	২৮৮।	"	শেখ আজিজুর রহমান
২৫৫।	"	ইলিয়াসুর রহমান	২৮৯।	"	রেজওয়ান আলী
২৫৬।	"	আবদুল জলিল	২৯০।	"	হেলালউজ্জামান
২৫৭।	"	সাজিদুর রহমান	২৯১।	"	রতন শরীফ
২৫৮।	"	ফারুক লস্কর	২৯২।	পুলিশ কনস্টেবল	মো. সুলাইমান
২৫৯।	"	শহীদ আ. মালেক	২৯৩।	"	শহীদ নিজামুদ্দিন
২৬০।	"	জাহাঙ্গীর হোসেন	মুক্তিবাহিনী সেক্টর-১		
২৬১।	"	বাচ্চু মিয়া	২৯৪।	নৌ কমাণ্ডো	ফারুক-ই-আজম
২৬২।	"	আ. ওয়াহাব	২৯৫।	"	মো. খোরসেদ আলম
২৬৩।	সিগনালম্যান	শহীদ আবুল হাসেম	২৯৬।	"	মো. নুরুল হক
২৬৪।	সিপাই	আলী আকবর	২৯৭।	"	মো. আমির হোসেন
২৬৫।	"	আবু সালেক (৯ম ই. রে)	২৯৮।	"	এস. এম. মওলা
২৬৬।	"	হযরত আলী (১ম ঐ)	২৯৯।	ইঞ্জিনিয়ার	এ. কে. এম. ইসলাম
২৬৭।	"	আশরাফ আলী খান (ঐ ঐ)	৩০০।	নৌ-কমাণ্ডো	শহীদ মো. হোসেন
৩৬৮।	"	তরিকুল ইসলাম	মুক্তিবাহিনী সেক্টর-২		
২৬৯।	"	সালেহ উদ্দিন	৩০১।	নৌ-কমাণ্ডো	মো. মতিউর রহমান
২৭০।	"	সাইয়দুর রহমান	৩০২।	"	মো. শাহজাহান কবীর
২৭১।	মুক্তি বাহিনী	মোঃ ইদরিস	৩০৩।	"	মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী
২৭২।	নৌ-বাহিনী এম ই আই	নজরুল ইসলাম	৩০৪।	প্রাক্তন ক্যা. পিআইএ	শাহজাহান কবীর
২৭৩।	চিফ আর ই এ	মো. রহমত উল্লাহ	৩০৫।	"	কাজী আ. ছাত্তার
২৭৪।	এ বি	মো. আবদুল হাকিম	৩০৬।	"	আবদুল মুকিত
২৭৫।	বি ও আর এস	আবদুল আওয়াল সরকার	৩০৭।	মুক্তি/গণবাহিনী	গিয়াসউদ্দিন
২৭৬।	এল টি ও	মোফাজ্জল হোসেন	৩০৮।	"	মহম্মদ গাজী
২৭৭।	-	এ.এস. ভূইয়া	৩০৯।	"	দুলাল
২৭৮।	এম ই আই	আহসান উল্লাহ	৩১০।	"	জয়নুল
২৭৯।	বিমান বাহিনী স্কোয়ার্ডন লিডার	এম. সদরউদ্দিন (এয়ার ভাইস মার্শাল অবঃ)	৩১১।	"	মহম্মদ জিয়া
			৩১২।	"	মহম্মদ জাকির
২৮০।	"	এম. হামিদউল্লাহ খান (উইং কমাণ্ডার)	৩১৩।	"	মহম্মদ
			৩১৪।	"	মান্নান
২৮১।	সার্জেন্ট	সহিদউল্লাহ	৩১৫।	"	হাবিবুল আলম
২৮২।	করপোরাল	মি. হক	৩১৬।	"	এ.এম. মো. ইসহাক
২৮৩।	এ এ সি	রুস্তম আলী	৩১৭।	"	ডব্লিউ.এ. এস. ওয়াডারল্যাণ্ড

www.pathagar.com

৩১৮।	গণ/মুক্তিবাহিনী	মো. আ. আজিজ	৩৫৪।	গণ/মুক্তিবাহিনী সেক্টর-৫	সিরাজুল ইসলাম
৩১৯।	"	শহীদ খায়রুল	৩৫৫।	"	আবদুল মজিদ
৩২০।	"	শহীদ সেলিম	৩৫৬।	"	ফখরুদ্দিন চৌধুরী
৩২১।	"	শহীদ মো. বাকাই	৩৫৭।	"	এম.এ. ইসলাম
৩২২।	"	মোজাম্মেল হক	৩৫৮।	"	ইনামুল হক চৌধুরী
৩২৩।	"	শহীদ নায়েব মিয়া	৩৫৯।	"	মো. ইদ্রিস
৩২৪।	"	শহীদ মানিক	৩৬০।	"	মোহাম্মদ বদরুজ্জামান
৩২৫।	"	সামসুল হক	৩৬১।	"	হারিছউদ্দিন সরকার
৩২৬।	"	আনোয়ার হোসেন	৩৬২।	"	আবদুল হাই
৩২৭।	"	শহীদ আলমগীর করিম	৩৬৩।	গণ/মুক্তিবাহিনী সেক্টর-৬	এম. এ. সরকার
৩২৮।	"	শহীদ মোমিন	৩৬৪।	গণ/মুক্তিবাহিনী সেক্টর-৭	এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান
৩২৯।	"	শহীদ আবুল হোসেন	৩৬৫।	"	মহসীন আলী সরদার
৩৩০।	"	শহীদ মো. সহিদউল্লাহ	৩৬৬।	"	মহাম্মদ আজাদ আলী
৩৩১।	"	শহীদ নুরুল হক	৩৬৭।	"	মো. নুর হাসিম
৩৩২।	"	রফিকুল ইসলাম	৩৬৮।	"	বদিউজ্জামান
৩৩৩।	"	মমিনুল হক ভূইয়া	৩৬৯।	গণ/মুক্তিবাহিনী সেক্টর-৮	গোলাম আজাদ
৩৩৪।	"	মোহাম্মদ ইব্রাহিম	৩৭০।	"	মো. সরদার উদ্দিন আহম্মদ (শহীদ)
৩৩৫।	"	সেরাজউদ্দিন আহমদ	৩৭১।	"	শহীদ আবদুর রহীম
৩৩৬।	"	মো. তৈয়ব আলী	৩৭২।	"	শহীদ নাছির উদ্দিন
৩৩৭।	"	আ. সামাদ	৩৭৩।	"	শহীদ হাবিবুর রহমান
৩৩৮।	"	বাহের	৩৭৪।	"	শহীদ নজরুল ইসলাম
৩৩৯।	"	জামাল	৩৭৫।	"	শহীদ হারুনুর রশীদ
৩৪০।	"	মহাম্মদ আশরাফ	৩৭৬।	"	আবদুল মালেক
৩৪১।	"	আবদুস ছালাম	৩৭৭।	"	হাজারী লাল তরফদার
৩৪২।	"	রফিকুল হক	৩৭৮।	"	শহীদ শামসুদ্দিন আহম্মদ
৩৪৩।	"	নুরুল ইসলাম খান পাঠান	৩৭৯।	"	ইসহাক হোসেন
৩৪৪।	"	শাহ জামান মজুমদার	৩৮০।	"	শহীদ কে. এম. রফিকুল ইসলাম
৩৪৫।	"	এ কে এম সিরাজউদ্দিন	৩৮১।	"	শহীদ দিদার আলী
৩৪৬।	গণ/মুক্তিবাহিনী সেক্টর-৩	শহীদ মাহফুজুর রহমান	৩৮২।	"	মুহাম্মদ গোলাম ইয়াকুব
৩৪৭।	"	আমীর হোসেন	৩৮৩।	"	আবদুল আলীম
৩৪৮।	গণ/মুক্তিবাহিনী সেক্টর-৪	মফিজুল ইসলাম	৩৮৪।	"	কুদ্দুস মোল্লাহ
৩৪৯।	"	এ. কে. এম. আতিরুল ইসলাম	৩৮৫।	"	আনোয়ার হোসেন
৩৫০।	"	আশরাফুল হক	৩৮৬।	গণ/মুক্তিবাহিনী সেক্টর-৯	রফিকুল আহসান
৩৫১।	"	মাহবুবুর রহমান সাদী	৩৮৭।	"	কে. এস. এ. মহিউদ্দিন (মানিক)
৩৫২।	"	শহীদ রফিকউদ্দিন	৩৮৮।	"	রফিকুল ইসলাম
৩৫৩।	"	শহীদ নুরুদ্দিন আহম্মদ	৩৮৯।	"	দেবদাস বিশ্বাস (খোকন)

www.pathagar.com

৩৯০।	গণ/মুক্তিবাহিনী সেক্টর-১১	এ. টি. এম. খালেদ
৩৯১।	"	জহিরুল হক মুন্সী
৩৯২।	"	মুহাম্মদ আনিছুর রহমান (সঞ্জু)
৩৯৩।	"	আবদুল হামিদ
৩৯৪।	"	মোছাম্মৎ তারামন বিবি
৩৯৫।	"	ভূঁইয়া
৩৯৬।	"	নুর ইসলাম
৩৯৭।	"	বশির আহম্মদ
৩৯৮।	"	আনিছুল হক আখন্দ
৩৯৯।	"	মতিয়ার রহমান
৪০০।	"	জহরুল হক মুন্সী
৪০১।	"	আবুল কালাম
৪০২।	"	মুহাম্মদ মাহবুব ইলাহী
৪০৩।	"	এ. টি. এম. খালেদ
৪০৪।	"	মুহাম্মদ নুরুল হক
৪০৫।	"	আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
৪০৬।	"	বাশার
৪০৭।	"	সৈয়দ সদরুজ্জামান
৪০৮।	"	বেলাল হোসেন
৪০৯।	"	মুহাম্মদ এনায়েত হোসেন
৪১০।	"	ওয়ারেছাত হোসেন
৪১১।	"	সাখাওয়াৎ হোসেন
৪১২।	"	মুহা. মিজানুর রহমান খান
৪১৩।	"	মো. হাবিবুর রহমান তালুকদার (খোকা)
৪১৪।	"	খোরশেদ আলম তালুকদার
৪১৫।	"	ফজলুল হক
৪১৬।	"	আবদুল গফুর
৪১৭।	"	মুহা. আবদুল্লাহ
৪১৮।	"	আবদুল হাকিম
৪১৯।	"	সৈয়দ গোলাম মোস্তফা
৪২০।	"	আনোয়ার হোসেন
৪২১।	"	ছায়েদুর রহমান
৪২২।	"	হামিদুল হক ভাসানী
৪২৩।	"	ফুল
৪২৪।	"	মুহাম্মদ খসরু মিঞা
৪২৫।	"	শহীদ ইসলাম
৪২৬।	"	আনিছুর রহমান

(বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত গেজেট থেকে সংগৃহীত)

হা. র.

বুখারি (র.), ইমাম [৮১০—৮৭০]

ইমাম বুখারি (র.)-র প্রকৃত নাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ। পিতার নাম ইসমাইল। মধ্য এশিয়ার বুখারায় জন্ম বলে তাঁর নামের শেষে 'বুখারি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাঁর জন্ম ৮১০ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখে। বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র)-র বাণী বা হাদিস (দ্র) সংগ্রহ ও সঙ্কলনের ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

জানা যায়, বাল্যকাল থেকেই বুখারি (র.) অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ছ' বছর, তখনই তিনি সমস্ত কুরআন শরীফ (দ্র) মুখস্থ করে ফেলেন এবং এগারো বছর বয়স থেকে হাদিস, অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি হাদিস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে হাদিস সংগ্রহ ও সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করেন এবং তাঁর সঙ্কলনে স্থান দেন। বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতার কারণে তাঁর সঙ্কলিত হাদিসগ্রন্থ 'সহীহ্ বুখারি'কে পবিত্র কুরআনের পরেই স্থান দেওয়া হয়।

জানা যায়, ইমাম বুখারি (র.) দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন। এর মধ্য থেকে তিনি ৭ হাজার ২ শত ৭৫টি হাদিস বাছাই করে 'আল-জামি-উস্ সহীহ্' নামক সঙ্কলনে লিপিবদ্ধ করেন—আমাদের দেশে যা 'সহীহ্ বুখারি' নামেই পরিচিত, ব্যাপকভাবে পঠিত ও নন্দিত। সঙ্কলনটি ও. উদা (O. Houdas) এবং মার্স্যা (Marcais) কর্তৃক 'El Bokhari, les tradition islamiques (এল্ বোখারি, লে ত্রাদিসিওঁ ইসলামিক্) শিরোনামে ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয় এবং প্যারিস থেকে ১৯০৩ সালে চার খণ্ডে বের হয়।

৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট ইমাম বুখারি (র.) ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

বুড়িগঙ্গা নদী, বাংলাদেশের দ্র

www.pathagar.com

মহাকাশ

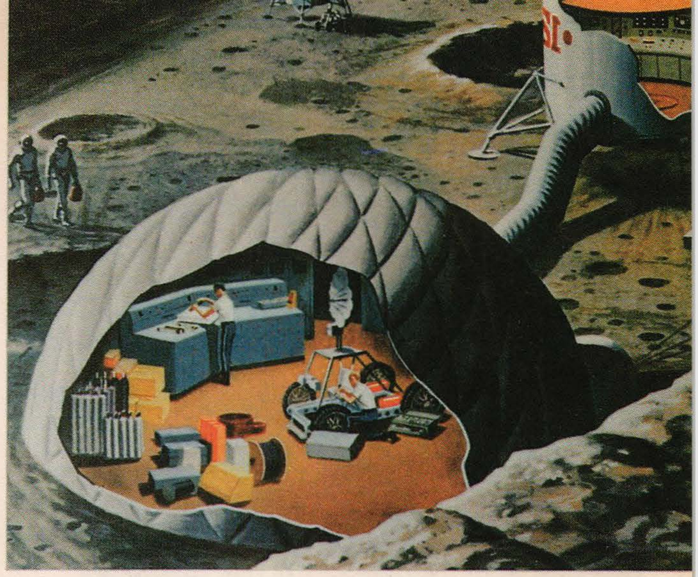

চাঁদে মোলাব পরীক্ষাগারের
ধারণা (আঁকা ছবি)

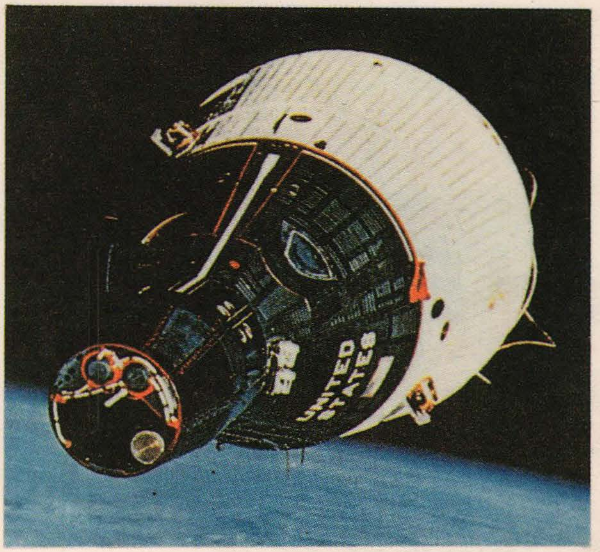

উপরে: মহাশূন্যযান জেমিনি-৭। নিচে: বিভিন্ন রকম মোটর গাড়ি। বাঁ পাশে: চাঁদ থেকে তোলা পৃথিবী। ডান পাশে: মহাশূন্যে ভাসমান নভোচারী

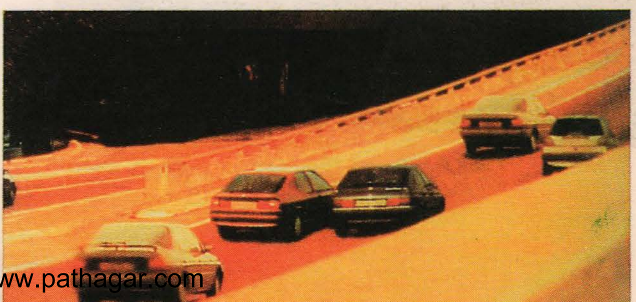

www.pathagar.com

প্রাচীন ফিনিসীয় এবং সুমেরীয় সভ্যতার অঞ্চল

মেসোপটেমীয় শিল্পকর্ম

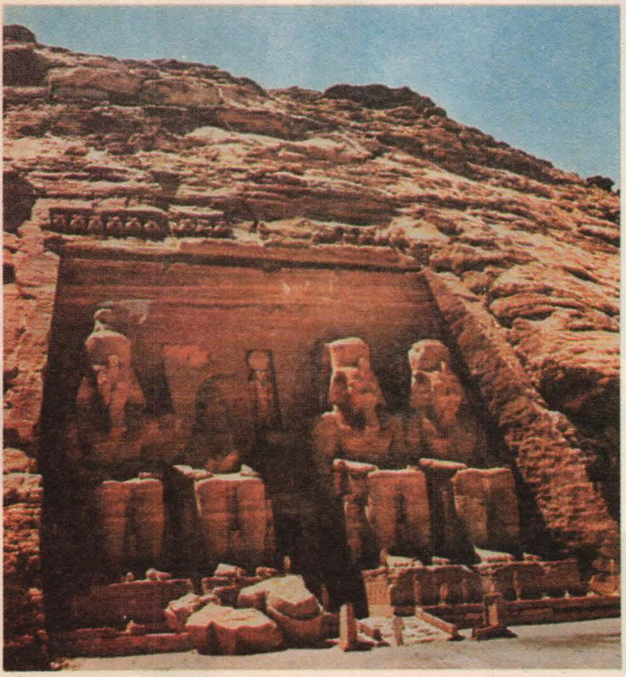
মিশরীয় শিল্পকর্ম

গ্রিক মৃৎপাত্র অ্যাম্পোরা

www.pathagar.com

শিল্পী আলফ্রে সিস্‌লির আঁকা ছবি (ফরাসি চিত্রকলা)

শিল্পী পিসারোর আঁকা ছবি

উপরে : শিল্পী ক্লোদ্‌ মনের ছবি: ইম্প্রেশন সানরাইজ
নিচে: বাইজান্টাইন আইকন

উপরে: শিল্পী রদ্যাঁর ভাস্কর্য
নিচে: ক্রুশবিদ্ধ যিশু (একটি শিল্পকর্ম)

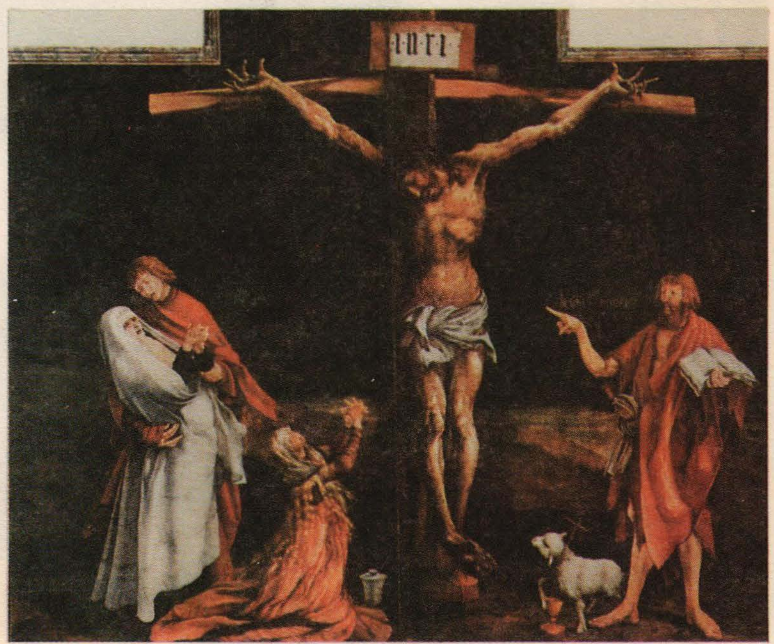

www.pathagar.com

মিনিয়েচার— বাংলা পুঁথির ছবি

মিনিয়েচার—মোগল চিত্র

শাপলা ফুল

www.pathagar.com

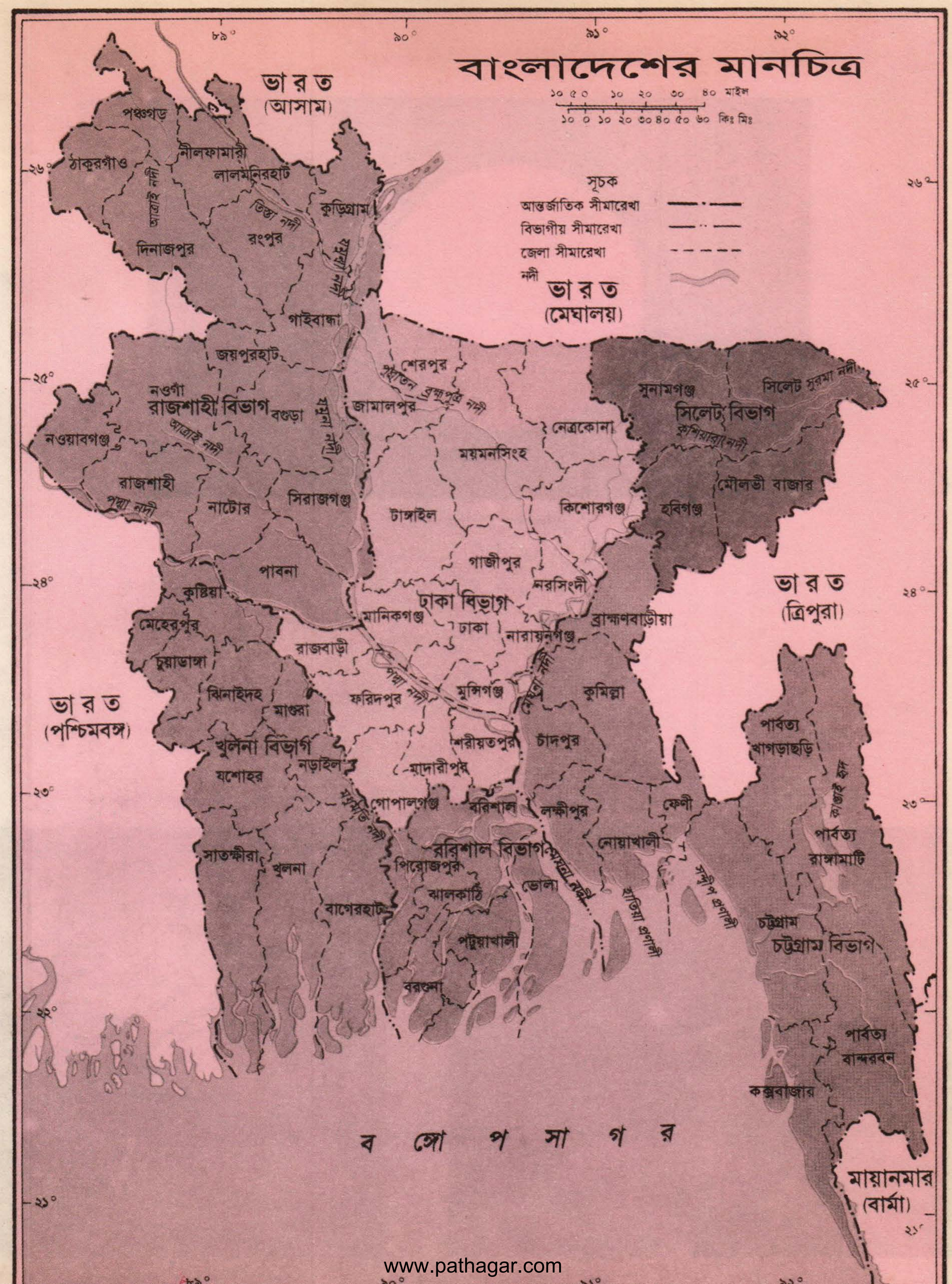

www.pathagar.com

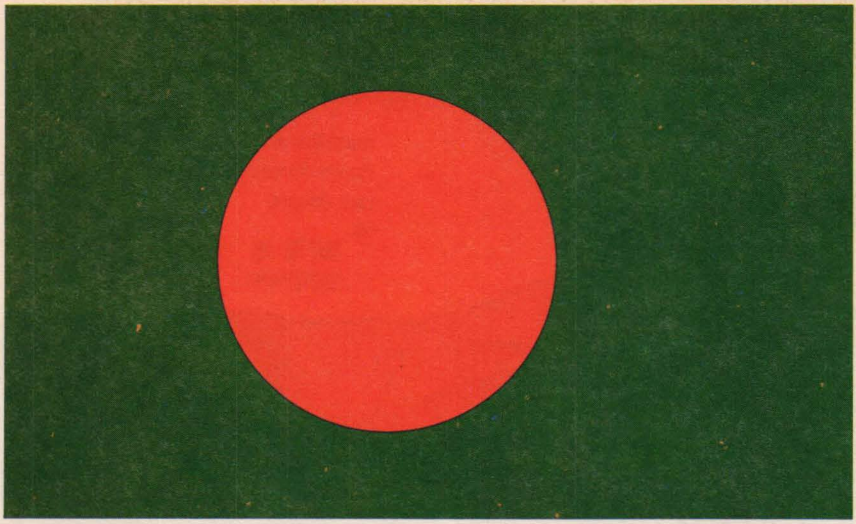

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল

বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

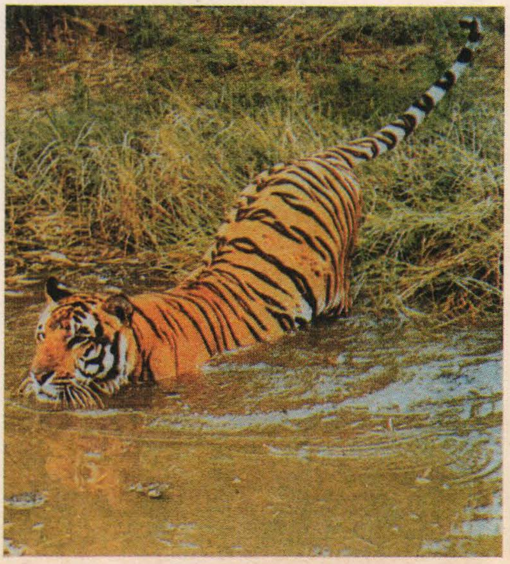

www.pathagar.com

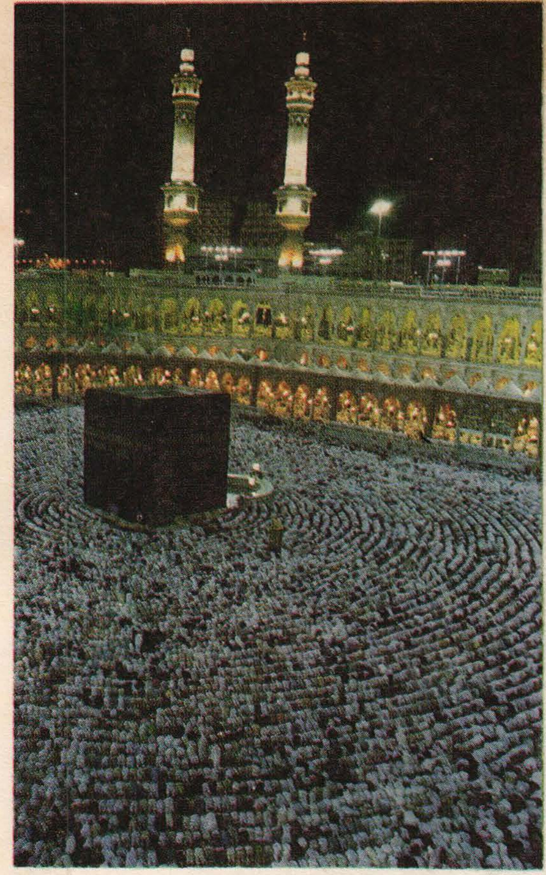

পবিত্র কাবা শরীফ

মৃৎশিল্পের প্রাচীন নিদর্শন

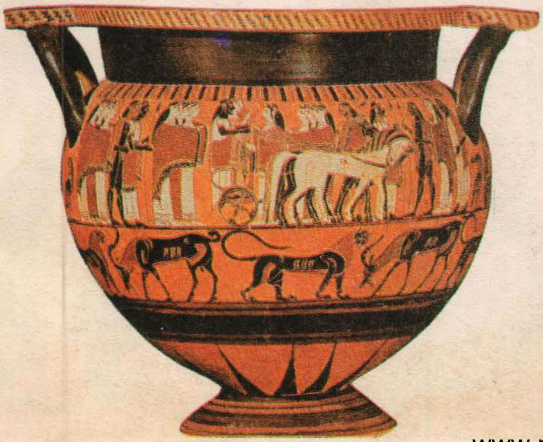

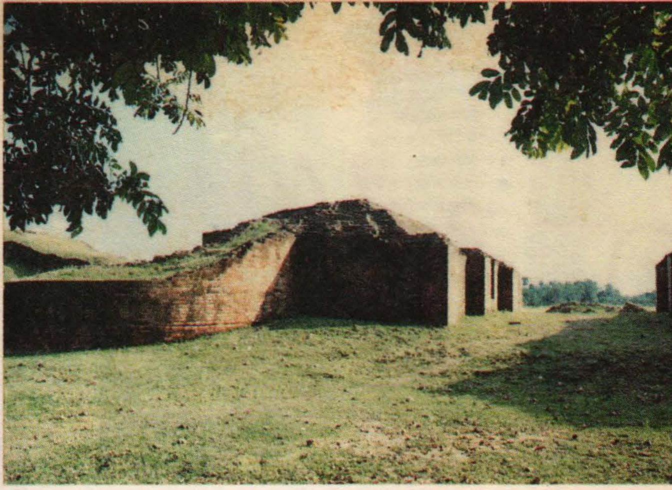

মহাস্থানগড়

উপরে: ময়নামতি। নিচে: বিশ্বশিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ব্যস্ততম এলাকা

বাজপাখি

উপরে: বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার। নিচে: বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ শিকার করে এনে কূলে তোলার দৃশ্য

প্রাচীন মৃৎফলক

www.pathagar.com

বুদ্ধ / বুদ্ধদেব গৌতম বুদ্ধ দ্র

বুদ্ধদেব বসু [১৯০৮—১৯৭৪]

রবীন্দ্রোত্তর কালের অন্যতম প্রধান কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, অনুবাদক ও সম্পাদক। জন্ম ১৯০৮ সালে, কুমিল্লা শহরে। পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ঢাকা (দ্র) জেলার বিক্রমপুরে হলেও তাঁর শৈশব ও কৈশোরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় নোয়াখালিতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। এখানে অধ্যয়নকালেই তিনি সতীর্থ কবি অজিত দত্তের সহযোগে প্রকাশ করেন 'প্রগতি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা। অচিরেই কলিকাতার (দ্র) 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং ১৯৩১ সালে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় চলে গেলে সেই সম্পর্ক হয় আরো ঘনিষ্ঠ ও প্রসারিত।

বুদ্ধদেব বসু ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতার রিপন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৫ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কবিতা' নামে কবিতা সম্পর্কিত একটি সমৃদ্ধ সাময়িকী। আধুনিক বাংলা কবিতার দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় এই পত্রিকার অবদান অপরিসীম। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষকতা করেন। দেশে ফিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবেও শিক্ষকতা করেন।

বুদ্ধদেব বসু প্রধানত কবি হিসাবে খ্যাত হলেও তাঁর গদ্যভঙ্গিও বিশিষ্টতার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) পরে সাহিত্যের সব শাখাতেই অঙ্গুলিমেয় যে ক'জন সাধনা করেছেন, বুদ্ধদেব বসু নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম।

তিনি বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে প্রায় দেড় শতাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম : 'বন্দীর বন্দনা' (কবিতা), 'কঙ্কাবতী' (কবিতা), 'তিথিডোর' (উপন্যাস), 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' (কাব্যনাটক), 'কালের পুতুল' (প্রবন্ধ), 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' (অনুবাদ), 'কালিদাসের মেঘদূত' (অনুবাদ), 'কবি রবীন্দ্রনাথ' (প্রবন্ধ) ও 'হাউই' (অনুবাদ)। বুদ্ধদেব বসু ১৯৭৪ সালে কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

বুদ্ধপূর্ণিমা

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ (দ্র) খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে রাজপ্রাসাদের বাইরে নেপালের (দ্র) লুম্বিনী-কাননে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে আরেকটি বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে গয়ার উরুবেলার অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করে তিনি বুদ্ধত্ব বা জ্ঞান লাভ করেন। এ জন্য এই পূর্ণিমার নাম হয় বুদ্ধ পূর্ণিমা। যে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে তিনি জ্ঞান লাভ করেন, সেই বৃক্ষের নাম হয় বোধিবৃক্ষ বা বোধিদ্রুম (দ্র)। ৮০ বছর বয়সে খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে কুশিনারার মল্লদের

শালবনে আরেক বুদ্ধ পূর্ণিমা-রাতের তৃতীয় প্রহরে গৌতম বুদ্ধ পরিনির্বাণ (দ্র) লাভ (মৃত্যুবরণ) করেন। জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণ লাভ একই পূর্ণিমায় ঘটেছিল বলে বুদ্ধ পূর্ণিমার তাৎপর্য খুব গভীর। এ জন্য বুদ্ধ পূর্ণিমা পবিত্র ও করুণাময় তিথি হিসাবে পরিচিত।

বি. ব.

বুদ্ধাব্দ অব্দ দ্র

www.pathagar.com

বুদ্ধি (intelligence)

বুদ্ধি একটি বিমূর্ত ধারণা। একে ধরাছোঁয়া যায় না, দাঁড়িপাল্লায় মাপা যায় না। এ জন্য এর সহজ কোনো সংজ্ঞা দেওয়াও কঠিন। তবে বেশির ভাগ পণ্ডিতের মতে বুদ্ধি হচ্ছে শেখার ক্ষমতা এবং তার সাহায্যে নতুন পরিস্থিতি কিংবা সমস্যা সমাধান করার এবং বিমূর্ত চিন্তা করার সামর্থ্য।

নানাভাবে বুদ্ধি মাপজোখের চেষ্টা করা হয়েছে। আজ থেকে এক শ' বছর আগে গালটন (Sir Francis Galton: 1822-1911) মানুষের মাথার আকার দেখে বুদ্ধি মাপার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সার্থক হয় নি। আজকাল মগজের বৈদ্যুতিক কর্মতৎপরতা ইইজি (Electroencephalography) যন্ত্রে মেপে বুদ্ধির হিসাব করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আই. কিউ. (দ্র) পরীক্ষাই বুদ্ধি মাপার জন্য সকলের নিকট মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। বর্তমান শতকের শুরুর দিকে, ১৯০৪ সালে আলফ্রে বিনে (Alfred Binet) এবং তেওদোর সিমঁ (Théodore Simon) কাদের লেখাপড়া শেখালে কাজে লাগবে তা বের করার জন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদির প্রায় তিরিশ রকম পরীক্ষা করেন এবং কোন বয়সের ছেলেমেয়েদের নিকট থেকে কতটুকু বুদ্ধি আশা করা যায় তা হিসাব করেন। এর নাম দেওয়া হয় মানসিক বয়স। মানসিক বয়স এবং আসল বয়সের শতকরা হারকে বুদ্ধ্যঙ্ক (intelligence quotient) বা আই. কিউ. বলা হয়।

মানুষের বুদ্ধি বংশগতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। এ দুটোর মধ্যে কোনটির অবদান কতটুকু তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। দেখা গেছে, দত্তক নেওয়া শিশুর বুদ্ধির মান পালক পিতামাতার চেয়ে তার আসল পিতামাতার .বুদ্ধির মানের কাছাকাছি। আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর আই. কিউ. কম হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি শুধু বংশগতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়, এতে পুষ্টি ও পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। উপযুক্ত চর্চা ও পরিশ্রম বুদ্ধির সর্বোচ্চ বিকাশ ও প্রয়োগে সাহায্য করে।

সা.এ.

বুদ্ধিমান মানব হোমো সেপিয়ান্স্ দ্র

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'—এই প্রত্যয়কে আশ্রয় করে 'বুদ্ধির মুক্তি' নামক সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন সক্রিয় ছিল। এর সূচনা হয়েছিল ঢাকায় (দ্র)। এই আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষাবিদ আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ (দ্র), কবি আবদুল কাদির (দ্র), সাহিত্যিক আবুল ফজল (দ্র), কাজী মোতাহার হোসেন (দ্র), খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, আনোয়ার হোসেন ও আবু যোহা নূর আহমদের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিবৃন্দ।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন যে সংগঠনকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, তার নাম ছিল 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' (দ্র)। এই সংগঠন আয়োজিত সভা-সমাবেশে যেসব প্রবন্ধ ও রচনা পড়া হত, সেগুলোই সাধারণত প্রকাশ করা হত এর মুখপত্র 'শিখা'য় (দ্র)। পরবর্তী কালে এই মুখপত্রের লেখকবৃন্দ 'শিখা গোষ্ঠী'র লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। 'শিখা'র আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র পাঁচ বছর (১৯২৭-১৯৩১)।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন সম্পর্কে এর প্রধানতম প্রাণপুরুষ কাজী আবদুল ওদুদের বক্তব্য ছিল : ··'বুদ্ধির মুক্তি'··· এই মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে—কামাল আতাতুর্কের (দ্র) কাছ থেকে, রামমোহন (দ্র), রবীন্দ্রনাথ (স.) (দ্র) ও জাঁ ক্রিস্তোফের লেখক রম্যাঁ রলাঁর (দ্র) কাছ থেকে, পারসিক কবি সাদির (দ্র) কাছ থেকে আর হযরত মুহম্মদের (স.) (দ্র) কাছ থেকে।

তবে এই আন্দোলনকারীদের যাত্রাপথ বাধামুক্ত ছিল না। সমাজের একটি প্রভাবশালী মহলের কাছ থেকে তাঁদের উপর্যুপরি নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁদের উচ্চারিত উদার বক্তব্যের জন্য তাঁদের শিকার হতে হয়েছিল চরম সাম্প্রদায়িক ও অযৌক্তিক অপপ্রচারের, জোরপূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের সভার কার্যক্রম। শুধু তাই নয়, রক্ষণশীলদের আয়োজিত সভায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে তাঁদের কাউকে কাউকে ক্ষমাও চাইতে হয়েছে তখন। এ জাতীয় ঘটনার পরিণতিতে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম মধ্যমণি আবুল হুসেন ১৯৩১ সালে

www.pathagar.com

ঢাকা ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় চলে যান। কাজী আবদুল ওদুদও দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে (দ্র) আর ফিরে আসেন নি।

আ. হু.

বুধ

সৌরজগতের (দ্র) ক্ষুদ্রতম গ্রহ বুধ—দূরত্বের দিক থেকে সূর্যের (দ্র) সবচাইতে কাছের। এর ব্যাস মাত্র ৪,৮৫০ কিলোমিটার। বুধের ইংরেজি নাম মার্কারি (Mercury)। মার্কারি শব্দের অর্থ হল সূর্যের দূত। গ্রিকেরা এই নাম রেখেছিলেন। বুধের কক্ষপথ পৃথিবীর (দ্র) কক্ষপথের ভেতরে। এই জন্য বুধকে মাঝে মাঝে ভোরে সূর্যোদয়ের কিছু আগে আবার কখনো সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের ঠিক পরেই অল্প

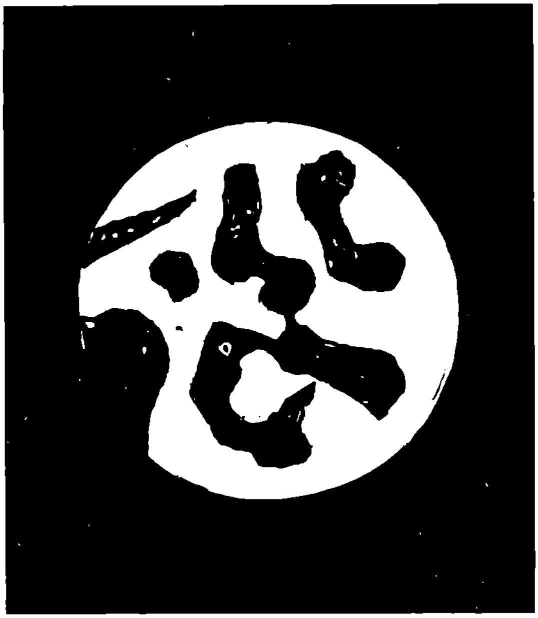

সময়ের জন্য ক্ষুদ্র তারকার মতো দেখা যায়। সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে আসতে বুধের সময় লাগে ৮৮ দিন। এই কক্ষপথ ভ্রমণের সময় বুধ যখন সূর্যের সবচাইতে কাছে থাকে, তখন সূর্য থেকে এর দূরত্ব হয় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার। আর যখন বুধ সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, তখন সূর্য থেকে এর দূরত্ব হয় ৭ কোটি কিলোমিটার। বুধ যখন সূর্যের কাছাকাছি চলে আসে, তখন তার গতিবেগ হয় সবচেয়ে বেশি— সেকেণ্ডে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার। আবার সূর্য থেকে যখন খুব দূরে সরে যায়, তখন কক্ষপথে তার গতিবেগ হয় সেকেণ্ডে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার। সূর্যের খুব কাছের গ্রহ বলে সূর্য এই গ্রহকে অকৃপণ হাতে তাপ ও আলো দেয়। ফলে বুধের তাপমাত্রা এত বেশি যে সেখানে সীসা (দ্র) ও দস্তার (দ্র) মতো ধাতুও গলে যাবে। বুধের যে অংশটি সূর্যের দিকে ফেরানো, তার তাপমাত্রা দিনের বেলা ৫১০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। আর উল্টো দিকে পড়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তাপমাত্রা প্রায়—১০০° সেলসিয়াস। গভীর রাতে এই তাপমাত্রা নেমে আসে—২১০° সেলসিয়াসে। বুধে কোনো বায়ুমণ্ডল (দ্র) নেই; নেই পানি (দ্র), মেঘ (দ্র), বৃষ্টি। ১৯৭৪ সালে মার্কিন মহাশূন্যযান মেরিনার-১০ সর্বপ্রথম কাছ থেকে বুধের ছবি তুলে পাঠায়। ছবিতে বুধের উপরিতলকে একদম চাঁদের মতো দেখায়; উপরের ভূ-ত্বক অসংখ্য গর্তে ভরা, এবড়ো-খেবড়ো। এই গ্রহে রয়েছে অসংখ্য পাহাড় ও সমতল ভূমি।

সে. শা.

বুব্‌কা, সের্গিয়েই [১৯৬৩—]

সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ। তাঁর জন্ম ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৩: জন্মস্থান ভরোশিলভ্‌গ্রাৎ, উক্রাইন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

পোল্‌ভল্ট জাম্পে বুব্‌কার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অভিষেক হয় ১৯৮১ সালে ইউরোপিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে। সেবার বুব্‌কা সপ্তম স্থান লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে হেলসিংকি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জয় করে সবার নজর কাড়েন।

বুব্‌কা এ পর্যন্ত ১৩ বার বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টির কৃতিত্ব দেখালেও বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছেন মাত্র ৬ বার। সেগুলি হচ্ছে ১৯৮৩'র বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ, হেলসিংকি–৫.৭০মিটার; ১৯৮৫'র ক্যানবেরা বিশ্বকাপ—৫.৮৫ মিটার; ১৯৮৬'র স্টুট্‌গার্ট ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ—৫.৮৫ মিটার; ১৯৮৭'র রোম বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ—৫.৮৫ মিটার; ১৯৮৮ সালে সিউল অলিম্পিক গেম্‌স্—৫.৯০ মিটার; ১৯৯১–এর টোকিও বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ (দ্র)—৫.৯৫ মিটার।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে কোকা-কোলা পুরস্কার হাতে সের্গিয়েই বুব্‌কা

বুব্‌কার বিশ্ব রেকর্ড :

২৬শে মে '৮৪—৫.৮৫ মিটার, ব্রাতিস্লাভা;
২রা জুন '৮৪—৫.৮৮ মিটার, সেন্ট ডেনিস;
১৩ই জুলাই '৮৪—৫.৯০ মিটার, লণ্ডন (দ্র);
৩১শে আগস্ট '৮৪—৫.৯৪ মিটার, রোম;
১৩ই জুলাই '৮৫—৬ মিটার, প্যারিস (দ্র);
৮ই জুলাই '৮৬—৬.০১ মিটার, মস্কো (দ্র);
২৩শে জুলাই '৮৭—৬.০৫ মিটার, ব্রাতিস্লাভা;
১০ই জুলাই '৮৮—৬.০৬ মিটার, নিস্;
৬ই মে '৯১—৬.০৭ মিটার, সিজুয়োকা;
৯ই জুন '৯১—৬.০৮ মিটার, মস্কো;
৯ই জুলাই '৯১—৬.০৯ মিটার, ফর্মিয়া;
৫ই আগস্ট '৯১—৬.১০ মিটার, মাল্‌মো;
১৩ই জুন '৯২—৬.১১ মিটার, ডাইজন।

অলিম্পিক এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ ছাড়া অন্যান্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ-ফি হিসাবে বুব্‌কা ২৫ হাজার থেকে ৩৫ হাজার মার্কিন ডলার পান। এ ছাড়াও প্রতিটি বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টির জন্য ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুতকারী 'নিকে' (Nike) কোম্পানি থেকে তিনি পান প্রায় ২০ হাজার মার্কিন ডলার।

অ. ব.

বুয়র যুদ্ধ (Boer War)

ইংরেজদের বিরুদ্ধে আফ্রিকাবাসী বুয়রদের যুদ্ধ। বুয়রগণ ওলন্দাজদের বংশধর। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল, কেপ কলোনি ইত্যাদি অঞ্চলে সংখ্যা ও শক্তিতে তাদের বেশ প্রাধান্য ছিল। ট্রান্সভালে তাদের একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজেরা ট্রান্সভালের বুয়র প্রজাতন্ত্রটির স্বাধীনতা হরণ করে এবং প্রজাতন্ত্রটিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। এর বিরুদ্ধে বুয়রেরা সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এভাবেই ১৮৮০ সালে যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে বুয়রেরা ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এতেও উভয় পক্ষের ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে না।

কয়েক বছর চুপ থাকার পর ইংরেজেরা আবার উপনিবেশ স্থাপন করতে তৎপর হয়। এতে নতুন করে বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৯৯ সালে বুয়রেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরেজবাহিনী কিছুটা বেকায়দায় পড়লেও পরে শক্তি ও চাতুর্যের সাহায্যে ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়া দখল করে নেয়। পরবর্তী এক বছর ইংরেজ ও বুয়র সৈন্যদের মধ্যে গেরিলাযুদ্ধ চলে। ভেরিনিগিঙের (Vereeniging) সন্ধির ফলে ১৯০২ সালের ৩১শে মে বুয়র যুদ্ধ শেষ হয়।

সুজ. ব

বুরাক্

বুরাক্ আরবি 'বার্ক্' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। 'বার্ক্' শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ।

হাদিসের (দ্র) বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) শবে মিরাজ (দ্র)-এর রাত্রে যে দ্রুতগতিসম্পন্ন বাহনে চড়ে ঊর্ধ্বলোক পরিভ্রমণ সম্পন্ন করেছিলেন, সেই বাহনটির নাম বুরাক্।

পবিত্র কুরআন শরীফে (দ্র) বুরাকের কোনো উল্লেখ নেই। তবে হাদিসে উল্লেখ আছে, বুরাকের আকৃতি গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট ছিল।

মু. মা.

বুলফাইটিং (bullfighting)

১৭০০ সালের দিকে স্পেনে এই লড়াইয়ের সূচনা হয়।

www.pathagar.com

তখন থেকে এই লড়াইয়ের জন্য স্থায়ীভাবে বুল্‌রিং (bull-ring) তৈরি করা হয়।

বুলফাইটিংকে মূলত একটি ষাঁড় এবং এক জন মানুষের মধ্যে সম্মুখলড়াই বলা যায়। মানুষটিকে বলা হয় মাতাদোর্ (matador; ইংরেজিতে ম্যাটাডোর)। বুলফাইটিং পর্তুগাল, মেক্সিকো, স্পেন এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের হিস্পানি (অর্থাৎ স্প্যানিশ ভাষাভাষী) এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। স্পেন ও মেক্সিকোতে মাতাদোর্‌কে জাতীয় বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়। স্পেনে মাতাদোর্ যশ ও খ্যাতি অর্জন করে ১৯০০ সালের দিকে।

বুলরিংকে বলা হয় প্লাজা দে তরোস্। এটি একটি বিশেষভাবে তৈরি স্টেডিয়াম। এর ব্যাস সাধারণত ৫৫-৬০ গজ হয়ে থাকে। মাঠের উপর অংশে বালি দেওয়া থাকে। ষাঁড় যে দরজা দিয়ে ঢোকে তাকে বলা হয় তোরিল্। বুলরিং-এর চার পাশে ৫ ফুট উঁচু কাঠের তৈরি বেষ্টনী থাকে।

লড়াইয়ের সময় মাতাদোর্ একাকী ষাঁড়টির সামনে দাঁড়িয়ে এক টুকরো লাল বা নীল কাপড় দিয়ে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করলে ষাঁড়টি শিং বাগিয়ে তেড়ে আসে ঢুঁ মারতে। লড়াইয়ের জন্য ষাঁড়টিকে বিশেষভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। সাধারণত এসব ষাঁড় খুবই হিংস্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। এক একটির ওজন প্রায় ৪০০-৫০০ কিলোগ্রাম হয়। বেশির ভাগ দেশে লড়াইয়ের পর মাতাদোর্ ষাঁড়টিকে হত্যা করে। তবে পর্তুগাল ও ফ্রান্সে এই নিয়ম নেই। অনেক সময় ষাঁড়ের শিংয়ের আঘাতে মাতাদোর্ মারা যায়। তাই এ লড়াইয়ের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ এর বিরোধিতা করে।

স্পেনে প্রায় ৪০০ বুলরিং রয়েছে। একেকটিতে ১৫শ' থেকে ২০ হাজার দর্শকের বসার ব্যবস্থা আছে। বিশ্বের বৃহত্তম বুলরিং হচ্ছে মেক্সিকো সিটির প্লাজা দে তরোস্ মনুমেন্তাল্। এর দর্শক-ধারণক্ষমতা ৫৫ হাজার।

দু'ধরনের ষাঁড়ের লড়াই হয়: ১. কোরিদা দে তরোস্, এবং ২. নোভিলাদা। কোরিদা উচ্চ পর্যায়ের লড়াই।

অ. ব.

বুলবুল চৌধুরী [১৯১৯—১৯৫৪]

সুপ্রসিদ্ধ নর্তক, নৃত্যনাট্য-রচয়িতা ও নৃত্যসংগঠক। লেখক ও চিত্রকররূপেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রকৃত নাম রশিদ আহমদ চৌধুরী। পিতা মুহম্মদ আজমউল্লাহ। ১৯১৯ সালে পিতার কর্মস্থল বগুড়ায় জন্ম। আদি নিবাস চট্টগ্রামের (দ্র) চুনতি গ্রামে। বুলবুল চৌধুরী মানিকগঞ্জ স্কুল থেকে ১৯৩৪ সালে প্রবেশিকা ও ১৯৩৮ সালে কলিকাতার (দ্র) স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই নর্তক, নৃত্যনাট্য-রচয়িতা ও

www.pathagar.com

নৃত্যসংগঠকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। বি. এ. ক্লাসে পড়ার সময়েই তিনি কলিকাতায় Oriental Fine Arts Association-সংক্ষেপে O.F.A. নামে নৃত্যসংঘ গঠন করেন। O.F.A.-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলার গভর্নর লর্ড ব্রাবোর্ন ও তাঁর পত্নী লেডি ব্রাবোর্ণ উপস্থিত থেকে বুলবুল চৌধুরীকে অভিনন্দিত করেন। ১৯৩৮ সালে ভারত (দ্র) সফররত আমেরিকার বিখ্যাত ব্যালে দল মার্কাস কোম্পানির আমন্ত্রণে বুলবুল তাঁর দল নিয়ে তাঁদের মঞ্চে তাঁর নৃত্যনাট্য উপস্থাপন করেন। ১৯৪০ সালে বুলবুল Calcutta Culture Centre নামে আরো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এই সময়েই তিনি তাঁর নৃত্যদল নিয়ে ঢাকা (দ্র) সফর করেন এবং এখানকার পিকচার হাউস ও তাজমহল সিনেমা হলে প্রথম বারের মতো তাঁর নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গণনাট্যসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে বুলবুল চৌধুরী তার সঙ্গে যুক্ত হন ও গণনাট্যের ব্যালে স্কোয়াডের জন্য নৃত্যনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে বুলবুল চৌধুরী কলিকাতা থেকে ঢাকায় চলে এসে এখানে একটি সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। ১৯৫০ সালে তিনি চট্টগ্রাম সফর করেন ও পালাক্রমে বেশ কয়েকটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। সেখান থেকে কলিকাতা ফিরে গিয়ে বুলবুল পেশাদার নৃত্যদল Bulbul Choudhury and his Troupe গঠন করেন। এই দল নিয়ে তিনি পূর্ববঙ্গের নানা স্থান সফর করেন ও নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। এই সফর শেষে কলিকাতা ফিরে গিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসার উদ্যোগ নেন ও পরিকল্পনা মতো ময়মনসিংহ শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

১৯৫০ সালেই বুলবুল তাঁর দল নিয়ে করাচি ও লাহোর সফর করেন এবং বিদেশ সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে তিনি সদলবলে জাহাজে করে করাচি বন্দর থেকে ইউরোপ (দ্র) যাত্রা করেন, ইংল্যাণ্ডে পৌঁছান ১৪ই এপ্রিল। ২৭শে এপ্রিল থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে বুলবুলের দলের অনুষ্ঠান হয়। নৃত্যরসিকেরা সেসব অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সে সময় অসুস্থ কবি কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের (দ্র) নজরুল সাহায্য সংস্থা যে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে বুলবুলের দল তাতে অংশগ্রহণ করে। অসুস্থ থাকার জন্য তিনি নিজে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কিছু দিন আগে থেকেই বুলবুল কিড্‌নির (দ্র) অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে সদলবলে বুলবুল গেলেন হল্যাণ্ড। ১৬ই জুলাই আমস্টার্ডামের বৃহত্তম অপেরা হাউসে তাঁর অনুষ্ঠান হল। এক মাস ধরে হল্যাণ্ডের নানা শহরে বুলবুলের নৃত্যপ্রদর্শনী চলল, প্রশংসাও পেলেন প্রচুর। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। তবু বুলবুল তা নিয়েই নৃত্যানুষ্ঠান করে চললেন। হল্যাণ্ডের পর বেলজিয়াম। সেখানকার নানা শহরে এক মাস ধরে তাঁর নৃত্যানুষ্ঠান চলে। সেখান থেকে ফ্রান্স। ফ্রান্সেও অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে তিনি তাঁর নৃত্য উপস্থাপন করলেন। কিন্তু অসুস্থতা অনেক বেড়ে যাওয়ায় তিনি আমেরিকা (দ্র) সফরের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলেন না। এবার ফিরে আসার পালা। ১২ই ডিসেম্বর তাঁদের জাহাজ বোম্বাই বন্দরে ভিড়ল। সেখান থেকে কলিকাতা হয়ে বুলবুল নিজ গ্রাম চুনতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁর শরীর এতই অসুস্থ হয়ে পড়ল যে গ্রামে আর যেতে পারলেন না তিনি। চিকিৎসার জন্য তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কলিকাতায়। সেখানেই ১৯৫৪ সালের ১৭ই মে কিডনির ক্যান্সারে (দ্র) মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বুলবুল মৃত্যুবরণ করলেন।

উদয়শঙ্কর (দ্র) ছাড়া অপর কোনো বাঙালি নৃত্যবিদ বুলবুল চৌধুরীর মতো এমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হন নি। তাঁর রচিত ও পরিচালিত নৃত্যনাট্যের সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি। গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রকাশিত উপন্যাস : প্রাচী (১৯৪২)। ঢাকায় বুলবুল একাডেমী অব ফাইন আর্টস (BAFA) তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

ক. গো.

বুলবুলি

বুলবুলি গায়ক পাখি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *পিকনোনোটিডি* *(Pycnonotidae)*। এর বহু প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি আছে। এটি মাঝারি ছোট পাখি। লম্বাটে দেহ। তীক্ষ্ণ ঠোঁট। অনেক বুলবুলির মাথায় সামনে হেলানো চুড়ো আছে। অনেকের বাহারি পালক ও রঙ আছে। হলুদ, সবুজ, ধূসর, বাদামি

www.pathagar.com

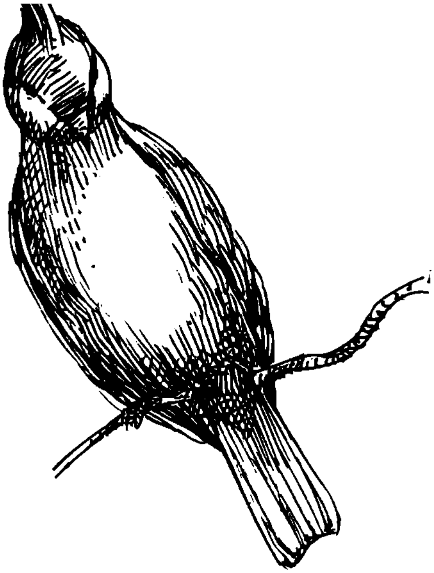

ইত্যাদি রঙ হয়। অনেকের গায়ে মালার মতো সাদা বা কালো দাগ থাকে।

এর উজ্জ্বল চোখ। কারো-বা নীলচে লিকলিকে পা। গোঁফ আছে কারো কারো। অনেকের মাথায় যেন কদমছাঁট। শাহ্ বুলবুলের লেজে লম্বা গুচ্ছ আছে।

পাহাড়-পর্বত-টিলা, বন-বাগান, মাঠসহ বাড়ির আঙিনায় এদের দেখা যায়। এরা শহরেও বাস করে।

প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার বা দুধরাজ, সবুজ, সাধারণ, কালোমাথা, সিপাহি বুলবুল ও নীলপরী হচ্ছে বিশ্বে উল্লেখযোগ্য। এরা পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গ (দ্র), ছোট ফল ও ফুলের মধুসহ তাল (দ্র)-খেজুরের (দ্র) রস খায়।

এর কণ্ঠস্বর মিষ্টি। ফুল বাগানে যেন নাচে। বাটির মতো বাসা করে গাছে। ডিম পাড়ে ২ থেকে ৪টি।

বুলবুলি সাহসী ও যোদ্ধা পাখি। বন্যপ্রাণী দেখলে পেছনে লাগে। পোষ মানে। শেখালে মোরগের মতো লড়াই করে। 'বুলবুলির লড়াই' এক সময় জমিদার-রাজাদের প্রিয় খেলা ছিল। কেউ কেউ শীতে পরিযায়ী হয়। এটি ১০-১২ বছর বাঁচে।

শাহ্ বুলবুল, সবুজ, নীলপরী, সিপাহি ও কালো বুলবুলি বাংলাদেশেও (দ্র) আছে।

শ. খা.

বৃক্ক রেচনতন্ত্র দ্র

বৃত্ত

শব্দটি জ্যামিতির (দ্র) পরিভাষা। কোনো সমতলে অবস্থিত একটি আবদ্ধ বক্ররেখা, যার প্রতিটি বিন্দু এর ভিতরে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট স্থির বিন্দু থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করে। স্থির বিন্দুটিকে বৃত্তের কেন্দ্র বলে। পূর্বে বক্ররেখাটিকে পরিধি এবং এর মধ্যবর্তী অংশকে বৃত্ত বলা হত।

আধুনিক গণিতবিদদের মতে বক্ররেখাটিই বৃত্ত অর্থাৎ বৃত্ত ও এর পরিধি একই ভিন্ন কিছু নয়; আর আবদ্ধ অংশটুকু মধ্যাংশ (interior) নামে পরিচিত, বৃত্ত নয়। বৃত্তের যে কোনো বিন্দু ও এর কেন্দ্রসংযোগকারী রেখাংশকে (সরল) ব্যাসার্ধ বলে। একটি বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ সমান। বৃত্তের যে কোনো দু'টি বিন্দুর সংযোগকারী রেখাংশকে জ্যা বলে। বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে অঙ্কিত জ্যা-কে ব্যাস বলে। ব্যাস ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ এবং এটি জ্যা-এর মধ্যে সবচেয়ে বড়। দু'টি বিন্দু দ্বারা বিচ্ছিন্ন বৃত্তের অংশকে বৃত্তের চাপ (arc) বলে। যে কোনো দু'টি বিন্দু একটি বৃত্তকে দু'টি বৃত্তচাপে ভাগ করতে পারে। যে বৃত্তচাপ বৃত্তকে সমান দু'টি অংশে ভাগ করে তাকে অর্ধবৃত্ত বলে। যে সরলরেখা বৃত্তকে

বৃত্তের জ্যামিতিক ব্যবহার

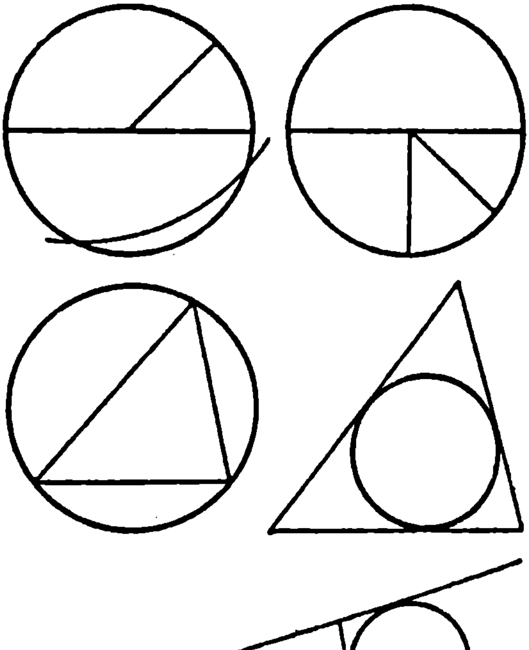

www.pathagar.com

একটিমাত্র বিন্দুতে স্পর্শ করে তাকে স্পর্শক এবং বিন্দুটিকে স্পর্শবিন্দু বলে। বৃত্ত একটি সুষম ও সমরূপ জ্যামিতিক চিত্র। সব ধরনের জ্যামিতিক চিত্রের মধ্যে এটি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা, ভবন, বাগান, গাড়ি, সাইকেল, ঘড়ি (দ্র), ইলেক্ট্রিসিটি (দ্র), বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য থেকে শুরু করে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার প্রায় সবকিছুর মূলে রয়েছে এই জ্যামিতিক চিত্রের সঙ্গে অন্যান্য জ্যামিতিক চিত্রের সমন্বিত ধারণার প্রয়োগ। মজার ব্যাপার হচ্ছে– লেওনার্দো দা ভিঞ্চির (দ্র) বিখ্যাত মোনা লিসার (দ্র) হাসির রেখা যা ঠোঁটের দু' দিক থেকে দু' চোখ স্পর্শ করেছে তাও একটি বৃত্তের উপর অবস্থিত; মাথার উপরের সীমারেখাটি ঠিক দ্বিগুণ বড় আরেকটি বৃত্তের চাপ বলে ধরা হয়।

হো. আ.

বৃহদন্ত্র পরিপাকতন্ত্র দ্র

বৃহস্পতি

গ্রহরাজ বৃহস্পতি সৌরজগতের (দ্র) সবচেয়ে বড় গ্রহ (দ্র)।

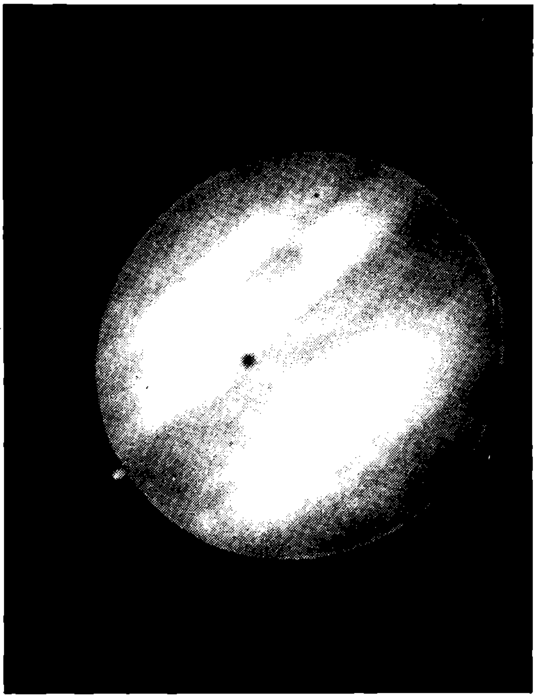

বৃহস্পতি

এর ব্যাস ১,৪২,৮০০ কিলোমিটার। এটি আয়তনে এত বিশাল যে এক হাজার তিন শ' পৃথিবীকে (দ্র) এর ভেতর পুরে রাখা যায়। বৃহস্পতির ওজন সৌরজগতের অন্য সকল গ্রহের ওজনের দ্বিগুণ। এই গ্রহ সূর্য (দ্র) থেকে প্রায় ৮০ কোটি কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে। তাই গ্রহরাজ হয়েও তা সূর্যতাপ পায় মাত্র পৃথিবীর সাতাশ ভাগের এক ভাগ। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের (দ্র) উপরিভাগে তাপমাত্রা খুবই কম, -১৫০° সেলসিয়াস। গ্রহটি খুবই ঠাণ্ডা, কিন্তু এর বায়ুমণ্ডলের ঘন মেঘের (দ্র) নিচে তাপমাত্রা ৭৫° সেলসিয়াস। এই মেঘ হিলিয়াম (দ্র) ও হাইড্রোজেনের (দ্র) মেঘ। বৃহস্পতির ভেতরে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি। তার কক্ষপথে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির সময় লাগে প্রায় ১২ বছর অর্থাৎ পৃথিবীর ১২ বছরে বৃহস্পতির এক বছর হয়। কিন্তু নিজ অক্ষে পাক খেতে গ্রহরাজের সময় লাগে মাত্র ১০ ঘণ্টা। তাই এখানে ৫ ঘণ্টা দিন, ৫ ঘণ্টা রাত। সুতরাং পৃথিবীর এক দিনে এখানে দু'বার সূর্য ওঠে, দু' বার অস্ত যায়। বৃহস্পতির অনেক ছবি থেকেই প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে একটি বৃহৎ রক্তিম চোখ, ঘূর্ণায়মান গ্যাসের (দ্র) উপর সূর্যের আলো পড়েই এর সৃষ্টি। বৃহস্পতির উপগ্রহ বা চাঁদের (দ্র) সংখ্যা অনেক। এ পর্যন্ত এর ষোলটি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৬০৯ সালে গালিলেও গালিলেই (দ্র) তাঁর প্রথম টেলিস্কোপের (দ্র) সাহায্যে এই গ্রহের চারটি উজ্জ্বল চাঁদ দেখেছিলেন। এই চারটি চাঁদ হল আইও, ইউরোপা, গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টো। এগুলোকে পৃথিবী থেকে দূরবীনের (দ্র) সাহায্যে দেখা যায়। ভয়েজার মহাশূন্যযানের আবিষ্কারের ফলে এদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। আইও চাঁদটি আমাদের চাঁদের চেয়ে সামান্য বড়। এর উজ্জ্বল, কমলা ও হলুদ রঙের পৃষ্ঠের কারণে একে অনেকটা 'পিৎসার' মতো দেখায়। এর মধ্যে অনেক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি (দ্র) রয়েছে। ইউরোপা আইও উপগ্রহ থেকে ছোট; এর পৃষ্ঠ মসৃণ ও বাদামি রেখায় আবৃত। এর কিছু অংশ বরফে ঢাকা থাকে। গ্যানিমিড সৌরজগতের সবচেয়ে বড় চাঁদ (উপগ্রহ)। এর পৃষ্ঠদেশ ১০০ কিলোমিটার গভীর বরফে ঢাকা। ক্যালিস্টো গ্যানিমিডের চেয়ে ছোট, কিন্তু দেখতে গ্যানিমিডের মতোই।

সে. শা.

www.pathagar.com

বেইজিং

চীনের (দ্র) উত্তর ভাগে অবস্থিত রাজধানী-শহর। চীনের বড় বড় শহরগুলোর মধ্যে এটি একটি। বেইজিং-এর পূর্ব নাম ছিল পিকিং। শহরটি আকারে লণ্ডনের (দ্র) সমান।

শহরটি সমতল ও ধূলিময় হওয়ায় দেশের রাজধানী হিসাবে আকর্ষণীয় নয়। বেইজিং-এর কেন্দ্রে অবস্থিত চীনের এককালের প্রকাণ্ড নিষিদ্ধ নগরী (Forbidden City), সেখানে প্রথম দিকের চীনা সম্রাটগণ বাস করতেন। এই নিষিদ্ধ নগরীর আকর্ষণীয়, চমৎকার, সুবৃহৎ কক্ষ (halls), প্যাভিলিয়ন, প্যাগোডা (দ্র) ইত্যাদি দেখতে পুরো এক দিন সময়ের প্রয়োজন। এখানকার ভবনগুলির ছাদ চমৎকার—সোনা ও হলদে সিরামিক টাইল দিয়ে তৈরি।

এক সময় পুরো শহরটিই অসম্ভব রকমের পুরু ও উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল, সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। বর্তমানে এই নিষিদ্ধ নগরী জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। 'প্যালেস মিউজিয়াম' নাম দিয়ে এর পুনঃনামকরণ করা হয়েছে।

হো. আ.

বেকন, ফ্রান্সিস [১৫৬১—১৬২৬]

ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) নামের সঙ্গে তাঁর উপাধি যুক্ত করেই তাঁর সমকালে তাঁকে সম্বোধন করা হত— Lord অথবা Baron Verulam এবং Viscount St. Albans। ১৫৬১ সালের ২২শে জানুয়ারি লণ্ডনের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ফ্রান্সিসের জন্ম হয়। বাবা স্যার নিকোলাস বেকন ছিলেন রাজকর্মচারী। মা অ্যান কুক্ ছিলেন আরেক লর্ডের কন্যা। পিতা-মাতা উভয়েই দৃঢ়চেতা, উচ্চশিক্ষিত, ধার্মিক, আবার চার্চের সংস্কারে আগ্রহী। তবে মনে করা হয়, ধ্রুপদী বিষয়ে মায়ের জ্ঞান ও তাঁর ধর্মবিশ্বাস ফ্রান্সিসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১২ বছর বয়সে তিনি ভাইয়ের সঙ্গে একত্রে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন এবং দু'বছর পর লণ্ডনে (দ্র) ফিরে এসে আইন বিষয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। ১৫৭৬ সালে পনেরো বছর বয়সে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে (দ্র) নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের অধস্তন সচিব হিসাবে যোগ দেন। তাঁর বয়স যখন উনিশ তখনই তাঁর বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর লণ্ডনে ফিরে এসে তিনি আইন পড়াশোনা পুনরায় শুরু করেন। আইন ব্যবসায়ে তিনি কাকা লর্ড বার্গলির (Lord Burgley) কাছ থেকে সাহায্য পাবেন এমন আশা করেছিলেন, কিন্তু তা তিনি পান নি। তবে ১৫৮৪ সালে কাকার সহায়তায় তিনি পার্লামেন্টের আসনে বসেন। দুই পর্বে পার্লামেন্টে যোগদানের পর তিনি ১৫৯৩ সালে মিড্‌ল্‌সেক্স অঞ্চল থেকে পার্লামেন্টসদস্য নির্বাচিত হন। অনতিকালের মধ্যেই তিনি প্রথিতযশা পার্লামেন্টসদস্য হয়ে ওঠেন এবং সরকারি একটি বিলের বিরোধিতা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সময়েই বেকন তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৫৯৭ সালে তিনি একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশ করেন, যা থেকে সকলেই বুঝতে পারলেন যে এ লেখক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ১৬০৩ সালে বেকন 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৬০৭ সালে তিনি সলিসিটর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং ১৬১৩ সালে এটর্নি জেনারেলের পদে যোগ দেন।

১৬০৫ সালে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বেকন অ্যালিস বার্নহামকে বিয়ে করেন। অ্যালিসের পিতা ছিলেন লণ্ডনের এক জন ধনী বণিক। বেকন নিজেও যথেষ্ট উপার্জন করতেন। স্ত্রীর সূত্রে তিনি নিয়মিত ভাল টাকা-পয়সা পেতেন। কিন্তু খরচ করার ব্যাপারে তিনি এমনই উদারহস্ত ছিলেন যে সব সময়ই তাঁর লোকজনের কাছে ধার থাকত। নিজের বাড়ি তৈরি করতে বা আসবাবপত্র দিয়ে সাজাতে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ১৬১৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি লর্ড চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। একই বছরে তিনি ব্যারন ভেরুলাম পদ লাভ করেন। ১৬২১ সালে তিনি ভাইকাউন্ট সেন্ট অ্যাল্‌বন্স উপাধি লাভ করেন। ১৬২৬ সালের ৯ই এপ্রিল ফ্রান্সিস বেকন মারা যান।

বেকনের যুক্তিবাদী ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনা আজও পরম সম্পদ বলে বিবেচিত। তাঁর উইলে লেখা ছিল—আমার নাম ও স্মৃতিকে বিভিন্ন জাতি ও অনাগত কালের জন্য রেখে গেলাম। সংস্কৃতি ও শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজিকে তিনি অমর্যাদাকর মনে করতেন। তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল ধ্রুপদী ভাষা লাতিন। পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে তিনি ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাণীকে উপদেশমূলক চিঠি লেখেন। তাঁর 'The Advancement of Learning' প্রকাশিত হয় ১৬০৫ সালে। লাতিন ভাষায় লিখিত হয়েছিল 'Novum Organum' (১৬২০) এবং 'De

www.pathagar.com

Augmentis' (১৬২৩)। বেকন চেয়েছিলেন প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার মাধ্যমে দর্শনের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করতে। বেকনের বিখ্যাত 'Essays' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫৯৭ সালে এবং তার চূড়ান্ত প্রকাশকাল ১৬২৫। এই নিবন্ধসমূহে তিনি বন্ধুত্ব, বিবাহ, পড়াশোনা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণী মন্তব্য করেছেন। এই রচনাগুলো আজও আমাদের জীবনের দিঙ্‌নির্দেশনা হয়ে আছে। এই লেখাগুলোর অনেক বাক্য প্রায় প্রবাদের পরিচিতি লাভ করেছে। তাঁর অন্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'History of Henry VII' (১৬২২), 'New Atlantis' (১৬২৬)।

শ. আহ.

বেকার, বোরিস [১৯৬৭ —]

টেনিস (দ্র) তারকা। বোরিস বেকারের (Boris Becker) জন্ম ২২শে নভেম্বর ১৯৬৭, জার্মানির লাইমেন্-এ। ছোটকালে তাঁর প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল (দ্র) ও টেনিস। তিনি ১২ বছর বয়স থেকে শুধুমাত্র টেনিসে মনোনিবেশ করেন।

বেকার ১৯৮২ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত টানা ৩ বার সাবেক পশ্চিম জার্মান জুনিয়র টেনিস শিরোপা জয় করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। ১৯৮৫ সালে প্রথম অবাছাইকৃত এবং সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বল্‌ডন্ টেনিস শিরোপা জয় করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর ৭ মাস। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত টানা ৭ বছর বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০ জন খেলোয়াড়ের এক জন ছিলেন। ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে ডেভিসকাপ বিজয়ী জার্মান দলের সদস্য ছিলেন। তিনি উইম্বল্‌ডন্ টেনিসে অংশগ্রহণকারী পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম সফল খেলোয়াড়; ৬ বার ফাইনালে উঠে ৩ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। টেনিসে সর্বাধিক সফল ছিলেন ১৯৮৯ সালে। উইম্বল্‌ডন্ ও যুক্তরাষ্ট্র ওপেন শিরোপা জয়সহ ১৪টি শিরোপা অর্জন করেন। ১৯৯১ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনালে ইভান লেণ্ডল্‌কে (Ivan Lendl) হারিয়ে প্রথম বারের মতো বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-এ শীর্ষস্থান দখল করেন। গ্রাণ্ড স্লাম টেনিস টুর্নামেন্টের এককে সর্বাধিক গেমে জয়ের (১১১-২৩) রেকর্ড ছিল (১৯৯২-এর জুন পর্যন্ত)।

তিনি এই পর্যন্ত ৫ বার গ্রাণ্ড স্লাম শিরোপা জিতেছেন। টেনিসে খেলে এ যাবৎ উপার্জন করেছেন প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশের মুদ্রায় ৫০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা)।

অ. ব.

বেকেট্, স্যামুয়েল্ বারক্লে [১৯০৬—১৯৮৯]

আইরিশ ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং কবি স্যামুয়েল্ বারক্লে বেকেট্ (Samuel Barclay Beckett) আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনের ফক্সরক অঞ্চলে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনার জন্য তিনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যান ১৯২৮ সালে এবং পরবর্তী কালে এই শহরেরই বাসিন্দা হয়ে যান। তিনি ছিলেন অন্য এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জেম্‌স্ জয়েসের (দ্র) বন্ধু এবং কিছুকাল তাঁর শ্রুতিলেখক হিসাবে কাজ করেন। স্যামুয়েল্ বেকেট্ হলেন সেই সব বিশ্বখ্যাত লেখকদের এক জন যাঁরা দু'টি ভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনায় পারঙ্গম। বেকেট্ ইংরেজি (দ্র) ও ফরাসি এই দুই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করেছেন অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে। তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'Murphy' (১৯৩৮) লিখিত হয়েছিল ইংরেজিতে। পরের উপন্যাস 'Watt'ও (১৯৫৩) ইংরেজিতে লিখিত। এই উপন্যাস দু'টিতে তিনি ইংরেজি ভাষার ধ্বনি ও কৌতুকপ্রবণতা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এরপর 'Molloy' (১৯৫৫) রচনার দ্বারা তিনি ত্রয়ী উপন্যাসের বৃত্ত সম্পন্ন করেন।

স্যামুয়েল্ বেকেট্ আধুনিক সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। তাঁর উপন্যাস ও নাটকে তিনি জীবনকে এমন অদ্ভুত ভঙ্গি ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে দেখেন যে তা আমাদের পরিচিত পৃথিবী ও সমাজ থেকে একেবারে অন্য রকম। এ ধরনের রচনাকে সাধারণভাবে 'উদ্ভট' আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই 'absurd' বা 'উদ্ভট' রচনা অত্যন্ত গভীরভাবে অর্থবহ। তাঁর বিখ্যাত রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে : 'Malone meurt' (ফরাসি-১৯৫১), ইংরেজিতে 'Malone Dies' (১৯৫৬); 'L' innommable' (ফরাসি-১৯৫৩) ইংরেজিতে 'The Unnameable'

www.pathagar.com

(১৯৫৮); 'Comment c'est' (ফরাসি- ১৯৬১), ইংরেজিতে 'How It Is' (১৯৬৪); নাটক 'En attendant Godot' (ফরাসি-১৯৫২) ইংরেজিতে 'Waiting For Godot (১৯৫৬); 'Fin de partie' (ফরাসি, ১৯৫৭), ইংরেজিতে 'Endgame' (১৯৫৮); 'All that Fall' (১৯৫৭), 'Krapp's Last Tape' (১৯৫৯), 'Happy Days' (১৯৬১)। বেকেট্ জীবনের শূন্যতা ও অর্থময়তাকে এক বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছিলেন। বেকেট ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্সেল্ প্রুস্তের ওপর একটি সমালোচনামূলক গ্রন্থ 'Proust' -এর রচয়িতা (১৯৩১)। ১৯৬৯ সালে বেকেট্ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

শ. আহ.

বেকেন্‌বাওয়ার্, ফ্রান্‌ৎস্ [১৯৪৫—]

বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার। বিশ্ব-ফুটবলে জার্মানির প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর অনেকখানি অবদান রয়েছে। তাঁর জন্ম ১৯৪৫ সালে।

ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলে বেকেন্‌বাওয়ারের (Franz Beckenbauer) অনেক কীর্তি রয়েছে। ফুটবলের এমন কোনো সম্মান নেই যা তিনি পান নি। তরুণ বয়সে যুব ফুটবলে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান পান। দু' বার 'বেস্ট ফুটবলার অব ইউরোপ' খেতাব পান। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-সাংবাদিকদের ভোটে তিনি ফুটবলসম্রাট পেলের (দ্র) সঙ্গেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একাদশ দলে স্থান পান। বেকেন্‌বাওয়ারের অধিনায়কত্বে তাঁর দল ব্যায়র্ন মিউনিখ্ জার্মান ফুটবল লীগে বেশ ক' বার চ্যাম্পিয়ন হয়। এ ছাড়াও তাঁর অধিনায়কত্বে ব্যায়র্ন মিউনিখ্ ইউরোপীয়ান ক্লাব কাপ, কাপ উইনার্স কাপসহ অনেক আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টের শিরোপা জয় করে।

৫ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট বেকেন্‌বাওয়ার্ ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে দারুণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে তিনি পায়ের অপূর্ব কারুকাজ দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। সেবার তাঁর দেশ পশ্চিম জার্মানি (বর্তমানে জার্মানি) চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও ১৯৭৪ সালে পরের বিশ্বকাপ ফুটবলে তাঁরই অধিনায়কত্বে বিশ্বকাপ জয় করে।

১৯৯০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণকারী জার্মান দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেন বেকেন্‌বাওয়ার্। ফাইনালে জার্মানি মারাদোনার (দ্র) আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে তৃতীয় বারের মতো বিশ্বকাপ জয় করে।

১৯৭৪ সালে অধিনায়ক হিসাবে এবং ১৯৯০ সালে কোচ হিসাবে জার্মানিকে বিশ্ব-ফুটবলের শ্রেষ্ঠ সম্মান এনে দিয়ে বেকেন্‌বাওয়ার্ ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

টি. কি.

বেকেরেল, অঁতোয়ান্ অঁরি তেজস্ক্রিয়া দ্র

বেগ

কোনো বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থান পরিবর্তনের হারকে বলা হয় দ্রুতি, কিন্তু এই অবস্থান পরিবর্তন যখন কোনো নির্দিষ্ট দিকে হয় তখন সে হারকে বলে বেগ। সুতরাং কোনো বস্তু বা ব্যক্তি একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় বেগ। কোনো বস্তু বা ব্যক্তির নির্দিষ্ট দিকের দ্রুতিকেই বলা হয় বেগ। যেমন ধরা যাক, কোনো গাড়ি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করছে, এখানে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার গাড়িটির দ্রুতি। গাড়িটি যদি উত্তর দিকে যায়, তা হলে এর উত্তরমুখী বেগ হবে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার। অপর একটি গাড়ি যদি দক্ষিণ দিকে ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার যায় তা হলে দু'টি গাড়ির দ্রুতি সমান অর্থাৎ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার, কিন্তু দ্বিতীয় গাড়ির বেগ প্রথম গাড়ির সমান নয়। এ বেগ দক্ষিণমুখী এবং ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার; প্রথম গাড়ির বিপরীত বেগ।

বেগ পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক মিটার/সেকেণ্ড। এ পর্যন্ত জানা মতে এই মহাবিশ্বে (দ্র) আলোর (দ্র) বেগ সবচেয়ে বেশি, সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার।

বেগ একটি ভেকটর রাশি। অর্থাৎ এর মান ও দিক উভয়ই রয়েছে। বেগের মানকে দ্রুতি বলে।

হো. আ.

বেগুন

কম-বেশি কাঁটাযুক্ত দ্বিবীজপত্রী এই উদ্ভিদের (দ্র) বৈজ্ঞানিক নাম *সোলানাম মেলোঙ্গেনা (Solanum melongena)*।

www.pathagar.com

এর গোত্র সোলানাসি (Solanaceae)। ফুলের রং বেগুনি। ফুলে ৫টি পরস্পরযুক্ত বৃতি, ৫টি পাপড়ি, পাপড়িতে লাগানো ৫টি পুং-কেশর এবং ২টি পরস্পরযুক্ত গর্ভ-কেশর থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাশাপাশিও ২-৩টি ফুল হয়। সারা বছর ফুল-ফল থাকে। ফলে বহু বীজ থাকে। কোনো কোনো গাছ ২-৩ বছর বাঁচে। গাছ দু' তিন ফুট বা তার বেশিও উঁচু হয়। বিভিন্ন আকারের বেগুন হয়—গোল, লম্বা, লম্বাটে গোল ইত্যাদি। রংও নানা রকম—সবুজাভ, সাদাটে, লালচে, কালচে-লাল এবং বেগুনি তো আছেই। এর নানা রকম নাম : কাঁটাবেগুন, কুলিবেগুন, মাকড়াবেগুন, মুক্তকেশী, আউশ, ঝুমকা, সুতা, সিঙ্গি ইত্যাদি। গফরগাঁও অঞ্চলে বড় জাতের গোল বেগুন পাওয়া যায়। বৈশাখ ও শ্রাবণ-ভাদ্র মাস বেগুনের চারা লাগানোর সময়। কোনো কোনো বেগুনের পাতায়ও কাঁটা হয়। আবার কাঁটা ছাড়াও বেগুন আছে।

রাস্তার ধারে, জঙ্গলে এক রকম বেগুন জন্মে। তার নাম গোষ্ঠবেগুন। এ গাছ সাধারণত ৫-৬ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। ফুল সাদা, ফল ছোট ও থোকা-থোকা সবুজ রঙের। পাকলে হয় হলদে। ফুল ও ফল বছরের সব সময় থাকে। বীজ সাধারণ বেগুনের মতো কিন্তু তুলনায় অনেক বেশি। এটি গুণের দিক থেকেও সাধারণ বেগুনের সমান। এ ছাড়া তেতো এক রকম বেগুনও ঝোপে-ঝাড়ে ও পথের পাশে জন্মে। একে সাধারণত তিত্‌বেগুন বলে। এর বোঁটায় ও সারা গাছে অনেক কাঁটা। ফল হয় থোকা-থোকা। বেগুনের অনেক গুণ। বেগুনপোড়া ভর্তায় মেদ কমে।

বি. ব.

বেটোফেন্, লুড্‌ভিগ ফান্ [১৭৭০—১৮২৬]

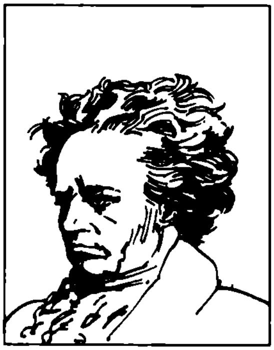

বিশ্ববিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতস্রষ্টা, মহত্তম সিম্ফনি (দ্র) রচয়িতা। বেটোফেন (Ludwig van Beethoven) ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির বন্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। গায়ক পিতা চাইতেন ছেলে সঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। শুরুতে নিজেই তাঁকে শেখাতেন। নয় বছর বয়সে বেটোফেন্ বনের রাজকীয় অর্গ্যান(দ্র)-বাদকের কাছে সঙ্গীত (দ্র) শিক্ষার জন্য যান। প্রতিভাবলে চার বছর পরেই অর্থাৎ মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি সেই অর্গ্যানবাদকের সহকারীর পদে উন্নীত হন। সে সময় কখনো তিনি একটি পুরো অর্কেস্ট্রা (দ্র) পর্যন্ত পরিচালনা করতেন। পিতার কাছে বেটোফেন্ বেহালা (দ্র) শিখেছিলেন। এতদিনে বেহালায়ও তাঁর উচ্চতর অধিকার জন্মে গেছে। সতেরো বছর বয়সে বেটোফেন্‌কে ভিয়েনায় পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি মোৎসার্টের (দ্র) কাছে কিছু দিন সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন। বেটোফেনের সঙ্গীতপ্রতিভা সম্পর্কে মোৎসার্ট উচ্চাশা পোষণ করতেন। ভিয়েনা থেকে বনে ফিরে এসে বাইশ বছর বয়সে আবার তিনি ভিয়েনা যান এবং হাইড্‌ন্ (দ্র)-এর কাছে সঙ্গীতের পাঠ নিতে শুরু করেন। সেই থেকে ভিয়েনাই হয়ে ওঠে তাঁর স্থায়ী বাসস্থান। বেটোফেনের দুর্ভাগ্য যে ত্রিশ বছর বয়স হতে না হতেই তাঁর কানের ও স্নায়ুর রোগ দেখা দেয়।

১৮০২ সালের দিকে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর কানে শোনার ক্ষমতা লোপ পেতে বসেছে। সে এক গভীর দুঃখজনক পরিস্থিতি। তিনি সঙ্গীত সৃষ্টি করছেন অথচ নিজেই তা শুনতে পাচ্ছেন না। তা ছাড়া আর দশজনের মতো তিনি সমাজে চলাফেরা করতে পারেন না। সবাই তাঁর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলে, তাঁর কাছে ভাল লাগে না। সারাক্ষণ ঘরেই থাকেন। কোথাও যান না, কারো সঙ্গে কথা বলেন

www.pathagar.com

না। বিয়েও করলেন না। বেটোফেন্ সারা জীবন গভীর নির্জনতায় কাটিয়ে দিলেন। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও দুর্ব্যবহারই পেয়েছেন বেশি। শেষের দিকে ভাইয়ের ছেলেকে পোষ্য নিয়েছিলেন। সেও বেটোফেনের ওপর অত্যাচার করত। ফলে জীবনে কখনো স্বাস্তি পাবার সুযোগ আসে নি। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বেটোফেন্ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। শরীর একটু ভাল হলে তিনি তাঁর দশম সিম্ফনি, একটি ডুয়েট পিয়ানো সোনাটা ও একটি অরাটোরিও রচনায় হাত দেন। কিন্তু সেসব সমাপ্ত করে ওঠার আগেই সে বছরেরই ২৪শে মার্চ দুপুর বেলা বেটোফেন্ মারা যান।

নানা শ্রেণীর সঙ্গীত তিনি রচনা করেছেন। তবে পিয়ানো সোনাটা ও সিম্ফনির খ্যাতিই সবচেয়ে বেশি। সিম্ফনি-রচয়িতা হিসাবেই বেটোফেন্ বিশ্ববন্দিত। দুঃখ ও সুষমার যে রূপ তিনি তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন তার কোনো তুলনা নেই। বেটোফেনের সঙ্গীত নিয়ে আজও আলোচনার শেষ নেই। নিজেকে তিনি বলতেন সঙ্গীতের কবি। অন্যেরা তাঁকে বলেন সঙ্গীতের শেক্সপীয়র (দ্র)। স্বয়ং ভাগ্নের (দ্র) বলেছেন যে বেটোফেনের সিম্ফনির সঙ্গে তুলনীয় কোনো কিছু কোথাও সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি।

ক. গো.

বেণ্টিঙ্ক, লর্ড উইলিয়াম [১৭৭৪—১৮৩৯]

জন্ম ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে। পোর্টল্যাণ্ডের তৃতীয় ডিউকের দ্বিতীয় পুত্র বেণ্টিঙ্কের (Lord William Bentinck) সৈনিক হিসাবে কর্মজীবনের শুরু। ভারতে (দ্র) এসে ১৮০৩ থেকে ১৮০৭ সাল পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন। পরে বাংলায় আসেন। তিনি ১৮৩১ সালে মহীশূর, ১৮৩২ সালে কাছাড় এবং ১৮৩৪ সালে কুর্গকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে আনেন। এ ছাড়া তিনি মহারাজা রণজিৎ সিং এবং সিন্ধুর আমীরদের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে ইংরেজ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবেশের অধিকার পায়।

বেণ্টিঙ্ক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন শাসন এবং সমাজসংস্কারের জন্য। তিনি ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা (দ্র) নিষিদ্ধ করেন। তাঁর আমলে দুর্ধর্ষ ঠগীদের (দ্র) দমন করা হয়। ১৮৩৩ সালে তিনি এ দেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলেই ভারতীয়রা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক বিচার বিভাগ ও প্রশাসনে ভারতীয়দের অধিক সংখ্যায় নিয়োগের সুযোগ দেন এবং তাদের দায়িত্ব ও বেতন বৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলেই কয়েকটি জেলা একত্র করে বিভাগ তৈরি করা হয়। ভারতীয়দের জন্য বিচারালয়ে তিনি সাবজজ পদের সৃষ্টি করেন।

১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ১৮৩৯ সালের ১৭ই জুন ফ্রান্সের প্যারিসে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আ. ই.

বেত

বেত বা বেতসের আদি নিবাস এশিয়ার (দ্র) উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। তার মধ্যে আমাদের এই উপমহাদেশে আছে ৪৮টি প্রজাতি। বাংলাদেশের (দ্র) জলাভূমি ও পাহাড়ে সাধারণ জাতের যে বেত পাওয়া যায় তার বোটানিক্যাল নাম *'কালামাস ভিমিনালিস ওয়াইল্ড'* (*Calamus viminalis wild)*, গোত্র পালমি (Palmae)। এ ছাড়া আছে কালামাস রোতাঙ্, কালামাস তেনুইস্ ইত্যাদি।

বেতের পাতা অনেকটা কচি খেজুরপাতার মতো। লম্বায় আরো জড়ানো বেতের শরীর বাড়তে বাড়তে পাশের গাছ ছাড়িয়ে উঠে যায়। গুচ্ছতন্তুর জন্য বেতের শরীর কখনো ভাঙে না। ঝড়ে নুয়ে পড়লেও আবার হাঁটু ফেলে উঠে দাঁড়ায়। এ জন্য সুন্দর শরীরের সঙ্গে বেতের তুলনা হয়। বেত ঘর বাঁধার প্রধান উপকরণ। পাতার ডগা কাঁটার মতো। পাতা ও ডালের কোল থেকে বের হয় কাঁটার শিরা। আবার তার গায়ে কাঁটা থাকে উল্টো হয়ে। এ জন্য বেতবনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওই কাঁটায় কাপড় জড়িয়ে গেলে ছাড়ানো কঠিন। বর্ষায় বেতের ফুল, শরতে ফল হয়। এই ফল খাওয়া যায়। ফল গোলাকার ও খোসার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেন চিত্রল চামড়া। বীজ আয়তাকার

www.pathagar.com

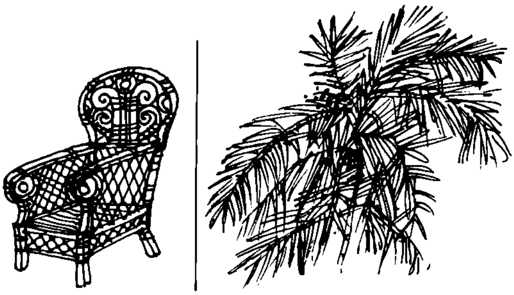

ও মসৃণ। এক রকম প্রজাতির বেত আছে যার বীজের ভেতর লাল গুঁড়ো পাওয়া যায়। এই গুঁড়ো শুকিয়ে 'খুনখারাবি রঙ' নামে বিক্রি হয় এবং তা খুব মূল্যবান। ইংরেজিতে তাকে বলে 'ড্রাগন্‌স্ ব্লাড'। এই বেত আমাদের দেশে পাওয়া যায় না।

সিলেট (দ্র), পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনে (দ্র) প্রচুর বেত জন্মে। বেতের মোড়া, চেয়ার, টেবিল, দোলনা, তাক ইত্যাদি হরেক রকম আসবাব তৈরি হয়। দামও বেতসলতার মতো আকাশ ছুঁতে চায়। বেত ওষধিগুণে ভরা উদ্ভিদ। অগ্নিমান্দ্যে, সর্দিতে, পুরানো জ্বরে, বিষাক্ত পোকায় কামড়ালে এর ডগা, পাতা ইত্যাদি ঔষধে (দ্র) লাগে।

বি. ব.

বেতার রেডিও দ্র
বেতার-তরঙ্গ কম্পন/কম্পাঙ্ক দ্র

বেতাল-পঞ্চবিংশতি

প্রাচীন সংস্কৃত গল্পগ্রন্থ। এতে পঁচিশটি গল্প আছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য গুরুর আদেশে বেতালকে আনতে যান। গাছে উল্টো হয়ে ঝুলন্ত সেই বেতালকে কাঁধে নিয়ে রাজা গুরুর কাছে যেতে থাকেন। বেতাল চুপচাপ চলার চেয়ে রাজার সঙ্গে গল্প বলা শুরু করে। বেতাল বলেছিল, সে প্রত্যেকটি গল্পের শেষে একটি প্রশ্ন করবে। সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলে বেতাল বিক্রমাদিত্যের কবল থেকে ছুটে গিয়ে উল্টো হয়ে আবার গাছে ঝুলতে থাকবে। আর রাজা যদি জেনেও সঠিক উত্তর না দেন, তা হলে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। এই শর্তে বিক্রমাদিত্য রাজি হন। কারণ এই বেতালকে গুরুর কাছে নিয়ে যেতে পারলে রাজা সিদ্ধপুরুষ হয়ে অশেষ ক্ষমতাশালী হবেন। এভাবে বেতালকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার সময় রাজা চব্বিশটি গল্পের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হন। প্রত্যেকটি গল্পের শেষে প্রশ্ন এবং বিক্রমাদিত্যের দেওয়া সমাধান—এই নিয়ে নানা রসের সমন্বয়ে গল্পগুলো বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পঞ্চবিংশতিতম গল্পটির উত্তর বিক্রমাদিত্যের মতো বিজ্ঞ রাজার পক্ষেও দেওয়া সম্ভব হয় নি। ফলে রাজা বেতালকে গুরুর কাছে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ ভাষায় এই বই অনূদিত হয়েছে। কোনো কোনো ভাষায় গল্পগুলো আবার অন্যরকম হয়ে গেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (দ্র) ১৮৪৭ সালে 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' বাংলায় অনুবাদ করেন। কবি লল্লুলালকৃত হিন্দী 'বৈতালপচ্চীসী'র অনুসরণে বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ রচনা করেন।

বি. ব.

বেদব্যাস / ব্যাস

মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র ও শক্তির পৌত্র। ঋষি পরাশরের পুত্র। মায়ের নাম সত্যবতী। গায়ের রঙ কালো এবং যমুনা দ্বীপে জন্ম হয়েছিল বলে তাঁর নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। বেদের বিভাগ করেন বলে নাম হয় 'বেদব্যাস'। মহাভারতের (দ্র) কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই প্রয়োজনের সময়ে এই মহাপ্রাজ্ঞ মুনির সদুপদেশ লাভ করেন। তাঁর বরে দিব্যচক্ষু লাভ করে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের (দ্র) সমস্ত বিবরণ কুরুপক্ষের অন্ধ রাজা যুতরাষ্ট্রকে জানাতেন। অন্য দিকে স্বজনবিনাশে বিষণ্ন যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব মহাভারতের শান্তিপর্বে বহু উপদেশ দান করেন। তাঁরই আদেশে পাপনাশের জন্য যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ (দ্র) যজ্ঞ করেন। দ্রৌপদীকে (দ্র) বিবাহের বিধান তিনিই দিয়েছিলেন।

বেদব্যাস সংস্কৃতে মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের রচয়িতা। পুত্র শুকদেবকে তিনি বেদ ও

www.pathagar.com

মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করছেন গণপতির সাহায্যে

মহাভারত অধ্যয়ন করান। বেদব্যাস চিরজীবীদের মধ্যে এক জন। পিঙ্গল জটা-শ্মশ্রুসহ তাঁর চেহারা নাকি অত্যন্ত কুৎসিত ছিল।

বি. ব.

বেদি

যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য আলাদাভাবে তৈরি পরিষ্কার ভূমিখণ্ড। বৃষোৎসর্গ, ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য বেদি তৈরি করা হয়। সাধারণত ঘরের (দ্র) বাইরে চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া এবং এক হাত উঁচু খুঁটি এবং আচ্ছাদিত বেদি ব্যবহার করা হয়। তবে কখনো কখনো জাঁকজমকের জন্য আট হাত লম্বা, আট হাত চওড়া বেদিও ব্যবহার করা হয়। শাস্ত্রানুযায়ী কেবলমাত্র বৈদিক ব্রাহ্মণেরই বেদিতে বসার অধিকার রয়েছে।

মে. খা.

বেনজীর আহমদ [১৯৩০—১৯৮৩]

কবি, সাংবাদিক ও রাজনীতিক। তিনি ১৯০৩ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার ধানুয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা বেশি হয় নি। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও (দ্র) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে ১৯২১ সালে তিনি গ্রেফতার হন। দীর্ঘদিন তাঁকে কারারুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। পরবর্তী কালে তিনি মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলনে (দ্র) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

বেনজীর আহমদ ১৯২৭ সালে নিজের সম্পাদনায় 'নওরোজ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি সহকারী সম্পাদক হিসাবে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকাতেও কাজ করেন। 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি সাংবাদিকতাসূত্রে জড়িত ছিলেন।

বেনজীর আহমদ মূলত কবি নজরুলের (দ্র) আদর্শ ও ভঙ্গির অনুসারী কবি। তাঁর কাব্যের মূল সুর হল বিদ্রোহ ও বিপ্লব। সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্গে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা প্রকাশে তাঁর কাব্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। 'বন্দীর বাঁশী' ও 'বৈশাখ' কবির দু'টি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থগুলো হল : 'আশ্চর্য আর আশ্চর্য', 'কমলমণি', 'ইসলাম ও কমিউনিজম', 'কোরানের গল্প'। বাংলা কবিতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

বেনজীর আহমদ ১৯৮৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

বেন্থাম, জেরেমি [১৭৪৮—১৮৩২]

ইংরেজ দার্শনিক এবং সমাজসংস্কারক। 'সর্বাধিক লোকের সর্বোচ্চ সুখ'ই হচ্ছে তাঁর দার্শনিক নৈতিকতার মূল নীতি।

জেরেমি বেন্থামের (Jeremy Bentham) জন্ম ১৭৪৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ইংল্যাণ্ডে। অক্সফোর্ড থেকে ১৭৬৩ সালে আইনের ডিগ্রি নিলেও বাস্তবে সারা জীবন তিনি ব্যয় করেছেন দর্শন, সমাজ, রাজনীতি ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে মতবাদ গড়ে তোলায় এবং বিভিন্ন ধরনের সংস্কারকাজের পেছনে। তিনি ছিলেন একটি উদারপন্থী দার্শনিক দলের নেতা। ইংল্যাণ্ডের প্রচলিত আইন-কানুনের সংস্কারসাধনই ছিল এই দলের মূল লক্ষ্য। এই দলে জেম্‌স্ ও স্টুয়ার্ট মিলের (দ্র) মতো ব্যক্তিবৃন্দও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বেন্থামের উদ্ভাবিত তত্ত্ব দার্শনিক মহলে 'উপযোগিতাবাদ' (utilitarianism) নামে খ্যাত। তাতে বলা হয়েছে 'কল্যাণই হচ্ছে তৃপ্তি অথবা তৃপ্তির কারণ। ব্যক্তিসত্তার স্বার্থের বা উপকারের পক্ষে যা উপযোগী তেমন সব কিছুই তার সার্বিক সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে সক্ষম।' প্রায় অনুরূপ মতবাদ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস (দ্র)

www.pathagar.com

ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগে আগ্রহী ছিলেন।

বেন্থামরচিত 'এ ফ্রাগমেন্ট অন গভর্নমেন্ট' (১৭৭৬) ইংল্যাণ্ডের তখনকার প্রচলিত আইন-কানুনের কঠোর সমালোচনামূলক গ্রন্থ। ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য প্রিন্সিপল্‌স্ অব মোরাল্‌স্ অ্যাণ্ড লেজিস্‌লেশন'। এই গ্রন্থের ভেতর দিয়েই বেন্থামের 'উপযোগিতাবাদ'-এর মূলনীতিগুলো পরিস্ফুট। এই নীতিই অচিরে শীর্ষস্থানীয় সামাজিক ও নৈতিক তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে, সাড়া তোলে ইউরোপের (দ্র) বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকায়।

১৭৯২ সালে বেন্থামকে ফ্রান্সের নাগরিক করা হয়। বেন্থাম মারা যান ১৮৩২ সালের ৬ই জুন।

আ. হ.

বেয়ার্ড্, জন্ লগি [১৮৮৮ —১৯৩৩]

টেলিভিশনের (দ্র) জনক জন লগি বেয়ার্ড (John Logie Baird) ১৮৮৮ সালে স্কটল্যাণ্ডের হেলেন্‌জবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। দৃশ্যমান প্রতিবিম্বকে প্রেরণ করা যে সম্ভব তা তিনিই প্রথম প্রদর্শন করেন। এই জন্যই তাঁর নাম টেলিভিশনের ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাঁর প্রথম চাকুরিটি ছিল একেবারেই দুঃখজনক। তাই ২৬ বছর বয়সে তিনি এই কাজ ত্যাগ করে নিজে কাজ করে আবিষ্কারক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্যে তিনি ৩৫ বছরে পা রাখেন।

১৯২৩ সালে তিনি বেতারের (দ্র) সাহায্যে ছবি ও শব্দ প্রেরণের একটি যন্ত্রের উপর কাজ শুরু করেন। অচিরেই তিনি একটি বেতার প্রেরকের সাহায্যে কয়েক ফুট দূরে একটি গ্রাহক যন্ত্রে অস্পষ্ট চিত্র প্রেরণে সক্ষম হন। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি লণ্ডনের (দ্র) রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে জনসাধারণের নিকট একটি 'টেলিভিশন ডেমন্‌স্ট্রেশন' দেন বা টেলিভিশনে ছবি প্রেরণ প্রদর্শন করেন। এটিই ছিল টেলিভিশনের প্রথম প্রদর্শন। বেয়ার্ডের যন্ত্রের উপর ভিত্তি করে ১৯২৯ সালে বি বি সি (দ্র) প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার চালু করে। লগি বেয়ার্ডই প্রথম 'দৃশ্য ও শব্দ' বাইরে সম্প্রচারে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি আধুনিক টেলিভিশনের ভিত্তি ক্যাথোড (দ্র) রে টিউব ব্যবহারে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাই ১৯৩৩ সালে তাঁর পদ্ধতি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে নি।

শা. ত.

বেরিবেরি ভিটামিন দ্র

বের্গ্‌সঁ, অঁরি [১৮৫৯—১৯৪১]

ফরাসি দার্শনিক ও অধ্যাপক অঁরি বের্গ্‌সঁ (Henri Bergson) আধুনিক ভাববাদের (দ্র) অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর 'অন্তর্গত কালাতিপাত' (Inner Duration), 'সৃজনশীল অভিব্যক্তি' (Creative Evolution) এবং 'মানুষের বোধশক্তির সীমা' (limits of human intelligence) সম্পর্কিত ধারণা-সমূহের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

বের্গ্‌সঁ ১৮৫৯ সালের ১৮ই অক্টোবর প্যারিসে (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁর শিক্ষা শেষ হয়। ১৮৮৩ সালে ক্লেরমঁ ফেরঁ (Clermont Ferrand)-তে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯০০ সালে তিনি কলেজ দ্য ফ্রাঁস্ (College de France)-এ অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯২১ সালে এই কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাক্‌পটু শিক্ষক। ১৯১৮ সালে তিনি ফরাসি একাডেমীর সদস্য নির্বাচিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় তিনি কূটনৈতিক মিশনে যোগ দেন। পরবর্তী কালে তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (League of Nations) কমিটি ফর ইন্টেলেকচুয়েল কো-অপারেশন —যার পরে নাম হয় ইউনেস্কো (দ্র), তার সভাপতি হন।

ছাত্রজীবনে বের্গ্‌সঁ গণিত (দ্র)-শাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি গাণিতিক ও যান্ত্রিক ধারণার অগ্রগণ্যতা পরিহার করেন এবং অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কালাতিপাত (experienced duration)-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, এ ধরনের অভিজ্ঞতা পরিমাপ করা যায় না। যেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব। মানুষ কালক্রমে যেভাবে বেড়ে ওঠে, তা-ই তার দৈনন্দিন আচরণে প্রকাশ পায়, তা কখনো পূর্বনির্ধারিত বিষয় নয়। তিনি বলেন, পরিবর্তন নিত্য (permanence) অপেক্ষা অধিকতর সত্য। সত্য অবিভাজ্য ও পরিমাপের অযোগ্য। তাই সময় বা কাল তাঁর কাছে মহত্তর সত্যের নির্দেশক।

www.pathagar.com

তাঁর মতে, মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত। তিনি বলেন, দর্শনে প্রত্যক্ষ অনুভূতিই তত্ত্বজ্ঞান লাভের একমাত্র পন্থা।

বের্গ্‌সঁ আসলে স্বজ্ঞাবাদের (intuitionism) প্রতিনিধি। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান নয়, উপলব্ধি বা স্বজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান (দ্র)। তিনি একই সঙ্গে বুদ্ধি ও যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে চলেন বলে তাঁর তত্ত্বকে অ-যুক্তিবাদের দর্শনও বলা হয়ে থাকে।

বের্গ্‌সঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো (ইংরেজি অনুবাদে) হল : 'Time and Free Will' (১৮৮৯), 'Matter and Memory' (১৮৯৬), 'Creative Evolution' (১৯০৭), 'The Two Sources of Morality and Religion' (১৯৩২)। দার্শনিক রচনাবলির জন্য তিনি ১৯২৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

বের্গ্‌সঁ ১৯৪১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

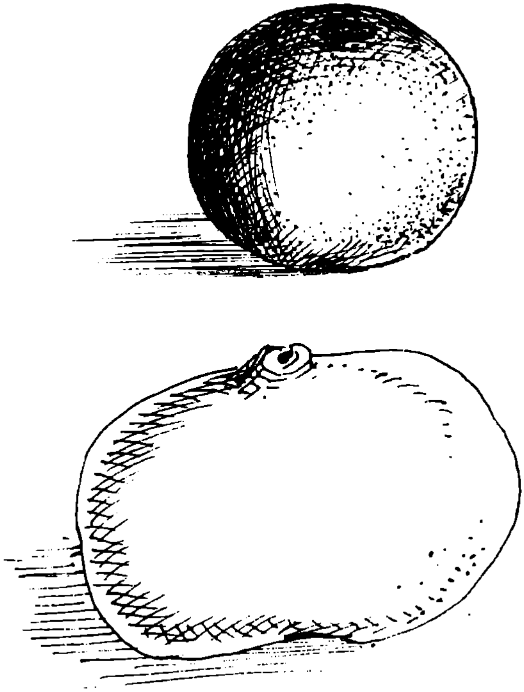

বেল / কদবেল

লেবু গোত্রের এই গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম *ঈগ্‌লে মার্মেলোস (Aegle marmelos)*, গোত্র রুতাসি (Rutaceae)। বাংলাদেশে (দ্র) সর্বত্র বেল জন্মে। গাছের উচ্চতা ২০-২৫ ফুট হয়। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার প্রত্যেক কক্ষে দু'টি করে কঠিন ও তীক্ষ্ণ কাঁটা হয়। এটি লেবু গোত্রের গাছের বৈশিষ্ট্য। পাতা যৌগিক ও তিনটি করে থাকে, উপপত্র নেই। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাতা ঝরে যায় ও বৈশাখ মাসে নতুন পাতা ও ফুল আসে। এ সময় গাছে পাকা বেল থাকে। গোলাকার ফলের কঠিন খোল কাঁচা অবস্থায় সবুজ এবং পাকলে হলুদ বা পীত হয়। ফলের ভেতরটি ৮-১৫টি কক্ষে বিভক্ত এবং প্রতি কক্ষে সাদা আঠার মধ্যে বহু বীজ থাকে। বীজের বাইরের ত্বক আঠালো। শাঁস কাঁচা অবস্থায় সাদা, পাকলে হলদে, মিষ্টি ও মধুর গন্ধে ভরপুর। ফুল থেকে ফল পাকতে ১১ মাস লাগে। এরকম খুব কম ফলের বেলাতেই ঘটে।

কচি বেল চাকা-চাকা করে কেটে শুকিয়ে বেলশুট করা হয়। এই শুকনো শাঁস আমাশয় (দ্র), উদরাময় (দ্র) ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। পাকা বেলের শরবত সুস্বাদু। কিন্তু পাকা ফল বা শরবত দীর্ঘদিন খেলে অন্ত্রে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ তৈরি হয়। আবার কাঁচা বেল পুড়িয়ে শরবত করে খেলে কোষ্ঠবদ্ধতা তো দূর হয়ই বরং অন্ত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ বন্ধ হয়। কবিরাজী মতে এই শরবতই স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম। কাঁচা বেল থেকে মোরব্বা হয়। কচি পাতা স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। বেলপাতা শিবপূজায় অপরিহার্য।' বেলকে বিল্বফল, শ্রীফলও বলে।

রুতাসি পরিবারের আরেক সদস্য কদবেল। বৈজ্ঞানিক নাম *ফেরোনিয়া লিমোনিয়া (Feronia limonia Linn Swingle)*। পথের ধারে বা যেখানে-সেখানে এই গাছ জন্মে। এটি ঝোপঝাড়ময় হলেও এর পাতা দেখতে অনেকটা কামিনী ফুলের পাতার মতো। ডাল কালচে। পত্রদণ্ডের দু'দিকে ৫-৭টি পাতা থাকে, পাতা সুগন্ধযুক্ত। বর্ষায় প্রথমে সাদা সাদা ফুল ও পরে ফল হয়। ফল পুষ্ট হয়ে পাকে পৌষ-মাঘ মাসে। কিন্তু তার আগেই তা কাঁচা অবস্থায় বাজারে চলে আসে ও রোদে শুকিয়ে পাকানো হয়। পৌষ-মাঘে গাছের পাতা শূন্য হয়ে যায়। ফল গোলাকার, ধূসর, খোলা শক্ত। এ বেল আকারে বেশ ছোট। কাঁচা অবস্থায় স্বাদ কষায়, পাকলে মধুর-টক। ফলে থাকে বহু বীজ, বীজ একটু চ্যাপ্টা। পাকা শাঁসের রঙ কালচে ধূসর, কিন্তু গন্ধ

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যময়। পাকা ফলের বোঁটার দিকে ছিদ্র করে নুন ও গুঁড়ো লঙ্কা মিশিয়ে আচার বানিয়ে কাঠি দিয়ে খেতে সুস্বাদু, ছেলে-মেয়ে ও গৃহিণী সবার প্রিয় খাবার।

কদবেলের পাতা, ছাল, কচি ও পাকা, শাঁস, গাছের আঠা ওষধি গুণে ভরপুর। পিত্তপাথুরিতে, পেটের বায়ুতে, রক্তপিত্তে, আমাশয়ে, হেঁচকিতে, প্রবল বমি ও শ্বাসে, মেচেতায়, চোখের পাতা ঝরায় কদবেল খুব উপকারী।

বি. ব.

বেল, আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম [১৮৪৭—১৯২২]

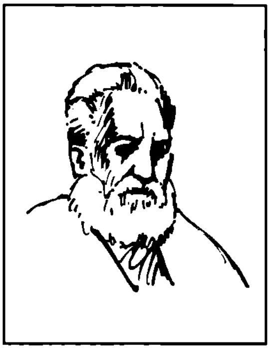

বেল (Alexander Graham Bell) ছিলেন এক জন মার্কিন পদার্থবিদ ও আবিষ্কারক।

১৮৪৭ সালে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় (Edinburg) তাঁর জন্ম। তিনি ১৮৭৬ সালে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের জন্যই মূলত বিশ্বে সুপরিচিত হয়ে আছেন। কিন্তু বধিরদের কথা বলা শেখানোর কাজের জন্যও তিনি স্মরণীয়। বধিরদের সুস্পষ্টভাবে কথা বলা শেখানো মূলত তাঁর পারিবারিক পেশা ছিল। তাঁর পরিবারের সব সদস্যই এ পেশায় ছিলেন সুদক্ষ। এ বিষয়ে কাজ করার জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) যান। তিনি বাক্-বলবিদ্যা বা স্পিচ্ মেকানিক্স নিয়ে গবেষণা করেন। এ সকল গবেষণার উপর ভিত্তি করে তাঁর বিভিন্ন আবিষ্কার বিকাশ লাভ করে। তিনি সম্পূর্ণ বধির ব্যক্তিকে কথা বলা শেখানোর কাজে দক্ষতা অর্জন করেন এবং দু'জন বিশেষ বধির শিক্ষার্থীকে কথা বলাতে কৃতকার্য হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের (দ্র) অন্যান্য গবেষণায় তাঁর আগ্রহ দেখে এসব শিক্ষার্থীর অভিভাবকেরা তাঁকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর গবেষণার একটি ফল টেলিফোন (দ্র)। টেলিফোন তৈরি ও বিক্রয়ের জন্য তিনি একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এই অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমেরিকার একটি বিখ্যাত কর্পোরেশনের নাম হয়েছে 'Bell Telephone Systems'। গ্রাহাম বেল বধিরদের জন্য শিক্ষা- প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক প্রোব (electric probe)। এই বৈদ্যুতিক প্রোব দিয়ে মানবদেহের ভেতরে বুলেটের অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। তিনি এমন একটি ঘুড়ি (দ্র) আবিষ্কার করেছিলেন যা একটি মানুষকে বহন করে উড়তে পারত।

তিনি ১৮৯৮ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি বর্তমান বিশ্বে চমৎকার রঙিন ছবির জন্য বিখ্যাত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন (National Geographic Magazine) নামে পত্রিকা চালু করেন। শিক্ষণের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ছবি —এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে গ্রাহাম বেল পত্রিকাটি চালু করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল ১৯২২ সালে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

হো. আ.

বেলুন (balloon)

রাবার (দ্র), প্লাস্টিক (দ্র) বা নাইলন (দ্র) জাতীয় পদার্থের তৈরি থলে বা মোড়ক, যা বাতাস (দ্র) অথবা বাতাসের চেয়ে হালকা কোনো গ্যাস দিয়ে পূর্ণ করলে প্রসারিত হয়, আবার গ্যাস (দ্র) বা বাতাস বের করে নিলে সঙ্কুচিত বা ছোট হয়। বিশেষ আনন্দ-অনুষ্ঠানে ঘরবাড়ি, দোকান, অফিস, বিদ্যালয় ইত্যাদি সাজানোর জন্য রঙিন বেলুন ব্যবহার করা হয়।

শিল্পীর কল্পনায় বেলুনে করে চাঁদে যাত্রা—১৮৩৬

www.pathagar.com

উপহার হিসাবে রঙবেরঙের বেলুন পেলে শিশুরা খুশি হয়। কোনো কোনো অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয় বেলুন উড়িয়ে।

মানুষের আকাশে ওড়ার সাধ থেকে বেলুন আবিষ্কৃত হয়। দু' শ' বছরেরও আগে এতিয়েন্ মঁগোল্‌ফিয়ে ও জোসেফ্ মঁগোল্‌ফিয়ে (Etienne এবং Joseph Montgolfier) নামে ফ্রান্সের দুই ভাই প্রথম বেলুন দ্বারা আকাশে উড়েছিলেন। তাঁদের এই বেলুন ওড়ানোর জন্য তাঁরা ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে হালকা গরম বাতাস ব্যবহার করেছিলেন। এ ধরনের বড় বেলুনের নিচের দিকে মানুষ বা জিনিসপত্র বহনের জন্য ঝুড়ির ব্যবস্থা থাকে। বেলুনকে

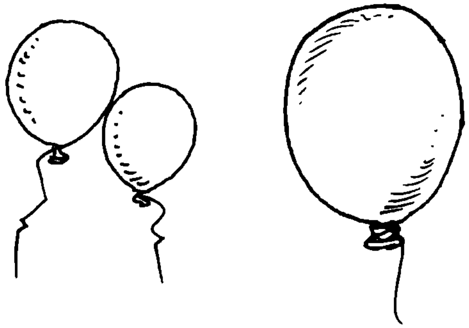

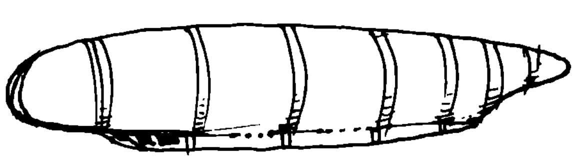

ওড়ানোর জন্য এর ভেতরের বায়ুকে গরম রাখার ব্যবস্থা থাকে। আধুনিক বেলুনের ভেতরের বাতাসকে অনবরত গরম রাখার জন্য গ্যাস বার্নার ব্যবহার করা হয়। বার্নারটি জ্বালানো হলে বেলুনটি বড় হতে থাকে। এর ভেতরের বাতাস ঠাণ্ডা হলে প্রসারতা কমে আসে। সাজ-সজ্জার জন্য যে বেলুন ব্যবহৃত হয় বা মেলায় যে খেলনা বেলুন পাওয়া যায়, তাতে হিলিয়াম (দ্র) গ্যাস ভরা থাকে। হাইড্রোজেন (দ্র) সবচেয়ে হালকা গ্যাস। তাই ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বেলুন ওড়ানোর কাজে এই গ্যাস ব্যবহৃত হত। কিন্তু হাইড্রোজেন (দ্র) গ্যাস দাহ্য পদার্থ বলে এতে সহজেই আগুন (দ্র) ধরে যায়। কতকগুলো মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার পর বেলুনে হাইড্রোজেনের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবহণের কাজে বেলুন ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ হিলিয়াম জ্বলে না এবং বর্তমানে এটি সহজে পাওয়াও যায়।

আধুনিক কালে বেলুন সাধারণত আনন্দ অথবা খেলাধুলার জন্য ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশ বেলুনে ভ্রমণকারীদের জন্য প্রতিযোগিতারও আয়োজন করে থাকে। ইংল্যাণ্ডের রিচার্ড ব্রানসন (Richard Branson) ও সুইডেনের পের্ লিণ্ডস্ট্রাণ্ড (Per Lindstrand) ১৯৮৭ সালে বেলুনে প্রথম আটলাণ্টিক মহাসাগর (দ্র) পাড়ি দেওয়ার রেকর্ড করেন। ফ্রান্সের মিশেল্ আর্নঁ ১৯৮৪ সালে একটানা ৪০ ঘণ্টা বেলুনে ভ্রমণ করেন। আবহাওয়ার (দ্র) তথ্য সংগ্রহের জন্য বেলুন ব্যবহার করা হয়। বায়ুচাপ (দ্র), তাপমাত্রা (দ্র), দ্রুতি ইত্যাদি পরিমাপের যন্ত্রপাতি সমেত বেলুন রেডিওসঙ্কেতের সাহায্যে তথ্য পাঠায় অথবা পৃথিবীতে (দ্র) ফিরে এলে রেকর্ডকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষক ও জ্যোতির্বিদগণও তাঁদের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বেলুন ব্যবহার করেন। সসিজ-এর আকারবিশিষ্ট ইঞ্জিনযুক্ত বেলুনকে এয়ারশিপ (airship) বলে, যা ফটোগ্রাফি (দ্র) ও টেলিভিশনের (দ্র) কাজের জন্য নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। এয়ারশিপ যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

হো. আ.

বেসবল (baseball)

আমেরিকার (দ্র) জাতীয় খেলা। আমাদের দেশের ডাংগুলি খেলার সঙ্গে এই খেলার কিছুটা মিল লক্ষ করা যায়।

১৮৩৯ সালে এক মার্কিন ভদ্রলোক অ্যাব্‌নার্ ডাব্‌ল্‌ডে (Abner Doubleday) বেসবল খেলা আবিষ্কার করেন। ১৯১৪-১৫ সালে আমেরিকায় বেসবল লীগ চালু হয়। ১৮৪১ সালের পর খেলাটি আমেরিকায় ব্যাপক প্রসার লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় মার্কিন সৈন্যরা কয়েকটি

www.pathagar.com

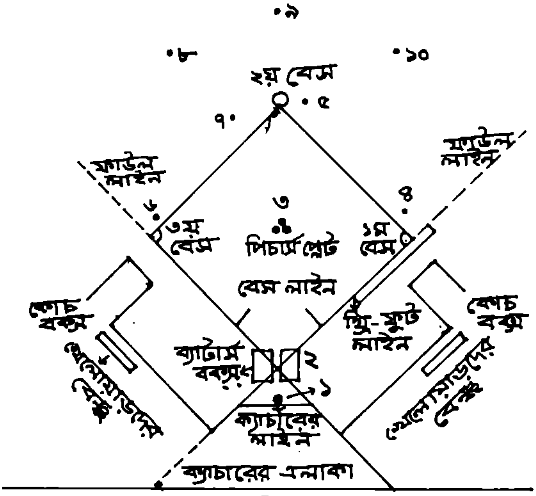

১ - ক্যাচার। ২ - ব্যাটার। ৩ - পিচার। ৪ - প্রথম বেসম্যান। ৫ - দ্বিতীয় বেসম্যান। ৬ - তৃতীয় বেসম্যান। ৭ - শর্ট স্টপ। ৮ - লেফট ফিল্ডার। ৯ সেন্টার ফিল্ডার। ১০ - রাইট ফিল্ডার।

দেশে এই খেলার প্রচলন করে।

বেসবল খেলায় ব্যবহৃত গ্লাভ্স্ আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৫ সালে। আবিষ্কারকের নাম চার্লস জি. ওয়েট। একই বছর মাস্ক আবিষ্কার করেন ফ্রেড ডব্লিউ. হায়ার।

বেসবল খেলায় মাঠকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটি ভাগকে 'ইনফিল্ড'(infield) বলা হয়, অপর ভাগ 'আউটফিল্ড'(outfield) নামে পরিচিত। ইনফিল্ডে থাকে 'হোম প্লেট' এবং তিনটি 'বেস।' হোম প্লেট থেকে প্রথম বেসের দূরত্ব.৯০ ফুট। প্রথম বেস থেকে দ্বিতীয় বেস, দ্বিতীয় বেস থেকে তৃতীয় বেস এবং তৃতীয় বেস থেকে হোম প্লেটের দূরত্বও ৯০ ফুট।

'ব্যাটার্স বক্স' (batter's box) নামক স্থানে ব্যাট্স্ম্যান ব্যাট হাতে দাঁড়ায়। আরেক জন খেলোয়াড় 'পিচার বক্স' (pitcher box) নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বল ছোঁড়ে। পিচার বক্স থেকে হোম প্লেটটি ৬০ ফুট ৬ ইঞ্চি দূরে অবস্থিত। আউটফিল্ডের কোনো নির্ধারিত সীমানা নেই।

যে বলটি দিয়ে বেসবল খেলা হয় তার ওজন পাঁচ থেকে সোয়া পাঁচ আউন্স হয়ে থাকে। বলের পরিধি হয় নয় থেকে সোয়া নয় ইঞ্চি।

বেসবল খেলা দু'টি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি দলে ন' জন করে খেলোয়াড় থাকে। এই ন' জন খেলোয়াড়কে বলা হয় ক্যাচার, পিচার, ফার্স্ট ব্যাট্স্ম্যান, সেকেণ্ড ব্যাট্স্ম্যান, থার্ড ব্যাট্স্ম্যান; সট স্পট, রাইট ফিল্ডার,

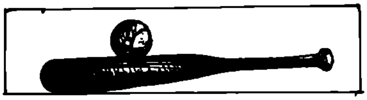

সেন্টার ফিল্ডার এবং লেফ্ট্ ফিল্ডার।

টি. কি.

বেহালা

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সঙ্গীতযন্ত্র। পাশ্চাত্য নাম ভায়োলিন (violin)। পাশ্চাত্য বণিকেরা এই যন্ত্র ভারতে (দ্র) আনয়ন করে। এখানে এর নাম হয় বেহালা। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন ভারতীয় পিণাকী বীণা থেকে বেহালার উৎপত্তি। কিন্তু এই ধারণার ব্যাপক সমর্থন নেই। বেহালাকে বাহুলীন বলা হয়েছে কোথাও কোথাও। ১৬০০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে ইতালির বাদ্যযন্ত্র নির্মাতাগণ ভায়োলিনের বর্তমান রূপ দান করেন। এ ব্যাপারে আন্তোনিও স্ত্রাদিভারি-র (Antonio Stradivari) ব্যক্তিগত অবদান সর্বোচ্চ। হালকা কাষ্ঠনির্মিত প্রকোষ্ঠের সঙ্গে ক্রমশ সরু বাদনদণ্ড যুক্ত করে বেহালা তৈরি করা হয়। এর চারটি তার—দু'টি তাঁতের, একটি লোহার (দ্র) ও একটি নিকেলের (দ্র) তার থাকে। প্রকোষ্ঠের মাঝামাঝি স্থাপিত একটি ব্রিজের ওপর দিয়ে দণ্ড বরাবর নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত তারগুলো টানা থাকে। ওপরের দিকে তার বাঁধার কান থাকে। ছড় দিয়ে ঘষে তার থেকে শব্দ বের করে বেহালা বাজানো হয়। ডান হাতে ছড় চালিয়ে বাঁ হাতে ফিঙ্গারবোর্ডে বা পটরিতে আঙুল দিয়ে স্বরস্থান ধ্বনিত করে বেহালা বাজাবার রীতি। অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্যে অর্কেস্ট্রার (দ্র) মুখ্য যন্ত্ররূপে বেহালার স্থান হয়। বেহালা সুরেলা উচ্চনাদী যন্ত্র। মানুষের কণ্ঠস্বরের মতো মনোরম এর আবেদন। ভারতবর্ষে রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত(দ্র) উভয় ক্ষেত্রেই বেহালার প্রয়োগ ঘটে। একক ও সহযোগী যন্ত্ররূপেও এর বিশিষ্ট স্থান। কর্ণাটকী সঙ্গীতে (দ্র) বেহালার অতি বিশিষ্ট মর্যাদা। রাগসঙ্গীতের পটভূমিতে নানা ঘরানায় বেহালা বাদনের বিকাশ ঘটে।

পাশ্চাত্যে ভায়োলিনের বৃহত্তর সংস্করণকে বলা হয় ভিয়োলা (viola)। এর ধ্বনি ভায়োলিনের ধ্বনির চেয়ে মন্দ্র ও গম্ভীর। ভায়োলঞ্চেলো (violoncello) বা চেলো ভিয়োলার চেয়েও আকৃতিতে বৃহৎ। এর ধ্বনি ভিয়োলার ধ্বনির চেয়ে মন্দ্র। মানুষের কণ্ঠস্বরের মতো মনোরম এর ধ্বনি। চেলোর

www.pathagar.com

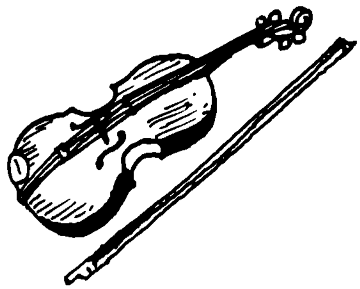

চেয়েও বৃহৎ ভায়োলিনের নাম ডাবল বেস, কন্ট্রাবেস বা বেস ভিয়ল। ভায়োলিন পরিবারে ডাবল বেসের ধ্বনি মন্দ্রতম।

তারযন্ত্র বাজাবার প্রধান প্রক্রিয়া দু'টি : লেগাটো বা অবিচ্ছিন্ন বাদন এবং স্টাক্কাটো বা ছিন্ন বাদন। ঘষে বাজালে লেগাটো হয়, টোকা দিয়ে বাজালে স্টাক্কাটো হয়। লেগাটো বাদনের মধুরতম রূপটি ফোটে ভায়োলিনে বা বেহালায়।

ক. গো.

বেহেশ্‌ত্‌

আরবি 'জান্নাত' শব্দটি এ দেশে 'বেহেশ্‌ত্‌' হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত। আভিধানিক অর্থ মনোরম বৃক্ষরাজিপরিপূর্ণ বাগান। ইসলামী পরিভাষায় বেহেশ্‌ত্‌ হচ্ছে পরকালে মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত চিরশান্তিময় আবাসস্থল। পবিত্র কুরআন শরীফে (দ্র) আট ধরনের বেহেশ্‌তের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে 'জান্নাতুল ফেরদৌস' সর্বোৎকৃষ্ট।

মু. মা.

বৈজ্ঞানিক গবেষণা গবেষণা, বৈজ্ঞানিক দ্র

বৈদ্যুতিক জেনারেটর

যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রে যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে বৈদ্যুতিক জেনারেটর বলে। সাধারণত দু'ভাবে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় : এদের একটি হল বিদ্যুৎকোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা; অপরটি, কোনো ঘূর্ণনশীল মেশিন ব্যবহার করে তড়িৎচৌম্বক ক্রিয়া দ্বারা। বিদ্যুৎ (দ্র) উৎপাদনকারী ঘূর্ণনশীল মেশিনকে বৈদ্যুতিক জেনারেটর বা সংক্ষেপে জেনারেটর (generator) বলে। জেনারেটরের ক্ষুদ্র রূপকে বলা হয় ডায়নামো (dynamo)।

এই বৈদ্যুতিক জেনারেটরের নীতির আবিষ্কারক মাইকেল ফ্যারাডে (দ্র)। তিনি দেখান যে কোনো পরিবাহী (দ্র) তারকে যদি তড়িৎক্ষেত্রের আড়াআড়ি চালনা করা হয়, তা হলে তারটিতে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। দু'টি চুম্বক-মেরুর মধ্যে পরিবাহী তারের কুণ্ডলী ঘোরানোর ব্যবস্থা করে সবচেয়ে সরল জেনারেটর তৈরি করা হয়। এ কাজটিই ১৮৩১ সালে মাইকেল ফ্যারাডে করেছিলেন। এ কথা বলা বাহুল্য হবে না যে আমাদের বর্তমান জীবনধারণপ্রণালীর প্রায় পুরোটাই এসেছে তাঁর আবিষ্কার থেকে। ফ্যারাডের প্রথম জেনারেটরটি ছিল ল্যাবরেটরি বেঞ্চ মডেলের, যা তিনি হাতে ঘুরিয়েছিলেন। আধুনিক পাওয়ার স্টেশনে মেশিনটি ঘোরানো হয় যান্ত্রিক উপায়ে। কয়লা (দ্র), তৈল বা নিউক্লীয় পাওয়ার স্টেশনে জেনারেটরকে বাষ্পীয় টার্বাইনের (দ্র) সাহায্যে ঘোরানো হয়। বাষ্পীয় টার্বাইনটি জেনারেটরের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত থাকে। এই টার্বাইন ও জেনারেটরের সেটকে বলা হয় টার্বোজেনারেটর (turbo-generator)। পানিবিদ্যুৎ স্টেশনে ওয়াটার টার্বাইনের সাহায্যে জেনারেটরের ঘোরানোর কাজটি করা হয়।

শা. ত.

বৈদ্যুতিক মোটর

জেনারেটরে পরিবাহী (দ্র) তারকে চৌম্বক ক্ষেত্রের (দ্র) মধ্যে গতিশীল করে বিদ্যুৎ (দ্র) উৎপন্ন করা হয়, কিন্তু বৈদ্যুতিক মোটরে চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত পরিবাহী তার দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হয়, এতে পরিবাহী তারে বল (দ্র) উৎপন্ন হয় এবং এই বল তারকে গতিশীল করে। সুতরাং বৈদ্যুতিক মোটর হল বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ। বৈদ্যুতিক মোটর দু' ধরনের হয় : ডি.সি. মোটর ও এ.সি. মোটর। বৈদ্যুতিক মোটরের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে ইলেক্ট্রিক শেভার, বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প (দ্র), রোলিং মিল ইত্যাদিতে। রেলগাড়ি (দ্র) ও কলকারখানায় বড় বড় মেশিন চালাতেও বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহৃত হয়। এ.সি. মোটর পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহে(এ.সি.) চলে এবং সাধারণত কলকারখানায় রোটর বা ঘূর্ণক ব্যবহার করা হয়। রেলগাড়ি (দ্র) চালাতে ব্যবহার করা হয় ডি. সি. মোটর। যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের অত্যন্ত সুবিধাজনক ও পরিচ্ছন্ন যন্ত্র হল বৈদ্যুতিক মোটর। বৈদ্যুতিক মোটরের আরো একটি সুবিধাজনক দিক হল,

www.pathagar.com

এটি সরাসরি ঘূর্ণনগতি উৎপাদন করে। কিন্তু পেট্রোল-ইঞ্জিনে পিস্টনের অগ্র-পশ্চাৎ গতিকে ঘূর্ণনগতিতে রূপান্তর করতে হয়।

শা. ত.

বৈষ্ণবধর্ম

হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর (দ্র) উপাসকগণ 'বৈষ্ণব' নামে পরিচিত। সপ্তম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ প্রথম বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে রামানন্দ এই ধর্মের সংস্কার সাধন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব (দ্র) বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটান। প্রধানত তাঁর অনুসরণীগণই বৈষ্ণব নামে পরিচিত। শ্রীচৈতন্যদেব ওড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারে ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে জগতের প্রতিটি মানুষের প্রতি ভালবাসা, জীবে দয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। পূজা-পার্বণের আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের চেয়ে শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বরের গুণকীর্তনের উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিভাব এক অভূতপূর্ব জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম সারা বাংলার ধর্মীয় ধারায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিরস বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

পরবর্তী যুগের অসংখ্য সাধক সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মমত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

টি. কি.

বৈষ্ণব পদাবলী

বিষ্ণুর (দ্র) ভক্তদের বৈষ্ণব বলা হয়। তাদের ধর্মের নাম বৈষ্ণবধর্ম (দ্র)। কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন কাল থেকে এই ধর্ম বিদ্যমান। বেদে বৈষ্ণবধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব (দ্র) রচিত 'গীতগোবিন্দ' (দ্র) কাব্যে 'পদাবলী' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। পদাবলীকে সাধারণত শ্রীকৃষ্ণ (দ্র) ও শ্রীচৈতন্যদেবের (দ্র) লীলাকথা নিয়ে গান করার জন্য রচিত কমনীয় কবিতা বোঝায়। বৈষ্ণব পদাবলী একাধারে সাহিত্য এবং সাধনার অবলম্বন। শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন (বা অনুভব) করার ও করাবার জন্য পদাবলী রচিত হয়েছে। পদাবলী রচয়িতাদের 'মহাজন' আখ্যায় সম্মানিত করা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব এক জন পরম বৈষ্ণব। তাঁর আবির্ভাবে সমগ্র বাংলা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের আগে পদাবলীর দু'টি ধারা বিদ্যমান ছিল—একটি বিদ্যাপতির (দ্র), অন্যটি চণ্ডীদাসের (দ্র)। বিদ্যাপতির পদ রাজরানীর মতো অলঙ্কারভূষিতা। চণ্ডীদাসের পদ সহজ, সরল ও অলঙ্কারবর্জিত। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবিরা চণ্ডীদাসের ধারা অনুসরণ করেন। তাঁদের মধ্যে নরহরি সরকার(দ্র), গোবিন্দ আচার্য, মুরারি গুপ্ত, বলরাম, বংশীবদন উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্য নিজেকে রাধাভাবে ভাবতেন, অর্থাৎ রাধা (দ্র) হিসাবে নিজেকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার সাধনা করতেন। তাঁর প্রেরণায় পদকর্তারা শ্রীরাধার ভাবধারা অঙ্কন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর পর ষোড়শ শতাব্দীতে খ্যাতিমান পদকর্তারা হলেন জ্ঞানদাস (দ্র), রায়শেখর, লোচনদাস, গোবিন্দদাস কবিরাজ (দ্র) ও নরোত্তম ঠাকুর। তার পরে অনেক পদকর্তা বা পদাবলী রচয়িতা আসেন। ১৭শ ও ১৮শ শতক পর্যন্ত পদাবলী খুব জনপ্রিয় ছিল।

পদাবলীসঙ্কলকদের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সবচেয়ে প্রাচীন। পদাবলীর বৃহত্তম সঙ্কলন বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'। এতে ৩১০১টি পদ আছে। ১২৯২ বাংলা সনে রবীন্দ্রনাথ (দ্র) ও শ্রীশচন্দ্র

www.pathagar.com

মজুমদার সঙ্কলন করেন 'পদরত্নাবলী'। এতে ১১০টি অতি উৎকৃষ্ট পদাবলী সঙ্কলিত হয়। এ পর্যন্ত ৬ হাজার বৈষ্ণব পদাবলী ছাপা হয়েছে। এ ছাড়া আরো পাঁচ-ছয় হাজার পদ অমুদ্রিত আছে বলে জানা যায়।

ভারতচন্দ্র (দ্র), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (দ্র), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র), রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বিশিষ্ট কবিগণ পদাবলীর অনুকরণে পদাবলী রচনা করেছেন।

প্রসঙ্গত, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব হিন্দু কবিগণই যে শুধু পদাবলী রচনা করেছিলেন এমন নয়। পদকর্তাদের মধ্যে কিছু ইসলাম ধর্মাবলম্বীও ছিলেন, যেমন—কবীর, কমর আলী, চাঁদ কাজী, নশীর মামুদ, মিল ফএজোল্লা, মনুঅর, পির মহম্মদ প্রমুখ।

বি. ব.

বোদ্‌ল্যার্, শার্ল্ পিয়ের্ [১৮২১—১৮৬৭]

ফরাসি কবি শার্ল্ বোদ্‌ল্যার্‌কে (Charles Pierre Baudelaire) এখন সমগ্র বিশ্বেই আধুনিক কবিতার জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সারা জীবনই তাঁর কষ্টের মধ্যে কেটেছিল, কিন্তু তার ভিতরেও তিনি যুগান্তকারী কিছু কবিতা ও শিল্প সমালোচনা উপহার দিতে পেরেছিলেন। তাঁর সর্বাধিক খ্যাত কাব্যের নাম 'লে ফ্ল্যর্ দু মাল্' (Les fleurs du mal অর্থাৎ ক্লেদজ কুসুম) এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধগ্রন্থ হল 'জুর্নো জ্যাতিম্' (Journaux Intimes বা অন্তরঙ্গ ডায়রি)। জীবদ্দশায় তত বিখ্যাত হন নি, কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে আদৃত হয়ে আসছেন। বাংলা ভাষাতে অনেকেই তাঁর কবিতা অনুবাদ করেছেন, তবে বুদ্ধদেব বসুর (দ্র) অনূদিত কাব্যই সম্ভবত সর্বাধিক খ্যাত ও জনপ্রিয়।

হা. মা.

বোধিদ্রুম অশ্বত্থ বা পিপ্পল দ্র

বোধিসত্ত্ব

'বোধি' (দ্র) অর্থাৎ যে জ্ঞানে মানুষের উদ্ধার হয়। এই জ্ঞানের জন্য যে প্রাণী (বা সত্ত্ব) চেষ্টা করে, তাকে বোধিসত্ত্ব বলে। গৌতম বুদ্ধের (দ্র) জন্ম থেকে তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ পর্যন্ত এই 'বোধিসত্ত্ব' বিশেষণটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে বর্তমান জন্মের পূর্বজন্মসমূহ, অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য তাঁকে যে দীর্ঘ সাধনা করতে হয়েছিল সেই সব জন্মসমূহে তাঁকে 'বোধিসত্ত্ব' বিশেষণে ভূষিত করা হয়।

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে। ধ্যানমগ্ন হয়ে রাতের প্রথম যামে (বা প্রহরে) তিনি তাঁর পূর্বজন্মসমূহের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। জাতক (দ্র)-কাহিনীতে সেই সব কথা বর্ণিত আছে। তিনি তাঁর পূর্বজন্মসমূহে নিজেকে 'বোধিসত্ত্ব' হিসাবে ভূষিত করেছেন। বলা হয়, বুদ্ধত্ব লাভের আগে তিনি ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন।

মহাযান (দ্র) মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ নিজেদের বোধিসত্ত্ব বলে মনে করেন। এই জন্য মহাযান হল বোধিসত্ত্বযান। সকল জীবের জন্য তিনি অপরিসীম করুণা ও মৈত্রী অনুভব করেন। তিনি পরের কল্যাণের জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করেন, মমতা অনুভব করেন, দুঃখ ভোগ করেন, মৃত্যুবরণ করেন। আবার দুঃখীর দুঃখভার গ্রহণ করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। এই চর্যাই তাঁর আদর্শ। জগতের সকল প্রাণীর জন্য পরম করুণা অনুভব করেন বলে বোধিসত্ত্ব পরম ও মহাকরুণাময়। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' গ্রন্থে এর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

বি. ব.

বোনাপার্ট, নেপোলিয়ন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দ্র

বোলিভার্, সিমোন্ [১৭৮৩—১৮৩০]

দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) মুক্তিদাতা হিসাবে তাঁর পরিচয়। ভেনেজুয়েলাস্থ কারাকাসের এক ভূস্বামী পরিবারে ১৭৮৩ সালের ২৪শে জুলাই সিমোন্ বোলিভার্ (Simon Bolivar) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি পিতা-মাতাকে হারান। তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন বেশ কয়েক জন গৃহশিক্ষকের কাছে। তাঁরাই তাঁকে রুসো (দ্র) ভলত্যার্ (দ্র) মঁতেস্কু ও জন্ লক্-এর রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করেন। তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন রুসোর দার্শনিক ভাবাদর্শ দ্বারা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি ব্যাপকভাবে ইউরোপ (দ্র) সফর করেন।

স্পেনীয় উপনিবেশবাদী শাসন-শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার বাসনা সিমোন্ বোলিভারের মনে

www.pathagar.com

কিশোর বয়সেই অঙ্কুরিত হয়। ১৮১২ সালে তিনি ২৯ বছর বয়সে প্রথম ভেনেজুয়েলান প্রজাতান্ত্রিক অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন। নানা ব্যর্থতা ও পশ্চাদপসরণের পরও তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটল থাকেন এবং ১৮১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সাহায্যে প্রথমে কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলা, ১৮২২ সালে ইকুয়েডর ও পেরু এবং এর পর একের পর এক তিনি দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ও অঞ্চলসমূহ মুক্ত করেন। ফলে তিনি সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় কিংবদন্তির বীর-এ পরিণত হন।

স্বাধীনতাউদ্বেল দেশবাসী বোলিভার্‌কে কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। দক্ষিণ আমেরিকার মুক্ত দেশগুলো একত্র করে গঠিত সাম্রাজ্যের সম্রাটের পদ বরণ করার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। 'মহান মুক্তিদাতা' বলে তিনি যে উপাধি লাভ করেছিলেন, তা-ই তিনি পরম পাওয়া বলে মনে করেছিলেন।

কলম্বিয়ার একটি অঞ্চলের নাম বোলিভার্‌ রাখা হয়েছে তাঁরই নামে। ভেনেজুয়েলার একটি প্রদেশ 'বোলিভার্‌' নাম গ্রহণ করেছে। দেশটিতে প্রচলিত মুদ্রার নামও 'বোলিভার্‌'। উত্তর পেরুর জনগণ তাদের পুরো রাষ্ট্রটিরই নতুন নামকরণ করেছে তাঁরই নাম স্মরণে 'বোলিভিয়া'।

দক্ষিণ আমেরিকার এই মহান সন্তান ১৮৩০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

বোহেমিয়ান্‌ (bohemian)

চেকোস্লোভাকিয়ার একটি জায়গার নাম বোহেমিয়া (Bohemia)। এক সময়ে ধারণা করা হত যে বোহেমিয়ার অধিবাসীরা জিপ্‌সি বা বেদে বা ভবঘুরে। বেদেদের চালচুলো নেই, ঘরবাড়ি নেই, তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে কেবলই ঘুরে বেড়ায়। এমন ভাসমান জীবনযাপনের জন্য তাদের সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সময়নিষ্ঠা ও নীতিজ্ঞান শিথিল হয়ে থাকে।

বোহেমিয়া থেকে যদিও বোহেমিয়ান্‌ শব্দের উৎপত্তি, তবু এখন এর দ্বারা বোহেমিয়ার অধিবাসী বা জিপ্‌সি জাতি বোঝায় না। এই শব্দ দিয়ে এখন বোঝানো হয় এমন লোক যে আর দশজন মানুষের মতো বাঁধাধরা নিয়মে চলে না, যে অ-গতানুগতিক, খামখেয়ালি, রোম্যান্টিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন।

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা সাধারণত বোহেমিয়ান স্বভাবের হয়ে থাকেন।

হা. মা.

বৌদ্ধধর্ম

যিশুখ্রিস্টের (দ্র) জন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ (দ্র) মানুষের মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম প্রচার করেন, তারই নাম বৌদ্ধধর্ম। শাক্য বংশের রাজপুত্র গৌতম জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও পূর্বজন্মের কবল থেকে মুক্তিলাভের আশায় দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যার পরে যে পরমজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন, পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তা মানুষের মধ্যে প্রচার করেন। তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞানকে (দ্র) বলা হয় 'বোধি'। যে গাছের তলায় বসে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তার নাম 'বোধিদ্রুম' (দ্র) বা জ্ঞানের গাছ। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৮ অব্দে গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুকে বলা হয় 'মহাপরিনির্বাণ'।

বৌদ্ধধর্মের মূলকথা হল— জীবন দুঃখময়, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের কারণ মানুষের অজ্ঞতা, অজ্ঞতা দূরীকরণের মাধ্যমে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। দুঃখমুক্তির উপায় হল আটটি— সৎ জ্ঞান, সৎ ইচ্ছা, সৎ বাক্য, সৎ আচরণ, সৎ জীবন, সৎ কর্ম, সৎ মানসিকতা ও সৎ অনুষ্ঠান। মানুষের মন ঠিক করার জন্য প্রথম দু'টি প্রয়োজন। পরের তিনটি প্রয়োজন সুষ্ঠু নীতিবোধ জাগ্রত করার জন্য। সত্যকে চেনার জন্য দরকার সৎ অনুধ্যান। সর্বশেষ তিনটির মাধ্যমে এই সৎ অনুধ্যান অর্জন করা সম্ভব।

গৌতম বুদ্ধের উপদেশ ও বাণী 'ত্রিপিটক' (দ্র) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটি পালি ভাষায় (দ্র) রচিত।

গৌতম বুদ্ধ

www.pathagar.com

হিন্দুদের মতো বৌদ্ধরাও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করেন, বার বার জন্মলাভ করে মানুষ দুঃখময় সংসারে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকে। নির্বাণ (দ্র) লাভের মাধ্যমেই পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব।

হিন্দু ধর্মের মতো উৎসব-অনুষ্ঠান কিংবা জৈন ধর্মের মতো কঠোর সাধনার পথ পরিহার করে মাঝামাঝি একটি পথ বেছে নেওয়ার শিক্ষাই দেয় বৌদ্ধধর্ম।

হিংসাকে জয় করার পথ হিংসা নয়, প্রেম—এটাই গৌতম বুদ্ধের কথা। তাঁর প্রধান শিক্ষা হল প্রেম, অহিংসা এবং সর্বজীবে দয়া।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাযান (দ্র) ও হীনযান (দ্র)। বৌদ্ধধর্ম ভারতে (দ্র) জন্মলাভ করলেও ধীরে ধীরে তা বিতাড়িত হয়ে ক্রমশ এশিয়ার (দ্র) একটি বিরাট অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন—সিংহল (দ্র), বার্মা (দ্র), চীন (দ্র), তিব্বত (দ্র), মধ্য এশিয়া, কোরিয়া, জাপান (দ্র), ইন্দোচীন (দ্র), থাইল্যাণ্ড (দ্র), ইন্দোনেশিয়া (দ্র) প্রভৃতি। প্রাচীন কালে সমগ্র বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। তার নিদর্শন এখনো ময়নামতী (দ্র), পাহাড়পুর (দ্র) ইত্যাদি বৌদ্ধ বিহারে দেখা যায়। চট্টগ্রাম (দ্র), পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় এখনো অনেক বৌদ্ধ রয়েছে।

টি. কি.

ব্যঙ্গ সাহিত্য

যে রচনায় ঘটনা ও বুদ্ধি, শ্লেষ ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত থাকে তাকেই বলা যেতে পারে ব্যঙ্গ সাহিত্য। সেখানে মজার চরিত্র গড়ে তোলে লঘু পরিবেশ। বুদ্ধিদীপ্ত লেখক হাস্যরস খোঁজেন, বিক্ষুব্ধ জন ব্যঙ্গের কষাঘাত করেন। দেখার ধরন পরিবেশনের ভঙ্গি তৈরি করে সাহিত্যের মেজাজ।

হাসিকে বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। তবে সে হাসিকে হতে হবে বিশুদ্ধ, অনাবিল ও স্বতঃস্ফূর্ত। মানুষ হাসতে চায়, হাসতে ভালবাসে। সেই জন্যই বুঝি সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে সে হাসির উপাদান ঠিকই খুঁজে নেয়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রায় সবাই সুরসিক। সবার ক্ষেত্রে হাসিটা হয়তো প্রকট নয়; কিন্তু নিজেদের রচনায় তাঁরা জীবনের এই সরস স্নিগ্ধতার উপকরণগুলোকে কখনো উপেক্ষা করেন না। 'সেন্স অব হিউমার' সাহিত্যের গুণবিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। হাস্যরস ছড়িয়ে আছে জীবনের সর্বত্র। সেগুলোকে অনুধাবন ও চয়ন করা বিরাট প্রতিভার লক্ষণ।

তল্‌স্তোয়ের (দ্র) 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসে আনা ও তার স্বামী আলেক্সির বিবাহবিচ্ছেদের আগে উত্তেজিত আলেক্সি যখন 'সাফারিংস'-কে 'থাফারিংস' বলে ফেলে, অমন দুঃখের মুহূর্তেও আনা না হেসে পারে নি। দুনিয়ার সব দেশের সাহিত্যেই রঙ্গব্যঙ্গ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের রসের ভাণ্ডারটিও উপেক্ষার নয়। বঙ্কিমচন্দ্র (দ্র), বিদ্যাসাগর (দ্র), রবীন্দ্রনাথ (দ্র), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (দ্র), পরশুরামের(দ্র) যে ধারা, তাতে রঙ্গ–রসিকতার শুভ্র রুচি ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন রয়েছে।

তবে ব্যঙ্গ শুধু ছোটগল্প (দ্র) কবিতা (দ্র) উপন্যাসে(দ্র) নয়, নাটকেও (দ্র) থাকে। সিনেমা, টিভি-চিত্র, কার্টুন (দ্র), কমিক-স্ট্রিপ এবং চিত্রকলা (দ্র)-তেও রঙ্গব্যঙ্গের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ব্যঙ্গচর্চাকে প্রথম সাহিত্যে রূপায়িত করেন প্রাচীন রোমের দু'জন লেখক। তাঁদের নাম হোরেস্ এবং জুভেনাল্। হোরেসের ব্যঙ্গ ছিল নমনীয় ধরনের। আর জুভেনালের রসিকতা ছিল নির্মম, নিষ্ঠুর। একে বলা হত জুভেনালীয় ব্যঙ্গ। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দে আরিস্তোফানেসের রসিকতা গ্রিক সমাজকে সরস ও সজীব রেখেছিল। পঞ্চদশ শতকে প্রকাশিত ফ্রাঁসোয়া রাব্‌লে-র উপন্যাস 'গার্গাঁতুয়া পাঁতাগ্রুয়েল' ফ্রান্সের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে এক রঙ্গব্যঙ্গের আয়নাতে প্রতিফলিত করেছিল। অষ্টাদশ শতকে রাশিয়ার নিকলাই গোগলের (দ্র) কথাসাহিত্যে রুশ জীবনের রঙ্গরস যেন উপচে পড়েছে।

ইংরেজি সাহিত্যে(দ্র) রসের জোয়ার আসে ষোড়শ শতকের শেষে এবং সপ্তদশ শতকের সূচনালগ্নে। আলেকজাণ্ডার পোপ দেশের যেসব কবি-সাহিত্যিক ভাষাকে নষ্ট করছেন বলে মনে করতেন, তাঁদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। তবে ইংরেজি ভাষায় (দ্র) লিখিত সেরা ব্যঙ্গরচনাটি খুব সম্ভব জোনাথন্ সুইফ্‌টের (দ্র) 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্' বা 'গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত' (দ্র)। সুইফ্‌ট্ এমন সহজ ভাষায় এ বইটি লিখেছিলেন যে তা শিশুতোষ রচনায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এ লেখার মাধ্যমে তিনি রাজনীতি ও বিজ্ঞানসহ বহু বিষয়কে আক্রমণ করেছিলেন।

মার্কিন কার্টুনিস্ট আল কাপ, জুলে ফিফার ও ওয়াল্ট

www.pathagar.com

কেলি তাঁদের রঙ্গব্যঙ্গের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীদের মধ্যে আরো যাঁরা খ্যাতিমান, তাঁদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম হোগার্থ, ফ্রান্সের অনরে দোমিয়ে (Honoré Daumier), যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) প্রেস্টন স্টার্জেস বহু ব্যঙ্গধর্মী চলচ্চিত্র (দ্র) নির্মাণ করেছিলেন।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ প্রচলিত রঙ্গরসিকতাকে ছাপিয়ে ব্ল্যাক হিউমারের আবির্ভাব ঘটে, যা কেবল মানুষের সমালোচনা করত, কিন্তু আশা যোগাত না।

আ. কা.

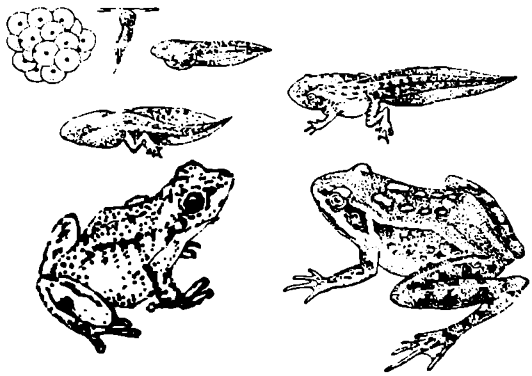

ব্যাঙের জীবন পরিক্রমা

ব্যাকেলাইট (bakelite)

বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক (দ্র) জাতীয় পদার্থ। এর আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ব্যাকল্যাণ্ড (Leo Hendrik Baekeland :১৮৬৩-১৯৪৪)-এর নামানুসারে পদার্থটির এই নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যাকেলাইট-এর বিশেষ গুণ হচ্ছে এটি কোনো রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। তা ছাড়া এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ (দ্র) বা তাপ (দ্র) প্রবাহিত হতে পারে না। এ জন্য ব্যাকেলাইট অন্তরক বা ইনসুলেটর হিসাবে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। রান্নার পাত্রের হাতলেও ব্যাকেলাইট চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হয়। এটি একটি থার্মোসেটিং প্লাস্টিক অর্থাৎ কোথাও লাগানোর সময় উত্তপ্ত করে এটি লাগাতে হয়। লেগে যাওয়ার পর এটি অত্যন্ত শক্ত হয়ে যায়। তখন গরম করা হলেও এটি আর গলে যায় না। ব্যাকেলাইটের মতো আরো দু'টি থার্মোসেটিং প্লাস্টিক হচ্ছে ইউরিথেন ও পলিয়েস্টার (দ্র)।

সু. ব.

ব্যাক্টেরিয়া জীবাণু দ্র

ব্যাঙ

ব্যাঙ উভচর মেরুদণ্ডী প্রাণী। স্থলে বাস করলেও জীবনচক্রের একটা পর্যায় জলে কাটাতে হয়। পৃথিবীতে (দ্র) প্রায় ২,৬০০ প্রজাতির কোলা-ব্যাঙ (frog) ও কুনো-ব্যাঙ (toad) রয়েছে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও লবণাক্ত অঞ্চল ছাড়া সর্বত্রই বাস করে। ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে স্থান পছন্দ করে।

ব্যাঙের চোখ বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। লেজ নেই। কোলা-ব্যাঙের ত্বক মসৃণ ও ভেজা। পাগুলো অত্যন্ত লম্বা। কুনো-ব্যাঙের চামড়া খসখসে ও আঁচিলযুক্ত। পাগুলো খাটো। আকৃতিতে পুরুষ-ব্যাঙ ছোট, কোনো কোনোটা স্ত্রী-ব্যাঙের অর্ধেক। প্রজাতিভেদে আকার, আকৃতি ও বর্ণে পার্থক্য হয়। ক্ষুদ্রতম প্রজাতিটির বাস কিউবায়। প্রায় বারো মিলিমিটার লম্বা। আফ্রিকার (দ্র) গলিয়াথ ব্যাঙ বৃহত্তম। লম্বায় প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার।

সাধারণত পোকা-মাকড় খায়। কোনো কোনো প্রজাতি ঘাসপাতাও খেয়ে থাকে। বর্ষা এদের প্রজনন ঋতু। এ সময় পুরুষ-ব্যাঙ স্বরথলি ফুলিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে থাকে। প্রজাতিভেদে স্ত্রী-ব্যাঙ পানিতে শত শত বা হাজার হাজার ডিম পাড়ে। কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহে ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বের হয়। লেজযুক্ত ব্যাঙাচি ফুলকার সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়। ব্যাঙাচি রূপান্তর- প্রক্রিয়ায় ব্যাঙে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে ফুসফুস, হাত-পা গঠিত হয়। লেজ খসে পড়ে। রূপান্তর সম্পন্ন হতে প্রজাতিভেদে দু' মাস থেকে তিন বছর লাগে।

আ. ন. ম. আ. র.

ব্যাঙের ছাতা (mushroom)

বর্ষাকালে ঘরের আশেপাশে, দেয়ালে, গাছের ডালে ব্যাঙের ছাতা দেখা যায়। ব্যাঙের ছাতা আসলে এক ধরনের উদ্ভিদ (দ্র)। তবে এদের পাতা ও ফুল নেই, এমনকি দেহে সবুজ পত্রহরিৎও নেই। তবু এরা উদ্ভিদ। সাধারণ উদ্ভিদের মতো এরা অজৈব পদার্থ থেকে নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না। কোনো উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর বিকৃত দেহ আশ্রয় করে

www.pathagar.com

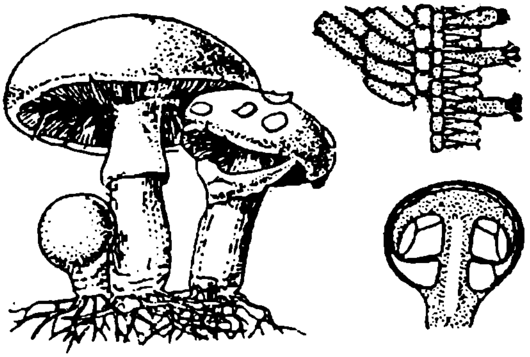

বিভিন্ন রকম ব্যাঙের ছাতা

সেখান থেকে এরা প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পুষ্টিরস সংগ্রহ করে। সচরাচর যেসব ব্যাঙের ছাতা আমাদের দেশে দেখা যায় সেসবে দু'টি অংশ থাকে, উপরে টুপি বা মাথা এবং নিচে লাঠির মতো বোঁটা বা বৃন্ত। ব্যাঙের ছাতার অসংখ্য জাত রয়েছে। সব জাতেই কিন্তু বৃন্ত বা টুপি থাকে না। কোনো কোনো ব্যাঙের ছাতায় টুপি থাকে না, আবার অনেকের টুপি থাকে, কিন্তু বোঁটা থাকে না। কোনো কোনো ছাতার টুপির নিচে সুচের মতো অনেক দাঁত থাকে। প্রবাল (দ্র)-জাতীয় ব্যাঙের ছাতা কখনো কখনো সরু বা মোটা লাঠির মতো, আবার কখনো শাখা-প্রশাখাযুক্ত ছোট গাছের মতো হয়। কোনো কোনো ছাতা আবার আকারহীন কিংবা সজারুর কাঁটার মতো হয়ে থাকে। ব্যাঙের ছাতাকে বিজ্ঞানীরা 'ছত্রাক' নামে অভিহিত করেন। যেসব ব্যাঙের ছাতায় টুপি থাকে, তাদের টুপির নিচের দিকে অনেকগুলো লম্বা লম্বা পর্দার মতো অংশ থাকে যাদের গিল (gill) বলা হয়। পৃথিবীতে অসংখ্য প্রজাতির ব্যাঙের ছাতা রয়েছে। কয়েকটি ধরন মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলো খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি এতে আমিষ এবং ভিটামিন বি, সি ও কে রয়েছে। জাপান (দ্র), সিঙ্গাপুর (দ্র) চীন (দ্র), থাইল্যাণ্ড (দ্র) ইত্যাদি দেশে ব্যাঙের ছাতা খুব প্রিয় খাদ্য। সেখানে এসবের চাষও করা হয়। এ ছাড়া বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতাও আছে।

ত. চ.

ব্যাটারি বিদ্যুৎকোষ / ব্যাটারি দ্র

ব্যাডমিণ্টন (badminton)

এই খেলাটি একটি কোর্টে বা লনে খেলা হয়ে থাকে। একটি হালকা ওজনের ৪.৫০ থেকে ৬ আউন্স র‍্যাকেট ও ১৪ থেকে ১৬টি পালকের তৈরি শাট্‌ল্ কর্ক দিয়ে খেলতে হয়। ৪৪ ফুট লম্বা ২০ ফুট চওড়া কোর্টের মাঝখানে মধ্যরেখায় ৫' ১" উঁচু জাল টাঙিয়ে খেলতে হয়। দু' জনে অথবা চার জনে খেলায় অংশ নিতে পারে। তবে যখন দু'জনের মধ্যে এককভাবে খেলা হয় তখন কোর্টের প্রস্থ তিন ফুট কমিয়ে ২০ ফুটের জায়গায় ১৭ ফুট চওড়া কোর্টে খেলতে হয়। সব বয়সের লোকেরাই এই খেলায় অংশ নিতে পারে।

এই খেলাটি ১৮৭০ সালে ইংরেজেরা বোম্বাইয়ের পুনা (বর্তমান 'পুনে') নামক স্থানে প্রথম খেলতে দেখেন। তখন এই খেলাটি পুনা গেম্‌স্ নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৩ সালে গ্লুকোস্টশায়ারের ব্যাডমিণ্টন নামক জায়গায় এই খেলাটির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আর তখন থেকেই এর নামকরণ করা হয় 'ব্যাডমিণ্টন'। এখন বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ব্যাডমিণ্টন খেলা প্রচলিত রয়েছে।

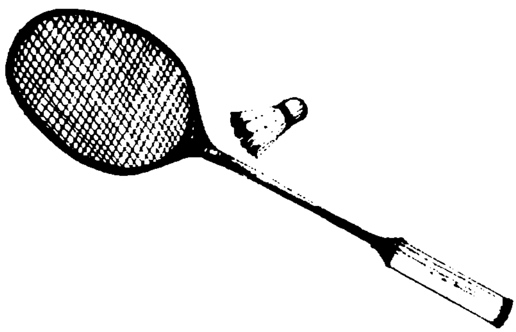

ইংল্যাণ্ডে ১৮৭৩ সালে ব্যাডমিণ্টন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৯ সালে অল ইংল্যাণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। আর আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশন স্থাপিত হয় ১৯৩৪ সালে। এর পরপরই আন্তর্জাতিক মানের টমাস কাপ পুরুষদের জন্য ১৯৪০ সালে এবং মহিলাদের জন্য আবার কাপ (১৯৫০) প্রচলিত হয়। বর্তমানে এশিয়ান, কমনওয়েলথ, অলিম্পিক ইত্যাদি খেলায় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে। এই খেলার জনপ্রিয়তাও খুব বেশি। সাধারণত পুরুষ একক, পুরুষ দ্বৈত, মহিলা একক,

www.pathagar.com

মহিলা দ্বৈত এবং মিশ্র দ্বৈত—এই পাঁচ ধরনের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। তবে এ ছাড়া পুরুষ ও মহিলাদের দলগত বিষয়েও খেলা হয়ে থাকে। ১৯৬২ সালে এটা এশিয়ান গেম্‌সের (দ্র) অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৯২ সালে বার্সিলোনা অলিম্পিকে এটা অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়া (দ্র), চীন (দ্র), জাপান (দ্র), নেদারল্যাণ্ড, সুইডেন ইত্যাদি দেশ খুব উঁচু মানের খেলা খেলে থাকে।

কা. আ. আ.

ব্যাডেন-পাওয়েল, স্যার রবার্ট গার্ল গাইড্‌স্ ও বয় স্কাউট দ্র

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা মেসোপটেমীয় সভ্যতা দ্র

ব্যারন পিয়ের্ দ্য কুবের্তাঁ দ্য কুবের্তাঁ, পিয়ের্ দ্র

ব্যারি, জেম্‌স্ ম্যাথু পিটার্ প্যান্ দ্র

ব্যারোমিটার (barometer)

বায়ুচাপমান যন্ত্র। এ যন্ত্রের সাহায্যে আবহমণ্ডলের বায়ুর চাপ মাপা হয়। ব্যারোমিটার দু' ধরনের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে পারদস্তম্ভবিশিষ্ট কাচনল ব্যারোমিটার (mercury barometer)। আর অপর ব্যারোমিটারটি হচ্ছে অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার (aneroid barometer)। কাচনল

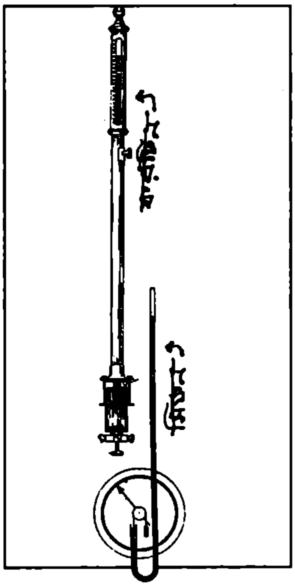

ব্যারোমিটার তৈরি হয়েছে তোরিচেল্লি নামে এক জন ইতালীয় বিজ্ঞানীর একটি পরীক্ষণ থেকে। ইভাঞ্জেলিস্তা তোরিচেল্লি (Evangelista Torricelli: ১৬০৮–১৬৪৭) ছিলেন গালিলেও গালিলেই-র (দ্র) ছাত্র। তিনি এক গজ লম্বা একটি কাচের নলের এক দিক বন্ধ করে তাতে পারদ (দ্র) ঢুকিয়ে নিলেন। পারদ পানির চেয়ে প্রায় ১৪ গুণ ভারি। পারদভর্তি নলটিকে তোরিচেল্লি একটি পারদভর্তি পাত্রের উপর উপুড় করে ধরলেন। দেখা গেল, পারদের স্তম্ভের উচ্চতা হয়েছে ৩০ ইঞ্চি। তার উপরে নলটি ফাঁকা অর্থাৎ সে জায়গায় কিছুই নেই। তোরিচেল্লি বললেন পারদের উপর বাতাসের চাপ পড়েছে বলেই কাচনলে পারদের এই স্তম্ভ টিকে থাকছে। তোরিচেল্লির এই নলটিকেই আদি ব্যারোমিটার বলা যেতে পারে। এই পরীক্ষাটি করা হয়েছিল ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে, ১৬৪৩ সালে। কাচনলের ভিতরে পারদের স্তম্ভের উপরকার শূন্য স্থানকে বলা হয় তোরিচেল্লিয়ান ভ্যাকুয়াম (Torricellian vacuum)। মূলকথা হল, নিচের খোলা পাত্রের পারদের উপরে বায়ুর যে চাপ পড়ে নলের পারদস্তম্ভের ওজন তার সমান হয় বলেই পারদস্তম্ভ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে; অতএব খোলা পাত্রের পারদের পৃষ্ঠতলের পরিমাণ নিয়ে বায়ুর চাপ বের করা যায়। এভাবে দেখা গেল, সাধারণ আবহাওয়ায় (দ্র) বায়ুচাপ (দ্র) প্রতি বর্গমিটার স্থানের উপর ৭৬ সেন্টিমিটার দীর্ঘ পারদস্তম্ভের ওজনের সমান। আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলে পারদস্তম্ভের উচ্চতাও কমে বা বাড়ে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের (দ্র) চাপের তারতম্য ঘটে। আমরা যে ব্যারোমিটার ব্যবহার করে থাকি, তাতে কোনো পাত্রের পারদের মধ্যে পারদভর্তি নল উপুড় করে রাখা হয় না। বাঁকানো একটি নলে পারদ নিলেও নলের খোলা মুখে বাতাসের চাপ পড়ে এবং সেই চাপের ফলে পারদস্তম্ভ ওঠা-নামা করে। কাচের নলে দাগ কাটা থাকে। সেই দাগের সাথে পারদস্তম্ভের উচ্চতা মিলিয়ে সহজেই বায়ুর স্থানীয় চাপ মাপা যায়।

'অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার'-এ পারদ বা অন্য কোনো তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। এতে ব্যবহৃত হয় ধাতুনির্মিত একটি চ্যাপ্টা পাত্র এবং দু' দিকে ঢেউ-খেলানো পাতলা ধাতব ঢাকনা। বায়ুর চাপের পরিবর্তনে এই ঢাকনা ওঠা-নামা করে। এ থেকে বায়ুচাপ মাপা হয়।

সু. ব.

ব্যাস বেদব্যাস / ব্যাস দ্র

ব্রজবুলি গোবিন্দদাস দ্র

ব্রজেন দাশ

বিখ্যাত সাঁতারু। বিশ্বক্রীড়াজগতে বাঙালির সাফল্যের

www.pathagar.com

স্বীকৃতি প্রথম আদায় করেছিলেন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে। 'নদীমাতৃক পূর্ববাংলার বীর সন্তান' হিসাবে সারা দেশ গর্ব বোধ করে তাঁর জন্য।

ব্রজেন দাশ ১৯২৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর বিক্রমপুরের কুচিয়ামোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হরেন্দ্রকুমার দাশ ও মা বিমলা দাশ। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালাতেই শুরু হয়েছিল। একটু বড় হলে গুরুজনদের সঙ্গে ঢাকা (দ্র) চলে আসেন এবং কে. এল. জুবিলি হাই স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন ১৯৪৬ সালে। পরে কলিকাতায় গিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে যথাসময়ে আই. এ. এবং বি. এ. পাশ করেন। বি. এ. পাশ করার পর ঢাকায় ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) ভর্তি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরে ছেড়ে দেন।

বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলার দিকে ঝোঁক ছিল। ফুটবল (দ্র) খেলা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন এবং স্কুল জীবনে সর্বদা স্কুল-ক্যাপ্টেন থেকেছেন। এরপর ভাল লাগত ক্রিকেট (দ্র)। কিন্তু ছোটবেলায় সাঁতার কখনোই তাঁর কাছে খেলা মনে হয় নি। সাঁতার ছিল মজার বা আমোদের ব্যাপার। বুড়িগঙ্গা ছিল কাছেই। সাঁতারের আনন্দ ছিল একান্তই স্বাভাবিক। আন্তঃবিদ্যালয় খেলাধুলায় সাঁতারের প্রতিযোগিতায় সর্বদাই প্রথম স্থান দখল করতেন। কলিকাতায় কলেজ জীবনে সাঁতারের দিকে বিশেষ কারণে আগ্রহ জন্মায়, কারণ তাঁর বাড়ির কাছাকাছি ফুটবল-ক্রিকেটাদি খেলার মাঠ ছিল না, অথচ সুইমিং পুল ছিল। সন্তরণক্রীড়ার বিজ্ঞান অর্থাৎ সাঁতারের বিভিন্ন কায়দা, নিয়মকানুন ইত্যাদি তিনি সেখানেই শেখেন। কলিকাতায় ছাত্রাবস্থাতেও তিনি সাঁতারে প্রথম হতেন।

ঢাকায় ফিরে আসার পর এ দেশে সাঁতারের নিয়মিত অনুশীলন, বাৎসরিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে শুরু হয় ১৯৫৩ সালে; কারণ ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস্ ফেডারেশনকে তিনিই এ ব্যাপারে উৎসাহী ও উদ্যোগী করে তুলেছিলেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান অলিম্পিকে সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম তো হনই, উপরন্তু সর্বমোট চারটি খেলায় উপর্যুপরি সাফল্যের কারণে স্বর্ণপদক লাভ করেন। অথচ পরের বছর ১৯৫৬ সালে মেল্‌বোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্বঅলিম্পিকে তাঁকে পাঠানো হয় নি। এই অপমানজনক পরিস্থিতিই তাঁকে অলিম্পিকে অংশ না নিয়েও সমতুল্য সম্মান ও সাফল্য অর্জনের চিন্তায় বাধ্য করে এবং তিনি মনস্থ করেন যে ইংলিশ চ্যানেল তাঁকে সাঁতরে অতিক্রম করতে হবে। তাঁর এই ভাবনায় অনুপ্রেরণার শক্তি যুগিয়েছিলেন ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস্ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এস. এম. মোহসীন। অতঃপর কঠিন সাধনা শুরু হয়– ১২, ১৬, ২৪, ৪৮ ঘণ্টা ব্যাপী একটানা সাঁতারের। নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর সাঁতরে যান ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে। জুনের শেষ দিকে বিলেতে গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের প্রতিযোগিতার পূর্বেই ১৯৫৮-র জুলাই মাসে আরেকটি সাঁতারে আমন্ত্রণ আসে : ইতালির কাপ্রি থেকে নেপল্‌স্ পর্যন্ত সাঁতার কেটে যেতে হবে, এটি কোনো প্রতিযোগিতা ছিল না। ফলে, লণ্ডন (দ্র) থেকেই তিনি ইতালি গিয়ে ঐ খেলায় অংশ নেন।

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার প্রতিযোগিতায় মোট ২৩টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। সাঁতারুদের মধ্যে মেয়েও ছিলেন ৫ জন। ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিলেন একমাত্র ব্রজেন দাশ। তিনি ছিলেন ১৯ নং প্রতিযোগী। ১৯৫৮ সালের ১৮ই আগস্ট প্রায় মধ্যরাত্রে সাঁতার শুরু হয়। ইংলিশ চ্যানেল এমনিতেই অশান্ত থাকে, সেদিন বাড়তি অসুবিধে ছিল প্রচণ্ড কুয়াশা। ফ্রান্সের তীর থেকে সাঁতরে ইংল্যাণ্ডের তীরে এসে উঠতে হবে। প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছিল পরদিন বিকেলবেলায় এবং ব্রজেন দাশ প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

সর্বমোট ছ' বার তিনি ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন : ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে, অর্থাৎ চার বছরে। ১৯৬১ সালের সাঁতারে তিনি বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করেছিলেন। ইতিপূর্বে ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের আগে কেউ চ্যানেল অতিক্রম করতে পারেন নি, ব্রজেন দাশ করেছিলেন ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে।

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণের পেশা গ্রহণের জন্য বিদেশ থেকে বহু আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্থ কিংবা খ্যাতির মোহে স্বদেশ ছেড়ে যান নি।

হা. মা.

ব্রণ

ব্রণ এক ধরনের চর্মরোগ। সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালেই এ রোগ বেশি দেখা দেয়। মুখমণ্ডল, ত্বকের (দ্র) উপরিভাগ এবং পিঠে ব্রণ হয়ে থাকে। গুরুতর অবস্থায় ত্বকে স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন দেখা দেয়।

বয়ঃসন্ধিকালে ত্বকে বিশেষ ধরনের হরমোন (দ্র) নিঃসরণের ফলে ত্বকে তৈল নিঃসরণকারী 'সিবেসাস গ্রন্থি' উদ্দীপ্ত হয়ে থাকে। কোনো কারণে ত্বকে এ তৈল নিঃসরণ ব্যাহত হলে ত্বকের নিচে সঞ্চিত নিঃসরণ প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে ত্বকে ব্রণ দেখা দেয়। কখনো কখনো ব্রণে জীবাণু (দ্র) সংক্রমণের ফলে পুঁজ দেখা দিতে পারে।

সুষম খাবার, উপযুক্ত ঘুম, শারীরিক ব্যায়াম, ত্বকের

পরিচ্ছন্নতা ব্রণের চিকিৎসায় উপকারী। অতিরিক্ত মশলা ও তেল-চর্বি (দ্র) জাতীয় খাবার, খাবারে শাক–সব্জির স্বল্পতা, ত্বকে অধিকমাত্রায় প্রসাধনী ব্যবহার ব্রণের জন্য আরো ক্ষতিকর। গুরুতর ব্রণের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ আবশ্যক। এ জন্য টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক (দ্র) ব্যবহার করা হয়।

সি. না. হ.

ব্রত

সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে পালনীয় বিশিষ্ট ধর্মাচার। ব্রত মূলত কামনামূলক মঙ্গলানুষ্ঠান এবং অভীষ্টসিদ্ধি ও বাসনা চরিতার্থতার জন্য করা হয়। ব্রত প্রধানত মেয়েলি অনুষ্ঠান। ব্রত সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত দু'ভাবেই পালিত হতে পারে। ৮ম-৯ম শতাব্দী থেকেই ব্রত পালনের তথ্য পাওয়া যায়। হিন্দু নারীদের ধর্মজ্ঞান ও সামাজিক বুদ্ধি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই ব্রত। ব্রত সাধারণ কিছু আচার-আচরণ এবং পাঁচালি পাঠ ও শ্রবণের মাধ্যমে পালিত হয়। ছড়া (দ্র), গীত, নাটক (দ্র), নাচ, কথা, আলপনা (দ্র) প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রতানুষ্ঠানকারীর বিশেষ মনষ্কামনার প্রকাশ ঘটে। ব্রতে সাধারণত ঐহিক জীবনের সুখ-শান্তি সৌভাগ্য কামনা করা হয়। ব্রত বাঙালির সাহিত্য ও সমাজের প্রাচীনতার বাহক। ব্রতে লৌকিক জীবনের অভিব্যক্তি সুপরিস্ফুট।

মে. খা.

ব্রতচারী কামরুল হাসান দ্র

ব্রহ্মচারী ইনজেকশন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যার দ্র

ব্রহ্মপুত্র নদ

তিব্বতের(দ্র) কৈলাসশিখরের পাদদেশে মানস সরোবরের (দ্র) কাছ থেকে জন্ম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা সেখানে ৫,১০০ মিটার। উৎসমুখে আছে এক হিমবাহ (দ্র)। সেই হিমবাহ থেকে 'ৎসাং পো' বা পবিত্রকারী এই নদ সোজা পূর্বদিকে ১,১২০ কিমি চলে গেছে। তারপর হঠাৎ দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে ভারতের (দ্র) অরুণাচল রাজ্যে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করেছে। এর মধ্যে দুই তীর থেকে অনেকগুলো উপনদী মিশে যাওয়ায় ব্রহ্মপুত্র বড় ও গভীর হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী অনেক এলাকা দুর্গম ও মানুষের বাসের অযোগ্য।

তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র লাসার পাশ দিয়ে এসেছে। সেখানে এক সময় তিব্বতীদের ধর্মগুরু দালাই লামা বাস করতেন। এখান থেকে ব্রহ্মপুত্র নাব্য। তিব্বতীরা এক রকম চামড়ার নৌকা ব্রহ্মপুত্রের তীব্র স্রোতে ব্যবহার করে। তবে স্রোতের উল্টো দিকে এই নৌকা চলতে পারে না। এ জন্য নিচের দিকে যতদূর প্রয়োজন নৌকাতে করে জিনিসপত্র নিয়ে যায় এবং কাজ শেষ হলে ঐ নৌকা গুটিয়ে গাধা বা ঘোড়ার পিঠে করে আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসে। এই নৌকার নাম কোরাকেলস। তীব্র স্রোত, ঝুলন্ত সেতু, পাহাড়, অরণ্য ও সবুজ শস্যের বিস্তৃত মালভূমির দৃশ্য তিব্বত অঞ্চলের ৎসাং পো-র বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

ভারতের অরুণাচলের সুদিয়া সীমান্ত দিয়ে ব্রহ্মপুত্র আসাম উপত্যকায় প্রবেশ করেছে। এখানে ৎসাং পো কিছুদূর ডিহিং ও পরে ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। অহমিয়া (অর্থাৎ আসামের অধিবাসী) লোকজন ব্রহ্মপুত্রকে আদর করে 'বুড়ো লুই' নামে ডাকে। এখানে পুব পাড়ের প্রধান উপনদীগুলো হল দিবাং ও সেসিরি এবং পশ্চিম পাড়ে মানস ও উন্মত্তা তিস্তা। আসামে ব্রহ্মপুত্র ৭২০ কিমি দীর্ঘ। এখানে সে বার বার গতিপথ পরিবর্তন করে। মাঝে মাঝে ৯.৬ কিমি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে বিশাল আকার হয়। বরফগলা পানি ও বর্ষার প্রচুর বৃষ্টির পানি নিয়ে সে উন্মুক্ত হয়ে ছোটে।

আসামের সাদিয়া জেলায় এই নদীর তীরে ব্রহ্মকুণ্ড বা পরশুরাম হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। এই দুর্গম এলাকায় হিংস্র আবর জাতির বাস। আগে মানুষের ধারণা ছিল, ব্রহ্মপুত্রের জন্ম আবর দেশে। ১৮৭৮ সালে ইংরেজ সরকার ব্রহ্মপুত্রের উৎস খোঁজার চেষ্টায় দার্জিলিঙের কিনথাপ দোরজি নামক এক জনকে এই কাজে পাঠায়। বহু বিপদ ও বাধা পেরিয়ে তিনি আবর এলাকা ঘুরে আসেন। তারপর এক চীনা তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তিব্বতে গেলেন নদীর উৎস খুঁজতে। সেই চীনা তীর্থযাত্রীই তাঁকে পঞ্চাশ টাকায় দাস হিসাবে বেচে দেন। অনেক কষ্টে, অনেক বুদ্ধি খরচ করে তিনি ফিরে এসে বলেন —ব্রহ্মপুত্র আর ৎসাং পো একই নদী। কিন্তু উৎসমুখ তিনি দেখে আসতে পারেন নি।

সাদিয়া, ডিব্রুগড়, তেজপুর, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি শহর পেছনে ফেলে বাংলাদেশের (দ্র) ময়মনসিংহ জেলায় ব্রহ্মপুত্র প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্রের যে অংশ যমুনা (দ্র) নামে পরিচিত তার সৃষ্টি হয় ১৭৮৭ সালে এক ভয়াবহ বন্যার ফলে। ১৭৮৭ সালের আগস্টের ২৭শে তারিখ ব্রহ্মপুত্রের প্রবল ঢলে রংপুর ডুবে যায়। রংপুরের মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ বন্যায় নিহত হয়। বন্যাশেষে পানি শুকানোর পর দেখা গেল, ব্রহ্মপুত্র নতুন এক খাত সৃষ্টি করেছে। পুরানো ধারা ময়মনসিংহের ভেতর দিয়ে ভৈরবের কাছে মেঘনার (দ্র) সঙ্গে মিশেছে। নতুন খাত যমুনা এখন ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোত। উৎপত্তিস্থান থেকে যমুনা ১৫০ মাইল গিয়ে পদ্মায় (দ্র) মিশেছে।

যমুনা নদী গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার পূর্ব সীমান্ত ধরে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা নদীতে মিশেছে। এ সময় পশ্চিম থেকে বড়াল, আত্রাই, হুরাসাগর, ঘাঘট উপনদী এসে মিশেছে। পূর্বদিকে তার শাখানদী হল পুরানো ব্রহ্মপুত্র ও ধলেশ্বরী। ধলেশ্বরী থেকে সৃষ্টি হয়েছে বুড়িগঙ্গা (দ্র)। বুড়িগঙ্গা যমুনার প্রশাখানদী। যমুনার উপনদী ও শাখানদী সমন্বয়ে গঠিত স্বাভাবিক জল-নিষ্কাশনের ব্যাপকতার জন্য এর নামে 'সিসটেম' শব্দটি যোগ করা যায়। একে এ জন্য 'যমুনা সিসটেম' নদী বলা হয়।

ব্রহ্মপুত্র ৯,৩৮,৬০০ বর্গ কিমি এলাকার পানি নিষ্কাশন করে বঙ্গোপসাগরে (দ্র) নিয়ে যায়। যমুনা নদীতে মাইলের পর মাইল বালুর চর দেখা যায়। তার দুই তীরের পলিমাটিতে প্রচুর শস্য হয়। বর্তমানে যমুনার উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। বঙ্গোপসাগর থেকে ১,২৪০ কিমি পর্যন্ত জলপথে ব্রহ্মপুত্রে নৌ-বাণিজ্য চলে। সুদীর্ঘ কাল থেকে আসামের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের নৌ-বাণিজ্য নদীপথে চলে আসছে। বর্ষাকালে বড় বড় জাহাজ অবাধে চলাচল করতে পারে।

বি. ব.

www.pathagar.com

ব্রহ্মা

ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। ঋগ্‌বেদে তাঁকে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি বলা হয়েছে। হিরণ্যগর্ভও তাঁর একটি নাম। সৃষ্টিকে বলা হয় প্রজা। সৃষ্টি করেন বলে ব্রহ্মার

চতুর্মুখ ব্রহ্মা

আরেক নাম প্রজাপতি। পুরাণ মতে—ব্রহ্মা নিজের দেহের অর্ধাংশ থেকে শতরূপা নামে এক নারী সৃষ্টি করেন। এই শতরূপাই তাঁর এক স্ত্রী। ব্রহ্মার রঙ রক্তগৌর, অর্থাৎ লালচে গোলাপি। তাঁর চার মাথা ও চার হাত। হাঁস তাঁর বাহন। সৃষ্টি এক বার ধ্বংস হলে ব্রহ্মা নতুন করে তা সৃষ্টি করেন। পুরাণে আছে, ব্রহ্মা জ্যোতিষশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা।

নি. অ.

ব্রাউনিং, রবার্ট [১৮১২—১৮৮৯]

ভিক্টোরীয় যুগের অন্যতম কবি। তাঁকে টেনিসন (দ্র)-এর সমপর্যায়ভুক্ত কবি বলেও বিচার করা হয়। তাঁর আশাবাদী আবেগ-অনুভূতি এবং নব উদ্ভাবিত রচনারীতি ঊনবিংশ শতকের পাঠককুলের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এখনো সে সংক্রান্ত বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Browning) ১৮১২ সালের ৭ই জুন লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে ধর্ম (দ্র), গ্রন্থপ্রেম, সঙ্গীত (দ্র) এবং চিত্রকলা (দ্র) বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর জীবনের প্রথম প্রকাশিত 'পউলিন' (Pauline, ১৮৩৩) কবিতায় শেলির (দ্র) স্পষ্ট প্রভাব ছিল। এই কবিতা ছিল প্রধানত কাব্যিক সংবেদনশীলতায় ভরপুর। তবু এটি পাঠক সমাজের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি।

ব্রাউনিং-এর আত্মসমাহিত ভাব স্টুয়ার্ট মিল (দ্র)-এর ভর্ৎসনার শিকার হয়। সম্ভবত এই সাহিত্যিক আক্রমণই ব্রাউনিংকে নাটকীয় স্বগতোক্তি (Dramatic monologue) রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তবে দ্রুত সাফল্য বা জনপ্রিয়তা তাঁর কাছ থেকে, বলতে গেলে, দীর্ঘ কাল পালিয়েই থাকে। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'প্যারাসেলসাস'-এর ভাগ্যেও জোটে অস্বীকৃতির ঔদাসীন্য। নাটক 'স্ট্রাফোর্ড'ও (১৮৩৭) পাঠকদের অগোচরেই থেকে যায়। মধ্যযুগের (দ্র) ইতালির একটি কাহিনীভিত্তিক কবিতা 'সোর্দেল্লো'র (১৮৪০) ব্যাপারেও সমালোচকবৃন্দ নীরবতা পালন করেন।

কিন্তু এতে ব্রাউনিং দমে যান নি। নিজের কাব্যশৈলী নিয়ে বিরামহীনভাবে তিনি কাজ করে চলেন। এবার তিনি রচনা করেন 'বেল্‌স্ অ্যাণ্ড পোমেগ্র্যানেট্‌স্' (১৮৪১-৪৬) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ। আটটি কবিতার সঙ্কলন ছিল এটি। এসবের মধ্যে ছিল তাঁর সেই তিনটি বিখ্যাত কবিতা—'মাই লাস্ট ডাচেস', 'সোলিলোকি অব দ্য স্প্যানিশ ক্লয়স্টার' এবং 'দ্য বিশপ অর্ডারস্ হিজ টুম অ্যাট সেইন্ট্ প্রাক্সেড্ চার্চ'। সেগুলোর ওপর প্রধানত তাঁর পরবর্তী কালের কবিখ্যাতি নির্ভরশীল ছিল।

১৮৪৬ সালে রবার্ট ব্রাউনিং ঊনবিংশ শতকের মহিলা কবি এলিজাবেথ ব্যারেটকে (Elizabeth Barrett : ১৮০৬-১৮৬১) বিয়ে করেন। বিয়ের পর তিনি ইতালির ফ্লোরেন্সে সস্ত্রীক বসবাস করতে থাকেন। ১৮৬১ সালে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু হলে শোককাতর ব্রাউনিং ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। স্বদেশের সমালোচকমহলে তখন তাঁর কবিখ্যাতি বিস্তৃত।

১৮৮৯ সালের ১২ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর দিন তাঁর

www.pathagar.com

সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'আসোলান্দো' প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যু হয় ইতালির ভেনিস শহরে। পরে তাঁকে সমাহিত করা হয় লণ্ডন শহরের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবের পোয়েট্স্ কর্ণার-এ।

কবি হিসাবে রবার্ট ব্রাউনিং ছিলেন মানুষের কর্মের চাইতে তার মানবীয় চরিত্রের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী।

ব্রাউনিং-এর বিখ্যাত কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— 'ড্রামাটিস পার্সোনে' (১৮৬৪), 'ক্যালিবান আপন সেটেবোস', 'এ ডেথ ইন দ্য ডেজার্ট', 'দ্য রিং অ্যাণ্ড দ্য বুক' (১৮৬৮-৯), 'বালাউস্‌শন্স অ্যাডভেঞ্চার' (১৮৭১), 'অ্যারিস্টোফানেস অ্যাপোলজি' (১৮৭৫), 'রেড কটন নাইটক্যাপ কান্ট্রি (১৮৭৩) ও 'দ্য ইন্ অ্যালবাম' (১৮৭৫) ইত্যাদি।

আ. হ.

ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্রীড়াসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

ব্রাম্‌স্, ইওহানেস্ [১৮৩৩—১৮৯৭]

সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতস্রষ্টা। ১৮৩৩ সালে জার্মানির হামবুর্গে জন্ম। ব্রাম্‌স্ (Johannes Brahms) খুব অল্প বয়সে চেলো, বেহালা (দ্র), হর্ণ, পিয়ানো (দ্র) প্রভৃতি বাজাতে শেখেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি হামবুর্গের এক প্রতিষ্ঠানে পিয়ানোবাদকের কাজ পেয়েছিলেন। সতেরো বছর বয়সে তিনি হাঙ্গেরির বিখ্যাত বেহালাবাদক এদুয়ার্দ রেমেনির (Eduard Reményi)) সঙ্গে কন্সার্টে পিয়ানো বাজান। ১৮৫৩ সালে ব্রাম্‌স্ যান শুমানের (দ্র) কাছে। শুমান্ তাঁর প্রশংসা করে পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেন। ফলে সারা জার্মানিতে ব্রাম্‌সের নামে সাড়া পড়ে যায়।

১৮৫৭ সালে ব্রাম্‌স্ ডেট্‌মোল্টের যুবরাজের দরবারে সঙ্গীতশিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন ও কয়েক বছর সেখানে থেকে নির্বিঘ্নে নানা প্রকার সঙ্গীত রচনা করেন। ১৮৬৩ সালে ব্রাম্‌স্ ভিয়েনা যান। সেখানকার উচ্চ সাঙ্গীতিক পরিবেশ তাঁকে উৎসাহিত করে। তিনি ভিয়েনায় কিছু দিন থাকেন ও নানা শৈলীর কিছু উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত রচনা করেন। এবার ভিয়েনা থেকে জুরিখ্। সেখানেও আসে সাফল্য। ১৮৭২ সালে ব্রাম্‌স্ কন্সার্ট পরিচালকের কাজ পান ও প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর রচনাবলি প্রকাশে মনোযোগ দেন। ১৮৭৪ সালে বাভেরিয়ার রাজসভা থেকে তাঁকে খেতাব দেওয়া হয়। সে বছরই তিনি বার্লিন একাডেমীর সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭৫ সালে থেকে ব্রাম্‌স্ সিম্ফনি (দ্র) রচনায় মনোবিবেশ করেন। ১৮৮০ সালে ব্রেস্‌লাউ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দান করে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ব্রাম্‌স্‌কে দুই বার এই ডিগ্রিতে ভূষিত করে। ১৮৮৩ সালে ব্রাম্‌স্ কোরাল সঙ্গীত রচনা শুরু করেন। পিয়ানো ও বেহালার জন্য সঙ্গীত রচনা ছাড়াও সিম্ফনি তিনি রচনা করেই যাচ্ছিলেন। ১৮৮৯ সালে ব্রাম্‌স্ হামবুর্গ পৌরসভা থেকে সংবর্ধনা পান। সমগ্র ইউরোপে তখন ব্রাম্‌সের অসামান্য সুখ্যাতি। তখন থেকেই তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্যান্সারের (দ্র) লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১৮৯৭ সালে ভিয়েনায় ব্রাম্‌সের মৃত্যু হলে তাঁকে বেটোফেন (দ্র) ও শুবার্টের (দ্র) পাশে সমাহিত করা হয়।

খুব কম ব্যক্তিই পৃথিবীতে সঙ্গীতের জন্য এমন সম্মান ও সাফল্য লাভ করেছেন। সঙ্গীত ব্যতীত মানববিদ্যার নানা শাখাতেও ব্রাম্‌সের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর রচনাকর্ম বিপুল ও বৈচিত্র্যময়।

ক. গো.

ব্রাহ্মধর্ম

রাজা রামমোহন রায় (দ্র) ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহন রায়ের ধর্মীয় মতবাদের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব।

এই ধর্মের মূলকথা, ঈশ্বর এক, তিনি নিরাকার; ঈশ্বর বা এক ব্রহ্মের উপাসনা করাই ব্রাহ্মধর্মের আচরণীয় কর্তব্য।

বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা (দ্র) ও ইংরেজিশিক্ষার বিস্তারে

ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়

www.pathagar.com

ব্রাহ্মসমাজ প্রধান ভূমিকা পালন করে। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করে এই সমাজ।

১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), অক্ষয়কুমার দত্তসহ ১৯ জন তরুণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজে এটাই প্রথম দীক্ষাদান অনুষ্ঠান। পরবর্তী সময়ে ঢাকা (দ্র), মেদিনীপুর, রংপুর, কুমিল্লা, বাঁশবেড়িয়া, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে অনেক লোক ব্রাহ্মধর্মে দিক্ষিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তোলেন।

ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্মের (দ্র) গোঁড়ামি থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁরা মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন এবং জাতিভেদপ্রথাও মানতেন না।

মূলত হিন্দুধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মসম্প্রদায়ের রূপ গ্রহণ করে।

টি. কি.

ব্রাহ্মসমাজ আত্মীয় সভা দ্র

ব্রাহ্মী লিপি অক্ষর দ্র

ব্রিটিশ মিউজিয়াম (British Museum)

সারা বিশ্বের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর শিল্পকর্মের এক সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা। এটি লণ্ডন (দ্র) শহরের ব্লুম্‌স্‌বেরিতে অবস্থিত।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম ১৭৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। চিকিৎসাবিদ ও প্রকৃতিবিদ স্যার হ্যান্স স্লোনের (Hans Sloane : ১৬৬০—১৭৫৩) জমানো গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি (দ্র) ও প্রাকৃতিক ইতিহাস সংশ্লিষ্ট নিদর্শনাদির একটি বিখ্যাত সংগ্রহ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের মাধ্যমে এর গোড়াপত্তন হয়। স্লোনের সংগ্রহের পাশাপাশি আরো যে দু'জনের উইল করা সম্পত্তিসংগ্রহ এই মিউজিয়ামের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে, তাঁরা হলেন অক্সফোর্ডের দু'জন আর্ল যথাক্রমে এডোয়ার্ড হার্লে ও রবার্ট হার্লে (Edward ও Robert Harley)। এই দু'জনের দান করা নিদর্শনাদির মধ্যে ছিল পাণ্ডুলিপির এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ। এ ছাড়া স্যার রবার্ট ব্রুস কটনের (Robert Bruce Cotton) দান করা কথিত 'কটোনিয়ান' পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা (দ্র) ও প্রাচীন শিল্পদ্রব্যের নিদর্শনাদিও একে সমৃদ্ধ করতে প্রভূত অবদান রাখে।

১৭৫৭ সালে এই জাদুঘরে সম্রাট দ্বিতীয় জর্জ ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় গ্রন্থাগার দান করলে এটি আরো সমৃদ্ধ হয়। এর দু'বছর পর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বর্তমানে এটি লণ্ডনের ব্লুম্‌স্‌বেরির মণ্টেগু হাউসে অবস্থিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে মিউজিয়ামের নিদর্শন-ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হয়। এই সব প্রাচীন নিদর্শনের অধিকাংশই উপহার হিসাবে পাওয়া যায় অথবা ক্রয় করা হয়। এসবের মধ্যে ১৮১৬ সালে সংগৃহীত বিখ্যাত এল্‌গিন মার্বেল এবং এথেন্সের আক্রোপলিস থেকে প্রাপ্ত ধ্রুপদী গ্রিক ভাস্কর্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮২৩ সালে সম্রাট তৃতীয় জর্জের গ্রন্থাগার অধিগ্রহণের ফলে বর্ধিত সংগ্রহাদির স্থান সংকুলানের জন্য মিউজিয়াম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমান ভবনটির নকশাঙ্কন করেন স্যার রবার্ট স্মার্ক্ (Sir Robert Smirke)। শেষ পর্যন্ত ১৮৪৭ সালে এটি

ব্রিটিশ মিউজিয়াম

www.pathagar.com

স্থানান্তরিত হয় এর যাবতীয় নিদর্শনসহ এই মন্টেগু হাউসেই।

এর দশ বছর পর মিউজিয়ামের বিশাল গম্বুজাকৃতি গ্রন্থাগারের কাজ সম্পন্ন হয়। এই গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা করেন এর মুখ্য গ্রন্থাগারিক স্যার অ্যান্থনি প্যানিজ্জি (Sir Anthony Panizzi)। ১৮৮৩ সালে এর প্রাকৃতিক ইতিহাস সংশ্লিষ্ট সংগ্রহ দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে স্থানান্তর করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম'।

১৯৭৩ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও অন্যান্য জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ দিয়ে 'ব্রিটিশ লাইব্রেরি' গড়ে তোলা হয়। এর সংগ্রহে রয়েছে বর্তমানে যুক্তরাজ্যে (দ্র) কপিরাইটকৃত গ্রন্থের প্রতিটি কপি এবং রেফারেন্স বিভাগে রয়েছে মোট ১ কোটিরও বেশি গ্রন্থ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৮১ হাজার পাশ্চাত্য পাণ্ডুলিপি, ৩৭ হাজার প্রতীচ্যের পাণ্ডুলিপি এবং ১ লক্ষ সনদ ও দলিলাদি।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম মোট চারটি বিভাগে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে : প্রাচীন নিদর্শন বিভাগ, মুদ্রা ও পদক বিভাগ এবং এথনোগ্রাফিক বা মানবজাতি (দ্র) বিষয়ক বিভাগ। শেষোক্ত বিভাগটি বর্তমানে একটি পৃথক ভবনে অবস্থিত। এটি এখন 'মিউজিয়াম অব্ ম্যানকাইণ্ড' নামে পরিচিত। প্রাচীন নিদর্শনাদির সংগ্রহবিভাগে রয়েছে মিশরীয়, পশ্চিম এশীয়, গ্রিক, রোমান, প্রাগৈতিহাসিক, ব্রিটিশ, মধ্যযুগ (দ্র) ও প্রতীচ্যের অমূল্য সব নির্দশন।

আ. হ.

ব্রিটেন যুক্তরাজ্য দ্র

ব্রেই, লুই অন্ধশিক্ষা দ্র

ব্রেশ্‌ট্, বের্টোল্ট [১৮৯৮—১৯৫৬]

জার্মান নাট্যকার ও কবি ব্রেশ্‌ট্ (Bertolt Brecht) নাট্যতত্ত্বজ্ঞ ও প্রযোজক হিসাবে বিশ্বব্যাপী সবিশেষ খ্যাত। জন্ম জার্মানির বাভারিয়া অঞ্চলের আউস্‌বুর্গ-এ, ১৮৯৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি।

১৯১৬ সালে ব্রেশ্‌ট্ চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য মিউনিখে আসেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় সামরিক বাহিনীতে চিকিৎসাসহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯১৮ সালে কবিতা 'মৃত সৈনিকের জন্য শোকগাথা' প্রকাশিত হলে কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। কবিজীবনের সূচনায় প্রথমে তিনি ইম্প্রেশনিস্ট, স্যুর্‌রিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদী, পরে সরাসরি মার্ক্সবাদী আন্দোলনের ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন।

১৯২০ সালে মিউনিখ শহরে চাকরি নেন এক থিয়েটারে (দ্র)। ১৯১২ সালে একটি নাটক রচনা করে পান বিখ্যাত 'ক্লাইস্ট' পুরস্কার।

১৯৩৩ সাল থেকে জার্মানিতে হিটলারের (দ্র) নেতৃত্বাধীন নাৎসি (দ্র) বাহিনীর ব্যাপক নিপীড়ন শুরু হলে অন্য আরো বহু শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের মতোই তিনি আত্মরক্ষার্থ দেশত্যাগ করেন। প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে, সেখান থেকে ফ্রান্স। ফ্রান্স থেকে যান ডেনামার্কে। দীর্ঘ সাত বছর তিনি এখানে ছিলেন। নাৎসিরা ডেনমার্ক অধিকার করে নিলে তিনি ফিনল্যাণ্ড ও সাইবেরিয়া হয়ে সোজা চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র)। কিন্তু এখানেও তাঁর থাকা হয় নি। মার্কিন কর্মকর্তাদের কোপানলের শিকার হয়ে ১৯৪৭ সালে আবার তিনি ফিরে আসেন সুইজারল্যাণ্ডে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শেষে ১৯৪৮ সালে ফিরে ব্রেশ্‌ট্ আসেন খণ্ডিত জার্মানির পূর্ব অংশে অর্থাৎ সাবেক পূর্ব-জার্মানিতে। বিখ্যাত অভিনেত্রী সহধর্মিনী হেলেনে ভাইগেল্-এর সঙ্গে মিলে তিনি গড়ে তোলেন বিখ্যাত 'বার্লিনার আঁসাম্ব্‌ল্'। শুরু হয় 'এপিক' থিয়েটার হিসাবে খ্যাত তাঁর নাট্যদর্শনভিত্তিক নাট্য প্রযোজকের ও নাট্যকারের জীবন। ব্রেশ্‌ট্ তাঁর বাদবাকি জীবন নাটক রচনা ও প্রযোজনাকর্মেই আত্মনিবেদিত থাকেন।

তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলোর অন্যতম 'বাল্', 'ডি ড্রাইগ্রোশেনোপের্' ('থ্রি পেনি অপেরা' নামে খ্যাত), 'মুটের্ কারেজ উণ্ড ইহ্‌রে কিণ্ডের্' (ইংরেজিতে 'মাদার কারেজ'), 'সেট্‌সুয়ানের মক্ষিরানী' এবং 'লেবেন্ ডেস্ গালিলেই' (গালিলেওর জীবন) ইত্যাদি।

১৯৫৫ সালে তিনি লাভ করেন 'লেনিন পুরস্কার'।

১৯৫৬ সালের ১৪ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ন' খণ্ডে তাঁর কাব্যসমগ্র 'গেডিখ্‌টে' (কবিতাবলি)।

আ. হ.

www.pathagar.com

ব্রোঞ্জ (bronze)

তামা (দ্র) ও টিন এই দুই ধাতুর সংশ্রিণে যে সঙ্কর ধাতু (দ্র) তৈরি হয় তারই নাম ব্রোঞ্জ। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন যে যিশুখ্রিস্টের (দ্র) জন্মের আড়াই হাজার বছর আগেও মিশর দেশের লোকেরা ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত।

সাধারণত নয় ভাগ তামা ও এক ভাগ টিন মিশিয়েই ব্রোঞ্জ তৈরি হয়। ব্রোঞ্জ আবার নানা রকমের হয়। যেমন ফস্‌ফর ব্রোঞ্জ, সিলিকন্ (দ্র) ব্রোঞ্জ, কাস্টিং ব্রোঞ্জ প্রভৃতি। বিভিন্ন ব্রোঞ্জের উপাদানের পরিমাণ বিভিন্ন এবং তাদের ব্যবহারও বিভিন্ন। তামা ও টিন ছাড়াও কোনো কোনো ব্রোঞ্জের সঙ্গে সামান্য দস্তা (দ্র) এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্য ধাতুও মেশানো হয়। টেলিগ্রাফের (দ্র) তার তৈরির কাজে সিলিকন্ ব্রোঞ্জ বিশেষ উপযোগী। আবার সব ব্রোঞ্জে যে টিন থাকবে এমন কোনো কথা নেই—যেমন 'অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ'। এতে থাকে তামা ও অ্যালুমিনিয়াম (দ্র) ধাতু।

আ. হ. খ.

ব্রোমিন্ (bromine)

১৮২৬ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী আঁতোয়ান্ জেরোম্ বালার্ (Antoine Jérome Ballard) ব্রোমিন্ আবিষ্কার করেন। প্রতীক Br, আণবিক সঙ্কেত Br_2, পারমাণবিক ওজন ৮০, পারমাণবিক সংখ্যা ৩৫।

মৌল (দ্র) হিসাবে ব্রোমিন্ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। ব্রোমাইড হিসাবে সমুদ্রে, খনিতে (দ্র) এবং মরুসাগরে পাওয়া যায়। সমুদ্রে বা মরুসাগরে $CaBr_2$, KBr এবং NaBr হিসাবে অবস্থান করে। খনিজ কারনাইলাইটে (KCl, $MgCl_2$, $6H_2O$,), $MgBr_2$ খাদ হিসাবে থাকে।

প্রস্তুতি : ল্যাবরেটরিতে পটাসিয়াম ব্রোমাইড, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড একত্রে পাতন করে ব্রোমিন্ তৈরি করা হয়। (১) একটি বকযন্ত্রে MnO_2 ও KBr (৫:১) নিয়ে তাতে গাঢ় H_2SO_4 ঢেলে উত্তপ্ত করলে ব্রোমিন্ গ্যাস (দ্র) তৈরি হয়। এই গ্যাস ঠাণ্ডা পানিতে (দ্র) আংশিকভাবে নিমজ্জিত পাত্রে লাল রঙের তরল পদার্থ হিসাবে উৎপন্ন হয়। (২) KBr-এর গাঢ় দ্রবণে ক্লোরিন গ্যাস চালনা করলে ব্রোমিন্ তৈরি হয় : $2KBr + Cl_2 = 2KCl + Br_2$

শিল্পক্ষেত্রে প্রস্তুতি : (১) সমুদ্রের পানি H_2SO_4 দ্বারা অম্লায়িত করে তাতে প্রয়োজনীয় ক্লোরিন চালনা করলে ব্রোমিন্ তৈরি হয়ে পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকবে। এই দ্রবণের মধ্য দিয়ে বাতাস (দ্র) প্রবাহিত করলে বাষ্পাকারে বাতাসের সঙ্গে ব্রোমিন্ বের হয়ে আসে এবং Na_2CO_3-এর দ্রবণে শোষিত করলে সোডিয়াম ব্রোমাইড ও সোডিয়াম ব্রোমেট তৈরি হয়। এর পর এই ব্রোমাইড ও ব্রোমেটের দ্রবণ H_2SO_4 দ্বারা অম্লায়িত করে পাতন করলে ব্রোমিন পাওয়া যায়।

$$3Br_2+3Na_2CO_3 = 5NaBr + NaBrO_3 + 3CO_2$$

$$5NaBr + NaBrO_3 + 3H_2SO_4 = 3Na_2SO_4 + 3Br_2 + 3H_2O$$

(২) কারনালাইট থেকেও শিল্পক্ষেত্রে ব্রোমিন্ তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু এসব পদ্ধতিতে তৈরি ব্রোমিন্ বিশুদ্ধ হয় না। এতে সামান্য পরিমাণে ক্লোরিন, আয়োডিন (দ্র) ও পানি মিশ্রিত থাকতে পারে। এই অবিশুদ্ধ ব্রোমিন্ যথাক্রমে KBr ও ZnO দ্বারা পাতন করলে ক্লোরিন ও আয়োডিন অপসারিত হয়। এর পর গাঢ় H_2SO_4 দ্বারা পাতন করে পানি দূর করা হয় :

$$2KBr + Cl_2 = 2KCl + Br_2$$

ব্রোমিনের ধর্ম ও তার ব্যবহার : ব্রোমিন একমাত্র অধাতু, যা সাধারণ তাপমাত্রায় (দ্র) তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। এটির রঙ গাঢ় লাল এবং উদ্বায়ী। এ থেকে সর্বদা লাল ধোঁয়া নির্গত হয়। পানিতে ব্রোমিন্ সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয় এবং এই দ্রবণকে ব্রোমিন্ পানি বলা হয়। ব্রোমিন্ একটি বিষাক্ত পদার্থ এবং এর দ্বারা ঝিল্লি ও শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হয়, চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্লোরোফর্ম (দ্র), অ্যালকোহল (দ্র), ইথার, কার্বন-ডাই-সালফাইড প্রভৃতিতে ব্রোমিন্ সহজেই দ্রবীভূত হয়। ব্রোমিন ক্লোরিনের মতো ক্রিয়া প্রকাশ করলেও ক্লোরিনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ক্রিয়াশীল। উত্তপ্ত অবস্থায় হাইড্রোজেনের (দ্র) সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড উৎপন্ন করে। পানির সঙ্গে ব্রোমিন্ বিক্রিয়া করে হাইড্রোব্রোমিক ও হাইপোব্রোমাস অ্যাসিড উৎপন্ন করে। তাপ বা আলোর প্রভাবে হাইপোব্রোমাস অ্যাসিড ভেঙে সদ্যজাত অক্সিজেন (দ্র) দেয় বলে ব্রোমিন্ পানি জারকের মতো ক্রিয়া করে। ব্রোমিন্ অপেক্ষাকৃত দুর্বল জারক। হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ব্রোমিন্ সালফার (দ্র) মুক্ত করে। সালফার

www.pathagar.com

ডাইঅক্সাইড দ্রবণকে সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত করে। ব্রোমিন পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ থেকে আয়োডিন মুক্ত করে। সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সালফাইট দ্রবণকে সালফেটে পরিণত করে।

ব্রোমিন্ ঠাণ্ডা অবস্থায় ক্ষারের সঙ্গে ব্রোমাইড ও হাইপোব্রোমাইট এবং উত্তপ্ত অবস্থায় ব্রোমাইড ও ব্রোমেট উৎপন্ন করে।

ব্রোমিনের পরীক্ষা (test) :

১. ব্রোমিনের লাল রঙ ও বিশ্রী গন্ধ দ্বারা সহজেই তা চেনা যায়।

২. ব্রোমিন্ স্টার্চ আয়োডাইড কাগজ নীল করে।

৩. ইথার ও কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবীভূত হয়ে পীত রঙ উৎপন্ন করে।

ব্যবহার : ১. ইথিলিন (দ্র) ডাইব্রোমাইড ও ব্রোমোফরম তৈরির কাজে; ২. পটাসিয়াম ব্রোমাইড ও অন্যান্য ব্রোমাইড তৈরিতে; ৩. রঙ তৈরির কাজে এবং ৪. জারক হিসাবে ব্রোমিনের বহুল ব্যবহার রয়েছে।

আ. হ. খ.

ব্র্যাড্‌ম্যান্, ডোনাল্ড্ জর্জ [১৯০৮ —]

ক্রিকেটের মহানায়ক হিসাবে খ্যাত। ব্র্যাড্‌ম্যানের (Sir Donald George Bradman) জন্ম ২৭শে আগস্ট, ১৯০৮, কুটামুণ্ড্রায়। স্থানটি অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে অবস্থিত। ডানহাতী ব্যাট্‌স্‌ম্যান এবং মাঝে মাঝে লেগ ব্রেক বল করতেন।

ব্র্যাড্‌ম্যানের অসংখ্য রেকর্ডে ক্রিকেট ইতিহাস যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি তিনি নিজে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সর্বকালের সেরা ক্রিকেটের আসনে।

টেস্ট ক্রিকেটে অভিষিক্ত হন ১৯২৮-২৯ সালে। তখন থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ব্র্যাড্‌ম্যান্ ৫২টি টেস্টে ৮০ ইনিংস ব্যাট করার সুযোগ পান। ১০ বার অপরাজিত থেকে সর্বমোট ৬৯৯৬ রান করেন; এর মধ্যে ৩টি ত্রিশত ও ১০টি দ্বিশতসহ ২৯টি শত-রান রয়েছে। তাঁর ব্যাটিং গড় ৯৯.৯৪—এক অবিস্মরণীয় রেকর্ড। টেস্টে ৭২ ওভার বল করে ২টি উইকেট পান তিনি। সেরা বোলিং ৮ রানে ১ উইকেট।

ব্র্যাড্‌ম্যানের সময়ে শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়া (দ্র) আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে টেস্ট খেলা হত। ব্র্যাড্‌ম্যান্ ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই সবচেয়ে বেশি সফল ছিলেন। তিনি ১৯৩০, ১৯৩৪, ১৯৩৮ ও ১৯৪৮ সালে ইংল্যাণ্ড সফর করেন।

অ. ব.

ব্লাডগ্রুপ রক্তগ্রুপ দ্র

ব্লাডপ্রেসার রক্তচাপ দ্র

ব্লিচিং পাউডার (bleaching powder)

ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট [$Ca(ocl)_2$], ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$] মিলে গঠিত সাদা গুঁড়াবিশেষ। অনেক রসায়নবিদ এর ফর্মূলারূপে শুধু '$Ca(OCl)Cl$' ব্যবহার করেন। শুকনো কলিচুনের ওপর ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করে ব্লিচিং পাউডার তৈরি করা হয়। লঘু অ্যাসিডের (দ্র) সঙ্গে ব্লিচিং পাউডারের বিক্রিয়া ঘটলে ক্লোরিন তৈরি হয়। ক্লোরিন বিরঞ্জক হিসাবে কাজ করে। ব্লিচিং পাউডার থেকে নির্গত ক্লোরিনকে 'প্রাপ্তব্য ক্লোরিন' (available chlorine) বলে। ভাল ব্লিচিং পাউডার থেকে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ ক্লোরিন পাওয়া যায়।

জীবাণুনাশকরূপে এবং পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। কাগজ (দ্র) এবং বস্ত্র শিল্পে বিরঞ্জকরূপে এটা কাজে লাগে।

সা. এ.

ব্লিৎস্‌ক্রিগ্ (blitzkrieg)

শব্দটি জার্মান। এর অর্থ বিদ্যুতের মতো আকস্মিক, তীব্র, ভয়ঙ্কর শক্তিশালী যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময়ে এই শব্দ চালু হয়। বাংলায় সাধারণত একে 'ঝটিকা যুদ্ধ' বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে (দ্র) পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও দখল (১৯৩৯) করার সময়ে জার্মান বাহিনী একসঙ্গে সাঁজোয়া বাহিনী ও বোমারু বিমান নিয়ে পোল্যাণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আসলেই ঝড়ের গতিতে শত্রুপক্ষের সমস্ত প্রতিরোধ তছনছ করে এগিয়ে গিয়ে ঐ ক্ষুদ্র দেশটির অভ্যন্তরে ঢুকে যায়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাহিনীর সব

www.pathagar.com

ক'টি শাখার (পদাতিক বাহিনী, সাঁজোয়া বাহিনী, বিমান বাহিনী ইত্যাদি) সম্মিলিতভাবে সর্বাত্মক আক্রমণই 'ব্লিৎস্‌ক্রিগ্‌'।

হা. মা.

ব্লেক, উইলিয়াম [১৭৫৭—১৮২৭]

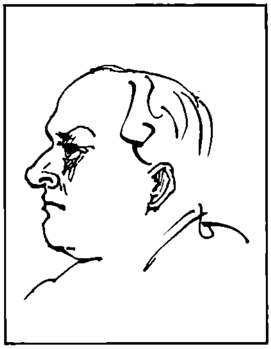

বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও আঁকিয়ে উইলিয়াম ব্লেকের (William Blake) জন্ম ১৭৫৭ সালে। বাবা ছিলেন দরিদ্র। গেঞ্জি, মোজা এইসব বুনতেন। বাবা জেম্‌স্‌ ব্লেক চেয়েছিলেন ছেলে বড় হয়ে তাঁর পেশাটাই নেবে। কিন্তু তা হয় নি। দশ বছর বয়সে উইলিয়াম একটা ড্রইং স্কুলে ভর্তি হন এবং প্রাচীন কালের অঙ্কনরীতি অনুকরণ করে তাঁর পাঠশিক্ষা আরম্ভ হয়। চার বছর এই স্কুলে পড়াশোনা করেন। তখন উইলিয়াম এক জন 'ক্ষুদে বোদ্ধায়' পরিণত হন। এ সময়েই তিনি খেলাচ্ছলে কিছু কিছু ছোট কবিতা রচনা করেন, যেগুলি পরবর্তী কালে 'Poetical Sketches' (১৭৮৩) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭৭৭ সাল থেকে সাত বছর তিনি জেম্‌স্‌ ব্যাসায়ার (James Basire) নামে এক জন খোদাইকারীর কাছে শিক্ষালাভ করেন। এর পর তিনি স্কুল অব রয়্যাল একাডেমীতে যোগদান করেন। ১৭৮২ সালে ব্লেক ক্যাথ্‌রিন বৌশারকে (Catherine Boucher) বিয়ে করেন। ক্যাথ্‌রিনের বাবা ছিলেন এক জন মালী। রয়্যাল একাডেমীর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে ব্লেক অনেক নামী-দামী শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৭৮৪ সালে আরেক জন শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রিন্ট ও খোদাইকর্ম বিক্রির একটা দোকান খোলেন। কিন্তু তাঁর প্রশিক্ষণ পাওয়া এই শিল্পকর্মের পাশাপাশি তাঁর কবিপ্রতিভার স্বাক্ষরও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই 'Songs of Innocence'-এ যেমন তাঁর অসাধারণ সুন্দর কিছু কবিতা ছাপা হল তেমনি পাশাপাশি ছাপা হল সুন্দর সব অলঙ্করণ। এই সালেই সংঘটিত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব (দ্র)। ব্লেক 'The French

উইলিয়াম ব্লেকের আঁকা একটি শিল্পকর্ম

অপাপবিদ্ধের গান—১৭৮৯

www.pathagar.com

Revolution' নামে একটি ছোট বই রচনা করেন।

ব্লেক ছিলেন গভীরভাবে ভাববাদী। সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়সহযোগে আমরা যা যা অনুভব করতে পারি, তিনি করতেন তারও চেয়ে বেশি। তাই তাঁকে অতীন্দ্রিয়বাদী বা মরমিয়া (mystic) কবি বলা হয়। ব্লেক নিজে বলেছেন, উল্লিখিত বই দু'টি ছাড়া অন্যগুলির ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর ভাই-এর আত্মার দ্বারা নির্দেশিত হয়ে লিখেছেন। 'Songs of Innocence' গ্রন্থেই তাঁর অতীন্দ্রিয় মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী 'The Marriage of Heaven and Hell' (১৭৯০), 'The Gates of Paradise' এবং 'The Vision of the Daughters of Albion' (১৭৯৩) গ্রন্থে তাঁর মনের এ ধরনের ভাব আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। Songs of Innocence-এর পরে রচিত হলেও 'The Book of Thel' প্রকাশিত হয়েছিল দু'বছর আগেই, ১৭৮৭ সালে। এই বইতেও অতীন্দ্রিয়বাদী উইলিয়াম ব্লেককে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই কবি যে শুধু ইন্দ্রিয়ের বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর আশেপাশের জীবনের যে ছবি দেখতে পেয়েছেন, যে কান্না শুনতে পেয়েছেন, যে অন্ধকার অনুভব করেছেন, শিশুর যে কষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন, সেসবেরও প্রকাশ আছে তাঁর কবিতায়। ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Songs of Experience' কাব্যগ্রন্থে তিনি সমাজের এক পৃথক চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর চেনা জগৎটাকে অস্বীকার করে নতুন এক ভুবনের খোঁজ করেন নি। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন, এই অজানা জগৎ সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি সেটুকুই সব নয়। ব্লেকের কবিতায় প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, মানুষের মুক্তির জন্য আকুলতা এবং জীবনের নানা সমস্যার কথা প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের শেষ দিকে কবি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। জীবনের অন্তিম বছরে 'Book of Job' গ্রন্থের জন্য তিনি যে অলঙ্করণ করেন তা সত্যিই অসাধারণ ও বিস্ময়কর।

১৮২৭ সালে উইলিয়াম ব্লেকের জীবনাবসান ঘটে।

শ. আহ.

ব্ল্যাক্ বিউটি (Black Beauty)

আনা সিওয়েল্ (Anna Sewell : ১৮২০-১৮৭৮) নামে এক মহিলা ঔপন্যাসিকের রচিত বই। ব্ল্যাক বিউটি একটি ঘোড়ার নাম; সে তাঁর জীবনকাহিনী বলে যাচ্ছে—এই নিয়েই গল্পটি। ১৮৭৭ সালে যখন বইটি প্রকাশিত হয় তখন বলা হতে থাকে যে ঐ কাহিনী পশুজগতের 'আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন' (দ্র)।

এক ভদ্রলোকের একটা ঘোড়া ছিল, নাম ব্ল্যাক্ বিউটি। পশুর প্রতি মায়ামমতা না থাকলে যা হয়, বাড়ির সবাই দুর্ব্যবহার করে। শেষ পর্যন্ত বেচারার একটা পা-ই ভেঙে গেল এবং সে অকেজো হয়ে পড়ল। এতে তার দুর্দশা আরো বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এক দয়াবতী মহিলার স্নেহে ও মমতায় মৃত্যুর হাত থেকে সে বেঁচে যায়।

বইটি লেখার এক উদ্দেশ্য ছিল আনা সিওয়েল্-এর। পশু-পাখিরও যে প্রাণ আছে, তাদের ভালমন্দ দেখা যে

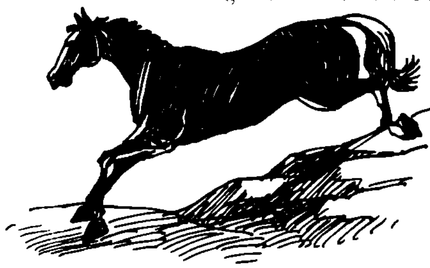

আমাদের মনুষ্যত্বের মধ্যেই পড়ে—এ কথাটিই দরদ দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন লেখিকা।

হা. মা.

ব্ল্যাক্ হোল্ কৃষ্ণবিবর দ্র

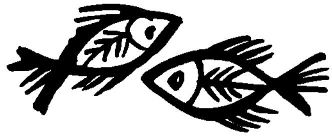

ভ

ভগৎ সিং [১৯০৭—১৯৩০]

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা ও শহীদ। তিনি ১৯০৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লায়ালপুর জেলার বাঙ্গা গ্রামে (বর্তমানে পাকিস্তানের অংশ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সর্দার কিষেণ সিং ও মাতা বিদ্যাবতী দেবী।

www.pathagar.com

ভগৎ সিং লাহোর ন্যাশনাল কলেজে পড়াশোনা করেন। কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের অনুপ্রেরণায় তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম জীবনে তিনি উত্তর প্রদেশের 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' নামক বৈপ্লবিক সংস্থায় যোগ দিয়ে সংগঠক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ভগৎ সিংয়ের উদ্যোগে লাহোরে 'নওজোয়ান ভারতসভা' নামে তরুণ বিপ্লবীদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর পর তিনি মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে এক নতুন বিপ্লবী দল গঠন করেন। এর নাম দেন 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন'। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বৈপ্লবিক উদ্দীপনামূলক বহু রচনা প্রকাশ করেন।

১৯২৮ সালের ৩০শে অক্টোবর লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমিছিলে বিপ্লবী লালা লাজপৎ রায় পুলিশের লাঠিচালনায় আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করলে ভগৎ সিং এর প্রতিবাদ স্বরূপ পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট জে. এ. স্কটকে হত্যা করেন (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৮)।

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মী বটুকেশ্বর দত্ত (দ্র) দিল্লির অ্যাসেম্বলি-কক্ষে দর্শকগ্যালারি থেকে দু'টি বোমা নিক্ষেপ করেন এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' ধ্বনি তোলেন। ঘটনাস্থলেই তাঁরা গ্রেফতার হন। ১২ই জুন তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁরা সণ্ডার্স হত্যামামলারও আসামী ছিলেন বলে ১৯৩০ সালের ৭ই অক্টোবর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে শিবরাম রাজগুরু ও শুকদেবসহ ভগৎ সিংকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ অন্যদের মতো ভগৎ সিংয়েরও ফাঁসি হয়।

সুজ. ব.

ভগবদ্‌গীতা গীতা / শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা দ্র

ভগ্নাংশ

'ভগ্নাংশ'কে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় 'ভাঙা অংশ'। অর্থাৎ কোনো একটি জিনিসকে ভেঙে বিভিন্ন অংশে ভাগ করলে প্রতিটি অংশ হবে ঐ জিনিসটির এক একটি ভাঙা অংশ বা ভগ্নাংশ।

গণিতে (দ্র) ভগ্নাংশ বলতে সংখ্যার অংশকে বোঝায়। ইংরেজি ফ্র্যাকশন (fraction)-এর বাংলা প্রতিশব্দ ভগ্নাংশ। এটি এসেছে একটি লাতিন শব্দ থেকে যার অর্থ ভাঙা, কারণ ভগ্নাংশে পূর্ণ সংখ্যাকে বিভিন্ন অংশে ভেঙে ফেলা হয়। কোনো কিছু পরিমাপ বা হিসাব করতে গেলে তা সব সময় পূর্ণসংখ্যা (যেমন ২, ৫, ৮৯, ১১১ ইত্যাদি) ব্যবহার করে করা যায় না, ভগ্নাংশের দরকার হয়। পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা বা ফাঁক বা গ্যাপ (gap) আছে ভগ্নাংশ তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে সঠিক পরিমাপ পেতে সাহায্য করে। ভগ্নাংশকে দু' ভাবে লেখা যায়—দু'টি পূর্ণ সংখ্যাকে একটি সরল রেখাংশের ওপরে- নিচে লেখা হয়। যেমন $\frac{৩}{৪}$; একে বলে ভাল্‌গার ভগ্নাংশ (vulgar fraction)। $\frac{৩}{৪}$–এর অর্থ ০ থেকে ১–এর মধ্যে যে ফাঁক তাকে সমান ৪ ভাগে ভাগ করে ৩টি ভগ্নাংশকে একত্রিত করা হয়েছে: $\{(\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪})\}$। এখানে ৩-কে অর্থাৎ ভাল্‌গার ভগ্নাংশের ওপরের সংখ্যাটিকে 'লব' (numerator) এবং ৪-কে অর্থাৎ নিচের সংখ্যাটিকে 'হর' (denominator) বলে। যদি ভাল্‌গার ভগ্নাংশে লব বড় ও হর ছোট হয় তবে এই ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ (improper fraction) বলে, যেমন $\frac{৩}{২}$। এর দু'টি অর্ধাংশের সঙ্গে আরো একটি অতিরিক্ত অর্ধাংশ যোগ করা হয়েছে : $\{(\frac{১}{২}+\frac{১}{২})+\frac{১}{২} = ১+\frac{১}{২} = ১\frac{১}{২}\}$। একে $১\frac{১}{২}$ দিয়েও লেখা যায়। ভাল্‌গার ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ করেও লেখা যায়। যেমন, ৭৫ শতাংশ (৭৫%); এর অর্থ $\frac{৭৫}{১০০}$। এ ক্ষেত্রে হর সব সময়ই ১০০ হয়। ভগ্নাংশকে লেখার আরেকটি উপায় হচ্ছে দশমিক চিহ্ন ব্যবহার করা। যেমন, $\frac{৭৫}{১০০}$ অথবা $\frac{৩}{৪}$ -কে লেখা যায় ০.৭৫ দিয়ে। যেসব ভগ্নাংশে হর এক কিন্তু লব ভিন্ন তাদের যোগ বা বিয়োগ করা বেশ সহজ। এ ক্ষেত্রে লবগুলো যোগ বা বিয়োগ করে দিলে যোগফল/ বিয়োগফল পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়রা ১ লববিশিষ্ট ভগ্নাংশ($\frac{১}{৪},\frac{১}{৫},\frac{১}{১০}$ ইত্যাদি) ব্যবহার করত। এবং $\frac{২}{৩}$ এর জন্য তারা বিশেষ ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করত। অন্য কোনো ভগ্নাংশ তারা ব্যবহার করত না।

হো. আ.

www.pathagar.com

ভদন্ত / ভন্তে / ভান্তে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী দ্র

ভবানী পাঠক [? —১৭৮৭]

অবিভক্ত ভারতে ইংরেজ শাসন-শোষণ এবং অত্যাচারী দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে সংঘটিত দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক।

ভবানী পাঠকের জন্মকাল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি ভোজপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইংরেজ লেখক গ্লেজিয়ার রচিত 'রংপুর জেলার বিবরণ' গ্রন্থে তাঁকে এই জেলার বাজপুর এলাকার অধিবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দলে নিগৃহীত কৃষক-প্রজার পাশাপাশি বেশ কিছু বিহারী ও পাঠান মুসলমানও ছিল। ফকির বিদ্রোহের (দ্র) নায়ক মজনু শাহের সঙ্গে পাঠকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং প্রথম থেকেই ভবানী এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়।

ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রধান ক্ষেত্র ছিল রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, কোচবিহার ও ময়মনসিংহের বিস্তৃত অঞ্চল। তিনি তাঁর তৎপরতার ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহের অন্যতম নায়িকা দেবী চৌধুরানীর সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেন।

১৭৮৭ সালের মাঝামাঝি থেকে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর নামের পাশাপাশি উল্লেখ দেখা যায়। তাঁদের যৌথ আক্রমণে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় শাসনব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ফলে ইংরেজ শাসকদের তরফ থেকে তাঁদের দু'জনকে গ্রেফতার করার জন্য সশস্ত্র লোকজনসহ পরোয়ানা পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁরা তা অগ্রাহ্য করলে অবশেষে লেফটেন্যান্ট ব্রেনামের নেতৃত্বে একটি ইংরেজ সেনাদল পাঠানো হয়। ১৭৮৭ সালের জুন মাসে রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জের কাছে ভবানী পাঠক ইংরেজ সেনাদলের বেষ্টনের মধ্যে পড়ে যান। সেই জলযুদ্ধে তাঁর দল পরাজিত হয়, তিনি নিজে নিহত হন, নিহত হন তাঁর পাঠান সহকারীসহ অপর দুই জন সহযোদ্ধা। আহত ও বন্দি হন আরো ৫০ জন। এ ছাড়া বিদ্রোহীদের 'অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ সাতখানি নৌকা' (ছিপ) ইংরেজ বাহিনীর হস্তগত হয়। এই জলযুদ্ধের সময় দেবী চৌধুরানী উপস্থিত ছিলেন না।

ভবানী পাঠকের মৃত্যুর পরও এই বিদ্রোহ আরো কিছুকাল অব্যাহত থাকে।

আ. হ.

ভবিষ্যবাদ (futurism)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইতালিতে 'ফুতুরিজ্‌মো' (futurismo) নামে এই সাহিত্য আন্দোলনের উদ্ভব হয়। পরে এর প্রভাব চিত্রকলা (দ্র) ও সঙ্গীতের (দ্র) উপরও ছড়িয়ে পড়ে। ইতালীয় কবি ফিলিপ্পো মারিনেত্তি (Filippo Marinetti) ১৯০৯ সালে প্যারিসের (দ্র) 'লা ফিগারো' পত্রিকায় প্রথম বারের মতো ভবিষ্যবাদের নীতিমালা ও রূপরেখা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন।

ভবিষ্যবাদের প্রবক্তারা পুরানো ঐতিহ্যের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন যন্ত্রযুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক সন্ধানের উপর গুরুত্ব দেন। গতিবেগ, যন্ত্রপাতি, যুদ্ধের গৌরব ও তীব্র স্বদেশপ্রেমের উপর তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ভবিষ্যবাদী শিল্পীরা শুধু ফর্ম ও রঙ নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন না, তাঁরা পৃথিবীর নিয়ত পরিবর্তনশীলতা ও চলমানতাকে রূপ দিতে চেষ্টা করতেন। একটি ছুটন্ত ঘোড়াকে তাঁরা দেখান বিশপদী রূপে, তার গতিকে দেখান ত্রিকোণাকৃতি করে। অনেকে এই আন্দোলনের মধ্যে চলচ্চিত্রের (দ্র) পূর্বসূরিকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম ভাগেই ভবিষ্যবাদ আন্দোলন ফ্যাসিবাদের (দ্র) সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। দাদাবাদ (দ্র), অভিব্যক্তিবাদ (দ্র) ও পরাবাস্তবতাবাদের (দ্র) উপরও এ আন্দোলন পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। রাশিয়াতে (দ্র) ভবিষ্যবাদ আন্দোলনের প্রবক্তারা প্রতীকী ও মরমীয়া সাহিত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এক পর্যায়ে পুশ্‌কিন্ (দ্র), দস্তইয়েফ্‌স্কি (দ্র), তলস্তোয় (দ্র) প্রমুখ ধ্রুপদী সাহিত্যিকদের রচনাকে পুরোপুরি বর্জন করার পক্ষে মত দেন। তবে তা গ্রাহ্য হয় নি। বস্তুতপক্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে ভবিষ্যবাদ আন্দোলন কোথাও ব্যাপক বা স্থায়ী প্রভাব ফেলে নি। ১৯২০-এর দশক সমাপ্ত হবার আগেই এ আন্দোলনের মৃত্যু ঘটে।

ক. চৌ.

www.pathagar.com

ভয়েস অব আমেরিকা

মার্কিন সমরতথ্য বিভাগের সম্প্রচারকেন্দ্র হিসাবে ১৯৪২ সালে এই বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সাল থেকে এটি ইউ. এস. ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন এজেন্সির (সাবেক মার্কিন ইনফর্মেশন এজেন্সি) আন্তর্জাতিক বেতার নেটওয়ার্কের অংশ হিসাবে কর্মরত ছিল।

বিদেশে, বিশেষত সাবেক কমিউনিস্ট দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) জীবনযাত্রা, এর অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অনুকূলে প্রচার চালানোই এর প্রাথমিক লক্ষ্য ও দায়িত্ব ছিল। পরে এই কেন্দ্রের কাজের বা প্রচারের আওতা আরো সম্প্রসারিত হয়, এর অনুষ্ঠানপ্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে।

১৯৭৯ সালে ভোয়া (VOA) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বা এলাকায় ১০৯টি ট্রান্সমিটার স্থাপন করে। সপ্তাহে ৩৮টি ভাষায় প্রায় ৪২০ ঘণ্টা ধরে এখান থেকে প্রচার করা হয় সংবাদ, কথিকা, সংবাদবিশ্লেষণ ও সঙ্গীত (দ্র)। এর মধ্যে ২২১ ঘণ্টার ইংরেজি, ৯৮ ঘণ্টার রুশ ও ৬৩ ঘণ্টার চীনা ভাষার অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত। 'ভয়েস অব আমেরিকা'র সদর দফতর ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত।

আ. হু.

ভর

কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমাণের পরিমাপ অর্থাৎ বস্তু-পরিমাণ। কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুর সরণ অথবা সেই বল (দ্র) প্রতিরোধের ক্ষমতা বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে। আবার কোনো বস্তুর অন্য বস্তুকে আকর্ষণের পরিমাণও বস্তুর ভর অনুযায়ী কম-বেশি হয়। তবে আমরা সাধারণত বস্তুর ওজনের পরিমাপ দ্বারাই বস্তুর ভর নির্ণয় করে থাকি। আসলে বস্তুর ওজন হচ্ছে পৃথিবীর (দ্র) দিকে সেই বস্তুকে আকর্ষণের জন্য যে বল কাজ করে তা-ই। আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতিতে ভরের একক হচ্ছে কিলোগ্রাম।

সু. ব.

ভরতনাট্যম্

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য। ভরতনাট্যম্, কথাকলি (দ্র), মণিপুরী (দ্র), কত্থক বা কথক (দ্র) ও ওড়িষী এই প্রধান ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে ভরতনাট্যম্ প্রাচীনতম। ভরতনাট্যম্ নৃত্য নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে দু'টি ধারণা প্রচলিত। প্রথম ধারণা এই যে বিখ্যাত শিল্পালোচনাগ্রন্থ 'নাট্যশাস্ত্র'-প্রণেতা মুনি ভরতের নাম অনুসারে ভরত ও নাট্যশাস্ত্র থেকে নাট্য নিয়ে ভরতনাট্যম্ নামটির উৎপত্তি। দ্বিতীয় ধারণা অনুযায়ী ভাব, রাগ (দ্র) ও তাল এই শব্দসমূহের প্রথম তিন অক্ষর নিয়ে ভরত ও তার সঙ্গে অভিনয় অর্থে নাট্যম্ কথাটি যুক্ত হয়ে ভরতনাট্যম্ হয়েছে। প্রথম ধারণাটিই অধিকতর গৃহীত।

ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে ভরতনাট্যমের বিকাশ ঘটে। মাদ্রাজ অঞ্চলের তাঞ্জোরে এই নৃত্যকলার উচ্চ অনুশীলন হয় এবং সেখানেই এর সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। নানা নৃত্যধারার সম্মিলনে ভরতনাট্যমের বিকাশ। ধারণা করা হয় যে এখন থেকে দুই হাজার বছর পূর্বে ভরতনাট্যমের সূচনা। প্রচলিত লোকনৃত্যসমূহে ভরতরচিত নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত নিয়মসমূহ প্রয়োগ করে এই শাস্ত্রীয় নৃত্যের সূচনা করা হয়। সাদির নাট্যম্, ভগবত মেলা, কুচিপুড়ি ও কুরু ভাঞ্জি এই চার নৃত্যধারায়ই ভরতনাট্যম্ নৃত্যকলার বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। তবে এই চারটি ধারা মিলিত হয়ে ভরতনাট্যমের আধুনিক যুগ রচনা করে। সাদির নাট্যম্ দেবদাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার বিকাশে দেবদাসীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরাই

ভরতনাট্যমের নানা মুদ্রা

www.pathagar.com

ভরতনাট্যমের প্রধান ধারক। আধুনিক ভরতনাট্যমের ভিত্তি স্থাপন করেন তাঞ্জোর দরবারের চার নৃত্যবিশারদ। এঁরা হলেন চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দম্ ও ওয়াড়িডেলু। এঁরা চার ভাই। এঁদের আগে ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতক জুড়ে এই নৃত্যধারাকে শাস্ত্রসঙ্গত করে তোলার কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন ব্যাঙ্কটমখী, ক্ষেত্রায়া, তীর্থনারায়ণ স্বামী প্রমুখ। অষ্টাদশ শতক ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে এই নাচের উৎকর্ষ বিধানের জন্য কাজ করেন মহাদেব অন্নাভী, সুব্বরায়ানাটুবান, শ্যামশাস্ত্রী, ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী প্রমুখ নৃত্যবিদ। এঁদের কর্মধারাকেই সংহত করে তোলেন চিন্নাইয়া ভ্রাতৃগণ।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা নৃত্ত, নৃত্য ও অভিনয়। নৃত্ত বলতে বোঝায় তালযুক্ত অঙ্গ সঞ্চালন, এর সঙ্গে রস প্রকাশের কোনো সম্পর্ক নেই। নৃত্য বলতে বোঝায় রসযুক্ত ও ছন্দময় অঙ্গ সঞ্চালন। অভিনয় বলতে বোঝায় ভাবপ্রকাশের উপযোগী অঙ্গ সঞ্চালন করে, সংলাপ বলে, আবৃত্তি করে, সাজসজ্জা গ্রহণ করে মনের ভাব প্রকাশের যে প্রক্রিয়া, তাকে। নৃত্য ও অভিনয় গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ভরতনাট্যমে নৃত্ত ও নৃত্যাভিনয় উভয়ই সুপ্রযুক্ত হয়ে থাকে।

একটি পরিপূর্ণ ভরতনাট্যম্ নৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। বিভাগগুলো হচ্ছে : আলারিপ্পু, যতিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্, পদম্, তিল্লানা, শ্লোক। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতও এই নৃত্যধারায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আলারিপ্পু ভরতনাট্যমের প্রথম নৃত্ত পর্যায়। এই পর্যায়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তালবাদন সহযোগে ধীরে ধীরে নৃত্যোপযোগী করে তোলা হয়। এই অংশে নর্তক ঈশ্বরবন্দনা করে থাকেন। যতিস্বরম্ অংশটিও নৃত্ত। এখানে তালের বোলের সঙ্গে শারীরিক ভঙ্গি সম্পাদিত হয়। পাঁচ থেকে সাতটি জটিল তালছন্দে প্রতিটিতে একই আবর্তনে এই অংশ সম্পূর্ণ করা হয়। পরবর্তী অংশ শব্দম্। শব্দম্ দ্বারা ঈশ্বর, বীর বা রাজার প্রশংসা বোঝায়। নৃত্যাভিনয়ের সাহায্যে প্রশস্তিমূলক বক্তব্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এর পরে ভরতনাট্যমের সবচেয়ে জটিল, কঠিন আকর্ষণীয় অংশ বর্ণম্। বর্ণম্ দ্বারা বোঝায় রঙ লাগানো বা আনন্দিত করা। এই অংশে নৃত্যশিল্পী দর্শকের মনে নানাভাবে রঙ লাগিয়ে দেয়। এতে নৃত্ত, নৃত্য ও অভিনয়ের চমৎকার সমাবেশ ঘটে। পরবর্তী পর্যায় পদম্। এই অংশে নৃত্যাভিনয় সহযোগে কয়েকটি গান পরিবেশন করা হয়। সবশেষে তিল্লানা। এটি জটিল পদকর্মযুক্ত নৃত্ত। তবে শির, দৃষ্টি প্রভৃতির সঞ্চালনও পদকর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তর্জনীকে বাঁকিয়ে গণ্ডে স্থাপিত করা তিল্লানার বৈশিষ্ট্য। জটিল ও ক্ষিপ্র পদকর্মে তিল্লানার যথার্থ আকর্ষণ নিহিত থাকে। সমাপ্তিসূচক অংশ শ্লোক। এই অংশে গীতগোবিন্দ (দ্র) থেকে একটি শ্লোক আবৃত্তি করা হয়। চক্ষু, হস্ত প্রভৃতি স্থানের নানা প্রকার প্রয়োগে শ্লোকের মর্মার্থ ব্যক্ত করা হয়ে থাকে।

ভরতনাট্যমে সকল প্রধান শাস্ত্রীয় অসংযুক্ত মুদ্রা ও সংযুক্ত মুদ্রা, নয় প্রকার শিরকর্ম, আট প্রকার দৃষ্টিকর্ম, নয় প্রকার তারাকর্ম, সাত প্রকার ভ্রুকর্ম, নয় প্রকার পুটকর্ম, ছয় প্রকার নাসাকর্ম, ছয় প্রকার গণ্ডকর্ম, ছয় প্রকার অধরকর্ম, নয় প্রকার গ্রীবাকর্ম, চার প্রকার মুখরাগ, আট প্রকার চিবুককর্ম এবং নানা অঙ্গ ও উপাঙ্গের বিধিসম্মত ব্যবহার হয়ে থাকে। সঙ্গীত ভরতনাট্যমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাতে বীণা, তম্বুরা, বাঁশি (দ্র), বেহালা (দ্র), নাগেশ্বরম্, মৃদঙ্গ (দ্র)ও মন্দিরা ব্যবহৃত হয়। কাব্য (দ্র), সঙ্গীত, নৃত্ত, নৃত্য ও অভিনয় এই পাঁচের সমন্বয়ে একটি সার্থক ভরতনাট্যম্ নৃত্য গঠিত হয়ে থাকে।

ক. গো.

ভলিবল (volleyball)

এটা মূলত একটি আমেরিকান খেলা। ওয়াই এম সি এ-র ডিরেক্টর উইলিয়াম জি. মর্গ্যান ১৮৯৫ সালে ম্যাসাচুসেট্সে এই খেলা আবিষ্কার করেন। এই খেলার পূর্ববর্তী নাম ছিল মিন্টোনেট। পরে এটা সারা বিশ্বে 'ভলিবল' নামেই পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে বিশ্বের ১০০টির উপর দেশে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অল্প জায়গায়, অল্প পরিশ্রমে প্রচুর আনন্দ দিতে, সব বয়সের মানুষকে বিনোদন দিতে এই খেলার জুড়ি নেই। ১৯৪৭ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে জাপান অলিম্পিকে পুরুষ ও মহিলাদের ভলিবল অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৮ সালে এশিয়ান গেম্সে (দ্র) এই খেলা যুক্ত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই খেলার প্রাধান্য বেশি।

ভলিবল খেলার মাঠ ১৮ মিটার লম্বা ও ৯ মিটার চওড়া হয় এবং এর উপরের দিকে ৭ মিটার পর্যন্ত খোলা জায়গা থাকা চাই। খেলার জালটি ১০ মিটার লম্বা ও ৯০ সেন্টিমিটার

www.pathagar.com

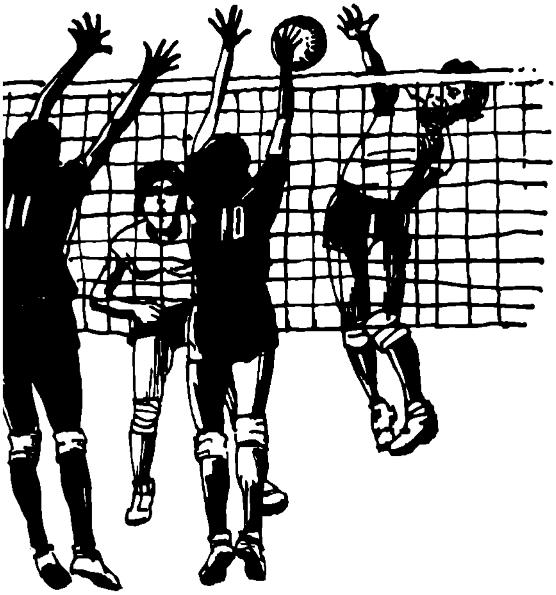

চওড়া হবে। মাটি হতে জালের উচ্চতা পুরুষদের জন্য ২ মিটার ৪৩ সেন্টিমিটার এবং মহিলাদের জন্য ২ মিটার ২৪ সেন্টিমিটার হয়। ১৯৪৯ সালে বিশ্ব ভলিবলের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন ১৯৭২ সালের ৩০শে অক্টোবর গঠিত হয়। এটি এশিয়ান ও আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশনের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে।

বাংলাদেশে (দ্র) এই খেলা বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত। খেলার সরঞ্জাম সহজলভ্য, আইনকানুন সহজ হওয়ার দরুন বিদ্যায়তনগুলিতে, গ্রামে-গঞ্জে এই খেলা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের প্রায় শহরেই নক্ আউট ও লীগ খেলা হয়ে থাকে। সার্ভিসেস্, পুলিশ ও আনসারদের প্রতিযোগিতা সব সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই খেলায় বাংলাদেশ এশিয়ান গেম্‌স্ (দ্র), সাফ (দ্র) গেম্‌স্ ও অন্যান্য আঞ্চলিক খেলায় অংশ নিয়ে থাকে।

কা. আ. আ.

ভল্‌ত্যার্ [১৬৯৪—১৭৭৮]

অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ফরাসি সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক। অবশ্য তাঁর সমকালীন অনেকের মতে, তিনি শতাব্দীর মহত্তম কবি ও নাট্যকার।

ভল্‌ত্যার্ (Voltaire) ১৬৯৪ সালের ২১শে নভেম্বর প্যারিসে (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে (François Marie Arouet)।

ব্যঙ্গাত্মক কিছু কবিতা রচনার দায়ে তাঁকে এক বছর (১৭১৭—১৮) বাস্তিল দুর্গে (দ্র) বন্দি থাকতে হয়। এর পরপরই তিনি গ্রহণ করেন ছদ্মনাম ভল্‌ত্যার্। এই নামেই তিনি সারা বিশ্বে পরিচিত।

ভল্‌ত্যার্ ছিলেন 'ফিলোসফিস্' নামে অভিহিত একটি ফরাসি সংস্কারবাদী গোষ্ঠীর নেতা, মুখ্য সংগঠক ও প্রচারকর্তা। এই গোষ্ঠীই ফ্রান্সে মুক্তবুদ্ধি ও সংস্কারযুগের স্রষ্টা বা প্রবর্তক; ফরাসি বিপ্লবে (দ্র) এঁর চিন্তা ও রচনার গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৭২৬ সালের পর ভল্‌ত্যার্ ইংল্যাণ্ডে তিন বছরের নির্বাসনজীবন বেছে নেন। এই সময় তিনি ব্রিটিশ উদারনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্য বিষয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করেন। ১৭৩৪ থেকে ১৭৪৪, ১৭৪৯ থেকে ১৭৫৩ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবন নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে কাটে।

ভল্‌ত্যার্ মারা যান ১৭৭৮ সালের ৩০শে মে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম 'ত্র্যাতে দ্য মেতাফিজিক্', 'অয়দিপাস', 'জায়রে', 'আলজিরে', 'লা অঁরিয়াদ্', 'জাদিগ্' ও 'কাঁদিদ্' ইত্যাদি। এইসব গ্রন্থের মধ্যে দিয়েই তাঁর দর্শনচিন্তা এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংস্কারচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

আ. হ.

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন গিরিশচন্দ্র সেন দ্র

ভাইরাস (virus)

ভাইরাস প্রোটিন–আবরণে বেষ্টিত একটি 'ডি এন এ' (দ্র) অথবা আর এন এ অণু দ্বারা গঠিত অতি ক্ষুদ্র অণুজীব, যা শুধু সজীব কোষেই বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (দ্র) ছাড়া ভাইরাস দেখা যায় না। অধিকাংশ ভাইরাসই মানুষ ও প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টি করে। উদ্ভিদ (দ্র), এমনকি জীবাণুও (দ্র) ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। জীবাণুকে আক্রমণকারী ভাইরাস 'ব্যাক্টেরিওফাজ' (bacteriophage) নামে পরিচিত, যা ভাইরাসগবেষণায় বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। ভাইরাসের শ্রেণীবিন্যাস জটিল, তবে বর্তমানে নিউক্লিক অ্যাসিডের ধরনের উপর নির্ভর করে

www.pathagar.com

এদের মোটা দাগে 'ডি এন এ' ভাইরাস ও 'আর এন এ' ভাইরাস হিসাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়ে থাকে।

সর্দি জ্বর (দ্র), মাম্প্‌স্ (দ্র), হাম (দ্র), জলাতঙ্ক (দ্র), ইনফ্লুয়েঞ্জা (দ্র), পোলিওমায়েলাইটিস (দ্র), গুটিবসন্ত, জলবসন্ত, সংক্রামক জণ্ডিস (দ্র), এইড্‌স্ (দ্র) প্রভৃতি রোগ ভাইরাসের আক্রমণে সৃষ্ট হয়। কোনো কোনো ভাইরাস টিউমার (দ্র) সৃষ্টির জন্যও দায়ী বলে মনে করা হয়। ভাইরাস রোগের চিকিৎসায় এখনো সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর এণ্টিবায়োটিক (দ্র) পাওয়া যায় নি।

উচ্চ তাপমাত্রা, তেজস্ক্রিয়া (দ্র), ইথার, বিশেষ ধরনের রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদির মাধ্যমে ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব। কোনো বস্তুকে ভাইরাসদূষণমুক্ত করার জন্য হাইড্রোজেন্ পারক্সাইড্ (দ্র), পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, হাইপোক্লোরাইট ইত্যাদি রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। ১৯৫৭ সালে ভাইরাসবিদ আইজাক্স ও তাঁর সহকর্মী লিণ্ডারম্যান ভাইরাস–আক্রান্ত কোষ থেকে 'ইন্টারফেরন' নামক উপাদান আবিষ্কার করেন, যা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে কার্যকর বলে দাবি করা হয়ে থাকে।

সি. না. হ.

ভাওয়াইয়া

বাংলা লোকসঙ্গীতের (দ্র) একটি বিশিষ্ট ধারার নাম। উত্তর-বঙ্গে এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। ভাব থেকে ভাওয়াইয়া কথাটি এসেছে বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ ভাবসমৃদ্ধ গান—এ অর্থে ভাওয়াইয়া কথার প্রচলন। এই গানের সুররূপকে বলা হয় ভাওয়াইয়া। চড়ার দিকে এই সুর দীর্ঘ টানযুক্ত হয়। তবে এই সুর ভাটিয়ালির মতো একটানা নয়। স্থানে স্থানে ভাওয়াইয়ার সুর ভেঙে আসে এবং তাতে শ্বাসের আঘাত লাগে। ভাঙা ভাঙা দীর্ঘ টানের সঙ্গে শ্বাসের আঘাত মিশে ভাওয়াইয়া গানকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে। ভাওয়াইয়া একটি শ্রেণীনাম। এর নানা উপশ্রেণী আছে। যেমন— মৈষাল বন্ধুর গান, গাড়োয়ালি গান, মাহুত বন্ধুর গান, চট্‌কা, ক্ষীরোল প্রভৃতি ভাওয়াইয়ার উল্লেখযোগ্য উপশ্রেণী। মহিষপালক রাখালের নাম মৈষাল। মৈষালদের জীবন নিয়ে রচিত গানকে বলা হয় মৈষাল বন্ধুর গান। মহিষপালক বা অন্যরাও এই গান গায়। গরু বা মহিষে টানা গাড়ির চালককে বলা হয় গাড়োয়ান। ভাওয়াইয়া গানে তাদের বলা হয় গাড়িয়াল। গাড়িয়ালদের নিয়ে রচিত গানকে বলা হয় গাড়ীয়ালি গান। হাতির চালককে বলা হয় মাহুত। এই মাহুতদের নিয়ে রচিত গানকে বলা হয় মাহুত বন্ধুর গান। চট্‌কা এক প্রকার রঙ্গনীতি। দ্রুত তালে কাটা কাটা সুরে গাওয়া এই গানে যথেষ্ট হাসির ব্যাপার থাকে। ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে দোতারা বাজানো হয়। ভাওয়াইয়ার ভাষায় একে বলা হয় 'দোতরা'। 'দোতরা' গান বলতে

ভাওয়াইয়াকে বোঝায়। আব্বাসউদ্দিন আহমদ (দ্র) ভাওয়াইয়া গানের বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন।

ক. গো.

ভাগ

ভাগ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ ডিভিজন্ (division)। এর অর্থ অংশ বা বণ্টন। কোনো বস্তু, দ্রব্য বা সংখ্যার সম্পূর্ণ একক বা সমগ্রককে একের অধিক সমান অংশে পৃথক করার প্রক্রিয়া হচ্ছে ভাগ। এটি একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া। গণিতের (দ্র) পাটীগণিত অংশের একটি প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় হল ভাগ। বস্তুত ভাগ হচ্ছে কোনো সমগ্র বা সংখ্যা থেকে একটি নির্দিষ্ট ছোট অংশ বা সংখ্যা বারে বারে বিয়োগ করার সংক্ষিপ্ত ও সহজতর প্রক্রিয়া। ৪টি দলকে যদি ৮টি বল থেকে ২টি করে বল দিতে হয়, তবে দু'টি করে বল চার বার সরিয়ে নিতে হবে। একে গাণিতিকভাবে এভাবে লেখা যায়: ৮-২ = ৬ ; ৬-২ = ৪; ৪-২ = ২; ২-২ = ০। অর্থাৎ ৮ থেকে ২ চার বার বিয়োগ করতে হয়। সংখ্যা বড় হলে

www.pathagar.com

বিয়োগ করার এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। কিন্তু ভাগপ্রক্রিয়ায় ৮-কে ৪ দিয়ে ভাগ করে সহজে ও স্বল্প সময়ে বিয়োগের কাজটি করা যায়। একে গাণিতিকভাবে লেখা যায় ৮÷৪ = ২ হিসাবে। এখানে ভাগের চিহ্ন হল '÷'। যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তাকে অর্থাৎ ৮-কে বলে ভাজ্য। যে সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়, তাকে অর্থাৎ ৪-কে বলে ভাজক। ভাজ্যকে ভাজক দিয়ে ভাগ করে যে ফল পাওয়া যায়, তাকে ভাগফল (যেমন ২) বলে। অনেক সময় ভাগ করার পর অবশেষ যা থাকে (যাকে ভাগ করা যায় না), তাকে ভাগশেষ বলে। যেমন ৯-কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ভাগে ২ পড়বে এবং ১ অবশেষ থাকবে। ভাগ মূলত গুণনের (দ্র) বিপরীত প্রক্রিয়া। গুণনে গুণ্য ও গুণক দেওয়া থাকে, অজানা গুণফল (৫X৩ = ?) নির্ণয় করতে হয়। কিন্তু ভাগের বেলা গুণফল ও একটি সংখ্যা দেওয়া থাকে অজানা অপর সংখ্যাটি (৫X? = ১৫ অর্থাৎ ১৫÷৫ = ?) নির্ণয় করতে হয়। গুণনপ্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত যোগ (দ্র) আর ভাগপ্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত বিয়োগ (দ্র)। সমান সমান রাশি বিয়োগের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হিসাবে ভাগের উদ্ভব হয়েছে। ভাগপ্রক্রিয়াটি একটু জটিল। গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ভাগ করতে হলে সংখ্যার স্থানীয় মান, গুণ এবং বিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হয়।

হো. আ.

ভাগ্‌নের্‌, ভিল্‌হেল্‌ম্‌ রিশার্ড্‌ [১৮১৩—১৮৮৩]

সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতরচয়িতা। নাট্যকার ও দার্শনিক। সর্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য গীতিনাট্য ও অপেরা (দ্র) রচয়িতা। জার্মানির লাইপ্‌ৎসিগে ১৮১৩ সালে জন্ম।

শৈশবেই ভাগ্‌নের্‌ (Wilhelm Richard Wagner) অসামান্য মেধার পরিচয় দেন। গ্রিক ও ইংরেজি শেখেন স্কুলে পড়ার সময়ই। সে সময়েই তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করেন। উনিশ বছর বয়সে লাইপ্‌ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিভাগে ভর্তি হন। তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা সকলকে অভিভূত করে। ছাত্র অবস্থাতেই ভাগ্‌নের্‌ একটি সিম্ফনি (দ্র) ও কতিপয় অন্যবিধ যন্ত্রসঙ্গীত রচনা করেন। সঙ্গীতশিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি উরৎসবর্ন থিয়েটারে কোরাস (দ্র)-মাস্টারের পদে নিযুক্ত হন। এর পরপরই ভাগ্‌নের্‌ অপেরা রচনায় হাত দেন ও একটি অপেরা নিয়ে ফ্রান্স সফরে যান। সেখানে প্রথম দিকে তাঁর অপেরার সমাদর হয় নি। প্যারিসে (দ্র) থাকাকালীন ভাগ্‌নের্‌ পুরাণকাহিনীর ভিত্তিতে 'দ্য ফ্লায়িং ডাচম্যান' নামে একটি অপেরা রচনা করেন। সে থেকেই পুরাণভিত্তিক অপেরা রচনার ধারার সূচনা হয়। সেখান থেকে তিনি ড্রেসডেন যান ও বিখ্যাত 'ট্রিস্টান ইসোল্ডে' অপেরা রচনা করেন। ১৮৪১ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগ উঠলে ভাগ্‌নের্‌ ড্রেসডেন থেকে পালিয়ে জুরিখ যান ও সেখানে ক্রমান্বয়ে দশ বছর বসবাস করেন। সে সময় অপেরা ছাড়াও নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। পর পর বেশ কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা করেন তিনি। বাভারিয়ার রাজপরিবার ভাগ্‌নের্‌কে সে সময় থেকে অব্যাহতভাবে সাহায্য করে। মনীষী নিটশে (দ্র)ও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং ভাগ্‌নের্‌ও প্রভূত পরিমাণ সৃজনশীল কাজ করে সেই সাহায্যের সদ্ব্যবহার করেন। সঙ্গীত রচনা ছাড়াও অপেরা, গীতিনাট্য ও নানা বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ রচনায় তাঁর জীবনের শেষের দিকের বছরগুলো অতিবাহিত হয়। বায়ুপরিবর্তনের জন্য ভেনিস গেলে সেখানে ১৮৮৩ সালে হঠাৎ করে ভাগ্‌নের্‌ মারা যান। নাটক, গীতিনাট্য, অপেরা ও সুর রচনায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে ভাগ্‌নেরের স্থান অতুলনীয়। দার্শনিক হিসাবেও তিনি সুবিদিত। কেউ কেউ মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য (দ্র) রচনায় ভাগ্‌নেরের প্রভাব আছে।

ক. গো.

ভাটিয়ালি

বাংলা লোকসঙ্গীতের (দ্র) একটি প্রধান ধারা। প্রকৃতপক্ষে সুরগঠনের একটি রীতির নাম ভাটিয়ালি। চড়ায় দীর্ঘ টানের সাহায্যে এর সুরের বৈশিষ্ট্যময় রূপটি গঠিত হয়। ভাটিয়ালি সুরে রচিত গান—এই অর্থে এই গানের নাম ভাটিয়ালি গান। নদী ও জলাভূমিপ্রধান নিম্নাঞ্চলীয় বাংলাদেশে এই গান বিশেষভাবে প্রচলিত। ভাটিয়ালি সুরটি মাঝিদের গান থেকে এসেছে। ভাটির টানে নৌকা চললে মাঝিদের আয়েশ হয়। তখন তারা গলা ছেড়ে লম্বা টান দিয়ে গান গায়। এই অর্থেই নদীর ভাটির দিকে বেয়ে যাবার কালে গাওয়া সুরকে ভাটিয়ালি বলা হয়েছে। মাঝিদের গান থেকে এই সুররূপটি আহরণ করা হলেও মাঝিরাই এর একমাত্র গায়ক নয়।

www.pathagar.com

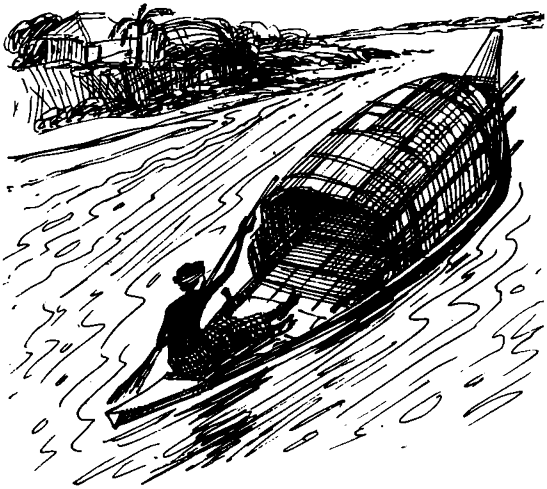

বাংলা লোকসঙ্গীতের নানা বিষয়ভিত্তিক ও আঞ্চলিক শ্রেণীতে ভাটিয়ালি সুর প্রয়োগ করা হয়েছে। ভাটিয়ালির সুররূপে আঞ্চলিক পার্থক্যও আছে। ময়মনসিংহের বিখ্যাত লোককবি জালালউদ্দিন খাঁ ভাটিয়ালি সঙ্গীত নিয়ে নানা পরীক্ষামূলক কাজ করেছেন। লোকসঙ্গীতে মিলিত গানের ধারাটি প্রবল, তবে 'ভাটিয়ালি' কিন্তু একক সঙ্গীত।

ক. গো.

ভাদ্র পূর্ণিমা / মধু পূর্ণিমা

কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধ (দ্র) খ্রিস্টপূর্ব ৫৭৯ অব্দে পারিলেয়্য অরণ্যে সাময়িক অবস্থানকালে একটি বানর তাঁকে পান করার জন্য মধু দান করে। তাই ভাদ্র পূর্ণিমা মধু পূর্ণিমা নামেও খ্যাত। এ সময় বনের হাতি ও অন্যান্য পশু তাঁর সেবা করেছিল।

বি. ব.

ভান গখ্, ভিন্সেন্ট্ [১৮৫৩—১৮৯০]

বিশ্ববিখ্যাত ডাচ্ বা ওলন্দাজ চিত্রকর। বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর গভীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, রঙ, রেখা এবং পরিপ্রেক্ষিতের বাঙ্ময় ব্যবহারের সমন্বয়ে সৃষ্ট তাঁর চিত্রকর্ম তাঁকে বিংশ শতাব্দীর এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রাঙ্কন রীতির বিশিষ্টতম পথিকৃতের মর্যাদায় বিভূষিত করেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর পরবর্তী কালের চিত্রকর্মে চক্রাকার তুলির পোঁচ এবং ঝাঁঝালো রঙের ব্যবহার তাঁকে আধুনিক শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক জন প্রভাবশালী চিত্রকরের মর্যাদায়ও অধিষ্ঠিত করেছে।

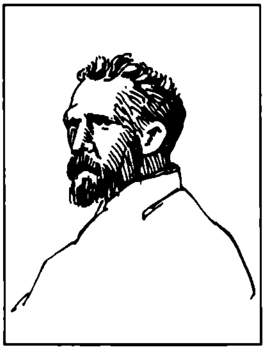

তাঁর পুরো নাম ভিন্সেন্ট্ উইলেম্ ভান গখ্ (Vincent Willem van Gogh)। ১৮৫৩ সালের ৩০শে মার্চ তিনি নেদারল্যাণ্ডসের উত্তর ব্রাবান্ট্-এর গ্রুট্-জুনডের্ট্-এর এক যাজকপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ভান গখ্ ১৬ বছর বয়সে দ্য হেগ শহরের গৌপিল(Goupil) গ্যালারিতে সেল্স্‌ম্যান হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৮৭৩ সালে তাঁকে এই গ্যালারির লণ্ডন (দ্র) দফতরে বদলি করা হয়। এই সময় তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি অনভিপ্রেত ঘটনা তাঁকে অস্থিরচিত্ত করে তোলে। ১৮৭৬ সালে তাঁকে গৌপিলের প্যারিস (দ্র) শাখায় বদলি করা হলে এই অস্থিরচিত্ততার কারণেই তিনি চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন।

এরপর থেকে ভান গখ্ ক্রমশ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকেন এবং ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করার মানসে ১৮৭৭ সালে আমস্টারডামে গ্রিক ও লাতিন ভাষার কোর্সে ভর্তি হন। তবে এই কোর্সে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে তাঁর উর্ধ্বতনেরা তাঁকে বোরিনেজ খনি এলাকায় এক জন সাধারণ ধর্ম-প্রচারকের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। কিন্তু খনিশ্রমিকদের দারিদ্র্য তাঁকে

ভান্ গখের ছবি

www.pathagar.com

তারা-ভরা রাত

ক্রন্দনরত বৃদ্ধ—১৮৮২

দ্য জোয়াভ—১৮৮৮

অপরিসীম ব্যথিত করে এবং তিনি তাদের চলমান ধর্মঘটকে সমর্থন করে বসেন। ফলে ১৮৭৯ সালে এ চাকুরিও তাঁকে হারাতে হয়। শেষকালে তিনি চলে আসেন দ্য হেগ শহরে, এবং চিত্রকর হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এই সময় তিনি শুধু সাধারণ ছবিই আঁকেন নি, লিথোগ্রাফি (দ্র) নিয়েও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

১৮৮৩ সালে ভান গখ্ নুয়েনে নামক একটি এলাকায় আসেন এবং এই প্রথম কৃষক সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে তাঁর। তাদেরকে মডেল করে তিনি ছবির পর ছবি আঁকতে শুরু করেন।

১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি প্যারিসে আসেন এবং পরিচিত হন নামকরা সব ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকরদের সঙ্গে। তাঁদের অঙ্কনরীতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। জর্জ স্যরা (George Seurat : ১৮৫৯–১৮৯১)-র পোয়্যাঁতিলিস্ত্ (pointillist) বা বিন্দুসজ্জা রীতি দ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হন। তবে অচিরেই তিনি তাঁর পূর্বসূরি ও সমকালীন চিত্রকরদের প্রভাব কাটিয়ে নিজস্ব রীতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর 'পেরে তানগাই' (১৮৮৬-৮৭) চিত্রকর্ম এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভান গখ্-এর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্য পটাটো ইটার', 'দ্য স্ট্যারি লাইট', 'দ্য চেয়ার অ্যাণ্ড দ্য পাইপ', 'দ্য অলিভ গ্রোভ', 'কাফে অ্যাট নাইট' ও 'পোর্ট্রেট অব ড. ঘাচেট' ইত্যাদি। তাঁর শেষ দিককার চিত্রকর্ম আধুনিক চিত্রকলার জগতে বিপ্লবের সূচনা করে এবং তাঁর

www.pathagar.com

কাজের দ্বারা 'ফোভিজম্' (fauvism) ও জার্মান এক্সপ্রেশনিজম্ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।

জীবিত থাকতে ভান গখ্ তাঁর আঁকা একটি মাত্র ছবি বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সঙ্গে জনপ্রিয়তাও।

১৮৯০ সালের ২৭শে জুলাই ভান গখ্ নিজের মাথা লক্ষ করে নিজেই পিস্তলের গুলি ছোঁড়েন। এর দুই দিন পর অর্থাৎ ২৯শে জুলাই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আ. হ.

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় [১৯২০—১৯৮৩]

জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা। তিনি ১৯২০ সালের ২৬শে আগস্ট ঢাকার (দ্র) অদূরে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম সাম্যময়। বাবা জিতেন্দ্রনাথ ছিলেন ঢাকার (দ্র) নবাব স্টেটের সদর মোক্তার। মাতা সুনীতি দেবী সরকারি শিক্ষা বিভাগে চাকুরি করতেন।

মাত্র বারো বছর বয়সে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র গুপ্তের (দ্র) সহযোগী ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) ভর্তি হন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের (দ্র) সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে হয়। ১৯৪১ সালে তিনি কলিকাতায় (দ্র) পালিয়ে যান। কলিকাতার 'আয়রন স্টিল কন্ট্রোলে' অনেক দিন চাকুরি করেন।

১৯৪৬ সালে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় চলচ্চিত্রের (দ্র) সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর প্রথম অভিনীত ছবির নাম 'জাগরণ'। 'জাগরণে' তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত এক চরিত্রে রূপদান করেন। তাঁর অভিনীত দ্বিতীয় ছবির নাম 'নতুন ইহুদী'। এখান থেকেই তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নাট্যমঞ্চের শিল্পী হিসাবেও তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আসেন। তিনি প্রায় তিন শ' ছবিতে অভিনয় করেন।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকার গাড়োয়ানদের কাছ থেকে কৌতুক অভিনয়ের প্রাথমিক প্রেরণা পেয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কলিকাতায় কাটালেও ঢাকার ছেলে হিসাবে পরিচয় দিতে তিনি গর্ববোধ করতেন। ব্যক্তিগত আচার-আচরণে এবং অভিনয়ে তিনি পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। শুধু কৌতুকাভিনেতা নয়, চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও তিনি ছিলেন উঁচু দরের শিল্পী। 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে', 'টাকা আনা পাই', 'দর্পচূর্ণ' প্রভৃতি ছবিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তাঁর নামে দু'টি ছবিও হয়েছে। ছবি দু'টির নাম 'ভানু পেল লটারী' এবং 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিসটেন্ট'।

জীবনের শেষ দিকে এসে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যাত্রা দলের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। তিনি একটি দলও পরিচালনা করতেন। ১৯৫৫ সালে লেখা তাঁর রসরচনার বই 'চাটনী' বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

তিনি ১৯৮৩ সালের ৪ঠা মার্চ কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

র. শা.

ভাববাদ (Idealism)

দর্শনের দু'টি প্রধান ধারা আছে, যার সাহায্যে মানুষ বিশ্বরহস্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে। একটি হল ভাববাদ আর অন্যটি বস্তুবাদ। বিশ্বরহস্য সন্ধানের ক্ষেত্রে খুবই মৌলিক এক প্রশ্ন দেখা দেয়, তা এই : বস্তু (matter) প্রধান, নাকি মন বা চৈতন্য বা ভাব (mind) প্রধান। ভাববাদ বস্তুকে প্রাধান্য দেয় না। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, ভাববাদী ও বস্তুবাদী ধারণার মধ্যে কালের দিক থেকে প্রথমটি প্রাচীনতর।

ভাববাদ যা বলতে চায় তা হল : মন বা চৈতন্যই হচ্ছে প্রধান, এবং তা কোনো 'বস্তু' নয় ; ফলে বস্তু কখনো প্রধান হতে পারে না। বস্তুর পরিবর্তন, ক্ষয় ও বিনাশ আছে। আর যে জিনিসের এসব থাকে, তাকে নিশ্চয়ই কোনো কিছুর মূল বা শাশ্বত হিসাবে ধরা যায় না। অন্যপক্ষে মন বা চেতনার কোনো বিকৃতি নেই, ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। অতএব বস্তুর চেয়ে ভাব (অর্থাৎ মন বা চৈতন্য) বেশি শক্তিশালী।

www.pathagar.com

ভাববাদের এই যে ব্যাখ্যা, তার সঙ্গে সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে ধর্মীয় বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন, সবকিছু যিনি চালনা করছেন তিনি কখনোই 'বস্তু' হতে পারেন না, তিনি বস্তুর অতীত, বস্তুর উর্ধ্বে কোনো শক্তি। প্রসঙ্গত, ভাববাদ অতীন্দ্রিয় শক্তি বা অ-বস্তুমূলক সত্তার অস্তিত্ব মানে; তাই শাসক ও যাজক উভয় শ্রেণীই সাধারণ মানুষজনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই তত্ত্বকে শত শত বছর ধরে ব্যবহার করে আসছেন।

প্রাচীন ভারতে হিন্দু দর্শনে ভাববাদ একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য চিন্তাধারা হিসাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

হা. মা.

ভারত

ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ও বাংলাদেশের (দ্র) প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সার্ক (দ্র)-ভুক্ত সাতটি দেশের (নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা) মধ্যে ভারত সর্ববৃহৎ। ভারতের আয়তন প্রায় ৩২,৬৬,৬৯৪ বর্গ কিমি (জম্মু ও কাশ্মীরসহ) এবং জনসংখ্যা প্রায় ৮৮ কোটি ২৮ লক্ষ ১৩ হাজার (১৯৯২ সালের হিসাবানুযায়ী)। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু (দ্র), ধর্ম-বর্ণ ও ভাষাগতভাবে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য ভারতকে একটি ক্ষুদ্র মহাদেশ (দ্র) বলা হয়।

ভারত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ভারত ২২টি প্রদেশ ও ৯টি রাজ্য নিয়ে গঠিত। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারির সংবিধান মতে ভারত শাসিত হচ্ছে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশ ভারত। লোকসভা ও রাজ্যসভা নিয়ে ভারতের সংসদ (দ্র) গঠিত। সরকারের প্রতি সংসদের সমর্থন না থাকলে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের ঘোষণা দিতে পারেন। যে দল সংসদে বেশি আসন লাভ করে, সাধারণত সেই দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনিই মন্ত্রীবর্গের নিয়োগ দান করেন।

ভূপ্রকৃতি : ভূপ্রকৃতি অনুসারে ভারতকে প্রধান তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় : ১. উত্তরের পার্বত্য ভূমি (হিমালয় পর্বত ও তার শাখা-প্রশাখা অর্ধচন্দ্রাকারে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে বিস্তৃত)। ২. গাঙ্গেয় সমভূমি (পার্বত্য

অজন্তা : মন্দিরের প্রবেশদ্বার

অঞ্চলের দক্ষিণে গঙ্গা (দ্র), যমুনা (দ্র), ব্রহ্মপুত্র (দ্র) ও এগুলোর শাখা-প্রশাখা দ্বারা পরিবাহিত পলল এক বিস্তীর্ণ সমভূমির সৃষ্টি করেছে ; এই সমভূমি উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় পর্বতমালা (দ্র) থেকে দক্ষিণাত্যের (দ্র) মালভূমি এবং পূর্ব-পশ্চিমে আসাম থেকে পাকিস্তানের (দ্র) পূর্ব সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত)। ৩. মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণে পর্বত ও মালভূমি অঞ্চল; এই অঞ্চলের পর্বতগুলোর মধ্যে রাজস্থানের আরাবল্লী এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত)।

জলবায়ু : সমস্ত ভারত মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। বাংলাদেশের মতোই ভারত গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকালে বেশির ভাগ অঞ্চল মৃদু শীতল ও শুকনো থাকে। দেশের সর্বত্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান নয়। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে বর্ষাকাল, কিন্তু দেশের দক্ষিণাংশে বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (দ্র) এবং উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়।

কৃষিজ সম্পদ : ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। উর্বর পললময় গাঙ্গেয় উপত্যকা ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃষিঅঞ্চল। মরুভূমির (দ্র) শুষ্ক অঞ্চলেও কৃষিকাজের জন্য ব্যাপকভাবে জলসেচের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বৃষ্টিময় পললভূমিতে ধান চাষ এবং শীতকালীন বৃষ্টিপাত ও জলসেচের ফলে গম উৎপাদিত হয়। তা ছাড়া ভুট্টা (দ্র), আখ (দ্র), তামাক (দ্র) ও পাট (দ্র) ভারতের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। তামাক উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পৃথিবীর প্রায় ৩৩ শতাংশ চা (দ্র) ভারতের আসামে উৎপন্ন হয়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন প্রকার ভাল তেলবীজ ও রবিশস্য উৎপন্ন হয়।

খনিজ সম্পদ ও শিল্পজাত দ্রব্য : ভারত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা (দ্র), লোহা (দ্র), অভ্র (দ্র), ম্যাঙ্গানিজ, সোনা (দ্র) ও খনিজ তেল উল্লেখযোগ্য। ভারত পৃথিবীর অন্যতম অভ্র উৎপাদনকারী দেশ। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। তা ছাড়া আসামে খনিজ তেল এবং মহীশূরের কোলার খনি থেকে সোনা আহরণ করা হয়।

প্রয়োজনীয় খনিজদ্রব্য এবং কাঁচামালের প্রাচুর্য থাকায় ভারতে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। বস্ত্র, পাট, লোহা ও ইস্পাত (দ্র), চিনি (দ্র), সিমেন্ট, পশম প্রভৃতি ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্প। তার মধ্যে বস্ত্রশিল্প বৃহত্তম। জাহাজ (দ্র) নির্মাণ ও মেরামত, বিমান নির্মাণ এবং সার (দ্র) ও খনিজ শিল্প অন্যান্য শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

যাতায়াতব্যবস্থার জন্য রেলপথ, সড়কপথ, জলপথ ও বিমানপথ ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারতে প্রায় ৩৩ হাজার কিমি সড়কপথ আছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কলিকাতা থেকে পূর্ব-পাঞ্জাব অতিক্রম করে পাকিস্তানের খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। ডেকান রোড মির্জাপুর থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এবং এয়ার ইণ্ডিয়া বিমানযোগে ভারতের সব গুরুত্বপূর্ণ শহরে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ স্থান : যমুনা নদীর তীরে নয়াদিল্লি ভারতের রাজধানী। এখানে মুসলিম স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আছে। তার মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের (দ্র) নির্মিত লালকেল্লা ও জুমা মসজিদ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আগ্রার তাজমহল (দ্র) বিশ্ববিখ্যাত। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত কলিকাতা (দ্র) ভারতের বৃহত্তম নগর এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী।

১৯১১ সাল পর্যন্ত কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী আয়তন মোটামুটি ৭,৩৫,৫৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা

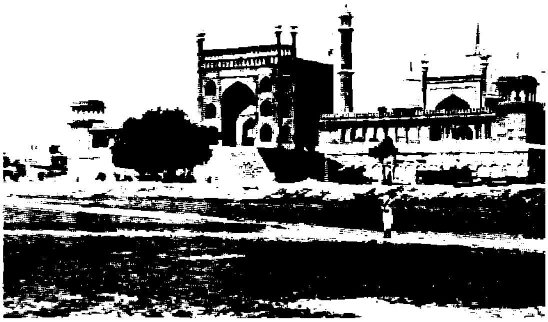

দিল্লির জামে মসজিদ

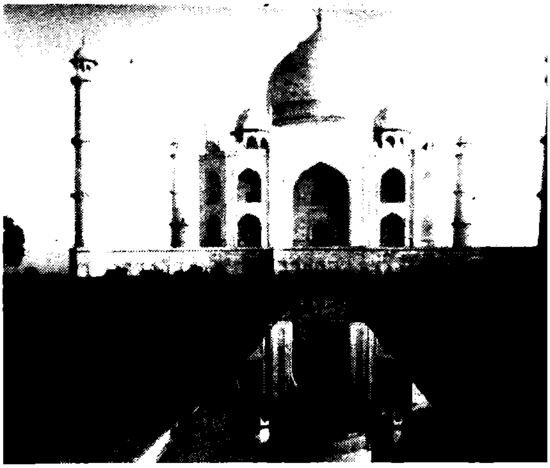

ভারতের আগ্রায় অবস্থিত তাজমহল

ছিল। বোম্বাই ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর ও প্রসিদ্ধ বন্দর। কাপড়ের কল ও চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য এ নগর বিখ্যাত। মাদ্রাজ দক্ষিণ ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। আজমীর শহরে হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির (রা.) (দ্র) মাজার শরীফ অবস্থিত। দার্জিলিং উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যনিবাস। বঙ্গোপসাগরের (দ্র) তীরে অবস্থিত পুরী হিন্দুদের তীর্থস্থান। কানপুর উত্তর ভারতের পাঁচটি রেলপথের মিলনস্থল। পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ রেলপথ-ব্যবস্থা ভারতেই দেখা যায়।

মু. এ.

ভারত ছাড়ো আন্দোলন আগস্ট আন্দোলন দ্র

ভারত মহাসাগর

পৃথিবীর (দ্র) তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। সমগ্র বিশ্বের ২০ শতাংশ জলরাশি এই মহাসাগর ধারণ করে আছে। এর

www.pathagar.com

আয়তন মোটামুটি ৭,৩৫,৫৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ২,৮৪,০০,০০০ বর্গমাইল, গড় গভীরতা ৪,০০০ মিটার বা ১৩,১২৩ ফুট। গভীরতম অংশ জাভা পরিখার (trench) গভীরতা হল ৭,৭২৭ মিটার বা ২৫,৩৫১ ফুট। এই মহাসাগরের পানির সর্বোচ্চ উষ্ণতা ৩০° সেলসিয়াস।

ভারত মহাসাগরের উত্তরে এশিয়ার (দ্র) দক্ষিণ অংশ, পশ্চিমে আরব উপদ্বীপ ও আফ্রিকা (দ্র), পূর্বে মালয় উপদ্বীপ, সুন্দা দ্বীপ আর অস্ট্রেলিয়া (দ্র) এবং দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) বা কুমেরু মহাদেশ। এই মহাসাগরের উত্তরাংশ দক্ষিণ ভারতের স্থলভাগ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমে আরব সাগর ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর (দ্র) সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়াও এডেন উপসাগর, পারস্য উপসাগর, আন্দামান সাগর ও গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান ব্রাইট এই মহাসাগরের অংশ।

ভারত মহাসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ হল মাদাগাস্কার ও শ্রীলঙ্কা (দ্র)। অন্যান্য প্রধান দ্বীপের মধ্যে মালদ্বীপ, সিচেলিস, মরিশাস, আন্দামান, নিকোবর, চাগোস, সকোত্রা, লাক্ষাদ্বীপ, সেন্ট পল উল্লেখযোগ্য।

মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ এই মহাসাগরের বৈশিষ্ট্য। এর সাগর-উপসাগরের মধ্যে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর সবচেয়ে বেশি উত্তাল ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। মৌসুমী বায়ুর (দ্র) প্রভাবে বছরের প্রায় যে কোনো সময় এখানে ঘূর্ণিঝড় (দ্র) ও জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়।

ভারত মহাসাগরের প্রায় সর্বত্রই প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। আরব সাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার নিকট-বর্তী অঞ্চলে এর লবণাক্ততা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩.৬ শতাংশেরও অধিক।

১৪০০ সালের আগে পর্যন্ত ইউরোপ (দ্র) থেকে ভারত মহাসাগরে জাহাজ আসত আফ্রিকা হয়ে। ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল (দ্র) চালু হবার পর ভূমধ্যসাগর (দ্র) ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে সরাসরি একটি সামুদ্রিক পথ স্থাপিত হয়।

সুজ. ব.

ভারতচন্দ্র [১৭১২—১৭৬০]

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের (দ্র) সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য কবি। কেউ কেউ তাঁকে সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলেন। তাঁর জন্ম হয় ১৭১২ সালে, কারো কারো মতে ১৭০৭ সালে। ভারতচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' (দ্র) কাব্যে নিজের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর জীবন কথা বিচিত্র।

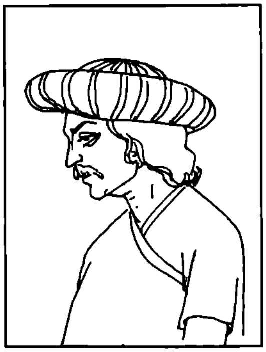

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। নরেন্দ্রনারায়ণ ভুরসুট পরগনার জমিদার ছিলেন। ভারতচন্দ্রের চার ভাই, ভারতচন্দ্র সকলের ছোট। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের বিরাগভাজন হওয়াতে নরেন্দ্রনারায়ণ সবকিছু হারিয়ে দুঃখকষ্টে পড়েন। পিতার দুরবস্থার কারণে ভারতচন্দ্র মাত্র এগারো বছর বয়সে নিজ বাড়ি ত্যাগ করে মামার বাড়িতে চলে যান এবং সেখানকার টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান পড়েন। পনেরো বছর বয়সে তিনি ঘরে ফিরে আসেন। এরপর তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিয়ে করেন। জমিদারের পুত্র হয়ে এরকম দরিদ্র ঘরে বিয়ে করাতে ভাইয়েরা ভারতচন্দ্রকে খুব গালাগাল করে। এতে মনের দুঃখে ভারতচন্দ্র আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তিনি আশ্রয় নেন এবং খুব ভাল করে ফার্সি ভাষা শেখেন। পড়াশোনায় ও ভাষা শিক্ষায় তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ ছিল এসব ঘটনা তার প্রমাণ। পাঁচ বছর ফার্সি শিখে তিনি আবার ঘরে আসেন। তখন তাঁর বয়স বিশ। পরিবারের লোকেরা এবার বিদ্বান ভারতচন্দ্রকে বর্ধমানের রাজদরবারে মোক্তারের কাজ করতে পাঠান। কিন্তু এখানে এক চক্রান্তে পড়ে তিনি কারাবন্দি হন। পরে কৌশলে কারাগার থেকে বের হয়ে আসেন তিনি এবং ওড়িষ্যার কটকে গিয়ে মারাঠা সুবেদার শিবচন্দ্রের আশ্রয় পান। এখানে থাকতেই বৈষ্ণবদের সাহচর্য পেয়ে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। এক সময় বৃন্দাবন যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি ওঠেন। এই আত্মীয়ই তাঁকে বুঝিয়েসুঝিয়ে আবার ঘরে ফিরিয়ে আনেন। ফার্সি-জানা ভারতচন্দ্রের পক্ষে চাকুরি পেতে দেরি হল না। তখনো ফার্সি রাজভাষা। ফরাসডাঙার ফরাসি কুঠির দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ভারতচন্দ্রকে একটি চাকুরি দেন। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র একবার ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে ভারতচন্দ্রকে দেখেন। ইন্দ্রনারায়ণ কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ

www.pathagar.com

করেন কৃষ্ণচন্দ্র যেন ভারতচন্দ্রকে তাঁর দরবারে ঠাঁই দেন।

এইভাবে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি হন। তাঁকে মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। পরে মূলাজোড় নামে একটি গ্রামের ইজারাও দেওয়া হয়। এখানেই ভারতচন্দ্র বাড়িঘর তোলেন এবং স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দেন। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদাতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যটি যখন লেখা হয় তখন বঙ্গদেশে নবাবী রাজত্ব চলছিল। দেশের শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ছিল এবং দুর্ভিক্ষও হয়েছিল। এসবের ছবি অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি খণ্ড। তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান। ভবানন্দ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ, আর মানসিংহ হলেন দিল্লির মোগল বাদশাহের সেনাপতি। মানসিংহ ভবানন্দকে বন্দি করে দিল্লি নিয়ে যান। ভবানন্দ কীভাবে দিল্লির মোগল সম্রাটকে খুশি করে নদীয়ায় রাজত্ব কায়েম করেন তার বর্ণনা এ খণ্ডে আছে।

অন্নদামঙ্গল বড় কাব্য এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য একটি বই। অন্নদামঙ্গল ছাড়া ভারতচন্দ্র আরো কয়েকটি কাব্য লিখেছেন; যেমন—সত্যপীর কথা, রসমঞ্জরীর বাংলা অনুবাদ। সংস্কৃতে লিখেছেন নাগাষ্টক। এ ছাড়া তাঁর অনেক খণ্ডকবিতা আছে।

ভারতচন্দ্র শব্দশিল্পী। চমৎকার তীক্ষ্ণ শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন তিনি। আরবি-ফার্সি শব্দের সুন্দর ব্যবহার তিনি করেছেন। ভারতচন্দ্রের একটি কথা আছে—'যে হউক সে হউক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' অর্থাৎ আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত কিংবা বাংলা যে ভাষাতেই কবিতা ভাল হবে তা-ই ব্যবহার করতে হবে। এটি একটি চমৎকার কথা। ভারতচন্দ্র কবিতার অলঙ্কার ব্যবহারেও নিপুণ কবি ছিলেন। নানা রকম ছন্দে কবিতা লিখেছেন তিনি। শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার—এই তিন দিকে তিনি দক্ষ কবি। তা ছাড়া তিনি এক জন রসিক লেখক। পরিহাস তাঁর লেখার মূল বৈশিষ্ট্য। চোখা চোখা কথা বলেছেন তিনি। হীরার মতো উজ্জ্বল ছিল তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার অনেক লাইন প্রবাদ-প্রবচনের রূপ নিয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের (দ্র) তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অবসান হয়।

আ. ক.

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্র

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি

১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র) ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর (দ্র) মধ্যে সম্পাদিত ২৫ বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি। এই চুক্তির উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা। বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে একে অপরকে সাহায্য করার অঙ্গীকারও এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। চুক্তির বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরূপ :

১. দুই দেশের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থে উভয় দেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে এবং অন্তত ছয় মাস অন্তর একবার করে আলোচনায় বসবে।

২. উভয় দেশের বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদীর অববাহিকা উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ (দ্র) ও সেচব্যবস্থার ব্যাপকতর সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য দুই দেশ একটি যৌথ নদীকমিশন গঠন করবে।

৩. উভয় দেশ শান্তি রক্ষার জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করবে। দুই দেশই সাহিত্য (দ্র), সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্প (দ্র), খেলাধুলা এবং স্বাস্থ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করবে।

৪. এই দেশ দু'টির যে কোনো একটির নিরাপত্তা বা সংহতি বিপন্ন হলে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উভয় দেশই সত্বর বৈঠকে মিলিত হবে।

৫. যদি এই দুই দেশের এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় কোনো পক্ষ সশস্ত্র হামলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা হলে দুই দেশের কোনো পক্ষই তৃতীয় পক্ষকে কোনোরূপ সাহায্য দান করবে না এবং উভয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারী কোনো সামরিক জোটে যোগদান করবে না।

৬. যে কোনো এক পক্ষের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় বা সামরিক ক্ষতি হয়, এমন কোনো কাজে উভয় দেশ তাদের নিজ নিজ এলাকাকে অন্যদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে দেবে না এবং উভয় পক্ষই একে অপরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত

www.pathagar.com

থাকবে। কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।

৭. জাতিসংঘে (দ্র) অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে ভারত বাংলাদেশকে সমর্থন করবে।

১৯৯৭ সালে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তির ২৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে।

সুজ. ব.

ভারতীয় চিত্রকলা

খ্রিস্টপূর্ব দুই তিন হাজার বছর পূর্ব থেকেই ভারতীয় শিল্পকলা যে একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন শহরগুলোতে তার প্রমাণ মেলে।

প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ভারতীয় শিল্পীরা কখনোই উপেক্ষা করেন নি।

প্রকৃতিবাদ ভারতীয় শিল্পকলাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। শিল্পীরা সব সময় ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় (দ্র) বাস্তব মানুষের গড়ন ও আচার-আচরণকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশানুক্রমে শিল্পশিক্ষা লাভ করতেন। এই সময় বেশির ভাগ চিত্র, ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে। ধর্ম (দ্র) প্রকাশের ও প্রচারের জন্য তাঁরা মন্দিরের গায়ে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে মনোযোগী ছিলেন। বিশেষ করে যোগশাস্ত্রের শৃঙ্খলায় নির্মিত হত সব মূর্তি।

সিন্ধু সভ্যতায় (দ্র) প্রাপ্ত মাটির তক্তির গায়ে বিভিন্ন নকশা আঁকা আছে। মানুষ, জীবজন্তু, সস্তিকা এবং পবিত্র পিপ্পল (দ্র) গাছের কাঠে অঙ্কিত এসব তক্তি গহনা হিসাবে ব্যবহার করা হত বলে অনুমান করা হয়।

গুপ্তযুগের পূর্ব পর্যন্ত বেশির ভাগ ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে স্থাপত্যকলাকে আশ্রয় করে। গুপ্তযুগেই আমরা পাই অজন্তা গুহার চিত্রকলা। অজন্তা চিত্রকলা মূলত গুহাচিত্র (দ্র)। ফ্রেস্কো (দ্র) মাধ্যমে আঁকা এসব চিত্রের কাহিনী হচ্ছে তৎকালীন রাজকীয় জীবনযাত্রা, এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বুদ্ধদেবের জীবনকথা। ১৮১৭ সালের একটি দিনে এই গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়। অনুমান করা হয় যে ২য় শতাব্দী থেকে এই চিত্রাবলি বৌদ্ধ সাধুরা অঙ্কন করেন।

গুপ্তযুগের পর ভারতীয় শিল্পকলায় পালযুগ বিশিষ্টতা লাভ করে। এ যুগের চিত্রকলা মূলত পুঁথিচিত্র।

এসব পুঁথিচিত্রের আকৃতি অত্যন্ত ছোট। তালপাতার উপর এসব ছবি আঁকা হত। পুঁথিচিত্র হলেও গ্রন্থের কাহিনীর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। পালযুগের চিত্রকলা মূলত বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব-দেবীর চিত্র। এই সময়ের দু'জন চিত্রশিল্পীর নাম পাওয়া যায় : ধীমান পাল ও তাঁর পুত্র বীত পাল। এই শিল্পীদ্বয় অতি সূক্ষ্ম চিত্রনৈপুণ্যে পারদর্শী ছিলেন।

এরপর ভারতীয় শিল্পকলায় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে আসে মুসলিম আমল। এই আমলেই মোগলেরা ক্ষমতায় আসে এবং মোগল চিত্ররীতির প্রচলন শুরু হয়। পারস্যপ্রভাবে অঙ্কিত এই মোগল চিত্ররীতিও মূলত পুঁথিচিত্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে। মোগল চিত্রকলায় সম্রাট আকবরের (দ্র) অবদান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। তিনি একাধিক চিত্রশালা নির্মাণ করিয়ে সেখানে একাধিক চিত্রশিল্পী নিয়োজিত করেছিলেন। দু' জন চিত্রশিল্পীর নাম এখানে উল্লেখযোগ্য : খাজা আব্দুস সামাদ এবং মীর সাঈদ আলী। সম্রাট আকবর

উপরে : অজন্তার দেয়ালচিত্র। নিচে : একটি মোগল চিত্র

www.pathagar.com

একটি রাজস্থানী চিত্র

বাশোলি চিত্র

জীবজন্তু, ফুল-পাখি, প্রকৃতি—এসব পছন্দ করতেন এবং তাঁর সময়ে এসব দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। এ ছাড়াও রাজপরিবারের কাহিনী, রাজকুমারী ও রাজাদের ছবি আঁকা হয়েছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের (দ্র) সময় আঁকা হয়েছে প্রতিকৃতি-চিত্র। তাঁর নিজের অসংখ্য প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কন করান। জাহাঙ্গীরের প্রিয় শিল্পী ছিলেন পারস্যদেশীয় আবুল হাসান। এই শিল্পীকে সম্রাট 'নাদীর-উজ্-জামান' অর্থাৎ যুগের সেরা শিল্পী উপাধিতে ভূষিত করেন। এই শিল্পী অতি সূক্ষ্ম কারুকাজে পারদর্শী ছিলেন।

ভারতীয় শিল্পে মোগল যুগের এই চিত্ররীতিকে 'মিনিয়েচার চিত্রকলা' (দ্র) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

১৬শ শতাব্দীর পূর্বের রীতির প্রভাব থেকে মুক্ত দাক্ষিণাত্যের (দ্র) চিত্রকলা। এই চিত্রের নমুনা হল বৃহদাকার অলঙ্কারপরিহিত নারীমূর্তি এবং দাক্ষিণাত্যের রীতিতে শাড়িপরা নারীদেহ।

ভারতীয় চিত্রকলায় পাহাড়ি চিত্রকলাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুত শিল্পীদের কাছে মানুষ এবং প্রকৃতি হচ্ছে প্রতীক। একই নারীর অঙ্গভঙ্গিকে নকল করে তাঁরা অন্যান্য নারীদেহ আঁকতেন। শিল্পী সব সময় মানুষকে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত করে ছবি আঁকতেন, শিল্পের সব বিষয়বস্তু পবিত্রতার সঙ্গে আঁকতে চেষ্টা করতেন। উজ্জ্বল, কালো, সবুজ, লাল, ইত্যাদি রঙ ব্যবহারে জীবজন্তু, গাছপালা এসব বিষয় দ্বারা তাঁরা চিত্র পরিপূর্ণ করতেন।

পাহাড়ি চিত্রকলার প্রথম দিকের রীতি হচ্ছে বাশোলি রীতি। আরেকটি হচ্ছে 'রাগমাল্য' যা সঙ্গীত (দ্র) এবং কাব্যের (দ্র) সমন্বয়ে আঁকা। এ যুগের রঙ ব্যবহার ছিল দ্বিমাত্রিক গভীর প্রোফাইল মুখমণ্ডল। এই সময়ে অঙ্কিত বিখ্যাত সিরিজের নাম লঙ্কা অবরোধ। এই ছবিতে রামচন্দ্র (দ্র) এবং প্রাণীসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমকে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া রাম-রাবণের যুদ্ধ, সীতাহরণের দৃশ্যও অঙ্কিত হয়েছে।

কিষাণগড় নামক ভারতীয় চিত্রকলায় রাধা (দ্র)-কৃষ্ণের (দ্র) বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি অঙ্কিত হয়েছে। রাধাকে কৃষ্ণ ফুল দিচ্ছে— এরকম সব ছবি। উনবিংশ শতকে এসে প্রাচীন ভারতীয় চিত্ররীতির অবক্ষয় শুরু হয়। ভারতীয় শিল্পীরা ইউরোপীয় চিত্ররীতি এবং টেকনিকের উপর ঝুঁকে পড়ে ইউরোপীয় চিত্রকলার অনুকরণে বেশ কিছু ছবি আঁকতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে রবি বর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পী ইউরোপীয় ধারায় তেলরঙে ছবি এঁকে খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তী কালে ভারতীয় শিল্পীরা হ্যাভেলের (ইংরেজ শিল্পশিক্ষক) প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে আবার ভারতের ঐতিহ্যগত চিত্ররীতির দিকে চোখ ফেরান। অন্যদিকে ইউরোপীয় ও অন্যান্য বিদেশী ধারাও প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বেশ কিছু বাঙালি শিল্পীর প্রচেষ্টায় একটা নতুন শিল্পধারা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যাকে বলা হয় 'বেঙ্গল স্কুল'।

www.pathagar.com

জকুমারী পদ্ম, শিল্পী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নন্দলাল বসুর একটি শিল্পকর্ম

যশোদা ও কৃষ্ণ, শিল্পী : যামিনী রায়

নেতৃস্থানীয় শিল্পীরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), নন্দলাল বসু (দ্র), গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), যামিনী রায় (দ্র) প্রমুখ। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), অমৃত শেরগিল এবং আরো পরে মকবুল ফিদা হুসেইনের মতো প্রতিভাবান শিল্পীরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধারাকে মনে রেখে নিজেদের মেধাপ্রসূত শিল্পকর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতীয় চিত্রকলায় আধুনিক ধ্যানধারণার এক নতুন ও বলিষ্ঠ মাত্রা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সেই ধারাকেই প্রবহমাণ রেখে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বর্তমান ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন।

সে. এ.

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

ভারতের (দ্র) বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে এর প্রথম সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং ব্রিটিশ শাসকবর্গের অনুমোদন ও ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের (Lord Dufferin : ১৮৮৪-৮৮) অনুরোধক্রমে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (Allan Octavian Hume)-কে সাধারণ সম্পাদক করে ঐ সম্মেলনেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাজনৈতিক দলটি গঠন করা হয়। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্র)।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে গোড়ার দিকে ইংরেজবিরোধী একাধিক গৌরবময় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান একযোগে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তী কালে কংগ্রেসের কিছু কার্যক্রমের কারণে এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান নেতাদের পরামর্শে অধিকাংশ মুসলমান এর সংশ্রব ত্যাগ করেন। তবে নেতৃস্থানীয় মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেসের পতাকাতলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াসে ব্রতী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বদরুদ্দিন তায়াবজি, রহমতুল্লাহ সায়ানি, সৈয়দ মাহমুদ, সৈয়দ হাসান ইমাম, হাকিম আজমল খান, ডা. মুখতার আহমেদ আনসারি এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ (দ্র) উল্লেখযোগ্য। এঁরা বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

কংগ্রেসে প্রাথমিকভাবে সমবেত হন জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বড় বড় ভূস্বামী এবং উঠতি ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। প্রথম দিকে ব্রিটিশ শাসকবর্গের সঙ্গে আপসে তাঁদের জাতীয় দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা করলেও ধীরে ধীরে তাঁরা সে পথ পরিত্যাগে বাধ্য হন।

কালক্রমে দলটিতে যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অনুসারী, অন্য দিকে তেমনি চরমপন্থার মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করার প্রবক্তাদেরও সমাবেশ ঘটে।

অবশেষে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবী নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (দ্র) দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশে ফিরে ১৯১৫ সালে কংগ্রেসে যোগ দিলে

www.pathagar.com

ভারতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন সময়ের সভাপতি

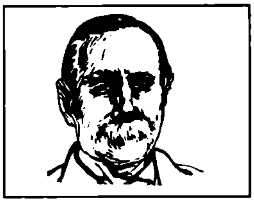
এ. ও. হিউম

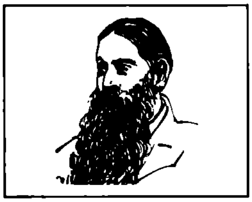
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

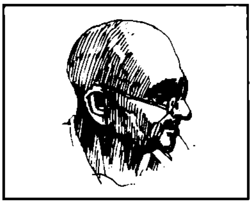
মহাত্মা গান্ধী

মওলানা আজাদ

জওহরলাল নেহরু

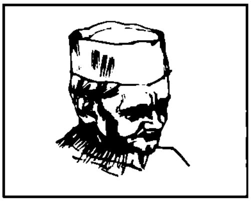
লাল বাহাদুর শাস্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধী

রাজীব গান্ধী

দলটিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সমগ্র অবিভক্ত ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে 'সত্যাগ্রহ' (দ্র) ও 'অসহযোগ আন্দোলনে' (দ্র) ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন তিনি। ফলে কংগ্রেসের নেতৃত্বেই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে কংগ্রেস দলীয় সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতাসীন থাকে। জওহরলাল নেহরু (দ্র) ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দরকুমার গুজরালও এক সময়ে কংগ্রেসে ছিলেন। কংগ্রেস দলীয় অন্য প্রধানমন্ত্রীরা ছিলেন যথাক্রমে প্রয়াত লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী (দ্র) ও প্রয়াত রাজীব গান্ধী (দ্র) এবং নরসিমহা রাও।

আ. হু.

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) তাশখন্দ শহরে ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর এই রাজনৈতিক দলের জন্ম। ১৯২১ সালে এর সদর দফতর স্থানান্তরিত হয় বার্লিনে। এখান থেকেই দলটির মুখপত্র 'ভ্যানগার্ড' (পরে এর নাম হয় 'অ্যাডভান্স গার্ড') প্রকাশিত হয়।

'ভ্যানগার্ড'এ প্রকাশিত কমিউনিস্ট মতাদর্শগত প্রবন্ধাদির প্রভাব এবং প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (দ্র) কয়েক জন সহযোগীর অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতের মাটিতে ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি কলিকাতা (দ্র), বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে বেশ কিছু কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। এসব গ্রুপ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন মুজফ্‌ফর আহমদ (দ্র), এস. এ. ডাঙ্গে, চেট্টিয়ার, গোলাম হোসেন ও শওকত উসমানি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অনুসৃত জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে ভারতের শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর বিভিন্ন অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও সংগ্রামে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় ফ্যাসিবাদ (দ্র)-বিরোধী আন্দোলনে এই দলটির ভূমিকা বিশেষ স্মরণীয়। শাসকশ্রেণীর তরফ থেকে পরিচালিত জেল-জুলুমের মুখে দৃঢ়তা প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীগণ অত্যুজ্জ্বল মর্যাদার অধিকারী।

১৯৬০-এর দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে মতাদর্শ ও রণকৌশলগত মতভেদ দেখা দেয়। ফলে দলটি 'সিপিআই' এবং 'সিপিআইএম' এই দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি গ্রুপ পরিচিত হয় মস্কোপন্থী ও অন্যটি পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে। '৭০-এর দশকে এসে পিকিংপন্থী বলে পরিচিত পার্টি আরো কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়। এসবের মধ্যে চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন

মুজফ্‌ফর আহমদ

www.pathagar.com

'সিপিআই' (এম এল) উল্লেখযোগ্য।

আ. হু.

ভারতের নৌ-বিদ্রোহ

নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের প্রথম সংগ্রামপ্রচেষ্টা। এর প্রথম আনুষ্ঠানিক সূচনা ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বোম্বাই বন্দরে।

'তলোয়ার' নামের একটি যুদ্ধপ্রশিক্ষণ জাহাজের ভারতীয় নাবিকেরা ঐদিন পুরোপুরি আহার-অযোগ্য খাবার সরবরাহের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট করে বসলে জাহাজটির ইংরেজ নৌ-কর্মকর্তারা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে পরদিন ১৯শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) বোম্বাই বন্দরে নোঙর-করা ২০টি যুদ্ধজাহাজের সকল ভারতীয় নাবিক উক্ত ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের সমর্থনে একযোগে ধর্মঘট করে বসেন।

ধর্মঘটী নাবিকদের দাবির অন্তর্ভুক্ত ছিল নৌবাহিনীতে বিদ্যমান যাবতীয় বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে তাদেরকেও ইংরেজ নাবিকদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, জাহাজে অবস্থানকালে জীবনযাত্রাসহ তাদেরকে সরবরাহ করা আহারাদির মানোন্নয়ন করা এবং তাদের প্রতি ব্রিটিশ নৌ-কর্মকর্তাদের অপমানজনক আচরণের অবসান ঘটানো।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু হলেও এই বিদ্রোহ সংগঠিত রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে। বিদ্রোহের সময় নাবিকগণ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (দ্র), কমিউনিস্ট পার্টি (দ্র) ও মুসলিম লীগ পতাকা ব্যবহার করেন। পরে এই বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কামনায় দেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতীকে পরিণত হয়। এই সঙ্গে বিদ্রোহীরা সকল রাজবন্দির মুক্তি এবং ইন্দোনেশিয়া (দ্র) থেকে ইঙ্গ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপসারণেরও দাবি জানান।

২০শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) এই বিদ্রোহ দমনের জন্য বোম্বাইয়ে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। অবস্থা মোকাবেলায় নাবিকগণ তাঁদের তৎপরতা সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে গঠন করেন ৫ সদস্যের একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ।

২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) ব্রিটিশ সেনা-সদস্যরা বিদ্রোহী নাবিকদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। দুই পক্ষের মধ্যে ভারি অস্ত্রশস্ত্রে যুদ্ধ ও গোলাবিনিময়ের পর ঐ দিনই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

সারা দেশে এই বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়লে করাচি, কলিকাতা (দ্র), মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তম, দিল্লি (দ্র), থানা ও পুনার (বর্তমান নাম পুনে) ভারতীয় উপকূলীয় রক্ষিগণ ধর্মঘটী নাবিকদের সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন ও সংহতি প্রকাশ করেন। এঁদের পাশাপাশি বর্ণবৈষম্যের প্রতিবাদে ইতিমধ্যে ধর্মঘটরত কলিকাতা ও ভারতের অন্য কয়েকটি বিমানবন্দরের বৈমানিকেরাও তাঁদের প্রতি সমর্থন জানান।

এদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) শুরু হয় সারা দেশে এই বিদ্রোহের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও সংহতিসভা। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত মেহনতি জনগণের এইসব কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একটি বিশাল সৈন্য ও পুলিশবাহিনী সেখানে পাঠানো হয়। বিক্ষোভকারীদের ওপরে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তারা ৩শ' জন নিহত ও ১ হাজার ৭শ' জনকে আহত করে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৬) জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের আহ্বানে বোম্বাইয়ে ধর্মঘটী নাবিকগণ আত্মসমর্পণ করলেও দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে তা আরো কিছু দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

ভারতের মাটিতে সংঘটিত এই নৌ-বিদ্রোহের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর ফলেই শেষ পর্যন্ত তৎকালীন ব্রিটিশ শ্রমিক দলীয় সরকার ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে অনেকগুলি সুবিধা মঞ্জুর করতে বাধ্য হন এবং এর অত্যল্পকাল পরেই ভারত ব্রিটিশশাসন থেকে মুক্ত হয়।

আ. হু.

ভারতেশ্বরী হোমস্

বর্তমান টাঙ্গাইল জেলাধীন মির্জাপুর থানার শহরকেন্দ্রে কুমুদিনী কমপ্লেক্স চত্বরে অবস্থিত একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (চতুর্থ শ্রেণী থেকে)। কেবল মেয়েরাই এখানে পড়াশোনা করতে পারে। ১৯৩৮ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও এটি পুরোপুরি চালু হয় ১৯৪৫ সাল থেকে। এটি কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অন্যতম এক অঙ্গপ্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশের (দ্র) অন্যতম ধনাঢ্য ও দানবীর ব্যক্তি রণদাপ্রসাদ সাহার (দ্র) উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে এটি ধীরে

www.pathagar.com

ধীরে গড়ে ওঠে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছে প্রতিষ্ঠাতার প্রপিতামহীর নামানুসারে। পুরোপুরি সরকার অনুমোদিত আবাসিক সুবিধা সংবলিত এই বিদ্যাপীঠে ১২শ' ছাত্রী পড়তে পারে। ভারতেশ্বরী হোম্‌সের দ্বার ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের সর্বস্তরের শিক্ষার্থী মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত। অধ্যয়নকালে তাদের পাঠ্যসূচির বাইরে কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এগুলো হচ্ছে : অর্পিত ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন, শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চত্বর নিজেদের উদ্যোগে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখা, নিজেদের আহারসামগ্রী প্রস্তুতিতে সক্রিয় সাহায্য করা, সমগ্র কমপ্লেক্সের যাবতীয় কিছু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন এবং হোম্‌স্ সংলগ্ন কুমুদিনী হাসপাতালের রুগীদের নানাভাবে সাহায্য করা এবং এইভাবে দেশের গরিব ও দুঃস্থ জনসাধারণের প্রতি নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।

শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে একটি উপযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী। পাশাপাশি তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশসহ যাবতীয় সুবিধা ছাড়াও রয়েছে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। প্রত্যেক ছাত্রীর ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠা এবং পালাক্রমে বিদ্যালয়চত্বর ও এর ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে অংশগ্রহণ এবং নিয়মিত শরীরচর্চার অনুশীলন বাধ্যতামূলক এখানে। এ ছাড়াও রয়েছে খেলাধুলা ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মতো অতিরিক্ত কারিকুলাম।

ভারতেশ্বরী হোম্‌সের ছাত্রীদের শরীরচর্চা প্রদর্শনী বর্তমানে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষাগত মান এবং ছাত্রীদের পরীক্ষা পাশের হার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কখনো শতকরা ৯৯ কিংবা ১০০ ভাগ। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৫০ জন। ঢাকা (দ্র) থেকে ভারতেশ্বরী হোম্‌সের দূরত্ব মাত্র ৬৫ কিলোমিটার।

আ. হু.

ভারোত্তোলন (weight-lifting)

একটা লোহার রডের দু'পাশে বিভিন্ন ওজনের লোহার চাকতি লাগিয়ে উত্তোলন করার নামই ভারোত্তোলন। কারা কখন এর প্রবর্তন করেছে তার সঠিক কোনো তথ্য বা

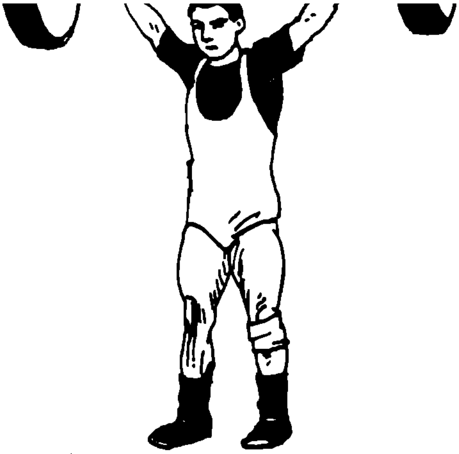

ইতিহাস নেই।

কিন্তু কালক্রমে ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতামূলক একটি ক্রীড়ায় পরিণত হয়। একই সমান শারীরিক ওজনের প্রতিযোগীদের মধ্যে যিনি বেশি ভার উত্তোলন করতে পারেন তিনি বিজয়ী হন।

ভারোত্তোলনে দু'ধরনের প্রতিযোগিতা হয়—স্ন্যাচ এবং ক্লিন ও জার্ক। স্ন্যাচ প্রতিযোগীকে উপুড় হয়ে নির্দিষ্ট ওজনসহ রড বা বার্বেল ধরে সরাসরি মাথার উপর তুলতে হয়। ক্লিন ও জার্কে প্রতিযোগী ঐ ভারযুক্ত বার্বেলকে কাঁধের উপরে স্থির করে রাখেন এবং দুই বাহু ও পায়ে ধাক্কা মেরে মাথার উপর সোজাভাবে রাখেন।

প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকে ৩ বার করে তোলার সুযোগ পান। প্রত্যেক বার সফলতার পর নতুন করে ভার যোগ করা হয়।

সবকিছু সঠিক এবং শুদ্ধ হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য ৩ জন বিচারক থাকেন।

ভারোত্তোলন অলিম্পিক গেম্‌সের (দ্র) অন্তর্ভুক্ত। মূলত ১০টি শারীরিক ওজনশ্রেণীতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ওজনশ্রেণীগুলি হচ্ছে : ১. অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি, ২. অনূর্ধ্ব ৫২ কেজি, ৩. অনূর্ধ্ব ৫৬ কেজি, ৪. অনূর্ধ্ব ৬০ কেজি, ৫. অনূর্ধ্ব ৬৭$\frac{১}{২}$ কেজি, ৬. অনূর্ধ্ব ৭০ কেজি , ৭. অনূর্ধ্ব ৭৫ কেজি, ৮. অনূর্ধ্ব ৮২$\frac{১}{২}$ কজি, ৯.অনূর্ধ্ব ৯০ কেজি, ১০. ১১০ কেজি এবং তার উপরে।

কা. আ. আ.

ভার্জিল [৭০—১৯ খ্রি.পূ.]

প্রাচীন রোমক সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে খ্যাত। তাঁর

www.pathagar.com

অমর ও কালজয়ী মহাকাব্য (দ্র) ঈনীদ (দ্র)-এর জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। খ্রিস্টপূর্ব ৭০ অব্দের ১৫ই অক্টোবর ইতালির মান্তুয়া (Mantua)-র নিকটবর্তী আন্দেস্ (Andes) নামক গ্রামের এক অবস্থাপন্ন কৃষকপরিবারে তাঁর জন্ম। পুরো নাম পুব্‌লিউস্ ভের্গিলিউস্ মারো (Publius Vergilius Maro) হলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সূত্রে তিনি এ দেশে ভার্জিল (Virgil) নামেই পরিচিত।

মিলান প্রদেশের ক্রেমোনা (Cremona) শহরে ভার্জিলের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন রোমে। ছাত্র থাকাকালেই তিনি প্রাচীন রোমান ও গ্রিক ভাষার গ্রন্থসমূহ পড়ে শেষ করেন এবং কাব্য (দ্র), দর্শন ও ইতিহাসশাস্ত্রবিষয়ে প্রচুর জ্ঞানার্জন করেন। এ সময় সিরো (Siro) নামক তাঁর এক শিক্ষকের নিকট তিনি কাব্যসাহিত্যের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

ভার্জিলের যখন যৌবনকাল, তখন রোম সাম্রাজ্য ভয়ানক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এর অতীত রূপ-ঐতিহ্য-গৌরব কিছুই আর তখন অবশিষ্ট নেই। চারদিকে চলছে রাজনৈতিক গোলযোগ আর গৃহযুদ্ধ। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শুরু হয়েছে ক্ষমতা ও সম্পদ দখলের প্রতিযোগিতা। দেশের এই পরিস্থিতি দেখে ভার্জিল খুব মর্মাহত হন। যদিও তিনি রাজনীতিসচেতন মানুষ ছিলেন না, তবু দেশের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ। এই দেশপ্রেম প্রকাশের জন্যই তিনি কাব্যরচনাকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন।

জন্মসূত্রে ভার্জিল গ্রামকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ভালও বেসেছিলেন অকৃত্রিমভাবে। তাই প্রথম জীবনে তিনি গ্রামীণ পরিবেশ ও জীবনভিত্তিক কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ বুকোলিক্স্ (Bucolics or Ecologues) বা রাখালী কবিতা (৪২-৩৭ খ্রি.পূ.)। এটি দশটি কবিতার সঙ্কলন। এর অধিকাংশ কবিতাই গ্রিক কবি থিওক্রিটাস (খ্রি.পূ. ২৮০)-এর কাব্যের আদর্শ অনুসরণে রচিত।

ভার্জিলের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ জর্জিক্স্ (Georgics)। খ্রিস্টপূর্ব ৩৬-২১ অব্দে যখন তিনি এই কাব্য রচনা করছিলেন, তখন ইতালির গৃহযুদ্ধ চরম আকার ধারণ করে। এতে সেই গৃহযুদ্ধেরই প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে। ভার্জিল তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি তৎকালীন রোমসম্রাট অগাস্টাস সিজারকে উৎসর্গ করেছিলেন।

অগাস্টাস ক্ষমতা গ্রহণের পর রোমসাম্রাজ্য ধীরে ধীরে উন্নতির পথে ধাবিত হয়। তিনি দেশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালান। অগাস্টাসের এই তৎপরতা ভার্জিলকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। অগাস্টাস তাঁর অন্তরে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে বসেন। অগাস্টাসকে কেন্দ্র করেই তিনি এক নতুন কাব্যভাবনায় আন্দোলিত হন, যার ফসল 'ঈনীদ' কাব্য।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে গ্রিক বীরদের ট্রয়ের যুদ্ধ (দ্র) জয়কে কেন্দ্র করে কবি হোমারের (দ্র) গৌরবগাথা 'ইলিয়াদ' (দ্র) ও 'ওদিসি' (দ্র) অনুসরণে ভার্জিলও 'ঈনীদ' মহাকাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। ট্রয়ের যুদ্ধে রোমের যে গৌরব হারিয়ে গিয়েছিল, অগাস্টাসকেই তার উদ্ধারকর্তা মনে করেন ভার্জিল। তাই তাঁর 'ঈনীদ' মহাকাব্যে তিনি অগাস্টাসকে সেই অতীত বীরত্বের সার্থক উত্তরসূরি হিসাবে বরণ করে নেন। অগাস্টাসের নেতৃত্বে রোমের অভ্যুদয়ের যশোগান করার জন্যই তিনি লেখেন 'ঈনীদ'। এই কাব্যে তিনি রোমকদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অতীত গৌরবকে তুলে ধরেছিলেন। এটি ছিল তাঁর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ রচনা।

'ঈনীদ' বিশ্বসাহিত্যের মহত্তম কাব্যগুলোর একটি। হোমারসহ পূর্ববর্তী অনেক লেখক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভার্জিল এটি রচনা করলেও এর বিষয়বস্তুর মহিমা, ঐতিহ্যের প্রতি অঙ্গীকার, ভাষার কারুকাজ ও সুললিত ছন্দমাধুর্য এটিকে অনুপম এক বিশিষ্টতা দান করেছে। সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিষয়, শৈলী ও আঙ্গিকের ওপর ভার্জিলের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বাংলা ভাষায় রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিষয়বস্তু ও ছন্দধ্বনির ওপরও ভার্জিলের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

দীর্ঘ এগারো বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভার্জিল 'ঈনীদ' মহাকাব্যটি রচনা করেন। রচনা শেষ করার পর এর গুণগত মানে তিনি পুরোপুরি তৃপ্ত হতে না পেরে কিছু দুর্বল অংশ আবার সংশোধন ও পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এই

www.pathagar.com

কাজ শেষ করার আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর আগে তিনি এই মহাকাব্যটি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে যান। সম্রাট অগাস্টাস সিজারের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত কবির এই নির্দেশ অগ্রাহ্য হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৯ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ভার্জিলের জীবনাবসান ঘটে।

সুজ. ব.

ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পরে জার্মানির সঙ্গে ইউরোপের (দ্র) মিত্রশক্তির (দ্র) চুক্তি। ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদে ১৯১৯ সালের ১০ই জানুয়ারিতে সম্পাদিত। এই চুক্তি সম্পাদনের আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) উড্রো উইলসন, গ্রেট ব্রিটেনের (দ্র) ডেভিড লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের জর্জ ক্লেমেসঁ এবং ইতালির অর্লান্দো। রাশিয়া (দ্র) এতে অংশ নেয় নি। জার্মানির কোনো প্রতিনিধি রাখা হয় নি। চুক্তির সিদ্ধান্তগুলো ছিল একতরফা এবং জার্মানিকে তা মানতে বাধ্য করা হয়। তাদের কোনো প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা হয় নি।

চুক্তির শর্তগুলো হচ্ছে জার্মানির উপনিবেশগুলোকে লীগ অব নেশন্স্(দ্র)-এর দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া, ডানজিগকে স্বাধীন নগরে পরিণত করা, জার্মানির সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে দেওয়া, রাইনল্যাণ্ড এলাকা মিত্রশক্তির দখলে আনা এবং তার বেসামরিকীকরণ।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট এই চুক্তি অনুমোদন করতে অসম্মত হয়। জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা ছিল এই চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য। জার্মানি তার আলসাস্-লোরেন (Alsace-Lorraine) এলাকা ফ্রান্সের কাছে, প্রুশীয় পোল্যাণ্ড ও পশ্চিম প্রুশিয়ার অধিকাংশ এলাকা পোল্যাণ্ডের কাছে, য়োপান ও মিলাডি বেলজিয়ামের কাছে এবং ট্রোপাও (বর্তমানে অপাভা) এলাকা চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। উত্তর শ্লেস্ভিগ্ ও সাইলেশিয়া অঞ্চলও হারাতে হয় ডেনমার্কের কাছে।

হিটলার

এই চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এই সূত্রেই হিটলারের (দ্র) নাৎসি (দ্র) বাহিনী বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এমনকি হিটলার এই চুক্তি নস্যাতের আহ্বান জানিয়ে জার্মান সরকারকে যুদ্ধের সমর্থনে নিয়ে আসেন। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পটভূমি তৈরি হয়।

আ. মা.

ভাল্কানাইজেশন (vulcanization)

আগের দিনে রাবারের (দ্র) দ্রব্যাদি গরমে নরম চটচটে আর শীতে বা ঠাণ্ডায় ভঙ্গুর এবং শক্ত হয়ে যেত। ১৮৩৯ সালে চার্লস্ গুড্ইয়ার্ (Charles Goodyear : ১৮০০-১৮৬০) রাবারকে শক্ত করার এবং তাপ ও শৈত্যের হাত থেকে রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেন। উদ্ভাবনটি ঘটে দৈবাৎ। একদিন স্টোভে উত্তপ্ত পাত্রের মধ্যে ভুল করে তিনি রাবার এবং সালফারের (দ্র) মিশ্রণ ঢেলে দেন। তাপে রাবারযৌগ শক্ত হয়ে যায় এবং দেখা যায়, গরম ও ঠাণ্ডায় এর ভৌত পরিবর্তন হয় না। এভাবে সালফার ও রাবারকে উত্তপ্ত করার নাম হল ভাল্কানাইজেশন। ভাল্কান্ রোমানদের আগুনের দেবতা। ভাল্কানাইজ্ড্ রাবার যেহেতু দ্রব্যাদি তৈরিতে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, তাই দ্রুত রাবারশিল্পের বিকাশ ঘটে। ভাল্কানাইজ্ড্ রাবার নমনীয়, বায়ু-পানিরোধী, গরমে নরম হয় না। মেশিনের দু'টি ঘূর্ণনশীল অংশের মধ্যে দৃঢ়, বায়ু-পানিরোধী সংযোগের জন্য এই রাবার ব্যবহৃত হয়। সালফার রাবারকে দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ় করে। এক-তৃতীয়াংশ সালফার এবং দুই-তৃতীয়াংশ রাবার ভাল্কানাইজ্ করলে কোনাইট তৈরি হয়।

সালফারের পরিবর্তে বেনজয়েল পারঅক্সাইড, টেলুরিয়াম, সেলেনিয়াম ইত্যাদি রাবার ভাল্কানাইজেশনে ব্যবহৃত হয়। ভাল্কানাইজেশন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ শিকলবিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন (দ্র) অণুসমূহের মধ্যে আড়াআড়ি সংযোগ ঘটানো হয়। সালফার বা অন্য উপাদান এই আড়াআড়ি রাসায়নিক বন্ধন বা সংযোগ ঘটায়। সালফার যত বেশি হয় সংযোগ তত শক্ত হয়, রাবার দীর্ঘস্থায়ী হয়।

স. রা.

ভাষা-আন্দোলন / রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

ভাষা-আন্দোলন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সংগঠিতরূপে

www.pathagar.com

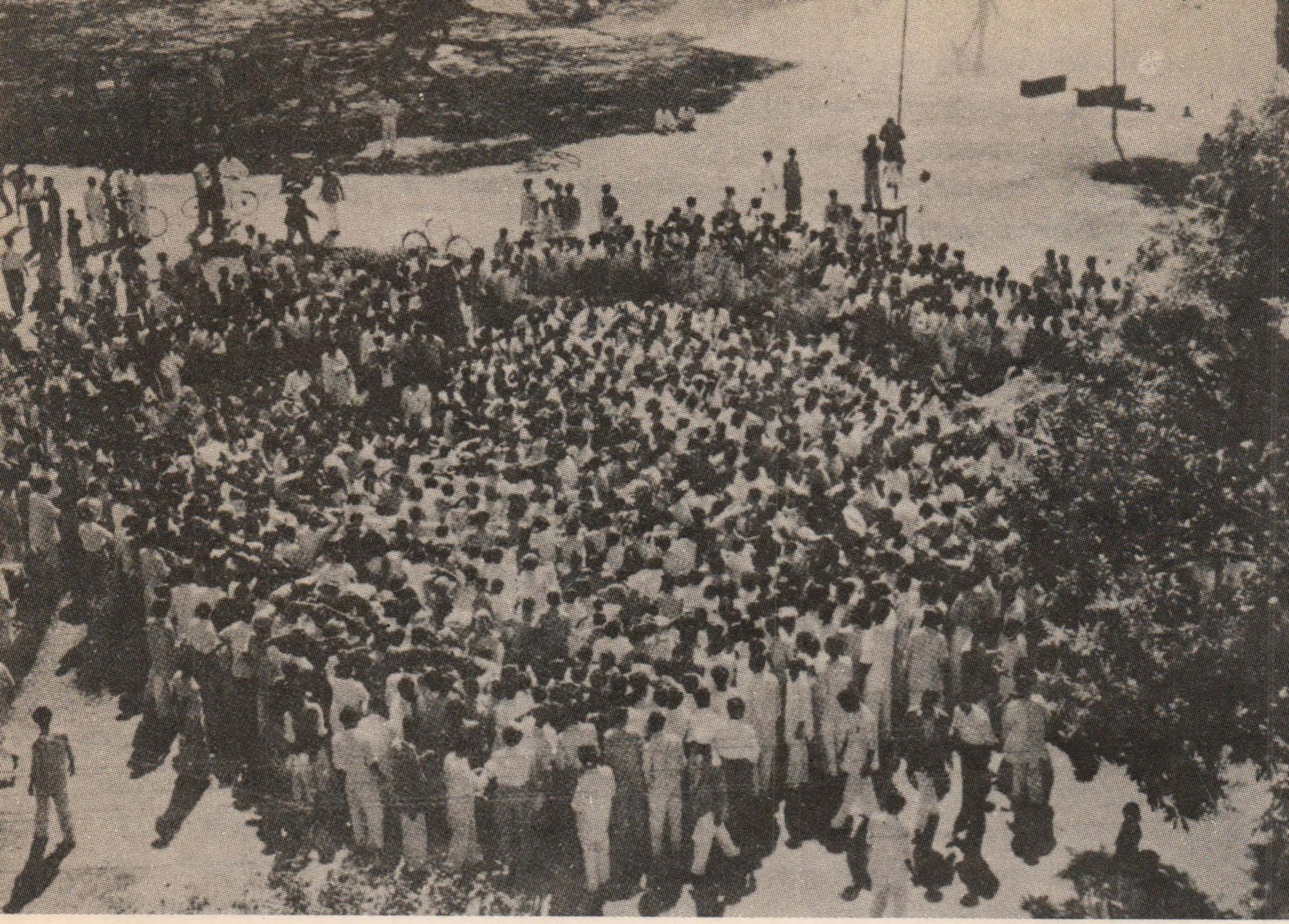

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শোভাযাত্রা বের করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পূর্বে আমতলায় অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশ

শুরু হলেও এর ভিত্তি তৈরি হয়েছে ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্রবিক্ষোভ, ছাত্রধর্মঘট, এমনকি সরকারি কর্মচারীদের একাংশের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। অবশ্য এই দাবি নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছিল সাতচল্লিশ সালের জুন মাস থেকেই।

বাংলা ভাষার (দ্র) প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা কখনো অস্পষ্ট ছিল না। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে (দ্র) প্রথম ছাপা এনভেলাপ, পোস্টকার্ড, ডাকটিকেট, মনিঅর্ডার ফর্ম ইত্যাদিতে বাংলা বাদ দিয়ে ইংরেজি ও উর্দু ব্যবহারের বিরুদ্ধে ঢাকায় (দ্র) ছাত্র, শিক্ষক এবং সরকারি কর্মচারীদের একাংশের প্রথম প্রতিবাদী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ সংহত রূপ ধারণ করে ১৯৪৭ সালের ২৭শে নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দু ভাষার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণের ফলে। ঢাকার ছাত্রশিক্ষক সমাজ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৫ই ডিসেম্বর থেকে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাতে থাকে। ডিসেম্বরের শেষ দিকে গঠিত হয় প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদে ব্যবহারযোগ্য ভাষা হিসাবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গ্রহণ করার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবার ফলে ঢাকার ছাত্রসমাজে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশে মিলিত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। এই উপলক্ষে ১১ই মার্চ দেশব্যাপী প্রতিবাদদিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবং আন্দোলনের

www.pathagar.com

স্বার্থে বিভিন্ন ধারার ছাত্র ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মীদের নিয়ে ২রা মার্চ দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

১১ই মার্চের বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ ও অবস্থান-ধর্মঘটের সময় বহু ছাত্রযুবা পুলিশী নির্যাতনের শিকার হন, অনেক নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিক্ষোভের বিস্তার ঘটে, ১৩ই মার্চ ঢাকায় এবং ১৪ই মার্চ সারা দেশে ছাত্রগণ ধর্মঘট পালন করেন। ১৫ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ চলতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন (দ্র) ধর্মঘটী ছাত্রদের সঙ্গে ৮ দফার এক মীমাংসা-চুক্তিতে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল ভাষা-আন্দোলনে ধৃত বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি, পূর্ববঙ্গ আইনসভার আসন্ন অধিবেশনে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন, পুলিশী নির্যাতন সম্পর্কে তদন্ত, সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, আন্দোলনকারীগণ রাষ্ট্রের দুশমন নন এই মর্মে স্বীকৃতিদান ইত্যাদি। জঙ্গী ছাত্রসমাজ আপসপন্থার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র (দ্র) আসন্ন ঢাকা সফরের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ চুক্তির ভিত্তিতে আন্দোলনের কর্মসূচি বাতিল করা হয়। কিন্তু ঢাকায় জিন্নাহ্ সাহেবের বাংলা ভাষাবিরোধী বক্তৃতার সুযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র বাতিল করে দেন।

আটচল্লিশের আন্দোলনের পর বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দূরে থাক, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে শাসকপক্ষে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়— যেমন আরবি হরফে বাংলা লেখা, সর্বজনীন উর্দুশিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ অবস্থায় ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' নতুন করে গঠিত হয় এবং আন্দোলন জিইয়ে রাখার চেষ্টা চলতে থাকে।

১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এসে বলেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দুই হতে যাচ্ছে। এই ঘোষণা ছাত্রসমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৯শে জানুয়ারি প্রতিবাদসভা এবং ৩০শে জানুয়ারি ঢাকার শিক্ষাঙ্গনে ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (দ্র) সভাপতিত্বে ৩১শে জানুয়ারি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রতিবাদসভা ও মিছিলের পর ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) দেশব্যাপী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে এক মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঐ দিন রাতে এক সভায় মিলিত হয়ে ১৪৪ ধারা অমান্য না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু উত্তেজিত ছাত্রসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তা প্রত্যাখ্যান করে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

আবুল বরকত   রফিকুদ্দিন আহমদ   শফিউর রহ

ফলে শুরু হয়ে যায় ছাত্রবিক্ষোভ, মিছিল করে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ ঘেরাওয়ের চেষ্টা। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষের অব্যাহত পটভূমিতে বেলা সোয়া তিনটার দিকে পুলিশ বিক্ষোভরত ছাত্রজনতার উপর কয়েক দফা গুলিবর্ষণ করে। এতে আবুল বরকত (দ্র), রফিকুদ্দিন আহমদ (দ্র) ও আবদুল জব্বার (দ্র) নিহত এবং বহুসংখ্যক ছাত্র-অছাত্র আহত হন।

পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে পরদিন মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের উদ্দেশ্যে গায়েবি জানাজা শেষে বিশাল

www.pathagar.com

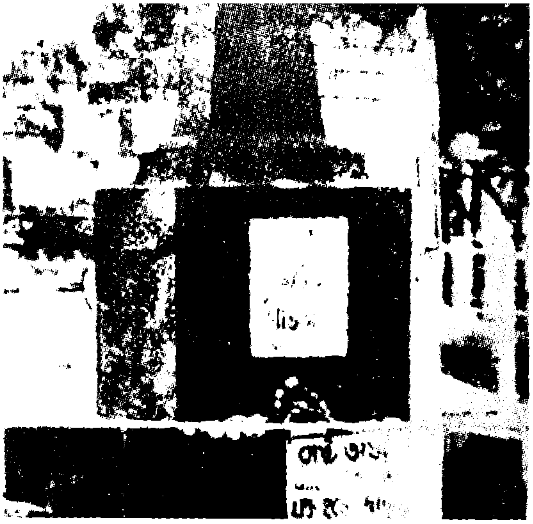

১৯৫২ সালে নির্মিত ভাষা-আন্দোলনের প্রথম শহীদ মিনার

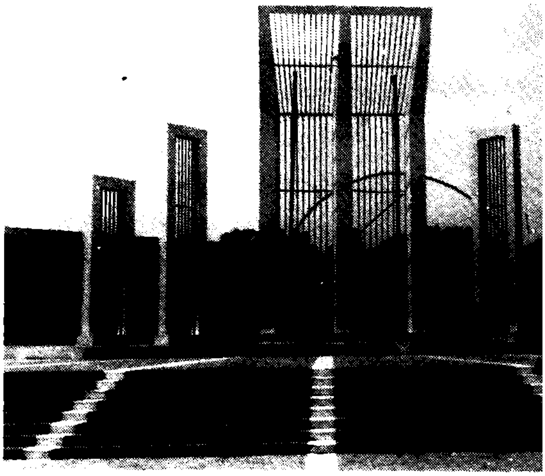

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

এক প্রতিবাদী মিছিল বের হয় এবং জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে যোগ দেন। সেদিন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে শফিউর রহমান (দ্র), আবদুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ এবং নাম না জানা আরো কয়েক জন নিহত হন। উত্তেজিত জনতা 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার ছাপাখানা জুবিলি প্রেস পুড়িয়ে দেয়। সারা শহরে মিছিল আর মিছিল। ভাষা-আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়।

সরকারি দমননীতির মুখে শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে মেডিক্যাল ছাত্রগণ ২৩শে ফেব্রুয়ারি মাত্র এক রাতের শ্রমে হোস্টেলপ্রাঙ্গণে সাড়ে দশ ফুট উঁচু ও ছয় ফুট চওড়া একটি শহীদ মিনার (দ্র) তৈরি করেন। কিন্তু পুলিশ ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিকালে তা ভেঙে ফেলে।

ভাষা-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির সঙ্গে ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত একাধিক দাবিদাওয়া— যেমন সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন ইত্যাদি। আর সেই লক্ষ্যে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস ধরে ঢাকাসহ সারা পূর্ব-পাকিস্তানে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কিন্তু সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি, নানা মিথ্যা প্রচার ও কূটকৌশলী ষড়যন্ত্রের মুখে এবং আন্দোলনের নেতাকর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতারের কারণে মার্চের প্রথম সপ্তাহে পৌঁছে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এক সময়ে থেমে যায়। কিন্তু এর প্রভাব রয়ে যায় জনমনে এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারায়। চুয়ান্নর নির্বাচনে শাসকবিরোধী যুক্তফ্রন্টের (দ্র) বিজয়ে তার প্রতিফলন ঘটে। আর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নেয় এই বলে যে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা'।

আ. র.

ভাসানী, আবদুল হামিদ খান [১৮৮০—১৯৭৬]

মানবদরদী জননেতা। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আবদুল হামিদ খান। আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে বাঙালি কৃষকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করার সময় সেখানকার কৃষক সমাজ তাঁকে 'ভাসানীর মওলানা' বলে ডাকতে শুরু করলে তিনি 'ভাসানী' নামেই পরিচিত হয়ে ওঠেন।

সিরাজগঞ্জের ধানগড়াগ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১৮৮০ সালে তাঁর জন্ম। পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। অল্প বয়সে পিতা ও মাতার মৃত্যু হলে ইব্রাহিম খান

www.pathagar.com

নামে তাঁর এক চাচার আশ্রয়ে থেকে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। মাদ্রাসাশিক্ষার শেষে টাঙ্গাইল জেলার কাগমারির এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এখানে কৃষকদের ওপর জমিদার-মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এ জন্য তাঁকে কাগমারি ত্যাগ করতে হয়। তিনি আসামের জলেশ্বরে চলে যান। সেখানে সুফী সাধক শাহ নাসিরউদ্দিন বোগদাদীর ইসলাম প্রচার মিশনে তিন বছর কাজ করেন। তারপর বোগদাদীর উৎসাহে উত্তর ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

২২ বছর বয়সে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯১৯ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (দ্র) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে (দ্র) যোগ দেন। এ সময় অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) অংশ নেবার কারণে দশ মাস কারাভোগ করেন। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি কৃষক-প্রজাদের ওপর জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরেন। কিন্তু এর ফলে আবার তাঁকে দেশ ছেড়ে আসামে পাড়ি জমাতে হয়। আসামের ধুবড়ি জেলায় ব্রহ্মপুত্র (দ্র) নদের ভাসানচরে বসবাসরত বাঙালি কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে তিনি এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করেন। পরে তাঁর কর্মস্থল হয় আসামের ঘাগমারি অঞ্চল। সেখানে তিনি বাঙালি কৃষকদের জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র, স্কুল, মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি মুসলিম লীগে (দ্র) যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে আসামের স্থানীয় লোকরা (অহমিয়া) আসাম থেকে বাঙালিদের বহিষ্কার করার জন্য 'বঙালখেদা' আন্দোলনের ডাক দিলে তিনি এর বিরুদ্ধে পাল্টা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর পর সরকার 'লাইন-প্রথা' (দ্র) ঘোষণা করে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে যেসব বাঙালি আসামে গিয়ে ভূমি দখল করেছে, তাদের সপরিবারে উচ্ছেদ করার জন্য সরকারি আদেশ জারি হয়। তিনি এই লাইন-প্রথার বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যান।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ভাসানী দেশে ফিরে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে বসবাস শুরু করেন। পূর্ববাংলার ওপর মুসলিম লীগ সরকারের জোর-জুলুম, শোষণ-বঞ্চনা দেখে তিনি ১৯৪৮ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে

কাগমারি সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ও শেখ মুজিবুর রহমান

একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে এই দলেরই নাম হয় আওয়ামী লীগ (দ্র)। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি নিজের চেষ্টায় সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন, যা পরে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। তিনি ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা (দ্র) আন্দোলনে, জড়িত থাকার কারণে গ্রেফতার হন। ১৯৫৪ সালে আবুল কাসেম ফজলুল হক (দ্র) ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির (দ্র) সঙ্গে মিলে তিনি মুসলিম লীগ-বিরোধী নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট (দ্র) গঠন করেন এবং নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয় নিশ্চিত করেন।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাসানী কাগমারি গ্রামে এক বিশাল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন যা 'কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন' (দ্র) নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এতে বহু বিদেশী অতিথি যোগ দেন। এই সম্মেলনেই যুদ্ধবিরোধী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নীতিসহ বিভিন্ন বিদেশনীতির প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দি প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। তিনি তখন নতুন রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (দ্র) গঠন করেন। এই পার্টির মাধ্যমে তিনি দেশের কৃষক সমাজের উন্নতি ও পূর্ববাংলাকে শোষণমুক্ত করার জন্য তাঁর যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে পল্টনের ময়দানে

www.pathagar.com

ভাষণদানকালে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা'র দাবি ঘোষণা করে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময় পাকবাহিনী তাঁর বাড়ি পুড়িয়ে দিলে তিনি ভারতে (দ্র) আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে 'হক কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ পর্বে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ছিল 'ফারাক্কা মার্চ'। ভারতে ফারাক্কা বাঁধ (দ্র) নির্মাণের বিরুদ্ধে তিনি এই পদযাত্রা মিছিলের ডাক দেন।

ভাসানী ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, সাদা লুঙ্গি আর তালপাতার আঁশের টুপি পরে অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। ৯৬ বছর বয়সে ১৯৭৬ সালের ১৭ই নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেশের মানুষের কাছে মজলুম জননেতা হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

সুজ. ব.

ভাস্কো দা গামা [১৪৬৯—১৫২৪]

পর্তুগিজ নাবিক। ভাস্কো দা গামা (Vasco da Gama) সর্বপ্রথম ইউরোপ (দ্র) থেকে সমুদ্রপথে ভারতে (দ্র) পৌঁছান এবং ইউরোপ ও এশিয়ার (দ্র) মধ্যে সরাসরি বাণিজ্যপথ আবিষ্কার করেন। ভাস্কো দা গামার জন্ম পর্তুগালের সাইনিসে, ১৪৬৯ সালে। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা এবং নৌচালনবিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণ করে ১৪৯২ সালে পর্তুগালের নৌ-আফিসার পদে যোগ দেন। ইতিমধ্যে পর্তুগাল থেকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত জলপথ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং গামার পিতা ভারতবর্ষে যাওয়ার সরাসরি সমুদ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। কিন্তু পিতার মৃত্যু হওয়ায় পর্তুগালের রাজা প্রথম ম্যানুয়েল ভাস্কো দা গামাকে ঐ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

গামা ১৭০ জন নাবিক ও চারটি জাহাজ নিয়ে ৮ই জুলাই ১৪৯৭ সালে পর্তুগালের লিসবন বন্দর থেকে যাত্রা করেন। উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে, মোজাম্বিক, মোম্বাসা, মালিন্দি হয়ে ১৪৯৮ সালের ২০শে মে ভারতের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। আরব বণিকদের বিরোধিতার কারণে তিনি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হন। আগস্টে (১৪৯৮) স্বদেশের উদ্দেশে রওনা হন এবং ৯ই সেপ্টেম্বর ১৪৯৯ লিসবন পৌঁছান। এই সমুদ্রযাত্রায় অসুস্থ হয়ে ১১৫ জন নাবিক মারা যায়।

১৫০২ সালে ভাস্কো দা গামা ১৫টি জাহাজ এবং যুদ্ধসরঞ্জামসহ দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে আসেন। প্রথম বার পর্তুগিজদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করার অজুহাতে তিনি বহু নিরীহ ভারতীয়কে হত্যা করেন। তিনি ভারত মহাসাগরে (দ্র) পর্তুগিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৪ সালে তিনি তৃতীয় বার ভারতবর্ষে যান ভারতবর্ষের ভাইসরয় হয়ে, ভারতীয় পর্তুগিজ কলোনিসমূহের শাসনকর্তারূপে। ঐ বছর অসুস্থ হয়ে ২৪শে ডিসেম্বর কোচিনে তিনি মারা যান।

স. রা.

ভি সি আর / ভি সি পি

ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডারকে (Video Cassette Recorder) সংক্ষেপে ভি সি আর (VCR) বলা হয়। একে ভিডিও টেপ রেকর্ডারও বলে। ভি সি আর আসলে একটি টেলিভিশন সেট। সুতরাং এটি টেলিভিশনপ্রেরক স্টেশন থেকে পাঠানো অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে এবং তা ক্যাসেটে রেকর্ডও করতে পারে। এতে পিকচার টিউব ও স্পিকার থাকে না। তাই ছবি ও শব্দ পাবার জন্য এর সঙ্গে একটি টেলিভিশন সেট সংযুক্ত করা হয়। ভি সি আর-এর চৌম্বক টেপে শ্রবণ-দর্শনসঙ্কেত বা ছবি ও শব্দ রেকর্ড এবং রেকর্ডকৃত ছবি–শব্দ পরে প্লেব্যাক করার ব্যবস্থা থাকে। ভি

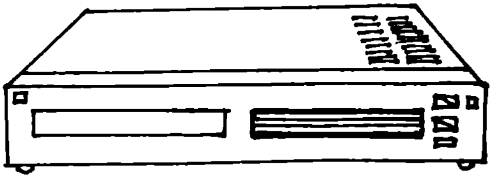

সি আর হল পিকচার টিউববিহীন এক ধরনের পরিবর্তিত টেলিভেশন সেট। ভি সি আর-এ যেহেতু একটি টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্র থাকে, তাই টেলিভিশনের এণ্টেনা এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে প্রেরক স্টেশন থেকে পাঠানো টেলিভিশন অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

একই সঙ্গে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা এবং ভিডিও ক্যাসেটে রেকর্ড করা যায়।

ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ারকে সংক্ষেপে বলা হয় ভি সি পি (VCP)। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভিডিও ক্যাসেটে রেকর্ডকৃত কোনো অনুষ্ঠান টিভির পর্দায় দেখা যেতে পারে। ভি সি পি-তে টেলিভিশন প্রেরক স্টেশন থেকে পাঠানো কোনো অনুষ্ঠান দেখা যায় না এবং রেকর্ডও করা যায় না। ভি সি আর ও ভি সি পির মধ্যে মূল পার্থক্য হল, ভি সি পি-তে শুধু রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান প্লেব্যাক করার ব্যবস্থা থাকে, এতে কোনো রেকর্ডিং ইউনিট থাকে না। তাই কোনো ভি সি আর থেকে ভি সি পি দ্বারা কোনো অনুষ্ঠান রেকর্ড করা যায় না। ভি সি আর-এর মতো ভি সি পি-র নিজস্ব কোনো টেলিভিশন ইউনিট নেই।

শা. ত.

ভিক্টর হুগো উগো, ভিক্তর মারী দ্র

ভিক্টোরিয়া, মহারানী [১৮১৯—১৯০১]

মহারানী ভিক্টোরিয়া (Queen Victoria) গ্রেট ব্রিটেনের (দ্র) রানী। তাঁর জন্ম ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম এডওয়ার্ড ও মায়ের নাম মেরিয়া লুইসা।

তিনি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমৃত্যু সুদীর্ঘ ৬৪ বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে তাঁর মতো আর কেউ এত অধিককাল শাসনক্ষমতায় থাকেন নি।

মহারানী ভিক্টোরিয়া দেশ শাসনে দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর আমলে শিল্প (দ্র), বিজ্ঞান (দ্র) ও সাহিত্যের (দ্র) ক্ষেত্রে প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইংরেজি সাহিত্য (দ্র) ও ইতিহাসচর্চায় বিশিষ্ট ঐ সময় 'ভিক্টোরীয় যুগ' নামে খ্যাত।

ভিক্টোরিয়া ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতসম্রাজ্ঞী' উপাধি লাভ করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

মু. মা.

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ক্রীড়াসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

ভিক্ষু, ভিক্ষুণী

গৌতম বুদ্ধের (দ্র) শিষ্যদের 'ভিক্ষু' বলা হয়। তাঁরা রঙিন কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন। এই বস্ত্রের নাম চীবর (দ্র)। জাপান (দ্র) ও কোরিয়ার ভিক্ষুরা কালো আলখাল্লা অথবা চীবর পরিধান করেন।

দুপুর বারোটার পর ভিক্ষুদের অন্ন বা অন্নজাতীয় সকল খাবার গ্রহণ নিষিদ্ধ। তবে এ সময় মধু (দ্র), ঘি, ননী এবং শর্করা – এই চার রকম দ্রব্য, হাল্কা পানীয় ইত্যাদি গ্রহণ করা যায়। মহাযান (দ্র)-পন্থী ভিক্ষুরা রাতেও আহার গ্রহণ করেন, তবে প্রকাশ্যে নয়। এই নিয়ম গৌতম বুদ্ধের সময় ছিল না।

ভিক্ষুরা বিবাহ বা গৃহধর্ম থেকে বিরত থাকেন। তবে বিবাহ করার পর গৃহত্যাগ করলে ভিক্ষু হওয়া সম্ভব। তখন গৃহের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখতে পারেন না তিনি। আবার ভিক্ষুধর্ম ত্যাগ করে সংসারধর্ম গ্রহণ করাও সম্ভব। বৌদ্ধ সাহিত্যে ভিক্ষুদেরকে সম্মানার্থে ভন্তে, ভান্তে বা ভদন্ত সম্বোধন করা হয়। সাধারণত ভিক্ষুদের বিহারের (দ্র) ভাণ্ডার থেকে চাল-ডাল দেওয়া হয়, অবশ্য যদি কোথাও নিমন্ত্রণ না থাকে। অথবা গ্রামবাসীরা পালা করে প্রতিদিন সকাল-দুপুরে তাঁদের আহার সরবরাহ করে থাকে।

বৌদ্ধদের সকল ধর্মীয় কাজ ভিক্ষুর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন ভিক্ষুরা গ্রামবাসীদের ধর্মকথা শুনিয়ে থাকেন। গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম প্রথম প্রচার করেন পাঁচ জন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে। সেই পাঁচ জনকে বলা হয় পঞ্চবর্গীয় শিষ্য বা পঞ্চ ভিক্ষু। তাঁদের নাম কৌণ্ডিণ্য, বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। গৌতম বুদ্ধের নির্দেশমতে তিনটি বস্ত্রখণ্ড, একটি পাত্র, একটি ছোট কুড়ুল, একটি সুচ, কোমরের তাগা ও জল ছাঁকার একটি নেকড়া—

www.pathagar.com

এই আটটি জিনিসই ভিক্ষুর পক্ষে যথেষ্ট। একটি বিহার বা প্যাগোডায় সাধারণত এক জন ভিক্ষু থাকেন এবং তাঁর অধীনে থাকেন এক বা একাধিক শ্রমণ (দ্র)। গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুদের বার বার বলেছেন যে ব্যক্তির উন্নতির মধ্যেই সমষ্টির উন্নতি নিহিত। এই উপদেশের প্রভাবে ভিক্ষুসঙ্ঘ নালন্দা (দ্র), অজন্তা, বিক্রমশীলা, ইলোরা, তক্ষশীলা, পাহাড়পুর (দ্র), ময়নামতী (দ্র) প্রভৃতি বিহার সমৃদ্ধ করেছেন। ধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘ নিতে পারেন।

বুদ্ধ তাঁর জীবৎকালে ভিক্ষুণীসঙ্ঘও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহিলারা সেকালে সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হতে পারতেন। তাঁরাও ভিক্ষুদের মতো গৃহে গিয়ে রাত্রিযাপন করতে পারতেন না। তবে সব কাজে ভিক্ষুণী থেকে ভিক্ষুদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল। এ জন্য ভিক্ষুদের সব নিয়ম ছাড়াও ভিক্ষুণীদের আটটি বাড়তি নিয়ম পালন করতে হত। গৌতমী, আম্রপালী (দ্র), বিশাখা, গোপাদেবী, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, কিসা গৌতমী প্রমুখ ভিক্ষুণী স্বনামখ্যাত। ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীরা আলাদা আলাদা স্থানে বাস করেন।

বি. ব.

ভিঞ্চি, লেওনার্দো দা দা ভিঞ্চি, লেওনার্দো দ্র

ভিটামিন / খাদ্যপ্রাণ

ভিটামিন (Vitamin) এক ধরনের জৈব যৌগ, যা শরীর সুস্থ রাখার জন্য অল্প পরিমাণে দরকার হয়, কিন্তু যা পর্যাপ্ত পরিমাণে দেহে তৈরি হয় না। ভিটামিন দু' ধরনের— চর্বিতে দ্রবণীয় 'এ', 'ডি', 'ই' ও 'কে' এবং পানিতে দ্রবণীয় 'সি' ও 'বি-কমপ্লেক্স'। চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন লিভারে জমা থাকে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন পর্যাপ্ত পরিমাণে দেহে সঞ্চিত থাকে না। একমাত্র ভিটামিনের অভাব হেতু রোগের জন্য নির্দিষ্ট ভিটামিন ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

ভিটামিন 'এ' : এই ভিটামিনের অন্য নাম রেটিনল। ভিটামিন 'এ'-এর স্বল্পতা অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। এই ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়, চোখের সাদা অংশ শুকিয়ে যায়, চক্ষুক্ষত দেখা দেয় এবং ত্বক (দ্র) ব্যাঙের চামড়ার মতো খসখসে হয়ে যায় এবং ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। ছোট মাছ (দ্র), ডিম (দ্র), মাখন (দ্র), পনির (দ্র), যকৃৎ (দ্র), দুধ (দ্র), সবুজ ও রঙিন শাকসব্জি, ফল ইত্যাদির মধ্যে ভিটামিন 'এ' আছে। পূর্ণবয়স্কের জন্য রেটিনল হিসাবে চাহিদা ৭৫০-১২০০ মাইক্রোগ্রাম, বিভিন্ন বয়সী শিশুর জন্য ৩০০-৭৫০ মাইক্রোগ্রাম।

ভিটামিন 'ডি' : এই ভিটামিনের অভাবে মহিলাদের মধ্যে অস্থিনম্রতা এবং শিশুদের মধ্যে রিকেট্স্ রোগ দেখা দেয়। রিকেট্স্-এ প্রধানত অস্থি এবং দাঁতের গঠন ও বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভিটামিন 'ডি' অন্ত্র থেকে ক্যালসিয়াম (দ্র) ও ফস্ফরাস্ (দ্র) শোষণে সহায়তা করে। মাছের যকৃতের তেল, চর্বিওয়ালা মাছ, ডিম, যকৃৎ ইত্যাদির মধ্যে এই ভিটামিন রয়েছে। অত্যধিক মাত্রায় 'ডি' ভিটামিন গ্রহণের ফলে দেহে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পূর্ণবয়স্কের দৈনিক চাহিদা ২.৫ মাইক্রোগ্রাম, শিশুদের জন্য ১০ মাইক্রোগ্রাম।

ভিটামিন 'ই': মানবদেহে জারণ (oxidation)-বিরোধী এই ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে এখনো প্রমাণিত হয় নি। বনজ তেল, ডিম, মাখন, মটরশুঁটি (দ্র), শস্যদানা ইত্যাদিতে 'ই' ভিটামিন পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'কে' : এর অভাবে দেহ থেকে রক্তপাত দীর্ঘায়িত হয়। কারণ এই ভিটামিন দেহে রক্ত জমাট বাঁধার সহায়ক উপাদান তৈরির জন্য অপরিহার্য। সবুজ শাকসব্জি ও সয়াবিনে 'কে' ভিটামিন আছে। অন্ত্রে উপস্থিত জীবাণু (দ্র) পর্যাপ্ত মাত্রায় ভিটামিন 'কে' তৈরি করে থাকে।

ভিটামিন 'সি' : এর অন্য নাম এস্কর্বিক্ অ্যাসিড।

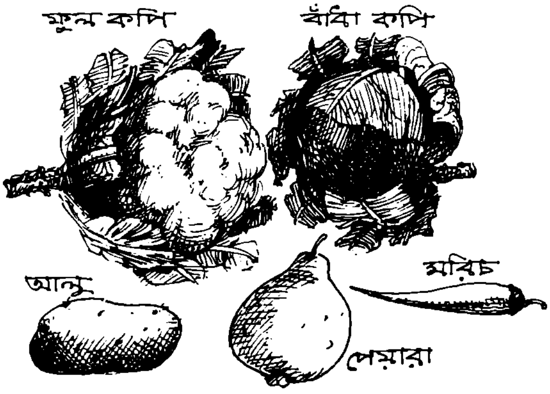

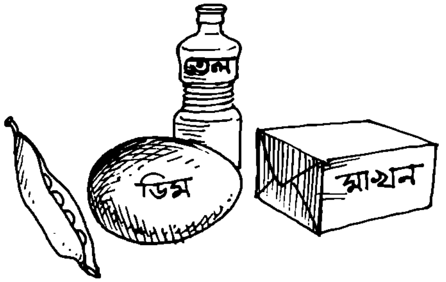

www.pathagar.com

দেহের বিপাকক্রিয়ায় এই বিজারক (reducing agent) উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভিটামিন 'সি' অত্যন্ত স্পর্শকাতর, উত্তাপে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এর অভাবে দেহে স্কার্ভিরোগ দেখা দেয়। রক্তাল্পতা, নরম মাঢ়ী, মাঢ়ীক্ষত, মাঢ়ী ও ত্বকের নিচে রক্তপাত, সন্ধিবেদনা ইত্যাদি লক্ষণ স্কার্ভিরোগের বৈশিষ্ট্য। উচ্চমাত্রায় ভিটামিন 'সি' স্কার্ভির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। আমলকী, পেয়ারা, কাঁচা মরিচ, ফুলকপি (দ্র), বাঁধাকপি, ফল (দ্র), আলু (দ্র) ইত্যাদি ফলমূল ও শাকসব্জিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' রয়েছে। দেহে ভিটামিন 'সি'র দৈনিক চাহিদা ৩০ মিলিগ্রাম।

ভিটামিন 'বি-কমপ্লেক্স' : এর অন্তর্গত প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদান বি$_{১}$ (থায়ামিন), বি$_{২}$ (রিবোফ্লেভিন), নিয়াসিন, বি$_{৬}$ (পাইরিডক্সিন), বি$_{১২}$ (কোবালামিন) এবং ফলিক অ্যাসিড (দ্র)। এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত বায়োটিন এবং পেন্টোথেনিক অ্যাসিড মানবদেহের পক্ষে অপরিহার্য প্রমাণিত হয় নি।

ভিটামিন 'বি$_{১}$' : ভিটামিন বি$_{১}$-এর অভাবে প্রধানত বেরিবেরি রোগ দেখা দেয়। বেরিবেরি শব্দের অর্থ 'আমি করতে পারি না' অর্থাৎ রোগী খুবই দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেরিবেরি রোগে শোথ, হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তিহ্রাস, স্নায়ুতন্ত্রের প্রদাহ ও বৈকল্য দেখা দেয়। ভিটামিন বি$_{১}$ শ্বেতসার বিপাকক্রিয়ায় সহ-উৎসেচক (কো-এনজাইম) হিসাবে কাজ করে। ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, অঙ্কুরিত বীজ, গম (দ্র), শিমের দানা, বাদাম, মাছের ডিম ইত্যাদিতে এই ভিটামিন আছে। পূর্ণবয়স্কের দৈনিক চাহিদা ১.২ মিলিগ্রাম।

ভিটামিন 'বি$_{২}$' : এর অভাবে মুখের ভেতরে বা বাইরের কোণে, ঠোঁটে, জিহ্বায় বা ত্বকের অন্যত্র ক্ষত দেখা দেয়। এই ভিটামিনটি দেহে প্রোটিন বিপাকক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ডিম, দুধ, পনির (দ্র), ব্যাঙের ছাতা (দ্র) ও মাংসে এই ভিটামিন রয়েছে। পূর্ণবয়স্কের দৈনিক চাহিদা ১.৭ মিলিগ্রাম।

'নিয়াসিন' (নিয়াসিনামাইড) : অন্য নাম যথাক্রমে নিকোটিনিক অ্যাসিড ও নিকোটিনামাইড। সাধারণত ঔষধ হিসাবে দ্বিতীয়টিই ব্যবহৃত হয়। এই ভিটামিনের অভাবে পেলেগ্রা নামক গুরুতর রোগ দেখা দেয়। এই রোগের প্রধান লক্ষণ ত্বকপ্রদাহ, উদরাময় এবং চিত্তবিকার। এ ছাড়া জিহ্বা ও মুখে ঘা, অজীর্ণ, বমি ইত্যাদি দেখা দেয়। উচ্চমাত্রায় নিকোটিনামাইড ব্যবহারে পেলেগ্রার নিরাময় ঘটে। এমাইনো অ্যাসিড বিপাক ও কোষের শ্বসনে নিকোটিনামাইডের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণবয়স্কের দৈনিক চাহিদা ১৮ মিলিগ্রাম (নিয়াসিন হিসাবে)।

ভিটামিন 'বি$_{৬}$' : এর অভাবে ঠোঁটের কোণে, জিহ্বায় ঘা দেখা দেয়। এই ভিটামিনও এমাইনো অ্যাসিড বিপাকে সহ-উৎসেচক হিসাবে কাজ করে। পূর্ণবয়স্কের দৈনিক চাহিদা ২ মিলিগ্রাম। যকৃৎ, বৃক্ক (দ্র), ডিম, মাংস, বাদাম, কলা, শস্যদানা ইত্যাদিতে এই ভিটামিন রয়েছে। এর অন্য নাম পাইরিডক্সিন।

ভিটামিন বি$_{১২}$: ভিটামিনটি দেহে লোহিতকণিকা তৈরিতে ও পরিপক্বতায় প্রয়োজন হয়। এর অভাবে 'পার্নিসিয়াস এনিমিয়া' নামক এক প্রকার মারাত্মক রক্তাল্পতা দেখা দেয়। দৈনিক চাহিদা ১-২ মাইক্রোগ্রাম। মাংস, যকৃৎ, ডিম ও দুধে এই ভিটামিন রয়েছে।

'ফলিক অ্যাসিড' : এই ভিটামিনও রক্তের লোহিতকণিকার (দ্র) গঠনে অপরিহার্য। এর অভাবে মেরুরজ্জুতে এক ধরনের অবক্ষয়জনিত রোগ দেখা দেয়। এ ছাড়াও দেখা দিতে পারে মেগালোব্লাস্টিক রক্তাল্পতা। সবুজ শাকসবজি, যকৃৎ, ঈস্ট (দ্র) প্রভৃতিতে এই ভিটামিন বর্তমান।

আ. আ. হা.

ভিনিগার (vinegar)

৬-১০% অ্যাসেটিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণের আরেক নাম ভিনিগার। ভিনিগার শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ থেকে, যার অর্থ টক মদ (sour wine)। অবশ্য মদ ছাড়া অন্য উপাদান দিয়েও অনেক ভিনিগার তৈরি করা হয়। মধু (দ্র), ঝোলাগুড়, ফল (দ্র) কিংবা শস্যের রসের ওপর ঈস্ট (দ্র) এবং ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়া ঘটিয়ে ভিনিগার তৈরি করা হয়। উৎস অনুসারে

www.pathagar.com

ভিনিগারের নাম দেওয়া হয়। যেমন— আঙুর থেকে ওয়াইন ভিনিগার, আপেল থেকে সাইডার (cider) ভিনিগার এবং বার্লি থেকে মল্ট ভিনিগার তৈরি হয়।

ভিনিগার তৈরির তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপ মল্টিং (malting), দ্বিতীয় ধাপ গাঁজনক্রিয়া (fermentation). তৃতীয় ধাপ অ্যাসেটিফিকেশন (acitification)। অ্যাসেটিক অ্যাসিডের জন্য ভিনিগারের স্বাদ টক। অ্যাসেটোব্যাক্টার (acetobacter) নামের ব্যাক্টেরিয়া অ্যালকোহলকে (দ্র) অ্যাসেটিক অ্যাসিডে পরিণত করে।

বাড়িতে এবং বাণিজ্যিকভাবে নানা রকম সুস্বাদু খাবার বানাতে ভিনিগার ব্যবহার করা হয়। সালাদ, সস, সবজি এবং মাংসে এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। আচার বানাতে এটা লাগে।

সা. এ.

ভিভ্ রিচার্ড্স্ [১৯৫২—]

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের (দ্র) খ্যাতিমান ক্রিকেটার। পুরো নাম আইজ্যাক ভিভিয়ান আলেকজাণ্ডার রিচার্ড্স্ (Isaac Vivian Alexander Richards)। জন্ম ৭ই মার্চ ১৯৫২, সেন্টজোন্স, এ্যান্টিগুয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ডানহাতী মিডল-অর্ডার মারমুখী ব্যাট্স্ম্যান ও ডানহাতী অফ্ব্রেক বোলার।।

প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৭৪ সালে ভারতের (দ্র) বিরুদ্ধে। ১২১টি টেস্টে ১৮২ ইনিংস ব্যাট করে ২৪টি সেঞ্চুরিসহ ৮৫৪০ রান করেছেন।

১০৮টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন। রান করেছেন ৬৭২১। ১১৮টি উইকেট লাভ করেছেন এবং ক্যাচ ধরেছেন ১০২ বার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়কত্ব করেছেন ৫০টি টেস্টে।

অ. ব.

ভিয়েৎনাম বিপ্লব

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে ভিয়েৎনামে ফরাসি উপনিবেশ বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কালক্রমে ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়া নিয়ে গঠিত হয় ফরাসি ইন্দোচীন (দ্র)। বিদেশী শাসকদের পদানত হয়ে ভিয়েৎনাম মুক্তির জন্য বরাবর লড়াই চালিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় (১৯৪০ সালে) ফরাসি ইন্দোচীনে প্রতিষ্ঠিত হয় জাপানি আধিপত্য। জাপানিদের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামী জনগণের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল স্বাধীন ভিয়েৎনাম লীগ বা 'ভিয়েৎমিন' নামে পরিচিত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট দ্বারা। জাতীয়তাবাদী থেকে বামপন্থী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির স্বাধীনতাকামীদের নিয়ে গঠিত এই ফ্রন্টের নেতা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ন্‌গুয়েন আই কুয়োক, যিনি বিশ্বব্যাপী হো চি মিন (দ্র) ছদ্মনামে সুপরিচিত। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভিয়েৎমিনেরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত দখলদার জাপানিরা ভিয়েৎনামে তাঁবেদার গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চাইলেও ভিয়েৎনামের জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও সশস্ত্র অভিযানের মুখে তাদের সব ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়। ২রা সেপ্টেম্বর ভিয়েৎমিন বাহিনী হ্যানয়ে প্রবেশ করে এবং বা দিন স্কোয়ারে সমবেত লক্ষ জনতার সামনে হো চি মিন ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন।

তবে অচিরেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ফরাসিরা নতুন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান শুরু করে। আট

হো চি মিন

www.pathagar.com

বছরব্যাপী লড়াই শেষে ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফু-তে ফরাসি বাহিনী চরম পরাজয় বরণ করে। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনে ১৭ অক্ষাংশ বরাবর সাময়িক সীমারেখা টেনে দেশটিকে বিভক্ত করা হয় এবং দেশের উত্তরাংশে ভিয়েৎমিন শাসনকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু জেনেভা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ ভিয়েৎনাম প্রতিষ্ঠার নির্বাচন আর অনুষ্ঠিত হয় নি। ফলে দক্ষিণাংশে প্রতিষ্ঠিত তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে জোরদার মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৬১ সালে আমেরিকা (দ্র) তার সেনাদল পাঠিয়ে সরাসরি দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপ দিয়েও আমেরিকা ভিয়েৎনামের মুক্তিসংগ্রাম দমন করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে প্রায় ৫০,০০০ মার্কিন সৈনিকের মৃত্যু ও বিশ্বব্যাপী প্রবল জনমতের চাপে ১৯৭৩ সালে আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়। এর দুই বছরের ভেতর তাঁবেদার সরকারের পতন ঘটে এবং ভিয়েৎনাম আবার এক দেশে পরিণত হয়।

ম. হ.

ভিয়েৎমিন ভিয়েৎনাম বিপ্লব দ্র

ভিলেন খলনায়ক দ্র

ভীমের কপাল

বাংলা ভাষায় (দ্র) লেখা প্রথম কিশোর-পাঠ্য মৌলিক উপন্যাস। এর লেখক প্রমদাচরণ সেন (দ্র)। ১৮৮৩ সালে তিনি উপন্যাসটি লেখেন। এটি প্রথমে লেখকের সম্পাদিত মাসিক শিশু-কিশোর পত্রিকা 'সখা'য় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে 'সখা'র প্রথম সংখ্যা থেকে উপন্যাসটির প্রকাশনা শুরু হয় এবং অক্টোবর সংখ্যায় শেষ হয়। তখন লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না।

সংক্ষেপে 'ভীমের কপাল' উপন্যাসটির কাহিনী হল: ভীমেন্দ্র নামে এক দুরন্ত একগুঁয়ে বাঙালি কিশোর কলিকাতা (দ্র) থেকে পূর্ববঙ্গে তার মামার বাড়িতে বেড়াতে আসে। এক দিন খেতে বসে ভাতের থালায় একখানা চুল পেয়ে মামা-মামীর সঙ্গে রাগ করে সে একাই কলিকাতায় রওনা দেয়। পথে সে নানা বিপদের সম্মুখীন হয়। সর্বশেষে সে গিয়ে পড়ে ডাকাতের পাল্লায়। আড়াই মাস পর তার মাসতুতো ভাই এবং বন্ধু বিপিন তাকে ডাকাত দলের কবল থেকে উদ্ধার করে কলিকাতায় নিয়ে যায়।

বাংলার গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে 'ভীমের কপাল' উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এটি 'সখা' পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি অনুযায়ী রচিত হয়েছিল। 'সখা'র উদ্দেশ্য ছিল প্রকাশিত রচনাসমূহের মাধ্যমে সাহিত্যরস পরিবেশনের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের চরিত্রের বিকাশ ও জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো। তাই প্রমদাচরণ ভীমেন্দ্র চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোরদের শিক্ষণীয় দিক নির্দেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে ভীমকে নানা প্রতিকূল অবস্থায় ফেলে তার স্বভাবচরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য-প্রধান রচনা হলেও এর গল্পরস এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় নি। আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গি ও চমকপ্রদ ঘটনাবিন্যাসে উপন্যাসটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

জীবিতকালে প্রমদাচরণ সেন 'ভীমের কপাল' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। এটি রচিত হওয়ার আড়াই বছর পর মাত্র ২৭ বছর বয়সে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে প্রায় এক শ' বছর তাঁর এই উপন্যাসটি সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় চাপা পড়ে থাকে।। ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

সুজ. ব.

ভুটান

পূর্ব-হিমালয়ে অবস্থিত ভুটান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এর আয়তন ৪৭,০৫০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার (১৯৯২ সালের হিসাব অনুযায়ী)। অত্যন্ত পর্বতসঙ্কুল ও অরণ্যময় বলে এখানে জনবসতি এত কম! ভুটানে বংশপরম্পরায় রাজতন্ত্র (দ্র) চলে আসছে। দেশটি শক্তিশালী রাজার দ্বারা শাসিত হয়, যদিও তাঁকে রাজকার্যে সহায়তার জন্য একটি উপদেষ্টা-কাউন্সিল আছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং সেখানকার সংসদের প্রধান কাজ হল রাজাকে রাজ্যপরিচালনায় উপদেশ দেওয়া। ভুটান সার্ক (দ্র)-ভুক্ত দেশগুলোর (নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা) অন্যতম।

ভুটানের উত্তরাংশ পর্বতময় ও বরফাবৃত। উত্তরের পর্বতমালার মধ্যে বহু উপত্যকা রয়েছে। এখানকার উল্লেখযোগ্য পর্বতশ্রেণী নাসাং কিংডু এবং চোমোলারি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (৭৩১৪ মি.)। তোর্সা, মানস প্রভৃতি নদী উত্তর

www.pathagar.com

থেকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের (দ্র) মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র (দ্র) নদে গিয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের (দ্র) মতো ভুটানেও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বজ্র ও বিদ্যুৎসহ প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে ঘন বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বীচ, বার্চ, সাইপ্রেস, ম্যাগনোলিয়া প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। এখানকার বনাঞ্চল থেকে মূল্যবান লাক্ষা (দ্র) ও মৃগনাভি পাওয়া যায়। শীতকালে ভুটানের উত্তরাঞ্চলে তুষারপাত হয়। মধ্যভাগের উপত্যকা অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে অধিকাংশ লোক বাস করে। কৃষিকাজ ও পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান (দ্র), গম (দ্র) ও ভুট্টা (দ্র) উল্লেখযোগ্য।

এখানে প্রচুর কমলা (দ্র) লেবু জন্মে। তা ছাড়া পাহাড়ের ঢালে বড় এলাচ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রেশম (দ্র), বিভিন্ন রকম ফল (দ্র) ও ফলের রস, কাঠ, পশমী দ্রব্য, এলাচ, মৃগনাভি প্রভৃতি রপ্তানিদ্রব্য। ভুটানের আমদানিদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ভোগ্যপণ্য, শিল্পজাত দ্রব্য, গৃহনির্মাণ-সামগ্রী ও ঔষধপত্র। পর্বতময় ভুটানের অভ্যন্তরে ভাল রাস্তাঘাট তৈরি হয় নি বলে পণ্য চলাচলে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়।

থিম্পু ভুটানের রাজধানী ও প্রধান শহর। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য বহু বিদেশী পর্যটক এখানে আসেন। এ জন্য এখানে পর্যটনশিল্প ও হোটেলব্যবসা গড়ে উঠেছে। পারো ও পুনাখা এখানকার উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

মু. এ.

ভুট্টা

গ্রামিনি (Gramineae) পরিবারভুক্ত বর্ষজীবী একবীজপত্রী উদ্ভিদ। এর ইংরেজি নাম কর্ন (corn) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *জিয়া মেইজ*, লিন (*Zea mays*, Linn)। ভুট্টা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ভাল জন্মে। অনেকের মতে এর উৎপত্তিস্থল মেক্সিকো এবং ১৬০০ সালে আমেরিকা (দ্র) থেকে তা আমাদের

দেশে আসে। প্রচুর বৃষ্টিপাত ভুট্টা চাষের জন্য সহায়ক। উত্তর-ভারতে পাহাড়ি এলাকায় ভুট্টা প্রধান খাদ্যশস্য। বাংলাদেশের (দ্র) বৃহত্তর রাজশাহী (দ্র), পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহ জেলায় কিছু ভুট্টা উৎপন্ন হয়।

ভুট্টা গাছে দুই ধরনের পুষ্পবিন্যাস হয়। এগুলো হচ্ছে পুং-পুষ্পের পুষ্পবিন্যাস ও স্ত্রী-পুষ্পের পুষ্পবিন্যাস। গাছের অগ্রভাগে পুং-পুষ্পের পুষ্পবিন্যাসে কেবল পুরুষ-ফুল হয়ে থাকে। পুরুষ-ফুলের নিচে গাছের গাঁট থেকে বের হওয়া স্ত্রী-পুষ্পবিন্যাসে কেবল স্ত্রী-পুষ্প থাকে। গাছের গোড়ার দিকে স্ত্রী-ফুল প্রথমে পুষ্ট হয়।

দানার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভুট্টা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ফসল হিসাবে ভুট্টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এতে শতকরা ১০ ভাগ প্রোটিন, ৪ ভাগ চর্বি জাতীয় পদার্থ এবং ১.৩৭ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে।

সবুজ ভুট্টা পুড়িয়ে খাওয়া যায়। পাকা ভুট্টা ভেজে খৈ তৈরি করা হয়। ভুট্টা চিনি, সিরাপ, স্টার্চ, ভুট্টাময়দা,

www.pathagar.com

অ্যালকোহল (দ্র) প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এর গাছ এবং দানার আবরণ থেকে কাগজ (দ্র), হার্ডবোর্ড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্লাস্টিক তৈরি করা হয়।

মু. আ.

ভুট্টো, জুলফিকার আলী [১৯২৮—১৯৭৯]

রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। জন্ম সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায়, ১৯২৮ সালের ৫ই জানুয়ারি। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কলি) ও অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ এবং লণ্ডনের (দ্র) লিঙ্কন্‌স ইন্ থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করার পর ১৯৫৩ সাল থেকে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি আইয়ুব খানের (দ্র) মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগের (দ্র) সংসদীয় সভার ডেপুটি লিডার হন।

১৯৬৫ সালে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধের (দ্র) পর ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে স্বাক্ষরিত তাশখন্দ চুক্তির (দ্র) প্রতিবাদে তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯৬৭ সালের নভেম্বরে ভুট্টো পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টি (পি পি পি) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে বিরোধী দলীয় নেতা হিসাবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন। তাঁর নেতৃত্বাধীন এই রাজনৈতিক দলের আদর্শ ছিল 'ইসলামী সমাজতন্ত্র'।

তাঁর নেতৃত্বে আইয়ুবের গণবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠলে ১৯৬৮ সালের ১৩ই নভেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি মুক্তিলাভ করেন ১৯৬৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ (দ্র) পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠনের অধিকারী হয়। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টো দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে পাক সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজসে সরকার গঠনের প্রশ্নে বিরোধিতা শুরু করেন। এই রাজনৈতিক জটিলতার সূত্রে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ (দ্র) পাক সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর আঘাত হানে এবং এর ফলে শুরু হয়ে যায় বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধ (দ্র)। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানে (সাবেক পশ্চিম পাকিস্তান) সরকার গঠন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বহাল থাকেন।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পি পি পি বিজয়ী হয়। কিন্তু এই নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত না হওয়ার অভিযোগে পাকিস্তানের বড় বড় শহরে গোলযোগ শুরু হয়ে যায়। এরই সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের সামরিক নেতৃবৃন্দ ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে পুনরায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বহু নেতাকে গ্রেফতার করে।

এর পরই এক জন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে সামরিক ট্রাইব্যুনালে ভুট্টোর বিচার শুরু হয় এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল।

আ. হু.

ভূগোল

ভূগোল শব্দটির 'ভূ' অর্থ পৃথিবী আর 'গোল' অর্থ গোলাকার। অর্থাৎ ভূগোলশাস্ত্র বলতে গোলাকার পৃথিবীর বর্ণনা বোঝায়। ইংরেজিতে geography কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ geograghia থেকে, যার অর্থ পৃথিবীর বর্ণনা। 'geo' অর্থ ভূ বা পৃথিবী আর 'graphy' অর্থ বর্ণনা। geographia শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন প্রাচীন ভূগোলবিদ এরাতোস্থেনেস্। আধুনিক ভূগোলশাস্ত্র শুধু পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক তথ্য পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কীভাবে

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক অবস্থাগুলো মানুষের দৈনন্দিন কর্মজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাই ভূগোল পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য। আজকের ভূগোল পৃথিবীর মানুষ ও পরিবেশের (দ্র) পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করে। ভূগোলবিদ অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ডিবেনহামের মতে, ভূগোলের প্রধান তিনটি কাজ হল : (ক) বন্টন সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাখ্যা দান করা; (খ) প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করা, (গ) মানবিক ও প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা।

ভূগোলের বিভিন্ন শাখা

প্রাকৃতিক ভুগোল : এতে পৃথিবীর প্রাকৃতিক গঠন, জলবায়ু (দ্র), চাপবলয়, তাপবলয়, উদ্ভিদ (দ্র) ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

মানবিক ও সামাজিক ভূগোল : এখানে পৃথিবীর জনসংখ্যা, বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, তাদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

অর্থনৈতিক ভূগোল : এখানে কৃষি, শিল্প (দ্র), পরিবহণ (দ্র), উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

আঞ্চলিক ভূগোল : এখানে রাজনৈতিক বিভাগ, আঞ্চলিক বিভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত স্থানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেওয়া হয়।

মু. এ.

ভূতত্ত্ব (geology)

ভূতত্ত্ব বলতে বোঝায় পৃথিবী (দ্র) সম্বন্ধে জ্ঞান (দ্র) বা পৃথিবী সংক্রান্ত মৌলিক বিজ্ঞান (দ্র)। পৃথিবী কীভাবে গঠিত হয়েছিল এবং এর পরিবর্তন কীভাবে ঘটেছে ভূতত্ত্ব তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ সাধারণত শিলা, পাহাড়-পর্বত, নদী (দ্র), মহাসাগর, গুহা এবং পৃথিবীর অন্যান্য বিষয়ও জানার চেষ্টা করে থাকেন। ভূতত্ত্বের ইংরেজি geology কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'geo' (পৃথিবী) এবং 'logos' (আলোচনা) থেকে।

যে পৃথিবী প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে গঠিত হয়েছিল, তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কোনো পরিবর্তন এসেছে ধীরে ধীরে, আবার কোনোটি এসেছে অনেক দ্রুত। যত দিন পৃথিবী থাকবে, তত দিন এই পরিবর্তন চলতেই থাকবে। ভূমিকম্প (দ্র) পৃথিবীর নানা ধরনের পরিবর্তন সাধন করে। তা পাহাড়-পর্বতের (দ্র) সৃষ্টি করে, আবার মরুর বুকে নদীরও সৃষ্টি করে। আগ্নেয়গিরি (দ্র) থেকে গলিত লাভা (দ্র) বের হয়ে শক্ত শিলায় পরিণত হয়। হিমবাহ (দ্র) পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নেমে আসে এবং তার সঙ্গে বাহিত শিলা ও মাটি রেখে গলে যায়। এসবের ফলে ভূপৃষ্ঠে নানা পরিবর্তন ঘটে।

পানিও পৃথিবীপৃষ্ঠে নানা ধরনের পরিবর্তন সাধন করে। বৃষ্টির পানি বিচূর্ণীভবনের কাজ করে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলা দ্রবণে সহায়তা করে। নদী ও সমুদ্রস্রোতের ঢেউয়ের আঘাতে উপকূল ক্ষয়ে যায়, আবার ঢেউয়ে প্রবাহিত তলানি জমে জমে ভাঙা উপকূল নিয়মিত উপকূলের আকার ধারণ করে এবং উপকূলের আয়তন বাড়ে।

ভূতত্ত্ববিদগণ জীবাশ্ম, প্রাণী (দ্র) ও উদ্ভিদের (দ্র) ধরন, ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করেন। পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব কীভাবে হয়েছিল এই জীবাশ্ম থেকে তা জানা যায়।

ভূতত্ত্বকে দু'টি প্রধান শাখায় ভাগ করা যায় : প্রাকৃতিক ভূতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ভূতত্ত্ব। পৃথিবী কোন কোন উপাদানে গঠিত এবং কীভাবে পৃথিবী গোল আকার ধারণ করল ইত্যাদি বিষয় প্রাকৃতিক ভূতত্ত্বে জানা যায়। পৃথিবীগঠনের ইতিহাস নিয়ে যে আলোচনা তা হল ঐতিহাসিক ভূতত্ত্ব। অনেকগুলো সমস্যা আছে যা এই দুই শাখাতেই পড়ে। কাজেই এই দুই শাখাকে একই সঙ্গে পড়তে হয়।

প্রাকৃতিক ভূতত্ত্বের মধ্যে পড়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তন, পরিবেশগত দিক, ভূ-রসায়ন, ভূ-পদার্থ, খনিজ ও মহাসাগর সংক্রান্ত বিষয়, বিভিন্ন ধরনের শিলা, উদ্ভিদ ও ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়।

ঐতিহাসিক ভূতত্ত্বে পড়ে বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম ও ভূ-ত্বকের শিলার বিভিন্ন স্তর গঠন নিয়ে গবেষণা। উভয় শাখাতেই পড়ে হিমবাহ কীভাবে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন ঘটায়, কীভাবে তলানি সঞ্চিত হয়, ভূ-তাত্ত্বিক সময় ও ভূ-ত্বক পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়।

মু. এ.

www.pathagar.com

ভূতের গল্প

যেসব গল্পের প্রধান পাত্র-পাত্রী বাস্তব জগতের মানুষ বা প্রাণী নয়, বাস করে অতিপ্রাকৃতের জগতে, মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে, বিভিন্ন রূপ ধরে মানুষের সামনে উপস্থিত হয় এবং অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড ঘটায়, সেগুলোকেই সাধারণত ভূতের গল্প বলা হয়। ভূতের গল্প কথাটি উচ্চারণ করলেই আমাদের এমন গল্পের কথা মনে হয়, যা পড়লে বা শুনলে ভয় ও আতঙ্কে গা ছমছম করে উঠবে। অবশ্য ভূতের গল্পের মধ্যে নানা শ্রেণী ও বৈচিত্র্য আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে' বা 'মণিহারা' প্রভৃতি গল্পে অতি-প্রাকৃতের উপস্থিতি থাকলেও সাধারণভাবে যাকে ভূতের গল্প বলা হয় এগুলি সে গোত্রের নয়। বাংলা সাহিত্যের (দ্র) অনেক সেরা লেখকই ছোটদের জন্য উৎকৃষ্ট মানের ভূতের গল্প রচনা করেছেন। বড়দের জন্য রচিত কৌতুকরসমণ্ডিত একটি অসামান্য ভূতের গল্প হল পরশুরাম তথা রাজশেখর বসুর (দ্র) 'ভূশণ্ডীর মাঠ'।

ক. চৌ.

ভূমধ্যসাগর (Mediterranean Sea)

চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত যে ক'টি সাগর রয়েছে ভূমধ্যসাগর হল তাদের মধ্যে আয়তনে বৃহত্তম। উত্তরে ইউরোপ (দ্র), দক্ষিণে আফ্রিকা (দ্র) আর পূর্বদিকে এশিয়ার

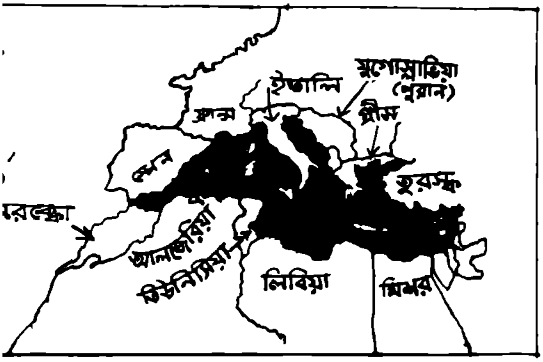

(দ্র) পশ্চিম প্রান্তকে রেখে এদের ঠিক মাঝখানে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি শায়িত এই শান্ত জলভাগ। চারদিকে স্থলভূমি দিয়ে ঘেরা হলেও দূরবর্তী সাগর-মহাসাগরের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে : পূর্বদিকে সংকীর্ণ জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে (দ্র) পড়া যায়; দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে সুয়েজ খালের (দ্র) ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া যায় লোহিত সাগরে (Red Sea) ও লোহিত সাগর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে (দ্র) গিয়ে পড়া যায়; আর উত্তর দিকের মাঝামাঝি জায়গায় বস্‌ফরাস্ প্রণালী দিয়ে কৃষ্ণসাগরে (Black Sea) গিয়ে মেশা যায়।

'ভূমধ্যসাগর' নামটি মূলত ইংরেজি 'মেডিটেরেনিয়ান' শব্দ থেকে অনুবাদ। মেডিটেরেনিয়ান কথাটি আবার তৈরি হয়েছে লাতিন 'মেডিয়ুস্' (medius) আর 'তের্‌রা' (terra) শব্দের সমন্বয়ে। মেডিয়ুস মানে মধ্যভাগ আর তের্‌রা মানে পৃথিবী বা স্থলভূমি। বোঝা যায়, মানবসভ্যতার কোনো এক পর্যায়ে মানুষ বিশ্বাস করত যে এই অঞ্চলটি পৃথিবীর (দ্র) মাঝখানে অবস্থিত।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশ বলতে বোঝায় : মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, ইসরায়েল, লেবানন, সিরিয়া, তুরস্ক (দ্র), গ্রিস, আলবানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ইতালি, মোনাকো, ফ্রান্স ও স্পেন। এ ছাড়া দ্বীপও রয়েছে অনেক, যেমন—মাল্টা, সাইপ্রাস, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি ইত্যাদি।

হা. মা.

ভূমিকম্প

প্রাকৃতিক কারণবশত ভূ-আলোড়নের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো অংশে আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনের সৃষ্টি হলে তাকে ভূমিকম্প বলে। এরূপ কম্পন প্রচণ্ড বা মৃদু আকারের হতে পারে। বছরে প্রায় ৬০০০ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। বেশির ভাগই সমুদ্রের তলদেশে (যেখানে ভূত্বক খুব দুর্বল) ঘটে থাকে বলে আমরা তা অনুভব করি না। একটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তা ১৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন টি এন টির (TNT = trinitrotoluene) সমান। অর্থাৎ এই শক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময় জাপানে যে প্রথম পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল তার প্রায় দশ হাজার গুণ বেশি।

ভূগর্ভস্থ যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে এর কেন্দ্র বলে। ভূকম্পনকেন্দ্র সাধারণত ভূ-ত্বকের ৩২

www.pathagar.com

কিমি–র মধ্যে অবস্থান করে। কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বি ভূ-ত্বকের উপরিস্থ বিন্দুকে উপকেন্দ্র বলে। ভূমিকম্পের স্পন্দন কেন্দ্র থেকে তরঙ্গের ন্যায় চারদিকে প্রসারিত হয়। সাইসমোগ্রাফ (seismograph) বা ভূ-কম্পনলিখনযন্ত্রের সাহায্যে এরূপ তরঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ভূমিকম্পের তীব্রতা সাধারণত রিক্টার (Richter) স্কেলে মাপা হয়। এই স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতার মাত্রা ৫-এর বেশি হলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

ভূমিকম্পের কারণ

১. ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-ত্বকের কোনো স্থানে শিলা ধসে পড়লে বা শিলাচ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়।

২. ভূ-ত্বক তাপ বিকিরণ করে সঙ্কুচিত হলে ভূ-নিম্নস্থ শিলাস্তরে ভারের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে ফাটল বা ভাঁজের সৃষ্টি হয়। তখন ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে।

৩. পৃথিবীর অভ্যন্তরে অত্যধিক তাপের জন্য উত্তপ্ত বাষ্প ও শিলারাশির চাপ ভূ-ত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দিলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

৪. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় উর্ধ্বমুখী উত্তপ্ত বাষ্প ও শিলারাশির চাপে নিকটবর্তী স্থানেও ভূমিকম্প হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে ভূমিকম্পের ঘটনা প্রধানত দু'টি বলয়ে সীমাবদ্ধ। একটি হিমালয় ও আল্পস পার্বত্য বলয় ও অপরটি প্রশান্ত মহাসাগরের (দ্র) উভয় তীরস্থ বলয়। এই উপমহাদেশে যেসকল ভূমিকম্পের ঘটনা হয়েছে তাদের অধিকাংশই হিমালয় ও তার পাদদেশ এবং গঙ্গা-অববাহিকা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক কালে অন্যান্য দেশের মধ্যে আলাস্কা, জাপান (দ্র), গুয়াতেমালা, ইতালি ও চীনদেশে (দ্র) ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৭৬ সালে চীনের ভূমিকম্পে প্রায় ৭ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল। রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৯।

ভূমিকম্পের ফলাফল: ভূমিকম্পের ফলে বহু ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ ও যাতায়াতব্যবস্থা বিনষ্ট হয়। ভূমিকম্পের দ্বারা ভূ-ত্বকের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে শিলাস্তরে ভাঁজ, ফাটল বা চ্যুতি এবং স্রস্ত উপত্যকার সৃষ্টি হয়। সময় সময় পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে স্তূপপর্বতের সৃষ্টি হয়। নদীর (দ্র) গতি পরিবর্তিত হয় এবং নদী শুকিয়ে যায়। কখনো কখনো উচ্চভূমি অবনমিত হয়ে জলাশয়ে পরিণত হয়। পর্বতের উপর শিলাপাত এবং হিমানীসম্প্রপাত বা আভালাঁশ (avalanche) হয়। সাগর–উপকূল ধসে গিয়ে সংলগ্ন এলাকা জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়। ভূমিকম্পের পরোক্ষ ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে (দ্র) বহু প্রাণহানি ঘটে।

মু. এ.

ভেটো

ভেটো (veto) একটি লাতিন শব্দ। এর অর্থ 'আমি নিষেধ করি'।

কোনো সরকারি শাখা বা বিভাগ (সাধারণত আইন প্রণয়কারী) কর্তৃক গৃহীত কোনো পদক্ষেপ বা উদ্যোগের প্রতি কোনো সরকারি সম্মতি প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাহার করার অধিকার হিসাবে শব্দটি বিবেচিত।

ভেটো অবাধ (শর্তহীন) অথবা সীমিত হতে পারে। সীমিত ভেটো হচ্ছে তা-ই, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা যায়। অবাধ বা শর্তহীন ভেটোর সমকালীন দৃষ্টান্ত হচ্ছে— কার্য পরিচালনা-বহির্ভূত বিষয়ে (Non-procedural) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ (দ্র) নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচটি রাষ্ট্রের যে কোনোটির ভেটো প্রয়োগের অধিকার।

দেশ ও সরকার ভেদে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা ও চরিত্রের হেরফের হয়ে থাকে।

আ. হ

ভেড়ামারা গঙ্গা নদী দ্র

ভেনাস্ / ভিনাস্ (Venus)

প্রাচীন কালের রোমানদের দেবী। এক সময় উদ্যানের দেবীরূপে পূজিত হতেন, কিন্তু পরে প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবীতে রূপান্তরিত হন। এখন ভেনাসকে শিল্পসাহিত্যের ভুবনে সর্বজনীনভাবে প্রেমের দেবীরূপেই দেখা হয়। গ্রিকেরা এই প্রেমের দেবীকে বলতেন আফ্রোদিতি

www.pathagar.com

(Aphrodite)। আফ্রোদিতিই রোমানদের ভেনাস। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের (দ্র) সময় ভেনাসকে রোমে পাঁচ ভাবে পূজা করা হত। সৌভাগ্যজননীরূপে তিনি ছিলেন ভেনাস ফেলিক্স, যুদ্ধজয়ের দেবীরূপে ভেনাস ভিক্‌ট্রিক্স, ভোগের দেবী হিসাবে ভেনাস লিবেন্তিনা। রোমান জাতির

ভেনাসের জন্ম (আংশিক), শিল্পী : বত্তিচেল্লি

ভেনাস ডি মিলো (আংশিক)

মাতা হিসাবে তিনি ছিলেন ভেনাস জেনেট্রিক্স এবং নারীর সতীত্ব রক্ষার দেবী হিসাবে তাঁর পরিচয় ছিল ভেনাস ভার্তিকোর্দিয়া।

চিত্রকলা (দ্র) ও ভাস্কর্যের অঙ্গনে সৌন্দর্য ও ভালবাসার দেবী ভেনাস বহু শিল্পী কর্তৃক অপরূপভাবে রূপায়িত হয়েছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় চিত্রশিল্পী সান্দ্রো বত্তিচেল্লির (Sandro Botticelli) 'ভেনাসের জন্ম' নামে একটি অসামান্য চিত্রকর্ম আছে।

ক. চৌ.

ভেনি, ভিদি, ভিসি

খ্রিস্টপূর্ব ৪৭ সালে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার (দ্র) আলেকজান্দ্রিয়া (দ্র) থেকে সিরিয়া হয়ে স্বদেশে ফেরার পথে গ্রিসের বিদ্রোহী নেতা ফার্নাসেসকে পরাজিত করেন। এর পর তিনি উত্তর আফ্রিকার পুব্‌লিউস সিপিয়া এবং রাজা জুবা ও স্পেনে পম্পের দুই পুত্রকে পরাজিত করেন। মিশর, গ্রিস, স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধজয়ের বিবরণ সিজার লিপিবদ্ধ করেন তাঁর 'গল যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী একটি সুসজ্জিত শকটের গায়ে শুধু এই তিনটি লাতিন শব্দ Veni. Vidi. Vici (অর্থাৎ 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম') লেখা ছিল। দু'টি সারিতে মশাল বহনকারী ৪০টি হাতি এই মিছিলের শোভা বর্ধন করে। রোমের কোনো যুদ্ধে সিজার কখনোই পরাজয় বরণ করেন

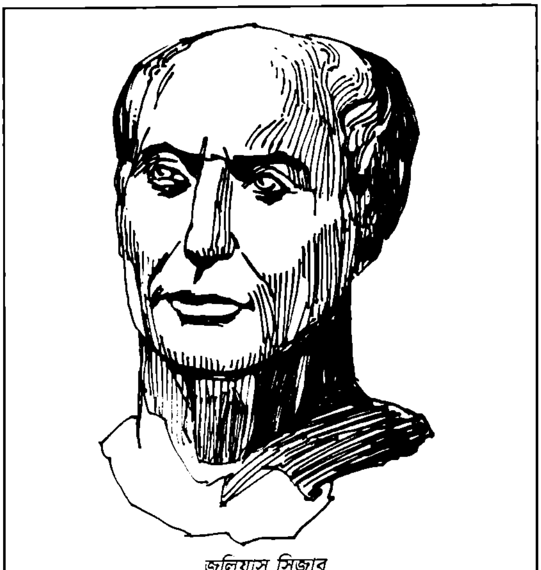

জুলিয়াস সিজার

নি—এই বাক্যটি তারই ভাব-প্রকাশক এবং সেই অর্থেই দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আ. হু.

ভের্ন্, জুল্   জুল্ ভের্ন্ দ্র
ভেষজকোষ   ফার্মাকোপিয়া / ভেষজসংহিতা দ্র

ভেষজবিদ্যা (pharmacology)

'ফার্মাকোলজি' শব্দটির গ্রিক মূলের অর্থ 'ভেষজবিজ্ঞান'।

www.pathagar.com

ড্রাগ অর্থাৎ ভেষজের ইতিহাস, উৎস, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম, দেহে এর প্রাণরাসায়নিক ও শারীরতাত্ত্বিক প্রভাব, ক্রিয়াপদ্ধতি, শোষণ ও বিস্তার, জৈবপরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে ভেষজের রেচন, আরোগ্যিক ও অন্যান্য ব্যবহার, ব্যবহার্য মাত্রা, বিরূপ ক্রিয়া, বিষক্রিয়া, একাধিক ভেষজ গ্রহণের ফলে এদের মিথস্ক্রিয়া (ইন্টারঅ্যাকশান) ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়ে ভেষজবিদ্যা। এক কথায় ভেষজ সম্পর্কে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞান (দ্র) আহরণ ও মূল্যায়ন ভেষজবিদ্যার লক্ষ্য।

ভেষজ ব্যবহারের উদ্দেশ্য রোগনিরাময়। তাই দেহতন্ত্রে এর ক্রিয়া, এর আরোগ্যিক মাত্রা, রক্তে (দ্র) এর বিস্তার ইত্যাদি বিষয় জানা চিকিৎসকের পক্ষে জরুরি। সেই সঙ্গে দরকার ভেষজের বিরূপ ক্রিয়া ও বিষক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞান। কারণ চিকিৎসকের লক্ষ্য রোগনিরাময়ের উপযোগী সঠিক ঔষধ নির্বাচন, যা যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবভিত্তিক।

সম্প্রতি ভেষজবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঔষধের 'বায়ো-এভেইলেবিলিটি' অর্থাৎ শরীরে ঔষধের কার্যকরী মাত্রার সক্রিয় উপস্থিতি। নানা কারণ এই মাত্রা অর্জনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই ঔষধ গ্রহণ মানেই ঔষধের পূর্ণ কার্যকারিতা নয়। ভেষজবিদ্যা এসব তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

ভেষজবিদ্যা এমনিভাবে সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ নিরাময়ের নানাদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলে।

আ. র.

ভেষজসংহিতা ফার্মাকোপিয়া / ভেষজকোষ দ্র

ভেস্‌পুচি, আমেরিগো [১৪৫১—১৫১২]

দুঃসাহসী নাবিক, অভিযাত্রী এবং নতুন বিশ্ব আবিষ্কারকদের এক জন। তাঁর সম্মানে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের নামকরণ হয়েছে।

আমেরিগো ভেস্‌পুচি (Amerigo Vespucci) সম্ভবত ১৪৫১ সালে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই নৌবিদ্যা এবং ভূবিদ্যার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তবে প্রথম জীবনে তিনি ফ্লোরেন্সের শাসকপরিবারের মালিকানাধীন এক ব্যাঙ্কে কাজ নেন। ১৪৯২ সালে তাঁকে এই ব্যাঙ্কের সেভিইয়ে (স্পেন) শাখায় বদলি করা হয়। পরে তিনি এই শাখার প্রধান পদে উন্নীত হন।

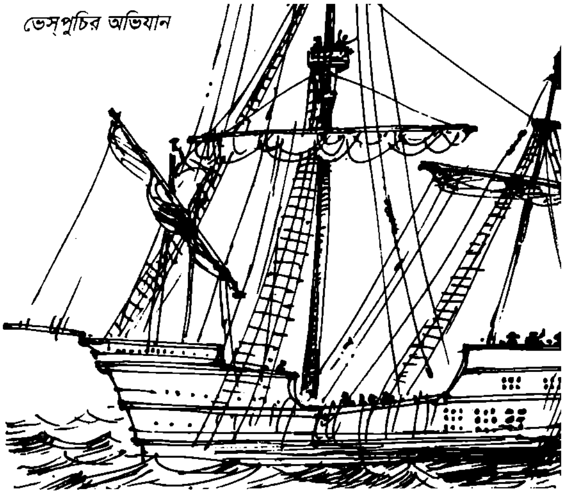
ভেস্‌পুচির অভিযান

স্পেনের সেভিইয়ে (Seville) শাখায় কাজ করার সময় আমেরিগো ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে নতুন দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদিত পর্যটকদের আর্থিক সাহায্য দানের একটি কর্মসূচি হাতে নেন। ১৪৯৩ সালে দ্বিতীয় ভ্রমণযাত্রার সময় তিনি কলম্বাসের (দ্র) জাহাজের সাজসজ্জার ব্যয় নির্বাহ করেন। এভাবে তাঁর মনে অভিযাত্রী হবার আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং তিনি নিজেই নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন।

ভেস্‌পুচি মোট চার পর্বে তাঁর অভিযাত্রা পরিচালনা করেন বলে জানা যায়। ১৪৯৭ ও ১৪৯৯ সালে দু' বার স্পেন থেকে এবং ১৫০১ ও ১৫০৩ সালে দু' বার পর্তুগাল থেকে তিনি অভিযানে বের হন। অবশ্য ১৪৯৭ সালে সংঘটিত তাঁর প্রথম অভিযানে দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) মূল ভূখণ্ডে পৌঁছেছিলেন বলে তিনি যে দাবি করেছেন তা পণ্ডিতেরা মেনে নেন নি।

১৪৯৯ ও ১৫০১ সালের অভিযানে ভেস্‌পুচি দক্ষিণ আমেরিকা উপকূলের প্রায় ৬০০০ মাইল ভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি এর মানচিত্র (দ্র) অঙ্কন ও বিবরণ লিপিবদ্ধ

www.pathagar.com

করেন। ১৫০১ সালের অভিযানে তিনি বর্তমান আমেরিকা মহাদেশের ভূখণ্ডটিকে মহাদেশ (দ্র) বলে শনাক্ত করেন। এর আগে এই অঞ্চলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি বলে ভাবা হত। এই অভিযানেই তিনি নিরক্ষরেখা (দ্র) থেকে পৃথিবীর বৃত্তাকার ব্যবধান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তাঁর নির্ণীত দূরত্ব প্রকৃত দূরত্ব থেকে ৫০ মাইল কম ছিল।

১৫০৭ সালে জার্মানির এক ভূতত্ত্ববিদ এবং মানচিত্রনির্মাতা ভেস্‌পুচির ভ্রমণবৃত্তান্ত সংবলিত পত্রাবলি প্রকাশ করেন। তিনি ভেস্‌পুচির তথ্য অনুসরণ করে প্রথম নতুন বিশ্বের মানচিত্র অঙ্কনে উদ্বুদ্ধ হন এবং তিনিই প্রথম নতুন মহাদেশটিকে 'আমেরিকা' নামে অভিহিত করেন। পরে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মহদেশই এই নামে পরিচিত হয়।

আমেরিগো ভেস্‌পুচি ১৫০৫ সালে স্পেনের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ১৫০৮ সালে তিনি স্পেনের প্রধান নাবিক নিযুক্ত হন। তিনি নব আবিষ্কৃত অঞ্চলের মানচিত্র নির্মাণ এবং এসব অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়নেরও কাজ করেন। ১৫১২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি সেভিইয়ে-তে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজ. ব.

ভোঁদড় উদবিড়াল দ্র
ভোয়া ভয়েস অব আমেরিকা দ্র

ভোল্ট (volt)

বৈদ্যুতিক বিভব, বিভবান্তর এবং ই. এম. এফ. (তড়িচ্চালক শক্তি)-এর আন্তর্জাতিক একককে ভোল্ট (volt) বলা হয়। কোনো পরিবাহী (দ্র) তার দিয়ে এক অ্যাম্পেয়ার (দ্র) তড়িৎপ্রবাহ চালানোর ফলে পরিবাহীর দুই প্রান্তে এক ওয়াট ক্ষমতা অপচয়িত (dissipated) হলে পরিবাহীর প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে বিভবান্তরকে বলা হয় এক ভোল্ট। আলেসান্দ্রো ভোল্‌তার (দ্র) নাম অনুসারে এর নাম হয়েছে ভোল্ট। তড়িচ্চালক শক্তি বা বিভবান্তরকে যখন ভোল্ট এককে প্রকাশ করা হয়, তখন একে বলা হয় ভোল্টেজ (voltage)।

শা. ত.

ভোল্টমিটার (voltmeter)

ভোল্টেজ পরিমাপের যন্ত্রবিশেষ। ভোল্টমিটারের সাহায্যে কোনো পরিবাহীর (দ্র) দুই প্রান্তের বা কোনো বর্তনীর (সার্কিট) কোনো অংশের বিভব বা ভোল্টেজ সরাসরি মাপা যায়। ভোল্টমিটারকে বর্তনীতে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করতে হয় যাতে তড়িৎপ্রবাহ এর ভেতর ধনাত্মক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত দিয়ে বের হয়। চলকুণ্ডলী ভোল্টমিটার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। একটি গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে উচ্চরোধকে সিরিজ সংযোগে সংযুক্ত করে এই ভোল্টমিটার তৈরি হয়। পরিবর্তী বা পর্যাবৃত্ত বিভবান্তর পরিমাপের জন্য বর্তনীর সঙ্গে একটি রেক্টিফায়ার (দ্র) সংযুক্ত করতে হয়। চল-লৌহযন্ত্র দ্বারা রেক্টিফায়ার ব্যবহার না করেও ডি. সি. অথবা এ. সি. ভোল্টেজ মাপা যায়। ক্যাথোড (দ্র) রে টিউবকেও ভোল্টমিটার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইলেক্ট্রনিক ডিজিটাল ভোল্টমিটার ভোল্টেজের মানকে ডিজিট হিসাবে প্রদর্শন করে।

শা. ত.

ভোল্টামিটার (voltameter)

বৈদ্যুতিক চার্জের (দ্র) পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য পূর্বে যে ইলেক্ট্রোলাইটিক সেল বা তড়িৎবিশ্লেষী কোষ ব্যবহৃত হত তার নাম ভোল্টামিটার। বিজ্ঞানী কুলঁ (দ্র)-র নাম অনুসারে একে কুলোমিটার (Coulometer)ও বলা হয়। কোনো সেলের ধাতব লবণের দ্রবণ থেকে ক্যাথোডে (দ্র) যে ধাতু জমা হয় তার পরিমাণ জেনে চার্জের পরিমাণ বের করা যায়। সঞ্চিত ধাতুর ভরকে রাসায়নিক সমতুল দিয়ে ভাগ করে চার্জের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। বর্তমানে ভোল্টামিটার বলতে তড়িৎদ্রবে নিমজ্জিত দু'টি ইলেক্ট্রোডকে বোঝায়।

শা. ত.

ভোল্‌তা, কাউন্ট আলেসান্দ্রো [১৭৪৫— ?]

ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী এবং প্রথম ব্যাটারির (দ্র) আবিষ্কারক। ১৭৪৫ সালে ইতালির কোমোতে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে চালাক চতুর বালক হিসাবে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এই বয়সেই তিনি বিজ্ঞানী হবার সিদ্ধান্ত নেন। ভোল্‌তার (Count Alessandro Volta) এক বিজ্ঞানী বন্ধু লুইজি গালভানি (দ্র) তাঁর সম্পাদিত একটি মজার পরীক্ষণ সম্পর্কে এক সময় ভোল্‌তাকে একটি চিঠি লেখেন। গালভানি তাঁর পরীক্ষণ সম্পর্কে বলেন যে তিনি ব্যাঙ কেটে এর মাংসপেশি একটি পেতলের হুকের সাহায্যে

www.pathagar.com

ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে ব্যাঙের ঝোলানো মাংসপেশিটি যখনই লোহার পাতকে স্পর্শ করছে তখনই তা সঙ্কুচিত হচ্ছে। গালভানি ও অন্যান্যরা মনে করেছিলেন, এটি প্রাণি-বিদ্যুৎ। ব্যাঙের মাংসপেশি তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করেছে বলে এ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ভোল্‌তা বিশ্বাস করতেন যে ব্যাঙের মাংসপেশি দ্বারা দু'টি ধাতুর মধ্যে সংযোগ ঘটার জন্যই বিদ্যুৎ (দ্র) উৎপন্ন হচ্ছে। এই বিদ্যুৎ দু'টি ধাতুর সংযোগের ফলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ, ব্যাঙের মাংসপেশি থেকে তা উৎপন্ন নয়। ভোল্‌তা এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি লবণ ভেজানো কার্ডবোর্ড দ্বারা পৃথক্‌কৃত তামা (দ্র) ও দস্তার (দ্র) পাত দিয়ে 'ভোল্টেইক পাইল' তৈরি করেন। এটিই প্রথম ব্যাটারি। তিনি তড়িচ্চালক শক্তির এককের নাম দেন ভোল্‌ত্ (ইংরেজিতে ভোল্ট)।

শা. ত.

ভ্যান গখ্‌, ভিন্‌সেণ্ট্‌ ভান গখ্‌, ভিন্‌সেণ্ট্‌ দ্র

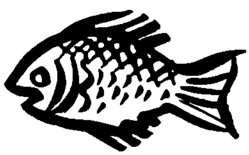

ম

মওলানা আজাদ আবুল কালাম আজাদ, মওলানা দ্র

মওলানা ভাসানী ভাসানী, আবদুল হামিদ খান দ্র

মকরক্রান্তি

পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরত্বে পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করে একটি পূর্ণবৃত্ত কল্পনা করা যায়। তাকে নিরক্ষরেখা (দ্র) বা নিরক্ষবৃত্ত বা ভূ-বিষুব রেখা বলে। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ বলে। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশকে ০° ধরে দক্ষিণগোলার্ধের ২৩$\frac{১}{২}$° দক্ষিণ অক্ষরেখাকে মকরক্রান্তি রেখা বলে।

ডিসেম্বর মাসে পৃথিবী কক্ষপথে এমনভাবে অবস্থান করে যে সূর্য নিরক্ষরেখার ২৩$\frac{১}{২}$° দক্ষিণ অক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই অক্ষরেখা সূর্যের আপাতগতির সর্বদক্ষিণ সীমা বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে মকরক্রান্তি রেখা (Tropic of Capricorn– Tropic= Turning Place)। দক্ষিণায়নে এটিই সূর্যের শেষ অবস্থান। একে দক্ষিণ আয়নান্ত বলে। এই সময় ছায়াবৃত্ত (৬৬$\frac{১}{২}$° অক্ষাংশ) নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণের সমাক্ষরেখাগুলোকে এমনভাবে বিভক্ত করে যে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয় এবং উত্তর গোলার্ধে রাত্রি বড় ও দিন ছোট হয়। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে উত্তর গোলার্ধে ৬৬$\frac{১}{২}$° উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে সর্বত্র রাত্রি এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ৬৬$\frac{১}{২}$° দক্ষিণ অক্ষাংশের দক্ষিণে সর্বত্র দিন থাকে।

মু. এ.

মক্কা

মক্কা সৌদি আরবের একটি প্রাচীন নগরী। তীর্থভ্রমণ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সূত্রে মক্কা সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই একটি সুপরিচিত নগরী। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে প্রাচ্যের নানা দ্রব্যসামগ্রী মক্কার উপর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে চালান যেত। এ ছাড়া, দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা প্রতি বছর মক্কার কাবা (দ্র) ঘরে সমবেত হত। এ কারণেও বহির্বিশ্বে মক্কার বিশেষ মর্যাদা ও সুনাম ছিল। হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর জন্ম ও ইসলামের অভ্যুদয়ের পর মক্কা এবং প্রাচীন তীর্থস্থান 'বায়তুল্লাহ্‌' বা কাবা ঘর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করে। প্রতি বছর হজ্‌ (দ্র) পালনের জন্য এখানে সারা দুনিয়া থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সমাবেশ ঘটে,

পবিত্র কাবা শরীফ

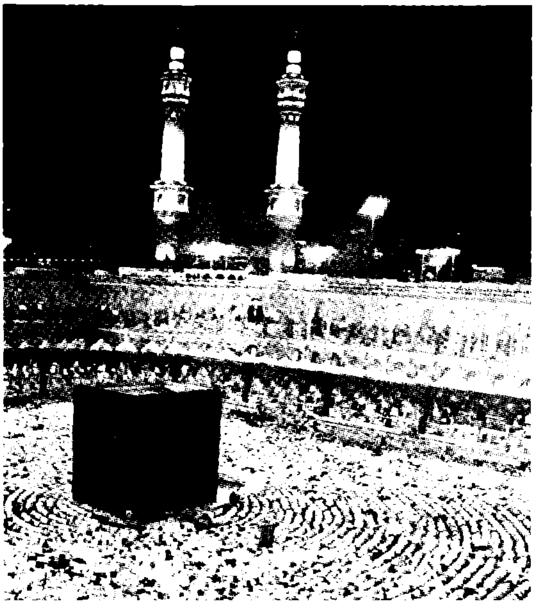

www.pathagar.com

সুযোগ হয় পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের। ইবরাহিম (আ.)(দ্র)-এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) মক্কা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের আদিপুরুষ বলে জানা যায়। তাঁরই বংশোদ্ভুত শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স.)। তিনি জন্মগ্রহণ করেন এই মক্কা নগরীতেই।

মু. মা.

মখদুম শাহদৌলাহ্

বিখ্যাত কামেল দরবেশ, পীর, ইসলামপ্রচারক। জানা যায়, ইয়েমেন দেশ থেকে আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি ইসলাম ধর্ম (দ্র) প্রচারের উদ্দেশ্যে শিষ্য-সাগরিদসহ বাংলাদেশে আগমন করেন।

কথিত আছে, তিনি ইয়েমেনের রাজপুত্র ছিলেন। পরে রাজ-পরিবারের সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে তিনি দরবেশের জীবন গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন।

মখদুম শাহদৌলাহ্ পাবনা (বর্তমান সিরাজগঞ্জ) জেলার সাজাদপুরে (দ্র) আস্তানা স্থাপন ও ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা এখনো বিদ্যমান।

জানা যায়, ইসলাম প্রচার ও মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করার বিষয় নিয়ে স্থানীয় হিন্দু রাজার সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণতিতে সকল সঙ্গী-সাথীসহ তিনি নিহত হন। তাঁর মাজার সাজাদপুর মসজিদ-প্রাঙ্গণেই অবস্থিত।

মু. মা.

মঘাব্দ অব্দ দ্র

মঙ্গল

উজ্জ্বল রক্ত-লাল গ্রহ মঙ্গল পৃথিবীর (দ্র) নিকটতম প্রতিবেশী—দূরত্বের দিক থেকে সূর্যের (দ্র) চতুর্থ গ্রহ (দ্র)। মঙ্গল গ্রহের ব্যাস ৬,৭৮৭ কিলোমিটার—পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক। রোমানদের যুদ্ধদেবতা মার্স (Mars)-এর নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়েছে। মঙ্গলগ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের এক-তৃতীয়াংশ। আমরা পৃথিবীর বাসিন্দারা জোছনা রাতে আকাশের দিকে তাকালে একটি চাঁদ দেখতে পাই, কিন্তু মঙ্গল গ্রহের আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে দু'টি চাঁদ। এর অর্থ, মঙ্গল গ্রহের দু'টি উপগ্রহ রয়েছে। রোমানদের যুদ্ধদেবতা মার্স-এর দু'জন

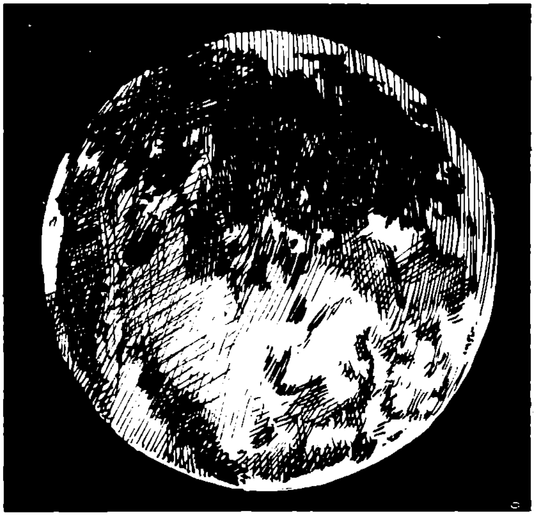

অনুচর ছিল। এক জনের নাম ফোবোস (Phobos) অর্থাৎ ভয় এবং অপর জনের নাম দেইমোস (Deimos) অর্থাৎ বিপ্লব। এদের নাম অনুসারে মঙ্গলের ভিতরের দিকের উপগ্রহটির নাম হয়েছে ফোবোস এবং বাইরের দিকেরটির নাম হয়েছে ডিমোস। ফোবোস পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে আয়তনে ছোট এবং মঙ্গলের খুবই নিকটে অবস্থিত। মঙ্গল গ্রহ প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে। এর আবর্তনের সময় পৃথিবীর চেয়ে মাত্র ৪১ মিনিট বেশি। তাই এই গ্রহের দিন-রাত্রির পরিমাণ পৃথিবীর দিন-রাত্রির প্রায় সমান। কিন্তু পৃথিবী যেখানে ৩৬৫ দিনে সূর্যকে এক বার ঘুরে আসে, সেখানে মঙ্গলের লাগে ৬৮৭ দিন। পৃথিবীর মতো মঙ্গল গ্রহেও বার্ষিক ঋতুচক্র আছে। সূর্য থেকে দূরে থাকার দরুন মঙ্গলের বিভিন্ন ঋতুর স্থিতিকাল পৃথিবীর চেয়ে বেশি। মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগেও পৃথিবীর মতো কতকগুলো বিশেষ ধরনের ভূমিরূপ রয়েছে; আরো রয়েছে আগ্নেয়গিরি, গিরিখাত ইত্যাদি। মঙ্গলগ্রহের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরির নাম অলিম্পাস্ মন্স (Olympus mons)। এর ব্যাস প্রায় ৬০০ কিলোমিটার আর উচ্চতা কমপক্ষে ২৬ কিলোমিটার। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলগ্রহের গিরিখাতগুলো অতি বিশাল ও গভীর। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল (দ্র) বেশিদূর পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। তা ছাড়া বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন (দ্র) ও পানির (দ্র) পরিমাণ খুবই কম। এর নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা ৩০°-৪০° সেলসিয়াস। উত্তরে ও দক্ষিণে

www.pathagar.com

তাপমাত্রা ক্রমশ কমে গেছে। রাতের বেলায় তাপমাত্রা −১৮০° সেলসিয়াসে নেমে আসে। পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন মহাকাশযানের সাহায্যে মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে। মেরিনার-৪, মেরিনার-৯, ভাইকিং-১, ভাইকিং-২ ইত্যাদি মহাকাশযান প্রেরণের পর সম্প্রতি 'পাথফাইণ্ডার' ১৯৯৭-এর ৪ঠা জুলাই মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করেছে। পৃথিবী থেকে একে পাঠানো হয়েছিল সাত মাস পূর্বে। মঙ্গল গ্রহের মাটি বিশ্লেষণ করে জানা গিয়েছিল, অক্সিজেনের সংস্পর্শে এর পাথরগুলোতে মরচে পড়ে গেছে। এ জন্যই মঙ্গল গ্রহকে লালচে দেখায়। মঙ্গল গ্রহের মাটির মধ্যে রয়েছে লোহা (দ্র), অ্যালুমিনিয়াম (দ্র), সিলিকন (দ্র), ক্যালসিয়াম (দ্র), গন্ধক (দ্র) ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ। পাথফাইণ্ডার মহাকাশযানে পাঠানো 'সোজার্নার' নামে ২২ পাউণ্ড ওজনের রোবট (দ্র) এই গ্রহটি সর্ম্পকে আরো বিশদ তথ্য পাঠাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সে. শা.

মঙ্গলকাব্য

বাংলা সাহিত্যে (দ্র) আদি ও মধ্যযুগে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এক রকম কাহিনী-কাব্য রচনা করা হত। এগুলোর নাম মঙ্গলগান বা মঙ্গলকাব্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আদি যুগ বলতে আনুমানিক ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ, মধ্যযুগ বলতে ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ এবং আধুনিক যুগ বলতে ১৮০০ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ধরা হয়। মধ্যযুগে এই মঙ্গলকাব্য ব্যাপকভাবে চর্চা করা হত।

মঙ্গলগানগুলোর মধ্যে মনসামঙ্গল (দ্র) প্রাচীন বলে মনে করা হয়। প্রাচীন কবিদের মধ্যে হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপ্‌লাই, রায়বিনোদ ও নারায়ণ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। হরিদত্ত মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি। চাঁদ সওদাগর-বেহুলা-লখিন্দর-মনসাদেবীর কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত। শতাধিক কবি এই বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। তাঁর মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র প্রসিদ্ধ। পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচলন বেশি।

মনসামঙ্গলের পরে চণ্ডীমঙ্গল (দ্র) কাব্য উল্লেখযোগ্য। মুকুন্দরামের (দ্র) চণ্ডীমঙ্গল রচনার ধারা অনুসরণ করে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে কবি ভারতচন্দ্র (দ্র) রায়গুণাকর রচনা করেন 'অন্নদামঙ্গল' (দ্র) কাব্য। ভারতচন্দ্রকে মধ্যযুগের শেষে কবি বলা হয়। তিনি এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

মঙ্গলকাব্যের একটি প্রধান শাখা ধর্মমঙ্গল (দ্র)। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য অবলম্বন করে এই কাব্য রচিত। এই ধারার আদি কবি ময়ূরভট্ট (পঞ্চদশ শতক)। এই কাব্যে বৌদ্ধ (দ্র), জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্মের (দ্র) মিলিত প্রভাব আছে।

মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন তিনটি শাখা। এর অনুসরণে বহু লৌকিক দেবদেবী নিয়ে কাহিনী-কাব্য রচিত হয়। সেগুলো হল কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, কপিলামঙ্গল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর (দ্র) কাব্য বিখ্যাত রচনা। রায়মঙ্গল রচিত হয়েছে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য নিয়ে। এর মধ্যে কুম্ভীরদেবতা এবং পীর বড় খাঁ গাজীর মহিমাও বর্ণিত হয়েছে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর (দ্র) একটি কাব্য আছে 'সারদামঙ্গল' নামে, কিন্তু 'মঙ্গল' নাম থাকলেও তা মঙ্গলকাব্য নয়।

বি. ব.

মজনু শাহ [? —১৭৮৭]

ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে তাদের সীমাহীন অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সৃষ্ট ফকির ও সন্ন্যাসী (দ্র) বিদ্রোহের অন্যতম অধিনায়ক। জন্ম ভারতের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালিয়র এলাকার মেওয়াত নামক স্থানে।

বর্তমানে বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পূর্বে তিনি বিহার ও অযোধ্যার সীমান্তবর্তী মাখনপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

মজনু শাহ ফকিরদের সংঘবদ্ধ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিহারের পূর্ণিয়া ও উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর, কোচবিহার, বগুড়া, পাবনা এবং মাঝে মাঝে ময়মনসিংহ ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়

www.pathagar.com

পর্যন্ত অভিযান চালাতেন। তাঁর কর্মকাণ্ডে স্থানীয় কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়ের অনেকের সহযোগিতা লক্ষ করার মতো। বিদ্রোহীদের সশস্ত্র এইসব অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল কোম্পানির কুঠি, রাজস্ব-তহবিল এবং অত্যাচারী জমিদারশ্রেণীর অনাচারী কর্মচারীবৃন্দ। ফকির ও সন্ন্যাসীবিদ্রোহের সূচনা যদিও ১৭৬৩ সালে ঢাকাস্থ ইংরেজ কুঠি আক্রমণের মধ্য দিয়ে, তবু ব্যক্তিগতভাবে এই বিদ্রোহ পরিচালনায় মজনু শাহ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৭৭৬ সালের ১৪ই নভেম্বর, ১৭৮৩ সালের জানুয়ারি ও ১৭৮৬ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে মজনু শাহের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর বড় ধরনের সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় এবং এতে বেশ কয়েক জন ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ পর্যন্ত হতাহত হন। মজনু শাহের ভয়ে এই সময় বঙ্গদেশের বেশ কয়েকটি এলাকার অত্যাচারী জমিদার ও বড় বড় ভূস্বামী তাঁদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

১৭৮৬ সালের ২৯শে ডিসেম্বর মজনু শাহ তাঁর পাঁচ শত অনুচরসহ বগুড়া জেলার মুঞ্জরা নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই সংবাদ পেয়ে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট ব্রেনান তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। অবশেষে কালেশ্বর নামক স্থানে তাঁরা মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ইংরেজ সেনাদল একসময় মজনুর বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। উপস্থিত বিপদের মুখে মজনু শাহ স্বয়ং তাঁর দলবল-সহ শত্রুসেনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে তাঁদের বেষ্টনী ভেদ করে পালাতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধে মজনুর বহু সৈন্য হতাহত হয়। তিনি নিজেও গুরুতভাবে আহত হন।

এর পর বহু কষ্টে আহত মজনু শাহকে নিয়ে আসা হয় মাখনপুরের জিন্দাশাহ মাদারের দরগায়, তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্রে। এখানেই ১৭৮৭ সালের মার্চ অথবা মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তাঁর মৃতদেহ তাঁর জন্মভূমি মেওয়াতে নিয়ে সমাহিত করা হয়।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য মুসা শাহ, পরাগল শাহ, করম শাহ ও সোবহানী শাহ আরো কয়েক বছর পর্যন্ত (১৮০০ খ্রি.) ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধ তাঁদের লড়াই অব্যাহত রাখেন।

আ. হ.

মটর

প্যাপিলিওনেসি (Papilionaceae) পরিবারভুক্ত ছোট লতা জাতীয় বর্ষজীবী বীরুৎ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *পাইসাম্ অ্যারেন্স*, এল *(Pisum Arrense. L)* /বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে মটরের চাষ হয়। তবে উত্তরাঞ্চলে এর চাষ বেশি। বড় মটর বা কাবুলি মটর *পাইসাম্ স্যাটাইভাম্*, লিন্ *(Pisum Sativ, Linn)* দেশের নানান জায়গায় চাষ করা হয়ে থাকে।

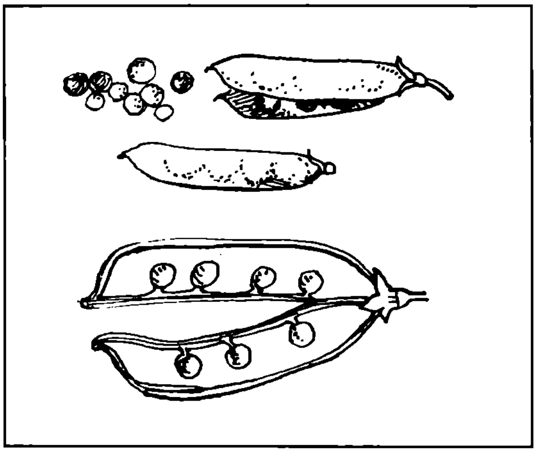

যেসব উদ্ভিদের দুর্বল কাণ্ড কোনো অবলম্বনকে বেষ্টন করে ওপরে ওঠে সেগুলো রোহিণী নামে পরিচিত। মটর গাছের কাণ্ড, পাতা বা পাতার অংশবিশেষ আঁকশিতে পরিণত হয় এবং সেই আঁকশি দিয়ে অবলম্বনকে পেঁচিয়ে ধরে ওপরে ওঠে।

মটরের ডাল প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। তবে এ ডাল কিঞ্চিৎ গুরুপাক। প্রতি ১০০ গ্রাম মটর ডাল থেকে ২৮৫–৩০৫ ক্যালোরি উত্তাপ পাওয়া যায়। মটর ডালে যে প্রোটিন থাকে তার শতকরা ৪৮ ভাগ আমাদের শরীর গ্রহণ করতে পারে। মটর ডালে প্রচুর ভিটামিন 'বি' ও নানা ধরনের খনিজ দ্রব্য থাকে। ইংরেজিতে মটরকে garden pea বলে।

শরীরে ঘামাচি দেখা দিলে মটর ডাল ভাল করে বেটে গায়ে মাখলে তা সেরে যায়। এর ফলে গায়ের চুলকানিও কমে।

মু. আ.

www.pathagar.com

মণি সিং, কমরেড [১৯০১—১৯৯০]

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা। তাঁর নাম মণি সিংহ হলেও তিনি মণি সিং নামে পরিচিত। জন্ম বর্তমান নেত্রকোণা জেলার সুসং-এর এক সম্ভ্রান্ত সামন্ত পরিবারে, ১৯০১ সালে।

মণি সিং উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ না করলেও স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত ছিলেন।

কৈশোরেই তিনি সন্ত্রাসবাদী 'অনুশীলন' (দ্র) দলে যোগ দেন। ১৯২৫ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথ ছেড়ে মার্ক্সবাদে (দ্র) বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

আন্দোলন করার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৯৩৫ সালে তাঁর জন্মস্থান সুসং-এ নজরবন্দি করে রাখলে জীবনে প্রথম তিনি কৃষকদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে ব্যাপৃত হন।

১৯৪৫ সালে নেত্রকোণায় ঐতিহাসিক নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠানে মণি সিংয়ের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৭ থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের (১৯৪৮) টংক-প্রথা-বিরোধী আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলন সহ চল্লিশ দশকের প্রায় সব ক'টি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে মণি সিংয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। এসব কারণে ১৯৪৮ সালে মুসলিম লীগ (দ্র) সরকারের পুলিশবাহিনী তাঁর সুসং-এর বাড়িঘর জ্বালিয়ে ধূলিসাৎ করে দেয় এবং তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে তিনি আত্মগোপন করেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (দ্র) রাষ্ট্রের জন্ম হলে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে নতুন করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে ৯ জনকে নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন মণি সিং। প্রায় দুই দশককাল আত্মগোপন থাকার পর ১৯৬৭ সালে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি চট্টগ্রাম থেকে পুনরায় গ্রেফতার হন এবং তাঁকে রাজশাহী কারাগারে প্রেরণ করা হয়। সহবন্দি কয়েদিদের সহায়তায় কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি ভারতে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করার জন্য যে 'জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি' গঠিত হয়, মণি সিং ছিলেন তার অন্যতম সদস্য।

তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (দ্র) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ বেশ কয়েক বার সম্পাদক ও সভাপতি মনোনীত হন। ১৯৮৬ সালের পর থেকে তিনি শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

মণি সিং মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯০ সালে ৩১শে ডিসেম্বর, ঢাকায়।

আ. হ.

মণিপুরী

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য। প্রধান চারটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার অন্যতম। অপর তিনটি নৃত্যধারা হচ্ছে : ভরতনাট্যম (দ্র), কথাকলি (দ্র), কথক (দ্র)। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্য রাজ্য মণিপুরে উদ্ভূত বলে স্থাননাম অনুসারে এর নাম মণিপুরী হয়েছে। মণিপুর অঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল থেকেই নৃত্যকলার বিকাশ ঘটে। সেই সব প্রাচীন নৃত্যের ভিত্তিতেই শাস্ত্রসম্মত মণিপুরী নৃত্যের উদ্ভব।

প্রাচীন মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে থাবল চোংবি ও লাইহারউবা প্রধান। এদের চেয়ে বয়সে কিঞ্চিৎ নবীন নৃত্য হচ্ছে রাস। এই তিন ধারার ভিত্তিতে, তবে প্রধানত রাস নৃত্য অবলম্বনে বর্তমানে মণিপুরী নৃত্য গঠিত। মণিপুরের রাজা চিং সাঙ খম্বা বা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ (রাজত্বকাল : ১৭৬৪-১৭৮৯ খ্রি.) এই নৃত্যধারার প্রধান প্রবর্তক। তাঁর কন্যা বিম্ববতী ছিলেন এই নৃত্যের প্রধান প্রচারক। রাজা

www.pathagar.com

ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ 'গোবিন্দসঙ্গীত লীলাবিলাস' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন ও সেখানে তিনি নৃত্যের আঙ্গিক, পদ্ধতি, পোশাক, সঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই গ্রন্থই মণিপুরী নৃত্যের তত্ত্বগত ভিত্তি রচনা করে।

মণিপুরে নৃত্য একটি পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে সম্পন্ন হয়। সর্বপ্রথম নৃত্যস্থলী প্রস্তুত করা হয়। তারপর পবিত্র জল ছিটিয়ে তাকে শুদ্ধ করা হয়। এর পর সেখানে হয় কীর্তন (দ্র) গান। শ্রীচৈতন্য-বন্দনা, রাজা ভাগ্যচন্দ্রের প্রশংসা, বৃন্দাবন বর্ণনা প্রভৃতি হয় কীর্তনের বিষয়। কীর্তন শেষে সেখানে নৃত্যের আয়োজন করা হয়। নৃত্যস্থলীর পাশে থাকেন গায়ক ও বাদকদল। নর্তক-নর্তকীরাও গেয়ে থাকেন।

শুরু হয় রাসনৃত্য বা রাস নৃত্যনাট্য। এর প্রধান চরিত্র হচ্ছে কৃষ্ণ, রাধা ও দ্বাদশ গোপী। এঁরা রাধার সখী। প্রথম প্রবেশ করেন কৃষ্ণরূপী নর্তক। তিনি দ্রুত পায়ের কাজ করে নাচেন। কৃষ্ণ হঠাৎ দেখতে পান যে রাধা আসছেন। তখন তিনি রাধাকে ছলনা করার জন্য লুকিয়ে পড়েন। এই অংশের নাম কৃষ্ণ অভিসার। তখন রাধারূপী নর্তকী নৃত্যস্থলে প্রবেশ করে কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকেন। এর নাম রাধা অভিসার। এর পর আসেন গোপী বৃন্দা। তিনি নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের আহ্বান জানান। তখন রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটে। তখন গোপীরূপী নর্তকীদের সবাই নৃত্যস্থলে প্রবেশ করেন ও রাধা, কৃষ্ণ ও গোপীগণ মিলে সম্মেলক রাসনৃত্য পরিবেশন করেন। মিলনের পর গোপীরা রাধা-কৃষ্ণকে তাঁদের প্রণাম জানিয়ে নৃত্য করেন। এর নাম কুরুম্বাপেরেঙ। এর পরে গোপীরা পরস্পর কাঁধে হাত রেখে রাধা-কৃষ্ণকে মাঝখানে রেখে বৃত্তাকারে নৃত্য করেন। তখন দ্রুত লয়ে সমবেত কণ্ঠে গান গাওয়া হয় ও করতাল বাজানো হয়। এর পরে আসে গোপীদের প্রার্থনামূলক নৃত্য। পরবর্তী পর্যায় নৃত্যভঙ্গিতে আবীর খেলা। রাত শেষে ভোরবেলা কৃষ্ণের আরতি সহযোগে নৃত্য সমাপ্ত হয়। নৃতশিল্পীরা তখন প্রদীপ নিয়ে নৃত্য করেন ও শ্রোতা-দর্শকেরা অগ্নিশিখা থেকে হাত বাড়িয়ে তাপ নেন। শঙ্খ বাজিয়ে রাসনৃত্য সমাপ্ত করা হয়।

মণিপুরী মধুর ভঙ্গির বা লাস্যপ্রধান নৃত্য। তবে এতে তাণ্ডবেরও ব্যবহার আছে। অভিনয় এর একটি বিশেষ অংশ। সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ প্রভৃতি ভঙ্গির ব্যবহার ঘটতে দেখা যায় এখানে। মণিপুরীর একটি প্রধান উপাদানের নাম চালি। মণিপুরী নৃত্যের প্রধান মুদ্রার নাম কুরুম্বা বা নমস্কার জানানোর মুদ্রা। সকল নৃত্যই কুরুম্বা সহযোগে সমাপ্ত হয়। তা ছাড়া থাকে ২৫ প্রকার অসংযুক্ত ও ১২ প্রকার সংযুক্ত হস্ত। মণিপুরী নৃত্যের পোশাক অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। রাজা ভাগ্যচন্দ্রই এই পোশাকের প্রবর্তক। এই নৃত্যে কণ্ঠ ও যন্ত্রাসঙ্গীতের স্থান খুবই প্রশস্ত। তাল প্রয়োগের বিষয়টি এখানে যথেষ্ট জটিল। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে তালের বিস্তার করা হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) মণিপুরী নৃত্যের প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি বিশ্বভারতী (দ্র)-তে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করলে সেখানকার দৃষ্টান্তে ভারতের নানা সঙ্গীতকেন্দ্রে মণিপুরীর প্রতিষ্ঠা ঘটে। রবীন্দ্রনৃত্যধারা নামে পরিচিত যে বিশিষ্ট নৃত্যধারার তিনি প্রচলন করেন তাতেও মণিপুরীর প্রভাব গভীর।

ক. গো.

মতিউর রহমান, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বীরশ্রেষ্ঠ দ্র

মতিউর রহমান মল্লিক, শহীদ [১৯৫৭—১৯৬৯]

শহীদ কিশোর মতিউর রহমান মল্লিকের জন্ম ১৯৫৭-র

www.pathagar.com

২৪শে জানুয়ারি। পিতার নাম আজহার আলী মল্লিক। ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র মতিউর। কৈশোর থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁকে আকর্ষণ করেছে। ১৯৬৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি থেকে তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিভিন্ন মিছিলে তিনি যোগ দেন।

অকুতোভয় এই কিশোরকে বার বার মিছিলের পুরোভাগে দেখা গেছে। ঊনসত্তরে ছাত্র-জনতার এক বিরাট মিছিল সচিবালয়-ভবন ঘিরে ফেলার পর ছাত্র-জনতার সঙ্গে শুরু হয় সশস্ত্র পুলিশ আর ই পি আর (EPR = ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্) বাহিনীর সংঘর্ষ। এ সময় আবদুল গণি রোড দিয়ে ছাত্র-জনতার আরেকটি মিছিল পুলিশ ও ই পি আর বাহিনীর বাধা অগ্রাহ্য করে পল্টন ময়দানের (বর্তমান স্টেডিয়াম) দিকে এগুতে থাকে। সে সময় সশস্ত্র পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন বারো বছরের কিশোর মতিউর। সমগ্র শহর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দুপুরে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পল্টন ময়দানে। সেখান থেকে মিছিল জমায়েত হয় ইকবাল হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) মাঠে। এ-জমায়েতে বক্তৃতাকালে শহীদ মতিউরের পিতা বলেন, 'এক মতিউরকে হারিয়ে আজ আমি হাজার মতিউরকে পেয়েছি।' এই মিছিল আর জমায়েত থেকেই '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের (দ্র) সূচনা। প্রতি বছর ২৪শে জানুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশে এই দিনটি 'গণ-অভ্যুত্থান দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (দ্র) চত্বরে এই কিশোর শহীদের নামে স্থাপিত হয়েছে শহীদ মতিউর মঞ্চ। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া (৯ই মাঘ, ১৩৯৮/২৩শে জানুয়ারি, ১৯৯২) এই স্মৃতি-মঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

হা. র.

মৎস্যকন্যা

মৎস্যকন্যার কাহিনী ইউরোপের (দ্র) মাঝিমাল্লাদের ভিতরে সুদূর অতীত কাল থেকে প্রচলিত। কথিত আছে, মৎসকন্যার দেহের উপরিভাগ মেয়েদের মতো আর নিচের অংশ মাছের মতো। গ্রিক্ পুরাণেও অনুরূপ প্রাণীর কথা আছে, তার নাম সাইরেন্। তবে, বলাই বাহুল্য এ সবই কল্পনা; বাস্তবে মৎস্যকন্যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

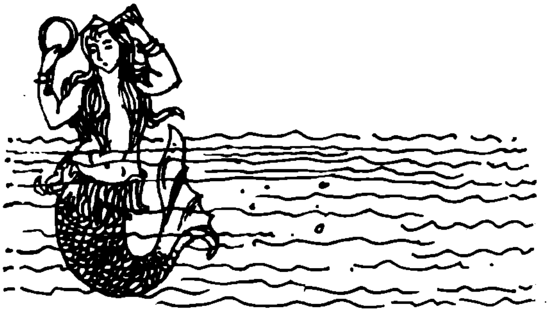

রূপকথার জাদুকর হান্স্ ক্রিস্টিয়ান্ এণ্ডার্‌সেন্ (দ্র)-এর লেখা বিখ্যাত একটি গল্পের নাম 'ছোট্ট মৎস্যকন্যা'। এণ্ডার্‌সেনের প্রতি সম্মানবশত ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন বন্দরনগরীর জাহাজঘাটার অদূরে সমুদ্রের মধ্যে বিশাল শিলাখণ্ডের উপরে মৎস্যকন্যার বিষণ্ণ মূর্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে।

হা. মা.

মথ (moth)

লেপিডোপ্টেরা (Lepidoptera) বর্গের পতঙ্গ। প্রজাপতি ও মথ দুই-ই এই বর্গে পড়ে। এই বর্গের প্রজাতি সংখ্যায় প্রায় ১ লক্ষ। সারা পৃথিবী জুড়ে এরা ছড়িয়ে রয়েছে। পরিণত অবস্থায় এদের দু' জোড়া আঁশ-মোড়ানো পাখা থাকে। এদের পাখা রঙিন এবং খুব সুন্দর নকশাযুক্ত। এরা নানান আকার-প্রকারের হয়। এদের জীবনচক্র চারটি পর্যায়ে বিভিক্ত—ডিম, লার্ভা (ক্যাটারপিলার), পিউপা এবং পরিণত পর্যায়। শূককীট (যাকে আমরা সাধারণত শুঁয়োপোকা বলি) বা ক্যাটারপিলার সাধারণত গাছের পাতা খেয়ে বাঁচে। কোনো কোনো প্রজাতির শূককীট শস্যের প্রচুর ক্ষতি করে।

www.pathagar.com

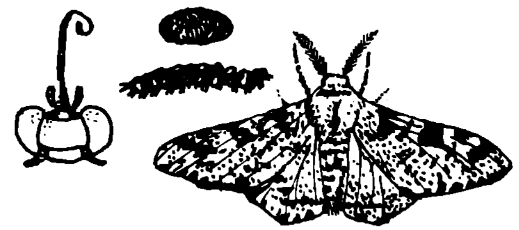

কতকগুলি প্রজাতির মূককীট বা পিউপা চারদিকে এক রকম জাল বানিয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখে (যেমন—রেশম তৈরির গুটিপোকা)। এরা সাধারণত ফুলের রস আর পাতার রস খেয়ে বাঁচে। মথের সামনের এবং পেছনের পাখা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এরা সাধারণত রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায় এবং বিশ্রামের সময় পাখা ছড়িয়ে বসে। প্রজাপতির অ্যান্টেনা মসৃণ, কিন্তু মথের অ্যান্টেনা শুঁয়োযুক্ত।

সা. এ.

মদিনা

'মদিনা' শব্দের অর্থ শহর। এ ক্ষেত্রে মদিনা হচ্ছে আরব দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী। মদিনার প্রাচীন নাম ইয়াছরিব।

প্রাচীন কাল থেকেই মদিনা ছিল অত্যন্ত উর্বর, ফলে-ফুলে সুশোভিত, নানা প্রকার কৃষিজাত পণ্যের সমারোহে সমৃদ্ধ এক শান্তিপূর্ণ জনপদ। এই জনপদ ক্রমে একটি সুন্দর নগরীর রূপ লাভ করে।

ইসলাম ধর্মের (দ্র) অভ্যুদয়ের পর, বিশেষ করে হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর মক্কা (দ্র) থেকে হিজরত (দ্র) করে মদিনায় গমনের পর মদিনার গৌরব ও সুনাম বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বস্তুত ইসলাম এবং মুসলমানদের উত্থানের সঙ্গে মদিনা ও তার অধিবাসীদের (যারা 'আনসার' বা সাহায্যকারী নামে পরিচিত) নাম ঐতিহাসিক সূত্রে বাঁধা। মদিনাই ছিল তখন মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী।

এখানে 'মসজিদুন নববী' বা নবীর মসজিদ অবস্থিত। হযরত মুহম্মদ (স.) এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এ কারণে মক্কার মতো মদিনাও সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার নিকট পবিত্রস্থান হিসাবে গণ্য হয়।

মু. মা.

মধু

ফুলের সুধারস থেকে মৌমাছি (দ্র) যে ঘন মিষ্টি তরল পদার্থ তৈরি করে তার নাম মধু। ফুলের সুধারস পাতলা পানির মতো। ফুলে ফুলে ঘুরে মৌমাছি এ রস সংগ্রহ করে। প্রতিটি কর্মী মৌমাছির শরীরে একটি থলি থাকে। এর নাম মধুথলি। এখানে ফুলের সুধারস জমা হয়। থলির ভিতরে নিঃসৃত এনজাইমের (দ্র) ক্রিয়ার ফলে সুক্রোজ ভেঙে গ্লুকোজ (দ্র) এবং ফ্রুক্টোজ (দ্র) তৈরি হয়। মৌচাকের খোপে খোপে এটা জমা থাকে। পানি উবে যাওয়ায় মধু ঘন হয়। এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে এর স্বাদ-গন্ধও পাল্টে যায়। কোন ধরনের ফুল থেকে সুধারস সংগ্রহ করা হয়েছে তার ওপর মধুর স্বাদ-গন্ধ অনেকখানি নির্ভরশীল। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি চাষ করে মধু উৎপাদন করা হয়।

প্রাচীন কালে মধু একটি প্রিয় মিষ্টদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হত। টেবিলের ওপর এক ভাণ্ড মধু গৃহস্থের ধন-সম্পদের ও প্রাচুর্যের প্রতীকরূপে বিবেচিত হত। মিসরীয়রা মমি তৈরির জন্য সম্ভবত মধু ব্যবহার করত।

সকল মধুই ফ্রুক্টোজ, গ্লুকোজ, জৈব অ্যাসিড, খনিজ লবণ, ভিটামিন (দ্র) এবং উদ্ভিদরঞ্জকের এক জটিল মিশ্রণ। এটা একমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্য যা বিশুদ্ধ করার দরকার হয় না। শক্তি যোগানোর জন্য মধু একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

মধু আর্দ্রতাকে শোষণ ও ধারণ করতে পারে। বেকারিতে খাদ্যদ্রব্য তরতাজা রাখার জন্য মধু ব্যবহার করা হয়। মৃদু অম্লতার জন্য মধু একটি ভাল জীবাণুনাশক। বিভিন্ন ঔষধ তৈরির জন্য মধু ব্যবহৃত হয়।

সা. এ.

মধু পূর্ণিমা ভাদ্র পূর্ণিমা / মধু পূর্ণিমা দ্র

www.pathagar.com

মধুসূদন দত্ত, মাইকেল [১৮২৪—১৮৭৩]

বাংলা সাহিত্যের (দ্র) প্রথম আধুনিক কবি ও নাট্যকার। সে জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্গাতা বলে খ্যাত। বাংলা কাব্যে তিনিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন।

মধুসূদন ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। পিতা বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন।

সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঠশালায় মধুসূদনের বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। তারপর কিছুকাল কলিকাতার খিদিরপুর স্কুলেও তিনি পড়াশোনা করেন। তিনি ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুলে ভর্তি হন; ১৮৪১ সালে কলেজের সিনিয়র বিভাগে প্রবেশ করেন। মেধাবী ও কৃতিছাত্ররূপে তাঁর সুনাম ছিল। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন।

ছাত্রজীবনেই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি মধুসূদনের তীব্র অনুরাগ জন্মায় এবং পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রতি তিনি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। ফলে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যসাধনাকে তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ইংরেজিতে কাব্যচর্চা শুরু করেন। দেশের বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশ হতে থাকে। এ সময় তাঁর মনে বিলেত গমনেরও প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে।

১৮৪৩ সালে ৯ই ফেব্রুয়ারি মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম (দ্র) গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নামে 'মাইকেল' কথাটি যুক্ত হয়। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার কারণে তাঁকে হিন্দু কলেজ ছাড়তে হয়। তিনি শিবপুরস্থ বিশপ্‌স্ কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। এসময় তিনি গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন।

১৮৪৮ সালে মধুসূদন জীবিকার অন্বেষণে মাদ্রাজ গমন করেন। সেখানে প্রথমে তিনি এক অনাথ আশ্রমে শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। পরে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও মাদ্রাজের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা Spectator–এর সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। এ সময় মাদ্রাজের বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় ইংরেজি ভাষায় তাঁর বহু প্রবন্ধ এবং ১৮৪৯ সালে 'The Captive Ladie' ও 'Visions of the Past' নামে দু'টি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

মাদ্রাজে মধুসূদন রেবেকা নাম্নী এক ইংরেজ গোলন্দাজ সৈন্যের অনাথা কন্যার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু পরে এই বন্ধন ছিন্ন হলে এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া নামে আরেক ইংরেজ মহিলা তাঁর ঘরনী হন। প্রসঙ্গত হেনরিয়েটা ফরাসি ছিলেন বলে অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে।

১৮৫৬ সালে মধুসূদন কলিকাতায় ফিরে আসেন। এখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে বহু বিচিত্র পেশা গ্রহণ করতে হয়। প্রথমে পুলিশ আদালতের করণিক ও পরে তিনি দোভাষীরূপে চাকুরি করেন। ১৮৬২ সালে তিনি কিছুকাল 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা সম্পাদনারও কাজ করেন। এ বছর পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তাঁর বেশকিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটে এবং তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যান। ১৮৬৩ সালে তিনি সপরিবারে ফ্রান্স গমন করেন। সেখানে তিনি অর্থাভাবে তীব্র সঙ্কটে পড়েন। এ বিপদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (দ্র) তাঁকে অর্থসাহায্য করেন। ১৮৬৬ সালের শেষ দিকে তিনি লণ্ডনের গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসেই দেশে ফিরে আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

মধুসূদন দত্ত নাট্যকার হিসাবেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পদার্পণ করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী নাটক'-এর ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব বোধ করেন। তাই ১৮৫৯ সালে তিনি রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা নাটক'—এটিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক। ১৮৬০ সালে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন–'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং পূর্ণাঙ্গ 'পদ্মাবতী নাটক'। পদ্মাবতী নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। ১৮৬০ সালেই তিনি অমিত্রাক্ষরে লেখেন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। এরপর একে একে রচিত হয় 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) নামে মহাকাব্য, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা

www.pathagar.com

কাব্য' (১৮৬২), 'চতুর্দশপদী কবিতা' (১৮৬৬)।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। এটি বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী সম্পদ। এর অনন্য ভাষাভঙ্গি, ছন্দরীতি ও কাব্যশৈলীর জন্য মধুসূদন স্মরণীয় হয়ে আছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে তিনি বাংলায় যে ছন্দ প্রবর্তন করেছেন, তা বাংলা কবিতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। তিনিই বাংলায় প্রথম সনেট (দ্র) রচনা করেন এবং তার নাম দেন 'চতুর্দশপদী'।

মধুসূদনের শেষ জীবন চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আইন ব্যবসায়ে তিনি তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তা ছাড়া অমিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েন। ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

মধ্যপ্রাচ্য

এশিয়া (দ্র), আফ্রিকা (দ্র) ও ইউরোপের (দ্র) মিলনস্থানের কয়েকটি দেশ নিয়ে গঠিত অঞ্চল। এর সঠিক আঞ্চলিক সীমারেখা টানা সম্ভব না হলেও দেশগুলোর মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে গভীর ঐক্য আছে। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির মধ্যেও মিল রয়েছে।

১৯০২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিদ্যা বিষয়ক লেখক আলফ্রেড মাহান (Alfred Mahan) 'মধ্যপ্রাচ্য' শব্দটি ভারতে প্রবেশের পশ্চিম ও উত্তর দ্বার হিসাবে ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য বলতে অনেকগুলো দেশকে বোঝায়। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য বলতে চারটি গুচ্ছদেশকে বোঝায়— ১. উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা—মিশর ও লিবিয়া; ২. উর্বর ক্রিসেন্ট দেশসমূহ—সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইরাক ও ইসরায়েল; ৩. আরব উপদ্বীপের দেশসমূহ—সৌদি আরব, ইয়েমেন, কুয়েত, বাহারাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান; ৪. উত্তরের রেঞ্জ—তুরস্ক ও ইরান। এই এলাকা আনুমানিক ৯০ লক্ষ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা (১৯৭৮ সালে) ১৬ কোটি।

মাঝে মাঝে সুদান, আফগানিস্থান, পাকিস্তান, গ্রিস, সাইপ্রাস, রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহকেও এই এলাকার মধ্যে বিবেচনা করা হয়। ৭ম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের সময় মধ্যপ্রাচ্য আরব-মুসলিম সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে। এ সময় উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের রাজত্বের যুগ। আধুনিক কালে 'ইসলামী বিশ্ব'–ধারণার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য যুক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই অঞ্চলের গুরুত্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। ১৯৭০ সালের দিক থেকে এই অঞ্চল তৈলসমৃদ্ধ দেশরূপে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক এলাকা হয়ে ওঠে।

বি. ব.

মধ্যযুগ

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে 'মধ্যযুগ' বা Middle Ages নামটি প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন রেনেসাঁসের (দ্র) মানবতাবাদী পণ্ডিতেরা। এ যুগের শুরু রোম সাম্রাজ্যের পতন থেকে, তাঁদের নিজেদের কাল পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। মোটামুটিভাবে ধরা হয় যে ৪১০ খ্রিস্টাব্দে রোমের পতনের সঙ্গে প্রাচীন যুগ শেষ হয়ে গেল আর আধুনিক যুগ শুরু হল ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে থেকে। এ নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু তর্কবিতর্ক রয়েছে। তাঁদের অনেকে বলেন ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'মধ্যযুগ' ধরা উচিত। যাই হোক, মধ্যযুগের সময়কাল প্রায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত, ভাবা চলে। সভ্যতার ইতিহাস আলোচনায় 'মধ্যযুগ' সম্পর্কে পঠনপাঠন এ কারণে খুবই জরুরি যে নানান দিক থেকে ইউরোপীয় সভ্যতার সবচেয়ে ঘটনাবহুল, বিচিত্র ও উল্লেখযোগ্য সময় হচ্ছে তখন এবং ঐ সময়েরই বহু চরিত্রলক্ষণ পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হতে-হতে 'আধুনিক কাল' শুরু হয়।

এখানে বলা দরকার যে, ইউরোপের মধ্যযুগ পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু মধ্যযুগ বলে বিবেচিত হয় না, যেমন–ভারতবর্ষ কিংবা বঙ্গদেশের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে অন্য সময় বুঝে থাকি আমরা।

হা. মা.

মনসামঙ্গল

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল প্রাচীনতম। সাপের দেবী

www.pathagar.com

মনসার পূজা প্রচারের কাহিনীই এই কাব্যের বিষয়বস্তু। চৈতন্যপূর্ববর্তী কালেই মনসামঙ্গলের কয়েক জন কবির কথা জানা যায় যাঁদের কাব্য সমগ্র বাংলায় ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস এবং নারায়ণ দেব। হরিদত্তকে মনসামঙ্গলের আদি কবি বলে মনে করা হয়। চৈতন্যপূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল কাব্যের সংখ্যা সর্বাধিক। চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর এবং মনসা দেবী কাব্যের মূল চরিত্র। চৈতন্যপরবর্তী কালের কবিদের মধ্যে রয়েছেন কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস।

মনসামঙ্গলের কাহিনী হচ্ছে : সাপের দেবী মনসা চায় অভিজাত সমাজে তার পূজা প্রচার হোক। এ কাজের জন্য সে চাঁদ সওদাগরকে বেছে নেয়। কিন্তু চাঁদ সওদাগর পুরুষকারে বিশ্বাসী। তার সাত ছেলে একে একে মনসার আক্রোশের শিকার হয়ে মারা যায়। চাঁদের স্ত্রী সনকা গোপনে মনসার পূজা করে। চাঁদ তা জানতে পেরে লাথি মেরে মনসার ঘট ভাঙে, লাঠি দিয়ে মনসার কোমর ভাঙে। চাঁদের ছোট ছেলে লখিন্দর। বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে হয়। বিয়ের রাতে লখিন্দর সাপের কামড়ে মারা গেল।

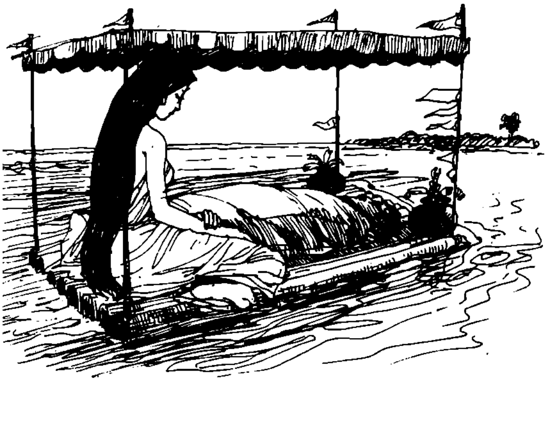

বেহুলা মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে যমপুরীতে যাত্রা করে ভেলায় চড়ে। যমপুরীতে গিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে সে মৃত স্বামী লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু তার বিনিময়ে মনসাকে কথা দিতে হয় যে সে ফিরে গিয়ে চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে মনসাপূজার ব্যবস্থা করবে। মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে ফিরে এলে চাঁদ সওদাগর পুত্রবধূ বেহুলার প্রতি মমতায় মনসাপূজা করে।

মে. খা.

মনসুর আলী, ক্যাপ্টেন এম. [১৯১৯—১৯৭৫]

রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও বাংলাদেশের এককালীন মন্ত্রী। তিনি ১৯১৯ সালে বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুরের কুড়িপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

এম. মনসুর আলী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন। এরপর আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি নিয়ে পাবনা জেলা বার-এ আইনজীবী হিসাবে পেশাগত জীবন শুরু করেন।

১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি পাবনা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি আওয়ামী লীগে (দ্র) যোগ দেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সাল এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি দলটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি আত্মগোপন করে ভারতে চলে যান এবং ঐ বছর ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে (দ্র) গঠিত বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন করে গঠিত মন্ত্রিসভায় এম. মনসুর আলী একাধিক বার মন্ত্রী এবং শেষে প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হলে এম. মনসুর আলী ২৩শে আগস্ট (১৯৭৫) গ্রেফতার হন এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কতিপয় সামরিক সদস্যের হাতে ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) নিহত হন।

আ. হু.

www.pathagar.com

মনসুর বয়াতী

ময়মনসিংহ-গীতিকা-খ্যাত কবি মনসুর বয়াতী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর জন্মতারিখ বা মৃত্যু-তারিখও জানা যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে তিনি ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। দীনেশচন্দ্র সেনের (দ্র) 'মৈমনসিংহ গীতিকা' (দ্র)-র ভূমিকা থেকে জানা যায় যে চন্দ্রকুমার দে যে গাথাসমূহ সংগ্রহ করেন তার একটির নাম 'দেওয়ানা মদিনা'। এই 'দেওয়ান মদিনা'রই লেখক মনসুর বয়াতী। যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিত্বশক্তি ছিল। করুণরস সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন পটু। 'দেওয়ানা মদিনা'র কাহিনী রোদনভরা। স্বামীর প্রতি মদিনার বিশ্বাস ছিল অগাধ। কিন্তু স্বামী ছিল চপলমতি ও অকৃতজ্ঞ। স্বামীর তালাকনামা পেয়েও তার ভালবাসা কমে নি, কিন্তু তার বিশ্বাস এতখানি ভেঙে গেল যে শোকাহত হৃদয়ে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল।

আ. হা.

মনস্তত্ত্ব (psychology)

মনস্তত্ত্ব মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান। মনস্তত্ত্ববিদগণ মানুষ ও প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে পাঠ ও গবেষণা করেন। তাঁরা শিক্ষা, চিন্তা, স্মৃতি, অনুভূতি, দর্শন, শ্রবণ, কথা—এরকম অনেক বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। মানুষের আচরণের মিল-অমিল, এক জন অন্য জনের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করে এগুলি তাঁদের লক্ষ করার বিষয়।

মনস্তত্ত্বের অনেক ভাগ রয়েছে, যেমন —

১. শিশু-মনস্তত্ত্ব : শিশুদের বড় হওয়া, লেখাপড়া শেখা, তাদের স্বভাব এবং আচরণের ক্রমপরিবর্তন নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়।

২. তুলনামূলক মনস্তত্ত্ব : প্রাণী এবং মানুষের বিভিন্ন আচার-আচরণের মধ্যে পার্থক্য এবং মিল খুঁজে বের করা এর লক্ষ্য। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষের আচরণের মধ্যেও তুলনা করা হয়।

৩. সমাজ-মনস্তত্ত্ব : একসঙ্গে বসবাসকারী লোকদের সম্পর্কে এ শাখায় আলোচনা করা হয়। বালক-বালিকারা বাসায় কেমন আচরণ করে, স্কুলে কিংবা খেলার মাঠে কেমন আচরণ করে, এসবই সমাজ–মনস্তত্ত্বের বিষয়। সমাজের আরো অনেক দিক নিয়ে এ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়।

৪. অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব : অন্যের সঙ্গে যাদের আচরণ স্বাভাবিক নয়, তাদের এরকম আচরণের কারণ নিয়ে এ শাখায় আলোচনা করা হয়। মানসিক রোগীর চিকিৎসার জন্য মনস্তত্ত্বের এ শাখাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৫. শারীরবৃত্তিক মনস্তত্ত্ব : বয়সের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আচরণের যে পরিবর্তন ঘটে, এ শাখায় সে-সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

এসব ছাড়াও মনস্তত্ত্বের আরো অনেক শাখা রয়েছে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে। অনেক মনস্তত্ত্ববিদ স্কুলের ছেলেমেয়েদের ওপর কাজ করেন। কারা কোন বিষয়ে পড়াশোনা করলে ভাল করবে কিংবা কেউ পড়াশোনায় ভাল ফল করতে পারছে না কেন, মনস্তত্ত্ববিদগণ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিয়োগ করার আগে প্রার্থীর মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীতে নিয়োগের আগেও প্রার্থীর প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করার ক্ষমতা কেমন তা জানার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

সা. এ.

মনিরউদ্দীন ইউসুফ [১৯১৯—১৯৮৭]

বিশিষ্ট অনুবাদক, কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানার জাওয়ারে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯১৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষা জাওয়ার, কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল ও ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে, পরে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পেশাগত জীবনে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক মুখপত্র 'কৃষি সমাচার'-এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৯ সালে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যের সব শাখাতেই মনিরউদ্দীন ইউসুফ বিচরণ করলেও অনুবাদক হিসাবেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি। ছয় খণ্ডে

www.pathagar.com

সমাপ্ত পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসীর (দ্র) 'শাহনামা'র (দ্র) বাংলায় অনুবাদকর্ম তাঁর বিশিষ্ট অবদান। তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : কবিতা—'উপনয়ন' (১৯৪১), 'রাত্রি নয় কলাপী ময়ূর নয়' (১৯৭৬); উপন্যাস—'ঝড়ের রাতের শেষে' (১৯৬২), 'ওর বয়স যখন এগারো' (১৯৮৫); প্রবন্ধ—'রুমীর মসনবী' (১৯৬৬), 'উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস' (১৯৬৮), 'বাংলা সাহিত্যে সুফী প্রভাব' (১৯৬৯); অনুবাদ—'ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন' (১৯৬০), 'দীওয়ান-ই-গালিব' (১৯৬৪); কিশোর সাহিত্য—'ছোটদের ইসলাম পরিচয়' (১৯৮৬) ও 'মহাকবি ফেরদৌসী' (১৯৮৮) ইত্যাদি।

অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। অন্যান্য পুরস্কার : গভর্নর স্বর্ণপদক (১৯৬৮), হাবীব ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৮), আবুল মনসুর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৫) এবং মরণোত্তর একুশে পদক (১৯৯৩)।

মনিরউদ্দীন ইউসুফ ১৯৮৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

মনে, ক্লোদ্ ইম্প্রেশনিস্ট আর্ট দ্র
মনোটাইপ মুদ্রণ দ্র

মনোরোগবিদ্যা (psychiatry)

ব্যক্তির মানসিক ও আচরণগত বৈকল্য অনুধাবন ও তার চিকিৎসা মনোরোগবিদ্যার অন্তর্গত। মন বলতে ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও ইচ্ছাপূরণের ক্রিয়া বোঝায়। সে হিসাবে চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছার স্বল্পতা, গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা মানসিক রোগের কারণ।

নাগরিক সভ্যতার দ্রুত বিকাশের ধারায় মানসিক রোগেরও বিস্তার ঘটছে। মানসিক রোগের কারণগুলো সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে চিহ্নিত করা যায়। প্রথা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, শ্রেণীসংঘাত, পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি, শিশুর লালন-পালনে ত্রুটি ইত্যাদি একাধিক কারণ মানসিক রোগের জন্ম দেয়। অবশ্য জীনগত ত্রুটির কারণেও মানসজড়তা সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানসিক প্রতিবন্ধীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এখন সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইসব কারণে দেহতন্ত্রের অন্যান্য রোগের পাশাপাশি মনোরোগের সংখ্যাও বেড়েছে, বেড়েছে এর চিকিৎসার গুরুত্ব। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মনোরোগবিদ্যা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। মনোরোগের চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরেনের ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে, যদিও আদর্শ ঔষধের সন্ধান এখনো মেলে নি। বরং চেষ্টা চলছে আধুনিক পদ্ধতিতে রোগের চেয়ে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রোগীর আবেগ-অনুভূতি ও উত্তেজনার ভুবনে প্রবেশ করে মনোরোগের চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতি সংযোজন করার।

আ. র.

মন্ময় ও তন্ময়

মন্ময় বা সাবজেক্টিভ রচনায় লেখক তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি, ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটান। তন্ময় বা অবজেক্টিভ রচনায় লেখক নৈর্ব্যক্তিকভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ও কল্পিত ঘটনাবলি তুলে ধরেন, নিজের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তাঁর চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্য দেন। তাই মন্ময় গীতিকবিতায় আমরা কবিতার 'আমি' বা কাব্যময় কথকের সঙ্গে কবিকে এক করে দেখার সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ লক্ষ করি। অন্য দিকে তন্ময় গীতিকবিতার বক্তা কথকের নিজের পরিবর্তে তাঁর উদ্ভাবিত বা কল্পিত ভিন্ন কোনো ব্যক্তির রূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' বা 'আমি চঞ্চল হে', কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' বা 'দারিদ্র্য' প্রভৃতি কবিতাকে আমরা মন্ময় রচনা বলে অভিহিত করতে পারি। ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের (দ্র) 'টিনটার্ন অ্যাবে', শেলির 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইণ্ড' প্রভৃতি মন্ময় রচনার সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' বা 'অভিসার', কাজী নজরুল ইসলামের 'ছাত্রদলের গান' বা 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' প্রভৃতি কবিতাকে আমরা তন্ময় রচনা বলে অভিহিত করতে পারি। ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে রবার্ট ব্রাউনিং (দ্র)-এর 'মাই লাস্ট ডাচেস', টি. এস. এলিয়টের (দ্র) 'লাভ সঙ্ অব জে. আলফ্রেড প্রুফ্রক' তন্ময় কবিতার সুপরিচিত দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে গীতিকবিতা (দ্র), জার্নাল, ডায়েরি (দ্র), স্মৃতিকথা প্রভৃতিকে মন্ময় রচনার এবং প্রবন্ধ (দ্র), নাটক (দ্র), ছোটগল্প (দ্র) ও উপন্যাসকে (দ্র) তন্ময় রচনার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। তবে কখনো কখনো লেখক মন্ময় ভঙ্গিতেও প্রবন্ধ রচনা করে থাকেন। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী (দ্র), সৈয়দ মুজতবা আলী (দ্র) ও মোতাহের হোসেন চৌধুরী (দ্র) বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট মন্ময় প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

ক. চৌ.

মমতাজ তাজমহল দ্র

মমি পিরামিড দ্র

মম্, উইলিয়াম সমারসেট্ [১৮৭৫–১৯৬৫]

উইলিয়াম সমারসেট মম্ (William Somerset Maugham) ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। জন্ম ২৫শে জানুয়ারি ১৮৭৫ সালে প্যারিসে, মৃত্যু ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে। প্রথম জীবনে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয় নাটক-রচয়িতা হিসাবে ইংল্যাণ্ডে খ্যাতি লাভ করেন। পরে গভীর অভিনিবেশ সহকারে গল্প-উপন্যাস রচনায় লিপ্ত হন এবং বিংশ শতাব্দীর অত্যন্ত জনপ্রিয়, সফলকাম ও বিত্তবান কথাশিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার, কিন্তু কখনো ডাক্তারি করেন নি। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নকালীন অভিজ্ঞতার কথা আছে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লিজা অব ল্যামবেথ'-এ (১৮৯৭)। তাঁর প্রথম সার্থক নাটক 'লেডি ফ্রেড্‌রিক' ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিরিশটির বেশি সার্থক নাটক লেখার পর ১৯৩০ সালে রচিত 'শেপ্পি' (Sheppy) নাম কুড়াতে না পারায় তিনি নাটক লেখা ছেড়ে দেন। তার পর উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি মানবচরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে এক অনুপম শৈলীর জন্ম দেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'অব্ হিউম্যান বণ্ডেজ' (Of Human Bondage) ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটি এক অসুখী তরুণের কাহিনী এবং আধাআত্মজীবনীমূলক রচনা। 'দ্য মুন অ্যাণ্ড সিক্স পেন্স' (১৯১৯) চিত্রশিল্পী পল্ গোগ্যাঁর জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস, 'দ্য পেইণ্টেড ভেইল' (১৯২৫), 'কেক্‌স অ্যাণ্ড এইল' (১৯৩০) ইত্যাদি তাঁর প্রধান রচনার অন্তর্গত। শেষের বইটিতে টমাস হার্ডি ও অন্যান্য সাহিত্য-মহারথীর উপর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। 'এশেনডেন' (১৯১৮) মমের প্রথম মহাযুদ্ধকালীন গোয়েন্দাবৃত্তির উপর রচিত বিখ্যাত গল্পগুচ্ছ। 'এ রাইটার্স নোটবুক' (১৯৪৯), 'দ্য ভেগ্রাণ্ট মুড' (১৯৫২) নিবন্ধগ্রন্থ দু'টি তাঁর বিখ্যাত রচনার পর্যায়ে পড়ে।

পৃথিবীর বহু জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেন। দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জের ঘটনাবলি নিয়ে তাঁর গল্প রয়েছে। 'দ্য সামিং আপ' (১৯৩৮) মমের আত্মজীবনী।

বি.ব.

ময়নাতদন্ত পোস্ট-মর্টেম দ্র

ময়নামতী শালবন বিহার দ্র

ময়নামতীর চর বন্দে আলী মিয়া দ্র

ময়ূর

জমকালো সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের জন্য ময়ূরের (Pea-fowl) খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কুক্কুট পরিবারের বৃহত্তম সদস্য ময়ূরের দু'টি প্রজাতি রয়েছে। নীল প্রজাতির ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি। এটি ভারত ও আশেপাশের দেশে বাস করে। বিরল প্রজাতির বার্মিজ সবুজ ময়ূরের বাস বার্মা, মালয়েশিয়া ও জাভায়।

ময়ূরের সৌন্দর্য তার অপূর্বসুন্দর পেখমে। ময়ূরীর পেখম নেই। প্রজননমৌসুমে ময়ূর পেখম মেলে নেচে নেচে ময়ূরীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। পেখমের পালকগুলোর উৎপত্তি পিঠের প্রান্ত থেকে। পেখমটি ১.৬ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। ময়ূরের গলার স্বর কর্কশ।

নীল ময়ূরের গলা ও বুক সবুজাভ নীল, শরীরের নিচের অংশ বেগুনি-নীল, পাখা ও পেখম ধাতবনীল। পেখমের উজ্জ্বল পালকগুলোর অগ্রভাগে পর্যায়ক্রমে নীল, হালকা নীল ও সোনালি বৃত্তাকার ছোপ থাকে। মাথায় সুন্দর নীল ঝুঁটি। নীল ময়ূরের একটি সাদা উপ-প্রজাতি রয়েছে। বার্মিজ সবুজ ময়ূর নীলটির থেকেও সুন্দর।

ঘাস-পাতা, শস্যদানা, পোকা-মাকড়, শামুক-ব্যাঙ, ছোট সাপ ইত্যাদি ময়ূয়ের প্রধান খাদ্য। ময়ূরী ঘন ঝোপ-ঝাড়ে বাসা বানায়। তাতে পাঁচ-দশটি বাদামি ডিম পাড়ে।

www.pathagar.com

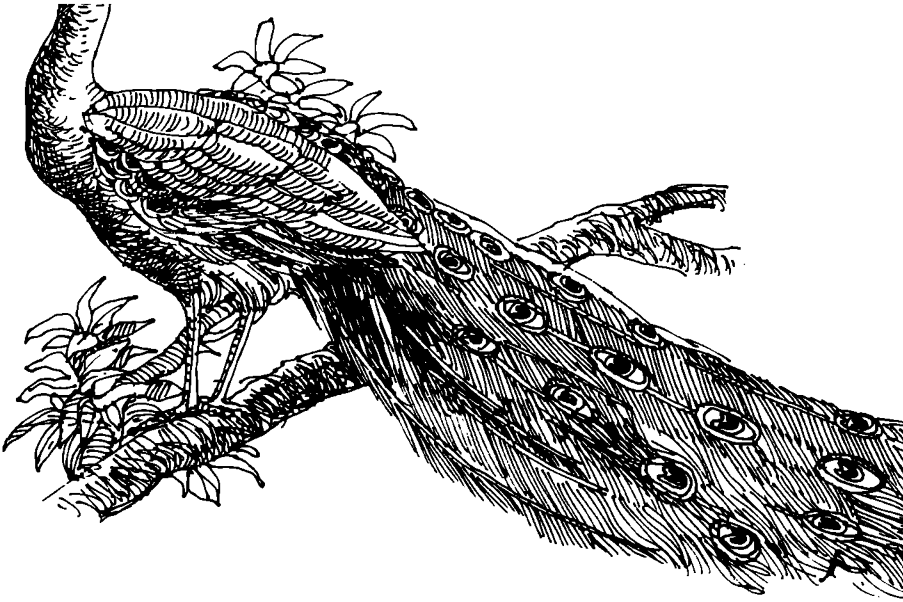

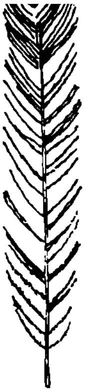

প্রায় ২৮ দিনে বাচ্চা ফোটে। ময়ূরের পেখমটি পুরোপুরি গজাতে তিন বছর সময় লাগে। এরা পনেরো-বিশ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

ময়ূরভট্ট ধর্মমঙ্গল দ্র

মরমীয়া সাহিত্য

ইসলাম (দ্র) ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে ভারতীয় যোগ ও বেদান্তদর্শন প্রভাবিত ইসলামপূর্ব সব ধর্মের সমন্বয়ই হচ্ছে সুফিবাদ (দ্র) বা মরমীবাদ। আর এই সব ধর্মসমন্বয়মূলক সাহিত্যই হচ্ছে মরমীয়া সাহিত্য। এই সাহিত্যে মানুষের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক বিভিন্নভাবে দেখানো হয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলন কল্পনা করা হয়। এই মিলন সম্পর্কে সহজ ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গানে গানে বলা হয়, যার আড়ালে থাকে গভীর তত্ত্ব। প্রথাগত ধর্মসাধনাও বেশির ভাগ সময়ই অস্বীকার করা হয়।

ধর্মগুরু নয়, মরমীয়া নিজেই স্রষ্টার কাছে তার নিজের কথা বলবে। ধর্মবিভেদ নয়, সব মানুষের মিলনসাধনাই মরমীয়া সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য।

মে. খা.

মরিচ ও গোল মরিচ

মরিচ বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী ছোট গাছ। এই জাতীয় বহু শাখাবিশিষ্ট ছোট গাছকে বলে ক্ষুপ। দু'-তিন ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। কোনো কোনো জাতের গাছ সারা বছর ফল দেয় এবং দু' বছরের বেশি বাঁচে। মরিচের বৈজ্ঞানিক নাম *ক্যাপসিকাম এন্নাম* লিন্ *(Capsicum annum* Linn.*)*, গোত্র সোলানসি (Solanaceae)। সারা পৃথিবীতে এই গণে ৩০টি প্রজাতি আছে। পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে এর আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) উষ্ণতাপ্রধান অঞ্চল। তাঁদের মতে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (দ্র) থেকে পর্তুগিজেরা এটি আমাদের দেশে নিয়ে আসে।

বর্ষজীবী মরিচ থেকে শুকনো লাল মরিচ মসলারূপে সারা বছর তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা ও লাল মরিচ সবজি, আচার, সালাদ, মাছ (দ্র), মাংস ও অন্যান্য তরকারিতে মসলা হিসাবে প্রায় অপরিহার্য। নানা রকম মরিচ হয়। ধানি লঙ্কা ছোট ও খুব ঝাল। আবার বোম্বাই

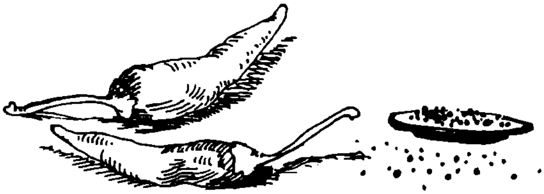

লঙ্কা হয় বড় বড় গোলগাল এবং খুব ঝাল, সুগন্ধি লঙ্কা, নীল গোল লঙ্কা, সবজে গোল, সূর্যমুখী, সাদা ধানি, সাধারণ লাল মরিচ—সব মরিচই কম-বেশি ঝাল। বইপত্র ও কাপড়চোপড়কে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য শুকনো মরিচ ব্যবহৃত হয়।

গোল মরিচ হল পাইপার জাতের লতাজাতীয় গাছ।

www.pathagar.com

এই পাইপার গণে ৫০টি প্রজাতি আছে। গোল মরিচ পটলগাছের মতো অন্য গাছের আশ্রয়ে বাড়ে। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (দ্র) এর আদি নিবাস। বৈজ্ঞানিক নাম *পাইপার নাইগ্রাম* লিন (*Piper nigrum* Linn.). গোত্র পাইপারাসি (Piperaceae) গোল মরিচ সাদা ও কালো হয়। কাশি, আমাশয় (দ্র), কৃমি ইত্যাদি নানা রোগে এটি উপকারী। মাংসে গোল মরিচ অপরিহার্য। আচার, চাটনি ও নানা রকম খাবারে গোল মরিচের গুঁড়ো মেশালে মুখরোচক হয়। প্রাচীন কাল থেকে সর্বত্র মসলা হিসাবে এর বিশেষ খ্যাতি আছে।

বি. ব.

মরিচা / মরচে

সাধারণ লোহা (দ্র)কে ঘরের বাইরে ফেলে রাখলে তার ওপরের স্তর ধীরে ধীরে একটি বাদামি রঙের গুঁড়াতে পরিণত হতে থাকে। একে লোহায় মরিচা বা মরচে ধরা বলে। একবার মরিচা পড়তে আরম্ভ করলে খুব দ্রুত এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মরিচা ধাতুকে (দ্র) ক্ষয় ও দুর্বল করে ফেলে এবং অবশেষে লোহা ফুটো হয়ে যায়। মরিচা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তাতে সোদক আয়রন অক্সাইড (যার মোটামুটি সঙ্কেত $Fe_3O_3 . 3H_2O$) থাকে।

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লোহায় মরিচা পড়ে না। মরিচা পড়তে হলে জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেন (দ্র) প্রয়োজন হয়। এদের যে কোনো একটির অবর্তমানে লোহায় মরিচা পড়ে না। মরিচা কেন পড়ে ? লোহা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে প্রথমে লোহার অক্সাইড তৈরি হয়, পরে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে মরিচা তৈরি হয়। অনেকে মনে করেন, বায়ুর জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) থেকে যে কার্বনিক অ্যাসিড হয় তা লোহাকে আক্রমণ করে এবং তাকে অ্যাসিড-ফেরাস-কার্বনেটে পরিণত করে। অক্সিজেনের সংস্পর্শে তা ক্ষারকীয় কার্বনেটে রূপান্তরিত হয়। পরে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয় এবং সেটাই মরিচা। এই রাসায়নিক পরিবর্তনগুলোকে এভাবে দেখানো যায় :

$$CO_2 + H_2O = H_2CO_3$$

$$Fe + 2H_2CO_3 = Fe(HCO_3)_2 + H_2$$

$$2Fe(HCO_3)_2 + O + H_2O = 2Fe(OH)_2HCO_3 + 2CO_2$$

$$2Fe(OH)_2HCO_3 = [Fe_2O_3 . 3H_2O] + 2CO_2$$

সাধারণত লোহার ওপর রঙের বার্নিশ দিয়ে লোহাকে মরিচা থেকে রক্ষা করা হয়। দস্তা (দ্র) বা টিনের প্রলেপ দিয়েও মরিচা পড়া বন্ধ করা যায়। দস্তাপ্রলেপিত লোহা বা ইস্পাতের (দ্র) পাতকে সাধারণ লোক টিন (ঘরের চালে যা ব্যবহার করা হয়) বলে। বিশেষ প্রয়োজনে নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি দিয়ে বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রলেপ দিয়ে মরিচা পড়া ঠেকানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে আলকাতরাও (দ্র) ব্যবহার করা হয়।

মু. এ.

মরুভূমি

২০° থেকে ৩০° অক্ষাংশের মধ্যে ক্রান্তীয় উষ্ণ মরুভূমির বিস্তৃতি। কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ-বলয়ের মধ্যে অবস্থিত বলে এ অঞ্চলের বায়ু বিষুবরেখার (দ্র) দিকে প্রবাহিত হয়, যা আয়ন (দ্র) বায়ু নামে অভিহিত। এই উচ্চচাপ-বলয় থেকে আয়ন বায়ু ব্যতীত আরো দুইটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ-বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুকে পশ্চিমা বায়ু বলে। এই উচ্চচাপ-বলয় অঞ্চলে কোনো বায়ু মিলিত

www.pathagar.com

হয় না, ফলে সেখানে বৃষ্টিও হয় না। পৃথিবীর প্রায় সকল বিখ্যাত মরুভূমি এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে দিবাভাগে প্রচণ্ড তাপ ও রাত্রে অত্যধিক শীত অনুভূত হয়।

ক্রান্তীয় মরুভূমিগুলোর মধ্যে সাহারা মরুভূমি, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি, আরবের মরুভূমি, আফ্রিকার (দ্র) কালাহারি, দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) আটাকামা, ভারতের (দ্র) থর মরুভূমির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্রান্তীয় মরুভূমির বাইরেও মধ্য অক্ষাংশ অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের মালভূমিতে আরো বেশ কিছু মরুভূমি দেখা যায়। এগুলো সমুদ্র থেকে অনেক দূরে বলে শুষ্ক এবং প্রায়ই বৃষ্টিহীন, যদিও এখানে গ্রীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকালে এসব মরুভূমি এত ঠাণ্ডা হয় যে বরফে আবৃত থাকে এবং গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম অনুভূত হয়। পাকিস্তানের (দ্র) মরুভূমি, মধ্যএশিয়ার গোবি, উত্তর আমেরিকার (দ্র) কলরেডো এবং দক্ষিণ আমেরিকার পাতাগোনিয়া মরুভূমিতে এরূপ জলবায়ু দেখা যায়। পৃথিবীর অন্যতম উষ্ণ স্থান জেকোবাবাদ পাকিস্তানের দক্ষিণাংশে শুষ্ক জলবায়ু-অঞ্চলে অবস্থিত।

উদ্ভিদ ও প্রাণী : উষ্ণ মরুভূমিঅঞ্চল বৃষ্টিহীন হওয়ায় সেখানে কোনো গাছপালা দেখা যায় না। তবে কোথাও কোথাও কাঁটা জাতীয় গাছ দেখা যায়, যার পাতা খুবই ছোট এবং শিকড় অনেক নিচে প্রোথিত। তবে মরুভূমির কোনো কোনো স্থানে মরূদ্যান আছে, যেখানে কিছু পানির (দ্র) দেখা মেলে এবং চারদিকে কিছু খেজুর (দ্র) গাছও জন্মায়।

প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র উট (যাকে মরুভূমির জাহাজ বলে) দেখা যায়। উট (দ্র) একবার পানি খেলে প্রায় সাত দিন মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে পারে। উটের পায়ের তলা বেশ চ্যাপটা হওয়ায় বালিতে উটের পা দেবে যায় না।

বসতি : মরুভূমিতে যারা বাস করে তারা বেশির ভাগই যাযাবর। তারা এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। তবে মরূদ্যানের আশেপাশে কিছু মানুষ স্থায়ীভাবেও বসবাস করে। তারা উট ও গরু পালন করে এবং খেজুর গাছের চাষ করে। আকাশের নক্ষত্র দেখে তারা রাত্রে দিঙ্‌নির্দেশ করতে পারে।

মু. এ.

মর্গান্, লিউইস্ হেনরি [১৮১৮—১৮৮১]

উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদ। জন্ম ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে।

মর্গানের (Lewis Henry Morgan) যুগান্তকারী গবেষণাগ্রন্থ 'এনশ্যান্ট সোসাইটি' (আদিম সমাজ) তৎকালীন সমাজতত্ত্বের অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি। করে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে মর্গান 'রেড ইণ্ডিয়ান' নামে পরিচিত আমেরিকার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পরিমাণ তথ্যাদি সংগ্রহ করে মানবসমাজের বিকাশ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। চারটি খণ্ডে বিভক্ত 'আদিম সমাজ' গ্রন্থে তিনি জাতিতাত্ত্বিক যুগবিভাগ, সমাজে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পরিবারের বিকাশ ও উন্নয়ন এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণার ক্রমবিকাশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এর আগে রেড ইণ্ডিয়ানদের উপর তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'দ্য ইরাকোয়া' প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে। মর্গান্ নিজে বহু বছর রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি শাখা সেনেকাদের মধ্যে বসবাস করে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। মর্গান্ই প্রথম সমাজবিজ্ঞানী, যিনি মানবসমাজের প্রাগৈতিহাসিক কাঠামো সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থ ও তথ্যাদির উপর নির্ভর করে এঙ্গেল্স্ (দ্র) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' রচনা করেছেন এবং মর্গান্কে এক জন বস্তুবাদী সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

মর্গান্ ছিলেন এক জন যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী বিজ্ঞানী। মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের প্রতি ছিল তাঁর শ্রদ্ধাবোধ। তাই তিনি বলতে পেরেছেন, "আজকে আমাদের আরাম-আয়েসের কারণ আমাদের আদিম ও বর্বর পূর্বপুরুষদের সাহসের সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে সব কষ্ট মোকাবেলা করার ক্ষমতা।"

মর্গানের মৃত্যু হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে।

আ. র.

www.pathagar.com

মর্সিয়া সাহিত্য

মর্সিয়া সাহিত্য বা এলিজি (elegy) উর্দুসাহিত্যে এক ধরনের কাব্য। মর্সিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ শোকপ্রকাশ। পরিভাষা অনুসারে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ এবং তাঁর স্তুতিমূলক কাব্যই মর্সিয়া। মর্সিয়া সাহিত্য প্রধানত কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হলেও যে কোনো মৃত ব্যক্তির শোকগাথাকেই মর্সিয়া বলা যায়। কারবালার শহীদদের মর্সিয়া চতুষ্পদী কবিতার আকারে সাধারণত লেখা হয়, তবে মর্সিয়া ষট্‌পদীও হতে পারে।

মে. খা.

মলিয়্যার্ [১৬২২—১৬৭৩]

বিখ্যাত ফরাসি নাট্যকার। প্রকৃত নাম জঁ বাপ্তিস্ত্ পক্‌ল্যাঁ (Jean Baptiste Poquelin); মলিয়্যার্ (Moliére) ছিল তাঁর নাট্য–ছদ্মনাম। জন্ম প্যারিস শহরে, ১৬২২ সালে। পিতার আগ্রহে ক্লেরমঁ-র জেসুইট কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কালের সেরা বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসেন।

১৬৪৩ সালে তিনি প্যারিসে 'ইল্যুস্ত্র তেয়াত্র্' নামে একটি থিয়েটার দল গঠন করেন। তাঁর সময়ে নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছদ্মনাম গ্রহণ করার রেওয়াজ ছিল। সে-প্রথা অনুসারে তাঁর 'মলিয়্যার্' নাম গ্রহণ।

নাটকের দল গঠন করে উপার্জনের চেষ্টা করে পুরোপুরি ব্যর্থ হন মলিয়্যার্। ঋণভারে জর্জরিত হওয়ায় কারারুদ্ধ হলেন। কারামুক্তির পর সিদ্ধান্ত নিলেন, শহরের বাইরে গ্রামে গ্রামে নিজের নাট্যদল নিয়ে ঘুরবেন। এই সিদ্ধান্ত থেকেই তিনি দীর্ঘ এক যুগ চারণের মতো নাটকের দলসহ ফ্রান্সের গ্রামে গ্রামে ঘোরেন, নাটক রচনা, প্রযোজনা ও অভিনয় করেন।

মলিয়্যারের যুগ বিয়োগান্ত নাটকের যুগ হলেও, তিনি তাঁর চেনা-জানা চরিত্র আর বিদ্যমান সমাজ-বাস্তবতাকে মূল চরিত্র ও বিষয় করে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন।

প্রথমাবস্থায় মলিয়্যার্ প্রাচীন নাট্যকাহিনী 'কোমেদিয়া দেলার্তে' ও প্রাচীন প্রহসনগুলো থেকে সংগ্রহ করতেন তাঁর নাটকের উপকরণ। ১৬৫৮ সালে তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন। এ বছরেরই অক্টোবর মাসে তিনি আপন নাট্যপ্রতিভার জোরে ফ্রান্সের রাজকীয় বুর্বঁ থিয়েটারে নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ লাভ করেন।

কালজয়ী এই নাট্যকারের বিখ্যাত নাট্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'তার্ত্যুফ্', 'দঁ জুয়াঁ', 'ল্য মিজাঁত্রপ্', 'ল্য মেদ্‌স্যাঁ মাল্‌গ্রে লুই', 'লে ফাম্ সাভাঁৎ', 'লেকোল্ দে ফাম্', 'অঁফিত্রিওঁ', 'জর্জ্ দঁদ্যাঁ' এবং 'ল্য বুর্জোয়া জঁতিওম্' ইত্যাদি।

মলিয়্যার ১৬৭৩ সালে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

মশা

মশা দুই পাখাওয়ালা খুদে পতঙ্গজাতীয় জীব। পৃথিবীতে ২৬০০-রও বেশি প্রজাতির মশা রয়েছে। সব জায়গাতেই এদের দেখা যায়। তবে গরম দেশগুলিতে মশার প্রকোপ বেশি।

মশার জীবনচক্র চারটি পর্যায়ে বিভক্ত—ডিম, শূককীট (larva), মূককীট (pupa) এবং পূর্ণাঙ্গ মশা। পরিণত মশা বিভিন্ন জায়গায় ডিম পাড়ে। বাড়ির আশেপাশের ডোবা-পুকুর, নর্দমা, এমনকি ঝোপঝাড়, ভাঙা কলস কিংবা পুরনো পাত্রে জমা পানিতেও এরা ডিম পাড়ে। মশার শূককীট শুধু পানিতেই বাঁচে। এরা খুদে জলজ উদ্ভিদ খেয়ে টিকে থাকে।

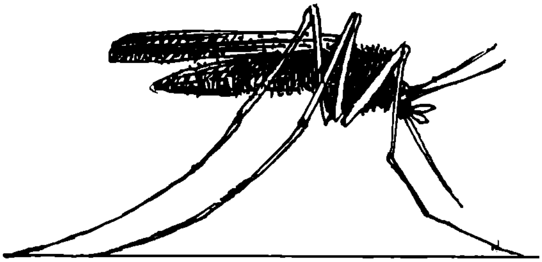

শূককীট রূপান্তরিত হয়ে মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট খুব বেশি নড়াচড়া করে। এরা শ্বাসনলের সাহায্যে পানির ওপর থেকে শ্বাস নেয়। পরিণত মশা পানি থেকে উঠে উড়ে যায়।

মশার কামড় সব সময় আমাদের বিরক্ত করে। এদের উপদ্রবে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়াতেই বিঘ্ন হয় তা নয়, এক সময় এদের জ্বালায় পানামা খাল কাটানো পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হয়েছিল। শুধু স্ত্রী মশাই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর

www.pathagar.com

দেহে হুল ফুটিয়ে রক্ত শোষণ করে। পুরুষ মশা ফুল-পাতার রস খেয়ে বেঁচে থাকে। স্ত্রী মশা রক্ত পান না করলে ডিম পাড়তে পারে না। শরীরের উত্তাপ, গন্ধ, আর্দ্রতা, কার্বন ডাই-অক্সাইডের (দ্র) ঘনত্ব ইত্যাদির সাহায্যে মশা শিকারের খোঁজ পায়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্বের পার্থক্যের সাহায্যে মশা ঘুমন্ত মানুষকে হুল ফোটানোর জন্য খুঁজে নেয়।

মশা যে অত্যন্ত বিপজ্জনক আগে এটা জানা ছিল না। ১৮৯৮ সালে রোনাল্ড রস্ (দ্র) অনেক গবেষণার পর আবিষ্কার করেন যে ম্যালেরিয়া (দ্র) রোগের জন্য আসলে অ্যানোফিলিস (Anopheles) জাতীয় মশা দায়ী। এরা ম্যালেরিয়া রোগীর যে রক্ত শোষণ করে, তাতেই ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু (দ্র) থাকে। অন্য সুস্থ মানুষকে কামড় দিলে ঐ জীবাণু তার দেহে সংক্রমিত হয়। ১৯০০ সালে ওয়াল্টার রীড আবিষ্কার করেন যে ইডিস (Aedes) জাতীয় মশার সাহায্যে পীত জ্বরের (yellow fever) জীবাণু ছড়ায়। কিউলেক্স (Culex) জাতীয় মশা ফাইলেরিয়াসিস (filariasis) বা গোদ রোগের জন্য দায়ী।

মশা নির্মূল করে এসব মারাত্মক রোগের কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বদ্ধ জলাশয় ও নর্দমা পরিষ্কার রেখে, এসব জায়গায় তেল কিংবা কীটনাশক ঔষধ ছিটিয়ে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব। ছোট ছোট মাছ মশার শূককীট খেয়ে থাকে। তাই মাছ চাষ করলেও মশা কমে যায়। ব্যাঙও মশা খায়।

সা. এ.

মস

মোটামুটিভাবে একই ধরনের কতগুলো উদ্ভিদের সমষ্টিগত নাম হচ্ছে মস (moss)। এটি কোনো বিশেষ গণ বা প্রজাতির নাম নয়। অন্যভাবে বলা যায়, ব্রায়োফায়টা (Bryophyta) জাতীয় উদ্ভিদের মাসাই (Musci) শ্রেণীভুক্ত এক ধরনের স্থলজ, সবুজ ও অপুষ্পক উদ্ভিদকে সাধারণভাবে মস বলা হয়। এরা সমাঙ্গদেহী (thallophyta) জাতীয় উদ্ভিদের চেয়ে কিছুটা উন্নত এবং ফার্ন (দ্র) জাতীয় উদ্ভিদের চেয়ে অনুন্নত।

ছায়াযুক্ত ও স্যাঁৎসেঁতে স্থানে মস্ জন্মে থাকে। গাছের গুঁড়িতে, প্রাচীরের গায়ে, পরিত্যক্ত ইট বা শিলাখণ্ডের ওপরে সবুজ গালিচার আস্তরণের মতো এরা জন্মে। ফিউনারিয়া

(Funaria), ব্রায়াম্ (Bryum) ও বার্বিউলা (Barbula) আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য পরিচিত মস্।

মসের মূল কখনোই থাকে না। মূলের পরিবর্তে এদের থাকে রাইজয়েড্ (rhizoid)। তাই মসের দেহ রাইজয়েড্, কাণ্ড ও পাতা—এ তিন ভাগে বিভক্ত। মসের ছোট্ট দেহকাণ্ডের চারদিক ঘিরে ছোট ছোট পাতাগুলো সুন্দরভাবে সর্পিলাকারে সজ্জিত থাকে। মসে আদর্শ কোনো পরিবহণতন্ত্র বা সংবহনতন্ত্র নেই। এর জননাঙ্গ বহুকোষী এবং তা বন্ধ্যা কোষ দ্বারা আবৃত থাকে। এর স্পোর বা রেণু অঙ্কুরিত হয়ে সুতোর মতো প্রোটোনেমা উৎপন্ন করে।

মসের মূল উদ্ভিদটি স্বভোজী এবং 'গ্যামেটোফাইটিক' জনুর প্রতিনিধি। এর 'স্পোরোফাইটিক' প্রতিনিধি গ্যামেটোফাইটিক উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। মসের জীবনে সুস্পষ্ট জনুক্রম (বা পুরুষানুক্রম) আছে। এর স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদটি পদ (foot), বৃন্ত (seta) এবং ক্যাপ্সিউল্ (capsule) —এ তিন অংশে বিভক্ত। জলাভূমির মস্‌বর্গের উদ্ভিদজাত পীট্ নামক পদার্থ অনেক সময় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মু. আ.

মসজিদ

মসজিদ এমন একটি চতুষ্কোণ-স্থাপত্য বিশিষ্ট ভবন যেখানে

তারা মসজিদ

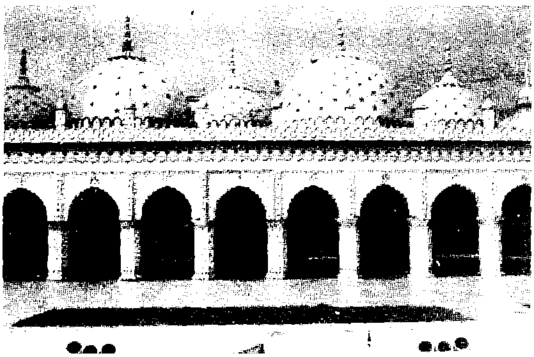

www.pathagar.com

ইসলাম (দ্র) ধর্মাবলম্বীরা সারিবদ্ধভাবে নামায (দ্র) আদায় করেন। বড় বড় মসজিদে একাধিক কক্ষ থাকে। তবে বৃহৎ কক্ষটিই নামাযের জন্য নির্দিষ্ট। মসজিদের ওপর থাকে গোলাকার গম্বুজ। কোনো কোনা মসজিদের পাশেই থাকে মিনার, যেখানে দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আযান (দ্র) দেন। মসজিদ অবশ্য নানা রকমেরই আছে। এর ভেতরটা হয় যথাসম্ভব প্রশস্ত। একদিকে থাকে নামাযীদের ওযু (দ্র) করার জায়গা। মসজিদের দেয়ালের যে অংশটি পবিত্র মক্কা (দ্র) শরীফের দিকে থাকে, সেখানে থাকে একটি খিলান। সুনির্মিত ও অলঙ্কৃত এ স্থানটিকে বলা হয় মিহ্‌রাব। সেখানে সুন্দর আরবি হরফে পবিত্র কুরআন শরীফের (দ্র) বাণী উৎকীর্ণ থাকে। মসজিদের মিম্বর নামে যে অংশটি থাকে, সেখানে দাঁড়িয়ে ইমাম জুম্মার (দ্র) নামায ও ঈদের নামাযের খুত্‌বা (দ্র) পাঠ করেন।

মদিনায় (দ্র) বিশ্বের প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)। এ মসজিদে কোনো গম্বুজ ছিল না। মসজিদটির নাম বনি আলমাহকে মসজিদ। বালি, পাথর ও খেজুর গাছের গুঁড়ি ও ডাল দিয়ে তৈরি এ মসজিদ নির্মাণকালে স্বয়ং রসূলে করিম (স.) শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করেন। বিশ্বের প্রথম মসজিদ বলা হয় কাবা শরীফ বা মসজিদুল হারামকে। আর দ্বিতীয় মসজিদ হিসাবে গণ্য করা হয় আল-আক্‌সা মসজিদকে (দ্র)। এটি জেরুজালেম নগরীতে অবস্থিত। বিশ্বের উচ্চতম মসজিদটি ১৯৯৩ সালে নির্মিত হয়েছে মরক্কোতে।

আ. কা.

মসলা

তরকারি, আচার, চাটনি বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু ও সুগন্ধ করার জন্য এর ব্যবহার হয়। এ ছাড়া ঔষধ, প্রসাধনসামগ্রী, ধূপধুনা এবং সাবান (দ্র) তৈরির কাজেও এর প্রয়োজন। তবুও মসলা শব্দটি এখন খাদ্য বা পানীয়ের সুগন্ধিকারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে মরিচ (দ্র) উদ্দীপক, সুগন্ধি মসলা লবঙ্গ, দারুচিনি, মরিচ ও গোলমরিচ উত্তেজক, আবার ধনেপাতা ও পুদিনা মিষ্টি সুবাস ছাড়ায়। উদ্ভিদের যে অংশ সবচেয়ে সুগন্ধিকারক সে অংশ থেকে মসলা হয়। যেমন— বাকল, কাণ্ড, পুষ্পকোরক, ফল, বীজ ও পাতা।

প্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মসলার বিরাট চাহিদা আছে ইউরোপ (দ্র) ও মধ্যপ্রাচ্যে (দ্র)। এ জন্য ইউরোপ থেকে জাহাজপথে ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার এবং পরে 'মসলাযুদ্ধ' নামে হানাহানি পর্যন্ত হয়েছিল। এখনো সারা বিশ্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মসলার চাহিদা ব্যাপক। মসলা খুব দামি সামগ্রী। মসলা ছাড়া মাছ-মাংস আমাদের মুখে রোচে না। কয়েকটি মসলার বিবরণ:

কাবাব চিনি— গোলমরিচ গোত্রের দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফল। আদি নিবাস জাভা ও মালাক্কায়। বৈজ্ঞানিক নাম *পিপের কুবেবা (Piper cubeba) ।*

কালোজিরা— ছাগলবতী গোত্রের দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ বা লতা। আদি বাস দক্ষিণ ইউরোপে। বর্তমানে আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিক নাম *নাইজেল্লা সাতিভা (Nigella Sativa),* গোত্র রাননকুলাসি (Ranunculaceae)।

জয়ত্রী জায়ফল— মিরিসতিকাসী গোত্রের চিরহরিৎ সুগন্ধি বৃক্ষ। আদিবাস মালাক্কা। এই ফল পাকলে আপনা-আপনি ফেটে যায়। ফলের মধ্যে পাতলা লালচে-হলদে দেখতে এক রকম বীজের মতো থাকে, তাকে বলে জয়ত্রী। আর সম্পূর্ণ শুকনো বীজ নাড়লে ভেতরে শাঁস বাজতে থাকে। খোলার মতো বাইরের ত্বক ভেঙে প্রাপ্ত শক্ত শুকনো

www.pathagar.com

শাঁসকে বলে জায়ফল। জয়ত্রীর লালচে-হলদে জালের মতো বাইরের আবরণ ব্যবহৃত হয়। উত্তেজক, পাচক এই মসলা খুব দামি। আবার নানা রোগের উপশমও ঘটায়।

জাফরান— কলাবতী গোত্রের বহুবর্ষজীবী একবীজপত্রী লতা। আদিবাস দক্ষিণ ইউরোপ। ভারতের কাশ্মীরে অত্যন্ত উন্নত মানের জাফরান জন্মে। বৈজ্ঞানিক নাম *ক্রোকাস সাতিভাস (Crocus Sativus)*, গোত্র কান্নাসী (Cannaceae)। ফুলের কমলা রঙের তিন ভাগে বিভক্ত কেশর দিয়ে জাফরান হয়। এক কিলো জাফরানের জন্য এক লক্ষ ফুলের প্রয়োজন। রান্নায় রং ও সুগন্ধির জন্য এই দামি জাফরান বা কুঙ্কুম প্রয়োজন। কুঙ্কুম প্রাচীন কাল থেকে প্রসাধনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

জিরা— ধন্যাক গোত্রের বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। আদিবাস মিশর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। বঙ্গদেশে জন্মে। মাছ, মাংস ও তরকারিতে জিরা অপরিহার্য। বৈজ্ঞানিক নাম *কুসিনম কিমিনম (Cuminum cyminum)*। গোত্র উম্‌বেল্লিফেরিঈ (Umbelliferae)।

জোয়ান— ধন্যাক গোত্রের বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। আদিবাস ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। বৈজ্ঞানিক নাম *ত্রাকিস্পের্নম আম্মি (Trachyspernum ammi)*। মসলা এবং খাওয়ার পর মুখরোচক হিসাবেও ভাজা জোয়ান ব্যবহৃত হয়।

দারুচিনি— দারুচিনি গোত্রের চিরহরিৎ ২০-২৫ ফুট উঁচু গাছ। গাছের বাকল থেকে মসলা হয়। সারা বিশ্বে শ্রীলঙ্কা থেকে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়। বৈজ্ঞানিক নাম *সিন্নামোমম জেইলানিকম (Cinnamomum Zeylanicum)*।

তেজপাতা— দারুচিনি গোত্রের চিরহরিৎ বৃক্ষ। গাছের পাতাই তেজপাতা। বাংলাদেশে সিলেট অঞ্চলে হয়, তবে সারা দেশে এর চাষ করা সম্ভব। ভারতের খাসিয়া-জয়ন্তিয়ায় বেশি জন্মে। বৈজ্ঞানিক নাম *সিন্নামোমম তামালা (Cinnamomum Tamala)*।

ধনে— ধন্যাক গোত্রের অন্তর্গত হাত দেড়েক উঁচু বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বৈজ্ঞানিক নাম *কোরিয়ান্দ্রাম সাতিভম (Coriandrum Sativum)*। আদিবাস ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। বাংলাদেশের সর্বত্র রবিশস্যের মরশুমে জন্মে।

পানমৌরী— ধন্যাক গোত্রের তিন-চার হাত উঁচু দ্বিবর্ষজীবী বীরুৎ। আদিবাস ইউরোপে। বাংলাদেশ ও ভারতে চাষ হয়। পানের সঙ্গে ও আচার ইত্যাদিতে কাজে লাগে। বৈজ্ঞানিক নাম *ফিনিকুলম ভুলগারে (Finiculum Vulgare)*।

মেথি— শিম্ব গোত্রের বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। আদিবাস দক্ষিণ ইউরোপে। খুব সুগন্ধি মসলা। বঁড়শির চারেও ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক নাম *ত্রিগোনেল্লা ফোয়েনম গ্রেকম (Trigonella Foenum Grecum)*।

মৌরী— ধন্যাক গোত্রের বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বৈজ্ঞানিক নাম *পিম্পিনেল্লা আনিসম (Pimpinella Anisum)*। আদিবাস মিশরে। বাংলাদেশ ও ভারতে চাষ হয়।

রাঁধুনি— ধন্যাক গোত্রের দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বৈজ্ঞানিক নাম *ত্রাকিস্পের্নম রক্সবর্গিয়ানম (Trachyspernum Roxburghianum)*। 'রাঁধুনি' নাম থেকেই বোঝা যায় রান্নার মসলা।

লবঙ্গ— জাম গোত্রের ২০-২৫ হাত উঁচু শতবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। আদিবাস মালাক্কায়। গাছে আফোটা পুষ্পমুকুলই লবঙ্গ। মাংস ও মিষ্টিদ্রব্যে লাগে। বৈজ্ঞানিক নাম *কারিওফিল্লাস আরোমাতিকম (Caryophyllus Aromaticum)*।

শা-জিরা— ধন্যাক গোত্রের দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ। উত্তর ও মধ্য ইউরোপে এবং এশিয়ায় (দ্র) চাষ হয়। শীতের দেশে ভাল জন্মে। রুটি, বিস্কুট, কেক সুস্বাদু করতে ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক নাম *কাররম কারভি (Carrum Carivi)*।

এলাচ— এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় শীতোষ্ণ অঞ্চলে ৫০ রকম এলাচ জন্মে। আমাদের কাছে বড় এলাচ ও ছোট এলাচ পরিচিত। আসাম, সিকিম ও সিলেট অঞ্চলে হয় মোরন্দ এলাচি। বৈজ্ঞানিক নাম *এমোমম এরোমাতিকম (Amomum Aromaticum)*। বড় এলাচের গাছ দেখতে বন-আদার মতো। এগুলো গাছের গোড়ায় মাটির ওপরে গুচ্ছাকারে জন্মে। আষাঢ়ে ফুল হয়, আশ্বিন মাসে পাকে। দামি মসলা।

এ ছাড়া আদা, লঙ্কা, হলুদ, শুল্‌ফা ইত্যাদিও মসলা।

বি. ব.

মসুর ডাল দ্র

www.pathagar.com

মস্কো (Moscow)

রাশিয়ার (দ্র) রাজধানী এবং পৃথিবীর (দ্র) অন্যতম প্রধান নগর। জনসংখ্যার দিক থেকে জাপানের (দ্র) টোকিও (দ্র) এবং ইংল্যাণ্ডের লণ্ডনের (দ্র) পরেই এর নাম আসে। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ৮৮ লক্ষ।

মস্কো নদীর তীরে অবস্থিত ক্রেমলিন ভবন

এটি সাবেক 'ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক্‌স্'-এরও রাজধানী ছিল। তখন এটি ছিল বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান। রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশে মস্ক্‌ভা নদীর তীরে এটি অবস্থিত। নগরটির নামও তাই রুশ ভাষায় মস্ক্‌ভা।

অভ্যন্তরীণ জলপথের সুবিধার জন্য ১১৪৭ সালের দিকে মস্কো বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১১৫৬ সালে প্রিন্স ইউরি দোল্‌গোরুকি মস্ক্‌ভা নদীর উত্তর তীরে কাঠ দিয়ে একটি দুর্গ-নগর নির্মাণ করেন। ত্রিকোণাকৃতির এই দুর্গ-নগরটি ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ১৭১২ সাল পর্যন্ত মস্কো রাশিয়ার রাজধানী ছিল।

কিন্তু সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট পশ্চিম দিকে রাশিয়ার সীমানা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে ১৭১২-১৩ সালে মস্কো থেকে নবপ্রতিষ্ঠিত সেন্ট পিটার্সবার্গ (পরবর্তী কালে যথাক্রমে নাম হয়েছিল পেত্রোগ্রাদ ও লেনিনগ্রাদ)-এ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে লেনিন পিটার্সবার্গ থেকে রাজধানী আবার মস্কোতে সরিয়ে আনেন।

প্রাচীন দুর্গ-নগরকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে আধুনিক মস্কো গড়ে ওঠে। সেই প্রাচীন দুর্গই এখন দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ভবন ক্রেম্‌লিন্ (গণপরিষদ ও মন্ত্রিপরিষদের কার্যালয়)। এটি লাল ইটের উঁচু দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত। দেয়ালে সীমানার মধ্যে বিভিন্ন পুরাতন রাজকীয় অট্টালিকা, ক্যাথিড্রাল (যেখানে বিশপের আসন থাকে) এবং স্বর্ণখচিত গির্জা (দ্র) রয়েছে। ক্রেম্‌লিনের উত্তর-পূর্ব পাশে একটি বিশাল চত্বর আছে। এটিকে সাধারণত রেড স্কোয়ার (Red Square) বলা হয়। বড় ধরনের রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান বা সেনাবাহিনীর আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ক্রেম্‌লিনের প্রধান ফটকের ওপর একটি বড় ঘণ্টা স্থাপন করা আছে, যা থেকে দিনে দুই বার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। মস্কোর দর্শনীয় বস্তুগুলোর মধ্যে এটি একটি। রেড স্কোয়ারের দক্ষিণ প্রান্তে ১৫৬০ সালে নির্মিত সেন্ট বাসিল্‌স্ ক্যাথিড্রাল রাশিয়ার স্থাপত্যকলার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। এটি এখন জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মস্কো রাশিয়ার প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এর শিল্পসম্ভারের মধ্যে আছে ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রধানত মেশিন তৈরি ও ধাতুর কাজ), রাসায়নিক, বৃহদাকার বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, খাদ্যশিল্প। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জামও এখানে ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হয়ে থাকে। উৎপাদিত শিল্পপণ্য বিদেশেও রপ্তানি হয়।

দেশের প্রধান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে মস্কোর সঙ্গে ইউরোপ (দ্র) আর এশিয়ার (দ্র) যোগাযোগ ও পরিবহণের উন্নততর ব্যবস্থা রয়েছে। একটি খালের সাহায্যে মস্কো উত্তর দিকে ভোল্‌গা নদীর সঙ্গে যুক্ত এবং অন্য একটি খালের মধ্য দিয়ে মস্কো থেকে বাল্টিক, হোয়াইট, কাস্পিয়ান, আজভ্ ও কৃষ্ণ সাগরে ছোট ছোট জাহাজ চলাচল করতে পারে। মস্কোর তিনটি জাহাজ চলাচল বন্দর রয়েছে। নগরের কেন্দ্রস্থল থেকে ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মস্কোর প্রধান অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ভ্নুকোভ (Vnukovo)

www.pathagar.com

অবস্থিত। এ ছাড়াও রয়েছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শেরিমাতিয়েভ। খোলামেলা ও সুসজ্জিত স্টেশনসহ এখানে 'মেত্রো' বা পাতাল-রেল-ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উন্নত বিজ্ঞান-গবেষণা আর সমৃদ্ধ শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্যও মস্কো পৃথিবীবিখ্যাত স্থান। এখানকার বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার দেশী ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও প্রতি বছর এশিয়া, আফ্রিকা (দ্র) ও লাতিন আমেরিকার (দ্র) বহু তরুণ ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এখানে বিশ্বের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ থিয়েটার, জাদুঘর ও গ্রন্থাগার রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বলশোয় থিয়েটার, লেনিন গ্রন্থাগার, লেনিন জাদুঘর, বিপ্লব জাদুঘর, পলিটেকনিক জাদুঘর, পুশ্‌কিন্ ললিতকলা জাদুঘর ও ত্রেতিয়াকফ্ চিত্রশালা স্বনামখ্যাত।

মস্কোর জলবায়ু মহাদেশীয় জলবায়ুর মতো ঋতুর সঙ্গে পরিবর্তনশীল। এখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত মোটামুটি ৫৮৪ মিলিমিটার (২৩ ইঞ্চি)। তবে প্রতি বছরই এর তারতম্য ঘটে।

মস্কোর আনুমানিক আয়তন ৮৭,৮০০ বর্গ কিলোমিটার (৩৩,৯০০ বর্গমাইল)। এর ৪২ শতাংশ এলাকা জুড়ে আছে পার্ক আর শ্যামল বনানী।

সুজ. ব.

মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্র দ্র
মহররম মুহর্‌রম দ্র

মহাকাব্য (epic)

মহাকাব্য কথাটির মধ্যে বিশালতার ইঙ্গিত আছে। সাধারণত একটি গম্ভীর ও সমুন্নত বিষয় নিয়ে আদি, মধ্য ও অন্ত সংবলিত দীর্ঘ, বর্ণনাত্মক, বীররস সমৃদ্ধ, পদ্যে রচিত কাহিনীকে মহাকাব্য বলা হয়। এর ভাষা তেজোদীপ্ত, অলঙ্কারবহুল এবং গাম্ভীর্যব্যঞ্জক। সুদূর অতীতের মহাকাব্যগুলি, যেমন পাশ্চাত্যের ইলিয়াদ (দ্র) ও ওদিসি (দ্র) এবং প্রাচ্যের রামায়ণ (দ্র) ও মহাভারত (দ্র), প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ, লোককাহিনী ও মৌখিক ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পরবর্তী সময়ে প্রাচীন মহাকাব্যের ধারাকে অনুসরণ করে শক্তিশালী লেখকগণ 'সাহিত্যিক মহাকাব্য' রচনা করেছেন। এইসব মহাকাব্যে আমরা লেখকের শিল্পচাতুর্য, উচ্চ কল্পনা, আদর্শবাদিতা ও সযত্নলালিত ভাষাশৈলী লক্ষ করি। এ শ্রেণীর মহাকাব্য হল ইতালির কবি দান্তের (দ্র) 'ডিভাইন কমেডি' (দ্র) (১৩০৭–১৩১৩), ইংরেজ কবি মিল্টনের (দ্র) 'প্যারাডাইস লস্ট' (১৬৬৭) এবং বাঙালি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)।

বর্তমানে কোনো সাহিত্যকর্মে বিশাল পটভূমি, মহৎ চরিত্রচিত্রণ, মানবজীবন ও ইতিহাস সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক চিন্তাচেতনার প্রতিফলন এবং উন্নত রচনাশৈলী লক্ষিত হলে তাকেও শিথিলভাবে মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া হয়। এসূত্রেই রুশ লেখক তলস্তোয়ের (দ্র) 'যুদ্ধ ও শান্তি' (১৮৬২–১৮৬৯), ফরাসি লেখক রম্যাঁ রলাঁর (দ্র) 'জঁ ক্রিস্তফ্' (১৯০৩–১৯১২) এবং বাংলা ভাষার লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'গোরা (১৯১০) প্রভৃতি গ্রন্থকে মহাকাব্যিক উপন্যাস বলা হয়।

ক. চৌ.

মহাকাশ অভিযান

পৃথিবীর (দ্র) বাইরে মহাকাশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোই মহাকাশ অভিযান।

বিশ শতকের শুরু থেকে রকেট (দ্র) বানানোর ক্ষেত্রে মানুষ বেশ অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) জার্মানদের ভি-২ মিসাইল ছিল এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। বিশ্বযুদ্ধের পর অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্র) ও যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) এ ব্যাপারে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পৃথিবীর বাইরে স্পুৎনিক-১ (দ্র) নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করে। এর পর মনুষ্যবিহীন একাধিক মহাকাশযান মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়। ১২ই

সোভিয়েত রাশিয়ার মহাশূন্য যান—ভস্তোক

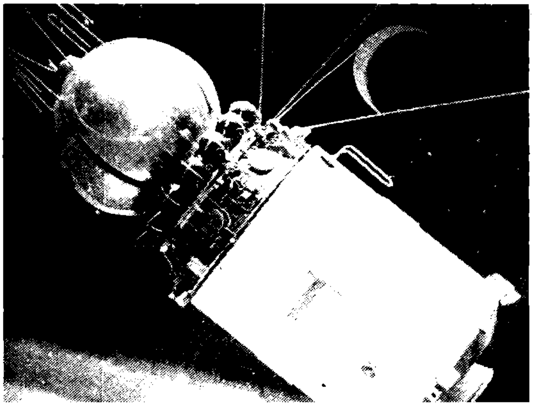

www.pathagar.com

চাঁদে অবতরণের পর নীল আর্মস্ট্রংয়ের তোলা অলড্রিনের ছবি

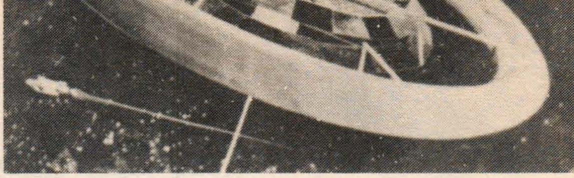

ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযান (কাল্পনিক)

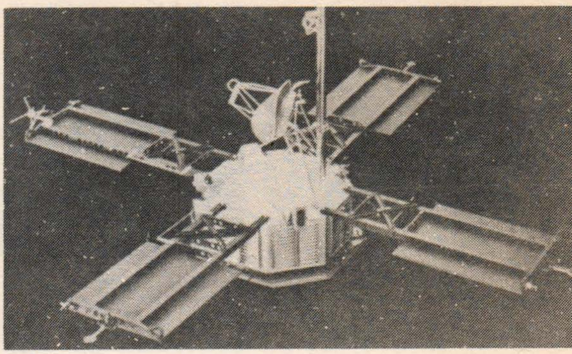

মেরিনার-৪, ভেনাস যাত্রা—১৯৬৭

অস্ট্রেলিয়ার একটি রেডিও টেলিস্কোপ

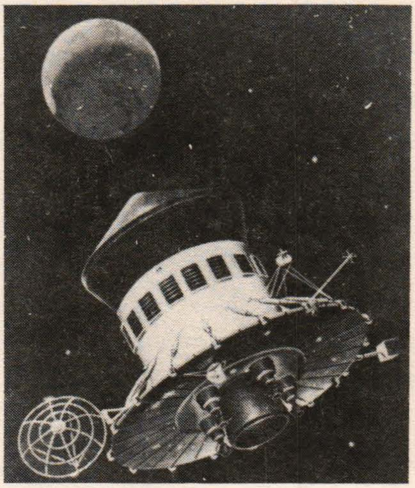

ভয়েজারের মঙ্গলগ্রহ অভিযান

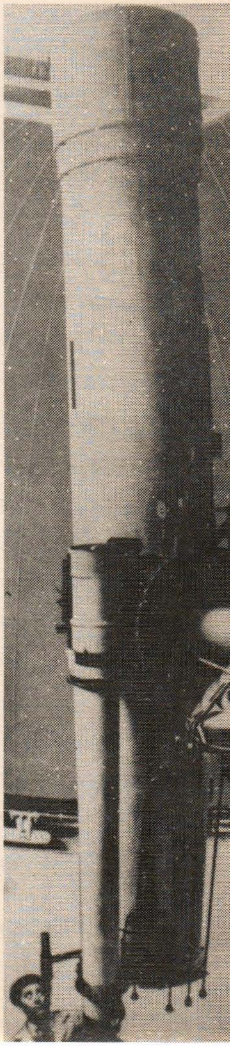

আরমেনিয়ার বিরুকান মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্র—ইকো-২

লুনার মডিউল

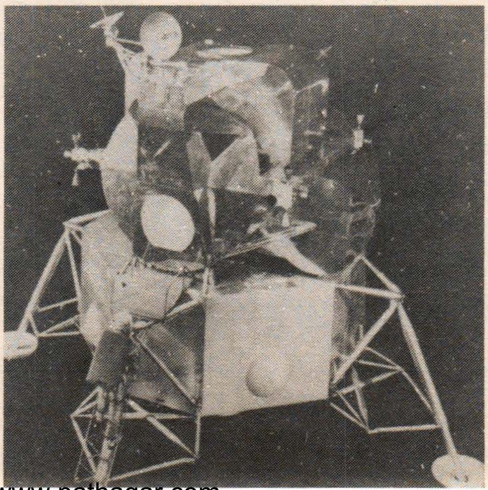

মহাশূন্যে অভিযানের কাল্পনিক দৃশ্য

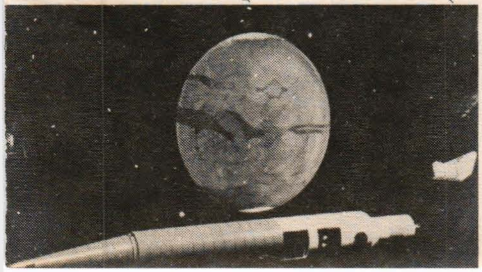

www.pathagar.com

ইউরি গাগারিন

নীল আর্মস্ট্রং

মাইকেল কলিন্স

অলড্রিন

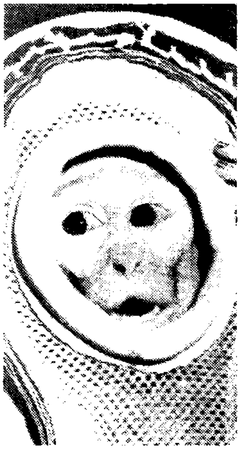

মিস্ স্যাম

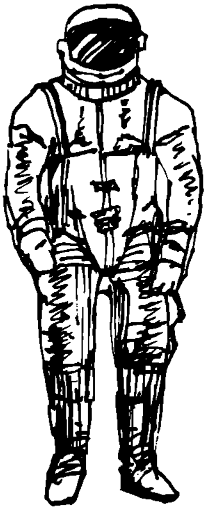

মার্কিউরির মহাকাশ যাত্রী

এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে সোভিয়েত নভশ্চর (দ্র) ইউরি গাগারিন্ (দ্র) মহাকাশযানে চড়ে প্রথম মহাশূন্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

পরবর্তী লক্ষ্য ছিল চাঁদে মানুষ পাঠানো। ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন প্রথম চাঁদের বুকে পা রাখেন।

এর পর শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের উদ্দেশ্যে মহাকাশযান প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে 'মেরিনার' শুক্রগ্রহের তথ্য ও 'ভাইকিং' মঙ্গলগ্রহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আনে। ১৯৭০-এর দশকে মহাকাশে পরীক্ষাগার তৈরি করা হয়। এ ধরনের দু'টি পরীক্ষাগারে (মার্কিন স্কাইল্যাব ও সোভিয়েত সইয়ুজ) নভশ্চরেরা দীর্ঘদিন অবস্থান করে নানাবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

সত্তর দশকের শেষের দিকে মহাশূন্যে পাঠানো হয় পাইওনিয়ার-১০ মহাকাশযান। এটি পৃথিবী ও মানবজাতি সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বয়ে নিয়ে চলেছে অজানা কোন সভ্যতার পানে। ১৯৭৮ সালে উৎক্ষেপিত ভয়েজার-২ মহাকাশযানটি বর্তমানে সৌরজগৎ (দ্র) ছাড়িয়ে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে ও প্রতিনিয়ত তথ্য প্রেরণ করছে।

'৮০-এর দশকে মহাকাশ অভিযানে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল নভোখেয়া (Space Shuttle)। এগুলোকে পুনঃপুনঃ ব্যবহার করা যায়। কলম্বিয়া, চ্যালেঞ্জার ও ডিস্কভারি নামের তিনটি নভোখেয়ার মাধ্যমে ইতিমধ্যে মহাকাশে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

মহাকাশ অভিযানে সর্বশেষ সাফল্য হল মঙ্গল (দ্র) গ্রহে একটি নভোযানকে অবতরণ করানো। এই মহাকাশযানের নাম পাথফাইণ্ডার (Pathfinder) বা পথপ্রদর্শক। সাত মাসে প্রায় ৫০ কোটি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ১৯৯৭ সালের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার এটি মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে।

মহাবিশ্বের দূর-দূরান্ত থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের (দ্র) বাইরে একাধিক টেলিস্কোপ (দ্র) স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে হাব্‌ল্ টেলিস্কোপ, কোবে (COBE) প্রভৃতি অন্যতম।

মহাকাশ অভিযানের নিকটতম লক্ষ্য হল মহাকাশে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাকাশ স্টেশন গড়ে তোলা। যুক্তরাষ্ট্র আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে এরূপ একটি স্টেশন 'ফ্রিডম' গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। মহাকাশ স্টেশনগুলো পরবর্তী সময়ে মহাকাশ অভিযানের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে। এ ছাড়া মহাকাশ ও চাঁদে (দ্র) পৃথিবীর উপনিবেশ গড়ে তোলা হল আগামী শতকের মহাকাশ অভিযানের চ্যালেঞ্জ।

মু. হা.

মহাত্মা গান্ধী গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ দ্র

মহাদেব শিব / মহেশ্বর / মহাদেব দ্র

মহাদেশ

পৃথিবীর স্থলভাগের একেকটি বড় অংশকে মহাদেশ (ইংরেজিতে কন্টিনেন্ট্— 'continent') বলা হয়। মহাদেশ

www.pathagar.com

সংখ্যায় ৭টি : ইউরোপ (দ্র), এশিয়া (দ্র), আফ্রিকা (দ্র), উত্তর আমেরিকা (দ্র), দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র), অস্ট্রেলিয়া (দ্র) এবং অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু অঞ্চল। পরস্পরলগ্ন হওয়ায় ইউরোপ ও এশিয়াকে অনেকেই একটি মহাদেশ— 'ইউরেশিয়া' —হিসাবে গণ্য করে; তাদের মতে মহাদেশ ৬টি।

মহাদেশগুলোর স্থলভাগ পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় শতকরা ২৯ ভাগ।

হা. মা.

মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) দ্র

মহাবিশ্ব (Universe)

সব বস্তু ও শক্তি, যা বিরাজ করে এবং যে স্থান জুড়ে বস্তু ও শক্তি রয়েছে সব মিলিয়েই হল মহাবিশ্ব।

প্রথমে ধারণা করা হত, এই পৃথিবী (দ্র) হল মহাবিশ্বের কেন্দ্র এবং সূর্য (দ্র), চাঁদ (দ্র), গ্রহমণ্ডলী পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। কোপার্নিকাস্ (দ্র) প্রথম জানালেন যে এই ধারণা সত্যি নয়, বরং পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। পরে জানা গেল, আমাদের সৌরজগৎ (দ্র) হল ছায়াপথ (দ্র) নামে একটি গ্যালাক্সির সদস্য, যেখানে সূর্যের মতো আরো প্রায় দশ হাজার কোটি ($১০^{১১}$) তারা রয়েছে। আর মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে এরূপ লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সি এবং এই মহাবিশ্বের কোনো কেন্দ্র নেই। ধারণা করা হয়, বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী আলোর এই মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে ১০০ কোটি বছর প্রয়োজন হবে।

মহাবিশ্বের সদস্যরা হল নক্ষত্র (কোনো কোনো নক্ষত্রের রয়েছে গ্রহমণ্ডলী, যেমন— সূর্য), গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সিঝাঁক বা ক্লাস্টার, ক্লাস্টারঝাঁক বা সুপার ক্লাস্টার, এবং সম্ভবত সুপার ক্লাস্টারের ঝাঁক। গড়পড়তা প্রতিটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে ১০ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ কোটি [$১০^{৬}$–$১০^{১৩}$] নক্ষত্র বা তারা। প্রতিটি ক্লাস্টারে রয়েছে ১০ থেকে ১০ হাজার গ্যালাক্সি।

গাঠনিক দিক থেকে মহাবিশ্বের ৯০ শতাংশ হাইড্রোজেন (দ্র)। বাকি ১০ ভাগের ৯ ভাগই হল হিলিয়াম (দ্র)। অবশিষ্ট ১ ভাগ হচ্ছে কার্বন (দ্র), অক্সিজেন (দ্র), নাইট্রোজেন (দ্র), লোহা (দ্র) প্রভৃতি জীবনের জন্য অত্যাবশকীয় উপাদান।

বিগ ব্যাঙ (Big Bang) নামে এক মহাবিস্ফোরণের

মহাবিশ্ব

মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সূচনা। বিস্ফোরণের পর সকল উপাদান চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং স্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই মহাবিশ্বের বয়স দেড় হাজার থেকে দু' হাজার কোটি ($১.৫—২ \times ১০^{১০}$) বছর।

মহাবিশ্বের পরিণতি কী হবে তা নির্ভর করছে এই মহাবিশ্বের মোট বস্তু অথবা এর গড় ঘনত্বের ওপর। যদি মহাবিশ্বে বস্তুর পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তিবিন্দুর (বিজ্ঞানীরা বলেন ওমেগা পয়েন্ট) বেশি হয়, তবে বস্তুর মহাকর্ষ মহাবিশ্বের প্রসারণকে এক সময় থামিয়ে দেবে এবং পুনরায় সঙ্কোচনের মাধ্যমে এক বিন্দুতে শেষ হবে। এই বদ্ধ মহাবিশ্বে সঙ্কোচনের শেষ বিন্দুতে পুনরায় মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে। আর যদি মহাবিশ্বে বস্তুর পরিমাণ ওমেগা বিন্দুর কম হয়, তবে মহাবিশ্বের প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে।

এখন পর্যন্ত মহাবিশ্বে যে বস্তু পাওয়া গেছে তাতে বলা যায়, মহাবিশ্বের প্রসারণ অনন্তকাল চলবে। অবশ্য এ সম্পর্কে চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় এখনো আসে নি।

অতি সম্প্রতি স্টিফেন হকিং (দ্র) নামে এক ব্রিটিশ

www.pathagar.com

বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, সৃষ্টির শুরুতে একাধিক মহাবিশ্ব তৈরি হবার সম্ভাবনা ছিল, অবশ্য এই মহাবিশ্বগুলো কখনোই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না।

মু. হা.

মহাবিশ্বে জীবন

এখন পর্যন্ত জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, তা শুধু পৃথিবী (দ্র) গ্রহেই রয়েছে। পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্বের (দ্র) কোনো একটি স্থানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কল্পবিজ্ঞানলেখকদের কল্পনায় স্টারম্যান হরহামেশাই আসছে, যাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মহলে এ ব্যাপারে দুটো মত রয়েছে। একটি দলের বক্তব্য হল—পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ একটি একক ঘটনা। পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই। এর বিপরীত মতটাই কিন্তু যুক্তিসঙ্গত। এ দল বলছে—পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের ফসল। এঁদের মতে, মহাবিশ্বে অনেক তারা ও অনেক গ্রহ (দ্র) রয়েছে। যে কোনো গ্রহে প্রাণের বিকাশের কোনো শর্তের সম্ভাবনা কম হলেও তারার আধিক্যের জন্য মোট সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মহাকাশে সকল উজ্জ্বল তারার ১০ শতাংশই গড়পড়তা আমাদের সূর্যের (দ্র) মতো। তা হলে শুধু ছায়াপথেই (দ্র) চার হাজার কোটি সূর্য রয়েছে। সূর্য তৈরির সময় গ্রহ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। যদিও এখন পর্যন্ত একটি পালসারের গ্রহমণ্ডলীর পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে, তথাপি তা অন্যান্য গ্রহমণ্ডলীর অনুপস্থিতি প্রমাণ করে না। অর্থাৎ

আমাদের ছায়াপথেই লক্ষাধিক সূর্যের গ্রহপরিবার রয়েছে. যেগুলোতে প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ অসম্ভব নয়।

অন্য যে কোনো গ্রহে জীবনের রসায়ন, ধরন ও কার্যকারিতা আমাদের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে, তথাপি সমগ্র বিষয়টিকে একটি জীব-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তবে, এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ কোনো গ্রহে হতে পারে তাড়াতাড়ি, আবার অন্য কোথাও হতে পারে ধীর লয়ে।

অপার্থিব প্রজাতি আমাদের তুলনায় ভিন্নতর হবে। তবুও তাদের থাকবে ডিএনএ বা অনুরূপ অণু (দ্র), থাকবে প্রকৃতি থেকে আহার সংগ্রহের অঙ্গ, এমনকি থাকতে পারে আলো ব্যবহারকারী অঙ্গও।

অপার্থিব জীববিজ্ঞান কখনোই আমাদের মতো হবে না। মানবজাতি কখনোই গ্রহান্তরের আগন্তুকের সঙ্গে মিলিত হয়ে সঙ্কর জাতি সৃষ্টি করতে পারবে না।

মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজার জন্য আমেরিকান মহাকাশ সংস্থা নাসা (NASA = National Aeronautics and Space Administration)-র একটি বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে। সংক্ষেপে এটির নাম 'সেটি' (SETI= Search for Extra-Terrestial Intelligence)। এই প্রজেক্টে 'বুদ্ধিমত্তা'র সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে যারা বেতারতরঙ্গ গ্রহণ ও প্রেরণ করতে পারে। পৃথিবীব্যাপী অধিকাংশ মাইক্রোওয়েভ রিসিভারের সাহায্যে বহির্বিশ্বের বার্তা শোনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

নাসার এই প্রোগ্রাম যদি অন্তত একটি বার্তাও ধরতে পারে, তা হলেই আমরা বুঝব যে এই মহাবিশ্বে আমরা একা নই।

মু. হা.

মহাবীর

সাধারণত মনে করা হয়, মহাবীর জৈনধর্মের (দ্র) প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু জৈনদের বিশ্বাস, তিনি ছিলেন জৈনধর্মের শেষ বা ২৪ সংখ্যক গুরু। জৈনরা তাদের ধর্মপ্রবর্তক ও প্রচারকদের 'তীর্থঙ্কর' (দ্র) বলে। তীর্থঙ্কর মহাবীরের আসল নাম বর্ধমান। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ৫৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান উত্তর বিহারের বৈশালীর অন্তর্গত কুণ্ডপুর বা কুন্দপুর। তিনি ৭২ বছর বয়সে

www.pathagar.com

দেহত্যাগ করেন।

ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সাধারণ গৃহী মানুষের মতোই জীবনযাপন করেন। তার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে বারো বছর নানা স্থানে পর্যটন করেন এবং ক্রমাগত কঠোর তপস্যার দ্বারা নিজের দেহকে কষ্ট দেন।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি সাধনায় সফল হন। সাধনার দ্বারা তিনি ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি জয় করে সংযমী হতে পেরেছিলেন বলে লোকে তাঁর নাম দেয় 'মহাবীর'। এই মহাবীর নামেই তিনি বেশি পরিচিত।

তিনি বলেছেন : প্রকৃত ভক্তি, যথার্থ জ্ঞান এবং উত্তম আচরণ—এই তিনটি হল ধর্মসাধানার মূল কথা। এই তিনটিকে একত্রিত করে জৈনরা বলে—'ত্রিরত্ন'। জৈনধর্মে নিজের দেহকে কষ্ট দেওয়া, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, অহিংসা, চুরি না-করা, লোভ না-করা, মিথ্যে কথা না-বলা প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

নি. অ.

মহাভারত

সংস্কৃত ভাষায় (দ্র) রচিত ভারতের (দ্র) শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য (দ্র)। রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস (দ্র)। আকারে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্য। প্রাচীনপন্থী ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের আগে রচিত, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। রচনাকাল যখনই হোক, রামায়ণ (দ্র) ও মহাভারতের মধ্যে রামায়ণ আগে লেখা হয়েছিল। মহাভারতের মূল ঘটনা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। কুরুপক্ষে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কুরুর নামানুসারে কৌরব বা কুরু, এবং পাণ্ডুর পুত্ররা (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব) পাণ্ডব নামে পরিচিত। কুরুপক্ষে দুর্যোধনসহ কর্ণ, দ্রোণাচার্য

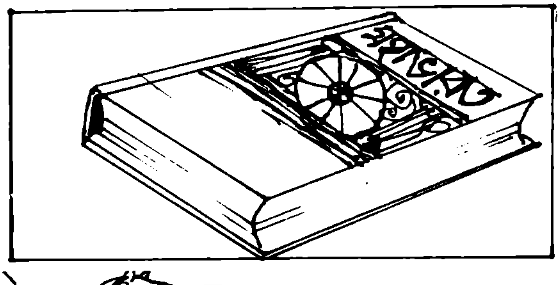

www.pathagar.com

ও ভীষ্ম ছিলেন। পাণ্ডবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ (দ্র) যোগ দেন। মহাকবি বেদব্যাস হিমালয়ের বদরিকা আশ্রমে বসে ৩ বছরে মহাভারত রচনা করেন। এর শ্লোকসংখ্যা ১০ হাজার। পরে বৈশম্পায়ন-কথিত অংশ মিলে ২৪ হাজার শ্লোক হয়। তার পর সৌতি-কথিত মহাভারত সর্বমোট ৮৪ হাজার শ্লোকে পূর্ণতা লাভ করে। পরিশেষে পরিশিষ্ট হরিবংশসহ হয় শতসহস্র, অর্থাৎ মোট এক লক্ষ শ্লোকের এক বিশাল মহাকাব্য হয়। এর প্রতিটি চরণ ষোল মাত্রায় রচিত। প্রচলিত মহাভারত ১৮ পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলোর নাম : আদি, সভা, বন, বিরাট, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ। সর্বশেষ পর্বে আছে যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন ও পরলোকগত অর্জুনদের দেখে সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে গমন।

মহাভারত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু এটি ধর্মগ্রন্থ নয়। এতে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মমতের সমন্বয়প্রচেষ্টা দেখা যায়। মহাভারত যুগপৎ ইতিহাস, আখ্যান, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। আবার সব মিলেমিশে এতে অতীত ভারতবর্ষের সামগ্রিক রূপায়ণ ও মহাকোষগ্রন্থ এবং সর্বোপরি মহাকাব্য। এর ৬ষ্ঠ পর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (দ্র) অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলে। বহু শতাব্দী ধরে মহাকবি ভাস, কালিদাস (দ্র) ইত্যাদি কবিগণ, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্যশিল্পী ও অন্যান্য শাখার শিল্পী-সাহিত্যিকগণ মহাভারত থেকে প্রেরণা ও লেখার উপাদান পেয়েছেন। ভারতের প্রায় সকল দেশীয় ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ (দ্র) গদ্যে এবং কাশীরাম দাস (দ্র) পদ্যে মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন। কাশীরামের আগে পরাগল খাঁর আদেশে সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলায় অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। পরে ছুটি খাঁ-র আদেশে শ্রীকর নন্দী, সৃষ্টিধর সেন, রাজেন্দ্র দাস, গোপীচন্দ্র দত্ত, গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধ পর্ব পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করেন। এ ছাড়া প্রতাপচন্দ্র রায় বাংলায় ও ইংরেজিতে এবং রমেশচন্দ্র দত্ত (দ্র) ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। রাজকৃষ্ণ রায় পদ্যে এবং প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একে বাংলা নাট্যকাব্যে রূপান্তরিত করেন।

বি. ব.

মহামারী (epidemic)

একই সময়ে বহুসংখ্যক লোক যখন নির্দিষ্ট কোনো রোগে আক্রান্ত হয় এবং রোগের প্রকোপ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগের সে অবস্থাকে মহামারী বলা হয়।

মহামারী রোগের জীবাণু (দ্র) রোগভেদে বিভিন্ন উপায়ে মানুষের শরীরে ছড়িয়ে যেতে পারে। যেমন— কলেরা (দ্র), ডায়রিয়া (দ্র), টাইফয়েড জ্বর (দ্র) ইত্যাদি রোগের জীবাণু মল নিঃসরণের মাধ্যমে পানি দ্বারা বাহিত হয়ে কিংবা খাবারের সংস্পর্শে এসে মানবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। ম্যালেরিয়া-জীবাণু মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে মশার (দ্র) কামড়ের মাধ্যমে। মানুষের থুথু এবং হাঁচির মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়তে পারে কিছু কিছু রোগ। যথাসময়ে প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা না নিলে রোগ অধিকতর সংক্রমিত হয়ে মহামারী রূপ ধারণ করতে পারে।

মহামারী আকারে দেখা দেয় এমন কিছু রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কলেরা, ডায়রিয়া, গুটিবসন্ত, জলবসন্ত (দ্র), হাম (দ্র), ম্যালেরিয়া (দ্র), ইনফ্লুয়েঞ্জা (দ্র), জণ্ডিস (দ্র), প্লেগ ইত্যাদি।

একাধিক রোগের মহামারী বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। যেমন ৫৬৯ সালে ইথিওপিয়ান সৈনিকদের মক্কা (দ্র) অবরোধের সময় গুটিবসন্তের মহামারী। ১৬৬৫ সালে লণ্ডনে (দ্র) প্লেগের মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেছিল ষাট হাজার মানুষ। ১৩৩৮-৩৯ সালে মধ্য এশিয়ায় প্লেগের মহামারী দেখা দেওয়ার পর তা অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ মহামারীতে ইউরোপের এক-চতুর্থাংশ মানুষ মারা যায়। বঙ্গদেশেও এক সময়ে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা মহামারীতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল। এখনো প্রায়শ কলেরা ও ডায়রিয়ার মহামারী দেখা দেয়। তাই মহামারীর বিস্তার রোধে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (দ্র) বহুদিন থেকেই নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

সি. না. হ.

মহাযান

গৌতম বুদ্ধের (দ্র) পরিনির্বাণের (দ্র) অর্থাৎ মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্মমত মহাযান ও হীনযান (দ্র) বা থেরবাদ (দ্র) এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। নির্বাণ বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের

www.pathagar.com

পরম লক্ষ্য। মহাযানপন্থীরাও নির্বাণপথের অনুসারী। 'যান' অর্থ যা নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়। 'মহাযান' শব্দের অর্থ নির্বাণের দিকে যাত্রার শ্রেষ্ঠ শকট।

সম্রাট অশোকের (দ্র) সময় বৌদ্ধধর্ম (দ্র) মোট ১৮টি সম্প্রদায় বা নিকায়ে বিভক্ত হয়। প্রধান দু'টি ধারার নাম মহাসাঙ্গিক ও স্থবিরবাদ (বা থেরবাদ)। মহাসাঙ্গিকেরাই এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মতবাদীরাই মহাযানী সম্প্রদায়ের পূর্বসূরি। মহাযানীদের 'বোধিসত্ত্ব' (দ্র) বলা হয়। মহাযান তাই বোধিসত্ত্বযান। মহাযানমতে বোধিসত্ত্ব পরের জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করেন ও দুঃখভোগ করেন। তিনি পাপীর পাপভার ও দুঃখীর দুঃখভার নিজে গ্রহণ করে তাদের আর্তি দূর করবেন। এ জন্যই তিনি বোধিসত্ত্ব। যাঁর মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান ও মহাকরুণার পরম সমাবেশ ঘটেছে সেই বোধিসত্ত্ব মহাযানীদের দ্বারা পূজিত হন।

মহাযানীরা মধ্যমপন্থী ও শূন্যতাবাদী। দার্শনিক নাগার্জুন (দ্র) এই শূন্যবাদ (দ্র) দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। মহাযানীরা আবার ভক্তিবাদী। মহাযানে বুদ্ধ ঈশ্বর, শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রতিভূ। তাঁদের মতে, গৌতম বুদ্ধের আগে এরকম ২৬ জন বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ২৭তম বুদ্ধ, ২৮তম বুদ্ধ ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবেন। ধর্মরূপে বুদ্ধ বিশ্বের নিয়ন্তা, জীবের মুক্তির জন্য তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। সকল মানুষের মধ্যেই সম্ভাব্য বুদ্ধত্ব বিদ্যমান।

মহাযানী সাহিত্য শুদ্ধ অথবা মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় (দ্র) লিখিত হয়েছে। আচার্য নাগার্জুন ছাড়া কয়েক জন প্রধান মহাযানী দার্শনিক ও আচার্য হলেন চন্দ্রকীর্তি (দ্র), অসঙ্গ (দ্র), বসুবন্ধু (দ্র), শান্তরক্ষিত, শান্তিদেব, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (দ্র) প্রমুখ। জাপান (দ্র), কোরিয়া, তাইওয়ান, মঙ্গোলিয়া, চীন (দ্র), তিব্বত (দ্র), ভিয়েতনাম, লাওস, নেপাল (দ্র), ভুটান (দ্র) প্রভৃতি দেশের মানুষ মহাযান পন্থার অনুসারী।

বি. ব.

মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় দ্র
মহাযুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম দ্র

মহালয়/মহালয়া

আশ্বিন মাসের অমাবস্যা। এই তিথিতে হিন্দুরা পিতৃপুরুষের পার্বণ শ্রাদ্ধ বা তর্পণ করে থাকেন। এই পক্ষ পিতৃপক্ষ বা মহালয় নামে প্রসিদ্ধ। অমাবস্যা পর্যন্ত এক পক্ষকালের মধ্যে এই তিথি শেষ হয়ে যায়। আবার মহালয়া থেকে দেবীপক্ষ অর্থাৎ শারদীয় দুর্গাপূজার (দ্র) পক্ষ শুরু হয়।

বি. ব.

মহাস্থান গড়

বগুড়া শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত মহাস্থান গড় বাংলাদেশের (দ্র) প্রাচীনতম নগরীর ধ্বংসাবশেষ। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট

জাহাজঘাটা, মহাস্থানগড়

অশোকের (দ্র) রাজত্বকালের একটি শিলাখণ্ডে ব্রাহ্মীলিপিতে (দ্র) উৎকীর্ণ তথ্য থেকে অনুমান করা হয়, প্রাচীন পুণ্ড্রনগর এবং মহাস্থান একই নগরী। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ১৫ শতাব্দীর মধ্যে সমৃদ্ধ জনপদ হিসাবে এই নগর গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই প্রাচীন নগরীর দৈর্ঘ্য ৫০০০ ফুট এবং প্রস্থ ৪০০০ ফুট। চার পাশের সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা ১৫ ফুট। নগরীর বাইরে প্রায় ৫ মাইল এলাকা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে বহু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, এ সকল ধ্বংসাবশেষ মূল নগরীর শহরতলি। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে গভীর পরিখা এবং পূর্ব ও উত্তরে করতোয়া নদীর অবস্থানের দ্বারা সুরক্ষিত এই নগর বেশ কয়েক শতক ধরে মৌর্য, গুপ্ত ও পাল রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।

বর্তমানে গড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে শাহ সুলতান বল্খীর কিংবদন্তিখ্যাত অন্যান্য স্থানের মধ্যে রয়েছে বেহুলা-লখিন্দরের বাসরঘর, শীলাদেবীর ঘাট ও জীয়ৎ কুণ্ড।

মহাস্থানে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত জিনিসপত্রের মধ্যে তৎকালীন সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের পোড়ামাটির

www.pathagar.com

চিত্রফলক, অলঙ্কৃত ইট, প্রস্তরনির্মিত গুটি ও বোতাম, লোহা-তামা-ব্রোঞ্জের দ্রব্যাদি, অলঙ্কার ও কড়ি এবং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রচলিত ছাঁচে-ঢালা ছাপযুক্ত গোলাকার ও চতুষ্কোণ মুদ্রা এবং গুপ্ত যুগের সীলমোহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন আকারের ও নানা রঙের মাটির পাত্রের গড়ন ও কারুকাজ গঙ্গা-অববাহিকার অন্যান্য প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের তুলনায় উন্নত মানের। ধাতব দ্রব্যের মধ্যে তামার তৈরি বালা, আংটি, লোহার বর্শাফলক, তীর, ছুরি, পেরেক এবং স্বর্ণালঙ্কার ও অলঙ্কারের ছাঁচ মহাস্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাস্থানে আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্তি ও ব্রোঞ্জমূর্তির মধ্যে বুদ্ধমূর্তিসহ হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

এই নগরী ধ্বংস হবার সঠিক কারণ জানা যায় না।

ফ. র.

মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর, ক্যাপ্টেন বীরশ্রেষ্ঠ দ্র

মহিষ (buffalo)

মহিষ বা মোষ পরিবারের সদস্য। এশিয়া (দ্র) ও আফ্রিকায় (দ্র) বাস করে। এদের প্রজাতি চারটা। আফ্রিকার প্রজাতিটি বন্য। ভারতীয় প্রজাতি গৃহপালিত। তবে বনে-জঙ্গলেও

এরা আছে। অ্যানোয়া এবং টামারাও অত্যন্ত বিরল প্রজাতি, শুধু ফিলিপাইনেই আছে।

মহিষ দেখতে অনেকটা গরুর মতো। তবে বেশ বড়সড়। পিঠে কুঁজ নেই। চামড়া বেশ পুরু। মুখমণ্ডল খানিকটা উঁচু করে রাখে। ভারতীয় মহিষ কিছুটা নিরীহ হলেও অন্যান্যগুলো বেশ হিংস্র। ভারতীয় এবং আফ্রিকার মহিষ প্রায় সমান—১.৫ মিটার উঁচু ও ৮০০–১০০০ কেজি ওজন। এদের শিং বাঁকানো, অত্যন্ত বড় ও শক্তিশালী। দুটো শিং একত্রে ১.২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গায়ের রং ধূসর বা ময়লা-কালো। লেজের ডগা, কপাল, পায়ে সাদা দাগ থাকতে পারে। ভারতীয় মহিষ পানি বা কাদায় থাকতে পছন্দ করে। বন্য অবস্থায় ১০-৫০ টি একত্রে থাকে।

অ্যানোয়া ও টামারাও ছোট আকৃতির। অ্যানোয়া ০.৭৫-১ মিটার উঁচু এবং ওজন হয় ১৫০–৩০০ কেজি। রঙ গাঢ়-বাদামি। এরা একাকী বা জোড়ায় থাকে।

গৃহপালিত মহিষ অত্যন্ত পরিশ্রমী। এরা নিম্নমানের ঘাস, খড়, লতা-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। এরা গাড়ি টানায় দক্ষ। মহিষ-গাভীর দুধে চর্বির পরিমাণ গরুর দুধের থেকে বেশি। চামড়া উন্নত মানের।

মহিষ-গাভী ১০-১১ মাস গর্ভধারণের পর একটি বাছুর প্রসব করে, ২০-২৫ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

মহেনজোদারো

সিন্ধুর লারকানা জেলার কৃত্রিম পাহাড়ের উপর ২য় শতাব্দীর বৌদ্ধ মন্দিরের তলদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে মহেনজোদারো নামে পরিচিত বিশাল প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ। মহেনজোদারো শব্দের অর্থ মৃতের পাহাড়। অনুমান করা হয়, যিশুখ্রিস্টের (দ্র) জন্মের দু' হাজার বছর বা তারও পূর্বে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় মহেনজোদারোতে গড়ে উঠেছিল একটি সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতা।

মহেনজোদারোর নগরপরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরনের। নগরীর আবাসগৃহ, রাস্তাঘাট, নর্দমা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল সুপরিকল্পিত। এই প্রাচীন নগরীতে শস্য সংরক্ষণের জন্য ছিল বিশাল শস্যভাণ্ডার, জনগণের ব্যবহারের

মহেনজোদারো নিদর্শন

www.pathagar.com

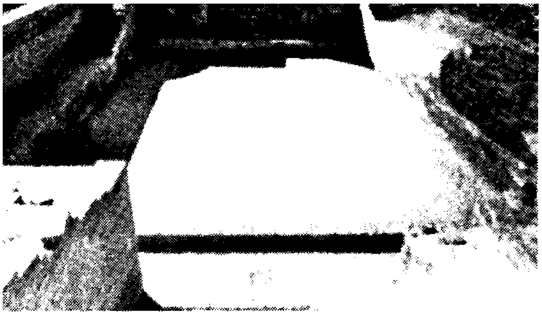

মহেনজোদারোর দৃশ্য

জন্য ছিল গণ-স্নানাগার, বিদ্যালয় এবং সভাকক্ষ। ইটের পাড় বাঁধানো কূপের অস্তিত্ব থেকে এদের পানীয় জল ব্যবহার সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। নগরপ্রাচীর, সুপ্রশস্ত রাস্তাঘাট ও অন্যান্য নির্মাণকাজে পোড়ামাটির ইট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বন্যা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মূল দুর্গটি নিচের নগরএলাকা থেকে অনেক উঁচুতে নির্মিত।

মহেনজোদারোর সিন্ধু সভ্যতা (দ্র) ছিল কৃষি ও বাণিজ্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজব্যবস্থা। বাণিজ্যসূত্রে মধ্য-এশিয়া, উত্তরপূর্ব আফগানিস্তান, উত্তরপূর্ব পারস্য, দক্ষিণ-ভারত এবং রাজস্থান ও গুজরাটের সঙ্গে মহেনজোদারোর যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়। এখানে কৃষিক্ষেত্রে গম ও বার্লি ছাড়াও তুলা (দ্র) চাষের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর ফলে সিন্ধু সভ্যতায় কাপড়ের তৈরি বস্ত্রের প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়।

মহেনজোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে ব্রোঞ্জ (দ্র) ও তামার (দ্র) তৈরি বর্শাফলক, ছুরি ও কুড়াল। এ ছাড়া তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বিভিন্ন আকারের পাত্র, স্বর্ণালঙ্কারসহ বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার, পোড়ামাটির তৈরি ফলক, সীলমোহর, প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ-নির্মিত মূর্তি সিন্ধু সভ্যতার শিল্পরীতির পরিচয় বহন করে। এদের ব্যবহৃত লিপির অর্থ উদ্ধার করা যায় নি বলে এই সভ্যতার ইতিহাস অনেকাংশে রহস্যাবৃত।

সিন্ধু উপত্যকার এই প্রাচীন সভ্যতার শেষ পর্যায়ে উপর্যুপরি বন্যা, সামাজিক অবক্ষয়, পরিবর্তনের অভাব মহেনজোদারোকে একটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় পরিণত করে। এর পর বহিঃশত্রু আর্যদের আক্রমণ মহেনজোদারোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

ফ. র.

মহেশ্বর শিব/মহেশ্বর/মহাদেব দ্র

মাইকা অভ্র দ্র

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মধুসূদন দত্ত, মাইকেল দ্র

মাইক্রন ডায়াটম্ দ্র

মাইক্রোনেশিয়া ওশেনিয়া দ্র

মাইক্রোপ্রসেসর (microprocessor)

ক্ষুদ্রকায় (miniature) ইলেক্ট্রনিক সার্কিটব্যবস্থা, যার সাহায্যে গাণিতিক ও যৌক্তিক সমস্যা সমাধান করা যায়। এই ধরনের ইলেক্ট্রনিক সার্কিটব্যবস্থা ডিজিটাল কম্পিউটারের (দ্র) কেন্দ্রীয় প্রসেসিং একক (central processing unit) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোপ্রসেসর বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারে। ১৯৮০-র দশকে মাইক্রোপ্রসেসরকে ভিত্তি করে পার্সোনাল বা মাইক্রোকম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে।

'৭০ দশকের শেষ দিকে ইলেক্ট্রনিক ক্ষেত্রে এল এস আই (LSI—Large Scale Integration) প্রযুক্তির সুবাদে মাইক্রোপ্রসেসর বানানো সম্ভব হয়। এই প্রযুক্তিতে খুবই ছোট জায়গাতে প্রচুর সংখ্যক ট্রানজিস্টর (দ্র), রেজিস্টর (দ্র) প্রভৃতি বসানো যায়। মাইক্রোপ্রসেসরজগতের সর্বশেষ (১৯৯৭, মে) সংযোজন ইন্টেল কোম্পানির পেন্টিয়াম-২ মাইক্রোপ্রসেসরে প্রায় ৮৯ লক্ষ ট্রানজিস্টর রয়েছে।

মাইক্রোপ্রসেসর একসঙ্গে কয়টি বিট নিয়ে কাজ করতে পারে; সে অনুযায়ী মাইক্রোপ্রসেসরকে ৪-বিট, ৮-বিট, ১৬-বিট, ৩২-বিট বা ৬৪-বিট মাইক্রোপ্রসেসর বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেল কোম্পানির 4004 হল প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর (১৯৭১)। এটি ছিল একটি ৪-বিট মাইক্রোপ্রসেসর। এই ধারায় 80286, 80386, 80486 হয়ে বর্তমানে পেন্টিয়াম মাইক্রোপ্রসেসর ৬৪-বিটের। ইন্টেল কোম্পানির এই মাইক্রোপ্রসেসরগুলোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পার্সোনাল কম্পিউটারের আই বি এম

www.pathagar.com

(IBM = International Business Machines) পরিবার।

অপর দিকে মটোরোলা নামক একটি প্রতিষ্ঠানের তৈরি মাইক্রোপ্রসেসরগুলো অ্যাপ্‌ল্ পার্সোনাল কম্পিউটারের ভিত্তি। ইন্টেল, মটোরোলা ছাড়াও ডিজিটাল, অ্যাডভানটেক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোপ্রসেরর তৈরি করে।

ডিজিটাল কম্পিউটার ছাড়াও স্বয়ংক্রিয় শিল্প রোবট (দ্র), চিকিৎসাসহায়ক যন্ত্রপাতি, পাট (দ্র) ও তাঁত শিল্পের স্বয়ংক্রিয়করণ প্রভৃতিতে মাইক্রোপ্রসেসরের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মু. হা.

মাইক্রোফোন (microphone)

শব্দতরঙ্গকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করার উপকরণ, যেখানে উভয় ক্ষেত্রে তরঙ্গবৈশিষ্ট্য একই রূপ থাকে।

টেলিফোন (দ্র), হিয়ারিং এইড, শব্দ রেকর্ডিংব্যবস্থা, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম প্রভৃতিতে মাইক্রোফোনের ব্যবহার লক্ষণীয়।

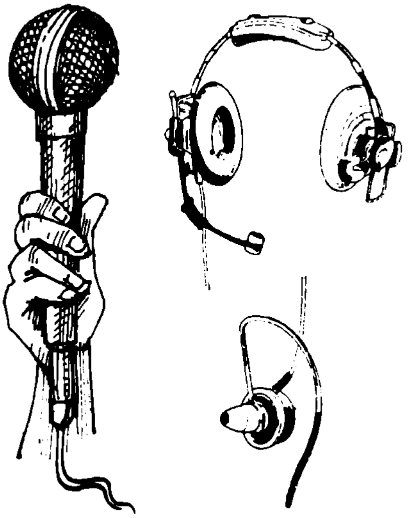

মাইক্রোফোনে দুই ধাপে শব্দতরঙ্গ (শব্দের তারতম্যের জন্য বায়ুর চাপের পরিবর্তন)-কে একটি বৈদ্যুতিক বর্তনীর বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবর্তনে পরিণত করা হয়। শব্দের তারতম্যের জন্য বাতাসের আলোড়িত কণাগুলো একটি পাতলা পর্দা বা ডায়াফ্রামকে আন্দোলিত করে। ডায়াফ্রামটি এমন যে এর কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বৈদ্যুতিক বর্তনীর কোনো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। এটি হতে পারে কার্বনদণ্ডের রোধের মানের পরিবর্তন (কার্বন মাইক্রোফোন), ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক কনডেন্সারের মানের পরিবর্তন (কনডেন্সার মাইক্রোফোন) কিংবা পিজো ইলেক্ট্রিক ক্রিস্টালের আকারের পরিবর্তন (ক্রিস্টাল মাইক্রোফোন)। এর ফলে, বৈদ্যুতিক বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবর্তন হয়, যার তরঙ্গবৈশিষ্ট্য শব্দউৎসের তরঙ্গবৈশিষ্ট্যের অনুরূপ।

মু. হা.

মাইক্রোবায়োলজি অণুজীববিদ্যা দ্র

মাইক্রোস্কোপ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্র

মাইজভাণ্ডার

মাইজভাণ্ডার মূলত একটি গ্রামের নাম। উত্তর-পূর্ব চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় এ গ্রামটি অবস্থিত। প্রখ্যাত সুফি সাধক শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্(১৮২৬-১৯০৬) এবং তাঁর উত্তরসূরি কয়েক জন সাধকের সাধনাস্থল হিসাবে গ্রামটি দেশেবিদেশে সুপরিচিত। গোড়াতেই সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ সুফিবাদের (দ্র) সমন্বয়ধর্মী বৈশিষ্ট্যময় এক ধারা প্রবর্তন করেন, যাকে উক্ত গ্রামেরই নাম অনুসারে বলা হয় 'মাইজভাণ্ডারী তরিকা'। এ তরিকার অনুসারী তাঁর উত্তরসূরি সাধকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান এবং পৌত্র শাহ্ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন। এই তিন মহান আধ্যাত্মিক পুরুষের যোগ্য উত্তরসূরি হলেন মওলানা সৈয়দ জিয়াউল হক। তিনি ছিলেন সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্র প্রপৌত্র, সৈয়দ গোলামুর রহমানের দৌহিত্র এবং সৈয়দ দেলাওর হোসাইনের প্রথম পুত্র।

প্রতি বছর ১০ই মাঘ হযরত আহমদ উল্লাহ্র ওফাত দিবসে (মৃত্যুদিবস) মাইজভাণ্ডারে বিরাট ওরস অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ব্যাপী এই ওরস উপলক্ষে মুসলিম-হিন্দু বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী সমবেত হয় মাইজভাণ্ডারগ্রামে। মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রেরণায় বিশেষ কিছু গানেরও সৃষ্টি হয়েছে। এসব গানকে বলা হয় 'মাইজভাণ্ডারী গান'। এসব গান নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে এদেশের মরমী গানে এবং সমৃদ্ধ করেছে এখানকার লোকসঙ্গীতের (দ্র) ভাণ্ডারকে। কবিয়াল রমেশ শীল (দ্র) মাইজভাণ্ডারী গানের গীতিকার ও গায়ক হিসাবে দেশব্যাপী খ্যাতিলাভ করেছেন।

মো. ই.

www.pathagar.com

মাইম এবং প্যান্টোমাইম

প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত জনপ্রিয় নাট্যমাধ্যম। এর সাহায্যে কোনো গল্প বা কোনো বিষয়বস্তুকে শারীরিক বা মুখাবয়বগত অভিব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

প্রাচীন গ্রিস ও রোমে ব্যঙ্গরসাত্মক প্রহসনের (দ্র) অভিনেতারা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁরা অশ্লীল ও কুৎসিত ধরনের সব মুখোশ পরে অভিনয় করতেন। ভাঁড়ামোই ছিল তাঁদের অভিনয়ের প্রধান উপজীব্য। তাঁরা যখন অভিনয় করতেন, তখন তাঁদের অভিনয়ের সহায়ক হিসাবে কাজ

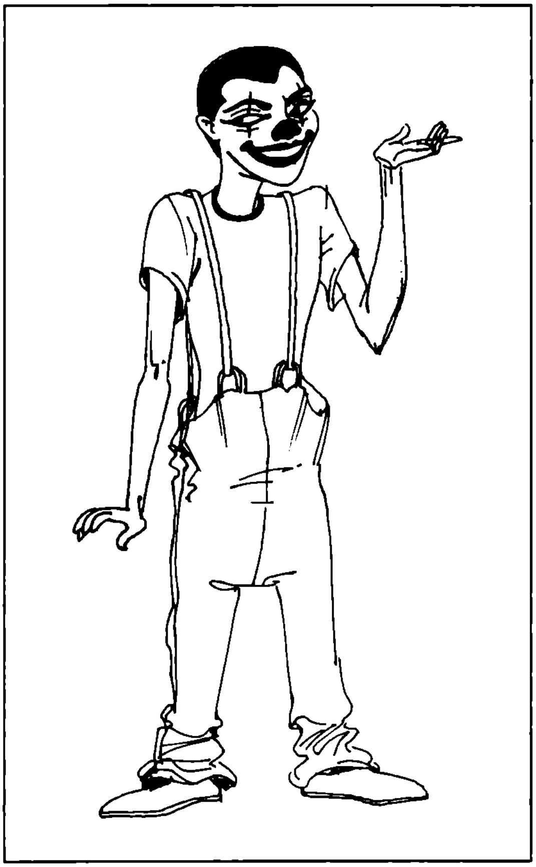

করতেন সম্মেলক বা কোরাস (দ্র) গায়কবৃন্দ ও বাদ্যযন্ত্রী দল। প্রহসন অভিনেতারা অঙ্গভঙ্গি ছাড়াও কখনোসখনো সংলাপের আশ্রয় নিতেন।

খ্রিস্টধর্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে 'মাইম' (mime) পরিবেশনা নিষিদ্ধ করা হলেও এই অভিনয়ের বিশেষ ঐতিহ্যগত ধারা অংশত রাজসভায় নিযুক্ত ভাঁড়েদের মধ্যে প্রচলিত থাকে। মধ্যযুগে (দ্র) মুখে রঙচঙ-মাখা চারণ গায়ক এবং অভিনেতারাও এই ধারা বহন করে চলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে বিকশিত মুখোশ-নাটকে ও রাজদরবারসমূহে মঞ্চস্থ ব্যালেতেও মূক অভিনয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকে ইতালির 'কোমেদিয়া দেলার্তে' মাইমকে একটা রুচিসম্মত উপস্থাপনার ভেতর দিয়ে যতদূর সম্ভব নবরূপ দান করে।

কোমেদিয়া দেলার্তের অনুসরণে ফ্রান্সে নির্বাক অভিনয়ের চরিত্র বা ভাঁড়েরা পরিণত হন সাদা মুখাবয়বের ফিগারে, যাদের বলা হয় পিরো (pierrot)। এর অর্থ ঢিলেঢালা পোশাক পরিহিত সাদা রঙমাখা মুখের ভাঁড় বিশেষ। এ জাতীয় এক জন বিখ্যাত ফরাসি অভিনেতার নাম জঁ গাস্পার্ দ্যব্যুরো (Jean Gaspard Deburau)। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মূক অভিনেতা হিসাবে তিনি অভিনয় করেন। তাঁর উত্তরসূরিদের মাধ্যমে দ্যব্যুরো-র প্রভাব বর্তমান কাল পর্যন্তও প্রসারিত। তাঁর এই প্রভাব দ্বারা বিখ্যাত প্যান্টোমাইম অভিনেতা মার্সেল মার্সো যেমন প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি তিনি নিজেও একে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

'প্যান্টোমাইম'(panto mime) থেকে সুস্পষ্টভাবেই পৃথক অর্থ বহন করে 'মাইম' শব্দটি। বিংশ শতাব্দীতে 'মাইম' তার সার্বিক অর্থসহ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এতিয়েন্ দ্যক্রু (Étienne Decroux)[জ. ১৮৯৮] কর্তৃক উদ্ভাবিত নাটকীয় রীতিপদ্ধতির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে। তাঁকেই 'আধুনিক মাইমের জনক' বলা হয়ে থাকে। জাক্ ল্যকক্-ও (Jacques Lecoq) [জ. ১৯২১] মাইমের আরেক আধুনিক দিকপাল। দ্যক্রু জাক্ কপো-র (Jacques Copeau) অধীনে ভিও কলঁবিয়ে (Vieux-Colombier) থিয়েটার স্কুলে মুখোশ-চর্চা ও শারীরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। দ্যক্রু-র ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন মার্সেল্ মার্সো (Marcel Marceau) এবং অভিনেতা লুই বারো (Louis Barrault)।

'প্যান্টোমাইম' খুবই সুনির্দিষ্টভাবে শ্বেত মুখাবয়ববিশিষ্ট একটা জাদুকরী শৈল্পিক রীতিকেই তুলে ধরে, যা গ্রহণ করা হয়েছে ঊনবিংশ শতকেরই বিভিন্ন সূত্র বা মাধ্যম থেকে।

মাইম এবং প্যান্টোমাইম শিল্পরীতি হিসাবে পৃথক সত্তার অধিকারী।

আ. হ.

www.pathagar.com

মাউন্ট্‌ব্যাটেন্‌, লর্ড [১৯০০—১৯৮০]

তাঁর পুরো নাম লুই ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ভিক্টর নিকোলাস মাউন্ট্‌ব্যাটেন্‌ (Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten) ১ম আর্ল মাউন্টব্যাটেন অব বার্মা।

ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল (নৌ-সেনাপতি)। রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রদৌহিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নরওয়ে ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ এবং ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বার্মায় জাপানিদের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর অভিযান পরিচালনা করেন। বিভাগপূর্ব ভারতের শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় (১৯৪৭) এবং বিভাগোত্তর ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম গভর্নর জেনারেল (১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ —জুন, ১৯৪৮) ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাটো (দ্র.) বা ভূমধ্যসাগরে উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার নৌ-সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অবসরগ্রহণের (১৯৫৬) পর ব্রিটেনের দেশরক্ষা বিভাগের প্রধান উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৮০ সালে লোকান্তরিত হন।

মো. ই.

মাও সে-তুং [১৮৯৩—১৯৭৬]

সাম্যবাদী বিপ্লবী, চীনা রাষ্ট্রনেতা, গণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠাতা, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (প্রতিষ্ঠা : ১৯২১ সালের জুলাই) অন্যতম সংগঠক। জন্ম ১৮৯৩ সালের ২৯শে নভেম্বর হুনান প্রদেশের শাওকানের এক সচ্ছল কৃষক পরিবারে। বর্তমানে মাও সে-তুং নামটি মাও জেদঙ্ (Mao Zedong) বানানে লিখিত হতে দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষাজীবন স্থানীয় একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯১৮ সালে হুনানের ফার্স্ট নর্মাল স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পর পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিসহকারী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯১৯ সালে মাও নিজের প্রদেশ হুনানে ফিরে শুরু করেন রাজনৈতিক তৎপরতা। দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের জন্য বেছে নেন শিক্ষকতার পেশা।

সাংহাইয়ে ১৯২১ সালে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এর পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির হুনান শাখার নেতা নির্বাচিত হন এবং গড়ে তোলেন জাতীয়তাবাদীদের মোর্চা কুওমিণ্টাং (দ্র)-এর সঙ্গে কমিউনিস্টদের যুক্তফ্রন্ট।

১৯২৫ সালের মার্চ মাসে চীনের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী নেতা সান্‌ ইয়াৎ-সেন্‌ (দ্র)-এর মৃত্যু হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন কমিউনিস্টবিরোধী নেতা চিয়াং কাই-শেক (দ্র)। তিনি ক্ষমতাসীন হয়েই কমিউনিস্ট নিধনে তৎপর হন।

১৯৩০ সালের জুন মাসে তৃতীয় লাল ফৌজ ও আর্মি কোরের সমন্বয়ে চিয়াং কাই-শেকের অনুগত বাহিনীকে মোকাবেলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। মাও ছিলেন এই অভিযানের রাজনৈতিক কমিসার। চিয়াং এই সময় মাওকে ধরার জন্য শুধু পুরস্কার ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নি, হুনান প্রদেশে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং গ্রেফতার করেন তাঁর স্ত্রী, ছোট বোন ও দুই ভাইকে। পরে মাওয়ের স্ত্রী ও ছোট বোনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

এর পর মাওয়ের নেতৃত্বাধীন লাল ফৌজকে (রেড আর্মি) নির্মূল করার জন্য চিয়াং কাই-শেক তাঁর বাহিনীসহ বেশ কয়েকটি অভিযান চালান, কিন্তু প্রতি বারই তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

১৯৩৪ সালে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ কিয়াংসি থেকে ইয়েনান অভিমুখে কমিউনিস্টদের ৩ হাজার মাইল দীর্ঘ যে পদযাত্রা শুরু হয়, তা-ই ঐতিহাসিক 'লং মার্চ' (দ্র) নামে খ্যাত।

১৯৩৭ সালে চীনের ওপর উপর্যুপরি জাপানি হামলার মুখে স্বদেশ রক্ষার স্বার্থে মাও-এর উদ্যোগে কুওমিণ্টাং-এর সঙ্গে কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শেষ হলে কমিউনিস্ট ও কুওমিণ্টাং-এর মধ্যে আবার লড়াই শুরু হয়ে যায়। অবশেষে

www.pathagar.com

বিজয়ী হয় মাওয়ের নেতৃত্বাধীন বাহিনী।

১৯৪৯ সালের ১৪ই অক্টোবর বিজয়ী কমিউনিস্ট মুক্তিফৌজের অগ্রগামী অংশ ক্যান্টনে প্রবেশ করলে চিয়াং কাই-শেক সদলবলে চীনের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে ফরমোজা দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেন।

১৯৪৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর মাও সে-তুং স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং তিনি এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকেন। পরে তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জীবদ্দশাতেই নিজের প্রণীত রাজনৈতিক দর্শন ও বিপ্লবী তত্ত্বের জন্য মাও সে-তুং যেমন বিশ্বের দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামী নেতার প্রতীকে পরিণত হন, তেমনি কোনো কোনো মহলের সমালোচনারও পাত্র হয়ে ওঠেন।

তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৭৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর।

আ. হু.

মাকড় কীটপতঙ্গ দ্র

মাকড়সা (spider)

মাকড়সা সকলেই চেনে। পৃথিবীর সর্বত্র আছে। ঘর-বাড়ি, মাঠ-ঘাট-বাগান, জলা, গুহা, মরুভূমি, পর্বত সবখানেই। প্রজাতি ৩০ হাজারের ওপর বলে জানা গেছে। অনুমান করা হয়, এই সংখ্যা লাখখানেকও হতে পারে।

মাকড়সা মোটেও কীটপতঙ্গ (দ্র) নয়। এরা অ্যারাক্নিড (Arachnid)। এদের পা আটটি, চোখ আটটি এবং সরল প্রকৃতির। দেহ শির, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত। ছোট ছোট লোমের মতো কাঁটায় সারা দেহ আবৃত। সব প্রজাতিরই দুটো করে বিষদাঁত থাকে। তবে, মোটে দু'একটি প্রজাতির বিষই মানুষের জন্য ক্ষতিকর। উদরের শেষপ্রান্তে স্পিনারেট (spinneret) নামক অঙ্গের অবস্থান। এ থেকে সিল্কের সুতো ছাড়ে। সুতো দিয়ে জাল বোনে। ডিম রাখা, কীটপতঙ্গ ধরা ও অন্যান্য কাজে তা ব্যবহার করে। তবে, সব প্রজাতিই যে সুতো তৈরি করতে পারে এমন নয়।

প্রজাতিভেদে মাকড়সা এক মিলিমিটার থেকে ২৫

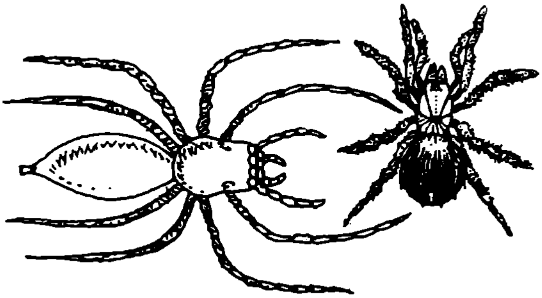

সেন্টিমিটার লম্বা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার টারান্টুলা বৃহত্তম প্রজাতি। বেশির ভাগ মাকড়সাই বাদামি, ধূসর বা কালো। তবে, কোনো কোনো প্রজাতি প্রজাপতি থেকেও সুন্দর।

এরা কীটপতঙ্গ, ব্যাঙাচি, ছোট মাছ ইত্যাদি খায়। কিছু প্রজাতি নেংটি ইঁদুর বা পাখিও খেতে পারে। মাকড়সা মানুষের বন্ধু। এরা বিভিন্ন রোগজীবাণু বহনকারী পতঙ্গ এবং ফসলের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ধরে খায়।

প্রজাতিভেদে স্ত্রী-মাকড়সা ১০০–২০০০ ডিম পাড়ে। সাধারণত এর পরই সে মারা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই ডিম থেকে বাচ্চা বেরোয়। ৭-৮ বার খোলস বদলানোর পর সে পূর্ণাঙ্গ মাকড়সায় পরিণত হয়। বেশির ভাগ প্রজাতি এক বছর বাঁচে। স্ত্রী–টারান্টুলা ২০ বছরও বাঁচতে পারে।

আ. ন. ম. আ. র.

মাকিয়াভেল্লি, নিকোলো [১৪৬৯—১৫২৮]

রাজনীতিক, ইতিহাসবিদ, নাট্যকার ও কূটনীতিবিদ হিসাবেই তাঁর পরিচয়। মাকিয়াভেল্লির (Nicolò Machiavelli) খ্যাতি ও কুখ্যাতির মূলে প্রধানত 'দ্য প্রিন্স' (১৫১৩) গ্রন্থটি। তাঁর রাষ্ট্র বিষয়ক চিন্তাধারা থেকেই মাকিয়াভেল্লি শব্দের উৎপত্তি। শব্দটি স্বেচ্ছাচার ও চরম বলপ্রয়োগে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসাবে প্রচলিত

মাকিয়াভেল্লির জন্ম ১৪৬৯ সালের ৩রা মে, ফ্লোরেন্সে। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৪৯৪ সালে। পরে ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্রের সচিব ও দ্বিতীয় চ্যান্সেলর হন।

১৫১২ সালে স্বৈরাচারী মেদিচি পরিবারের হাতে প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটলে মাকিয়াভেল্লি কারারুদ্ধ ও নির্যাতনের শিকার হন। ১৫১৩ সালে মুক্তি পেয়ে বেছে নেন অবসর

www.pathagar.com

জীবন। এই সময়েই লিখিত হয় তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান—তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের জন্য পৃথক নৈতিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। নিজের জীবনের রূঢ় অভিজ্ঞতাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে এ জাতীয় তত্ত্ব খাড়া করতে। কেননা, সমগ্র ইতালি তখন খণ্ডবিখণ্ড। রাজ্যে রাজ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সহিংস হানাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ইতালীয়দের কাছে জাতীয় ঐক্যের ধারণা তখনো অজ্ঞাত। এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ছিল মাকিয়াভেল্লির রচনা ও সক্রিয় রাজনৈতিক তৎপরতার মূল লক্ষ্য। এ বিচারে তিনি খাঁটি দেশপ্রেমিকও। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৫২৮ সালের ২২শে জুন।

আ. হু.

মাক্সমুলার্, ফ্রিড্রিশ্ [১৮২৩—১৯০০]

বিখ্যাত ভারতবিদ্যা-বিশারদ, সংস্কৃত ভাষার (দ্র) পণ্ডিত ও অনুবাদক। জন্ম ১৮২৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন প্রুশিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আন্হাল্ট্ রাজ্যের রাজধানী ডেসাউ নগরীতে। পিতা ভিল্হেল্ম্ ছিলেন স্থানীয় ডিউকের গ্রন্থাগারিক।

১৮৩৬ থেকে ১৮৪১ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফ্রিড্রিশ্ মাক্সমুলার্ (Friedrich Maxmuller) ভর্তি হন লাইপ্ৎসিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা, প্রধানত গ্রিক ও লাতিন ভাষা আয়ত্ত করার পর অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বিশেষভাবে সংস্কৃতও অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৩ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি লাভ করেন ডক্টরেট ডিগ্রি। এর অত্যল্পকাল পরেই তিনি বিষ্ণুশর্মা রচিত 'হিতোপদেশ' জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন (১৮৪৪)। বার্লিনে সংক্ষিপ্তকালের ছাত্রজীবন শেষে ১৮৪৫ সালে প্যারিসে (দ্র) আসেন। এখানকার প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ বুর্নফের কাছে শুরু হয় আরো উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়নের নতুন অধ্যায়। এই পণ্ডিতের প্রেরণাই মাক্সমুলারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেয়।

লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির পুঁথির সংগ্রহ থেকে সাহায্য লাভের আশায় ১৮৪৬ সালের জুন মাসে মাক্সমুলার্ ইংল্যাণ্ডে আসেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে তাঁর সম্পাদিত ঋগ্বেদ ছাপার ব্যবস্থা হওয়ায় ১৮৪৮ সালের মে মাসে তিনি লণ্ডন থেকে অক্সফোর্ডে চলে যান। জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি ব্রিটিশ প্রজারূপে এখানেই অতিবাহিত করেন।

১৮৫০ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং ১৮৫৪ সালে এই বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৮৫৯ সালে তাঁর রচিত 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ সালে নিযুক্ত হন এর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই ছিলেন, যদিও ১৮৭৫ সালের পর থেকে তাঁর পক্ষে ক্লাস নেওয়া সম্ভব ছিল না।

ইংল্যাণ্ডে ও ইংরেজি ভাষায় মাক্সমুলার্কে ভাষা-বিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার প্রবর্তক হিসাবে গণ্য করা হয়। আধুনিক ইউরোপীয় (কেল্টিক) ভাষাসমূহের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং এই তথ্য বা তত্ত্বের পক্ষে প্রচার মাক্সমুলারের অন্যতম কীর্তি। ভাষাবিজ্ঞানের মতো তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন) ও বিভিন্ন জাতির পুরাণ-কথাসমূহের তুলনামূলক আলোচনা (কম্পারেটিভ মিথোলজি) বিষয়েও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ।

মাক্সমুলার্ সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের পুরানো এই ধর্মগ্রন্থের মাহাত্ম্য পাশ্চাত্য জগতে প্রথম প্রচারের কীর্তি এই মনীষীরই। ভারতবর্ষে তাঁর সম্পাদিত এই গ্রন্থ পৌঁছুলে এক দল ধর্মান্ধ তাঁর সম্বন্ধে অপপ্রচারে নামেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয় নি।

১৮৫৭ সালে তাঁর পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সেক্রেড বুক্স্ অব দ্য ইস্ট্'। মোট ৫১ খণ্ডের এই মহাগ্রন্থের মধ্যে ২১টি খণ্ড বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংক্রান্ত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের সংখ্যা যথাক্রমে ১০ ও ২, অর্থাৎ মোট ৩৩টি খণ্ডই ভারত সম্পর্কিত। এই ভারতবিদ্যাবিদ যদি জীবনে আর কিছু নাও করতেন তবু কেবল 'সেক্রেড বুক্স্ অব দ্য ইস্ট্'-এর অক্লান্তকর্মা সম্পাদক হিসাবেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

তাঁর অন্যান্য রচনাকর্মের মধ্যে 'ইণ্ডিয়া : হোয়াট্ ক্যান্ ইট্ টিচ্ আস্' (১৮৮০), 'লেকচারস্ অন ভেডাণ্ট্ ফিলসফি' (১৮৯৪), 'সিক্স সিসটেম্স্ অব্ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি'

www.pathagar.com

(১৮৯৮),'রামকৃষ্ণ : হিজ্ লাইফ অ্যাণ্ড সেইংস্' (১৮৯৮) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কালিদাসের 'মেঘদূত' এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদ' (দ্র)-এর অনুবাদও তিনি করেন। ভাষাবিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও দেবতত্ত্ব বিষয়েও রয়েছে তাঁর বহু গ্রন্থ।

ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে বহু ভারতীয় মনীষী, ব্যক্তিত্ব, পণ্ডিত ও রাজনীতিকেরও ছিল সাক্ষাৎ পরিচয় এবং পত্র মাধ্যমে যোগাযোগ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দ (দ্র), কেশবচন্দ্র সেন (দ্র), দ্বারকানাথ ঠাকুর (দ্র), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (দ্র)। রাজা রামমোহনের (দ্র) প্রতিও তিনি ছিলেন অসীম শ্রদ্ধাশীল।

স্বাধীনতাকামী নবীন ভারতের সংগ্রামরত মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন। ১৮৯৮ সালে লোকমান্য তিলক (দ্র) রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে তাঁর কারামুক্তির জন্য ইংল্যাণ্ডে যে আন্দোলন হয়, ম্যাক্সমুলার্ তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের ফলে তিলক কারামুক্ত হন। 'এলবার্ট বিল'-এর পক্ষেও তিনি সোচ্চার ছিলেন।

বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করে। ইতালি ও প্রুশিয়া সরকারের কাছ থেকে লাভ করেন 'নাইট' উপাধি। ১৮৯৬ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'প্রিভি কাউন্সিলর' নিযুক্ত করে সম্মানিত করেন। ১৮৯২ সালে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েন্টেলিস্ট্স্'-এর নবম অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

১৯০০ সালের ২৮শে অক্টোবর অক্সফোর্ডে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। স্থানীয় সেন্টমেরি গির্জার হোলিওয়েল সমাধিক্ষেত্রে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়।

আ. হু.

মাখন

দুধ (দ্র) এবং ক্রিম থেকে তৈরি সুস্বাদু স্নেহজাতীয় পদার্থ। 'বাটার ফ্যাট' থেকে মাখন তৈরি হয়। দুধ ও দুধের সরে ছোট কণা আকারে 'বাটারফ্যাট' থাকে। দুধের চেয়ে ক্রিমে দশগুণ বেশি 'বাটারফ্যাট' থাকে। একটি বিশেষ তাপমাত্রায় ক্রিম থেকে মাখন-কণা বের করা হয়। এটাকে বিশেষ উপায়ে ঘুঁটুনি দিয়ে মাখন বানানো হয়।

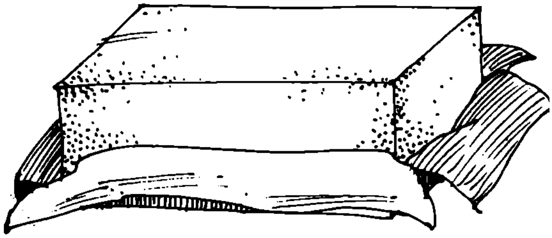

মাখনে প্রচুর কোলেস্টেরল থাকে। প্রতিগ্রাম মাখন থেকে ৭ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। এতে প্রচুর ভিটামিন (দ্র)-'এ' থাকে।

প্রথম কখন মানুষ মাখন খেতে শুরু করেছে তা সঠিক জানা যায় না। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালেও মোষের দুধ থেকে মাখন তৈরির কৌশল জানা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ১৮৫৬ সালে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাখন তৈরির প্রথম কারখানা চালু হয়।

মাখনের নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। সকলেই পাউরুটির ওপর মাখন মেখে খেতে ভালবাসে। অনেক রকম খাদ্যসামগ্রী ভাজার জন্য মাখন ব্যবহার করা হয়। মাখন থেকে বাটার অয়েল তৈরি হয়, তা রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন রোমের লোকজন কেশচর্চা এবং ত্বককে কোমল ও মসৃণ করার জন্য মাখন ব্যবহার করত।

সা. এ.

মাগন ঠাকুর [আনু. ১৬০০—১৬৫৯]

বর্তমান মায়ানমারের (দ্র) অর্থাৎ বার্মার উত্তর-পশ্চিমে এবং চট্টগ্রামের (দ্র) দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় মধ্যযুগে আরাকান বা রোসাঙ্ নামে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই রাজ্য শাসন করতেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মঘ রাজারা। কিন্তু রাজ্যে বাংলাভাষী মুসলমান ছিল অনেক। এদের মধ্যে শিক্ষিত জনেরা রাজসভায় উঁচু পদে চাকুরি করতেন। মন্ত্রী বা সচিব এবং সেনাপতিও হয়েছেন অনেকে। এঁরাই আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য (দ্র) ও সংস্কৃতির চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। মাগন ঠাকুর এঁদেরই এক জন। আলাওলের (দ্র) পৃষ্ঠপোষকরূপে তাঁর নাম বিখ্যাত। আনুমানিক ১৬০০ সালে তাঁর জন্ম হয়েছে। পুরো নাম কোরেশী মাগন ঠাকুর। 'ঠাকুর' সম্মানিত পদবি, সম্ভবত আরাকান রাজই পদবিটি দিয়ে থাকবেন। মাগন নাম কেন হল সে সম্পর্কে কেউ কেউ বলতে চান—মাগনের পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে মেগে এ পুত্রকে লাভ করেছিলেন, এ জন্য 'মাগন' নাম। সে যাই

www.pathagar.com

হোক, চেষ্টা আর সাধনায় মাগন ঠাকুর বড় হয়েছিলেন। কোরেশ বংশে জন্ম বলে তাঁর নামে 'কোরেশী' যুক্ত হয়েছে। কবির পূর্বপুরুষ আরব দেশ থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং চট্টগ্রামের চক্রশালায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মাগনের পিতার নাম বড় ঠাকুর। তিনিও আরাকান রাজসভার এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বড় ঠাকুর তাঁর পরিবার নিয়ে চলে আসেন আরাকান রাজ্যে। মাগনের ছোট ভাই ভিকনও ছিলেন এক জন কবি। তাঁর পদাবলী আছে। আরাকান রাজ নরপতিগীর বা নৃপতিগিরির ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন মাগন ঠাকুর। ১৬৪৫ সালে নরপতিগীরের (রাজত্বকাল ১৬৩৮–৪৫) মৃত্যু হলে মাগন ঠাকুর রাজপরিবারের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নরপতিগীরের ভাইয়ের ছেলে থদোমেঙদার বা সাদউ মেঙদারের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেন এবং সাদউ মেঙদারকে রাজা করেন। সাদউ মেঙদার কৃতজ্ঞতাবশত মাগন ঠাকুরকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করেন। সাদউ মেঙদারের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র থিরি সাদ থু ধম্মার (শ্রীচন্দ্র সুধর্মা) রাজত্বের (১৬৫২–৮৪) প্রথম কয়েক বছর মাগন ঠাকুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

মাগন ঠাকুর বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের অনুরাগী ছিলেন। আরাকান রাজসভায় বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ছিল এবং তিনি ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ভাগ্যের অন্বেষণে আলাওল (দ্র) যখন আরাকানে যান তখন মাগন ঠাকুরই তাঁকে আশ্রয় দেন এবং তাঁকে রাজ-অশ্বারোহী দলে চাকুরি দেন। পরে আলাওলের কবিপ্রতিভা দেখে তাঁকে কাব্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। মাগন ঠাকুরের অনুপ্রেরণার ফল আলাওলের 'পদ্মাবতী' (দ্র) কাব্যের রচনা। মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল 'সয়ফুলমূল্‌ক্ বদিউজ্জামাল' নামে আরেকটি কাব্যের অনুবাদেও হাত দেন। কিন্তু মাগনের জীবনকালে কাব্যটি শেষ হয় নি। আলাওলের কাছে মাগন ঠাকুর গান ও কবিতা বিষয়ে শিক্ষা নিয়েছিলেন। মাগন ঠাকুর জনৈক শাহ মাসুম পীরের মুরিদ ছিলেন। ১৬৫৯ সালে তিনি হঠাৎ মারা যান।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মাগন ঠাকুর শুধু পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, নিজেও কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। এটি রূপকথা জাতীয় রচনা। ভদ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভান সরন্দীপের রাজা সুরপালের কন্যা চন্দ্রাবতীর রূপগুণের কথা শুনে তাকে পাওয়ার জন্য দুঃসাহসিক অভিযানে বের হয়। যাত্রাপথে দেখা যায় নানা বাধাবিঘ্ন। বীরভান সব বাধা ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর সঙ্গে মিলিত হয়। তারপর তাদের বিয়ে হয়। 'চন্দ্রাবতী' রাজপুত্র-রাজকন্যার কাহিনী। তবে সাদামাটা কাহিনী নয়। অনেক আকর্ষণীয় ঘটনা এ কাব্যের মধ্যে আছে। 'চন্দ্রাবতী'র সঙ্গে এক উর্দু কাব্যের মিলের কথাও কেউ কেউ বলেছেন। এরকম মিল হয়তো আছে, তারপরও বলা যাবে 'চন্দ্রাবতী' মাগন ঠাকুরের স্বাধীন রচনা। মাগন ঠাকুর আলাওলের মতো বড় কবি নন, কিন্তু তাঁর কবিত্বশক্তি কিছুমাত্র কম ছিল না। তাঁর কাব্যের ভাষা উন্নত।

মাগন ঠাকুর আরাকানে শ্রদ্ধেয় রাজপুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র আরাকান রাজ্যের বিরাগভাজন হয়ে চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। কোনো কোনো গবেষক দুই জন মাগন ঠাকুর ছিলেন বলতে চান। এক জন হলেন আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, অন্য জন 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের কবি। কিন্তু অধিকাংশ গবেষক এই দুই জনকে একই ব্যক্তি মনে করেন।

আ. ক.

মাঘী পূর্ণিমা

এই পূর্ণিমা তিথিতে বৈশালীর চাপাল চৈত্যে অবস্থানকালে গৌতম বুদ্ধ (দ্র) ঘোষণা করেন যে তিন মাস পর তিনি নির্বাণ লাভ করবেন। তাই এই পূর্ণিমা তিথি বৌদ্ধদের জন্য শোকাবহ পরব। চট্টগ্রামে বহু 'কেয়াং'-এ (বৌদ্ধ বিহারে) মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে মেলা বসে। তখন সেখানে 'ব্যূহচক্র' তৈরি করা হয়। সেই ব্যূহচক্রে ঘুরে ঘুরে বৌদ্ধরা পুণ্য সঞ্চয় করে। পটিয়া থানার ঠেগরপুনি ও রামুতে বিরাট মেলা হয়।

বি. ব.

মাছ

মাছ অতি পরিচিত জলজ মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা বিশ্বের

www.pathagar.com

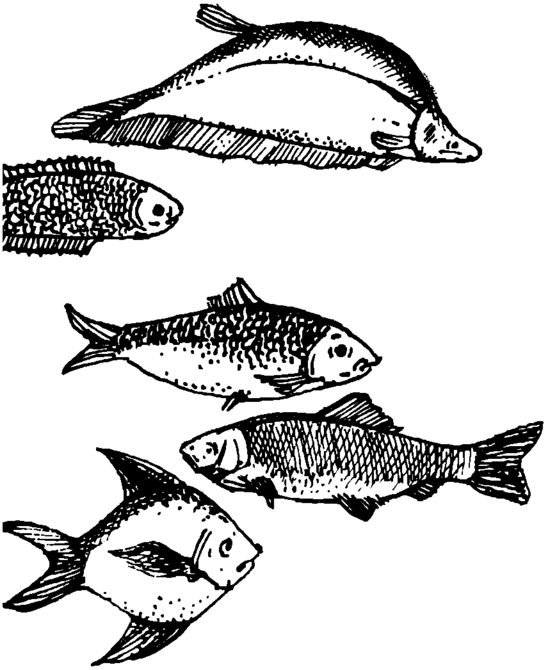

সবখানে লোনা ও মিঠা পানিতে বাস করে। বিজ্ঞানীদের মতে, এরাই প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে এদের উৎপত্তি হয়েছে। এরা শীতল রক্তবিশিষ্ট অর্থাৎ পারিপর্শ্বিক তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে।

মাছ সহজপাচ্য ও উন্নত মানের আমিষ সমৃদ্ধ খাবার। খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। অনেকে শখ করে এদের পোষে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পৃথিবীতে (দ্র) প্রায় ২১,৭০০ প্রজাতির মাছ আছে। লোনা পানিতে ১৩,৩০০ এবং মিঠা পানিতে ৮,৪০০ প্রজাতির বাস। প্রজাতিভেদে এদের আকৃতি-বর্ণে বিস্তর পার্থক্য থাকে। ফিলিপাইনের পিগমি গোবি ক্ষুদ্রতম প্রজাতি —মাত্র ১৩ মিলিমিটার। হোয়েল শার্ক (whale shark) বৃহত্তম—১২ মিটার আয়তন ও ১৪ মেট্রিক টন ওজন।

মাছের দেহ সাধারণত মাঝখানে মোটা, দু' প্রান্ত ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে এসেছে। এর দেহ সাধারণত আঁশে আবৃত। দেহে জোড়ায় জোড়ায় পাখনা (fin) থাকে। এরা লেজের পাখনা নেড়ে সাঁতার শুরু করে, ক্রমান্বয়ে সমস্ত দেহ ডাইনে-বাঁয়ে নাড়ে। এদের দৃষ্টিশক্তি ভাল, ঘ্রাণশক্তি প্রখর। এরা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে দেহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, ফুলকার সাহায্যে শ্বাস-কার্য চালায়।

পানির ওপরের বা মাঝখানের স্তরে বসবাসকারী মাছের দেহ দু' পাশে চ্যাপ্টা। নিচের স্তরের মাছের দেহ ওপরে-নিচে চ্যাপ্টা। ল্যাম্প্রে, হ্যাগফিশ আদি প্রকৃতির। এদের চোয়াল নেই। হাঙ্গর ও স্ক্যাট-এর দেহ তরুণাস্থি দিয়ে গঠিত। এরা অত্যন্ত হিংস্র।

বেশির ভাগ মাছই একলিঙ্গ। কিছু প্রজাতি উভলিঙ্গ। বেশির ভাগই ডিম পাড়ে। কিছু প্রজাতি সরাসরি বাচ্চা দেয়। ডিম ফুটে অল্প দিনের মধ্যেই লার্ভা বেরোয়। বড় হতে লাগে কয়েক সপ্তাহ। কিছু ল্যাম্প্রে পাঁচ বছর লার্ভা অবস্থায় থাকে। এরা জীবনভর বাড়তে পারে। ছোট প্রজাতিগুলো ১ থেকে ৩ বছর এবং অল্প কিছু বড় প্রজাতি ১০, ২০, এমনকি ৫০ বছরও বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

মাছি (fly)

মাছি অতি পরিচিত কীটপতঙ্গ (দ্র)। ডিপ্‌টেরা (Diptera) বর্গের প্রাণী। গ্রিক শব্দ 'di' (দুই) ও 'ptera' (পাখা) মিলে ডিপ্‌টেরা। এ দলে প্রায় লাখ খানেক প্রজাতি আছে। ঘরের মাছি *'মাস্কা ডোমেস্টিকা' (Musca domestica)* সবচেয়ে পরিচিত। পৃথিবীর (দ্র) সর্বত্র ময়লা-আবর্জনার পাশে ঘুর ঘুর করে।

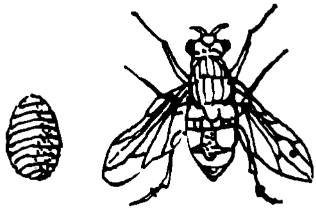

প্রজাতিভেদে মাছির আকৃতি-বর্ণে পার্থক্য থাকে। নসিয়াম মিজ (Midge) ক্ষুদ্রতম প্রজাতি—মাত্র ১.৩ মিলিমিটার। মাইডাস মাছি বৃহত্তম—৭.৬ সেন্টিমিটার। ঘরের মাছি ৫ থেকে ৭ মিলিমিটার, রঙ হালকা-মেটে। স্ত্রী-মাছি খানিকটা বড়।

মাথা, বুক উদর নিয়ে মাছির দেহ। লোমের মতো অসংখ্য ছোট ছোট কাঁটায় সমস্ত দেহ আবৃত। মাথায় দুটো বড়-বড় পুঞ্জাক্ষি। এক জোড়া শুঙ্গও আছে। একটি শুঁড়

www.pathagar.com

দিয়ে খাবার চেটেপুটে তোলে। দেহের পেছনের অংশ দিয়ে খাবারের গন্ধ নেয়। পা দিয়ে স্বাদ নেয়। ময়লা-আবর্জনা ছাড়াও কোনো কোনো প্রজাতি ফুল-ফলের রস, ঘাস, রক্ত খেতে পারে।

সাধারণত বর্ষাকালে আবর্জনাপূর্ণ স্থানে স্ত্রী-মাছি একসঙ্গে ১০০–১৫০টি সাদা লম্বাটে ডিম পাড়ে। স্ত্রী-মাছি জীবনে প্রায় ৬০০–১০০০টি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে চোখ-পা-মুণ্ডহীন সাদা কিড়া বেরোয়। ময়লা খেয়ে খেয়ে বড় হয়। দু'বার খোলস বদলানোর পর নিশ্চল পুত্তলিতে পরিণত হয়। এক দিন পুত্তলির খোলস ফেটে পূর্ণাঙ্গ মাছি বেরোয়। পূর্ণাঙ্গ মাছি ১–২ মাস বাঁচে।

গ্রীষ্মকালেই এরা বেশি জ্বালাতন করে। সারা দিন খাবারদাবারের ওপর ভনভন শব্দে উড়ে বেড়ায়। ডায়রিয়া (দ্র), আমাশয় (দ্র), টাইফয়েড জ্বরের (দ্র) মতো মারাত্মক রোগজীবাণু ছড়িয়ে আমাদের বেশ ক্ষতি করে।

আ. ন. ম. আ. র.

মাজেলান, ফার্দিনান্দ

[আনু. ১৪৮০—১৫২১]

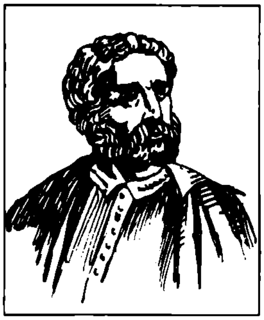

পর্তুগিজ নাবিক এবং প্রাচীন বিশ্বের জলপথ আবিষ্কার অভিযানের অন্যতম নায়ক। তিনি আনুমানিক ১৪৮০ সালে পর্তুগালের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ফার্দিনান্দ মাজেলান (Ferdinand Magellan) প্রথম জীবনে পর্তুগিজ কোর্টে বীরব্রতী (Knighthood) পদে শিক্ষানবিশ ছিলেন। ১৫০৫ সালে তিনি ফ্রান্সিসকো দে আলেমিদার (Francisco de Alemida) অধীনে ভারতের (দ্র) উদ্দেশ্যে নৌ যাত্রা শুরু করেন।

১৫১২ সালে মাজেলান পর্তুগাল ফিরে আসেন। পরের বছর তিনি দেশের পক্ষে মরক্কোয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং আহত হন। তখন তিনি পর্তুগাল সম্রাটের কাছে তাঁর ভাতা বৃদ্ধির আবেদন জানান। কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য হয়। এরপর ১৫১৭ সালে তিনি স্পেন চলে যান এবং স্পেনের রাজা ১ম চার্লসের কাছে চাকুরির আবেদন জানান। তিনি স্পেনের পশ্চিম দিকে আটলান্টিকের মধ্য দিয়ে মলাক্কাস (Moluccas) গমনের পথ আবিষ্কারের দায়িত্ব পান।

মাজেলান ১৫১৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর সেভিই (Seville) থেকে ৫টি জাহাজসহ ২৭০জন যাত্রী নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু করেন। ১৫২০ সালে ২৮শে নভেম্বর তিনি আটলান্টিক অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করেন। এই মহাসাগরের পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাড়ি দিয়ে তিনি এর বিশালত্ব সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করেন। তিনিই প্রশান্ত মহাসাগরের নামকরণ Pacific Ocean করেন। ১৫২১ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে তিনি ফিলিপাইনে এসে পৌঁছান এবং সেখানে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৫২১ সালের ২৭শে এপ্রিল তিনি ম্যাকটান (Mactan) দ্বীপে নিহত হন। তাঁর নৌবহরের একটি জাহাজ ১৫২২ সালে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হয়।

পৃথিবী গোল— এই ধারণা মাজেলানের সমুদ্র অভিযান থেকেই প্রমাণিত হয়। তাঁর অভিযান জল ও স্থলভাগের আপেক্ষিক পরিমাণ সম্পর্কিত ধারণাকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। আমেরিকা মহাদেশ দু'টি যে এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা জগৎ তা মাজেলানের সমুদ্র অভিযান থেকেই প্রথম জানা যায়।

সুজ. ব.

মাটি

বায়ু (দ্র), তুষার (দ্র), বৃষ্টি ইত্যাদির আঘাতে রূপান্তরিত ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে শিলার সূক্ষ্ম কণা, ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদ (দ্র) এবং মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ দিয়ে গঠিত পৃথিবীর (দ্র) ভূ-ত্বক। মাটি এক-দু' দিনে গঠিত হয় না। এর জন্য লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে।

পৃথিবী সৃষ্টির গোড়ার দিকে মাটি শিলা (rock)–পাথরের (stone) আকারে ছিল। অর্থাৎ তখন মাটি বলতে শিলা–পাথরকে বোঝাত। পৃথিবীর সেই সূচনাকাল থেকে এই শিলা–পাথরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বায়ুপ্রবাহ, তুষারপাত, তাপ, বৃষ্টি, কার্বনিক অ্যাসিড প্রভৃতির প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। এই সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে শিলা-পাথর ভেঙে ছোট ছোট বালির সৃষ্টি হয়। ব্যাক্টেরিয়া (দ্র) এবং অন্যান্য অতি সূক্ষ্ম জীব (micro-organism) সেই বালিকে মাটিতে রূপান্তরিত করে। ব্যাক্টেরিয়া মৃত গাছপালা এবং জন্তু-জানোয়ারের দেহকেও ধীরে ধীরে মাটি বানিয়ে

www.pathagar.com

ফেলে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ, পোকামাকড়, কেঁচো (দ্র) এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম জীব প্রতিনিয়ত জৈব পদার্থ সৃষ্টি করে করে সেই মাটিকে আরো উর্বর করে তোলে।

মাটির তিনটি স্তর আছে। যেমন— ১. নিম্নস্তর বা শয্যাশিলা—ধূসর রঙবিশিষ্ট, ২. অধঃমৃত্তিকা—ফিকে রঙবিশিষ্ট, এবং ৩. ঊর্ধ্বমৃত্তিকা— গাঢ় রঙবিশিষ্ট। মাটির সবচেয়ে নিচের স্তর শক্ত পাথর বা মাটির ভারি কণা দ্বারা গঠিত। এই স্তরকে শিলাস্তর বা শয্যাশিলা বলে। শিলাস্তরের উপরের স্তরটি অধঃমৃত্তিকার স্তর এবং মাটির সবচেয়ে উপরের স্তরটিকে বলে ঊর্ধ্বমৃত্তিকা-স্তর। এই স্তরটি হালকা উপাদান দ্বারা গঠিত। গাছপালা ও জীবজন্তুর দেহ পচে এই স্তরে যে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে হিউমাস (humas) বলে। হিউমাস ঊর্ধ্বমৃত্তিকার উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং গাছপালা জন্মাতে ও এদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। ঊর্ধ্বমৃত্তিকার স্তর থেকে অন্য স্তর দু'টি অধিক পুরু।

ঊর্ধ্বমৃত্তিকা প্রধানত তিন প্রকার—বেলেমাটি, কাদা বা এঁটেল মাটি এবং দো-আঁশ মাটি। এই তিন প্রকারের মাঝামাঝি আরো দুই প্রকারের মাটি আছে। এগুলো হল বেলে দো-আঁশ এবং এঁটেল দো-আঁশ মাটি।

সুজ. ব.

মাঢ়ী প্রদাহ দন্তরোগ দ্র

মাণ্টো, সাদাত হাসান [১৯১২—১৯৫৫]

উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত জীবনবাদী কথাসাহিত্যিক। তিনি ভারতের পাঞ্জাবের এক অখ্যাত গ্রাম সমরালাতে ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যয়ন-জীবন শেষে ভর্তি হন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখান থেকেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি চলে আসেন বোম্বাই শহরে এবং গভীরভাবে চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে জড়িত হন। তিনি বেশ কিছু ব্যবসা-সফল চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা করেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন উর্দু কথাসাহিত্যিক খাজা আহমদ আব্বাস ও কৃষণ চন্দর (দ্র)।

সাদাত হাসান মাণ্টোর সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা তিরিশের দশকে। মূলত ছোটগল্প রচনা ও প্রকাশের ভেতর দিয়ে তিনি উর্দুভাষী পাঠকদের চিত্ত জয় করে নেন। তাঁকে অনেক সমালোচক উর্দু সাহিত্যের 'নীলকণ্ঠ' নামেও অভিহিত করে থাকেন।

মাণ্টোর সাহিত্যিক আদর্শ ছিল তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ভেতর দিয়ে সামাজিক পঙ্কিলতার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং সমাজের নিচু তলার মানুষের সুখ-দুঃখ, ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে গভীর মমতায় তুলে ধরা।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর মাণ্টো পাকিস্তানে চলে আসেন। কিন্তু যে সৎ, স্বাধীন ও আদর্শগত মনোভাব নিয়ে তিনি নতুন করে তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের সূচনা করেন,. পাকিস্তানের (দ্র) সেই কালের রক্ষণশীল মহলের দ্বারা তা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমনকি পঞ্চাশের দশকে এক বার তাঁকে তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় পর্যন্ত দাঁড়াতে হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ মাণ্টোর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিকজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর 'খোল দো', 'ঠাণ্ডা গোশ্‌ত্' ও 'তোবাটেক সিং'-সহ আরো কিছু ছোটগল্পে সাতচল্লিশের দাঙ্গার পটভূমি ও বেদনা যেভাবে বিধৃত, তার তুলনা মেলা ভার।

তিনি ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

মাতিস্, অঁরি [১৮৬৯—১৯৫৪]

ফরাসি চিত্রকর। ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'ফোভ্' (Fauve) গ্রুপের নেতা এবং চিত্রকর্মে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় অভিব্যক্তি প্রকাশে যে কোনো রঙ ব্যবহার ও স্বাধীন শৈলী-বৈশিষ্ট্য অনুসরণের এক জন প্রধান প্রবক্তা। তাঁর শিল্পকর্ম বিংশ শতাব্দীর বহু চিত্রকরকে বহুভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছে।

তাঁর পুরো নাম অঁরি এমিল্ বেনোয়া মাতিস্ (Henri Émile Benoit Matisse)। ১৮৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তিনি উত্তরাঞ্চলীয় ফ্রান্সের স্যাঁ ক্যঁত্যাঁ (St. Quentin)-এর নিকটবর্তী ল্য কাতো (Le Cateau)-তে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথমে তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে শুরু করলেও অচিরকালের মধ্যে চিত্রকর হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ১৮৯০ সালে তিনি অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হন। সুস্থ হওয়ার পর মাতিস্ অবসর বিনোদনের জন্য ছবি

www.pathagar.com

এ. মাদাম মাতিসের প্রতিকৃতি—১৯১৩
শিল্পী : অঁরি মাতিস

শিল্পী ও মডেল—১৯১৭
শিল্পী : অঁরি মাতিস

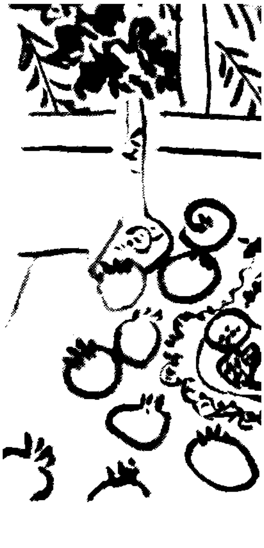

জড়-জীবন, শিল্পী : অঁরি মাতিস

আঁকতে শুরু করেন। পরে তিনি স্থানীয় চারুকলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৯২ সাল নাগাদ আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন ত্যাগ করে প্যারিসে চলে আসেন। প্যারিসে তিনি বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবি কপি করে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। তবে ১৯১০-এর দশকের শেষ নাগাদ তাঁর সৃষ্ট কর্মে চিত্রকর হিসাবে মাতিসের বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে। সমগ্র জীবন ধরে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় অভিব্যক্তির সঙ্গে দৃশ্যগত যৌক্তিকতার সমন্বয় সাধন করে গেছেন, এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। ১৯২০-এর দশকে মাতিস্ শিল্পী হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেন।

তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নৃত্য', 'পিয়ানো শিক্ষা', 'খোলা জানালা' এবং 'ওসেনিয়ার স্মৃতি'।

শেষ জীবনে মাতিস্ নিস্-এ বসবাস করতে শুরু করেন। এখানেই তিনি পঙ্গু অবস্থায় ১৯৫৪ সালের ৩রা নভেম্বর মারা যান।

আ. হু.

মাতুব্বর, আরজ আলী [১৩০৭—১৩৯২ ব.]
জন্ম ১৩০৭ সনের [খ্রি. ১৯০০] ৩রা পৌষ। বরিশাল শহর থেকে ৭/৮ কিলোমিটার দূরে, কীত্তনখোলা নদীর পার্শ্ববর্তী লামচরি নামে এক গ্রামে। শৈশবে চার বছর বয়সে বাবাকে হারান। অত্যন্ত দরিদ্রের সংসারে বিধবা মা পাঁচ ছেলেমেয়েকে নিয়ে কোনো রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। বসতবাটি ও সামান্য ফসলী জমি ক্রমে হাতছাড়া হয়ে যায় দেনার দায়ে; পরিবারটি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যায়।

এই পরিবেশে আরজ আলীর পক্ষে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং কেবলমাত্র নিজের অধ্যাবসায় ও চেষ্টা দিয়ে; তিনি সম্পূর্ণরূপে স্ব-শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি গ্রন্থপ্রেমিক ছিলেন; নিজের উদ্যোগে মানুষজন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে বই সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন। যেহেতু লেখাপড়ায় তাঁর কোনো ডিগ্রি ছিল না তাই তিনি চাকরিবাকরি করতে পারেন নি, পৈতৃক পেশা কৃষিকাজেই ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি জমি জরিপের কাজ অর্থাৎ 'আমিনে'র কাজ শিখে ফেলেন, পরে এই কাজকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। গণিত ও জ্যামিতি, মাপজোক ইত্যাদি নিজের সাধনায় এত ভাল শিখেছিলেন যে, বরিশাল অঞ্চলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

যখন তাঁর বয়স ৩২ বছর তখন একটি ঘটনায় জগৎ, জীবন ও মানুষ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে। সেসব প্রশ্নের সমাধানে তিনি বইপত্র পড়াশোনা শুরু করেন এবং সর্বোপরি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নিজস্ব ধরনে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এর

www.pathagar.com

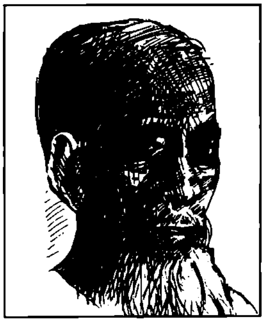

ফলে তিনি তাঁর উপলব্ধি ও বিচার-বিবেচনাপ্রসূত রচনা লিখতে শুরু করেন। তাঁর সকল রচনা দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে। 'সত্যের সন্ধান' (১৩৫৮/১৯৫১), 'সৃষ্টি-রহস্য' (১৯৭৮), 'অনুমান' (১৩৯০/১৯৮৩), 'মুক্তমন' (১৯৮৮) তাঁর এ জাতীয় বই। তিনি মননশীল ভাবুক-লেখক হিসাবে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

মৃত্যুর পূর্বে এই অতি সাধারণ অথচ আমাদের সময়ের উল্লেখযোগ্য বলিষ্ঠ চিন্তাবিদ মানুষটি লেখক হিসাবে দু'টি সম্মাননা পেয়েছিলেন: হুমায়ূন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৮) এবং বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর বরিশাল শাখার পক্ষ থেকে সংবর্ধনাজ্ঞাপন (১৯৮২)। বাংলা একাডেমী তাঁকে আজীবন সদস্যপদ দান করে এবং ১৩৯২ সনের ১লা বৈশাখ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। এ বৎসরেই, ১৩৯২ সনের (খ্রি. ১৯৮৬) ১লা চৈত্র তারিখে, ৮৬ বৎসর বয়সে তিনি বরিশাল মেডিক্যাল হাসপাতালে পরলোকগমন করেন।

হা. মা.

মাত্রা ছন্দ দ্র

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দ্র

মাৎসিনি, জুসেপ্পে [১৮০৫—১৮৭২]

ইতালির জাতীয়তাবাদের জনক ও ঐক্যবদ্ধ ইতালির স্বপ্নদ্রষ্টা। সাধারণভাবে মানবীয় ও গণতান্ত্রিক গুণসম্পন্ন জাতীয়তাবাদই ছিল মাৎসিনির (Giuseppe Mazzini) চিন্তার প্রধান বিষয়। জন্ম ১৮০৫ সালের ২২শে জুন জেনোয়া শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে।

রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় 'কার্বোনারি' নামের এক গোপন সমিতির সদস্য ছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে গোপন আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশবাসীর মুক্তি এবং তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জন সম্ভব নয়। এই লক্ষ্য সাধনে পরিচালিত আন্দোলনে প্রয়োজন দেশের যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই তিনি ১৮২১ সালে গড়ে তোলেন 'ইয়ং ইতালি' নামের একটি সংগঠন।

মাৎসিনির নেতৃত্বে পরিচালিত উল্লিখিত যুবসংগঠনটির লক্ষ্য ছিল দেশের মাটি থেকে অস্ট্রিয়ানদের বিতাড়িত করা এবং ইতালির খণ্ডবিখণ্ড রাজ্যগুলোকে একটি একক রাষ্ট্রকাঠামোর অধীনে নিয়ে আসা। শুধু তাই নয়, সমগ্র দেশের জন্য একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তাও গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন মাৎসিনি।

১৮৪৮ সালে তিনি মিলান শহর মুক্ত করতে স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৮৪৯ সালে রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে তিন জনকে নিয়ে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়, তিনি তার প্রধান নিযুক্ত হন। তবে অচিরেই এই প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটলে তিনি আবার বিদেশে পাড়ি জমান। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মাটিতে বসেই মাৎসিনি তাঁর অধিকাংশ রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের মধ্যে জুসেপ্পে গারিবাল্দির (দ্র) নাম বিশেষ স্মরণীয়।

দীর্ঘ প্রবাসজীবনশেষে ১৮৭২ সালে মাৎসিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং সে বছরই পিসা-য় তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. হু.

মাৎস্যন্যায় পালবংশ দ্র

মাথাধরা / মাথাব্যথা

মাথাধরা বা মাথাব্যথা বিভিন্ন রোগের লক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়ে থাকে। এর কারণ একাধিক। তবে নির্দিষ্ট রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাথাধরার কারণের মধ্যে রয়েছে আঘাত, প্রদাহ (দ্র), টিউমার (দ্র), রক্তবাহ সংক্রান্ত ও বিপাকীয় গোলযোগ, আবেগ, উত্তেজনা ইত্যাদি।

আঘাতজনিত মাথাব্যথার মধ্যে রয়েছে মাথায় বা গ্রীবাদেশীয় মেরুদণ্ডে আঘাত। প্রদাহের মধ্যে রয়েছে মেনিন্‌জাইটিস্ (দ্র), মস্তিষ্কপ্রদাহ, সাইনাসপ্রদাহ, চক্ষু (দ্র) ও কর্ণের (দ্র) প্রদাহ, মস্তিষ্কের রক্তবাহ প্রদাহ। মাথার ভেতরে, মেরুদণ্ডের গ্রীবা-অংশে টিউমার হলে তীব্র মাথাব্যথা দেখা দেয়। আবার উচ্চ রক্তচাপ (দ্র) ও মাইগ্রেনও তীব্র মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। থাইরয়েড্ (দ্র) গ্রন্থির স্বল্পক্রিয়া, বিশেষ ধরনের রক্তকোষের রোগ বা ঔষধের বিষক্রিয়াতেও মাথাব্যথা দেখা দিয়ে থাকে। যেমন থাকে

www.pathagar.com

আবেগ-উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা বা ডিপ্রেশানে অথবা কোনো কোনো মানসিক রোগে। এ ছাড়াও তীব্র জ্বর, দাঁতের ব্যথা, স্নায়বিক প্রদাহ, গ্লোকোমা (দ্র) ইত্যাদি নানা ধরনের রোগেও মাথাব্যথা দেখা দেয়।

স্বভাবতই মাথাব্যথার সঠিক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট রোগনিরাময়ের ব্যবস্থা করা। কিন্তু যন্ত্রণা-লাঘবের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে বেদনানাশক ঔষধ, যেমন— প্যারাসিটামল বা এসপিরিন বা অনুরূপ ঔষধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাইগ্রেন বা অনুরূপ কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথায় সেডেটিভ বা প্রশান্তিদায়ক ঔষধও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিদ্রাকর্ষক ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আ. র.

মাদক দ্রব্য (drugs of abuse)

অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে যা নেশা সৃষ্টি করে। এক বার কেউ এসব সেবন করতে শুরু করলে আর ছাড়তে পারে না। এরা শরীর ও মনে উত্তেজনা জাগায়, ঘুম আনে, আচ্ছন্নতা অথবা মায়াবিভ্রম সৃষ্টি করে। এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মাদক দ্রব্য নামে পরিচিত। আফিম (দ্র) এবং গাঁজা (দ্র) মাদক দ্রব্যের দু'টি উদাহরণ। মাদক দ্রব্য যারা গ্রহণ করে, তা হঠাৎ ছেড়ে দিলে তাদের শরীরে ও মনে নানা সমস্যা দেখা দেয়। এ জন্য তারা সহজে তা ছাড়তে পারে না।

মাদক দ্রব্য নানা রকমের হতে পারে। কতকগুলো মাদক দ্রব্য ঘুম ও আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে। আফিম, মর্ফিন, হেরোইন (দ্র), পেথিডিন, বার্বিচুরেট এ ধরনের মাদক দ্রব্য। আর কতকগুলো মাদক দ্রব্য শরীরে ও মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। গাঁজা, অ্যাম্ফেটামিন সে-ধরনের মাদক দব্য।

আজকাল মাদক দ্রব্যের নেশা দেশে দেশে একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। মাদক দ্রব্যের নেশা মানুষের স্বাস্থ্যহানি করে, সংসারে অশান্তি ডেকে আনে এবং টাকা-পয়সা নষ্টের কারণ ঘটায়। দেশ ও সমাজের জন্য মাদক দ্রব্য এক অভিশাপ।

সা. এ.

মাদকাসক্তি

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (দ্র) সংজ্ঞা অনুযায়ী মাদকাসক্তি হচ্ছে চিকিৎসায় গ্রহণযোগ্য নয় এমন উপাদান অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রমাগত কিংবা বিক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করা এবং সেই উপাদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে ওঠা। মাদক দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর যখন আর তা ছাড়া যায় না, তখন সেই অবস্থার নাম মাদকাসক্তি।

বিশ্বের সর্বত্র মাদকাসক্তি ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। তরুণ ও যুবসমাজই প্রধানত এই আসক্তির শিকার। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে মাদকাসক্ত রোগীর সংখ্যা পনেরো লাখ। ঔষধাসক্তিও (দ্র) এক ধরনের মাদকাসক্তি, কারণ সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ এবং অনুরূপ উপাদান মাদক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মাদকাসক্তির প্রধান কারণ সঙ্গদোষ, দুশ্চিন্তা, পারিবারিক অবহেলা, নৈতিক অবক্ষয় এবং মাদক দ্রব্যের প্রতি আগ্রহ। মাদকাসক্তির সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন— ছিনতাই, রাহাজানি, নির্যাতন, হত্যা ইত্যাদি। মাদকাসক্তি দেহের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা নষ্ট করে এবং পরিণামে আসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে থাকে।

বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত সব দেশই এখন মাদকাসক্তির সামাজিক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি —প্রত্যেকের দায়িত্ব এই সর্বনাশা ঝোঁকের বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া।

আ. আ. হা.

মাদল

চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র। লৌকিক তালযন্ত্র। দেখতে ঢোলকের মতো, তবে ঢোলকের চেয়ে খানিক সরু ও লম্বা। এর প্রাচীন নাম মর্দল মুরজ। ঢোলকের মতোই কাঠের খোল বা লকড়ি চামড়ায় ছেয়ে মাদল তৈরি করা হয়। দুই প্রান্তের ছাউনি

রজ্জু বা ডোরির সাহায্যে টান করা থাকে। কোনো কোনো মাদলে সুর করার জন্য ডোরির ভিতরে পেতলের বা লোহার রিং ঢোকানো থাকে। মাদল উপজাতীয় সঙ্গীতে, বিশেষ করে সাঁওতালদের (দ্র) সঙ্গীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

মাদলের বাম মুখে বা কোনো কোনো স্থলে উভয় মুখে খিরণ ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো মাদলে খিরণ একেবারেই ব্যবহার করা হয় না। বড়, মধ্যম ও ছোট এমনি নানা আকৃতির মাদল আছে। ফিতার সাহায্যে গলায় ঝুলিয়ে মাদল বাজানো হয়ে থাকে। প্রয়োজনে বসে কোলে রেখেও মাদল বাজানো যেতে পারে।

ক. গো.

মাদাম তুসোর জাদুঘর

১৮৮৪ সালে লণ্ডন (দ্র) শহরে এটি স্থাপিত হয়। এই বিশ্ববিখ্যাত জাদুঘরের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে বিশ্বের বিশিষ্ট মনীষী ব্যক্তিবর্গের মূর্তি এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনার হুবহু অনুকরণে দৃশ্য সৃষ্টি করে তাতে অংশগ্রহণকারী যেসব পাত্রপাত্রীর মূর্তি গড়ে তোলা হয়েছে, তার সবই মোমের তৈরি। ছোট-বড় সব বয়সী দর্শকদের কাছে এইসব মূর্তি প্রথম দর্শনেই মনে হয়, এগুলো বুঝি সত্যি জীবন্ত। এই জাদুঘরের পরিকল্পক ও নির্মাতা ফরাসি নাগরিক মারি তুসো (Marie Tussaud)। তাঁর নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'মাদাম তুসো মিউজিয়াম'।

মাদাম তুসো (১৭৬১–১৮৫০) ছিলেন ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের ভগ্নী এলিজাবেথের সহচরী ও সেক্রেটারি। তাঁর পিতা ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী। তুসোর বয়স যখন ছ' বছর তখন তাঁর মামা ডা. ফিলিপ ক্যুর্তিউ (Philippe Curtius)-র তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশোনা করতে প্যারিসে (দ্র) আসেন। ফিলিপ যেহেতু ডাক্তারি পড়তেন, সেহেতু তাঁকে মানবদেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ মোম দিয়ে তৈরি করতে হত। পরে তিনি খেয়ালের বশবর্তী হয়ে মোম দিয়ে মানুষের আবক্ষ মূর্তিও তৈরি করতে শুরু করেন। এ কাজে মাদাম তুসোও তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন।

মামা ও ভাগিনেয়ীর যৌথ প্রচেষ্টায় মোমের তৈরি সেইসব মানবমূর্তি জনসাধারণ্যে প্রদর্শিত হলে তাঁদের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ডা. ফিলিপ প্যারিসে স্টুডিও স্থাপন করেন। রাজা চতুর্দশ লুই তাঁদের তৈরি মূর্তিগুলো দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর সখ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে মাদাম তুসোর স্থান হয় ভার্সাই (Versailles) রাজপ্রসাদে। অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি মোমের মূর্তি তৈরির কাজে মামা ডা. ফিলিপকেও দক্ষতার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যান।

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব (দ্র) সংঘটিত হলে ফরাসি রাজপরিবারের সকলের সঙ্গে মাদাম তুসোও বিপ্লবীদের হাতে বন্দি হন। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের জোরেই তিনি মুক্তি পান এবং তাঁর স্বামী ফ্রঁসোয়া তুসোর ওপর প্যারিসে স্থাপিত তাঁর স্টুডিওর দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি নিজে লণ্ডনে চলে আসেন। ৭৪ বছর বয়সে তিনি লণ্ডন শহরের বেকার স্ট্রিটে মোমের মূর্তির একটি মিউজিয়াম স্থাপন করেন। তবে সেখানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় শেষে ১৮৮৪ সালে তুসোর এই মিউজিয়ামটি স্থানান্তরিত হয় বর্তমান মেরিল্‌বোন্‌ রোডে।

মাদাম তুসো তাঁর জাদুঘরের জন্য কেবল যে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিবর্গেরই মোমের মূর্তি তৈরি করেছেন তাই নয়, স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনারও খণ্ড দৃশ্যচিত্র তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় এই জাদুঘরে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষত ফরাসি বিপ্লব সংক্রান্ত মোমের মূর্তিগুলো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর একটি স্বল্পালোকিত কক্ষে ৮০ জনের মতো কুখ্যাত নরঘাতকের মূর্তি দর্শকসাধারণকে শিহরিত ও রোমাঞ্চিত করে থাকে।

এই জাদুঘরের মোমের মূর্তি এখনো বংশপরম্পরায় মাদাম তুসোর বংশধরদেরই কেউ-না-কেউ তৈরি করে থাকেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গড়ে প্রায় ৩ থেকে ১০ হাজার দর্শক প্রতিদিন এই জাদুঘর পরিদর্শন করে যান।

আ. হু.

মাদার তেরেসা [১৯১০—১৯৯৭]

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত বিশ্বখ্যাত সমাজসেবিকা। মাদার তেরেসার (Mother Teresa) জন্ম আলবেনিয়ায় ১৯১০ সালের ২৬শে আগস্ট। প্রাথমিক লেখাপড়া জন্মশহর স্কোপিয়ে-তে। তাঁর পুরো নাম আগ্নেস্‌ বোইয়াক্সিউ, আর ডাকনাম ছিল 'গোঙ্কসা'— এটি একটি তুর্কি শব্দ, যার অর্থ 'কুসুমকলি'।

দুঃস্থ মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ১৯২৮ সালে আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে যান এবং সেখানকার লরেটো কনভেন্টে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে একই বছরের ডিসেম্বর মাসে দার্জিলিং পৌঁছে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর

www.pathagar.com

১৯২৯ সালের ৬ই জানুয়ারি কলিকাতায় (দ্র) আসেন। এখানে লরেটো পরিচালিত একটি কনভেন্টে শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব পালন করার সময়ে ১৯৪৩ সালে সৃষ্ট মহাদুর্ভিক্ষে আর্ত, বুভুক্ষু মানুষের দুর্দশা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। ১৯৪৮ সালে এই শিক্ষায়তনের শান্তিপূর্ণ জীবন ত্যাগ করে তিনি আর্ত মানবতার সেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নাম হয় 'মাদার তেরেসা'।

অচিরকালের মধ্যেই তিনি কলিকাতার শিয়ালদহ রেলস্টেশনের নিকটবর্তী একটি পুরাতন ভবনে 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' (Missionaries of Charity) নামের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মাত্র ২০ বছর সময়ের ব্যবধানে শুধু কলিকাতা মহানগরী নয়, বিশ্বের ৫২টি দেশে এর প্রায় ৫০০টি শাখা গড়ে ওঠে। এসব শাখার মাধ্যমে দুঃস্থ নারী, শিশু ও গরিব মানুষকে শুধু খাদ্যসাহায্যই নয়, আশ্রয়েরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কলিকাতা শহরেও তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে বেশ কিছু সেবামূলক সংগঠন। পাশাপাশি 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ ৬৭০টি ক্লিনিক বছরে বিশ্বের ৬০ লাখ রোগীর চিকিৎসা করে থাকে। ১৯৬৮ সালে মাদার তেরেসার উদ্যোগে রোমে একটি সুবৃহৎ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, যার পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় ভারতীয় সেবিকাদের হাতে।

দুঃস্থ মানবতার সেবায় আত্মোৎসর্গের স্বীকৃতিস্বরূপ মাদার তেরেসা ইতিমধ্যে যেসব সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারতের 'পদ্মশ্রী' (১৯৬২), 'পোপ জন শান্তি পুরস্কার' (১৯৭১), জওহরলাল নেহরু পুরস্কার' (১৯৭২), 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' (১৯৭৯) এবং 'ভারতরত্ন' (১৯৮০) উপাধি। এ ছাড়াও তিনি ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আরো ৮৪টি পুরস্কার ও সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত।

মাদার তেরেসা ১৯৯৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আ. হু.

মাদোনা ম্যাডোনা দ্র

মান, টোমাস [১৮৭৫—১৯৫২]

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক। তিনি উত্তর জার্মানির ল্যুবেক (Lubeck) শহরে ১৮৭৫ সালের ৬ই জুন এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

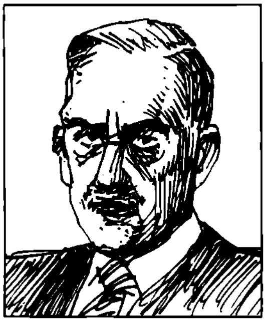

স্কুল-জীবনে টোমাস মান (Thomas Mann) খুব মনোযোগী ছাত্র ছিলেন না। স্কুলের কঠোর শৃঙ্খলা তিনি তেমন পছন্দ করতেন না।

টোমাস মানের পিতা ছিলেন এক জন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় নগর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ১৮৯১ সালে পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের পরিবার দুর্দশায় পড়ে। ফলে তিনি মাতাসহ ল্যুবেক থেকে মিউনিখে চলে আসেন। আসার পর টোমাস মান স্বল্পকালের জন্য একটি বীমা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। এরপর ভর্তি হন মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময় তিনি বুদ্ধিবৃত্তি চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। শোপেনহাওয়ার (দ্র) এবং নিট্‌শের (দ্র) রচনা তাঁকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে।

তরুণ বয়সে কবিতা রচনা দিয়েই তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু হয়। টোমাস মানের বয়স যখন পঁচিশ তখন প্রকাশিত হয় তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাস 'বুডেন্‌ব্রুক্স্' (১৯০১) এবং আটাশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় অপর উপন্যাস 'ট্রিস্টান্' (১৯০৩)। এ দু'টি উপন্যাসকেই তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা বলে অভিহিত করা হয়। এরপর তিনি ব্যঙ্গাত্মক সাময়িকী 'সিম্‌লিসিসিমুস'-এ যোগ দেন। পরবর্তী কালে এটি তিনি সম্পাদনাও করেন।

টোমাস মান ব্যাপকভাবে ইউরোপ সফর করেন এবং স্বাধীন লেখকের বৃত্তি বেছে নেন। তিনি তাঁর এই সময়কার প্রতিটি রচনাকর্মে ইউরোপীয় মানবতাবাদকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন।

১৯২৯ সালে টোমাস মান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

নাৎসিরা (দ্র)ক্ষমতায় এলে ১৯৩৩ সালে মান স্বেচ্ছায় জার্মানি ত্যাগ করেন এবং ১৯৩৪ সালে প্রথম বারের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। নাৎসি সরকার এই সময় তাঁর সমালোচনা ও নিন্দাবাদে সোচ্চার হলে জবাবে তিনি ক্ষমতাসীন নাৎসি সরকারকে খ্রিস্টধর্ম, পাশ্চাত্যের নৈতিকতা ও খোদ সভ্যতার দুশমন বলে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন। ফলে টোমাস মানের জার্মান নাগরিকত্ব এবং বন

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হয়। বলা যায়, এই ঘটনার ক্ষতিপূরণ স্বরূপই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ১৯৩৫ সালে তাঁকে একটি সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সাবেক চেকোস্লোভাকিয়া তাঁকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। ১৯৪৪ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন।

টোমাস মান দু'-দুটো বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) প্রত্যক্ষ করেছেন। তাতে মানবতা ও সভ্যতার পরাজয়ে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছেন। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে তাই মানবতা ও সভ্যতাকে রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের আহ্বান ধ্বনিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাকার্থি যুগের সূচনা হলে টোমাস মান সপরিবারে সুইজারল্যাণ্ডে চলে আসেন। ১৯৫২ সালের ১২ই আগস্ট তিনি এখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে ছোটগল্পের সঙ্কলন : 'ছোট্ট হের ফ্রিডেমান' (১৮৯৮); উপন্যাস : বুডেনব্রুক্স (১৯০১), 'টোনিও ক্রোয়গার' (১৯০৩), 'ভালজুংসের রক্ত' (১৯০৬), 'জাঁহাপনা' (১৯০৯), 'জোসেফ ও তাঁর ভ্রাতৃমণ্ডলী' (১৯৩৩-৪৩), 'ভাইমার-এ লোটে' (১৯৩৯), 'ডক্টর ফাউস্টুস' (১৯৪৭), 'জাদু পাহাড়' (১৯২৪) এবং 'কালো রাজহাঁস' (১৯৫৩) ইত্যাদি।

আ. হ.

মানচিত্র / ম্যাপ

ওপর থেকে কোনো একটি অঞ্চল বা দেশের ছবি বা দৃশ্যই মানচিত্র। একটি কাগজে পৃথিবীপৃষ্ঠ বা এর কোনো অংশের দেশ, সমুদ্র, নদী (দ্র), পাহাড়, পর্বত (দ্র) ইত্যাদি দেখিয়ে মানচিত্র তৈরি করা হয়। মানচিত্রে বিভিন্ন স্থান, ভূমি, সাগর (দ্র)-নদী, পাহাড়-পর্বত, রাস্তা, রেলওয়ে, স্টেশন, জংশন, উৎপাদিত পণ্য, শিল্প-কারখানা, হাসপাতাল, ধর্মশালা ইত্যাদি দেখানোর জন্য বিভিন্ন রঙের প্রতীক রেখা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

মানচিত্রের সাহায্যে আমরা কোথায় আছি তা জানতে পারি। বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র রয়েছে। কোনো কোনো মানচিত্রে শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার রাস্তা দেখানো থাকে; বলতে গেলে অন্যান্য তথ্য থাকেই না। যেমন, রেলওয়ে মানচিত্রে কোন স্টেশনের পর কোন স্টেশন আসে তা দেখানো হয়। কখনো কখনো দু'টি স্টেশনের মধ্যকার দূরত্ব উল্লেখ থাকে। বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে বিশেষ তথ্য দেওয়া থাকে বিষয়বস্তুগত মানচিত্রে (theme map)। অর্থনৈতিক মানচিত্রে (economic map) বিভিন্ন কারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ কোথায় অবস্থিত এবং এসব কারখানায় কী কী পণ্য উৎপাদিত হয় তা দেখানো হয়। খুব ক্ষুদ্র এলাকাকে নিয়ে যে মানচিত্র হয় তাকে স্কেচ মানচিত্র (sketch map) বলে। কোনো সংবাদকে চিত্রের সাহায্য বর্ণনা করার জন্য প্রায়ই সংবাদপত্রে স্কেচ মানচিত্র ব্যবহৃত হয়। পরিকল্পনাবিদেরা কোনো ভবন বা শহর তৈরি করার জন্য পরিমাপসহ কোনো সীমিত বা ক্ষুদ্র এলাকার যে মানচিত্র তৈরি করেন তাকে প্ল্যান (plan) বলে।

সমগ্র পৃথিবীকে দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয় গ্লোব। গ্লোবের সাহায্যে পৃথিবীকে তার আকৃতি অনুযায়ী সঠিকভাবে দেখানো যায়। তবে এতে পৃথিবীর সব অংশকে একত্রে দেখা যায় না। লোকেটর মানচিত্রের (locator map) সাহায্যে কোন ব্যক্তি পৃথিবীর কোন অংশে আছে তা জানতে পারে।

মানচিত্রে প্রকৃত পরিমাপের অনুপাতে বিভিন্ন স্থান বা বস্তুর দূরত্ব, উচ্চতা, পুরুত্ব ইত্যাদি দেখানো হয়। যিনি মানচিত্র আঁকেন তাকে কার্টোগ্রাফার (cartographer) বলে। এ শব্দটি ফরাসি 'কার্ৎ' (carte-অর্থ মানচিত্র) এবং গ্রিক 'গ্রাফিয়া'(graphia-অর্থ লেখা) থেকে এসেছে।

হো. আ.

মানব জাতি

আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আমরা দেখি—কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ হলদে রঙের; কারো চুল কোঁকড়ানো, কারো চুল সোজা, কারো নাক চোখা, কারো চোখের মণি কালো, কারো পিঙ্গল ইত্যাদি।

হাজার হাজার বছর আগে জন্মের পর থেকে মানুষ নামক প্রাণীটি বংশপরম্পরায় খাদ্য ও বাসস্থানের খোঁজে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেছে, আবার কখনো হাজার হাজার বছর মোটামুটি একই স্থানে বসবাস করেছে। ফলে এক দল আরেক দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং ভৌগোলিক অবস্থা, খাদ্যের অভ্যাস ও অন্যান্য কারণে (যেমন— জীনগত পার্থক্য, বংশগতি ইত্যাদি) নানা ধরনের

www.pathagar.com

মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

দেহবৈশিষ্ট্য, আকৃতি, রঙ ইত্যাদি দেখে মানুষকে সাধারণত তিনটি মহাজাতিতে ভাগ করা হয় : (১) ককেশীয়, (২) মঙ্গোলীয় এবং (৩) নিগ্রো। সাদামাটা ভাষায় এরা যথাক্রমে সাদা, হলদে এবং কালো হিসাবে পরিচিত। অত্যাধুনিক বিজ্ঞানীরা অবশ্য ভৌগোলিক অবস্থান থেকে মানুষকে নয়টি ভাগে ভাগ করেন : (১) আফ্রিকান, (২) আমেরিণ্ডিয়ান বা আমেরিকার ইণ্ডীয়, (৩) এশীয়, (৪) অস্ট্রেলীয়, (৫) ইউরোপীয়, (৬) ভারতীয়, (৭) মেলানেশীয়, (৮) মাইক্রোনেশীয় এবং (৯) পলিনেশীয়।

আফ্রিকানদের সাধারণত নিগ্রোয়েড অর্থাৎ নিগ্রোধারার লোক বলা হয়। কোঁকড়ানো চুল, কালো রঙ (দেহে প্রচুর মেলানিন নামক পদার্থ থাকলে রঙ কালো হয়), মোটা ঠোঁট এদের বৈশিষ্ট্য।

আমেরিণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এশীয়দের মিল রয়েছে, তবে রক্তে কোনো মিল নেই। এদের চুল কালো ও সোজা, গায়ের রঙ সাদা থেকে তামাটে।

এশীয়দের একাংশকে মঙ্গোলীয় (মঙ্গোলিয়া থেকে এই নাম) বলা হয়, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার লোকদের বাদে। মঙ্গোলিয়া, চীন (দ্র), জাপান (দ্র), তাইওয়ান, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ার (দ্র) মূল অধিবাসী এরা। এদের চুল সোজা এবং চোখে ভাঁজ রয়েছে। ইউরোপীয়দের চেয়ে এরা খাটো।

অস্ট্রেলীয়রা হল অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) অধিবাসী বা অস্ট্রালয়েড্ (বাংলায় কেউ কেউ লেখেন অস্ত্রাল)। মূলে এরা নিগ্রো মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত। হাজার হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে এরা সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী হয়ে গিয়েছে। এদের দাঁত একটু বড়, রঙ মধ্যম ধরনের, মাথার খুলি সরু, দেহে লোম রয়েছে।

ইউরোপীয়রা ককেশীয় বলে পরিচিত। ককেশাস পর্বতমালা থেকে এই নাম। পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার (দ্র) সাহারা মরুভূমির উত্তর দিকের অধিবাসীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। এদের চামড়া সাধারণত সাদাটে, তবে দক্ষিণ দিকের লোকদের রঙ কিছুটা মলিন। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা চামড়ার লোকেরাও এ জাতীয়।

দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ

ইণ্ডিয়ান হিসাবে পরিচিত। উত্তরের ফর্সা মানুষ থেকে দক্ষিণের কালো মানুষ পর্যন্ত এখানে দেখা যায়। পাকিস্তান (দ্র), ভারত (দ্র), শ্রীলঙ্কা (দ্র), বাংলাদেশ (দ্র) ইত্যাদি রাষ্ট্রের মানুষ সাধারণত ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত। ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়দের রক্তের গ্রুপ মোটামুটি 'বি' হলেও রক্তের অন্যান্য গ্রুপে ফারাক রয়েছে।

পাপুয়া নিউগিনি ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা মেলানেশীয় নামে পরিচিত। গায়ের রঙে এদের সঙ্গে মিল রয়েছে আফ্রিকানদের, কিন্তু রক্তের মিল সামান্যই।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপের অধিবাসীরা মাইক্রোনেশীয়। এদের গায়ের রঙ কালো, চুল পশমের মতো কুঞ্চিত। পলিনেশীয়দের সঙ্গে এদর রক্তের মিল রয়েছে।

পলিনেশীয়রাও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসী। উত্তরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড এবং পূর্বে ইস্টার দ্বীপ থেকে পশ্চিমে তুবালু দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের গায়ের রঙ হালকা থেকে মধ্যম।

মানব জাতির এই আপাত পার্থক্য দেখে কেউ কেউ এদের বিভিন্ন মূল থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে সকল মানুষই একটি মাত্র মূল অর্থাৎ হোমো সেপিয়ান্স্ বা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নামের এক ধরনের প্রাণী থেকে উদ্ভূত।

সৈ. আ. ই.

মানবতাবাদ

'মানব' থেকে 'মানবতা' শব্দের উৎপত্তি, এবং মানবতাকে কেন্দ্র করে যে তত্ত্ব বা ভাবনা বিকশিত হয়েছে তাকেই

www.pathagar.com

'মানবতাবাদ' বলা চলে। বাংলায় এই শব্দ ও তার ধারণাগত অর্থ ইংরেজি 'humanism' থেকে এসেছে।

'মানবতাবাদ' বলতে ঠিক কী বোঝা যায় বা বোঝা উচিত তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে মানবতাবাদের মূল বিষয় মানুষ ও মনুষ্যসম্পর্কিত সবকিছু। এর উদ্ভব রেনেসাঁসের (দ্র) সময়ে। তখনই প্রথম ভাবা হয়েছিল যে মানুষ ও তার সমাজের দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং উভয়েরই কল্যাণচিন্তা করা জরুরি। সে জন্য মানুষ যা কিছু করে—যেমন সে সমাজ গড়ে, শৌর্যবীর্য বা মেধা দিয়ে এমন ঘটনা ঘটায় যা ইতিহাস তৈরি করে, সে শিল্পসাহিত্য রচনা করে, বিজ্ঞানসাধনায় রত হয়, দেশ ও দশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে—এই সমস্ত কিছুই রেনেসাঁসের মানুষ গুরুত্ব সহকারে বুঝে নিতে চেয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই চিন্তায় প্রথমে 'মানুষে'র প্রাধান্য, তার পরে প্রাধান্য ঈশ্বরচিন্তার বা অজ্ঞেয় রহস্যালোকের।

মানবতাবাদের সবচেয়ে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত লক্ষণ হল মানুষের প্রতি এবং মানুষের তৈরি যাবতীয় কিছুর প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ।

হা. মা.

মানবসদৃশ প্রাণী

এক ধরনের 'এপ' (দ্র) জাতীয় জীব থেকে মানুষের উদ্ভব বলে আধুনিক নৃবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। এইসব এপ-এর দাঁত, চোয়ালের হাড়, মাথার খুলি, পায়ের হাড়, হাতের অংশবিশেষ ইত্যাদি সারা পৃথিবীর (দ্র) নানা স্থানে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে এইসব প্রাণীর আনুমানিক চিত্রপরিকল্পনা শিল্পীরা করেছেন। এদের মধ্য দিয়ে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারা এইসব প্রাণীর দাঁড়ানো অবস্থার রূপ দিয়ে এখানে দেখানো হল—

১. প্লিওপিথেকাস : সর্বপ্রাচীন এক ধরনের প্রোটো-এপ। অনেকটা আধুনিক গিবন-এর মতো দেখতে; এর পূর্বসূরি।

২. প্রোকন্সাল্ : শিম্পাঞ্জির পূর্বপুরুষ বলে অনুমিত।

৩. ড্রায়োপিথেকাস : বড় আকারের এপ জাতীয় প্রাণী। ইউরোপ (দ্র), ভারত (দ্র) এবং চীনে (দ্র) এদের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

৪. অরিওপিথেকাস : মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি শাখার প্রাণী।

৫. রামাপিথেকাস : মানুষের সর্বপ্রাচীন পূর্বপুরুষ বলে অনুমিত।

৬. অস্ট্রালোপিথেকাস : দু' পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারত।

৭. অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস : সোজা হয়ে হাঁটতে

মানুষ এবং বানরজাতীয় প্রাণীদের ক্রমবিবর্তিত পা ও হাত

www.pathagar.com

অস্ট্রালোপিথেকাস বা মানবসদৃশ্য প্রাণী

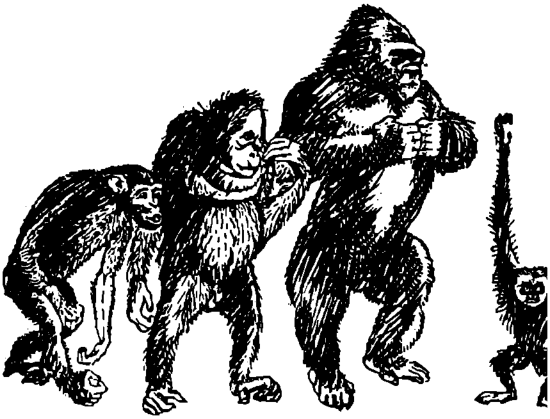

শিম্পাঞ্জি ওরাং ওটাং গরিলা গিবন

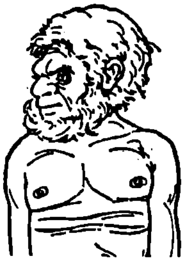

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী

গুয়েলন বানর

পারত এবং অনেকটাই মানুষসৃদশ।

৮. হোমো হেবিলিস : হাতিয়ারের ব্যবহার জানত। অনেক বেশি মানবসদৃশ। মাথার খুলিও বেশ বড়।

৯. হোমো ইরেক্টুস : 'হোমো' অর্থাৎ মানবগোত্রীয়। আমাদের মতো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলেও হাত এবং মস্তিষ্ক ছিল আদিম ধরনের। দলবদ্ধভাবে বাস করত এবং আগুনের ব্যবহার জানত।

১০. প্রাথমিক হোমো সেপিয়ান্স্ : আধুনিক মানুষের প্রাথমিক রূপ।

১১. রোডেসীয় মানব : আফ্রিকায় বসবাসকারী। এরা পাথুরে হাতিয়ারের ব্যবহার জানত।

১২. নিয়াণ্ডার্থাল মানব : আধুনিক মানুষের পূর্বসূরি।

১৩. ক্রোম্যানিয়ন মানুষ : আধুনিক কালের মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষ।

১৪. আধুনিক মানুষ : অনেকটাই ক্রোম্যানিয়ন মানুষের মতো। যোগাড়ে থেকে উৎপাদক মানুষে পরিণত। পশুপালন শেখে। সভ্যতার অধিকারী।

সৈ. আ. ই.

মানবেন্দ্রনাথ রায় [১৮৮৭—১৯৫৪]

শুরুতে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী, পরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা এবং শেষে উদার মানবতাবাদী ভাবধারার প্রচারক, সংগঠক ও তাত্ত্বিক। জন্ম কলিকাতার (দ্র) এক শিক্ষিত যাজক পরিবারে, ১৮৮৭ সালে। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর ছদ্মনাম। পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

নরেন্দ্রনাথ কৈশোরেই রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। যোগ দেন সন্ত্রাসবাদী 'যুগান্তর দলে' (দ্র)। ১৯০৭ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাতে গিয়ে বেশ কয়েক বার গ্রেফতার হন এবং জেল খাটেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে তিনি 'যুগান্তর দলে'র নির্দেশে জার্মানদের সহায়তায় অস্ত্র সংগ্রহের জন্য দেশত্যাগ করেন। বাটাভিয়া থেকে অস্ত্র আমদানি করতে গিয়ে ধরা

www.pathagar.com

পড়ে দূরপ্রাচ্যে পাড়ি জমান। উদ্দেশ্য, চীনের (দ্র) মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে অস্ত্র নিয়ে আসা। এই সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে বাংলার আরেক শীর্ষস্থানীয় চরমপন্থী নেতা রাসবিহারী বসু (দ্র) এবং চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান্ ইয়াৎ-সেন্ (দ্র)-এর। কিন্তু অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে তিনি গোপনে চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) এবং সেখান থেকে মেক্সিকোয়।

মেক্সিকোতে শুরু হয় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানেই তিনি রুশ বিপ্লবী মিখাইল্ বরোদিনের (১৮৮৪-১৯৫৩) কাছ থেকে মার্ক্সবাদের (দ্র) পাঠ গ্রহণ করেন এবং রাশিয়ার বাইরে মেক্সিকোয় প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন (১৯১৯)। তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সভাপতিমণ্ডলী এবং এর কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য হন।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে পেত্রোগ্রাদে (বর্তমান নাম সেন্ট পিটার্সবার্গ্ বা সাংক্ৎ পিতের্বুর্গ্) অনুষ্ঠিত কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি মেক্সিকান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। এই কংগ্রেসেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে লেনিনের (দ্র) 'পরাধীন দেশের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে পশ্চিমী উন্নত দেশের সর্বহারা আন্দোলনের মৈত্রী সম্পর্ক' বিষয়ে যে বিতর্ক হয়, তা ইতিহাসবিখ্যাত।

রায়ের অন্যতম বড় কৃতিত্ব তাশখন্দে অবস্থানকালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর)। ১৯২২ সালে এই পার্টির দপ্তর স্থানান্তরিত হয় বার্লিনে। এখান থেকে তিনি প্রকাশ করতে থাকেন 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকা (পরে 'অ্যাডভান্স গার্ড' নাম হয়)।

১৯২৭ সালের চীনা বিপ্লবের (দ্র) ব্যর্থতার পর তিনি তাঁর আগেকার উগ্র ও অসহিষ্ণু মনোভাব ত্যাগ করেন। এর পর থেকে তিনি তাঁর স্বাধীন মতামত পত্রিকান্তরে প্রকাশ করতে থাকলে ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে কমিণ্টার্ন্ থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং সেখানেই তাঁর কমিউনিস্ট-জীবনের ইতি ঘটে।

১৯৩০ সালে রায় গোপনে ভারতে চলে আসেন। এই অবস্থায় তিনি জওহরলাল নেহরু (দ্র) ও সুভাষচন্দ্র বসু (দ্র) সহ আরো বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৩১ সালের ২১শে জুলাই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে ৬ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালে কারামুক্তির পর তিনি কংগ্রেস দলে যোগ দেন। কিন্তু এই দলের রাজনৈতিক মত ও পথের সঙ্গে তাঁর মতের মিল খুঁজে না পাওয়ায় ক্রমেই প্রচলিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে তিনি দূরে সরে যেতে থাকেন। তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে সূত্রায়িত করেন এক নতুন দর্শন—'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজ্ম্' বা নবমানবতাবাদ, যার মূল বৈশিষ্ট্য যুক্তি, নৈতিকতা ও মুক্তি।

এই দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে দেরাদুনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট'। ১৯৪৬ সালে তিনি এর আগে প্রতিষ্ঠিত তাঁর 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' ভেঙে দেন এই যুক্তিতে যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজে পার্টি–রাজনীতির প্রথা অচল। এর সাহায্যে মানবতাবাদী দর্শন ও রাজনৈতিক আন্দোলন সম্ভব নয়। কারণ তাতে তার পার্টির আধিপত্য ও ক্ষমতাদখলই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং শুভ লক্ষ্যে পৌঁছনোর তাগিদে তখন অশুভ উপায় অবলম্বনেও আর আপত্তি থাকে না। ফলে সমাজ ও সাধারণ মানুষের হয় অকল্যাণ ও অধোগতি।

রুশ, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ ও ইংরেজিসহ আরো কয়েকটি ভাষায় তাঁর ছোট-বড় শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় মৃত্যুবরণ করেন ১৯৫৪ সালে এক দুর্ঘটনায়।

আ. হু.

মানমন্দির (observatory)

মানমন্দির এমন একটি ভবন, যেখান থেকে জ্যোতির্বিদগণ সূর্য (দ্র), গ্রহ (দ্র), নক্ষত্র (দ্র) এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ করেন। মূলত বৈজ্ঞানিকগণ উর্ধ্ববায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন রকমের রশ্মি, আলোকরশ্মি, বিকিরণ (দ্র), রঞ্জনরশ্মি (দ্র) ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার জন্যই মানমন্দির ব্যবহার করে থাকেন। জ্যোতির্বিদগণ বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যে উচ্চ তাপমাত্রায় পরমাণুর (দ্র) আচরণ সম্পর্কেও পরীক্ষা করে জানতে পারেন।

www.pathagar.com

দুই ধরনের মানমন্দির আছে। একটিকে বলা হয় অপটিক্যাল মানমন্দির, যার দ্বারা আলোকরশ্মি পর্যবেক্ষণ করা হয়। অপটিক্যাল মানমন্দিরের অপটিক্যাল টেলিস্কোপে আয়না, লেন্স্ (দ্র) ইত্যাদি ব্যবহার করে দূরের বিষয়বস্তুর বর্ধিত ছবি দেখা যায়। অন্যটি রেডিও মানমন্দির— যেখানে বিভিন্ন রশ্মি ও বিকিরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। রেডিও মানমন্দিরের বেশির ভাগ টেলিস্কোপে (দ্র) বৃহদাকার অ্যান্টেনা (দ্র) ব্যবহার করে মহাশূন্যের বিভিন্ন রশ্মি ও বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করে পরীক্ষা করা হয়।

মানমন্দির বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা (দ্র) ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত রাখা হয় যাতে করে অপটিক্যাল টেলিস্কোপ ও রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে সংগৃহীত তথ্যাবলির রেকর্ড রাখা সম্ভব হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কম্পিউটার (দ্র) ব্যবহার করে দূরবীনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করা হয়।

মানমন্দির এমন নিরাপদ জায়গায় তৈরি করা হয় যেখানে বায়ুমণ্ডলের (দ্র) তাপ ও চাপের হেরফের, দূষিত পরিবেশ এবং উজ্জ্বল আলোকরশ্মি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। বেশির ভাগ অপটিক্যাল মানমন্দির পর্বতের (দ্র) উপর যেখানে আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে সেখানে স্থাপন করা হয়। বেশির ভাগ রেডিও মানমন্দির দুই পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকায় স্থাপন করা হয়, যাতে করে কোনো সাধারণ বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও জনবহুল এলাকার পরিবেশ এর পরীক্ষা–নিরীক্ষার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

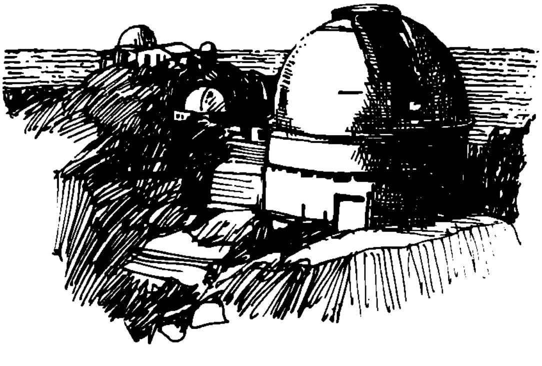

১৬০৯ সালে গ্যালিলিও (দ্র) তাঁর হাতে তৈরি দূরবীন (দ্র) দিয়ে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন। ১৬৭২ সালে প্যারিস মানমন্দির সম্পূর্ণ হয়। রয়েল গ্রিনিচ মানমন্দির

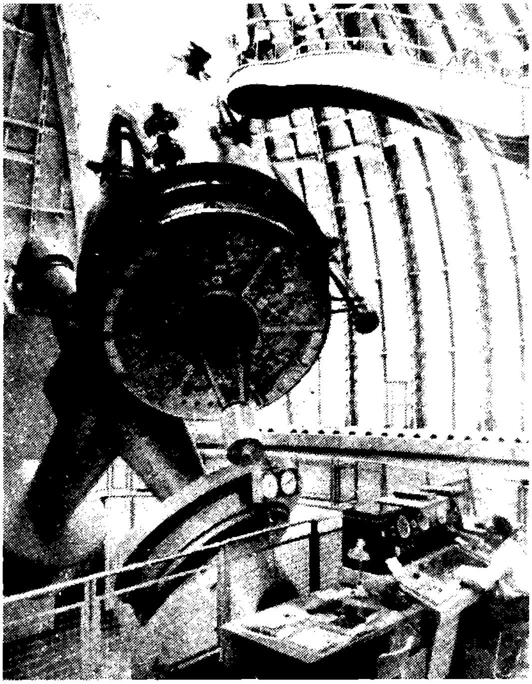

ফ্রান্সের একটি মানমন্দিরের ভিতরের দৃশ্য

১৬৭৬ সাল থেকে কাজ আরম্ভ করে।

মু. এ.

মানস সরোবর

হিমালয় পর্বতমালার (দ্র) উত্তর গাত্রে অবস্থিত একটি হ্রদ (দ্র)। হিন্দুধর্ম (দ্র)-অবলম্বীদের নিকট এই হ্রদ পবিত্র এক তীর্থস্থান। তিব্বতের (দ্র) দক্ষিণে ৪৪৮৫ মি উঁচুতে কৈলাস ও জাস্কর পর্বতমালার মধ্যে এর অবস্থান। এই হ্রদের তীরে তিব্বতীদের বৌদ্ধমন্দির ও হিন্দুদের শিবমন্দির রয়েছে। লোকবিশ্বাস এ রকম যে মানস সরোবরে গিয়ে কেউ কিছু প্রার্থনা করলে তার মনোবাসনা পূর্ণ হবেই।

হা. মা.

মানসিক প্রতিবন্ধী

নানা কারণে চিন্তাশক্তি, অনুভূতি ইত্যাদি বৃত্তিসহ স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ার কারণে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এতে আক্রান্তদের বলা হয় 'মানসিক প্রতিবন্ধী'।

জন্মগত ত্রুটি, শারীরিক বা মানসিক আঘাত, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বিরূপ প্রভাব, মানসিক রোগ ইত্যাদি কারণে

www.pathagar.com

কেউ কেউ মানসিক প্রতিবন্ধীতে পরিণত হতে পারে। অধিকাংশ মানসিক প্রতিবন্ধীর মধ্যে হতাশা, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, মাথাব্যথা (দ্র), বুকে ও পিঠে ব্যথা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। কোনো কোনো মানসিক প্রতিবন্ধীর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা দেয়। মানসিক প্রতিবন্ধী বিভিন্ন মানসিক অনুভূতিতে এমনভাবে সাড়া দেয় যা তার সামাজিক জীবন যাপনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

মানসিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য দায়ী বিভিন্ন মানসিক রোগের মধ্যে 'স্কিৎসোফ্রেনিয়া' (schizophrenia) উল্লেখযোগ্য। স্কিৎসোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত মানসিক প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক চিন্তা, সতর্কতা, আচার-আচরণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এদের কেউ কেউ হাঁটার সময় অস্বাভাবিক শারীরিক ভঙ্গি প্রদর্শন করে থাকে। বিশ্বজুড়ে মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও তেমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সি. না. হ.

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [১৯০৮—১৯৫৬]

জন্ম সাঁওতাল পরগনার দুমকায়। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত পিতৃদত্ত নাম প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) বি. এসসি. পড়ার সময় 'অতসী মামী' নামে গল্প লিখে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। 'মাসিক বিচিত্রা'য় 'অতসী মামী' প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা লক্ষ করা যায়। জীবনের ক্ষুদ্র খণ্ড ঘটনাংশের আড়ালে মানুষের অবচেতন মনের যে রহস্য রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নৈপুণ্যের সঙ্গে তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'দিবারাত্রির কাব্য', 'জননী', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'শহরতলী', 'চতুষ্কোণ', 'জীয়ন্ত', 'সোনার চেয়ে দামী', 'ইতিকথার পরের কথা' উপন্যাস এবং 'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনী', 'আজ কাল পরশুর গল্প', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'ফেরিওয়ালা' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের (দ্র) পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে সমাজসচেতনতা এবং মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছিল।

মে. খা.

মানিক মিয়া তফাজ্জল হোসেন দ্র

মানে, এদুয়ার্ ইম্প্রেশনিস্ট আর্ট দ্র

মাফিয়া (the Mafia)

সাম্প্রতিক বিশ্বে 'মাফিয়া' অত্যন্ত পরিচিত ও বহুল উচ্চারিত একটি শব্দ। এর সঙ্গে অপরাধ, খুনখারাবি, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও অবৈধ উপায়ে বিত্তসঞ্চয়ের সম্পর্ক রয়েছে। ফলে শব্দটি এখন অপরাধজগতের শব্দে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শব্দটি প্রাচীন এবং তার ইতিহাস অন্য রকম। সম্ভবত মধ্যযুগে (দ্র) সিসিলিতে প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল 'মাফিয়া' নামে একটি গুপ্ত ও অবৈধ প্রতিষ্ঠানের। এই নামের অর্থ ও 'মাফিয়া'র ইতিহাস ভালভাবে জানা যায় না। তবে ঊনবিংশ শতক থেকে এখন পর্যন্ত এদের চারিত্র্য, ক্রিয়াকাণ্ড, ইতিহাস ব্যাপারে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে নেওয়া যায়।

'মাফিয়া' বর্তমান বিশ্বে সর্বত্রই গোষ্ঠীপ্রধান পরিচালিত গুপ্ত অপরাধীচক্র। সবখানেই এদের ভূমিকা সন্ত্রাসীর। এরা গোপনে চাঁদা তোলে, খাজনা বা ট্যাক্স ধার্য করে, হুকুম অমান্য করলে খুন করে। এ যেন দেশের ভিতরে প্রতিপক্ষ আরেকটি গোপন সরকার ও গুপ্ত শাসনব্যবস্থা। তাই যেসব দেশে মাফিয়া রয়েছে সেসব দেশের সরকার এদের নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো দেশই এদের নির্মূল করতে পারে নি। তার কারণ, এদের যাবতীয় কর্ম পরিচালিত হয় অত্যন্ত গোপনে ও সুচতুরভাবে, দলপতিকে কোনো সদস্যই চেনে না, দায়িত্বপালনে শৈথিল্য মানেই শাস্তিস্বরূপ অবধারিত মৃত্যুদণ্ড।

হা. মা.

মাম্প্স্ (mumps)

এক প্রকার ভাইরাসের (দ্র) সংক্রমণে মাম্প্স্ রোগের সৃষ্টি হয়। এ রোগে মানুষের কানের নিম্নাংশে অবস্থিত প্যারোটিড গ্রন্থি (parotid gland)-সহ অন্যান্য লালাগ্রন্থিতে প্রদাহ দেখা দেয়।

www.pathagar.com

মাম্প্স্ রোগে জ্বর, মাথাব্যথা (দ্র), কানের নিচের অংশে ব্যথা, গা ম্যাজম্যাজ করা, এক পাশের কিংবা উভয় পাশের প্যারোটিড গ্রন্থি ফুলে যাওয়া ইত্যাদি অসুবিধা দেখা দেয়। মাম্প্স্ রোগে কোনো কিছু চিবানো কষ্টকর হয়ে পড়ে।

মাম্প্স্ রোগের প্রত্যক্ষ চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। তবে সঙ্গে জীবাণুসংক্রমণ না ঘটলে সাধারণত এক সপ্তাহের মধ্যে তা এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। নরম বা তরল খাবার খাওয়া এবং যথেষ্ট বিশ্রাম গ্রহণের ফলে দ্রুত রোগনিরাময় ঘটে। এক বার মাম্প্স্ রোগে আক্রান্ত হলে শরীরে এ রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে ওঠে, দ্বিতীয় বার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

সি. না. হ.

মায়া সভ্যতা

আধুনিক গুয়াতেমালা রাষ্ট্রের এল্ পেটেন্ নামক স্থান ছিল ‘মায়া’ (Maya) নামক সভ্যতার উৎসস্থল। আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে কৃষিজীবী এক দল মানুষ উর্বর ভূমির খোঁজে এখানে এসে বসতি গড়ে তোলে। আট শ’ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাদের পশ্চিম পাশে বসবাসরত ওলমেক্ মানবগোষ্ঠীর শিল্পচর্চা, লিখন এবং সংখ্যাগণনার পদ্ধতি দ্বারা তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাদের মতো মায়াগণও ধাপ-পিরামিড এবং পাথরের স্থাপত্যরীতি গড়ে তোলে। মায়া সভ্যতা গুয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, বেলিজ ও দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকো অঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

২৫০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মায়া সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ঐ সময় তারা বড় বড় নগর স্থাপন করে, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটায়। প্রথম দিকে পাশের নগরী তিওতিহুয়ান্কান্-এর প্রভাব পড়ে মায়া সভ্যতায়, বিশেষ করে শিল্প ও স্থাপত্যকলায়। নগরে নগরে তারা চারকোণা পাথরের স্তম্ভ তৈরি করতে থাকে। এর ওপর তারা নানা বিবরণ ও সন-তারিখ খোদাই করে রাখত।

খ্রিস্টীয় আট শতকের দিকে এসে মায়া সভ্যতার অধোগতি শুরু হয়। দক্ষিণাঞ্চল থেকে এরা সরে আসে, স্থাপত্যকলার চর্চাও বন্ধ হয়ে যায়। তবে উত্তর দিকের মায়া সভ্যতার কেন্দ্র ইউকাতান্-এ তা আরো শতবর্ষ টিকে ছিল।

৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মধ্য-মেক্সিকোর তোল্তেক্গণ ইউকাতান্-এ আধিপত্য স্থাপন করে। বারো শতকের দিকে

মায়া সভ্যতার নিদর্শন

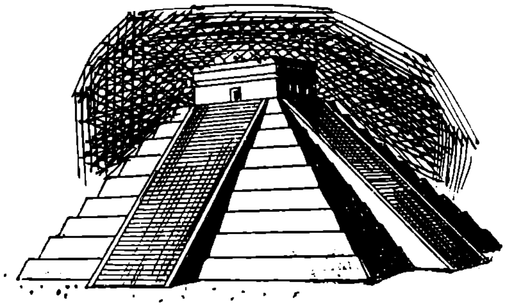

www.pathagar.com

তোল্‌তেক্‌ শাসনের অবসান ঘটে। মায়াগণ মায়াপন্‌ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে প্রাচীন সংস্কৃতির উদ্ধারসাধনে লিপ্ত হয়। তবে ধর্মের স্থলে ব্যবসা হয়ে ওঠে এবার তাদের প্রধান অবলম্বন। নগরগুলো বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

পনেরো শতকের দিকে মায়া নগরগুলো পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেনীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে এই সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে।

মায়াগণ যুদ্ধের চেয়ে প্রধানত শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মের দিকে বেশি আকৃষ্ট ছিল। তারা ৩৬৫ দিনে বছর গণনা করতে জানত। প্রথমে তারা পাথরের ফলক ও মাটির পাত্রে লিখত। পরে তারা হাতে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তারা চিত্রলিপি (দ্র) ও প্রতীকধর্মী লিপি ব্যবহার করত। মেক্সিকো এবং মধ্য-আমেরিকার প্রায় কুড়িটি ভাষা মায়া ভাষা থেকে উদ্ভূত। এই সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন আজও দেখা যায় চাষাবাদের ধরনে কিংবা ধর্মীয় আচার-আচরণে।

সৈ. আ. ই.

মায়াকোফ্‌স্কি, ভ্‌লাদিমির্‌ ভ্‌লাদিমিরভিচ্‌ [১৮৯৩—১৯৩০]

বিপ্লবের কবি। জন্মেছিলেন ককেশীয় অঞ্চলের জর্জিয়া রাজ্যের এক রুশ সম্ভ্রান্তবংশীয় কিন্তু অভাবগ্রস্ত পরিবারে। তেরো বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হলে মস্কো চলে আসেন তাঁরা। তখন থেকেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে তাঁর পদচারণা। উনিশ বছর বয়সেই ফুতুরিস্ত্‌ বা ফিউচারিস্টদের মধ্যে মায়াকোফ্‌স্কি সবচেয়ে উগ্র, তেজস্বী কবি। তাঁর প্রথম দিকের লেখা কবিতার বই 'ইজের পরা মেঘ' (১৯১৫), 'মেরুদণ্ডের বাঁশি'। বল্‌শেভিক পার্টি (দ্র) ক্ষমতায় আসার পর কমিউনিস্ট পার্টিতে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও মায়াকোফ্‌স্কির রাজনৈতিক কাব্যগ্রন্থ 'লেফ্‌ট্‌ মার্চ' (১৯১৯), 'ভ. ই. লেনিন, (১৯২৪) 'চমৎকার!' (১৯২৭) এবং কিছু নাটকে যেমন—'ছারপোকা' (১৯২৯), 'হামামখানা' (১৯৩০)তে নানা গোঁড়া বিষয়ে প্রচ্ছন্ন সমন্বয় পরিলক্ষিত। প্রেমে ব্যর্থতা ও পার্টির আদর্শের স্বপ্নভঙ্গ, সোভিয়েত সাহিত্যের সর্বস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ কবি মায়াকোফ্‌স্কিকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়।

সৌ. মা.

মায়ানমার

মায়ানমার (পূর্বনাম বার্মা বা ব্রহ্মদেশ) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। দেশটি ১৯৩৭ সালে ভারত (দ্র) থেকে পৃথক হয় এবং ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। মায়ানমারের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গ কিমি এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি। অধিবাসীদের শতকরা ৮৯ জন বৌদ্ধ।

মায়ানমারের বিস্তীর্ণ এলাকার উত্তর–দক্ষিণে প্রসারিত পর্বত ও মালভূমি। এর সর্বপশ্চিমে আরাকান ইয়োমা, এর পূর্বে পেগু ইয়োমা এবং সর্বপূর্বে শান্‌ মালভূমি অবস্থিত। শান্‌ মালভূমির দক্ষিণে টেনাসেরিম পর্বতমালা। আরাকান ও পেগু ইয়োমার মধ্যে ইরাবতী মায়ানমারের প্রধান নদী। ইরাবতী নদী বহু দূর পর্যন্ত নাব্য। ইরাবতীর উপনদী চিন্দুইন। সালুইন ও সিতাং নদী দেশের পূর্বাংশে ইরাবতীর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে। নদী-উপত্যকার সমতলভূমিতে অধিকাংশ লোক বসবাস করে। মায়ানমারের যাতায়াতব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ জলপথ উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

মায়ানমারের আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর (দ্র) প্রভাবে এখানে মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। দেশের পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের জলবায়ু কিছুটা শুষ্ক। বৃষ্টিপাতের আধিক্যের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়। এখানে শাল, সেগুন, মেহগনি এবং রাবারের (দ্র) ন্যায় মূল্যবান বৃক্ষ জন্মায়। বনে হাতি (দ্র), বানর (দ্র), মহিষ (দ্র) প্রভৃতি বাস করে।

মায়ানমার কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার লোকসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগই কৃষিজীবী। নদী–উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে ধান উৎপন্ন হয়। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে তামাক (দ্র), তুলা (দ্র), জোয়ার (দ্র) ও যব উল্লেখযোগ্য। মায়ানমারে খনিজ তেল, টিন, টাংস্টেন (দ্র), সীসা (দ্র), দস্তা (দ্র), অ্যান্টিমনি (দ্র), সোনা (দ্র), রূপা (দ্র) প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। বস্ত্রবয়ন, ধূমপানের জন্য চুরুট তৈরি ও খেলনা প্রস্তুত–কাজে মায়ানমারবাসীদের খ্যাতি আছে। বৃহৎ শিল্পের মধ্যে তৈল শোধনাগার, বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি প্রধান।

ইয়াঙ্গুন বা রেঙ্গুন মায়ানমারের রাজধানী ও প্রধান শহর। উপকূল থেকে প্রায় ৩৪ কিমি উত্তরে ইরাবতীর ব-

www.pathagar.com

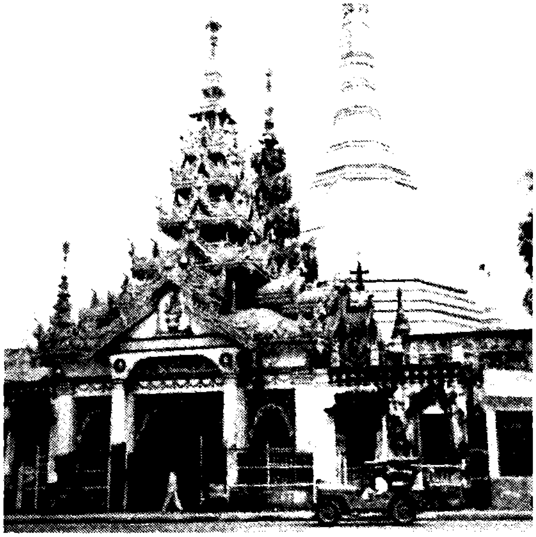

মায়ানমারের রাজধানী রেঙ্গুনে অবস্থিত একটি প্যাগোডা

দ্বীপে এ শহর অবস্থিত। খালের সাহায্যে এটি ইরাবতী ও সিতাং নদীর সঙ্গে যুক্ত। মায়ানমারের শতকরা ৮০ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য এ বন্দর দিয়ে চলে। দেয়ালের প্রতি ইঞ্চি খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়ানো এখানকার শউ ডাগন প্যাগোডা বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্যাগোডা। আরাকান উপকূলে মায়ানমারের বিখ্যাত চাল রপ্তানিবন্দর আকিয়াব। সালুইন নদীর মোহনায় দেশের দ্বিতীয় বন্দর মৌলমিন। মান্দালয় মায়ানমারের প্রাচীন রাজধানী ও উত্তর মায়ানমারের প্রধান শহর।

মু. এ.

মারাদোনা, দিয়েগো [১৯৬০—　　]

আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফুটবলার। ১৯৬০ সালের ৩০শে অক্টোবর আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস্ এয়ার্সের এক কারখানাশ্রমিকের ঘরে মারাদোনার জন্ম। দরিদ্র পিতার আট সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। তাঁর পুরো নাম দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা (Diego Armando Maradona)।

ছোটবেলা থেকেই মারাদোনা ফুটবলের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সারাক্ষণ ফুটবল নিয়ে মেতে থাকতেন। মাত্র ৮ বছর বয়সে মারাদোনা স্থানীয় ক্লাব লিসিবেলিতাস্-এ

মাঠে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলার অনন্য ভঙ্গিমায় মারাদোনা

জায়গা করে নেন। ১৯৭৩ সালে মারাদোনার সহায়তায় লিসিবেলিতাস্ জাতীয় জুনিয়র শিরোপা জয় করে। একই বছর তিনি জাতীয় জুনিয়র দলে স্থান পান। এর তিন বছর পর ১৯৭৬ সালে মারাদোনা ষোড়শ জন্মদিন পালনের ১০ দিন আগে প্রথম বিভাগ ক্লাব আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সে যোগ দেন। তবে প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পান ১৯৭৭ সালে। ১৯৭৮ সালে মারাদোনা বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনাইন দলে জায়গা করে নেন। একই বছর তিনি মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বোকা জুনিয়র্স ক্লাবে যোগ দেন।

তাঁর নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা ১৯৭৯তে বিশ্ব যুবকাপে জয়ী হয়। ১৯৮১ সালে মারাদোনার সুবাদে বোকা জুনিয়র্স প্রথম বারের মতো আর্জেন্টাইন লীগচ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৮২-র বিশ্বকাপ শেষে স্পেনের বার্সেলোনা ক্লাব প্রায় ১২ কোটি টাকার বিনিময়ে মারাদোনাকে দলভুক্ত করে। কিন্তু অসুস্থতা এবং আহত থাকার কারণে বার্সেলোনায় তাঁর অবস্থান তেমন সুখকর হয় নি। ১৯৮৪-তে প্রায় ৩০ কোটি টাকার বিনিময়ে ইতালির নাপোলি ক্লাব মারাদোনাকে কিনে নেয়। দু'বছর পর ১৯৮৬-তে মারাদোনার একক কৃতিত্বে আর্জেন্টিনা মেক্সিকো বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে তারা পশ্চিম জার্মানিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো বিশ্বকাপ জয় করে। সেই বছর মারাদোনার চোখধাঁধানো ফুটবলশৈলী সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৮৭ সালে মারাদোনার নেতৃত্বে নাপোলি ক্লাব প্রথম বারের মতো ইতালি লীগ শিরোপা জয়ী হয়। দু' বছর পর তাঁরই সহায়তায় নাপোলি

www.pathagar.com

প্রথম বারের মতো উয়েফা (ইউরোপীয়ান কাপ) কাপ জয় করে নেয়। পরের বছর ('৯০) তাঁর নেতৃত্বে নাপোলি ক্লাব দ্বিতীয় বারের মতো লীগচ্যাম্পিয়ন হয়। একই বছর মারাদোনার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা দুর্বল দল হয়েও ইতালি বিশ্বকাপে রানার্স-আপ হয়, ফাইনালে জার্মানির কাছে ০-১ গোলে হেরে যায়।

১৯৯১ সালে মারাদোনার জীবনে নেমে আসে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশা। মার্চে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য গ্রহণের দায়ে তাঁকে ফুটবল থেকে ১৫ মাসের জন্য সাসপেণ্ড করা হয়। পরের মাসে আর্জেন্টিনায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য পরে আদালত তাঁকে মাদকদ্রব্য সেবন ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে মুক্ত জীবন যাপনের অনুমতি দেয়।

১৯৯২ সালে মারাদোনা পুনরায় ফুটবলে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে অনুশীলন শুরু করেন এবং সেপ্টেম্বরে স্প্যানিশ ক্লাব সেভিয়ের পক্ষে খেলার জন্য ৩০ কোটি টাকার বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হন।

১৯৯৩-এর ফেব্রুয়ারিতে মারাদোনা পুনরায় আর্জেন্টাইন দলের অধিনায়ক মনোনীত হন। পরবর্তী কালে সেভিয়ে ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হলেও আর্জেন্টাইন দলে তাঁর অবস্থান পাকাপোক্ত হয়েছে। ফলে তাঁর '৯৪ বিশ্বকাপে খেলাও নিশ্চিত হয়।

কিন্তু নিষিদ্ধ ঔষধ গ্রহণের অপরাধে ফিফা (দ্র) মারাদোনাকে '৯৪-এর বিশ্বকাপ থেকে বহিষ্কার করে এবং তিনি ১৫ মাসের জন্য আর্ন্তজাতিক ফুটবল অঙ্গন থেকেও বহিষ্কৃত হন। এরপর বিভিন্ন কারণে কয়েক বার তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়র্স ক্লাবের সঙ্গে ৫০ লক্ষ ডলারে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তিনি ৫ম বারের মতো নতুন করে ফুটবল অঙ্গনে ফিরে এসেছেন।

অ. ব.

মার্‌মা

পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি মার্‌মা। বান্দরবন পার্বত্য জেলায় এদের বাস সবচেয়ে বেশি। বান্দরবন শহরে তাদের সমাজের প্রধান বোমাং রাজা বাস করেন। আর খাগড়াছড়িতে মঙ সার্কেলে ছিলেন মার্‌মাদের মঙ রাজা। এখনো সেখানে মার্‌মারা বাস করে। তবে পূর্ববর্তী রাজার মৃত্যুর পর' সেখানে আর কোনো রাজা নেই।

বান্দরবনের বোমাং রাজপরিবারের সদস্যরা নিজেদের বার্মার পেগুর রাজপুত্রের বংশধর বলে দাবি করেন। মার্‌মা শব্দটি তাঁদের মতে 'ম্রাইমা' থেকে এসেছে। ১৭৭৪ সালে তাঁরা রামু, ইদগরে ও মাতামুহুরি উপত্যকায় এবং ১৮০৪ সালে বান্দরবন শহরে বসতি স্থাপন করেন। ১৭৮৪ সালে বর্মি রাজা ভোদফ্রা (বা বোদপায়া) আরাকান রাজ্য দখল করলে হাজার হাজার শরণার্থী মার্‌মা কক্সবাজার (দ্র), পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালীতে এসে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে।

মার্‌মা সমাজে ১৩টি দল আছে। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের ভাষা বর্মি ভাষাগোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং সে ভাষা লিখতে তারা বর্মি লিপিমালা ব্যবহার করে। প্রত্যেক গ্রামে 'ক্যাং' বা 'কেয়াং' অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির আছে। পথিকদের জন্য পথের পাশে থাকে 'চরাইক' বা বিশ্রামঘর। সেখানে কলসিতে করে পথিকদের জন্য পানি রাখা হয়। একে তারা পুণ্যকাজ মনে করে।

মার্‌মা সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী। মেয়েরা স্বাধীনভাবে ঘরে ও ক্ষেতে কাজ করে। তারা নিজেদের তাঁতে তৈরি লুঙ্গি ও অন্যান্য কাপড় পরে। সাধারণত নদীর তীরে সমতলভূমিতে ঘর বেঁধে তারা বাস করে। ঘরগুলো খুঁটির ওপর বাঁশের মাচান বেঁধে তার ওপরে তৈরি করা হয়।

১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মার্‌মাদের পরিবারের সংখ্যা ২২,৫২০টি। ওই আদমশুমারিতে প্রতি পরিবারে ৫.৭৫ জন লোক ধরে তাদের আনুমানিক জনসংখ্যা হয় ১,২৯,৪৯০ জন।

বি. ব.

মার্ক টোয়েন্ [১৮৩৫—১৯১০]

বিখ্যাত মার্কিন লেখক, একাধারে হাস্যরসিক, বৈচিত্র্যসন্ধানী, ব্যঙ্গপ্রবণ ও লোক-ঐতিহ্যের শৈল্পিক ব্যবহারে পারঙ্গম শিল্পী। উপন্যাস (দ্র), ছোটগল্প, ও ভ্রমণসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। মার্ক টোয়েনের (Mark Twain) দু'টি উপন্যাস 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব টম সয়্যার' (দ্র) এবং 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব হাক্‌ল্‌বেরি ফিন্' (দ্র) বিশ্বসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

দু'টি উপন্যাসেরই প্রধান চরিত্র কিশোর, কিন্তু তাদের আবেদন ছোট-বড় নির্বিশেষে সবার কাছে বিপুল। বিশেষ করে 'হাক্ল্বেরি ফিন'-এ মার্ক টোয়েন্ চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনাবিন্যাসে, প্রতীকী

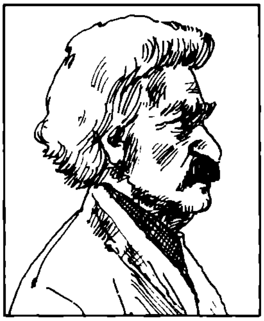

ব্যঞ্জনায়, প্রাণবন্ত আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে এবং গভীর ও উদার এক মানবিক জীবনদর্শন তুলে ধরার ক্ষেত্রে যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তাকে বিচক্ষণ পাঠক-সমালোচক অসামান্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পও, যেমন 'দ্য সেলিব্রেটেড জাম্পিংফ্রগ অব ক্যালভেরাস কাউন্টি', 'দ্য ম্যান দ্যাট করাপ্টেড হ্যাডলিবার্গ' এবং 'দ্য মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যাংকনোট' সারা বিশ্বে নন্দিত হয়েছে। নদীপথে ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত 'লাইফ অন দ্য মিসিসিপি' মার্ক টোয়েনের একটি উপভোগ্য গ্রন্থ।

মার্ক টোয়েন্ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৫ সালে মিসিসিপি নদীতীরবর্তী একটি ছোট শহরে। তিনি বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন দশ বছরেরও কম সময়, কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে তিনি জীবনের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্থক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯১০ সালে মৃত্যুবরণ করার পূর্বেই এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেন।

মার্ক টোয়েন্ কিন্তু ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম ছিল স্যামুয়েল ল্যাঙ্গহর্ন ক্লেমেন্স (Samuel Langhorne Clemens)। বাংলাদেশের নদীপথে আমাদের মাঝিমাল্লারা যেমন 'এক বাঁও মেলে না, দুই বাঁও মেলে না' বলে জল মাপার সময় ডেকে ওঠে, তেমনি 'মার্ক টোয়েন্'-ও হচ্ছে নদীপথে দুই ফ্যাদম গভীরতা মাপার একটি ডাক।

ক. চৌ.

মার্কারি / পারদ (mercury)

একমাত্র সাধারণ ধাতু (দ্র) যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে। এর আপেক্ষিক ঘনত্ব বেশি– ১৩.৫৪৬। প্রকৃতিতে এটা সালফাইড সিনাবার রূপে থাকে। সিনাবারকে এক বিশেষ ধরনের চুলোয় উত্তপ্ত করে পারদ নিষ্কাশন করা হয়। প্রাচীন মিশর, ভারত (দ্র) এবং চীনের (দ্র) অধিবাসীরা পারদের ব্যবহার জানত। থার্মোমিটার (দ্র), ব্যারোমিটার (দ্র) প্রভৃতি যন্ত্রে পারদ দরকার হয়। দাঁতের ক্ষয় পূরণের জন্য পারদ-সঙ্কর বা অ্যামালগাম হিসাবে এটা ব্যবহার করা হয়।

পারদের যৌগসমূহের মধ্যে রয়েছে মার্কিউরাস অক্সাইড (Hg_2O), মার্কিউরিক অক্সাইড (HgO) , মার্কিউরাস ও মার্কিউরিক ক্লোরাইড (Hg_2Cl_2. $HgCl_2$) এবং অন্যান্য সালফেট ও নাইট্রেট লবণ। বাজারে যে সিঁদুর পাওয়া যায়, তা আসলে মার্কিউরিক সালফাইড। মার্কিউরি ফালমিনেট ($Hg(ONC)_2$) ডিটেনেটর রূপে বিস্ফোরক বস্তুতে ব্যবহৃত হয়। পারদ এবং এর যৌগসমূহ অত্যন্ত বিষাক্ত। মানুষের শরীরে একবার ঢুকলে এগুলো খুব ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়। জৈব পারদযৌগ, যেমন– ডাই মিথাইল মার্কারি [$(CH_3)_2$ Hg] খুবই বিষাক্ত।

পারদের পারমাণবিক সংখ্যা ৮০, পারমাণবিক ওজন ২০০.৫৯।

সা. এ.

মার্কারি বাল্ব বিজলি বাতি দ্র

মার্কিউরাস নাইট্রাইট প্রফুল্লচন্দ্র রায় দ্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বিজ্ঞানপ্রযুক্তির অগ্রগতির দিক থেকে পৃথিবীর (দ্র) সবচেয়ে উন্নত দেশ এবং আধুনিক পুঁজিবাদের (দ্র) অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির কেন্দ্রভূমি। ইংরেজিতে এর পুরো নাম ইউনাইটেড স্টেট্স্ অব্ আমেরিকা (United States of America, সংক্ষেপে U S A)। এটি একটি ফেডারেল (সম্মিলিত) প্রজাতন্ত্র। উত্তর আমেরিকা (দ্র) মহাদেশের (দ্র) অধিকাংশ এলাকা এই দেশের আওতাধীন। এর পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর (দ্র), পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর (দ্র), উত্তরে কানাডা এবং দক্ষিণে মেক্সিকো প্রজাতন্ত্র ও মেক্সিকো উপসাগর। এর আয়তন ৯৫,২৯.০৬৩ বর্গ কিলোমিটার বা ৩৬,৭৯,১৭১ বর্গমাইল।

৫০টি অঙ্গরাষ্ট্র (States) নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রটি গঠিত। অঙ্গরাষ্ট্রগুলো হল অ্যালাবামা, আলাস্কা, অ্যারিজোনা, আরকানসাস, ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, কনেকটিকাট, ডেলাওয়ার, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, হাওয়াই, আইডাহো, ইলিনয়, ইণ্ডিয়ানা, আইওয়া, ক্যানসাস, কেন্টাকি, লুইসিয়ানা,

www.pathagar.com

মেইন, মেরিল্যাণ্ড, ম্যাসাচুসেট্স্, মিশিগান, মিনেসোটা, মিসিসিপি, মিজৌরি, মণ্ট্যানা, নেব্রাস্কা, নেভাডা, নিউ হ্যাম্প্শায়ার, নিউ জার্সি, নিউ মেক্সিকো, নিউইয়র্ক, নর্থ ক্যারোলিনা, নর্থ ডাকোটা, ওহাইও, ওক্লাহোমা, অরিগন, পেন্সিলভেনিয়া, রোড আইল্যাণ্ড, সাউথ ক্যারোলিনা, সাউথ ডাকোটা, টেনেসি, টেক্সাস, ইউটা, ভারমন্ট, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, উইস্কনসিন এবং ওয়াইওমিং। এই অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আলাস্কা এবং হাওয়াই আধুনিকতম অঙ্গরাষ্ট্র। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে আলাস্কা ও হাওয়াই অন্যান্য অঙ্গরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন। উত্তর আমেরিকার সর্ব উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আলাস্কা এবং প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই অবস্থিত।

আটলাণ্টিক উপকূল থেকে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে পরিচিত এই ভূখণ্ডটি প্রাচীন কালে স্পেন, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। তখন সমগ্র রাজ্য ছিল ১৩টি উপনিবেশে বিভক্ত। জর্জ ওয়াশিংটনের (দ্র) নেতৃত্বে ১৩টি উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৭৭৬ সালে দেশের সংবিধান রচিত হয় এবং জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। স্বাধীনতা লাভের ২০০ বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র দেশের সীমানা বিস্তার থেকে শুরু করে শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়।

স্ট্যাচু অব লিবার্টি

যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর এক বিচিত্র ভূখণ্ডের দেশ। এখানে অসমতল পর্বতমালা, উষ্ণ মরু অঞ্চল, উর্বর তৃণভূমিসহ আলাস্কার তুষারাবৃত পতিতভূমি, হাওয়াইয়ের আগ্নেয়গিরি এবং ফ্লোরিডার জলাভূমি রয়েছে। দেশের পূর্ব অংশে আপেলেশিয়ান পর্বতমালা এবং পশ্চিমে রকি পর্বতমালা অবস্থিত। মাউণ্ট ম্যাক কিন্লি যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতম পর্বত। এর উচ্চতা ৬,১৯৩ মিটার। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগ সবচেয়ে উর্বর ও সমতল। এর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দেশের ও পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী (৬,২১২ কিলোমিটার) মিসিসিপি ও মিজৌরি। দেশের উত্তর অংশে মিশিগান, সুপেরিয়র, হুরনসহ পাঁচটি বড় হ্রদ (Great Lakes) রয়েছে।

গ্রীষ্মকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্রই গরম অনুভূত হয়। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের মরু অঞ্চলে গরম সবচেয়ে বেশি পড়ে। শীতের সময় মধ্যভাগে শীত পড়লেও প্রশান্ত মহাসাগর-উপকূল আর আটলাণ্টিক মহাসাগর-উপকূল অঞ্চলের চেয়ে সেখানে শীত কম। দক্ষিণ ও পূর্ব অংশের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্ক

www.pathagar.com

সমতলভূমিতে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ফ্লোরিডা প্রজাতন্ত্র ও উপসাগরীয় অঞ্চল মাঝে মাঝে হারিকেনের (দ্র) কবলে পড়ে।

প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি, উন্নত ও সম্প্রসারিত পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে স্বীকৃত। স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় সব সম্পদই যুক্তরাষ্ট্রে আছে। দেশের এক-চতুর্থাংশ এলাকা সবুজ বনাঞ্চলে ঢাকা। কাঠ দেশের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। আপেলেশিয়ান পর্বতে কয়লা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জ্বালানি ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে আকরিক লোহা (দ্র), রক ফসফেট, তামা (দ্র), অক্সাইড (দ্র), নিকেল (দ্র), রূপা (দ্র), সোনা (দ্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জলশক্তি উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নায়গ্রা জলপ্রপাত, হুভার বাঁধ (Hoover Dam)-সহ দেশে এ ধরনের বহু সম্পদ রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় শিল্প-কারখানাগুলো হল লৌহ (দ্র), ইস্পাত (দ্র), সিন্থেটিক রাবার, সিমেন্ট (দ্র) ও অন্যান্য ধাতু, গাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাগজ (দ্র), খাদ্য, বস্ত্র ও পোশাক শিল্প। প্রধান প্রধান রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যগুলোর মধ্যে মোটরগাড়ি (দ্র), উড়োজাহাজ, খাদ্য, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও শিল্পজ কাঁচামালের কথা উল্লেখ করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ মালপত্রের প্রধান পরিবহণ রেল। দেশের চালু রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। সেন্ট লরেন্স সমুদ্রপথ দিয়ে দেশের উত্তর-পূর্ব কোণের গ্রেট লেক্‌স্ পর্যন্ত সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করে। মার্কিন বৃহৎ সামুদ্রিক নৌবহর বহির্বিশ্বে বাণিজ্যিক সংযোগে নিয়োজিত। পৃথিবীর বহু দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান যোগাযোগ আছে।

কৃষির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম অগ্রগণ্য দেশ। নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণ অঞ্চলের কৃষিজাত শস্যাদি, যেমন- ভুট্টা (দ্র), গম (দ্র), সয়াবিন (দ্র), বার্লি, বাদাম, আখ (দ্র), বীট, আলু (দ্র), যব, কমলা (দ্র), ধান (দ্র), আপেল, আঙ্গুর (দ্র), তামাক (দ্র), তুলা (দ্র) ইত্যাদি এখানে উৎপাদিত হয়। দেশের দক্ষিণ ভাগ তুলা, তামাক ও লেবুজাতীয় ফল চাষের জন্য বিখ্যাত।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শিল্প ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বৃহৎ শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে যুদ্ধে জড়িত না হওয়ার নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯১৭ সালে জার্মানেরা যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ ডুবিয়ে দিলে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে বিশ্বের জাতিসমূহের সম্মিলিত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জাতিপুঞ্জ বা 'লীগ অব নেশন্স' (দ্র) স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরুর মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র নীরব থাকলেও পরে ব্রিটেনকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করার মধ্য দিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের (দ্র) অনুসরণে পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে সমাজতন্ত্রের (দ্র) উত্থান ঘটলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রতিভূ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে মনোযোগী হয়। আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিসহ নিজেদের এলাকার বাইরে নতুন সামরিক ঘাঁটি পত্তন ও বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর পাশাপাশি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এই দেশ সাফল্য লাভ করতে থাকে। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম চাঁদে মানুষ পাঠাতে সক্ষম হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্বদান, আধুনিক অস্ত্র নির্মাণ এবং মহাকাশ গবেষণাসহ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির নানা ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ।

১৯৮৮ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৪,৫৮,০০,০০০। অধিকাংশ লোক ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত। ২ কোটি ৫০ লক্ষাধিক লোক নিগ্রো-বংশোদ্ভূত আফ্রো-আমেরিকান। যুক্তরাষ্ট্রের আদি ও স্থানীয় অধিবাসী হিসাবে পরিচিত রেড ইণ্ডিয়ানদের (দ্র) সংখ্যা সাড়ে ৭ লক্ষের ওপর। এরা দেশের পশ্চিম মরুভূমির সংরক্ষিত এলাকায় বসবাস করে। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় নিগ্রোদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, তবে পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মমতের অনুসারী লোকই এখানে বাস করে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো এত বিচিত্র ধর্ম-বর্ণের লোক ধারণ করে আছে এমন দেশ সম্ভবত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। ১৯৮০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই দেশে শিক্ষিতের হার ৯৫.৫%। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-সাহিত্য ও

www.pathagar.com

সংস্কৃতি আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারপদ্ধতি গণতান্ত্রিক। সরকারপ্রধান এক জন প্রেসিডেন্ট। তবে দেশের শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় (ফেডারেশন) ও আঞ্চলিক (অঙ্গরাষ্ট্রীয়) সরকারের মধ্যে বিভক্ত। দেশের আইন পরিষদের নাম কংগ্রেস। কংগ্রেসের দু'টি পরিষদ আছে—সিনেট এবং হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভ্স্। প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্র থেকে ২ জন করে সদস্য নিয়ে সিনেট গঠিত হয়। সিনেটের কার্যকালের মেয়াদ ছ' বছর। মোট সিনেটরদের এক-তৃতীয়াংশের কার্যকাল প্রতি দু' বছর অন্তর শেষ হয়। হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভ্সের সদস্যসংখ্যা ৪৩৫ জন। প্রতি দু' বছর পর পর হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভ্সের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ভোটদাতাদের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। প্রেসিডেন্ট পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এ পর্যন্ত ৪১ জন প্রেসিডেন্ট তাঁদের শাসনকাল অতিবাহিত করেছেন। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের ৪২তম প্রেসিডেন্ট। দেশের রাজধানীর নাম ওয়াশিংটন ডি. সি.। মুদ্রার নাম ডলার।

সুজ. ব.

মার্কিন সাহিত্য

কলম্বাস (দ্র) আমেরিকা (দ্র) আবিষ্কার করেন পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ থেকে ইংরেজরা সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলতে শুরু করে। প্রথম দিকের ঔপনিবেশিক আমলের সাহিত্যে আমেরিকান বা মার্কিনী বৈশিষ্ট্য বলে তেমন কিছু ছিল না। সে যুগের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্ (দ্র)। তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৭১ সালে। ততদিনে আমেরিকানদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমেরিকা ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করল এবং টমাস্ জেফার্‌সন্ (দ্র) কর্তৃক রচিত হল ঐতিহাসিক 'স্বাধীনতার ঘোষণা'। প্রথম যুগের মার্কিন সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল জেফার্‌সনের 'স্বাধীনতার ঘোষণা', টমাস্ পেইন্-এর 'কমনসেন্স' ও 'রাইট্স্ অব ম্যান', আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনের 'ফেডারেলিস্ট' এবং ফিলিপ ফ্রেন্-র 'কবিতাবলি'। এ সবই রচিত হয়েছে অষ্টাদশ

বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্

জেফারসন্

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ

অ্যালান্ পো

শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বছরের মধ্যে। তবে এসব রচনা উল্লেখযোগ্য হলেও প্রকৃত আমেরিকান জাতীয় সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার জন্য আরো কিছু কাল অপেক্ষা করতে হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কথাসাহিত্যিক ওয়াশিংটন আর্ভিং (দ্র) ও জেম্স্ ফেনিমোর কুপার এবং কবি উইলিয়াম কালেন ব্রায়াণ্ট ও হেনরি ওয়াড্স্ওয়ার্থ লংফেলো (দ্র) মার্কিন সাহিত্যের বিকাশে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। এদের সঙ্গে এড্গার্ অ্যালান্ পো (দ্র)-র নামও করা দরকার, যিনি ছিলেন একাধারে প্রতিভাবান কবি ও গল্পকার। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আরো কয়েক জন কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক মার্কিন সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেন। তাঁদের রচনায় আমেরিকার প্রকৃতি, জনজীবন, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের বিষয়গুলি উন্নত সাহিত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কবিতার ক্ষেত্রে ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানের (দ্র) 'লীভ্স্ অব গ্রাস', উপন্যাসের ক্ষেত্রে ন্যাথেনিয়েল হথর্নের 'দ্য স্কার্লেট লেটার', হারম্যান মেলভিলের 'মোবি ডিক', হ্যারিয়েট বীচার স্টো (দ্র)-র 'আঙ্কল্ টম্স্ কেবিন্' (দ্র) এবং প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রে ইমারসনের প্রবন্ধাবলি ও থরো-র 'ওয়াল্ডেন' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। হুইট্ম্যানের কবিতা ও গদ্যরচনার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী উভয় দিক থেকে মার্কিন সাহিত্য একটা বিশিষ্ট মাত্রা অর্জন করে। হুইট্ম্যান, হথর্ন্, মেল্ভিল্ প্রমুখের রচনায় কল্পনা ও আবেগ-অনুভূতি একটা

www.pathagar.com

মার্ক টোয়েন্

উইলিয়াম ফক্নার

হেমিংওয়ে

স্টাইনবেক

অ্যালেন গীন্সবার্গ

বড় অংশ অধিকার করে ছিল। পরবর্তী কালে গদ্যে মার্ক টোয়েন্ (দ্র), উইলিয়াম ডীন হাওয়েল্স্ ও হেনরি জেম্স্ এবং কাব্যে সিড্নি ল্যানিয়ার ও এমিলি ডিকিন্সন প্রমুখের সাহিত্যকর্মে একটু ভিন্ন সুর শোনা গেল। নির্ভেজাল বাস্তব জীবন, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ এবং গভীর ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এঁদের রচনাকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তুলল।

বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন সাহিত্য আরো বহুমুখী, বিচিত্র ও পরিণত হয়েছে। থিওডোর ড্রাইসার তাঁর উপন্যাসগুলির মাধ্যমে মধ্যবিত্তের নানাবিধ দুঃখদৈন্য ও দ্বন্দ্বসংঘাতপূর্ণ জীবনের আবেদনময় চিত্র পরিবেশন করেছেন। সিনক্লেয়ার লিউইস, পার্ল্ এস. বাক (দ্র), আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (দ্র), উইলিয়াম ফক্নার্ এবং জন স্টাইনবেক প্রমুখের উপন্যাস সমগ্র বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে। কবিতার ক্ষেত্রেও রবার্ট ফ্রস্ট, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, ই. ই. কামিংস্ প্রমুখ কবি মার্কিন কাব্য-সাহিত্যকে সমাদর ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

নাটকের ভুবনে ইউজীন ও'নীল, আর্থার মিলার, টেনেসি উইলিয়াম্স্, এডওয়ার্ড অ্যালবি মার্কিন নাট্যসাহিত্যকে বিশ্বের সর্বোত্তম নাট্যকর্মের সমান স্তরে উন্নীত করেছেন।

সমকালের আরো কতিপয় সাহিত্যিক যাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্ম দ্বারা মার্কিন সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন কবি রবার্ট লাওয়েল, অ্যালেন গীন্সবার্গ, লিরয় জোন্স এবং কথাসাহিত্যিক বার্নার্ড মালামুড, জেম্স্ বল্ডউইন, জন আপডাইক ও সল বেলো।

বেশ কয়েক জন মার্কিন সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেছেন : ইউজীন ও'নীল-১৯৩৬, পার্ল্ বাক-১৯৩৮, উইলিয়াম ফক্নার-১৯৪৯, হেমিংওয়ে-১৯৫৪, স্টাইনবেক-১৯৬২, সল বেলো-১৯৭৬, আইজাক বাশেভিস সিঙ্গার ১৯৭৮ এবং টনি মরিসন্-১৯৯৩ সালে। অনেক পরে যাত্রা শুরু করেও মার্কিন সাহিত্য আজ বিশ্বের সাহিত্যদরবারে আপন মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ক. চৌ.

মার্কুস্ অরেলিউস্ (১২১—১৮০]

রোমান দার্শনিক সম্রাট। তিনি ১২১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

মার্কুস্ অরেলিউস্ (Marcus Aurelius) ছিলেন প্রারম্ভিক রোমান সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সাল থেকে ২৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী) প্রায় মধ্যভাগের সম্রাট। তাঁর শাসনামলে রোমান সাম্রাজ্যের সীমানার ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

তবে অরেলিউসের পরিচিতি শুধু শক্তিমান সম্রাট হিসাবেই নয়, স্টোয়িক বা নিস্পৃহবাদী দার্শনিক হিসাবেও তাঁর পরিচিতি সুদূরপ্রসারী। তাঁর দর্শনের ভিতর দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের আসন্ন সঙ্কটের আভাসও পরিস্ফুট।

তাঁর দর্শনের মূল কথা হল ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার চেতনা বিশ্ব-বিবেকের মধ্যে লীন হয়ে যায়। ব্যক্তিকে বাস্তব-জীবনের ঘটনার অপরিহার্য নিয়তিকে মেনে নিতে হয় এবং আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নতির মাধ্যমে সান্ত্বনা পেতে হয়।

মার্কুস্ অরেলিউস্ সদ্য প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টধর্মের প্রতি অতি নির্দয় নীতি অনুসরণ করেন। অবশ্য পরবর্তী কালে উল্লিখিত ধর্মের ওপর তাঁর দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ধ্যান' যা উপদেশাকারে লিখিত।

তিনি ১৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

www.pathagar.com

মার্কো পোলো [১২৫৪—১৩২৪]

মধ্যযুগের ইউরোপীয় ভূ-পর্যটকদের এক জন। মার্কো পোলো (Marco Polo) ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইতালির ভেনিস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতা নিকোলা ও পিতৃব্য মেফিয়োর সঙ্গে চীন (দ্র) যাত্রা করেন এবং দীর্ঘ চার বছর পর চীনে পৌঁছন।

মার্কো পোলোর পিতা ও পিতৃব্য ছিলেন বণিক। তাঁরা আগে একবার চীনে গিয়েছিলেন এবং চেঙ্গিস খানের (দ্র) পৌত্র চীন-সম্রাট কুবলাই খান -এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। এবার তাঁদের মাধ্যমে তরুণ মার্কো পোলোও সম্রাটের সঙ্গে পরিচিত হন। স্পষ্টভাষণ, সরলস্বভাব, সততা আর বুদ্ধিমত্তার জন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং সম্রাট তাঁকে দরবারে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন।

তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় চীনা জাতি বেশ এগিয়ে ছিল। তাদের ছিল হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য। মার্কো পোলো চীনে গিয়ে নানা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে থাকেন। সম্রাট মাঝে মাঝে বিশেষ দূতের দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে পাঠান। এই সূত্রে তিনি সাইবেরিয়া, জাঞ্জিবার, মাদাগাস্কার এবং আবিসিনিয়া অঞ্চল ভ্রমণ করেন।

১২৭৭ সালে মার্কো পোলো রাজসভার ক্ষমতাপ্রাপ্ত দূত নিযুক্ত হন এবং পরে তিন বছর চীনের বৃহত্তম নগরী 'ইয়ংচৌ'-এর গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।

এভাবে দীর্ঘ আঠারো বছর চীন দেশে অবস্থান করে মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরের (দ্র) মধ্য দিয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহল (দ্র) হয়ে দেশে ফিরে যান।

১২৯৮ সালে ভূ-মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথ দখলের জন্য ভেনিস এবং জেনোয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে মার্কো পোলো তাতে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং জেনোয়াবাসীদের হাতে বন্দি হন। এ সময় কারাগারে সহবন্দিদেরকে তিনি তাঁর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ভ্রমণকাহিনী শোনান। সহবন্দিদের এক জন তা লিপিবদ্ধ করে নেন এবং পরে 'মার্কো পোলোর পর্যটন' নামে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই ভ্রমণবৃত্তান্তের জন্য মার্কো পোলো বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। কারণ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই চীন (দ্র), তিব্বত (দ্র), ভারত (দ্র), সিংহল, ব্রহ্মদেশ (দ্র) ও শ্যামদেশ (দ্র)-সহ এশিয়ার (দ্র) বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাপন সম্পর্কে ইউরোপবাসীরা প্রথম জানতে পারে। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির গুণে ভ্রমণকাহিনীটি হয়েছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল। পরবর্তী কালে এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রিস্টোফার্ কলম্বাস্ (দ্র) প্রাচ্যের দিকে একটি সামুদ্রিক পথ অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ হন। এঁর তথ্য নির্ভর করে চীনের ন্যায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ধীরে ধীরে ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের মুদ্রার প্রচলন হয়।

মার্কো পোলো ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পান। ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

সুজ. ব.

মার্কোনি, গুহ্লিয়েল্মো [১৮৭৪—১৯৩৭]

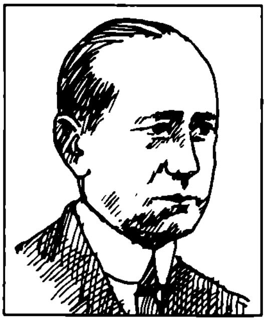

১৮৭৪ সালের ২৫শে এপ্রিল গুহ্লিয়েল্মো মার্কোনি (Guglielmo Marconi) ইতালির বোলোনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ছিলেন না। তাঁর পিতা ছিলেন ইতালির এক জন ধনী ব্যবসায়ী। সাত বছর বয়সে কিছু দিনের জন্য মার্কোনি স্কুলে গিয়েছিলেন এবং তার পর থেকেই পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। সেই সময় তিনি লক্ষ করেন যে স্ফুলিঙ্গ থেকে যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা বিনা তারেই কিছু দূর যেতে পারে। শুরু হল তাঁর গবেষণার কাজ। তিনি চার তলায় একটি ঘরে বসে বোতাম টিপে নিচতলার একটি বেল বাজিয়ে ফেললেন যেখানে তারের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ইতালির সরকার এই ক্ষুদে বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের প্রতি তেমন আগ্রহ না দেখানোর ফলে মার্কোনি পিতার উৎসাহে অনেকটা বাধ্য হয়েই ইংল্যাণ্ডে চলে যান।

মার্কোনির কাজ শুরু হল লণ্ডন জেনারেল পোস্ট অফিসের একটি কক্ষ থেকে পাশের বাড়ির কাছে বার্তা

www.pathagar.com

প্রেরণের মধ্য দিয়ে। অতঃপর ১৮৯৯ সালে ইংলিশ চ্যানেলের এপার থেকে ওপারে প্রেরিত হল বার্তা।

কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ছিল আটলান্টিকের এপার থেকে ৩৩৭৮ কিমি দূরে ওপারে বার্তা প্রেরণ। সেকালের বিজ্ঞানীরা অনভিজ্ঞ মার্কোনির এই স্বপ্নের সফলতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন এই ভেবে যে ভূপৃষ্ঠের বক্রতার জন্য বহু দূরবর্তী অঞ্চলে এই ধরনের বার্তা পাঠানো সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন ১৯০১ সালে এবং আটলান্টিকের এপার থেকে ওপারে বেতারসঙ্কেত পাঠাতে সক্ষম হলেন। তাঁর এই সাফল্য ছিল মানব জাতির (দ্র) জন্য যুগান্তকারী।

১৯০৯ সালে সরকার কর্তৃক তিনি সম্মানিত হন এবং ইতালি সরকার তাঁকে আজীবন সিনেটসদস্য নির্বাচিত করেন। একই বছরে পদার্থবিজ্ঞানে (দ্র) তিনি নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন। অবশ্য মার্কোনির পূর্বেও ম্যাক্সওয়েল, হার্ৎস্ কেল্‌ভিন, জগদীশচন্দ্র বসু (দ্র), আলেক্সান্দ্র পপোভ্ প্রমুখ বিজ্ঞানী এ বিষয়ে গবেষণা করে গেছেন। তাঁদের সেই অসমাপ্ত কাজকে সাফল্যের দিকে ধাবিত করে বিজ্ঞানী মার্কোনি অমর হয়ে আছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কোনি ইতালীয় বেতার-সার্ভিসের কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন। মার্কোনি ৬৩ বছর বয়সে ১৯৩৭ সালে পরলোকগমন করেন।

মু. এ.

মার্ক্স, কার্ল্ হাইনরিশ্ [১৮১৮—১৮৮৩]

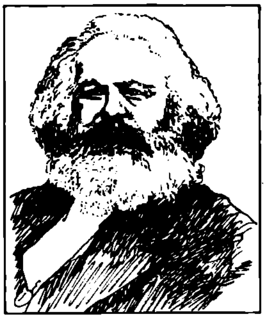

জার্মান অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও বিপ্লবী। মার্ক্সের (Karl Heinrich Marx) প্রণীত তত্ত্বই পরবর্তী কালে গোটা বিশ্বে 'মার্ক্সবাদ' (দ্র) নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর তত্ত্বের অধিকাংশই তিনি দাঁড় করান তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌সের (দ্র) সঙ্গে যৌথভাবে।

মার্ক্সের জন্ম জার্মানির ট্রিয়ের-এ, এক সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮১৮ সালের ৫ই মে। ১৮৩৫ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত তিনি বার্লিন ও বন শহরে আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে হেগেলের (দ্র) দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ১৮৪১ সালে তিনি দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৪২ সালে মার্ক্স 'রাইনিশে সাইটুং' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। অর্থনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে কঠোর সমালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য তিনি প্রুশিয়ার শাসকদের বিরাগভাজন হন। ১৮৪৩ সালে তারা পত্রিকাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে মার্ক্স সপরিবারে প্যারিসে চলে যান। ১৮৪৫ সালে পাড়ি জমান ব্রাসেল্‌স্-এ। ১৮৪৭ সালে আসেন লণ্ডনে (দ্র)। ইতিমধ্যে তাঁর পরিচয় হয় ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌সের সঙ্গে। তাঁদের এই পরিচয় পরে এমন এক বন্ধুত্বের রূপ নেয় যা আজীবন টিকে ছিল। ১৮৪৭-৪৮ সালের মধ্যে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ যৌথভাবে বিশ্বের শ্রমজীবী ও বিপ্লবীদের জন্য 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' (দ্র) প্রকাশ করেন।

১৮৪৭ সালে ইউরোপ (দ্র) জুড়ে বিপ্লবের সূচনা ঘটলে মার্ক্স ফিরে আসেন স্বদেশের মাটিতে। কিন্তু জার্মান উদার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তিনি স্থায়ীভাবে চলে যান ইংল্যাণ্ডে (১৮৪৯)। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

১৮৬৪ সালে মার্ক্স গড়ে তোলেন 'ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল' বা 'প্রথম আন্তর্জাতিক'(দ্র)। কিন্তু এই সংগঠনের অন্যতম নেতা মিখাইল্ বাকুনিন্ ও তাঁর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে এটি ভেঙে যায়। মার্ক্স ছিলেন এর সাধারণ পরিষদের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য।

১৮৬৭ সালে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ডাস্ কাপিটাল্' (দ্র)-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন যথাক্রমে এঙ্গেল্‌স্ ও কার্ল্ কাউট্‌স্কি।

মার্ক্সবাদের মূল বক্তব্য হল : ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধ ও সঙ্কটই ডেকে আনবে তার পতন। পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠবে কমিউনিজ্‌ম্ (দ্র) বা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা। রাষ্ট্র হচ্ছে শোষণের যন্ত্র। তাই শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীশোষণের অবসান সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবই সেই নতুন সমাজ গঠনের একমাত্র উপায়। বিপ্লব ছাড়া স্বয়ংক্রিয় সামাজিক পরিবর্তনের পথে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ মার্ক্সের মৃত্যু হয়। লণ্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে

www.pathagar.com

তিনি চিরশয্যায় শায়িত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ডাস্ কাপিটাল্', 'এ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমি', 'গ্রুনডিস', 'দ্য জার্মান আইডিওলজি', 'দ্য ইকোনমিক অ্যাণ্ড ফিলোজফিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্ট্স্' ইত্যাদি।

আ. হু.

মার্ক্সবাদ

মার্ক্সবাদ বা মার্ক্সইজ্‌ম্ (Marxism) একটি মতবাদের নাম। দু'জন জার্মান দার্শনিক কার্ল্ মার্ক্স (দ্র) ও ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌স্ (দ্র)-এর চিন্তাধারার উপরে নির্ভর করে এই মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এই দুই তাত্ত্বিক ও ভাবুকের মধ্যে প্রধান হলেন মার্ক্স এবং তাঁরই অনুসারী মতবাদের সমর্থক ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন তাঁর সারা জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু এঙ্গেল্‌স্।

মার্ক্সের প্রধান কৃতিত্ব—ভাববাদ ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে বর্জন করে মানবসভ্যতার বিকাশ, সমাজের বিবর্তন ও ইতিহাসের গতি সম্পর্কে যুক্তিবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা নির্মাণ করা। তিনিই প্রথম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় স্পষ্ট ও নিশ্চিত কিছু নিয়ম কাজ করে এবং তা হল উৎপাদনের উপায় (অর্থাৎ মানুষের শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ) ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের ফল। সমাজের অভ্যন্তরে অলক্ষ্যে যা কাজ করে তা হল বিভিন্ন শ্রেণীর উপস্থিতি, তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য

মার্ক্স

এঙ্গেল্‌স্

প্রতিযোগিতা ও সংঘাত, এবং এরই ফলে সমাজ পাল্টাতে থাকে, এগিয়ে যায়। শ্রেণীসংগ্রামের এই তত্ত্ব কার্ল্ মার্ক্সই উদ্ভাবন করেন। উপরন্তু তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান যে সুবিধাভোগী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বঞ্চিত-নিপীড়িত-শোষিত শ্রমিক শ্রেণী বিজয়ী হবেই এবং সে বিজয় পুঁজিবাদের (দ্র) পথে আসবে না, আসবে সমাজতন্ত্রের (দ্র) রাস্তা ধরে সাম্যবাদের (দ্র) পথে।

হা. মা.

মার্জারিন্ তেল-চর্বি দ্র

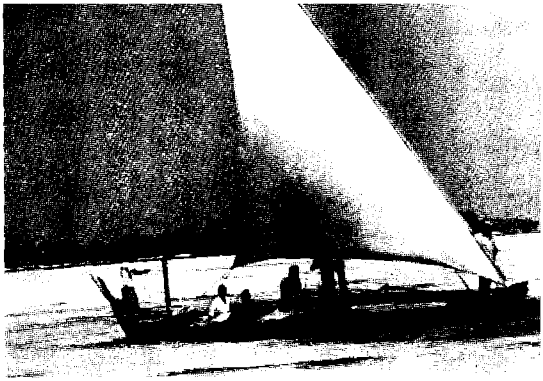

মালদ্বীপবাসীদের জীবন ও জীবিকার প্রধান সহায় সমুদ্র

মালদ্বীপ (Maldives)

মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্র এশিয়া মহাদেশের সার্ক (দ্র)-ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র। প্রায় ১২০০ প্রবাল দ্বীপ নিয়ে দেশটি গঠিত। ভারত মহাসাগরের (দ্র) মধ্যে অবস্থিত এই দ্বীপ ভারতের (দ্র) দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৫০০ কিমি বা ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৩০০ বর্গ কিমি এবং লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। এই দ্বীপের জলবায়ু উষ্ণ এবং আর্দ্র। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস এবং বৃষ্টিপাত প্রায় ৩০০০ মিমি। বছরে দু'বার বর্ষাকাল হয় এবং জলবায়ুর কারণে ম্যালেরিয়ার (দ্র) প্রকোপ আছে।

মালদ্বীপে সিংহলি, আরবীয় ও ভারতীয় লোকের বাস। তাদের ভাষা দিভেহি যা সিংহলির অনুরূপ। অধিবাসীদের প্রায় সকলেই মুসলমান এবং ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম। সমগ্র জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ রাজধানী মালে (Malé)-তে বাস করে। মালদ্বীপের সম্পদ খুবই সীমিত এবং বেশির ভাগ মালদ্বীপবাসী মৎস্য শিকার ও নারিকেল (দ্র) সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অবশ্য পর্যটনশিল্প মালদ্বীপের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। চাল, চিনি (দ্র), ময়দা ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনধারণের সব কিছুই তাঁদের আমদানি করতে হয়।

কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই সেখানে নাবিকদের আগমন ঘটে। দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীরা সেখানে যায় এবং ইসলাম (দ্র) ধর্ম (দ্র) প্রচার করে। তখন থেকেই এই দ্বীপে সুলতানদের শাসন কায়েম হয়। ১৮৮৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত মালদ্বীপ ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্য

www.pathagar.com

থাকার পর স্বাধীনতা (১৯৬৫) লাভ করে। ১৯৬৮ সাল থেকে সুলতানি আমলের অবসান ঘটে এবং মালদ্বীপে প্রেসিডেন্ট প্রথা ও প্রশাসন চালু হয়। প্রেসিডেন্ট পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ইব্রাহিম নাসির ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭৮ সাল থেকে মামুন আবদুল গাইয়ুম মালদ্বীপের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট।

মু. এ.

মালভূমি পর্বত দ্র

মালিক, ইমাম [আনু. ৭১৫—৭৯৫]

পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মালিক ইব্‌নে আনাস্।

বিখ্যাত মুসলিম মনীষী। মুসলমানদের চার মযহাবের একটির ইমাম। মদিনায় (দ্র) জন্ম। তিনি মদিনায় ফিক্‌হ্ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) ও হাদিস (দ্র) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। সারা জীবন তিনি এই দুই বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে তাঁর মূল্যবান মৌলিক অবদান রয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আল-মুয়াত্তা' বিশেষভাবে সমাদৃত। এ গ্রন্থে তিনি 'ইজ্‌মা' বা সাধারণ ঐকমত্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইমাম মালিক ছিলেন আব্বসীয় সুলতান মনসুরের সমসাময়িক। তিনি সুলতানকে আল্লাহ্‌র প্রতিভূ হিসাবে সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নি। তবু বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে মদিনার গভর্নর জাফর ইব্‌নে সুলাইমানের নির্দেশে তাঁকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয় এবং এতে তাঁর কণ্ঠদেশের হাড় ভেঙে যায়। এভাবে নির্যাতিত হওয়ার ফলে জনসাধারণের কাছে তাঁর মর্যাদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

ইমাম মালিক ৮০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং মদিনার জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মো. ই.

মাশরুম ব্যাঙের ছাতা

মাসকলাই ডাল দ্র

মাস্টারদা সূর্যসেন দ্র

মাস

মাস হল সময় সম্পর্কিত এক ধরনের ধারণা। যেমন ঘণ্টা দিন সপ্তাহ ঋতু ইত্যাদিও সময় বিষয়ক ধারণা। বৎসরকে যে ক'টি ভাগে বিভক্ত করা হয় সেগুলো প্রত্যেকটি একেকটি মাস।

আমাদের মধ্যে বর্তমানে সর্বাধিক পরিচিত বৎসরগণনা-পদ্ধতি তিন ধরনের : বঙ্গাব্দ, খ্রিস্টাব্দ ও হিজরি সাল। প্রথম দু'টি হল সৌর বৎসর, আর শেষেরটি চান্দ্র বৎসর। তিন ধরনের বর্ষগণনাতেই ১২ মাসে বৎসর হয়, যদিও বছরে দিনের সংখ্যায় ভিন্নতা রয়েছে। খ্রিস্টাব্দ ও বঙ্গাব্দে ৩৬৫ বা ৩৬৬ দিনে বৎসর হয়, আর হিজরি সালে বছর হয় ৩৫৪ দিনে। হিজরি মাসে দিনের সংখ্যা কম, কারণ তা চান্দ্র মাস। অন্য দু'টি হল সৌর মাস।

বঙ্গাব্দের মাসগুলোর (১ম থেকে ১২শ পর্যন্ত) অনুক্রম এরকম : বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। খ্রিস্টাব্দের বারোটি মাস যথাক্রমে : জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর। আর হিজরি সালের দ্বাদশ মাসের নাম : মহররম, সফর, রবিউল্ আউয়াল, রবিউস্ সানি, জমাতুল্ আউয়াল, জমাতুস্ সানি, রজব, শাবান্, রমজান, শাওয়াল, জেল্‌কদ, জেল্‌হজ্ব।

হা. মা.

মাহবুব-উল-আলম [১৮৯৮—১৯৮১]

বাংলা ভাষার (দ্র) প্রখ্যাত লেখক মাহবুব-উল- আলম ১৮৯৮ সালের ১লা মে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ফতেয়াবাদ গ্রামে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মওলানা নসিউদ্দিন একজন খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। তিনি কবিস্বভাবের মানুষ ছিলেন, নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন। ফার্সি কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা'র কাব্যানুবাদ তিনি করেছিলেন। মাহবুব-

www.pathagar.com

উল আলম তাঁর পিতার এই কবি-গুণ পেয়েছিলেন এবং কবিতা লিখেই সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এক জন জীবনবাদী গল্পলেখক, ব্যক্তিচেতনাসমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক ও ইতিহাসবেত্তা হিসাবে।

মাহবুব-উল-আলম প্রথমে ফতেয়াবাদ ও পরে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন। তিনি ফতেয়াবাদ মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি ফতেয়াবাদ হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। এ সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (দ্র) চলছিল। তিনি কলেজে পড়ার সময়েই এ বছর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীর এক জন সৈনিক হিসাবে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি প্রথমে করাচিতে ও পরে ইরাকের কুত-আল্ আমিরায় সৈনিক হিসাবে কাজ করেন। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে তিনি দেশে ফিরে আসেন। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী হিসাবে ১৯২১ সালে সাবরেজিস্ট্রার পদে নিয়োগলাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি জেলা সাবরেজিস্ট্রার ও বিভাগীয় ইন্স্পেক্টর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেন। এ বছরই তিনি চট্টগ্রাম থেকে 'সাপ্তাহিক জামানা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনিই তা সম্পাদনা করেন। পরে 'জামানা' দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে প্রথম সাংবাদিক সমিতি গঠন করেন। তিনি ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। ১৯৫৯ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ভ্রমণ করেন।

মাহবুল-উল-আলম লিখতেন বেশ সহজ সরল ভাষায়। কিন্তু তাঁর জীবনদৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর। মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল অটল। তাঁর লেখা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'মোমেনের জবানবন্দী' ও সৈনিকজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকথামূলক রচনা 'পল্টনজীবনের স্মৃতি' বাংলা সাহিত্যের (দ্র) দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য মাহবুব-উল-আলম ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) ও প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' লাভ করেন। তিনি আদমজী সাহিত্য পুরস্কারও লাভ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পর ১৯৭৮ সালে তিনি সাহিত্যের জন্য 'একুশে পদক' (দ্র) লাভ করেন। শেষ জীবনে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তিন খণ্ডে 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' রচনা করেন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, সৎ, রুচিশীল, মিতব্যয়ী ও অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির। মাহবুব-উল-আলম ১৯৮১ সালের ৭ই আগস্ট সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়িস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : 'পল্টনজীবনের স্মৃতি' (৩য় সং ১৯৬৫), 'মোমেনের জবানবন্দী' (১৯৪৬), 'তাজিয়া' (১৯৪৬), 'মফিজন' (১৯৪৬), 'গাঁয়ের মায়া' (১৯৪৬), 'পঞ্চ অন্ন' (১৯৫৩), 'গোঁফ সন্দেশ' (১৯৫৩), 'আলাপ' (অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে পত্রালাপ), 'সংকট কেটে যাচ্ছে' (১৯৫৪), 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' (তিন খণ্ড–পুরানো, নবাবী ও কোম্পানী আমল), 'দিদারুল আলম' (জীবনকথা, ১৯৫১)।

তাঁর রচিত ইউনেস্কোর দেশ-পরিচয়মূলক গ্রন্থাবলি : 'বার্মা' (১৯৫৯), 'পূর্ব পাকিস্তানের পাখি' (১৯৬০), 'পূর্ব পাকিস্তানের বন্য জন্তু' (১৯৬০), 'ইন্দোনেশিয়া' (১৯৬০), 'তুর্কী' (১৯৬০), 'সীলোন' (১৯৫৯), 'সৌদী আরব' (১৬০), 'পূর্ব পাকিস্তানের বনক্ষেত্র' ও 'পূর্ব পাকিস্তানের মৎস্য সম্পদ'।

শ. আ.

মাহবুব মোর্শেদ, সৈয়দ [১৯১১—১৯৭৯]

বিচারপতি ও বুদ্ধিজীবী। তিনি অবিভক্ত ভারতের মুর্শিদাবাদে ১৯১১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন।

সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ ১৯৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে এল. এল. বি. এবং বিলেতের লিঙ্কন্‌স্ ইন থেকে ১৯৩৯ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন। ১৯৫১ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকা

www.pathagar.com

হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন।

১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও এক শ্রেণীর রবীন্দ্র-বিরোধী বুদ্ধিজীবীর প্রবল বিরোধিতার মুখে বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী পালনে সবিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। তিনি রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতিও হন।

১৯৬৪ সালের ১৫ই মে তিনি ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৬৭ সালের ১৫ই নভেম্বর তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন।

বিচারপতি মোর্শেদ ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় (দ্র) অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। পাশাপাশি ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, ছাত্রদের ১১-দফা কর্মসূচির প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন, রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান (দ্র) আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, পূর্ব-বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) চলাকালে বাঙালি জনগণের ওপর পরিচালিত পাকবাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে তিনি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ ঢাকায় ১৯৭৯ সালের ৩রা এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

মাহি সওয়ার

মাহি সওয়ার বা মাহি সোয়ার নামে পরিচিত বিখ্যাত দরবেশের প্রকৃত নাম মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মাহি সওয়ার। তিনি শাহ্ সুলতান বল্‌খী (র.) নামেও এ দেশে পরিচিত। বগুড়ার মহাস্থানগড়ের (দ্র) সামান্য দক্ষিণে একটি উঁচু টিলার ওপর তাঁর মাজার আজও বিদ্যমান।

শাহ্ সুলতান মাহি সওয়ারের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। কিংবদন্তি অনুযায়ী মধ্য-এশিয়ার বল্‌খের রাজপুত্র ছিলেন তিনি। তাঁর পিতার নাম ছিল শাহ্ আলী আসগর। পিতার মৃত্যুর পর শাহ সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আরাম-আয়েশে বিলাসী জীবনযাপন করতে থাকেন। একদা বিশেষ এক ঘটনায় তাঁর মনে পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে নানা স্থানে ভ্রমণ করতে থাকেন। পীরের মুরিদ হয়ে তিনি সুফি সাধনায় মগ্ন হন। এর পর পীরের আদেশে তিনি ইসলাম (দ্র) প্রচারের জন্য বঙ্গদেশে আসেন। প্রথমে চট্টগ্রামের (দ্র) সন্দ্বীপে, পরে মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে এবং সবশেষে বগুড়ার করতোয়া-তীরস্থ মহাস্থানে অবস্থান করেন।

মু. মা.

মাহে-নও

সচিত্র বাংলা মাসিক 'মাহে-নও' আবদুর রশিদের সম্পাদনায় ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে (১৩৫৫ সনের চৈত্র) আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান পাবলিকেশন্সের পক্ষে পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচি থেকে এম. আরশাদ হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এ পত্রিকা ছাপা হত তখনকার প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায়। ছাপতেন ৫ নং নয়াবাজারের শ্রীকান্ত প্রেস থেকে ভোলানাথ বসাক। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল 'দেশের প্রধান সাহিত্যিকদের কদর দেওয়া ও নয়া আজাদীর আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট নবীন লেখক–লেখিকা সৃষ্টি করা'।

'মাহে-নও'- এর বার্ষিক মূল্য ছিল সডাক সাড়ে ৫ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৮ আনা বা ৫০ পয়সা। সাইজ সাড়ে ৯" X সাড়ে ৭"। দ্বিতীয় বর্ষের ১২শ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা পর্যন্ত 'মাহে-নও' সম্পাদনা করেন মীজানুর রহমান। চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা থেকে অষ্টম সংখ্যা পর্যন্ত এর সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (দ্র)। চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যা (১৩৫৯ সনের পৌষ) থেকে ষোড়শ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত 'মাহে-নও' সম্পাদনা করেন কবি আবদুল কাদির (দ্র)। ষোড়শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে (১৩৭১ সনের পৌষ : ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর) 'মাহে-নও' সম্পাদনা করে আসছিলেন কবি তালিম হোসেন। সরকারি আনুকূল্যে প্রকাশিত এ মাসিক পত্রিকা পাকিস্তানি ভাবধারা প্রচারে ব্যাপক প্রয়াস চালিয়েছিল।

আ. কা.

www.pathagar.com

মাহ্দী, ইমাম

'মাহ্দী' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সৎপথপ্রাপ্ত লোক, সৎপথে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী বিশ্বাসমতে ভবিষ্যৎ সংস্কারক অর্থে 'মাহ্দী' শব্দটি প্রচলিত। ইমাম মাহ্দী ইসলামের সর্বশেষ সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হবেন বলে সুন্নী মুসলমানদের বিশ্বাস। তাঁর সংস্কার-কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মূল শিক্ষার আলোকেই প্রণীত হবে। মাহ্দী সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভিন্ন হলেও সেখানেও এক জন সংস্কারক বা ইমামের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

মু. মা.

মিউনিখ চুক্তি

১৯৩৮ সালের ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর জার্মানির মিউনিখ শহরে সম্পাদিত চুক্তি। এতে অংশ নেন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে চেম্বারলেন, ফ্রান্সের পক্ষে দেলা দিয়ের, ইতালির পক্ষে মুসোলিনি (দ্র) এবং জার্মানির পক্ষে হিটলার (দ্র)। এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে চেকোস্লোভাকিয়ার সুডিটেনল্যাণ্ড অঞ্চল দখলের অনুমতি দেওয়া হয়। যুক্তি ছিল, সেখানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে আটাশ লক্ষ জার্মান এবং চেক মাত্র আট লক্ষ। আসলে সুডিটেনল্যাণ্ড ছিল শিল্প-কারখানায় সমৃদ্ধ অঞ্চল। যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। প্রাকৃতিক কারণে প্রতিরক্ষার দিক থেকেও এর অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি এবং রাশিয়াকে (দ্র) ডাকা হয় নি। ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স ভেবেছিল এতে করে জার্মানির আধিপত্যবাদী তৃষ্ণার অবসান ঘটবে। কিন্তু এই সমঝোতার অল্পকালের মধ্যেই ১৯৩৯ সালের মার্চে হিটলার (দ্র) এই চুক্তি ভঙ্গ করেন। তিনি দাবি করেন, সুডিটেনল্যাণ্ডে জার্মানেরা নিগৃহীত হচ্ছে, তাই এই অঞ্চল হবে পুরোপুরি জার্মানির অন্তর্ভুক্ত। এভাবে এই অঞ্চলে হিটলারের সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সূচনা হয়।

আ. মা.

মিকি মাউস ডিজ্‌নি, ওয়াল্ট্ দ্র

মিকেলাঞ্জেলো [১৪৭৫—১৫৬৪]

ইতালীয় ভাস্কর, চিত্রকর, স্থাপত্যবিদ, প্রকৌশলী ও কবি মিকেলাঞ্জেলো বুওনারোত্তি (Michelangelo Buonarotti) ছিলেন ইতালীয় রেনেসাঁস (দ্র)-এর ও অন্যতম পুরোধা। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের মর্যাদায়ও তিনি অধিষ্ঠিত।

দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে ইতালীয় শিল্পকলা জগতে আধিপত্য বিস্তারকারী মিকেলাঞ্জেলো পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের গোড়ার দিককার যাবতীয় শৈল্পিক আবিষ্কারগুলি আত্মস্থ করে ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করেন। শুধু তাই নয়, মানবতাবাদের (দ্র) নতুন দর্শনের ভেতর দিয়ে পুনরুজ্জীবিত চিরায়ত আদর্শের সঙ্গে তিনি ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করেন।

তিনি কাপ্রেসের তুস্কান্ গ্রামে ১৪৭৫ সালের ৬ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কালে ফ্লোরেন্স ছিল সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। বিশেষত ক্যাথিড্রাল, গির্জা (দ্র) ও প্রাসাদসমূহ সজ্জিত ছিল অনুপম সব ভাস্কর্য, চিত্রকর্ম ও স্থাপত্যশৈলী দ্বারা। এসবের নির্মাতা ছিলেন ইতালির বিখ্যাত সব ভাস্কর ও চিত্রকর। মিকেলাঞ্জেলো প্রথম জীবনে এসবেরই ছবি আঁকতে শুরু করেন। পরে ১৪৮৮ সালে তিনি ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত চিত্রকর দোমেনিকো গির্লান্দাইওর (দ্র) কাছে হাতে কলমে ছবি আঁকা শেখেন।

তাঁর কর্মজীবন পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত। ১৪৮৮ থেকে ১৫০৫ সাল প্রথম পর্যায়, ১৫০৫ থেকে ১৫১২ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায় ১৫১২ থেকে ১৫২১ সাল পর্যন্ত, চতুর্থ পর্যায় ১৫২১ থেকে ১৫৩৪ সাল পর্যন্ত এবং পঞ্চম পর্যায় ১৫৩৪ থেকে ১৫৬৪ সাল পর্যন্ত প্রসারিত।

তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রোমের সেন্ট পিটারের 'পিয়েতা' এবং ফ্লোরেন্সের আকাদেমিতে রক্ষিত 'ডেভিড', রোমের সিস্টিন চ্যাপেলের সিলিং-এর ভিত্তিচিত্র যাতে বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টি, মানুষের পতন ও নূহের কাহিনী ৩৪০টি পূর্ণাবয়ব মানবমূর্তির মাধ্যমে রূপায়িত। এ ছাড়া দ্বিতীয় পোপ জুলিয়াসের সমাধিসৌধ, 'মোজেস'-এর মূর্তি, 'ফ্লোরেন্স পিয়েতা', 'ক্যাপটিভ', ফ্লোরেন্সে মেদিচি পরিবারের

www.pathagar.com

সিস্তিন চ্যাপেলের ছাদে আঁকা ছবি, শিল্পী : মিকেলাঞ্জেলো

অ্যাথলেট, শিল্পী : মিকেলাঞ্জেলো

পিয়েতা—১৪৯৮, শিল্পী : মিকেলাঞ্জেলো

www.pathagar.com

সমাধিসৌধ এবং রোমে সেন্ট পিটারের সৌধ রচনায় ভাস্কর ও স্থপতি হিসাবে তাঁর কালজয়ী প্রতিভার স্বাক্ষর অঙ্কিত।

মিকেলাঞ্জেলো ১৫৬৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

মিঞা তানসেন তানসেন দ্র

মিণ্টো, লর্ড গিলবার্ট এলিয়ট [১৮৪৫—১৯১৪]

ব্রিটিশ প্রশাসক ও কূটনীতিক। গিলবার্ট জন এলিয়ট মারে কিনিনমণ্ড (Gilbert John Elliot Murray Kynynmound) ১৮৪৫ সালের ৯ই জুলাই লণ্ডনে (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজের ইটন ও ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি যৌবনে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৮৭৯ সালে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে এবং ১৮৮২ সালে দ্বিতীয় মিশরীয় যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৮৯১ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি লর্ড মিণ্টো নাম ধারণ করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি কানাডার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। এই পদে দায়িত্বপালনকালে প্রশাসক হিসাবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন।

লর্ড মিণ্টো ১৯০৫ সালে ভারতবর্ষের ভাইসরয় নিযুক্ত হন এবং লর্ড কার্জনের (দ্র) স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর গৃহীত উদারনৈতিক কার্যক্রম তৎকালীন ভারতের উত্তপ্ত পরিবেশকে অনেকটা শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিখ্যাত মর্লি-মিণ্টো সংস্কার। ভারতসচিব লর্ড মর্লির সহযোগিতায় তিনি এই সংস্কার প্রবর্তন করেন। মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তন। এই ব্যবস্থার ফলে আইনসভায় মুসলমানদের ভোটে মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হতে থাকেন।

লর্ড মিণ্টো ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে যেমন সাফল্য লাভ করেন, তেমনি প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথেও সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন। তিনি গ্রেট ব্রিটেন (দ্র) ও রাশিয়ার (দ্র) সকল বিরোধ অবসানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, আফগানিস্তানের আমীরের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করেন এবং ভারতের আফিম (দ্র) রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস করে চীনের (দ্র) সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে লর্ড মিণ্টো ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯১৪ সালের ১লা মার্চ পরলোকগমন করেন।

মো. ই.

মিত্রশক্তি বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয়) দ্র

মিথিলা

ভারতবর্ষের বিহার অঞ্চলের প্রাচীন নাম। এখানকার রাজাদের উপাদি ছিল 'জনক'। মিথিলার ভাষাকে বলা হত 'মৈথিলী', বাংলা ভাষার (দ্র) সঙ্গে তার সাদৃশ্য ছিল। মৈথিলীতে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। বিদ্যাপতি (দ্র) এ ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি।

হা. মা.

মিথেন (methane)

মিথেন একটি সরলতম হাইড্রোকার্বন (দ্র)। এটির অণুতে ১ টি মাত্র কার্বন ও ৪টি হাইড্রোজেন (দ্র) আছে। এটির সাধারণ সঙ্কেত CH_4। ১৭৭৮ সালে বিজ্ঞানী ভোল্‌তা (দ্র) এটি আবিষ্কার করেন। মিথেন একটি গ্যাসীয় পদার্থ। পেট্রোলিয়াম-খনিতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস (দ্র)-এ শতকরা ৮৫ ভাগ মিথেন থাকে। কয়লা (দ্র) থেকে যে কোল গ্যাস (Coal gas) পাওয়া যায় তাতেও মিথেন থাকে। সিলেট ও তিতাস গ্যাসেও যথেষ্ট পরিমাণে মিথেন আছে। জলাভূমিতে পানির নিচে পানা ও নানা জাতীয় পাতা ও বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদের পচনের ফলে এই গ্যাস তৈরি হয়। জলাভূমিতে এই গ্যাস উৎপন্ন হয় বলে একে জলাগ্যাস বা মার্শগ্যাস (marsh gas)-ও বলা হয়। জলাভূমিতে উদ্ভূত মিথেনের সঙ্গে অনেক সময় সামান্য পরিমাণ ফসফিন (Phosphine–PH_3) থাকে যার ফলে মিথেনে সহজেই আগুন ধরে যায় এবং এই ব্যাপারটিকেই আলেয়া (দ্র) বলা হয়ে থাকে।

মিথেন প্যারাফিন (দ্র) গোষ্ঠীর প্রথম হাইড্রোকার্বন। প্যারাফিন শব্দের অর্থ সামান্য আসক্তি (parum = little. affins = affinity)। সাধারণ বিকারক দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না বলে প্যারাফিনকে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

মিথেন স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন একটি গ্যাস। এটি

www.pathagar.com

বিষাক্ত নয়। মিথেন পানিতে (দ্র) সামান্যই দ্রবীভূত হয়, কিন্তু অ্যালকোহল (দ্র) ও ইথারে দ্রবণীয়। –১৬৪° সে. তাপমাত্রায় এটি বর্ণহীন তরল পদার্থে পরিণত হয়। মিথেন একটি সহজ-দাহ্য গ্যাস এবং অতি সহজে বায়ু বা অক্সিজেনে (দ্র) জ্বলে CO_2 এবং পানি উৎপন্ন করে। বায়ু বা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বালালে বিস্ফোরণ ঘটে এবং CO_2 এবং পানি উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপও সৃষ্টি হয়। ওজোন (দ্র) গ্যাস মিথেনকে জারিত করে ফর্ম্যাল্ডিহাইডে (দ্র) পরিণত করে। উপযুক্ত প্রভাবকের উপস্থিতিতে মিথেন অক্সিজেনে জারিত হয়ে ফর্ম্যাল্ডিহাইড, মিথাইল অ্যালকোহল ও ফরমিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। অন্ধকারে মিথেনের সঙ্গে ক্লোরিনের কোনো বিক্রিয়া হয় না। কিন্তু মিথেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণকে প্রখর রোদে রেখে দিলে বিস্ফোরণ ঘটে এবং কার্বন ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

ব্যবহার : (১) জ্বালানি হিসাবে; (২) মিথাইল অ্যালকোহল ফর্ম্যাল্ডিহাইড, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি উৎপাদন; (৩) মিথেন থেকে উৎপন্ন কার্বন, কার্বনপেপার, ছাপার কালি, জুতার কালি প্রভৃতি প্রস্তুতিতে; (৪) অধিক হারে হাইড্রোজেন তৈরি করতে।

আ. হ. খ.

মিনার শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

মিনিয়েচার চিত্রকলা

মিনিয়েচার চিত্র হিসাবে অভিহিত চিত্রের শুরু মূলত ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে। মোগল রাজত্বকালে এই মিনিয়েচার চিত্র পরিপূর্ণতা লাভ করে। এর আগে পালযুগের কিছু অনুলিপি চিত্রের নমুনা পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো তালপাতায় আঁকা। কিন্তু সম্রাট আকবরের (দ্র) সময়ে এই মিনিয়েচার চিত্রের চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। তিনি একাধিক চিত্রশালা নির্মাণ করে সেখানে অনেক শিল্পী নিয়োজিত করেন। এসব চিত্রশালায় ফুল, পাখি, রাজকীয় কাহিনী প্রভৃতি এবং সম্রাটদের চেহারা আঁকা হত। এটা পারস্য-প্রভাব।

এই সময়ে দু'জন শিল্পীর নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন খাজা আবদুস সামাদ এবং মীর সাঈদ আলি।

মোগল মিনিয়েচার হল চিত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক ধরনের শিল্পকলা। পুঁথিচিত্রণ দিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও পরে মিনিয়েচার চিত্র নানাভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করে। এসব চিত্রে পাহাড়ি দৃশ্য, গতানুগতিক ভঙ্গিমায় মানুষ, বহুকোণ থেকে দেখা পরিপ্রেক্ষিত, গালিচা বা চাদরে অঙ্কিত বিভিন্ন প্যাটার্নে স্থাপত্যের খুঁটিনাটি, চীনা রীতিতে আঁকা আকাশ। বলা যায়, রোমান্স ও ফ্যান্টাসির জগৎ নির্মাণের প্রয়াস এ চিত্রকলায় বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য।

'এক্‌বাল্' (অর্থাৎ এক পশমের) তুলিতে অতি সূক্ষ্ম, কারুকাজে মিনিয়েচার চিত্র অঙ্কিত হত। হাতের আংটি ও হারের লকেটেও অনেক চিত্রকর্ম করা হয়েছে।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের (দ্র) সময় এই মিনিয়েচার চিত্র উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌছয় এবং মিনিয়েচার রীতিতে বাদশা ও বেগমদের প্রতিকৃতিও অঙ্কন শুরু হয়।

এই চিত্ররীতির অঙ্কনপদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ : কাগজের উপর খুব যত্ন করে বার্নিশ লাগানো হত। তারপর লাল কালি দ্বারা প্রাথমিক রেখা আঁকা হত। পরে কোনো সংশোধনের

আরব মিনিয়েচার

বাশোলি মিনিয়েচার

www.pathagar.com

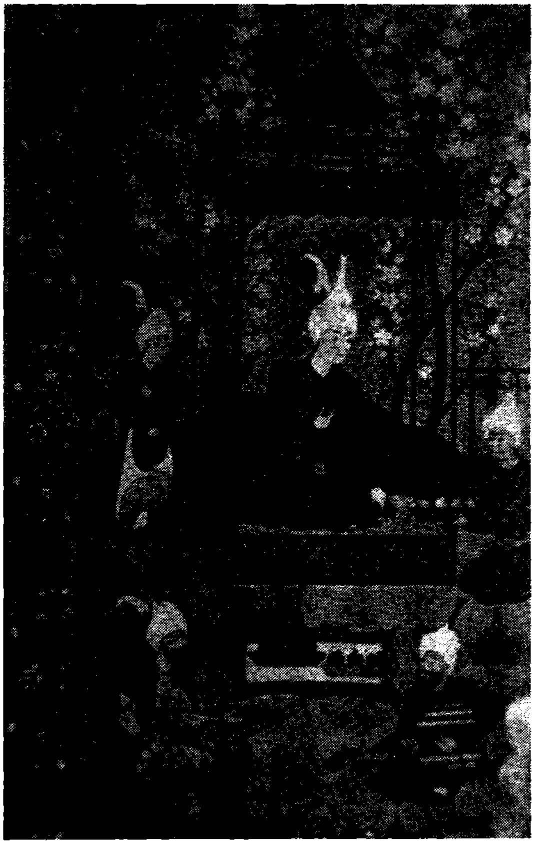

মোগল মিনিয়েচার

পুঁথিচিত্র : বুদ্ধ

প্রয়োজন হলে শিল্পী কালো কালিতে আঁকতেন। তারপর কাগজের উপর পাতলা করে সাদা রঙের আস্তরণ দিতেন। সবশেষে সোয়াশ রং এর মাধ্যমে আসল ছবি আঁকা হত। ছবি শেষ হলে তার উপর বার্নিশ লাগানোর রেওয়াজ ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অলঙ্কার এবং পোশাকের আলঙ্কারিতায় খাঁটি সোনা গুঁড়ো করে রং বানিয়ে তা ব্যবহার করা হত। যেসব পুঁথিচিত্রণ দিয়ে এসব মিনিয়েচার চিত্রের সূচনা সেগুলোর মধ্যে অন্যতম 'আমীর হামজা' গ্রন্থ। এ গ্রন্থে কাপড়ের উপর আঁকা ১২০০টি ছবি আছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কালকে মিনিয়েচার চিত্রের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে তাঁর দরবারে প্রতিকৃতি আঁকিয়ে শিল্পী বিশন দাস, মনোহর, মুহম্মদ নাদির, গোবর্ধন এবং আবদুল প্রভৃতি শিল্পীরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আবুল হাসানকে সম্রাট নাদির-উজ-জামান (অর্থাৎ যুগের সেরা শিল্পী) উপাধিতে ভূষিত করেন। এই শিল্পীই অতি সূক্ষ্ম কারুকাজে প্রতিকৃতি অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন।

চীন-জাপানেও মিনিয়েচার চিত্র তৈরির কমবেশি চর্চা হয়েছে। তবে সারা বিশ্বে মোগল মিনিয়েচারই মিনিয়েচার চিত্র হিসাবে বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। হাল আমলে ইউরোপ-আমেরিকায় আধুনিক চিত্রকলায় মিনিয়েচার চিত্র বা খুব ছোট আকারে ছবি আঁকার উৎসাহ ও প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বেশ ঘটা করে আন্তর্জাতিকভাবে মিনিয়েচার চিত্রের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হচ্ছে বেশ কয়েকটি উন্নত দেশে। ফলে আধুনিক চিত্রকলায় মিনিয়েচার চিত্র এক নতুন মাত্রা ও পরিচয় নিয়ে নিজের স্থান করে নিচ্ছে।

সে. এ.

মিম্বর মসজিদ দ্র

মিল, জন স্টুয়ার্ট [১৮০৬—১৮৭৩]

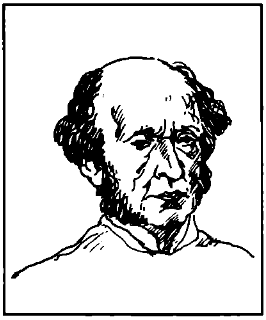

উনিশ শতকের ইংরেজ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ। মিলের (John Stuart Mill) জন্ম ১৮০৬ সালে ২০শে মে ইংল্যাণ্ডে। পিতা জেম্‌স্ মিলও (১৭৭৩-১৮৩০) বিশিষ্ট দার্শনিক ও ইতিহাসবেত্তা। মাত্র ৭ বছর বয়সে মিল উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন গ্রিক ভাষা। ২৩ বছর বয়সে পাঠ নেন অর্থনীতিশাস্ত্রের। ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে তাঁর চাকুরি জীবনের শুরু। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরও সদস্য (১৮৬৫-৬৮) হয়েছিলেন তিনি।

মিলের চিন্তাবিদ ও দার্শনিক জীবনের শুরু বেন্থামের (দ্র) মতবাদের নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা হিসাবে। পরে তিনি বেন্থামের উপযোগিতাবাদের ধারণা থেকে সরে আসেন। উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদের প্রধান প্রবক্তা

www.pathagar.com

হিসাবেও তিনি সবিশেষ খ্যাত। নারী জাতির ভোটাধিকারের সংগ্রামে তাঁর অবদান স্মরণীয়। গণতন্ত্রকে (দ্র) শ্রেষ্ঠ শাসনপদ্ধতি মনে করলেও এর প্রবলতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করতে পারে এমন আশঙ্কাও তাঁর বিভিন্ন রচনায় পরিস্ফুট।

মিলের প্রধান রচনাকর্ম : 'সিস্টেম অব লজিক' (১৮৪৩), 'প্রিন্সিপ্যাল্‌স্ অব পলিটিক্যাল ইকোনমি' (১৮৪৮), 'অন লিবার্টি' (১৮৫৯), 'কন্‌সিডারেশন অব রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট' (১৮৬০), 'ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্' (১৮৬৩), 'সাব্‌জেক্‌শান অব উইমেন' (১৮৬৯) ও 'অটোবায়োগ্রাফি' (১৮৭০)।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৮৭৩ সালে।

আ. হ.

মিলন, শহীদ ডা. শামসুল আলম খান [১৯৫৭—১৯৯০]

১৯৯০ সালের গণ-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও শহীদ। ১৯৫৭ সালের ২১শে আগস্ট ঢাকা শহরে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস নোয়াখালির লক্ষ্মীপুর জেলার কলাকোপা গ্রামে। তাঁর পিতা শাহাদাৎউল্লাহ খান এবং মাতা সেলিনা আক্তার।

শামসুল আলম খান মিলন ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে ঢাকার বিজ্ঞান কলেজ থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এস. এস. সি. এবং ১৯৭৫ সালে নটরডেম কলেজে থেকে প্রথম বিভাগে এইচ. এস. সি. পাশ করেন। ১৯৮৩ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে আই. পি. জি. এম. আর (Institute of Post -Graduate Medicine and Research) থেকে তিনি বায়োকেমিস্ট্রি বিষয়ে এম. ফিল. ডিগ্রি নিয়ে পরের বছর ১৯৮৯ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় মিলন ছাত্র- রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮০ সালে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখার সাহিত্য-সম্পাদক, ১৯৮১ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রসংসদের ক্রীড়া-সম্পাদক এবং ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান প্রণীত শিক্ষানীতিবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৭ সালে সরকারবিরোধী গণআন্দোলনেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি বি. এম. এ. (বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন)-র যুগ্ম-সচিব নির্বাচিত হন।

১৯৯০ সালে এরশাদ–সরকার ঘোষিত গণবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে বি. এম. এ.-র আন্দোলন-কর্মসূচি পরিচালনায় ডা. মিলন বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯০-এর শেষ দিকে তৎকালীন সরকারের পতন ঘটানোর আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন তিনি গণদাবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে থাকেন।

২৭শে নভেম্বর সকালে বি. এম.–এর এক সভায় যোগদানের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে রিকশায় পি-জি হাসপাতালের দিকে যাওয়ার সময় টি. এস. সি. মোড় সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশের সড়কে গুলিবিদ্ধ হয়ে মিলন মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সরকারবিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে এবং এই আন্দোলনের ফলেই সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়।

সুজ. ব.

মিলাদুন্নবী

মিলাদুন্নবী, ঈদ-ই মিলাদুন্নবী বা সীরাতুন্নবী প্রকৃতপক্ষে মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আনুষ্ঠানিকতাসমূহকে বোঝায়। প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জাঁকজমকের সঙ্গে মহানবী (স.)-র জন্মোৎসব ঈদ-ই মিলাদুন্নবী পালিত হয়।

হযরত মুহম্মদ (স.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন (এই তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে)। তাঁর বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল জীবন, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ আলোচনা এবং তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম

www.pathagar.com

পেশ করার মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালিত হয়ে থাকে।

মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রাচীন। মুসলিম লেখকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১২০৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মালিক মুজফরুদ্দীন কোক্‌বুরী সর্বপ্রথম এই উৎসব প্রবর্তন করেন।

মু. মা.

মিল্টন, জন [১৬০৮–১৬৭৪]

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের এক জন। ইংরেজি সাহিত্যে শেক্স্‌পীয়রের পরেই জন মিল্টনের (John Milton) স্থান। তাঁর কালজয়ী মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' (Paradise Lost)-এর জন্য তিনি অমর হয়ে আছেন।

১৬০৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর মিল্টন লণ্ডনে (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপরুষেরা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। পিতা জন মিল্টন সিনিয়র কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত গ্রহণ করে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যান। পিতা এক জন খ্যাতনামা আইনজীবী হলেও শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি গান রচনা করতেন।

লণ্ডনের সেন্ট পল স্কুলে মিল্টনের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তিনি ১৬২৫ সালে প্রবেশিকা পাশ করে কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে তিনি ১৬২৯ সালে স্নাতক ডিগ্রি ও ১৬৩২ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

স্কুলের ছাত্র থাকাকালে মিল্টন নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি লাতিন, গ্রিক, হিব্রু ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সেই সঙ্গে কাব্যচর্চাও শুরু করেন। ১৬২৬ সালে কলেজে পড়ার সময় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ছাত্রাবস্থায় রচিত 'On the Morning of Christ's Nativity' (১৬২৯) ও ' On Shakespeare' (১৬৩০) নামক রচনায় তাঁর কবিপ্রতিভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম জীবনের উল্লেখযোগ্য রচনা হল সনেট। তাঁর ২৪তম জন্মদিনে 'How Soon Hath Time' শিরোনামে সনেট গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এরপর 'On Time' (১৬৩২) এবং 'At a Solemn Musick' (১৬৩৩) শিরোনামে দু'টি ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'Comus' (১৬৩৪) 'Lycidus' (১৬৩৭) রচনার মধ্য দিয়ে তিনি কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

১৬৩৮ সালে মিল্টন ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। তৎকালীন ইউরোপের শিল্পসাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু ইতালিতে কয়েক মাস কাটিয়ে তিনি ১৬৩৯ সালের জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন এবং লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৬৪৩ সালে তিনি ম্যারি পাওয়েল (Mary Powell) নামে এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁর এই বিয়ে সুখের হয় নি।

১৬৪২ সালে পার্লামেণ্ট এবং রাজার মতবিরোধের কারণে ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মিল্টন পার্লামেণ্টের সমর্থনে গদ্য রচনা শুরু করেন। এ সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে লিখিত তাঁর 'Areopagitica' (১৬৪৪) গ্রন্থটি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। গৃহযুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে মিল্টন এর আলোকে 'The Tenure of Kings and Magistrates' (১৬৪৯) শিরোনামে বিখ্যাত রাজনৈতিক পুস্তিকাটি রচনা করেন। এতে রাজার করুণ পরিণতির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন—জনগণই দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

এরপর ক্রমওয়েল কাউন্সিল অব স্টেটের পক্ষ থেকে মিল্টন দেশের বিদেশী ভাষাবিষয়ক সচিব নিযুক্ত হন। ১৬৫১ সালে তিনি কমনওয়েলথ নিউজপেপার কর্তৃক প্রকাশিত 'Mercurius Polilicus' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক পদে যোগ দেন। কিন্তু তখন থেকে কঠোর কর্তব্যপরায়ণতার কারণে অত্যধিক পরিশ্রম করার ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। তিনি ১৬৫২ সালে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যান।

১৬৬০ সালে ইংল্যাণ্ডে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে পার্লামেণ্ট সমর্থনের জন্য মিল্টনকে জরিমানা করা হয় এবং তাঁর কিছু বইও পুড়িয়ে ফেলা হয়। এ সময় তিনি আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হন। পরে অনেকের সঙ্গে তাঁকে ক্ষমা করা হয়।

দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর মিল্টন কিন্তু তাঁর অন্ধত্বকে মেনে নেন নি। সকল প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে তিনি সাহিত্যসাধনা চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে তাঁর শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

কাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' লেখা হয়। ১৬৫৮ সালে তিনি এই কাব্য রচনা শুরু করে ১৬৬৩ সালে শেষ করেন। ১৬৬৭ সালে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি যিশুখ্রিস্টের জীবন নিয়ে 'Paradise Regained' (১৬৭১) শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময় তিনি গ্রিক আদর্শে 'Samson Agonistes' (১৬৭২) নামেও একটি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে রচিত 'On His Blindness'-সহ কয়েকটি মর্মস্পর্শী সনেটে তাঁর অন্তরের দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

মিল্টনকে ইংল্যাণ্ডের রেনেসাঁস যুগের সর্বশেষ প্রতিভূ বলা হয়। রেনেসাঁস ও রিফরমেশনের দ্বিবিধ আদর্শকে তিনি একসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি স্থির করেছিলেন যে এমন একটি কাব্যধারা রচনা করবেন, যার মধ্যে গ্রিক ও রোমান যুগের শিল্পনিষ্ঠা এবং খ্রিস্টান ধর্মের নৈতিক আদর্শের মিশ্রণ ঘটবে। নিজের জীবন থেকে তিনি এই দুই পরস্পরবিরোধী আদর্শের বিরোধ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এর সমাধানের পথও খুঁজে পেয়েছিলেন।

মিল্টন ১৬৭৪ সালের ৮ই নভেম্বর লণ্ডনে মারা যান।

সুজ. ব.

মিশরীয় শিল্পকলা

'সভ্যতার দোল্না' বলে স্বীকৃত প্রাচীন মিশর নীল নদের তীরে গড়ে উঠেছিল। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেকার সেই মিশরীয় সভ্যতা যে শিল্পনিদর্শন রেখেছে তা বিস্ময়কর। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সালের সেই প্রাচীন পৃথিবীর (দ্র) মিশরীয় মানুষদের আজও আমরা স্মরণ করি। তাদের অমর-অক্ষয় শিল্পকীর্তির জন্য।

নীল নদের দান হিসাবে চিহ্নিত মিশরীয় শিল্পকে বলা হয় ধর্মীয় শিল্পকলা। কেননা তাদের শিল্পকর্মগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। মিশরীয়দের ধর্মমন্দির, পিরামিড (দ্র) , ভাস্কর্য ও ছবি প্রভৃতি তাদের শিল্পকর্ম-নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরাট বিরাট সমাধিসৌধ যা পিরামিড বলে খ্যাত, তাকে কেন্দ্র করেই মিশরীয় শিল্পকলার উদ্ভব। তারা চিত্রকলা চর্চা করেছে পিরামিডের অভ্যন্তরে দেয়ালের গায়ে। একটা বিশেষ ধরনের ভঙ্গিতে আঁকা এই সব ছবি রেখা ও রঙের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। মাথা পাশ থেকে আঁকা, বুক পর্যন্ত সামনে থেকে দেখার মতো, আবার পা-দু'টি পাশ থেকে দেখানো। মিশরীয়দের পরিপ্রেক্ষিত-জ্ঞান না থাকায় ছবিতে এই অস্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ এসেছে, যা বাস্তবসম্মত নয়।

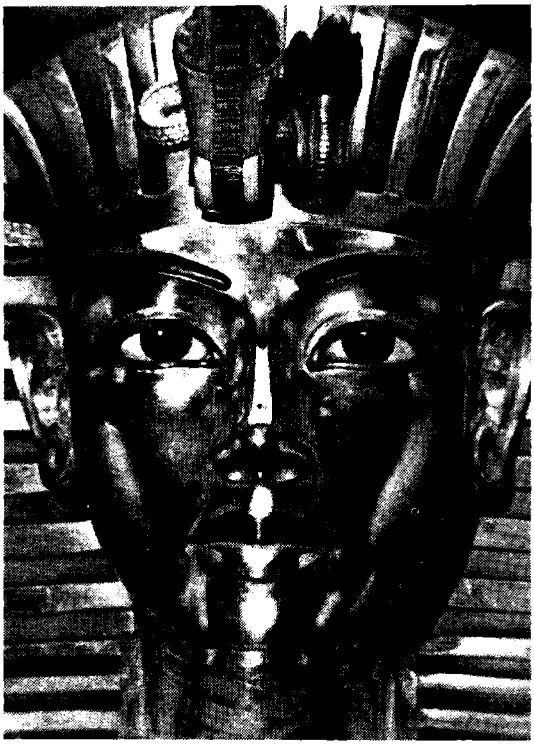

তুতেনখামেনের কফিনে ব্যবহৃত মুখোশ (১৩৬২-১২৫৩ খ্রি.পূ.)

মিশরীয়রা মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত। তাদের মনে এই বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল যে মৃত ব্যক্তির শবদেহটিকে সংরক্ষণ করতে পারলে আবার সেখানে প্রাণ ফিরে আসবে। এই ধারণা থেকে পিরামিডের ভিতরে 'মমি' করে রাখা হত 'ফারাও' (রাজা) এবং রাণী অথবা উচ্চ বংশীয়দের মৃতদেহ, দেয়ালে দেয়ালে ছবি আঁকা হত মৃত ব্যক্তির জীবনকাহিনীকে ভিত্তি করে।

গতানুগতিকতা, বিশালতা ও ব্যাপকতা ছিল মিশরীয় শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পিরামিড ও মন্দির নির্মাণের মধ্যে তারা এর প্রমাণ রেখেছে। আর প্রকৃতপক্ষে তাদের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন বলতেই বোঝানো হয় ওই মন্দিরস্থাপত্য।

মানুষের মুখ ও সিংহের আদলে গড়া দেহাকৃতিসমৃদ্ধ

www.pathagar.com

স্টেপ পিরামিড সাক্কারা (২৯০০ খ্রি.পূ.)

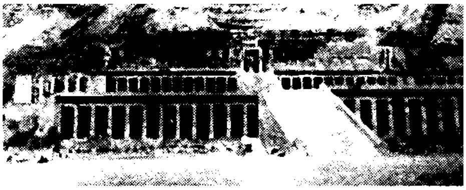

একটি মন্দির

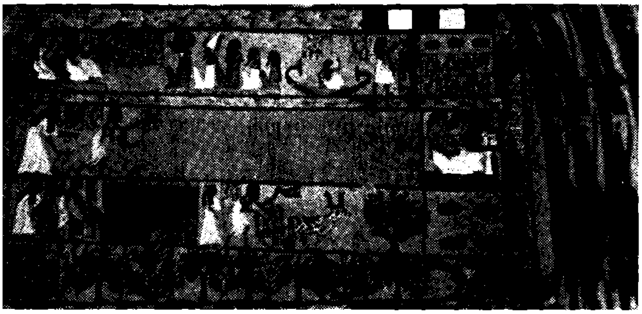

জীবন ও নীলনদকে কেন্দ্র করে অঙ্কিত একটি দেয়ালচিত্র

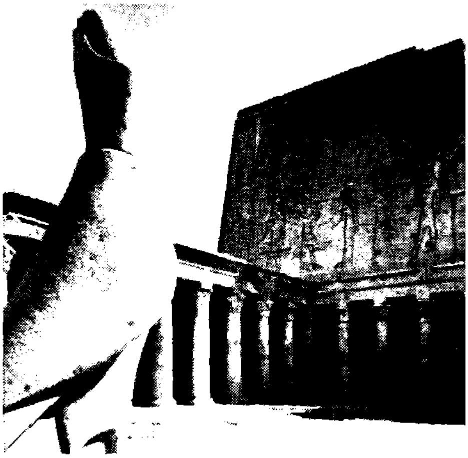

এড্‌ফুর মন্দির

এক ধরনের ভাস্কর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মিশরের শিল্পভাণ্ডারে। মৃতদেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে মমি করা হত তা একেকটি বাক্সে শুইয়ে রেখে তার ঢাকনার উপরে করা হত কাঠের রিলিফ বা খোদাই-কাজ। এ ছাড়াও দাস-দাসীদের স্থলে তাদের প্রতি-আকৃতিমূলক ভাস্কর্য রাখা হত। এভাবে একই ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ভাস্কর্য-শিল্পও বিকশিত হয় মিশরে। এই ভাস্কর্য-মূর্তিগুলি আকারে বিশাল করা হত। প্রস্তর খণ্ড এবং শিলাপাথর ব্যবহার করত তারা এই কাজে। ক্রীতদাসদের মারফত দূর-দূরান্তর থেকে তারা পিরামিডের জন্য এ সমস্ত প্রস্তরখণ্ড বয়ে আনত।

চিত্রশিল্প বলতে মিশরীয়দের যা কিছু অবদান, প্রকৃত অর্থে তা হল দেয়ালচিত্র। শিল্প উপকরণ হিসাবে তারা ব্যবহার করেছে মূলত ফ্রেস্কো (দ্র) পদ্ধতি ও টেম্পারা (দ্র)। ছবি আঁকার সময় মানব-মূর্তির আকার ও উচ্চতা নির্ধারণ করেছে মিশরীয় শিল্পীরা ছবির চরিত্র অনুযায়ী তার সামাজিক পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে । বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন রাজার বলিষ্ঠতা ও সমাজে তাঁর সর্বোচ্চ স্থান বোঝানোর জন্য তাঁকে সবচেয়ে বড় করে দেখানো হয়েছে—তাঁর রঙ উজ্জ্বল করা হয়েছে, আবার ক্রীতদাস শ্রেণীর মানুষকে ছোট করে আঁকা হয়েছে, তাদের রঙ কালো করা হয়েছে ইত্যাদি। মৃত রাজার শান-শওকত, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি, ভ্রমণ, শিকার এবং যুদ্ধসহ তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করাই ছিল মিশরীয় চিত্রশিল্পীদের কর্মকাণ্ডের লক্ষণীয় দিক।

প্রাথমিক পর্যায়ে মিশরীয়দের ছবি ছিল অনেকটা বর্ণমালার মতো—প্রতীকের রূপ ফুটে উঠত তাতে। তবে এই সব বাঁধাধরা অর্থাৎ গৎবাঁধা নিয়ম তাদের শিল্পকর্মের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

শুধুমাত্র আখ্‌নাতোন্ নামে এক প্রতাপশালী রাজার আমলে শিল্পীরা কিছুটা স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে। কারণ সেই রাজা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁকে তাঁর মতো করেই বাস্তব রূপে আঁকতে হবে।

ম. আ.

মিশরীয় সভ্যতা

পৃথিবীর (দ্র) প্রাচীনতম সভ্যতার একটি। নীল নদের তীরে কৃষিভিত্তিক এই সভ্যতার পত্তন ঘটে নব্য প্রস্তর-যুগে (দ্র) খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার অব্দ সময়সীমার

www.pathagar.com

মধ্যে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে উদ্ভব ঘটে মিশর রাষ্ট্রের। প্রথম দিকে মিশর প্রায় ৪০টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। রাজা মেনেম প্রথম পত্তন ঘটান একটি একক রাষ্টের। নীল নদের প্রপাত এলাকা থেকে তা বিস্তৃত ছিল ভূমধ্যসাগর (দ্র) পর্যন্ত। এই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মেম্ফিস। এর পর একাধিক রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করেছে। এ জাতীয় রাজবংশের সংখ্যা ৩০টির মতো। মিশরীয় সম্রাটদের বলা হত ফারাওন বা ফারাও। মিশর প্রথমে গ্রিক, পরে রোমক, তারও পরে আরব শাসনের অন্তর্গত হয়।

মিশরীয়রা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ভিতরেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। জমিতে জলসেচ, বাঁধনির্মাণ ও জলনিষ্কাশন কাজে সফল হওয়ার ফলেই এই উন্নতি সাধিত হয়। এ ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে দাস শ্রমিকেরা। মিশরীয় সভ্যতায় দাস শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল মিশরের। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত টিন ও তামা (দ্র) একত্রে মিশিয়ে তারা ব্রোঞ্জ (দ্র) তৈরির কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিল।

প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মভাব ছিল প্রবল। নানা দেবদেবীর উপাসনা করত তারা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এইসব দেবদেবী। সম্রাট ফারাও যেমন তাদের পরিচালনা করে থাকেন, তেমনি সূর্যের দেবতা 'রা' দেবদেবীদের নিয়ন্ত্রণ করেন।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মধ্যেই মিশরে এক উন্নত লিখনপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এই লিপিকে ইংরেজিতে বলা হয় 'হায়ারোগ্লিফ' বা চিত্রলিপি (দ্র)। শর বা নলখাগড়া জাতীয় গাছের মজ্জা থেকে তৈরি প্যাপিরাস (দ্র) নামের এক ধরনের কাগজের ওপরে লেখার কাজ সম্পন্ন করা হত। পাথর খোদাই করেও তারা লিখত।

ফসলের পরিমাণ নিরূপণ করতে গিয়ে সেই সুদূর প্রাচীন কালের মিশরে জন্ম হয় গণিত (দ্র) শাস্ত্রের এবং খাল খনন, ভূমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাপ, পিরামিডের (দ্র) পাথরের আয়তন ও কোণের পরিমাপ করতে গিয়ে উদ্ভব ঘটে জ্যামিতির (দ্র)। প্রতি বছর নীল নদে বন্যার পূর্বে

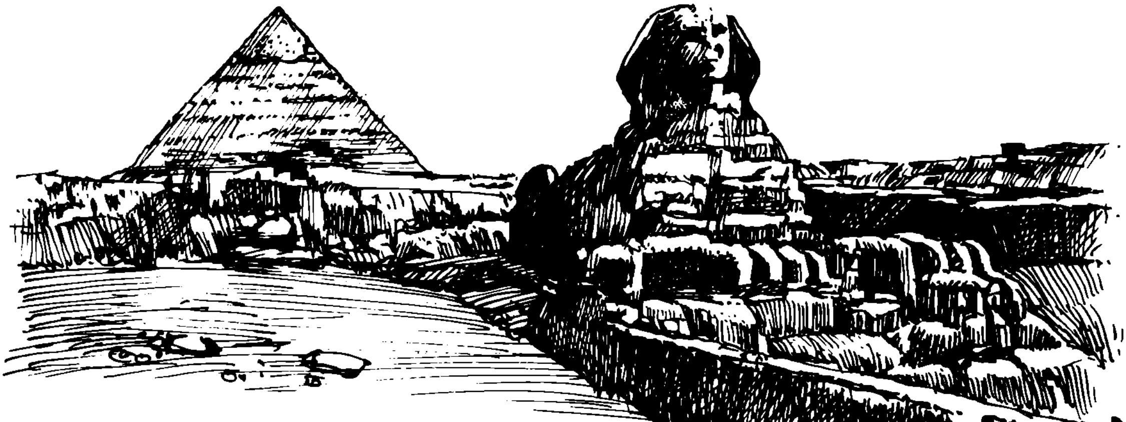

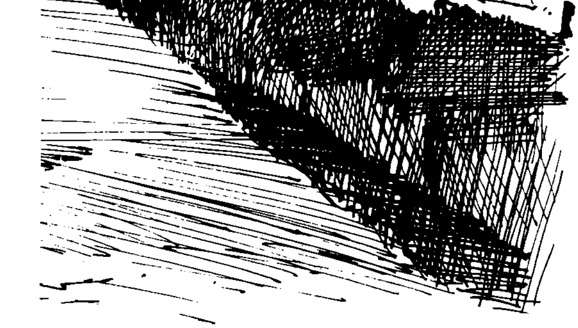

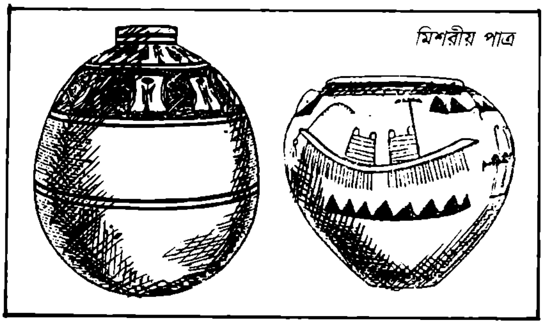

মিশরীয় পাত্র

www.pathagar.com

হায়ারোগ্লিফ বা চিত্রলিপি

আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে মিশরেই প্রথম জন্ম হয় জ্যোতির্বিদ্যার (দ্র)। বর্ষপঞ্জি (দ্র) অর্থাৎ ক্যালেণ্ডার তৈরি করার প্রথম কৃতিত্ব তাদেরই। তারাই প্রথম ৩৬৫ দিনে বছরের হিসাব বের করে।

মৃতদেহকে মমিরূপে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে রসায়নশাস্ত্রের (দ্র) উদ্ভব হয় এবং এই সূত্রেই তাদের পক্ষে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনও সম্ভব হয়। বিভিন্ন গাছগাছড়ার ভেষজ গুণাগুণ শনাক্ত করার মাধ্যমে ভেষজবিদ্যার (দ্র) পাশাপাশি শল্য-বিদ্যার (দ্র) বিকাশে মিশরীয় সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য।

প্রাচীন মিশরে শিক্ষাব্যবস্থারও ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। মিশরীয় ভাস্করেরা মানুষের মুখ খোদাইয়ে ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁদের নির্মিত বহু ধর্মমন্দির, পিরামিড ও স্ফিংক্স স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের অনুপম নিদর্শন হিসাবে আজও পৃথিবীর মানুষের মনে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পিরামিড পৃথিবীর 'সপ্তাশ্চর্যের' (দ্র) অন্যতম।

আ. হু.

মিহ্‌রাব মসজিদ দ্র

মীর কাশিম [? — ১৭৭৭]

মীর কাশিম বাংলার অন্যতম নবাব। তিনি মীর জাফরের (দ্র) আপন জামাতা। তাঁর জন্মকাল জানা যায় না।

মীর জাফরের প্রভাবে মীর কাশিম শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার (দ্র) বিরুদ্ধ পক্ষে অবস্থান নেন। পলাশীর যুদ্ধে (দ্র) সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয়ে পাটনা অভিমুখে পলায়ন করলে মীর জাফরের নির্দেশে মীর কাশিম সসৈন্যে নবাবের পিছু ধাওয়া করে তাঁকে বন্দি করেন। মীর জাফরের পুত্র মীরনের আদেশে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়।

সিরাজের মৃত্যুর পর ইংরেজেরা মীর জাফরকে নবাবের আসনে বসায়। মীর জাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজেরা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর কাশিমকে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে।

মীর কাশিম যোগ্য ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি কঠোর হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন এবং সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করে কোষাগার সমৃদ্ধ করেন। তিনি ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনার মানসে নিজস্ব সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন।

কিন্তু এত কিছুর পরও তাঁর শেষ রক্ষা হয় নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়া বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার রহিত করার ফলে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং অবশেষে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে তিনি ইংরেজ বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। পলাতক অবস্থায় ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

মীর জাফর [? — ১৭৬৫]

বাংলার অন্যতম নবাব। মীর জাফরের প্রকৃত নাম মীর মুহম্মদ জাফর খান। পিতার নাম সাইয়েদ আহমদ আল-নাজাফি। বাংলার ইতিহাসে তিনি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে নিন্দিত। তাঁর জন্ম-তারিখ জানা যায় না। তিনি নবাব আলীবর্দী খাঁ-র বৈমাত্রেয় ভগ্নী শাহ্ খানমের স্বামী ছিলেন এবং এই সূত্রে নবাবের আনুকূল্য লাভ করেন। এমনকি সেনাপ্রধানের দায়িত্বও তিনি লাভ করতে সক্ষম হন।

নবাব আলীবর্দী খাঁ (দ্র) ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব

www.pathagar.com

সিরাজউদ্দৌলার (দ্র) নিকট-আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও মীর জাফর বরাবরই সুকৌশলে নবাব পরিবারের বিরুদ্ধে গোপন শত্রুতায় লিপ্ত ছিলেন। ক্ষমতার উচ্চাশাই এর কারণ। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে এক বার তিনি নবাব আলীবর্দী খাঁ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন, যা সফল হয় নি।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মীর জাফর নবাবির লোভে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মেলান এবং নবাবকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনী ইংরেজ সৈন্যদলের মুখোমুখি হলে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের নিষ্ক্রিয়তা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নবাববাহিনী পরাজিত হয়। পরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ধৃত ও নিহত হন।

নবাবের মৃত্যুর পর ইংরেজেরা মীর জাফরকে নবাব হিসাবে অধিষ্ঠিত করে (২৯শে জুন, ১৭৫৭)। কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব ইংরেজদের হাতেই থেকে যায়, তিনি হন 'পুতুল নবাব'। এর পর ইংরেজদের ক্রমাগত আর্থিক দাবি মেটাতে অক্ষমতা এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে তিনি ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং কিছু দিন পর পুনরায় নবাবি ফিরে পান। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মারাত্মক কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

মীর জুমলা [? — ১৬৬৩]

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের (দ্র) অধীনে মীর জুমলা ১৬৬০ থেকে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।

মীর জুমলার প্রকৃত নাম মীর মুহম্মদ। পারস্যের ইস্পাহানে তাঁর জন্ম। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডার সৈন্যবিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং সেনাপতি পদে উন্নীত হন।

দিল্লির (দ্র) সিংহাসনের অধিকার নিয়ে সম্রাট শাহজাহানের (দ্র) পুত্রদের মধ্যে গোলযোগের সময় মীর জুমলা শাহজাদা আওরঙ্গজেবকে (দ্র) সমর্থন ও সহযোগিতা দান করায় তিনি আওরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

বঙ্গের শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে মীর জুমলা কুচবিহার অধিকার করে তার রাজধানীর নামকরণ করেন আলমগীরনগর। এ ছাড়া তিনি আসামের রাজা জয়ধ্বজ সিংহকে পরাজিত করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। এর পর মীর জুমলা তিব্বত (দ্র) অভিযানও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সে অভিযান সম্ভব হয় নি।

খু. জা.

মীর মদন [? — ১৭৫৭]

নবাব সিরাজউদ্দৌলার (দ্র) সেনাধ্যক্ষ। এক জন সত্যিকার যোদ্ধা হিসাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আপন কর্তব্য পালনে অটল ছিলেন। অবশেষে পলাশীর যুদ্ধে (দ্র) জীবন উৎসর্গ করেন।

প্রথম জীবনে হোসেন কুলি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাসানউদ্দীন খাঁর অনুচর হিসাবে মীর মদন ঢাকায় কর্তব্যরত ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার কথা জানতে পেরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে কাছে টেনে নেন। তার পর কালক্রমে তাঁকে দেওয়ান-ই-অন বা সৈন্য পরিসংখ্যার প্রধানরূপে নিযুক্ত করে মীর জাফর (দ্র)-কে নামমাত্র প্রধান সেনাপতি পদে বহাল রাখেন।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে মীর মদন প্রত্যক্ষভাবে অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীকে নবাবের পক্ষে পরিচালনা ও নির্দেশদানকালে শত্রুপক্ষের কামানের গোলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সুজ. ব.

www.pathagar.com

মীর মশাররফ হোসেন [১৮৪৭—১৯১২]

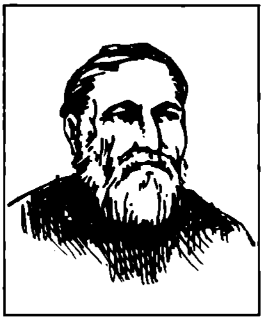

মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদ-সিন্ধু'র (দ্র) লেখক হিসাবে খুবই পরিচিত। উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান লেখকদের মধ্যে তিনিই সবচাইতে খ্যাতিমান। তাঁর আগে মুসলমানদের মধ্যে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ছিলও না। সেদিক থেকে তাঁর মর্যাদা ও সম্মান অনন্য।

'বিষাদ-সিন্ধু' মহররমের (দ্র) বিষাদময় কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির তিনটি পর্ব : মহরম পর্ব লেখা হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, উদ্ধার পর্ব ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে, এজিদবধ পর্ব ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। হযরত মুহম্মদের (স.)(দ্র) প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেন (দ্র,) কীভাবে নিষ্ঠুর উমাইয়া খলিফা এজিদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ফোরাত নদীর তীরে আত্মীয়-পরিজন নিয়ে নিহত হয়েছিলেন তার কাহিনী এই বইতে খুব করুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতই করুণ যে মনে দাগ কেটে যায়, অশ্রুপাত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এরকম করুণ ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। অবশ্য 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনীর মধ্যে সবটুকুই যে সত্য ইতিহাস এমন নয়, অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনীও আছে। মীর মশাররফ হোসেন এসব কাহিনী পুঁথি-সাহিত্য থেকে নিয়েছেন। কিন্তু মশাররফ হোসেনের গদ্য এতই সুন্দর যে পড়তে খুব ভাল লাগে। সন্দেহ নেই, 'বিষাদ-সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের (দ্র) একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ।

'বিষাদ-সিন্ধু' ছাড়া মীর মশাররফ হোসেন আরো বহু বই লিখেছেন। তিনি উপন্যাস ছাড়াও কবিতা, গান, নাটক, রসরচনা এবং জীবনী ও আত্মজীবনী লিখেছেন। সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে তাঁর বইয়ের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ/ছত্রিশটি হবে। তাঁর দু'টি নাটক বিখ্যাত—'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) ও 'জমীদার-দর্পণ' (১৮৭৩)। জমীদার-দর্পণে সেকালের জমিদারদের অত্যাচারের সত্য চিত্র আছে। তাঁর অন্যান্য গদ্য রচনার মধ্যে রয়েছে- 'রত্নবতী' (১৮৬৯), 'এর উপায় কি' (১৮৭৬), 'গো-জীবন' (১৮৮৯), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), 'গাজী মিঞার বস্তানী' (১৮৯৯), 'এসলামের জয়' (১৯০৮), 'আমার জীবনী' (১৯০৮) 'বিবি কুলসুম বা আমার জীবনীর জীবনী' (১৯১০)। বেশ কয়েকটি কবিতার বইও তাঁর আছে— 'গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু' (১৮৭৩), 'সঙ্গীত লহরী' (১৮৮৭), 'মৌলুদ শরীফ', 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৯০৫), 'হযরত ওমরের ধর্ম-জীবন লাভ' (১৯০৫), 'হযরত বেলালের জীবনী' (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬), 'মোসলেম বীরত্ব' (১৯০৭), 'বাজীমাৎ' (১৯০৮)।

অনেক কবিতার বই লিখলেও মীর মশাররফ হোসেন মূলত এক জন গদ্যশিল্পী। এই অসাধারণ গদ্যশিল্পী কুষ্টিয়া জেলার গৌর নদীর তীরে অবস্থিত লাহিনীপাড়া গ্রামে ১৮৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। কুষ্টিয়া তখন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। মশাররফের পিতার নাম মীর মোয়াজ্জেম হোসেন। মায়ের নাম দৌলতন্নেসা। মীর মোয়াজ্জেম অনেক জমিজমার মালিক ছিলেন। মশাররফ তাঁর নিজের বাড়িতে মুনশীর কাছে আরবি (দ্র) ও ফার্সি ভাষা শেখেন এবং বাংলাও শেখেন যত্ন করে গ্রাম্য পাঠশালায়। বিভিন্ন জায়গার স্কুলেও তিনি পড়েছিলেন, যেমন লাহিনীপাড়া স্কুলে, কুমারখালির উচ্চ বিদ্যালয়ে, ফরিদপুরের পদমদীর নবাব স্কুলে, কৃষ্ণনগরে, কলিকাতার (দ্র) কালীঘাট স্কুলে। তবে পড়াশোনায় তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। কলিকাতা থেকে ফিরে এসে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশোনা করতে থাকেন। এরপর তিনি জমিদারি এস্টেটে চাকুরি নেন। ফরিদপুরের পদমদীতে, তারপর টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এস্টেটে তিনি কাজ করেন। দেলদুয়ারে তিনি ম্যানেজার হন ১৮৮৪ সালে। জমিদারদের সঙ্গে বিবাদের কারণে ১৮৯২ সালে ঐ চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তিনি লাহিনীপাড়ায় চলে আসেন। মীর সাহেবের 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থটি দেলদুয়ার থাকার সময়ে লেখা। জমিদারি এস্টেটে কাজ করতে গিয়ে তিনি জমিদারদের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, সম্পত্তিলিপ্সা, ষড়যন্ত্র, হিংসা-বিদ্বেষ এবং নানারকম অনাচার দেখেছিলেন। সে সবের বিবরণ আছে 'গাজী মিঞার বস্তানী' ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' বই দু'টিতে। এই দু'টি বইয়ের গদ্যও খুব সুন্দর।

জমিদারি এস্টেটের কাজ যাওয়ার পর মশাররফ হোসেন বিভিন্ন জায়গায় থাকেন। কলিকাতাতেও ছিলেন—১৯০৩

www.pathagar.com

থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত। একেবারে শেষজীবনে থাকেন পদমদীতে। ১৯১২ সালে পদমদীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

মশাররফ হোসেনের দুই বিয়ে। কলিকাতায় ছাত্র থাকা কালেই তিনি প্রথম বিয়ে করেন (১৮৬৫)। পত্নীর নাম আজিজন্নেসা। এই পত্নীর নামানুসারে তিনি ১৮৭৪ সালে 'আজিজন নেহার' নামের একটি পত্রিকাও বের করেন। ঐ বছরই তিনি বিবি কুলসুমকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয় বিয়ে মশাররফের জীবনে খুব সুখের হয়েছিল। মশাররফের সাহিত্যচর্চায় বিবি কুলসুম বেশ উৎসাহ দিয়েছিলেন। বিবি কুলসুমকে নিয়ে মীর সাহেব যে বইটি লিখেছেন তা মজার বই।

সে আমলে মুসলিম সমাজে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা দেখা যায় নি। এই পরিবেশ থেকে মশাররফ বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। গান-বাজনায়ও আগ্রহী ছিলেন। সে সময় কুষ্টিয়া থেকে একটি খুব নাম করা পত্রিকা বের হত, তার নাম 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'। এই পত্রিকার সম্পাদক কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (দ্র) মশাররফকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর প্রেরণায় মশাররফ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'তে লিখতেন। আরো পরে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (দ্র) প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার কুষ্টিয়া-প্রতিনিধি ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশুদ্ধ বাংলা চর্চা করেছেন। বাংলা গদ্যের উন্নতিতে তাঁর অবদান কম নয়।

দেখা যায়, মীর মশাররফ হোসেনের বেশির ভাগ লেখা ইসলাম বিষয়ক। কিন্তু তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না, মনেপ্রাণে এক জন উদার মানুষ ছিলেন। তিনি রাজনীতি করেন নি, সাহিত্যসাধনাতেই ছিল তাঁর আনন্দ।

আ. ক.

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ ভারতের (দ্র) ব্রিটিশ সরকার ৩৩জন বামপন্থী ও শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে মীরাট শহরের আদালতে এক মামলা দায়ের করেন। এই ঘটনা রাজনৈতিক ইতিহাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। সরকার উৎখাতের গোপন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এই মামলায় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ছিলেন তিন জন ব্রিটিশ নাগরিক। তাঁরা হলেন ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন ব্র্যাডলি ও লেস্টার হাচিন্সন। বাংলা থেকে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ (দ্র), ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, রাধারমণ মিত্র, শামসুল হুদা প্রমুখ। মামলা চার বৎসর ধরে চলে। দেশ-বিদেশে, বিশেষভাবে ব্রিটেনে এই মামলার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত আসামিদের লঘু দণ্ড দেওয়া হয়।

বিশের দশকের গোড়া থেকে ভারতে কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের যে বিকাশ ঘটছিল তাতে ভীত হয়েই ব্রিটিশ সরকার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু এই মামলা বামপন্থী আন্দোলন দমন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরাই বরং পরবর্তী কালে ভারতে শক্তিশালী কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ম. হ.

মুকুন্দ দাস [১৮৭৮—১৯৩৪]

বাঙালি কবি, যাত্রাপালা রচয়িতা ও সঙ্গীতকার। স্বদেশী গান ও স্বদেশী যাত্রা রচনার জন্য বিখ্যাত। বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার বানরি গ্রামে ১৮৭৮ সালে জন্ম। পিতা গুরুদয়াল দে। পিতার দেওয়া নাম যজ্ঞেশ্বর দে। তবে মুকুন্দ দাস নামেই খ্যাত হন। গুরুদয়াল বরিশালে চাকুরি করতেন। শৈশব থেকে মুকুন্দ পিতার সঙ্গে বরিশালে ছিলেন। ফলে সেখানকার বাসিন্দারূপেই তিনি পরিচিত হন। বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে মুকুন্দকে ভর্তি করানো হলেও পড়াশোনায় তেমন অগ্রগতি হয় নি। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দেশব্রতী অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে কিশোর বয়সেই মুকুন্দের পরিচয় হয়। তাঁর দেশপ্রেম মুকুন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে গুরুদয়াল একটি ছোট মুদির দোকান দিয়েছিলেন। এই দোকানটি নিয়েই মুকুন্দের কর্মজীবন শুরু হয়। সে সময় বরিশালের নাজির ছিলেন বীরেশ্বর গুপ্ত। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া। তাঁর কীর্তনের দল ছিল। মুকুন্দ তাঁর দলে যোগ দেন ও শীঘ্রই কীর্তনগায়করূপে

www.pathagar.com

সুখ্যাতি অর্জন করেন। বীরেশ্বর গুপ্ত মারা গেলে মুকুন্দ নিজেই কীর্তনের দল গঠন করেন ও নানা স্থানে কীর্তন পরিবেশন করতে থাকেন। তাঁর গান রচনাও শুরু হয় সে সময় থেকেই। ১৯০৩ সালে 'সাধন সঙ্গীত' নামে মুকুন্দ দাসের একটি গানের বই বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়। তাতে শতাধিক গান স্থান পায়। এ হচ্ছে মুকুন্দ দাসের জীবনের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় কালীসাধক সনাতন চক্রবর্তী ওরফে সোনা ঠাকুরের প্রেরণায়। এই সময়েই তাঁর মধ্যে প্রবল দেশাত্মবোধক প্রেরণা দেখা দেয়। দেশের মানুষকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে ও নানা প্রকার সামাজিক দুর্দশার বিরুদ্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে তিনি গান ও যাত্রা রচনায় মনোনিবেশ করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (দ্র)-কে কেন্দ্র করে বরিশালে তুমুল ইংরেজবিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। মুকুন্দ দাস নিজে এই বিক্ষোভে অংশ নেন ও ইংরেজবিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করে গান রচনা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের শুরুতেই মুকুন্দ দাস 'মাতৃপূজা' নামে একটি পালা রচনা করেন। সুঅভিনেতা মুকুন্দ নিজেই স্থানে স্থানে এই পালা অভিনয় করে বেড়াতে থাকেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার অভিযোগে ইংরেজ সরকার এই পালা রচনা ও প্রচারের জন্য মুকুন্দ দাসকে গ্রেফতার করে। বিচারে তাঁর তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিছু দিন বরিশাল জেলে রাখার পর মুকুন্দ দাসকে দিল্লি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তিন বছর পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মুকুন্দ দাস বরিশালে ফিরে আসেন ও নতুন করে যাত্রার দল গঠনে উদ্যোগী হন। পালা লেখেন 'সমাজ' নামে। ১৯১৬ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (দ্র) আমন্ত্রণে মুকুন্দ দাস তাঁর যাত্রার দল নিয়ে কলিকাতা (দ্র) যান। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সে দলের অভিনয় হয়। সেবারে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িসহ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (দ্র) বিচারপতি এ. চৌধুরী প্রমুখের বাড়িতেও তাঁর যাত্রাভিনয় হয়। মহাত্মা গান্ধী (দ্র) আহূত অসহযোগ আন্দোলনের (দ্র) সময় মুকুন্দ দাস 'কর্মক্ষেত্র', 'পথ', 'পল্লীসেবা' প্রভৃতি যাত্রাপালা রচনা করেন। মুকুন্দ দাসের এই সব যাত্রাপালাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে সংগ্রামী সংযোজনরূপে গণ্য করা হয়। মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাতে, দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা যোগাতে তিনি গান গেয়ে ও যাত্রাভিনয় করে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সে জন্যই তাঁকে বলা হয় 'চারণ কবি'। আসামের এক প্রতিষ্ঠান তাঁকে 'চারণসম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। মুকুন্দ দাস কলিকাতা থাকাকালে এক বার কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁকে গান গেয়ে শোনান ও তাঁর লেখা কয়েকটি বই উপহার দেন। ১৯৩৪ সালে কলিকাতায় যাত্রা পরিবেশন করতে গেলে মুকুন্দ দাস হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মারা যান।

স্বদেশী গান ও যাত্রাপালা রচয়িতা হিসাবে মুকুন্দ দাসের খ্যাতি। বাংলায় এমন উদ্দীপনাপূর্ণ গান কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্য কেউ রচনা করতে সমর্থ হন নি। নজরুল ছাড়া অন্য কোনো কবিও তাঁর মতো চারণের ভূমিকা পালন করেন নি। মুকুন্দ দাসের অনেক রচনাই সংগৃহীত হয় নি। উল্লিখিত যাত্রাপালাগুলো ছাড়া তাঁর ১৩০টি গান পাওয়া যায়।

ক. গো.

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ [আনু. ১৬শ শতক]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের (দ্র) শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্ম বর্ধমানের দামুন্যায়, আনুমানিক ষোড়শ শতকে। হৃদয় মিশ্র ছিলেন কবির পিতা। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কবি পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ করেন। কবি জমিদারপুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। রঘুনাথ রায় জমিদার হলে কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চণ্ডীমঙ্গল (দ্র) কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য রচনা করে তিনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত হন। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে শুধু দেবী চণ্ডীর মহিমাই প্রচার করেন নি, গভীর জীবনবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণ এবং সমাজচেতনা তাঁর কাব্যকে উপন্যাসের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। মুকুন্দরামের মুরারি শীল, ভাঁড়ুদত্ত, ফুল্লরা চরিত্র বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি। উপন্যাসের বর্ণনানৈপুণ্য ও নাটকীয় ঘটনাসংঘাতের

www.pathagar.com

গুণে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি।

মে. খা.

মুকুল শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র
মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দ্র

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দেশের প্রথম জাদুঘর। সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ তারিখে। এটি অবস্থিত রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রস্থল ৫নং সেগুনবাগিচায় একটি দ্বিতল ভবনে।

বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত বাঙালি জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংগ্রামের ইতিহাসকে, বিশেষত একাত্তরের নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ ও তার সম্পৃক্ত অনুপুঙ্খ বিবরণকে, তুলে ধরার লক্ষ্য থেকেই এই জাদুঘরের জন্ম। ৬টি গ্যালারিতে বিভক্ত এর ১ নম্বর গ্যালারিতে রয়েছে বাঙালির ঐতিহ্য ও ব্রিটিশ ভারতে বাঙালি জনগণের সংগ্রামের ছবি ও স্মারক; গ্যালারি ২-এ রয়েছে পাকিস্তান পর্ব। এখানে রক্ষিত আছে '৫২-র ভাষা-আন্দোলন (দ্র) ও '৫৪-র সাধারণ নির্বাচন, ১৯৫৮-র সামরিক শাসন, ১৯৬২র সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬-র-৬-দফা (দ্র) আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (দ্র), ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান (দ্র), ১৯৭০-এর জলোচ্ছ্বাস ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল, ছবি ও স্মারক; গ্যালারি ৩-এ রয়েছে ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন, ২৫শে মার্চ কালরাত্রি (দ্র), শরণার্থী শিবির ও প্রবাসী সরকার সংক্রান্ত ছবি, স্মারক, দলিল ও নিদর্শনাদি; গ্যালারি ৪-এ রয়েছে পাকবাহিনীর বর্বরতা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, প্রাথমিক প্রতিরোধ, প্রবাসী সরকার ও সেক্টর কমাণ্ডারদের তৎপরতাগত বিবরণ; গ্যালারি ৫-এ রয়েছে প্রতিরোধের লড়াই, গেরিলাযুদ্ধ, নৌ-কমাণ্ডো, বিমান বাহিনী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (দ্র), মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন, পাকবাহিনীর দালালদের ভূমিকা ও সশস্ত্র যুদ্ধের ছবি, স্মারকদ্রব্য ও বিবরণ এবং গ্যালারি ৬-এ রয়েছে গণহত্যা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, বীরশ্রেষ্ঠ (দ্র), শহীদ বুদ্ধিজীবী, চূড়ান্ত লড়াই ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয় সম্পৃক্ত বিভিন্ন স্মারক,

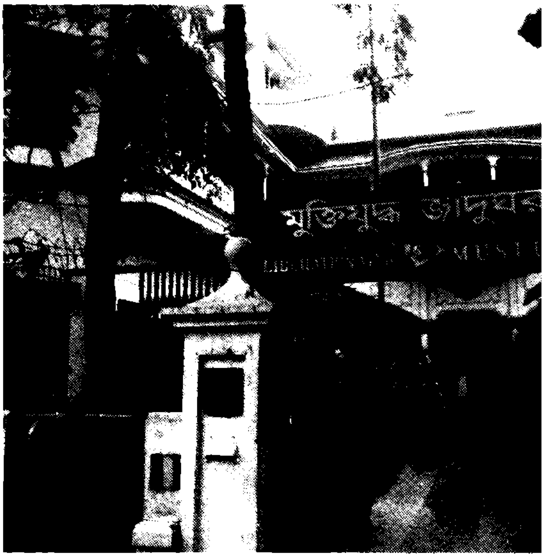

বিবরণ ও ছবি। উল্লেখযোগ্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) ব্যবহৃত কিছু স্মারকদ্রব্যও এই জাদুঘরে প্রদর্শন করা হয়েছে।

এ ছাড়াও রয়েছে এই জাদুঘর চত্বরে একটি অত্যাধুনিক হলরুম, একটি বিষয়সংশ্লিষ্ট পাঠাগার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইপত্র, পোস্টার, বিভিন্ন স্মারকদ্রব্য ও ভিউ কার্ড ইত্যাদি বিক্রয়ের একটি বিপণিকেন্দ্র এবং খাবারের দোকান।

এটি পরিচালিত হয় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্টের ৮ জনের একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা।

রোববার বাদে প্রতিদিন এই জাদুঘর খোলা থাকে সকাল সাড়ে দশটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত। এই জাদুঘরের প্রবেশপথের মুখে রয়েছে 'শিখা চির অম্লান'। কালো গ্রানাইট পাথরে নির্মিত তারকাকৃতির বেদির ওপর জ্বলছে অনির্বাণ শিখা। পেছনে রয়েছে পাথরের বুকে খোদাই করা নিম্নরূপ লিপি :

সাক্ষী বাংলার রক্তভেজা মাটি
সাক্ষী আকাশের চন্দ্রতারা
ভুলি নাই শহীদের কোনো স্মৃতি
ভুলব না কিছুই আমরা

শিখা চির অম্লানের সামনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার

www.pathagar.com

নিদর্শন স্বরূপ সব সময় তাজা ফুল শোভা পায়। এর সামনে দর্শনার্থী যে কেউ নীরবে এক মিনিট দাঁড়াতে পারেন। নিবেদন করতে পারেন নিজস্ব পুষ্পাঞ্জলি।

এই জাদুঘরের প্রবেশ মূল্য মাত্র তিন টাকা। ঢাকা শহরের যে কোনো জায়গা থকে প্রেসক্লাব বাস স্টপেজে নামলেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মাত্র ৫ মিনিটের পথ।

আ. হ.

মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দ্র
মুখ ও মুখোশ এফ ডি সি দ্র
মুগ ডাল দ্র

মুজতবা আলী, সৈয়দ [১৯০৪—১৯৭৪]

সৈয়দ মুজতবা আলী আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের এক স্মরণীয় শিল্পী। তাঁর লেখা পড়লে সহজে মনে হয় নানা বিষয়ে ও নানা ভাষায় তাঁর অনেক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য আছে। জীবনে তিনি অনেক বিষয়ে পড়েছেন এবং অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। যে কোনো বিষয়কে বর্ণনার গুণে তিনি সহজে সরস করে তুলতে পারেন। বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দেওয়ার সময় যেমন করে আমরা গল্প করি, মুজতবা আলীর গল্পগুলি সেই ভঙ্গির। অর্থাৎ মজলিসি ঢঙ তাঁর লেখায় আছে। এ জন্য তাঁর লেখা রসপূর্ণ ও উপভোগ্য। আরবি (দ্র), ফার্সি, ইংরেজি, জার্মান, সংস্কৃত এবং বাংলা শব্দের উপর তাঁর বেশ দখল ছিল। এই সব শব্দ দিয়ে তিনি খুব সহজে তাঁর লেখায় হাসি ও ব্যঙ্গ ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ১৯০৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে, আসামের করিমগঞ্জে। তখন করিমগঞ্জ সিলেট (দ্র) জেলার ভিতরে ছিল। সৈয়দ মুজতবা আলীর পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলী এক জন সাবরেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ (দ্র) সিলেট গেলে তাঁকে দেখে ও তাঁর বক্তৃতা শুনে মুজতবা আলী মুগ্ধ হন। পরে শান্তিনিকেতনে (দ্র) রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণের কারণে তিনি ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পড়তে যান। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী (দ্র) স্কুলের ও কলেজের প্রথম মুসলমান ছাত্র হলেন তিনি। শান্তিনিকেতনে তখন দেশবিদেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা পড়াতেন। মুজতবা আলী এঁদের সঙ্গে পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথের কাছেও পড়েছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনে থেকে তিনি নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন এবং ভাষা শেখার ব্যাপারে আগ্রহী হন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, আরবি ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করেন। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগে চাকুরি পাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। আফগানিস্তানের তখনকার বাদশাহ আমানুল্লাহ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। মুজতবা আলী ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত এক কলেজে যোগ দেন। এখানে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি জার্মানি গিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। মিশরের আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি কয়েকটা জায়গায় শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। এক বার বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তখন সদ্য পাকিস্তান হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলার পক্ষে লেখার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি পরোয়ানা নেমে আসে। তখন তিনি পালিয়ে কলিকাতা (দ্র) চলে যান। ভারতে (দ্র) গিয়ে তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে উঁচু পদে চাকুরি পান। রেডিও থেকে অবসর নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষার শিক্ষক হন এবং ১৯৬৫ সালে অধ্যাপনা ছেড়ে দেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কলিকাতা থেকে ঢাকা (দ্র)-তে স্থায়ী বাসের জন্য চলে আসেন। তাঁর পরিবার এখানেই ছিল। কিন্তু বেশি দিন তিনি বেঁচে থাকেন নি।

১৯৭৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়। তাঁর স্ত্রী রাবেয়া আলী শিক্ষা বিভাগের এক জন কর্মকর্তা ছিলেন। মুজতবা আলীর দুই ভাই সৈয়দ মুস্তফা আলী ও সৈয়দ মুর্তজা আলীও বিখ্যাত ছিলেন। সৈয়দ মুর্তজা আলী এক জন ভাল গবেষক ও লেখক ছিলেন। তিনি এক জন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি ছিলেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী অল্প বয়স থেকেই লিখতেন। শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি লেখার ব্যাপারে মনোযোগী

www.pathagar.com

হন। তখন তিনি পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম লেখাগুলোর একটি, 'বাংলা ভাষায় আরবি ফারসী শব্দ' ১৩৩৯ সালে মাসিক মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছিল। লেখক হিসাবে কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আনন্দবাজারে 'সত্যপীর' ছদ্মনামে লিখতেন এবং সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পঞ্চতন্ত্র' তাঁর একটি জনপ্রিয় কলাম ছিল। 'দেশে বিদেশে' সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম প্রকাশিত বই (১৯৪৯)। এটি অত্যন্ত সুন্দর আকর্ষণীয় গদ্যে লেখা একটি ভ্রমণকাহিনী এবং এতে আছে কাবুল বাসের স্মৃতি। প্রথম গ্রন্থটিই সৈয়দ মুজতবা আলীকে বাংলা সাহিত্যে (দ্র) রাতারাতি বিখ্যাত করে দেয়। সৈয়দ মুজতবা আলী রসস্রষ্টা ও গুণী মানুষ, তাঁর লেখা পড়লেই তাঁর সরস মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মুজতবা আলী সারা জীবনে বহু বই লিখেছেন। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনী', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'জলে-ডাঙায়', 'টুনি মেম', 'শবনম', 'শহর-ইয়ার' ইত্যাদি। তাঁর রচনাবলি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একালের বাংলা সাহিত্যের এক জনপ্রিয় লেখক।

আ. ক.

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কমরেড [১৮৮৯—১৯৭৩]

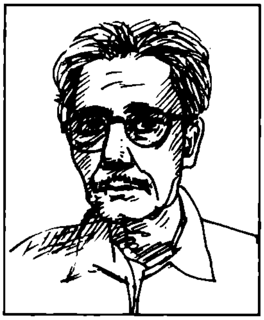

ভারতে (দ্র) কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় সংগঠক। জন্ম বর্তমান চট্টগ্রাম (দ্র) জেলাধীন সন্দ্বীপ উপজেলার মুসাপুর গ্রামে, ১৮৮৯ সালের ৫ই আগস্ট।

নোয়াখালি জেলা স্কুল থেকে ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কলিকাতায় (দ্র) চলে যান। ১৯১৫ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) সঙ্গে মিলে 'নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯২২ সালে নজরুলের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তাতে 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯২০ সালে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। ১৯২৬ সালে তাঁর সম্পাদনায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি আই = Communist Party of India) প্রথম বাংলা পত্রিকা 'গণবাণী' প্রকাশিত হয়। পার্টির প্রকাশনালয় 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি'রও তিনি প্রধান সংগঠক। তিনি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের অন্যতম স্থপতি।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১ সালে নির্বাচিত হন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পার্টির সম্পাদক। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে কমরেড মুজফ্‌ফরের নেতৃত্বে গঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী), সংক্ষেপে সি পি আই (এম)। পরে কমিউনিস্টদের একটি অংশ এই দল থেকে বেরিয়ে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে গঠন করে নতুন দল সি পি আই (এম এল অর্থাৎ Marxist-Leninist))। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ অন্ধভাবে মস্কো বা পিকিং কারো নীতি অনুসরণের পক্ষে ছিলেন না।

বহু বছর তিনি বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯২৪ সালে কানপুর বলশেভিক (কমিউনিস্ট) ষড়যন্ত্র মামলায় ৪ বছর, ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় (দ্র) ৩ বছর, ১৯৪৮ সালের নিবর্তনমূলক আইনে ৩ বছর এবং '৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের (দ্র) সময় ২ বছর — মোট ১২ বছর তাঁর জেলেই কাটে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নিখিল ভারত কৃষকসভারও অন্যতম প্রধান সংগঠক। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের পর তিনি কলিকাতায় থেকে যান। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি তাঁর জন্মভূমি পরিদর্শনে আসেন। ১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) প্রতি তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর।

আ. হু.

মুজাহিদ জেহাদ / জিহাদ দ্র

মুজিবনগর

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময়ের একটি ঐতিহাসিক

www.pathagar.com

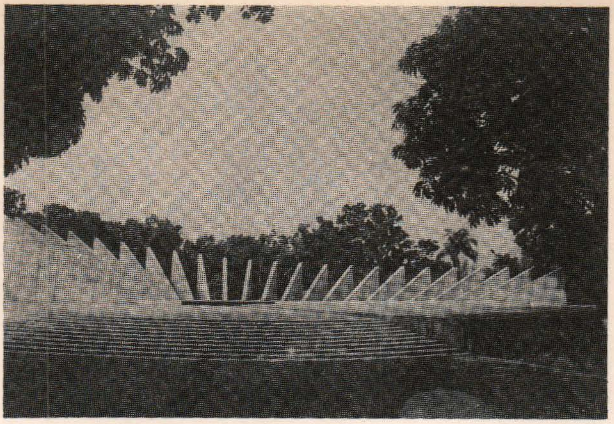

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

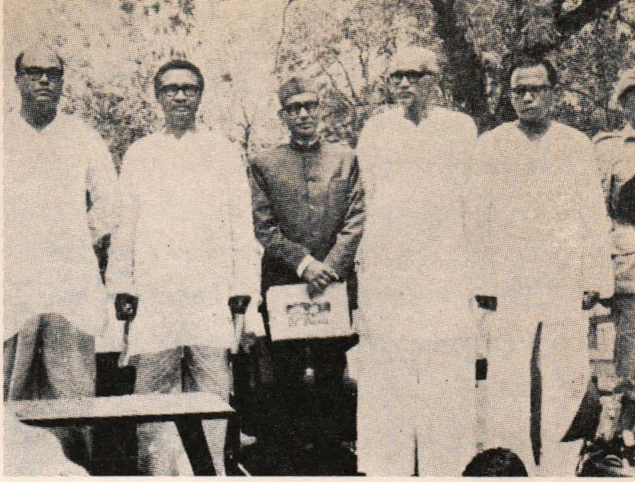

মুজিবনগরে গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ।বাঁদিক থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম. মনসুর আলী, এম. কামারুজ্জামান, এম. এ. জি. ওসমানী

স্থান। বস্তুতপক্ষে এটি 'নগর' নয়, গ্রাম। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য এখানে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার–এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ঘটে জনসভায় ঘোষণার মাধ্যমে। পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র)-কে তাঁর অনুপস্থিতিতেই সরকারপ্রধান ঘোষণা করে সেদিন সরকার গঠন করা হয়েছিল। ইতঃপূর্বে মুজিবনগরেই ১০ই এপ্রিল তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা 'ঘোষণা' করে বলা হয় যে এই ভূখণ্ড ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে।

এই গ্রামের নাম ভবেরপাড়া। এটি কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের অন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে এই গ্রামটি 'মুজিবনগর' নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

সুজ. ব.

মুজিবুর রহমান, শেখ শেখ মুজিবুর রহমান দ্র

মুজীবুর রহমান খাঁ [১৯১০—১৯৮৪]

জন্ম ১৯১০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর নেত্রকোণার উলুয়াটি গ্রামে। কৃতী সাংবাদিক। তবে সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। মুজীবুর রহমান খাঁ ১৯২৮ সালে নেত্রকোণার আঞ্জুমান উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স ও ১৯৩৪ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তার পর ইংরেজিতে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র)। কিছুদিন পড়াশুনা চালাবার পর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেন এবং চব্বিশ পরগণার হারুয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। কিন্তু শিক্ষকতা বেশি দিন করা হয় নি তাঁর। ১৯৩৬ সালে 'দৈনিক আজাদে'র সহযোগী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন তিনি। তার পর দীর্ঘদিন এই পত্রিকার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি দৈনিক আজাদের যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। তিনি কলিকাতার 'সাপ্তাহিক কমরেড' পত্রিকার সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর ঢাকায় এসে আজাদ গ্রুপের মাসিক প্রকাশনা 'মাসিক মোহাম্মদী'ও তিনি সম্পাদনা করেন। দেশবিভাগের আগে মুজীবুর রহমান খাঁ অল বেঙ্গল এন্টি-ফ্যাসিস্ট রাইটার্স গিল্ডের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক হন। ১৯৪৫ সালে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি (দ্র) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এর আহ্বায়ক। ১৯৪৬ সালে মুজীবুর রহমান খাঁ ভারতের প্রথম গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তবে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে সেই সদস্যপদ ত্যাগও করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি 'দৈনিক আজাদে'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে কৃতিত্বের

www.pathagar.com

স্বীকৃতি স্বরূপ পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'সেতারায়ে কায়েদ-ই-আজম' খেতাব দেয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ভূষিত করে একুশে পদকে।

মুজীবুর রহমান খাঁর প্রকাশিত বইগুলো হচ্ছে 'আমাদের ইতিহাস', 'বিলাতে প্রথম ভারতবাসী', 'পাকিস্তান', 'সাহিত্যের বুনিয়াদ', 'সাহিত্যের সীমানা' এবং 'গাজী ও শহীদ'। ১৯৮৪ সালের ৫ই অক্টোবর ঢাকায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

আ. কা.

মুণ্ডা

কয়েকটি আদিম জনগোষ্ঠীর সমষ্টি নিয়ে মুণ্ডা জাতি গঠিত। মুণ্ডা জাতিসমষ্টির মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, মুণ্ডারি, ভূমিজ, হো, বীরহোড়, কোদা, তুরি, আসুরি, খরিয়া, জুয়াং ইত্যাদি। মুণ্ডারা এক সময় বাংলাদেশের (দ্র) সিলেটের (দ্র) পার্বত্য এলাকায় বাস করত। এখন তারা ভারতের (দ্র) বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল প্রভৃতি

রাজ্যে বাস করে। মুণ্ডারা অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) আদি অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাদের শির দীর্ঘ, চুল কোঁকড়া, নাক চ্যাপ্টা, উচ্চতা খাটো ও রং কালো। কৃষি তাদের প্রধান জীবিকা। ভাষার নামও মুণ্ডারি, অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মুণ্ডারা নানা দেবদেবী ও প্রকৃতির উপাসক।

মুণ্ডারা প্রাচীন কাল থেকে আর্যদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে পাহাড়ি অঞ্চলে পিছু হটেছে। এখন তারা দুর্গম অরণ্য ও পাহাড়ি অঞ্চলে কোনো মতে টিকে আছে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে ৫ লক্ষ মুণ্ডা ছিল। বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা খুব নগণ্য। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় (দ্র) 'শীলদেবীর পালা'য় এক মুণ্ডা যোদ্ধার কাহিনী পাওয়া যায়। ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে দিনাজপুরে ২,১০৭ জন আদিবাসী ছিল বলে জানা যায়। এর মধ্যে ছিল রাজবংশী, পালিয়া, সাঁওতাল (দ্র), ওরাঁও (দ্র), কোচ ও মুণ্ডারি।

বি. ব.

মুতাজিলা মতবাদ

'মুতাজিলা' মুসলমানদের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাম। এঁদের প্রচারিত মতবাদই মুতাজিলা মতবাদ নামে পরিচিত। ইসলামী ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার এবং সেই মোতাবেক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খোঁজাই মুতাজিলা মতবাদের মূল বৈশিষ্ট্য।

এই মতবাদের অনুসারী পণ্ডিতেরা দাবি করেন যে তাঁদের মতবাদ পুরোপুরি কুরআন ভিত্তিক এবং সেই সঙ্গে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। মুতাজিলা মতবাদের অনুসারীগণ চিন্তার ক্ষেত্রে নিজেদের উদারপন্থী মনে করেন। ধর্মের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেও তাঁরা দর্শন চিন্তা ও যুক্তির চর্চা করেছেন।

এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম আবুল হুজায়ল। তিনি ৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। পরে বিভিন্ন শতকে এই মতবাদ আরো বিস্তারলাভ করেছে। এই মতবাদের অনুসারীদের সঙ্গে অন্যান্য মতাবলম্বীদের বিভিন্ন সময়ে মতবিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদের কথাও জানা যায়।

মু. মা.

মুদ্রণ

পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত যেসব বই পাওয়া যেত, সেগুলো ছিল হাতে লেখা। হাতে লেখা বলে এসব পুঁথিকে বলা হত পাণ্ডুলিপি (দ্র)। এক একখানি পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে সময় লাগত প্রচুর। তাই এগুলির দাম ছিল বেশি। সে জন্য সেকালের পুঁথিপত্র সকলের পক্ষে কেনা সম্ভব ছিল না। অনেক সময় পাণ্ডুলিপি নির্ভুলও হত না। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রণশিল্পের বিকাশের ফলে বই মানুষের কাছে সহজলভ্য হয় এবং শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে।

www.pathagar.com

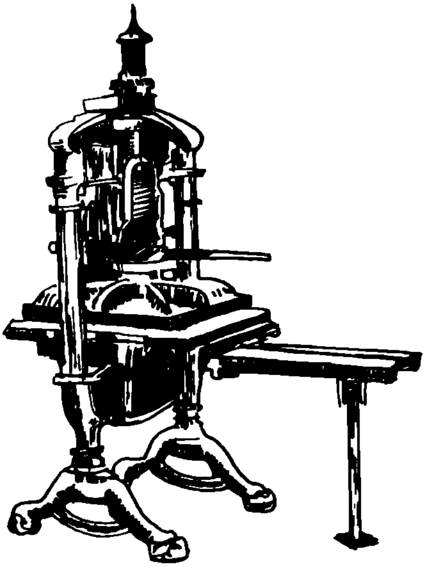

আদি মুদ্রণযন্ত্র

চীন (দ্র) দেশে যেমন প্রথম কাগজ (দ্র) উদ্ভাবিত হয়েছিল, তেমনি সেখানে মুদ্রণপদ্ধতিরও উদ্ভাবন হয়েছিল প্রথমে। অষ্টম শতকের প্রথম দিকেই সেখানে মুদ্রণের কাজ শুরু হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে মূল কৃতিত্ব ছিল সেখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। ঐ দেশে অবস্থিত 'হাজার বুদ্ধের গুহা' নামক স্থানে অনেক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল ৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত 'হীরক–সূত্র' নামের একখানি বইও। কিন্তু চীন দেশে মুদ্রণকৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার পরও তা বহুদিন গোপন রাখা হয়েছিল। শেষে ফেশতাউ নামক এক চীনা লোক কৌশলটি সকলের নিকট ফাঁস করে দেন। তাঁর জীবদ্দশায় সর্বপ্রথম কাঠের ছাঁচে চীন দেশের গাথা ছাপা হয়। একাদশ শতকের মধ্যভাগে চীন দেশে এক একটি হরফের জন্য আলাদা আলাদা ছাঁচও তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। অর্থাৎ বিচল হরফ বা মুভেব্‌ল্ টাইপও (moveable type) সর্বপ্রথম চীন দেশে নির্মিত হয়। ঐ ছাঁচ তৈরি করেছিলেন পিশেং নামক এক লোক।

আধুনিক মুদ্রণশিল্পের প্রচলন হয় ইউরোপে (দ্র) পঞ্চদশ শতকে। এ সময় কাঠ খোদাই করে ছাঁচ বানিয়ে ছাপার কাজ করা হত। প্রথম দিকে এই পদ্ধতিতে খেলার জন্য তাস (দ্র) ছাপানো হত। পরে ছবি ও পাঠ্যবস্তু একই সঙ্গে খোদাই করে পুরো বই ছাপানো চালু হল। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বেশি বই ছাপানো যেত না। মুদ্রণশিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে জার্মানির ইওহান্ গুটেন্‌বার্গ্ (দ্র) বিচল হরফের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং তা পরপর সাজিয়ে ছাপাবার কৌশল উদ্ভাবন করেন। এর পর মুদ্রণশিল্পের প্রসার ঘটে সারা ইউরোপে। ইংল্যাণ্ডে মুদ্রণশিল্পের প্রচলন করেন উইলিয়ম ক্যাক্সটন (William Caxton : ১৪২১-১৪৯১)। জার্মানির ফ্রিড্‌রিশ্ কোয়নিগ (Friedrich Konig) মুদ্রণযন্ত্রে সিলিণ্ডার যুক্ত করে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। ফলে হস্তচালিত মুদ্রণযন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। ওট্‌মার্ মার্গানথেলার (Ottmar Mergenthaler) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কম্পোজিশন বা অক্ষর বিন্যাস করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ সালে লাইনো টাইপ আবিষ্কার করেন। টলবার্ট ল্যান্সটন (Tolbert Lanston) উদ্ভাবন করেন মনোটাইপ। মুদ্রণের জন্য লাইনোটাইপ পুরো লাইন তৈরি করে আর মনোটাইপ একটি একটি করে টাইপ তৈরি ও বিন্যাস করে। এসব হল মুদ্রণশিল্পে 'লেটার প্রেস' পদ্ধতি। মুদ্রণশিল্পের আরো আধুনিক সংস্করণের নাম 'অফসেট' পদ্ধতি। এর যাত্রা শুরু হয়েছিল লিথোগ্রাফি (দ্র) থেকে। বর্তমান মুদ্রণশিল্পে আলোড়ন তুলেছে কম্পিউটার (দ্র) প্রিন্টিং পদ্ধতি।

বঙ্গদেশে মুদ্রণের ইতিহাসে ১৭৭৮ সালটি স্মরণীয়। ঐ বছরেই হুগলি শহরে একটি ছাপাখানা স্থাপিত হয়। নাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড (দ্র) নামক এক ইংরেজ 'এ গ্রামার অব বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' নামে একখানি বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। বইখানি ইংরেজি ভাষায় লিখিত হলেও উদাহরণগুলো মুদ্রিত হয়েছিল বাংলা অক্ষরে। এ বইয়ে যে অক্ষরগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল, সেগুলি তৈরি করেছিলেন চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্স (দ্র) ও পঞ্চানন কর্মকার (দ্র)। বাংলা টাইপ নির্মাণে পঞ্চানন কর্মকারের জামাতা মনোহরও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

শা. হ.

মুদ্রণশিল্প

মাস্টার ইমেজ (Master image) থেকে অবিকল একই ধরনের এক বা একাধিক কপি তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ব্যাপকার্থে মুদ্রণ (দ্র) বলা হয়। কাঠ বা পাথরে খোদাই করা থেকে শুরু করে কাঠের টুকরো কেটে কেটে চিত্র এঁকে

www.pathagar.com

কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা বা কম্পিউটারে ডিজিটাল তথ্য সঞ্চিত করা পর্যন্ত মুদ্রণকাজের পরিসীমা ব্যাপ্ত। মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে সচরাচর কালির ব্যবহার জড়িত। নতুন প্রযুক্তির অগ্রগতি অবশ্য মুদ্রণশিল্পের ঐতিহ্যবাহী সেই ধারণাকে বদলে দিয়েছে। যেমন, বলা যায়—অফিস কপিয়ারে মাস্টার ইমেজ তৈরি করার কাজে এখন ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক্যালি চার্জ্‌ড্ (electrostatically charged) গ্রাফাইট টোনার (graphite toner) ব্যবহার করা হয়।

ব্যাপকভাবে বিকাশের ফলে বেতার (দ্র), টেলিভিশন (দ্র) এবং চলচ্চিত্রের (দ্র) মতো মুদ্রণশিল্পও এ যুগে গণসংযোগের একটি অতি উত্তম মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক ভিত্তি এ মুদ্রণের উপরই নির্ভর করে আছে। আধুনিক কালের বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য এ মুদ্রণশিল্পের উপরই নির্ভরশীল। দোকানে বিক্রির রসিদ থেকে শুরু করে কাগুজে মুদ্রা ও স্টক সার্টিফিকেট পর্যন্ত অনেক কিছুর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে নির্ভর করতে হয় মুদ্রণশিল্পের উপর। মুদ্রণশিল্প ও প্রকাশনা অনেক দেশেই এ যুগে এক বড় ধরনের ও উন্নত মানের ব্যবসা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) এটি বর্তমানে অষ্টম ও কানাডায় নবম বৃহত্তম ব্যবসা।

প্রথম পর্যায়ে ধীর গতিতে বিকশিত হলেও মুদ্রণশিল্প দ্রুত গণসংযোগের প্রাথমিক মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। কালক্রমে মানুষের চিরশত্রু অজ্ঞতার বিরুদ্ধে মুদ্রণশিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে।

আধুনিক কালে সকল প্রকার মুদ্রণ তিনটি প্রধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে: (ক) লেটার প্রেস (Letter Press), (খ) অফসেট প্রেস (Offset Press) এবং (গ) গ্রাভিউর (Gravure)। লেটারপ্রেসে মুদ্রণতল উত্তোলিত থাকে। অফসেট লিথোগ্রাফিতে মুদ্রণ ও অমুদ্রণতল থাকে সমতলে। গ্রাভিউর প্রক্রিয়ায় মুদ্রণতল অমুদ্রণতলের চেয়ে নিচে থাকে।

সাম্প্রতিক কালে ফ্লেক্সোগ্রাফি (Flexography), কালার প্রিন্টিং (Colour printing) এবং কম্পিউটার প্রিন্টিং (Computer printing) ব্যবসা শুরু হওয়ার পর থেকে মুদ্রণের জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

মু. আ.

মুদ্রা

নৃত্যে অর্থপূর্ণ হাতের কাজকে 'মুদ্রা' বলা হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যে, যেমন— ভরতনাট্যম্ (দ্র), কথাকলি (দ্র), কথক (দ্র), মণিপুরী (দ্র) প্রভৃতিতে মুদ্রার স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয় যে যেখানে হস্ত সেখানেই দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি, যেখানে মন সেখানেই ভাব। নৃত্যের ভিতর দিয়ে কোনো-না-কোনো একটা ভাব প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। ফলে মুদ্রা ব্যতীত যথার্থভাবে ভাব প্রকাশ সম্ভব হয় না। নৃত্যশাস্ত্রে মুদ্রাকে আনন্দদাতা বলা হয়েছে। মুদ্রার প্রয়োগ ব্যতিরেকে নৃত্যে আনন্দের প্রতিফলন সম্পূর্ণ হয় না। মুদ্রা প্রধানত দুই প্রকার : অসংযুক্ত মুদ্রা ও সংযুক্ত মুদ্রা। মুদ্রাকে হস্ত বা হস্তকর্মও বলা হয়। হস্ত দ্বারা রচিত কর্ম বলে এই মুদ্রার নাম হস্ত বা হস্তকর্ম। হস্ত বা হস্তকর্মও দুই প্রকার : অসংযুক্ত হস্ত বা হস্তকর্ম এবং সংযুক্ত হস্ত বা হস্তকর্ম। এক হাতের সাহায্যে রচিত মুদ্রাকে বলা হয় অসংযুক্ত মুদ্রা ও দুই হাতের সাহায্যে রচিত মুদ্রাকে বলা হয় সংযুক্ত মুদ্রা। শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রকারভেদে মুদ্রার গঠন, প্রয়োগ ও তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়। মুদ্রা বিষয়ক আলোচনায় প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'নাট্যশাস্ত্র' ও 'অভিনয়-দর্পণ'। এই সব গ্রন্থে মুদ্রার গঠনপদ্ধতি ও প্রতিটি মুদ্রার অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি মুদ্রারই

নৃত্যের বিভিন্ন রকম মুদ্রা

www.pathagar.com

পৃথক পৃথক নাম আছে।

ক. গো.

মুনাফিক

কপটাচারী। হৃদয়ে অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে যারা আল্লাহ্‌র (দ্র) প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ভান করে, ইসলামী পরিভাষায় তাদের 'মুনাফিক' বলা হয়। ইসলামী বিশ্বাসে সন্দিহান বা দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা বিশেষ স্বার্থের জন্য লোক-দেখানো ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিকেও পবিত্র কুরআন শরীফে (দ্র) 'মুনাফিক' বলা হয়েছে। এ ছাড়া আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করার পর শেষ পর্যন্ত তার ওপর টিকে থাকতে পারে নি, এমন ব্যক্তিও কুরআনে 'মুনাফিক' নামে অভিহিত হয়েছে।

মু. মা.

মুনীর চৌধুরী [১৯২৫—১৯৭১]

প্রতিভাবান নাট্যকার, ভাষাতাত্ত্বিক, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী তাঁর সমকালে এক জন বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) শেষ পর্যায়ে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে আল-বদর (দ্র) ঘাতকবাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন।

মুনীর চৌধুরী ১৯২৫ সালের ২৭শে নভেম্বর পিতার কর্মস্থল মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস নোয়াখালিতে, চৌদ্দ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর পিতার নাম আবদুল হালিম চৌধুরী, মায়ের নাম আফিয়া বেগম। কঠোর পারিবারিক শৃঙ্খলার মধ্যে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পিতা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন বলে বার বার বদলি হতেন। ১৯৩৬ সালে পিতা ঢাকায় (দ্র) বদলি হয়ে এলে মুনীর চৌধুরীকে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালে তিনি ঢাকা বোর্ড থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। বিজ্ঞান পড়ার জন্য পিতার আগ্রহে তাঁকে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু আলীগড়ে তাঁর মন বসে নি। আই. এসসি. পড়া কোনো মতে শেষ করে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। তিনি তাঁর অগ্রজ কবীর চৌধুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র মুনীর চৌধুরী অল্পদিনের মধ্যেই বাগ্মী, রসগ্রাহী, চৌকস ছাত্র হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি প্রথম বর্ষের ছাত্র হয়েও হলের সেরা বক্তা হিসাবে প্রোভোস্ট্‌স্ কাপ অর্জন করেন। উল্লেখ্য, মুনীর চৌধুরীর পিতা ছিলেন বিদ্যানুরাগী মানুষ। ছেলের বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখনই তিনি ছেলেকে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' উপহার দেন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সাহিত্য প্রতিযোগিতায় মুনীর চৌধুরী সর্বাধিক পুরস্কার লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৪৩ সালে তিনি প্রগতি লেখক সংঘে (দ্র) যোগদান করেন। নাটক, ছোটগল্প (দ্র) ও প্রবন্ধ (দ্র) লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৬ সালে মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স পাশ করেন। পরের বছর পাশ করেন এম. এ.। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি সকল শিক্ষকের স্নেহের পাত্র ছিলেন।

'প্রগতি লেখক সংঘ' সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়াতে মুনীর চৌধুরীর প্রতিপক্ষ তাঁকে কমিউনিস্ট হিসাবে আখ্যায়িত করে। তখনকার দিনে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে বহু রকম অপপ্রচার ছিল। রাষ্ট্র তাঁদের সহ্য করত না, সমাজ তাঁদের তিরস্কার করত, পরিবারও তাঁদের আশ্রয় দিত না। বিশেষ করে মুনীর চৌধুরী যে ধরনের পরিবার থেকে এসেছিলেন, সে ধরনের পরিবার কমিউনিজ্‌মের (দ্র) প্রতি অঙ্গীকারকে সুনজরে দেখত না। চৌধুরী পরিবারের বেশ কয়েক জন ভাইবোন এই আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হওয়াতে সরকারি কর্মচারী পিতার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হয়। তদুপরি পিতার অমতে লিলি মির্জাকে বিবাহ করায় পিতাপুত্রের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে বাংলা ভাষা (দ্র)কে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, মুনীর চৌধুরী ছিলেন তাঁর অন্যতম বক্তা। ১৯৪৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে মুনীর চৌধুরী যোগদান করেন। এভাবে মুনীর চৌধুরী প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে

www.pathagar.com

কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। তৎকালীন মুসলিম লীগ (দ্র) সরকার ছিল ঘোরতর কমিউনিস্টবিরোধী। তারা কমিউনিস্ট পার্টির সভা ভেঙে দিত, পার্টি-কর্মীদের নিপীড়ন করত, পার্টির অফিস ভেঙে চুরমার করে দিত। মুনীর চৌধুরী কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সরকারি রোষ তাঁর উপর বর্ষিত হয়।

১৯৪৯ সালে মুনীর চৌধুরী খুলনার দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। তখন বেতন ছিল মাত্র এক শ' পঞ্চাশ টাকা। কলেজের অধ্যাপক হিসাবে পরীক্ষার খাতা নিতে এসেছিলেন মুনীর চৌধুরী। ঢাকায় এলে তাঁকে রাজনৈতিক তৎপরতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। মুনীর চৌধুরী ছিলেন প্রগতিপন্থী লেখক, তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না। তিনি রাজনীতি না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারি খপ্পর থেকে প্রথম বারের মতো রেহাই পান।

১৯৫০ সালে তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। অল্পদিন পরেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে (দ্র) তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য দাবির সমর্থনে বক্তৃতা দেন। ফলে তাঁকে পুনরায় জন-নিরাপত্তা আইনে বন্দি করে। বন্দি অবস্থার মধ্যেই তিনি জেল থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রাইভেট এম. এ. দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৪ সালে মুক্তিলাভ করে ১৯৫৫ সালের ২২শে জানুয়ারি তিনি বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। আজীবন তিনি এই বিভাগের শিক্ষক হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কৌতূহলী ছাত্রছাত্রী তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য তাঁর ক্লাশে ভিড় করত।

তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন জেলের বন্দিদের অনুরোধে ২১শে ফেব্রুয়ারি (দ্র) উপলক্ষে 'কবর' নাটক লেখেন। অধ্যাপক হিসাবে যেমন তিনি অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তেমনি নাট্যকার হিসাবেও অর্জন করেন দেশজোড়া জনপ্রিয়তা। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২), 'চিঠি' (১৯৬৬), 'দণ্ডকারণ্য' (১৯৬৬), 'পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য' (১৯৬৯) ইত্যাদি তাঁর মৌলিক নাটক। এ ছাড়াও তিনি শেক্সপীয়র (দ্র) ও অন্যান্য নাট্যকারের নাটক বাংলায় অনুবাদও করেছেন।

সমালোচক হিসাবে মুনীর চৌধুরী ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর 'মীর মানস' (১৯৬৫), 'তুলনামূলক সমালোচনা' (১৯৬৯), 'বাঙলা গদ্যরীতি' (১৯৭০) উল্লেখযোগ্য রচনা। মুনীর চৌধুরী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার প্রচলন সহজসাধ্য করার তাগিদে বাংলা টাইপ রাইটারের কী (key) ডিজাইন করেন। সে জন্য বাংলা টাইপ রাইটারের একটির নাম 'মুনীর অপটিমা'।

মুনীর চৌধুরী বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে ইংরেজিতে যেসব প্রবন্ধ লেখেন সেগুলো সারা দুনিয়ার ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি এক জন প্রতিভাবান ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

এই অসাধারণ মানুষটি মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৪ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ আল-বদর ঘাতক বাহিনীর সদস্যদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তা কোনোদিন আর পূরণ হবে না।

ম. মু.

মুন্সী আবদুর রউফ, ল্যান্স নায়েক বীরশ্রেষ্ঠ দ্র

মুন্সী মেহেরুল্লাহ [১৮৬১—১৯০৭]

বাংলার বিখ্যাত ইসলাম ধর্মপ্রচারক, সুবক্তা ও ধর্মীয় গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮৬১ সালে তিনি যশোর জেলার নলডাঙ্গার ঘোপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল এই জেলারই ছাতিয়াডেলা গ্রামে।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা লাভে অসমর্থ হলেও নিজের একান্ত চেষ্টায় কুরআন শরীফ (দ্র), ফার্সি সাহিত্য ও উর্দু ভাষায় (দ্র) বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন স্বগ্রামের মুহম্মদ ইসমাইল নামের জনৈক জনদরদী মৌলবি।

পিতৃহীন মেহেরুল্লাহ নিজের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের ব্যয় নির্বাহে এরপর দর্জির পেশা বেছে নেন। এই পেশায় সুনাম অর্জন করলে তিনি ইংরেজ সাহেবদের সুদৃষ্টিতে পড়েন এবং তাদের অধীনে একটি চাকুরি লাভে সমর্থ হন। অবশ্য অত্যল্পকালের মধ্যে ইংরেজ সাহেবদের দেওয়া চাকুরি ত্যাগ করে তিনি তাঁর পূর্বতন পেশায় ফিরে আসেন।

www.pathagar.com

এই সময় যশোরে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকেরা ইসলাম ধর্ম (দ্র)-কে অপব্যাখ্যায় বিকৃত করে খ্রিস্টধর্ম (দ্র) প্রচারে ব্যাপৃত হলে বাংলা ১২৯৩ সনে মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'খৃস্টান ধর্মের অসারতা' নামে একটি ধর্ম-পুস্তিকা প্রকাশ ও তা প্রচার করেন। এর অব্যবহিত পরে তিনি যশোরে 'ধর্মাগেঞ্জিকা' নামে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং ধীরে ধীরে নিজের পেশা ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে ধর্মপ্রচারকের জীবন গ্রহণ করেন।

অপূর্ব মনীষা ও বাগ্মিতার অধিকারী মেহেরুল্লাহর ধর্মীয় ব্যাখ্যা সংবলিত ভাষণ ও যুক্তিপূর্ণ তর্কযুদ্ধের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেইকালে বহু অমুলমান স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিস্তারেও তিনি তৎপর ছিলেন। ফলে তাঁর একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টায় মনোহরপুর গ্রামে একটি মাদ্রাসা ও একটি মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি'রও তিনি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

১৩১০ বঙ্গাব্দে তিনি রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সমিতি' ও ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতি'র অধিবেশনে যোগদান করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ লেখক হিসাবেও সুখ্যাতির অধিকারী। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা', 'মেহেরুল ইসলাম', 'বিধবা গঞ্জনা', 'উপদেশমালা', 'বক্তৃতামালা' এবং বাংলা গজলের সঙ্কলন 'নবরত্নমালা' ইত্যাদি।

তিনি ইংরেজি ১৯০৭ সালের ৭ই জুন মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

মুয়াজ্জিন

ইসলাম (দ্র) ধর্মে (দ্র) পাঁচ ওয়াক্তে বিভক্ত নামাযে (দ্র) সামিল হতে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে যিনি আহ্বান করেন, তাঁকেই মুয়াজ্জিন বলা হয়। আরবিতে 'আযান' (দ্র) শব্দের অর্থ 'ঘোষণা' এবং 'মুয়াজ্জিন' শব্দের অর্থ 'ঘোষণা করা' ও 'ঘোষক'।

কখন থেকে মুয়াজ্জিন পদের সৃষ্টি, সে নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। আরবদের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই গণঘোষণার একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। এ কাজ এক বা একাধিক ঘোষকের দ্বারা নিষ্পন্ন হত। গোত্রে গোত্রে কিংবা শহরগুলিতে সাধারণ সমাবেশের প্রতি কোনো বিশেষ শাসনতান্ত্রিক ফরমান, আদেশ কিংবা নিমন্ত্রণাদি যে ঘোষকের দ্বারা প্রচার করা হত তাঁকেই বলা হত মুয়াজ্জিন।

জনগণকে কোনো বিষয়ে অবহিত বা জ্ঞাত করানো কিংবা সজাগ করে দেওয়ার এই প্রথাই পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হয়ে আযান প্রচারে মুয়াজ্জিনের পদের কিংবা তাঁর কর্তব্যজনিত প্রথার জন্ম দেয়। এরপর হযরত উমরের (রা.) প্রস্তাব অনুযায়ী এক জন ঘোষক হিসাবে পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে সুরেলা কণ্ঠে বিলাল (রা.)'আস্ সালাতু জামি-আতুন' (নামায জামাতবদ্ধ হচ্ছে) বলে লোকজনকে নামায আদায়ে সামিল হওয়ার আহ্বান জানালে মুয়াজ্জিনের কর্তব্যকর্ম-প্রথা ইসলাম ধর্মে আনুষ্ঠানিক রূপ পায় এবং কালের বিবর্তনে মসজিদের (দ্র) মিনারশীর্ষে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন কর্তৃক আযান প্রচারের রেওয়াজ চালু হয়। বর্তমানে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে মসজিদে মাইক থাকলে মিনারশীর্ষে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার প্রয়োজন আর পড়ে না।

আ. হু.

www.pathagar.com

মুর সভ্যতা

লাতিন ভাষার 'মাউরি' থেকে 'মুর' শব্দটির উৎপত্তি। প্রাচীন রোমান অধিকৃত প্রদেশ মাউরিতানিয়ার অধিবাসীদের বলা হত মাউরি। পরবর্তী কালে স্পেন দেশের মুসলমানদের মুর বলা হত। স্প্যানিশ শব্দ 'মোরো' থেকে এসেছে 'মুর'। কালক্রমে যে কোনো মুসলমানকেই ইউরোপীয়রা মুর বলতে শুরু করে। মরক্কোর অধিবাসীরা মুর নামে পরিচিত। শ্রীলঙ্কা (দ্র) কিংবা ফিলিপাইন রাষ্ট্রের মুসলমানেরাও কখনো এই নামে চিহ্নিত হয়। বাংলা অঞ্চলে আগত ইউরোপীয় পরিব্রাজকেরা পনেরো-ষোল শতকের মুসলমানদেরকে 'মুর' নামে অভিহিত করেছেন। তবে মুর বলতে মূলত উত্তর আফ্রিকার বার্বার এবং স্পেনের মুসলমানদেরকেই বোঝায়।

স্পেনের মুসলমানেরা খ্রিস্টীয় আট থেকে দশ শতকের মধ্যে এক অতি উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। আরব-আন্দালুসিয়া সভ্যতা নামেও এটি পরিচিত। তৎকালীন স্পেনের রাজধানী কার্দোভা ছিল এই সভ্যতার পীঠস্থান। বিশাল 'আলকাজার' নামক প্রাসাদভবন ও মসজিদশোভিত কর্দোভার অধিবাসীরাও ছিল যথেষ্ট উন্নত। অঙ্ক, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি চর্চায় বিশেষভাবে খ্যাত এই সভ্যতা।

কর্দোবার মসজিদ (৮ম-৯ম শতক)

অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মুর সভ্যতা পরবর্তী কালে দুর্বল হয়ে পড়ে। ষোল শতকের শেষ দিকে এ সভ্যতার অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে চলে যায়। সতেরো শতকের দিকে উদ্বাস্তু হিসাবে উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে মুরগণ ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে স্থানীয় বিভিন্ন অধিবাসীর মধ্যে এরা বিলীন হয়ে যায়।

সৈ. আ. ই.

মুর, হেনরি [১৮৯৮—১৯৮৬]

বিমূর্ত রীতির আধুনিক ব্রিটিশ ভাস্কর। তাঁকে বিংশ শতাব্দীর মহত্তম ভাস্কর বলেও অভিহিত করা হয়। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে কাঠ, ব্রোঞ্জ ও পাথরসহ বহুবিধ উপকরণ ব্যবহার করেছেন।

১৮৯৮ সালের ৩০শে জুলাই হেন্‌রি মুর (Henry Moore) ইয়র্কশায়ারের ক্যাস্‌ল্‌ফোর্ড-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক জন খনি-শ্রমিক। কৈশোর কাল থেকেই মুর ভাবতেন, তিনি ভাস্কর হবেন। তাই ১৯১৯ সালে সেনাবাহিনীর চাকুরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে ভাস্কর্যকলা শিক্ষা করার জন্য লিউস্ স্কুল অব আর্ট-এ তিনি ভর্তি হন। লণ্ডনে কিছুকাল অধ্যয়ন শেষে রয়াল কলেজ অব আর্ট-এর বৃত্তি লাভ করে তিনি ফ্রান্স ও ইতালি যান। ভাস্কর্য বিষয়ে এ দু'টি দেশে তিনি ১৯২৫ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি শিক্ষা লাভ করেন চেল্‌সি স্কুল অব আর্ট-এ।

মুরের প্রথম দিককার ভাস্কর্যকর্মের ওপর স্কুল অব প্যারিস-এর সমকালীন বিমূর্ত রীতি, প্রাচীন গ্রিক, এত্রুস্কান, আফ্রিকান, বিশেষত প্রাক-কলম্বিয়ান ভাস্কর্যরীতির প্রভাব পড়ে। মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার (দ্র) অন্তর্গত ভাস্কর্যমূর্তিও তাঁকে প্রভাবিত করে গভীরভাবে। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিককার মুরের শিল্পকর্মে পিকাসোর (দ্র) পরাবাস্তববাদী 'বোন পিরিয়ড'-ভুক্ত চিত্রকলারও উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষণীয়।

তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্মের অন্তর্গত 'ফ্যামিলি গ্রুপ', 'অর্ধশায়িত অর্ধবিবসনা নারী', 'জোড়হাত নারী',

www.pathagar.com

রিক্লাইনিং ফিগার—১৯৪৫, শিল্পী : হেনরি মুর

'অর্ধশায়িতা রমণী', 'নারী', 'মার্জার ও রমণী', 'ফিগার', 'মা ও সন্তান', 'অর্ধবসনা নারী', ও 'সদ্যোত্থিতা' ইত্যাদি।

হেনরি মুর ১৯৮৬ সালের ৩১শে আগস্ট হার্টফোর্ড-শায়ারে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

হেলমেটে মাথা, শিল্পী : হেনরি মুর

মুরগি

মুরগি গৃহপালিত পাখি। বৈজ্ঞানিক নাম *গ্যালাস গ্যালাস ডোমেস্টিকাস (Gallus Gallus domesticus)*। বনে-জঙ্গলে এদের চারটি প্রজাতি বাস করত। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ৪,০০০ বছর পূর্বে ভারতীয় লাল জংলী প্রজাতি থেকে গৃহপালিত মুরগির উৎপত্তি। এক কালে মোরগের লড়াই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ছিল। এখনো অনেকে শখ করে সুন্দর সুন্দর জাতের মুরগি পোষে। বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন জাতের মুরগি দেখা যায়। ডিম ও মাংসের জন্য খামারভিত্তিতে এদের পোষা হয়।

এরা মধ্যম আকৃতির পাখি। গলা লম্বাটে। ঠোঁট শক্ত ও চোখা। মাথার ওপর একটি এবং নিচে একজোড়া লালচে মাংসপিণ্ড থাকে। মোরগের এগুলো বড় ও টকটকে লাল।

মোরগের লেজে দুটো লম্বা পালক থাকে। মুরগির লেজ কিছুটা চৌকোণা। মোরগের পালকগুলো উজ্জ্বল ও চকচকে। এদের পায়ের পেছনে যুদ্ধাস্ত্র বা স্পার (spur) থাকে।

জাতভেদে আকার-ওজন-রঙ-গুণে পার্থক্য হয়। ওজনে ০.৫–৫ কেজি। হোয়াইট লেগহর্ন, রোড আইল্যাণ্ড রেড, অস্ট্রালর্প, বার্ড প্লাইমাউথ রক বিশুদ্ধ জাত। বিভিন্ন বিশুদ্ধ জাত থেকে বর্তমানে বহু সঙ্কর জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এদের একেকটি বছরে ২৫০-৩০০ ডিম পাড়ে। আমাদের দেশী মুরগি বছরে ৪০–৬০টি ডিম পাড়ে। মাংসের জন্য পোল্ট্রিবিজ্ঞানীরা ব্রয়লার (Broiler) নামে এ ধরনের সঙ্কর-মুরগি তৈরি করেছেন। মাত্র দু' মাস বয়সে চার কেজি খাবার খেয়ে এরা ২–২.৫ কেজি মাংস উৎপাদন করে।

জংলী মুরগি শস্যদানা, ঘাস-পাতা, কীটপতঙ্গ (দ্র) খায়। দেশী মুরগি প্রায় সবকিছুই খায়। উন্নত জাতের মুরগিকে বিভিন্ন খাদ্যোপাদানসমৃদ্ধ খাবার দেওয়া হয়।

জংলী মুরগি মৌসুমে পাঁচ-ছয়টি এবং দেশী মুরগি একবারে দশ-পনেরোটি ডিম পাড়ে, একুশ দিন তা দিয়ে

www.pathagar.com

বাচ্চা ফোটায়। উন্নত জাতেরগুলো ডিমে তা দেয় না। ইনকুবেটরের (ডিম ফোটানোর যন্ত্র) সাহায্যে এদের ডিম ফোটাতে হয়। মুরগি ৫–৭ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

মুর্‌তাদ্

আভিধানিক অর্থ 'যে ফিরে যায়'। ইসলামী পরিভাষায় ইসলাম ধর্ম (দ্র) ত্যাগকারীকে মুর্‌তাদ্ বলা হয়। কারণ এই ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে তার আগের বিশ্বাসে ফিরে যাচ্ছে।

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর ইসলামী রীতিনীতি, বিশ্বাস ইত্যাদিকে আংশিক বা পূর্ণভাবে অসম্মান বা অস্বীকারকারী, পবিত্র কুরআন শরীফ (দ্র)-এর অসম্মানকারী ব্যক্তিগণ মুর্‌তাদ্ পর্যায়ভুক্ত।

মুর্‌তাদ্ ব্যক্তি যদি তওবা (বিধিবদ্ধ নিয়মে ক্ষমা প্রার্থনা) করে ইসলামে পুনঃদীক্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তা হলে তার জন্য সে সুযোগ রয়েছে।

মু. মা.

মুর্শিদকুলী খাঁ [? —১৭২৭]

মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার শাসনকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর জন্মকাল জানা যায় না। তবে তাঁর মৃত্যুকালের (১৭২৭) হিসাবে অনুমান করা যায় যে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে দাক্ষিণাত্যে (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন।

সম্রাট শাহজাহানের (দ্র) রাজত্বকালে তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব (দ্র) যখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার, মুর্শিদকুলী খাঁ তখন আওরঙ্গজেবের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেব দিল্লির সম্রাট হওয়ার পর মুর্শিদকুলী খাঁকে ঢাকার (দ্র) দেওয়ান করে পাঠান (১৭০০ খ্রি.)।

মুর্শিদকুলী খাঁ স্বীয় দক্ষতাবলে ভূমিবন্টন ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান। এর পর তিনি ১৭০১ সালে তাঁর দপ্তর ঢাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মক্‌সুদাবাদে স্থানান্তর করেন।

কর্মদক্ষতার গুণে তিনি নায়েব সুবেদার এবং পরে ১৭১৩ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার পদে উন্নীত হন। তাঁরই নাম অনুসারে মক্‌সুদাবাদের নাম হয় মুর্শিদাবাদ এবং তা বাংলার রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭২৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

মুষ্টিযুদ্ধ

মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিং (boxing) এমন এক ধরনের খেলা যাতে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁদের হাত বা মুষ্টি দিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। সাদামাটা বাংলায় একে ঘুষি-মারামারি বলা যায়। যে দু'জন লড়াই করেন তাঁদের বক্সার (boxer) বা মুষ্টিযোদ্ধা বলা হয়। মুষ্টিযোদ্ধারা হাতে দস্তানা লাগিয়ে চারদিকে রশিঘেরা একটি বর্গাকৃতির উঁচু মঞ্চের ওপরে লড়াই করেন। এই মঞ্চকে 'রিং' (ring) বলা হয়।

মুষ্টিযোদ্ধা দু'ধরনের—পেশাদার ও অপেশাদার। পেশাদারেরা লড়াই করেন অর্থের জন্য। আর অপেশাদারেরা লড়াইয়ের বিনিময়ে কোনো অর্থ গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁরা কোনো সংস্থা বা দলের হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন শুরু হয় প্রায় সহস্রাধিক বছর আগে। তখন এটা হিংস্র খেলা হিসাবে পরিচিত ছিল। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এর স্টাইল বা পদ্ধতি পরিবর্তন করার পর আধুনিক মুষ্টিযুদ্ধ আমেরিকায় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু ষষ্ঠ দশকের দিকে এর প্রতি দর্শকদের

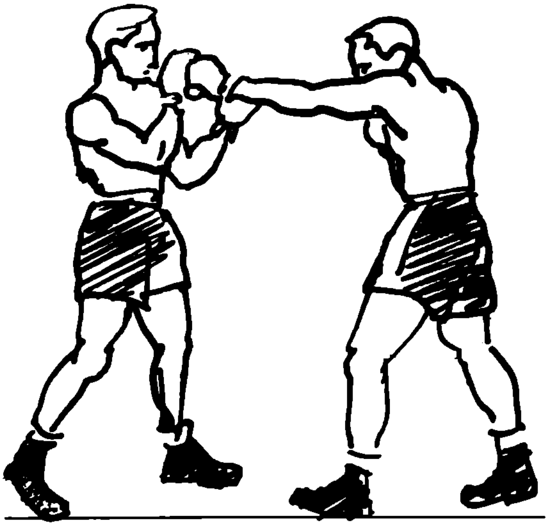

www.pathagar.com

আগ্রহ কমে যায়। এখনো শুধু শীর্ষস্থানীয় পেশাদারদের লড়াই এবং অলিম্পিক বক্সিংয়ের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে।

মুষ্টিযুদ্ধ মূলত বিপজ্জনক খেলা হিসাবে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। কারণ লড়াইয়ে অনেকে মাথায় মারাত্মক আঘাত পেয়ে আহত হন। এ আঘাত চিরস্থায়ী হতে পারে, অনেকে মারাও গেছেন।

মুষ্টিযুদ্ধ-প্রতিযোগিতা হয় ১২টি শারীরিক ওজন-বিভাগে। অপেশাদারদের প্রতিযোগিতা ৩ রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়। ৩/৪ মিনিট স্থায়ী প্রত্যেক রাউণ্ড শেষে ১ মিনিট বিরতি থাকে। আর পেশাদারদের প্রতিযোগিতা হয় ৪-১৫ রাউণ্ড পর্যন্ত।

প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করেন এক জন রেফারি। নিয়ম-কানুন মতো লড়াই হচ্ছে কিনা তা দেখেন তিনি। আর পয়েন্ট দেওয়ার জন্য রিং-এর বাইরে ৩ জন বিচারক থাকেন। মুষ্টিযুদ্ধে এক জন প্রতিযোগী তিন ভাবে পরাজিত হতে পারেন—নক্ আউট, টেকনিক্যাল নক আউট ও পয়েন্টে।

বক্সিং রিং হচ্ছে মাটি থেকে ৩/৪ ফুট উচুঁ প্রায় ২৯ ফুট বর্গাকৃতির একটি মঞ্চ। এর চার কোণায় ৪টি শক্ত খুঁটি এবং চারপাশে কমপক্ষে ৩টি রশির ঘের থাকে। রিংয়ের মেঝে ক্যানভাস বা মোটা কৃত্রিম কার্পেট দিয়ে ঢাকা থাকে।

আন্তর্জার্তিক আইন অনুযায়ী বক্সার বা মুষ্টিযোদ্ধাদের শরীরের ওজন অনুসারে ১২টি ওজন–শ্রেণীতে প্রতিযোগিতা হয়। সেগুলি হচ্ছে :

১. লাইট ফ্লাই ওয়েট, ২. ফ্লাই ওয়েট, ৩. ব্যাণ্টাম ওয়েট, ৪. ফেদার ওয়েট, ৫. লাইট ওয়েট, ৬. লাইট ওয়েল্টার ওয়েট, ৭. ওয়েল্টার ওয়েট, ৮. লাইট মিড্‌ল্ ওয়েট, ৯. মিড্‌ল্ ওয়েট, ১০. লাইট হেভি ওয়েট, ১১. হেভি ওয়েট, ১২. সুপার হেভি ওয়েট।

অ. ব.

মুসলমানি পুঁথি বটতলার পুঁথি / সাহিত্য দ্র

মুসলিম লীগ

ভারত (দ্র) উপমহাদেশের মুসলমানদের আর্থ–রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর প্রতিনিধিবৃন্দের উদ্যোগে ঢাকায় এটি

স্যার সলিমুল্লাহ

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্

আইয়ুব খান

গঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (দ্র), নওয়াব ভিকারুল মুল্‌ক্ ও মহসিনুল মুল্‌ক্ প্রমুখ। তখন এই দলটির নাম ছিল 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ', সংক্ষেপে 'মুসলিম লীগ'। ১৯৩৪ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ (দ্র) এর নেতৃত্বের হাল ধরলে দলটিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়।

১৯৩৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর থেকে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক আন্দোলন শুরু করে। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত তার এক অধিবেশনে 'পাকিস্তান' (দ্র) নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উথাপন করেন যা 'লাহোর প্রস্তাব' (দ্র) নামে পরিচিত। এর পর থেকে দলটির দ্বারা সূচিত ব্যাপক আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি (১৯৪৬-৪৭) চরম পর্যায়ে পৌঁছলে তার প্রচারিত দাবির ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান (১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট) এবং ভারত (১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট) নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকে অর্থনৈতিকভাবে সীমাহীন শোষণের শিকার হয় পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণ। ফলে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে একের পর এক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে, যেমন '৪৮ ও '৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন (দ্র), '৫৪ সালে

www.pathagar.com

পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের (দ্র) ভোটযুদ্ধ। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। ৭১টি আসনের মধ্যে দলটির সমর্থক প্রার্থীরা লাভ করে মাত্র ৫টি আসন।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান (দ্র) সাবেক পাকিস্তানব্যাপী সামরিক শাসন জারি করে দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে পরিবর্তিত রূপে মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। কিন্তু সমগ্র পাকিস্তান, বিশেষত পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের গণ-অভ্যুত্থানের (দ্র) মুখে তিনি ১৯৬৯ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলে দেশে সামরিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় তার রাজনৈতিক প্রভাব। তবে দল হিসাবে মুসলিম লীগ কখনোই অবলুপ্ত হয় নি, যদিও তার মধ্যে একাধিক উপদল তৈরি হয়েছে।

আ. হ.

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ কাজী আবদুল ওদুদ দ্র

মুসা (আ.), হযরত

হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরায়েল সম্প্রদায়ের নবী ছিলেন। তাঁর নিকট ঐশীগ্রন্থ 'তাওরাত' (দ্র) অবতীর্ণ হয়। বাইবেলে তাঁর নাম 'মোজেস'।

মুসা (আ.)-র জন্ম হয় মিশরে। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মিশরের শাসক ফেরাউন সকল সদ্যজাত বনী ইসরায়েলি পুত্রসন্তানকে হত্যার আদেশ জারি করেন। কারণ, জ্যোতিষীদের এরকম ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে এক জন ইসরায়েলির হাতেই ফেরাউন তাঁর শাসনক্ষমতা হারাবেন।

হযরত মুসা (আ.)-এর মা ফেরাউনের ভয়ে ছেলেকে লুকিয়ে রাখেন। পরে, ঘটনাচক্রে শিশু মুসা আশ্রয় লাভ করেন ফেরাউনেরই অন্দরমহলে। এখানেই তিনি বড় হতে থাকেন।

তাঁর তরুণ বয়সে এক জন অত্যাচারী মিশরীয় তাঁর হাতে নিহত হলে তিনি ধরা পড়ার ভয়ে মাদায়েনে পালিয়ে যান। সেখানে অবস্থানকালেই সিনাই পর্বতের পাদদেশে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নবুওয়াত লাভ করেন এবং ফেরাউন ও অন্যান্য অবিশ্বাসীদের সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য মিশরে গমন করেন।

ফেরাউনের সঙ্গে তাঁর সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফেরাউন নিজকে 'খোদা' বলে দাবি করত; তাই মুসা (আ.)-এর সত্যধর্ম প্রচার তার সহ্য হয় নি। সংঘাত ও বিরোধ চরম আকার ধারণ করায় মুসা (আ.) গোপনে চার লক্ষ সহযাত্রীসহ কিনানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। খবর পেয়ে ফেরাউনও সসৈন্যে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। লোহিত সাগর পার হওয়ার সময় সদলবলে ফেরাউনের সলিলসমাধি ঘটে।

ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার পর মুসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যপ্রচার শুরু করেন। এ সময় তাঁকে নানা বাধা-বিঘ্ন ও তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট থেকে। কুরআন শরীফে (দ্র) এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

মু. মা.

মুসোলিনি, বেনিতো [১৮৮৩—১৯৪৫]

ইতালির রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক এবং ইতালীয় একনায়কতন্ত্রের জনক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে ইতালিতে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এই একনায়কতন্ত্র ফ্যাসিবাদ (দ্র) নামে পরিচিত।

১৮৮৩ সালের ২৯শে জুলাই ইতালির রোমানিয়া প্রদেশের দভিয়া দে প্রেদাপ্পিয়ো শহরে জন্মগ্রহণ করেন মুসোলিনি (Benito Mussolini)।

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এড়াতে তিনি ১৯০২ সালে সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। ১৯০৪ সালে ইতালিতে ফিরে এসে সাংবাদিক ও সমাজতন্ত্রী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। এই সময় 'লা লত্তা দে ক্লাস্‌সি' এবং 'আভান্তি' (Avanti) পত্রিকা দুটোর সম্পাদনা করেন।

১৯১৯ সালে মিলান শহরে ফ্যাসিস্ট দল গঠিত হলে মুসোলিনি তাতে যোগ দেন এবং পরে এই দলের নেতা হন। ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সালের মধ্যে তিনি ইতালির সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় ইতালিতে পূর্ণ একনায়কতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। দেশের অর্থনীতিতে

www.pathagar.com

মুসোলিনি যে সংস্কার আনেন তা জনপ্রিয় হয়েছিল।

১৯৩৫ সালে তিনি আবিসিনিয়া আক্রমণ ও দখল করেন। এই সময় হিটলারের (দ্র) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়। মিউনিখ বৈঠকে তিনি শান্তির পক্ষে কাজ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় তিনি জার্মানির সঙ্গে অক্ষশক্তিতে যোগ দেন। পরে মিত্রশক্তির (ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া) হাতে পরাজিত ও পদচ্যুত হয়ে বন্দি হন। ১৯৪৫ সালে জার্মান সৈন্যদের সাহায্যে পালিয়ে যাবার সময় তিনি ইতালির প্রতিরোধবাহিনীর হাতে নিহত হন।

টি. কি.

মুহম্মদ (স.), হযরত [৫৭০—৬৩২]

ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স.) আরবের মক্কা (দ্র) নগরীর বিখ্যাত কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। আরবি মাসের হিসাবে তা ১২ই রবিউল আওয়াল। কোনো কোনো লেখকের মতে তাঁর জন্মসাল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল মোতাবেক ৮-১২ই রবিউল আওয়াল। তাঁর পিতা হাশিম গোত্রের আব্দুল্লাহ এবং মা জোহরা গোত্রের আমিনা।

হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁর জন্মের আগেই পিতৃহীন হন এবং ছ' বছর বয়সে মাকে হারান। হালিমা নামের এক দরিদ্র মহিলা ছিলেন তাঁর ধাত্রী। তিনি ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মুহম্মদকে (স.) লালন পালন করেন। মায়ের মৃত্যুর পর শিশু মুহম্মদ (স.) তার চাচা আবু তালিবের স্নেহে প্রতিপালিত হতে থাকেন।

হযরত মুহম্মদ (স.) বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত সৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনোই কোনো কারণে মিথ্যা বলতেন না। এ কারণে বালক বয়সেই তাঁর উপাধি হয় 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী।

তাঁর সময়ে আরবের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা ছিল তমসাচ্ছন্ন। অবক্ষয়, নৈরাজ্য, পারস্পরিক কলহ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। মেয়েশিশু হওয়া লজ্জার মনে করে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটত। গোত্রে গোত্রে লড়াই ছিল সাধারণ ঘটনা। কোনো কোনো সময় এ ধরনের যুদ্ধ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলত। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর জুলুমের প্রাধান্য ছিল সর্বত্র। সে সময় আরবের অধিকাংশ মানুষই ছিল ধর্মবিশ্বাসে পৌত্তলিক ও বহুদেবতার পূজারী। পবিত্র কাবা ঘরে রক্ষিত ছিল অসংখ্য দেবমূর্তি।

আরব সমাজের এমন এক দুঃসময়ে মহামানব হযরত মুহম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব। হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকার সময় আল্লাহ্ প্রেরিত ফিরিশ্‌তা (দ্র) জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সত্য ধর্ম ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় আল্লাহ্‌র বাণী। তিনি হলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ, ধর্মপ্রচারক। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর। এর পর দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয় সমগ্র কুরআন শরীফ (দ্র)। শুরুতে ঘনিষ্ঠ জনদের মধ্যে মুহম্মদ (স.) তাঁর নতুন ধর্মের বাণী প্রচার করতে থাকেন। ক্রমে প্রকাশ্যে মক্কাবাসীদের পৌত্তলিকতার পরিবর্তে এই সত্য ধর্মের দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করেন।

হযরত মুহম্মদ (স.) ঘোষণা করলেন : এক আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ বা উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। ছোট-বড়, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, আমীর-ফকিরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি খোদা-ভীরু, সৎ চরিত্রের অধিকারী এবং যাঁর মধ্যে সৎ কাজের পরিমাণ বেশি। তিনি মানুষকে হানাহানি, ভেদ-বিভেদ এবং গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের পরিবর্তে শান্তি ও সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণের পথে আহ্বান করলেন। তিনি নারী তথা মায়ের স্থান দিলেন সবার উপরে। অনেকে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। কেউ কেউ বিরোধিতা করল। যারা ইসলাম গ্রহণ করল, তাদের ওপর এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহর (স.) (দ্র) ওপর নেমে এল রক্ষণশীল সংস্কারাচ্ছন্নদের অত্যাচার। তবুও ন্যায়, সত্য ও ধর্মের পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন না মহানবী। তিনি অবিচলিতভাবে ইসলাম প্রচার করে যেতে থাকলেন। শেষে শত্রুদের নির্যাতন এত বেড়ে গেল যে তিনি ৬২২ সালে সঙ্গী-সাথীসহ মক্কা থেকে মদিনায় (দ্র) হিজরত (দ্র) করতে বাধ্য হন।

মদিনার লোকজন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে। সেখানে তিনি পূর্ণোদ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। দলে দলে মানুষ সত্যের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে। অবশ্য এখানে এসেও তাঁকে মক্কার অবিশ্বাসীদের এবং অন্যান্য শত্রুর মুকাবিলা করতে হয় বহুবার। কিন্তু সত্যের অবিচল সৈনিক মুহম্মদের (স.) সামনে কোনো শক্তিই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। তিনি নতুন ধর্মের প্রেরণায় বেদুঈনদের সুসংগঠিত করে আরব বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী দ্রুত সিরিয়া,

www.pathagar.com

মেসোপটেমিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে বিশ্বে ইসলামের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে। শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই নয়, এর মাধ্যমে ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে নয়া সভ্যতার সূচনা ঘটে। ইসলামের মূল কথা মানবতা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ, অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ইত্যাদি— যা হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁর বিদায় হজ্বের (দ্র) ভাষণেও বলে গেছেন।

মুহম্মদ (স.) সুদীর্ঘ তেইশ বছর ইসলাম প্রচার এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সফল প্রচার, ব্যক্তিক গুণাবলি ও অনুপম চরিত্র মাধুর্যের কারণে বিশাল ভূ-ভাগ মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুন, হিজরি ১১ সালের ১২ই রবিউল আওয়াল মহামানব হযরত মুহম্মদ (স.) ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

মুহম্মদ আবদুল হাই আবদুল হাই, মুহম্মদ দ্র

মুহম্মদ আলী [১৯৪২—]

সমকালীন বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতিমান মুষ্টিযোদ্ধা এবং মুষ্টিযুদ্ধের (দ্র) সবচেয়ে বর্ণাঢ্য চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। এক শত বছর পূর্বেও মুষ্টিযুদ্ধ নির্মম, হিংস্র আর বন্য খেলা হিসাবে ধিকৃত ছিল। এই অপবাদ পুরোপুরি ঘুচিয়ে মুহম্মদ আলীই প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ নামক 'বন্য' খেলাটিকে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করেন। পৃথিবীব্যাপী মুষ্টিযুদ্ধের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৪২ সালের ১৭ই জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) এক দরিদ্র খ্রিস্টান পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর নাম রাখা হয় ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে। পরবর্তী সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি মুহম্মদ আলী নাম ধারণ করেন।

জো মার্টিন নামক এক পুলিশ অফিসারের জিমনেশিয়ামে মুহম্মদ আলীর মুষ্টিযুদ্ধের হাতেখড়ি হয় বারো বছর বয়সে। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি দুর্দান্ত মুষ্টিযোদ্ধা হয়ে ওঠেন। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে লাইটওয়েট বিভাগে স্বর্ণপদক জয় করে তিনি প্রথম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পেশাদারি

জর্জ ফোর্ম্যানকে আঘাত হানার মুহূর্তে মুহম্মদ আলী

বক্সিং-এ অংশ নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুহম্মদ আলী ১০৬টি অপেশাদার লড়াইয়ে অংশ নিয়ে ৯৮টি খেলায় বিজয়ী হন এবং তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

১৯৬২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর মুহম্মদ আলী ফ্রয়েড প্যাটারসনকে মাত্র ২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে পরাজিত করে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৬৪ সালে সোনি লিস্টনকে পরাজিত করে তিনি বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করেন। পরাজয়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে লিস্টন আবার আলীকে চ্যালেঞ্জ করেন। দ্বিতীয় লড়াইয়ে আলী তাঁকে প্রথম রাউণ্ডেই নক আউট করেন।

পরের দু' বছর তিনি ৯ বার খেতাবি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং প্রতি বারই বিজয়ী হন। একে একে পরাজিত করেন জর্জ শুভালো, হেনরি কুপার, ব্রায়ান লণ্ডন, কার্ল মিল্ডেনবার্গার, ক্লেভল্যাণ্ড উইলিয়াম্স্, আর্নি টেরেল এবং জোরা ফলি-কে।

এর পর হঠাৎ করে মুহম্মদ আলীর জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। মার্কিন সেনাবাহিনীর পক্ষ হয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে পাঠানোর জন্য মার্কিন সরকার তাঁর ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু শান্তিকামী মুহম্মদ আলী যুদ্ধে যাবার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন খেতাব ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ৫ বছরের জেলও হয় তাঁর। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি মামলায় বিজয়ী হন এবং তাঁর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ এই তিন বছর তিনি মুষ্টিযুদ্ধের বাইরে ছিলেন। অনেকে বলেন, এই সময়ে আলী সবচেয়ে ভাল ফর্মে ছিলেন।

১৯৭৪ সালের ৩০শে অক্টোবর ফোর্ম্যান্‌কে (দ্র)

www.pathagar.com

হারিয়ে মুহম্মদ আলী তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া শিরোপা পুনরুদ্ধার করেন।

পেশাদার জীবনে মুহম্মদ আলী শিরোপা লড়াইসহ মোট ৬০ বার লড়াই করেছেন। এর মধ্যে ৫ বার পরাজিত হন যথাক্রমে জো ফ্রেজিয়ার, কেন নর্টন, স্পিংস, ল্যারি হোম্‌স্ এবং বার্বিকের কাছে।

১৯৭৯ সালে অবসরের কথা ঘোষণা করেও তিনি ১৯৮০ সালে নতুন চ্যাম্পিয়ন ল্যারি হোম্‌স্‌কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিরাট বড় ভুল করে বসেন। এই ভুলের কথা পরে আলী নিজেই স্বীকার করেছেন। এই ভুলের কারণেই তিনি অপরাজিতভাবে মুষ্টিযুদ্ধ থেকে বিদায় নিতে পারেন নি। ল্যারি হোম্‌সের কাছে পরাজিত হবার পরপরই মুহম্মদ আলী মুষ্টিযুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

টি. কি.

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ জিন্নাহ্, মুহম্মদ আলী দ্র

মুহম্মদ আলী, মওলানা [১৮৭৮—১৯৩১]

মওলানা মুহম্মদ আলী পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক জন নেতা, রাজনীতিক, অকুতোভয় সাংবাদিক, এবং অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন।

তাঁর জন্ম ভারতের (দ্র) উত্তর প্রদেশের রামপুর রাজ্যে, ১৮৭৮ সালে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি আলীগড় কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রথম জীবনে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদে চাকুরি করলেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের শাসন ও শোষণ তাঁর মনকে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করে। এ কারণেই তিনি সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের কবল থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে, বিশেষ করে মুসলমানদের রক্ষার জন্য তাঁর লেখনী ছিল ক্ষুরধার, কণ্ঠ ছিল দ্বিধাহীন।

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের (দ্র) তিনি ছিলেন অন্যতম স্থপতি। তিনি খিলাফত আন্দোলন (দ্র) ও ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের (দ্র) পুরোধা ছিলেন। তিনি ১৯২৩ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের (দ্র) সভাপতি হন। কিন্তু মতভেদগত কারণে পাঁচ বছর পর ঐ পদ থেকে ইস্তফা দেন।

তিনি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত গোলটেবিল বৈঠকে (Round Table Conference) যোগদান করেন। এই বৈঠক প্রথম বার ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর থেকে ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় বার ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকে যোগদানকালে মওলানা মুহম্মদ আলীর মৃত্যু হয় (১৯৩১)।

মু. মা.

মুহম্মদ ঘুরী ঘুরী, মুইজউদ্দিন মুহম্মদ দ্র

মুহম্মদ বিন কাসিম [৬৯৫—৭১৫]

মুহম্মদ বিন কাসিমের পুরো নাম ইমদাদ্‌দীন মুহম্মদ ইবনে কাসিম। সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম আরবীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

উমাইয়া বংশের খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময়ে আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্দেশে তিনি ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু আক্রমণ করেন। এই সময় মুহম্মদ বিন কাসিমের বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর।

সিন্ধু বিজয়ের পর মুহম্মদ বিন কাসিম ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মুলতান অধিকার করেন। বিজিত এলাকায় ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য কাসিম স্থানীয় প্রশাসক ও নিজ প্রতিনিধিবর্গকে নির্দেশ দেন।

খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যুর পর সুলায়মান খলিফা হন। কোনো অজ্ঞাত কারণে সুলায়মানের নির্দেশে কাসিমকে প্রথমে কারারুদ্ধ এবং পরে হত্যা করা হয়।

মুহম্মদ বিন কাসিম শুধু একজন বীর যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি একাধারে কবি, রাজনীতিবিদ ও সুশাসক ছিলেন। তিনি ধর্মপালনে স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের ভিত্তিতে অধিকৃত অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন।

খু. জা.

মুহম্মদ বিন তুঘলক [শা. ১৩২৫—১৩৫১]

মুহম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৫ সালে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম জুনা খান (উলুঘ খান)। তিনি

www.pathagar.com

দিল্লির সম্রাট গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের পুত্র।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের প্রথম দশ বছর শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে কেটেছে। কিন্তু ১৩৩৫ থেকে ১৩৫১ সাল পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বঙ্গ, গুজরাট, সিন্ধু ও দাক্ষিণাত্যে (দ্র) বিদ্রোহ দমনে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে তিনি দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং এর নামকরণ করেন দৌলতাবাদ। দিল্লি (দ্র) থেকে দৌলতাবাদ পর্যন্ত ৭০০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করা হয় এবং রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো হয় ও সরাইখানা স্থাপন করা হয়। দিল্লির সকল অমাত্যকে তিনি তাঁর সঙ্গে দৌলতাবাদ যাবার নির্দেশ দেন।

দৌলতাবাদে প্রায় আট বছর অবস্থানের পর তিনি উত্তর সীমানায় মঙ্গোল হামলা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পুনরায় দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং এর ফলে দিল্লিতে আসা-যাওয়ার জন্য অনেককে বেশ কষ্ট পেতে হয়, এমনকি পথশ্রমে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এতে তাঁর রাজকোষের উপরও চাপ পড়ে।

মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত, মহৎপ্রাণ, সাহসী যোদ্ধা ও নিরপেক্ষ বিচারক। কিন্তু শাসক হিসাবে তাঁর সাফল্য ছিল বিতর্কিত। তিনি তর্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত ও সাধারণ বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইসলাম ধর্মের (দ্র) প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি প্রতীক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন।

থাট্টার (সিন্ধু) বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকাকালে ১৩৫১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

খু. জা.

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন [১৯০৪—১৯৮৭]

১৯০৪ সালে পাবনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জায়দার আলী এবং মাতার নাম জিউয়ারুন নেসা। ১৯২১ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সালে বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বিবাহ করেন ১৯২৫ সালে শরিফুন নেসাকে।

কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৩১ সালে সরকারি চাকুরি দিয়ে, স্কুল সাব-ইন্সপেক্টররূপে। বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনার পর চাকুরি শেষ করেন ১৯৫৯ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রফেসর হিসাবে। ১৯৫২ সালে সরকারি মাসিক পত্রিকা 'মাহে-নও' (দ্র)-এর সম্পাদক ছিলেন ছয় মাসের জন্য।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সবচাইতে বড় পরিচিতি লোকসঙ্গীত (দ্র) ও লোকসাহিত্য (দ্র)-সংগ্রাহক হিসাবে। তিনি ছিলেন লোকসাহিত্যবিশারদ। তাঁর সারা জীবনের কীর্তি ১১ খণ্ডে সংগৃহীত লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় লোকসাহিত্যের সঙ্কলন 'হারামণি'। এ ছাড়াও তিনি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন লোককাহিনীর সঙ্কলন 'শিরণী' (১৯৩২)। বইখানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। বইখানি পরে মার্চ ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'হারামণি'-রও অধিকাংশ খণ্ড বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের আরো যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো হল : 'হাসি অভিধান', 'বাংলা ইডিয়ম সঙ্কলন' (১৯৫৭), 'জরিণ কলম' ছদ্মনামে লিখিত উপন্যাস 'সাতাশে মার্চ' (১৯৫৭), বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' ৩ খণ্ড একত্রে (১৯৮১), গানের সঙ্কলন 'শত গান' (১৯৬৭), 'ইরানের কবি' (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), আওরঙ্গজেব (অনুবাদ, ১৯৭০) ইত্যাদি। ছোটদের জন্য তাঁর লিখিত বইও প্রকাশিত হয়েছে। সে বইগুলির মধ্যে 'ঠকামি' রূপকথা সঙ্কলন (১৯৫৯), 'মুসকিল আসান' (২য় সং ১৯৫৯), 'হাসির পড়া' (১৯৬৩) উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত অনেক বই তাঁর নিজস্ব প্রকাশন সংস্থা 'হাসি প্রকাশালয়' থেকে প্রকাশিত।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন গবেষণা সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারে (দ্র) ভূষিত

www.pathagar.com

হন। তিনি ১৯৮৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন।

তাঁর সাধনাকে ধরে রাখার জন্য 'মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ফোকলোর ইনস্টিটিউট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে।

শা. হ.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ দ্র

মুহর্‌রম আশুরা দ্র

মুহাজির

আরবি শব্দ, আভিধানিক অর্থ স্বদেশত্যাগী, হিজরতকারী। ইসলামের ইতিহাসের আলোকে মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর সঙ্গে মক্কা (দ্র) থেকে মদিনায় (দ্র) হিজরতকারীদের 'মুহাজির' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এই হিজরত বা দেশত্যাগ সম্পন্ন হয় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সময় থেকে হিজরি (দ্র) সাল গণনা শুরু হয়।

পবিত্র কুরআন শরীফে (দ্র) মুহাজিরদের আল্লাহ্‌র বিশেষ প্রিয়পাত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তাঁরা মক্কায় তাঁদের ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ফেলে দেশত্যাগ করেন শুধুমাত্র আদর্শের খাতিরে, ইসলামের জন্য। তাঁরা শূন্য হাতে মদিনায় গিয়ে আনসারদের (দ্র) সাহায্যে পুনর্বাসিত হন। রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র)-এর সহযোগী হিসাবে এঁরা ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

মু. মা.

মূকাভিনয় মাইম এবং প্যান্টোমাইম দ্র

মূল / শিকড়

মূল বলতে সাধারণভাবে আমরা উদ্ভিদের যে অংশ মাটির নিচে থাকে সেই অংশকে বুঝি। প্রকৃতপক্ষে পর্ব, মধ্যপর্ব ও অগ্রমুকুলহীন এবং অরীয় (radial) কলাগুচ্ছ নিয়ে উদ্ভিদের যে অংশ গঠিত সেই অংশের নাম মূল। মাটির দিকে ও আলোর বিপরীতে গমন করা এর বৈশিষ্ট্য। মূল প্রধানত ভ্রূণমূল থেকে উৎপন্ন হয়। তবে অন্যান্য অংশ থেকেও তা উৎপন্ন হতে পারে। কাজেই উৎপত্তিস্থান নির্বিশেষে উদ্ভিদদেহের কোনো অংশে মূলের বৈশিষ্ট্য থাকলেই তাকে মূল বলা যায়।

উদ্ভিদদেহের মূল এবং এর শাখা-প্রশাখা নিয়ে গঠিত অঙ্গতন্ত্রের নাম মূলতন্ত্র। স্থায়ী প্রাথমিক মূল ও এর শাখা-প্রশাখা নিয়ে গঠিত মূলতন্ত্রের নাম 'প্রধান মূলতন্ত্র'। অপরদিকে সরু এক গুচ্ছ মূলের সমন্বয়ে গঠিত মূলতন্ত্রকে 'গুচ্ছ মূলতন্ত্র' বলা হয়। সাধারণভাবে প্রধান মূলতন্ত্রের উৎপত্তি দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদে এবং গুচ্ছ মূলতন্ত্রের উৎপত্তি একবীজপত্রী উদ্ভিদে।

একটি সাধারণ মূল মোটামুটিভাবে মূলত্রাণ অঞ্চল, বিভাজন অঞ্চল, বর্ধিষ্ণু অঞ্চল, মূলরোম অঞ্চল ও স্থায়ী অঞ্চল—এই পাঁচ অঞ্চলে বিভক্ত। উৎপত্তিস্থানের উপর নির্ভর করে মূলকে স্থানিক মূল এবং অস্থানিক মূল—প্রধান এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। স্থানিক মূল প্রধান মূল নামেও পরিচিত। অস্থানিক মূলের ভাগ দু'টি— গুচ্ছ মূল ও অগুচ্ছ মূল।

সাধারণভাবে মূল দুই প্রকার কাজ করে। এর একটি যান্ত্রিক কাজ। এ ধরনের কাজে উদ্ভিদকে মূল দৃঢ়ভাবে মাটির সঙ্গে ধরে রাখে। অপর কাজটি জৈবিক বা শারীরবৃত্তিক। এ ধরনের কাজে মূল— ১. মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছিয়ে দেয়, এবং ২. পাতায় তৈরি খাদ্য মূলের বিভিন্ন অংশে পৌঁছিয়ে দেয়।

প্রদান দু'টি কাজ ছাড়া বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে পরিবর্তিত সাধারণ মূলকে বলা হয় রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত মূল।

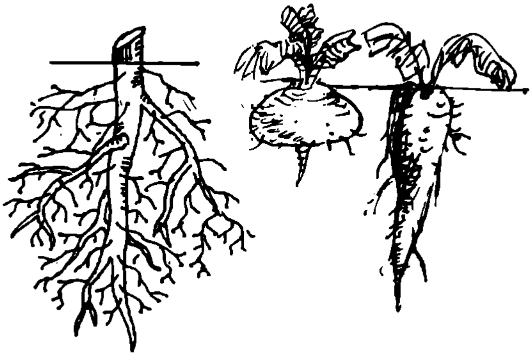

খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য পরিবর্তিত প্রধান মূল চারভাগে বিভক্ত। ভাগগুলো হচ্ছে :

ক. ফিউজিফর্ম বা মূলাকৃর্তি (যেমন মূলা)
খ. কনিক্যাল বা গাজরাকৃতি (যেমন গাজর)
গ. ন্যাপিফর্ম বা শালগমাকৃতি (যেমন শালগম)
ঘ. টিউবেরাস্ বা কন্দাকৃতি (যেমন ঢুপরি আলু)।

www.pathagar.com

খাদ্যসঞ্চয়ের জন্য পরিবর্তিত অস্থানিক মূল পাঁচ ভাগে বিভক্ত :

ক. দোলনাকৃতি মূল (কেশর আলু বা শাঁক আলু)

খ. গুচ্ছিত মূল (শতমূলী)

গ. মালাকৃতি মূল (করলা)

ঘ. দোলনাকৃতি মূল (আম আদা)

ঙ. চক্রাকৃতি মূল (ইপিকাক)।

যান্ত্রিক কাজের জন্য অস্থানিক মূলের পরিবর্তিত ভাগগুলো নিম্নরূপ :

ক. স্তম্ভমূল (বট গাছ)

খ. কণ্টক মূল (তাল বা নারিকেল)

গ. ঠেস মূল (কেয়া গাছ)

ঘ. পরাশ্রয়ী মূল (রাস্না)

ঙ. ভাসমান মূল (কেশরদাম)

চ. আরোহী মূল (পান)

ছ. ডানাবৎ মূল (শিমূল)।

জৈবিক কাজের জন্য রূপান্তরিত অস্থানিক মূল পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলো হচ্ছে :

ক. শ্বাসমূল (কেশরদাম)

খ. বায়বীয় মূল (রাস্না)

গ. পরভোজী বা পরজীবী মূল (স্বর্ণলতা)

ঘ. আত্তীকরণ মূল (গুলঞ্চ)

ঙ. জনন মূল (পটল)।

মু. আ.

মৃগীরোগ (epilepsy)

মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় সাময়িক গোলযোগের ফলে মৃগীরোগের উদ্ভব। মস্তিষ্কের বিশেষ স্নায়ুকোষে হঠাৎ করে অতিমাত্রায় অস্বাভাবিক বিদ্যুৎপ্রবাহ এর কারণ।

মৃগীরোগে আক্রান্ত হলে রোগী হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। মৃগীরোগীর মধ্যে সংজ্ঞাহীন হওয়ার আগে এক ধরনের পূর্ব-অনুভূতি প্রকাশ পায়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রোগীর শরীরে প্রবল খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। তখন রোগীর জিহ্বায় কামড় লাগা, অনিচ্ছাকৃত মূত্র নির্গমন ইত্যাদি সমস্যাও ঘটতে দেখা যায়। রোগের প্রকোপ কমে গেলে রোগী আপনা থেকেই আবার সংজ্ঞা ফিরে পায়।

মৃগীরোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে রোগীর মাথা এমনভাবে স্থাপন করা উচিত যাতে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত না হয়। রোগীর ওপরের ও নিচের চোয়ালের মাঝখানে একটি নরম পট্টি ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত যেন দাঁতের কামড় লেগে রোগীর জিহ্বা কেটে না যায়। রোগীর শ্বাসনালিতে শ্লেষ্মা আটকে থেকে যেন শ্বাসক্রিয়ায় অসুবিধা না ঘটে সে দিকেও লক্ষ রাখা উচিত।

মৃগীরোগের চিকিৎসার জন্য রোগের কারণ দূরীভূত করা প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ রোগের সঠিক কারণ নির্ণয়ের অভাবে চিকিৎসাব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। মৃগীরোগীর পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পানে বিরত থাকা, নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা, যথেষ্ট ঘুমানো ইত্যাদি বিষয়ে যত্নশীল হওয়া উচিত। রোগীকে গাড়ি চালানো, আগুন ও পানি থেকে এবং উচ্চ স্থানে অবস্থান করা থেকে বিরত রাখা আবশ্যক।

মৃগীরোগের ঔষধ (দ্র) হিসাবে প্রধানত ফেনোবার্বিটোন (phenobarbitone) জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। রোগের অবস্থাভেদে অন্যান্য ঔষধও ব্যবহার করা হয়।

সি. না. হ.

মৃৎশিল্প

মাটি দিয়ে তৈরি পাত্র পুড়িয়ে নেওয়ার শিল্প। মৃৎশিল্প বলতে সাধারণ কাদামাটি দিয়ে বানানো মাটির পাত্র থেকে কড়ি ও চীনামাটির সর্বাধুনিক সৌকর্যমণ্ডিত বাসনপত্র পর্যন্ত সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এসব তৈজসপত্র তৈরির পদ্ধতি প্রায় একই ধরনের। তবে আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশেও কুমোরেরা চাক ব্যবহার না করে হাতে মৃৎশিল্প গড়ে থাকে। আবার চাক ব্যবহার করেও তা তৈরি হয়। খালি হাতে চাকের সাহায্য ছাড়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এমনকি জাভা বা যবদ্বীপেও মৃৎপাত্র গড়া হয়। আবার চাকে বসিয়ে মাটির পাত্র গড়ে প্রয়োজন অনুসারে হয়তো শেষ অংশও হাতে তৈরি করা হয়ে থাকে।

সব রকম মাটিতে মাটির পাত্র গড়া সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার এঁটেল মাটি। কুমোরেরা সেই মাটি চিনে সংগ্রহ করে প্রয়োজন মতো ছাই, ভুষি, ঘোড়ার বা গাধার লাদ প্রভৃতিও মিশিয়ে থাকে। মাটি তৈরি হলে বাসনপত্র গড়ার পর কখনো কখনো গেরিমাটি গোলা রঙ ব্যবহার করা হতে পারে। আবার কোথাও কোথাও আমের খোসা, বাঁশপাতা, খয়ের ইত্যাদির ক্বাথ মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। এতে পাত্রের রঙ খুলে যায় এবং পানি চুঁইয়ে বের হয় না। এর পর

www.pathagar.com

লক্ষ্মীর সরা

বাঁকুড়ার পুতুল

পোড়ামাটির ফলক—পাহাড়পুর

চাকে পোড়ানোর পদ্ধতি অনুসারে বাসনকোসনের রঙ লাল বা কালো করা হয়, কোথাও কোথাও পাত্র কালো করার জন্য কালো রঙ ব্যবহার করা হয়। আবার কোথাও কোথাও চাক বা পোনে দেওয়ার আগে পাত্রে নানা রকম নকশা করা হয়। পোড়ানোর পর আবার নকশা বা রঙ করা হয়, যেমন শখের হাঁড়ি বা পাত্রে। এভাবে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সরা তৈরি হয়। ছাইদানি, টব ইত্যাদি নানা তৈজসপত্রে আজকাল নকশা ও রঙ করা হয়।

আমাদের এই উপমহাদেশে সবচেয়ে প্রাচীন মৃৎশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় হরপ্পায় (দ্র) খ্রি. পূ. ২৭৫০ অব্দ থেকে। মৃৎশিল্পে বাংলাদেশ গুণগতমানে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নি। চীন (দ্র), ইরান, মধ্যপ্রাচ্য (দ্র) ও মধ্যযুগের (দ্র) ইউরোপে (দ্র) এই শিল্পের চরম উৎকর্ষ ঘটে। সেসব দেশে চীনামাটির চিত্রিত তৈজসপত্র ধনী ও রাজপরিবারের আশ্রয়ে এক উচ্চাঙ্গ শিল্পের মর্যাদা লাভ করে। আমাদের দেশের রাজা–মহারাজা ও জমিদারগণ বিদেশ থেকে এসব তৈজসপত্র আমদানি করত।

আমাদের মৃৎশিল্পজাত বাসনকোসন গ্রাম ও শহরে সাধারণ মানুষ নিত্যনৈমিত্তিক কাজে ব্যবহার করে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। পল্লীবাসীরা বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে কুমোরের মাটির তৈরি নানা রকম বাসনকোসন ব্যবহার করে। এর মধ্যে ধান ও চাল রাখার বড় বড় পাত্র বা মটকা থেকে শুরু করে ছোট্ট মাটির প্রদীপ ইত্যাদি রয়েছে। মাটির খেলনাও কম গুরুত্বপুর্ণ নয়। গ্রামের মানুষ রান্নাবান্নার কাজে মাটির তৈরি এসব তৈজসপত্রাদি এখনো ব্যবহার করে।

বি. ব.

মৃদঙ্গ খোল দ্র

মে দিবস

আট ঘণ্টার কর্মদিবস বেঁধে দেওয়ার দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (দ্র) ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে সূচিত শ্রমিক আন্দোলন ও তাতে নিহত শ্রমিকদের স্মারক দিবস।

উল্লিখিত আন্দোলনের সূচনা ১৮৮৪ সাল থেকে হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন' নামে একটি জাতীয় শ্রমিকসংগঠন শ্রমিকদের কর্মদিবস ৮ ঘণ্টা করার দাবি তোলে এরও বেশ আগে। ১৮৬৬ সালের ২০শে আগস্ট ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ বাল্টিমোরে মিলিত হয়ে গঠন করেন 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন'। এই ইউনিয়নের আন্দোলনের ভেতর দিয়েই 'আট ঘণ্টা শ্রম সমিতি' গঠিত হয়। শ্রমিকগণ ৩রা ও ৪ঠা মে (১৮৮৬) আবার ধর্মঘট শুরু করে রাজপথে নেমে আসে। মালিক পক্ষ এই আন্দোলন দমন করার লক্ষ্যে পুলিশের সাহায্যে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ৩রা মে তারিখে 'ম্যাক-কমিক রিপার' কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক সভায় পুলিশ আক্রমণ চালিয়ে ৬ জন শ্রমিককে হত্যা এবং অনেককে আহত করে। এই দুঃখজনক ঘটনার প্রতিবাদে ৪ঠা মে শিকাগোর হে মার্কেটচত্বরে অনুষ্ঠিত এক শান্তিপূর্ণ সভার ওপর পুলিশ বাহিনী হামলা করলে শুরু হয় ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা। এতে নিহত হন ৭ জন পুলিশ এবং ৪ জন শ্রমিক। পরে প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে পুলিশ স্পাইজ, ফিসার ও অ্যাঙ্গেল নামের তিন জন শ্রমিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে এবং আন্দোলনরত বহু শ্রমিকনেতাকে কারারুদ্ধ করে। ১৮৮৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে এই রকম নৃশংস শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা অব্যাহত থাকে।

১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীগণ প্যারিসে সমবেত হন এবং গঠন করেন

www.pathagar.com

'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক' নামে একটি সংগঠন। এই সংগঠনটিই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের প্রতি তাদের স্ব-স্ব দেশের সরকারের কাছে আইন করে আট ঘণ্টা কাজের সময় বেঁধে দেবার দাবি উত্থাপন করার প্রস্তাব পেশ করে। ফলে ১৮৯০ সাল থেকেই মূলত এই দাবির ভিত্তিতে আমেরিকাসহ ইউরোপের দেশে দেশে 'মে দিবস' উদ্‌যাপিত হতে শুরু হয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে শ্রমিকদের আট ঘণ্টা কাজের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১লা মে তাদের ছুটির দিন হিসাবে উদ্‌যাপিত হতে থাকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে। এখনো সে ধারা অব্যাহত। বাংলাদেশেও ১লা মে সরকারি ছুটি থাকে।

আ. হ.

মেগাস্থিনিস [আনু. ৪র্থ খ্রি. পূ.]

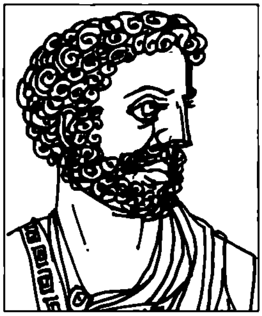

মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে প্রেরিত মহাবীর আলেকজাণ্ডারের (দ্র) সেনাপতি সেলুকাসের দূত, পর্যটক এবং প্রাচীন যুগের ভারততত্ত্ববিদ। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে 'ইণ্ডিকা' নামে একখানি বই লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

মেগাস্থিনিস (Megasthenes) সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাটলীপুত্রে আসেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ বা ৩২১ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করার পর গ্রিকদের হটিয়ে পাঞ্জাব অধিকার করলে সেনাপতি সেলুকাস পাঞ্জাব পুনরাধিকারের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। তখন সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করে তাঁর দরবারে গ্রিক রাজদূত হিসাবে মেগাস্থিনিসকে প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস এখানে বেশ কিছুকাল অবস্থান করে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা ও ভারতবর্ষের রীতিনীতি, আচার, অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থটি লেখেন। এই গ্রন্থ থেকে সেই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা জানা যায়। গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য হলেও অনেক প্রাচীন গ্রিক ও রোমক লেখক এই গ্রন্থ থেকে ভারত-গবেষণার প্রয়াস পেয়েছেন।

মেগাস্থিনিসের এই রচনাকর্ম ছাড়া তাঁর জীবন সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। লাতিন ও গ্রিক ভাষায় তাঁর সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শোয়ানবেক একখানি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির নাম 'India as describced by Megasthenes of Arian'। এতে মেগাস্থিনিসের মূল গ্রন্থের ৫৭টি অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে পণ্ডিতদের কেউ কেউ এগুলো মেগাস্থিনিসের লেখা নয় বলে মত প্রকাশ করেন।

সুজ. ব.

মেঘ

নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সর্বোচ্চ পরিমাণ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস (দ্র)-কে বলে সম্পৃক্ত বায়ু। যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু সম্পৃক্ত হয় এবং জলীয় বাষ্প জমে শিশির হয়, তাকে শিশিরাঙ্ক বলে। আর্দ্র বায়ুর উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের নিচে নেমে গেলে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা, ধোঁয়া, কয়লার (দ্র) সূক্ষ্ম কণা, গ্যাসের অণু প্রভৃতিকে আশ্রয় করে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়। এই ঘনীভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় ভেসে বেড়ায়। এদের বলা হয় মেঘ। মেঘের উপর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে বিভিন্ন বিচিত্র বর্ণ ধারণ করে।

আন্তর্জাতিক মেঘ-নীতি অনুসারে বায়ুমণ্ডলে ২৮ রকম মেঘ আছে। উচ্চতা অনুসারে মেঘ তিন প্রকার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,০০০ মিটারের ঊর্ধ্বের মেঘকে বলে উঁচু মেঘ। ২,১০০ থেকে ৬,০০০ মিটার উচ্চতায় থাকে মাঝারি মেঘ

www.pathagar.com

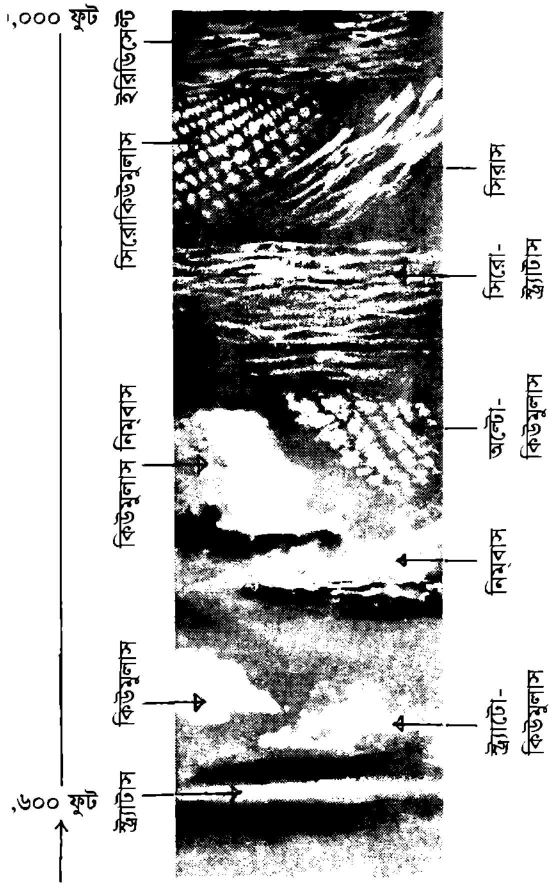

এবং এর নিচের মেঘ হল নিচু মেঘ। উঁচু মেঘের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিরোস্ট্র্যাটাস (cirrostratus), সিরাস (cirrus) ও সিরোকিউমুলাস (cirrocumulus)। মাঝারি মেঘের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অল্টোকিউমুলাস (altocumulus) ও অল্টোস্ট্র্যাটাস (altostratus)। নিচু মেঘের মধ্যে স্ট্র্যাটোকিউমুলাস, স্ট্র্যাটাস, নিম্বোস্ট্র্যাটাস। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য দু' ধরনের মেঘ হল কিউমুলাস এবং কিউমুলাস নিম্‌বাস। বিভিন্ন রকম মেঘের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কোনো মেঘ বৃষ্টিপাত ঘটায় অল্টোস্ট্র্যাটাস, স্ট্র্যাটোকিউমুলাস (stratocumulus), নিম্বোস্ট্র্যাটাস (nimbostratus)। কোনো মেঘ বজ্র-বিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির কারণ হয়।

স. রা.

মেঘদূত কালিদাস দ্র

মেঘনা

বাংলাদেশের (দ্র) গভীরতম ও প্রশস্ততম নদী। আসামের পার্বত্য অঞ্চল থেকে জন্ম নিয়ে বরাক নদী আসামের বদরপুরের কাছে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দু' ধারায় ভাগ হয়েছে। তার পর শ্রীহট্ট জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার সীমান্তে মারকুলিতে এই দুই নদী এক হয়ে কালনি নামে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ভৈরববাজারের কাছে পুরানো ব্রহ্মপুত্র নদের (দ্র) সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। তার পর আরো দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে চাঁদপুরের কাছে পেয়েছে পদ্মা (দ্র) নদীকে। আরো দক্ষিণে নোয়াখালি ও ভোলা দ্বীপের মধ্য দিয়ে মেঘনা বঙ্গোপসাগরে (দ্র) পড়েছে। সুরমাসহ মেঘনা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৫০ মাইল। মোহনার (দ্র) কাছে মেঘনা স্থানীয়ভাবে ভেড়া মোহনা ও অন্য কয়েকটি নামে পরিচিত। চাঁদপুরের পর থেকে পদ্মা ও মেঘনার মিলিত ধারা পুরোপুরি মেঘনা নামে পরিচিত। এখান থেকে আনুমানিক ৯০ মাইল দক্ষিণে চারটি মোহনাপথে মেঘনা বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এগুলো তেঁতুলিয়া, শাহবাজপুর, সন্দ্বীপ ও হাতিয়া নদী নামে পরিচিত। বর্ষাকালে এই নদী মোহনায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে। সামুদ্রিক ঝড়ের (দ্র) সময় এর প্রমত্ত রূপ বর্ণনার অতীত এক ধ্বংসকারী শক্তিতে পরিণত হয় : ১৯৭০ ও ১৯৮৫ সালের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাখরগঞ্জ, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, উরিরচর প্রভৃতি উপকূলীয় দ্বীপ ও চরে প্রচুর জীবনহানি ঘটে। মনপুরা এরকম একটি চর। ১৯৭০ সালে এই চরের ধ্বংসলীলা দেখে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (দ্র) মনপুরা সিরিজ নামে তাঁর অমর ছবিগুলো আঁকেন।

মেঘনার প্রধান উপনদী সোমেশ্বরী, কংস ও গোমতী। মনু কুশিয়ারার উপনদী। মেঘনার শাখানদীর মধ্যে তিতাস ও ডাকাতিয়া প্রধান। মারকুলির কাছে যেখানে সুরমা ও কুশিয়ারা মিশেছে, উৎস থেকে এই স্থান পর্যন্ত মেঘনার উচ্চগতি বা পার্বত্য অবস্থা। তার পর কালনি নামে ভৈরববাজার পর্যন্ত তার মধ্যগতি বা প্রৌঢ় অবস্থা। চাঁদপুরে পদ্মা নদী এসে মেশা পর্যন্ত অংশকে মেঘনার পরিপক্ব অবস্থা ধরা হয়। মেঘনা বাংলাদেশের চিরযৌবনা নদী।

কুলিয়ার চর থেকে ষাটনল পর্যন্ত মেঘনা তুলনামূলকভাবে শীর্ণ নদী। ষাটনল থেকে মোহনা পর্যন্ত মেঘনা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদীগুলোর মধ্যে একটি।

www.pathagar.com

ধলেশ্বরী যেখানে মেঘনার সঙ্গে মিশেছে সেখানে মেঘনার পানির রঙ দু' রকম। ধলেশ্বরীর পানি ঘোলা, মেঘনার পানি নীলাভ-সবুজ।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নদী মেঘনা অনেক বেশি বৃষ্টির পানি বহন করে। কারণ সুরমা-কুশিয়ারা নদী খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়, শিলং অধিত্যকা ও চেরাপুঞ্জির বৃষ্টির পানি বহন করে আনে। চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টির বিপুল জলরাশির জন্য শ্রীহট্ট জেলায় বড় বড় বিল ও হাওড় সৃষ্টি হয়েছে। মেঘনা সেই পানিকে সমুদ্রে নিয়ে যায়।

মেঘনার আর এক বৈশিষ্ট্য বানডাকা। জোয়ারের সময় পানি যখন ফুলেফেঁপে উজানে ছুটতে থাকে তখন তাতে কখনো কখনো ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ঢেউ হয়। চাঁদপুরের কাছে মেঘনার পানি নীল আর পদ্মা-যমুনার পানি ঘোলা। এখানে প্রচুর ইলিশ (দ্র) পাওয়া যায়। চাঁদপুরের ইলিশ স্বাদে অতুলনীয়। এ ছাড়া মেঘনার রুই, কাতলা, পাঙ্গাশ, আড়, রীটা ও চিংড়ি (দ্র) প্রসিদ্ধ।

এক সময় মেঘনা-উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলার সেচ ও বিদ্যুতের জন্য মেঘনা নদীতে বাঁধের পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল। সেই পরিকল্পনা এখনো কার্যকরী হয় নি। দাউদকান্দির কাছে মেঘনায় একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ভৈরববাজারে একটি রেলওয়ে সেতু আছে।

সুরমা নদীর তীরে কানাইঘাট, সিলেট (দ্র), ছাতক, সুনামগঞ্জ, দিরাই ও মারকুলি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও শহর। কুশিয়ারার তীরে জকিগঞ্জ, বিয়ানিবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ প্রসিদ্ধ শহর ও ব্যবসাকেন্দ্র। এ ছাড়া আজমিরীগঞ্জ, সাল্লা, ভৈরববাজার ও চাঁদপুর মেঘনার তীরে প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দর।

ময়মনসিংহের পূর্ব অংশ, বৃহত্তর সিলেট ও কুমিল্লা জেলা এবং ঢাকা (দ্র) জেলার কিছু অংশ নিয়ে মেঘনা অববাহিকা অঞ্চল। মেঘনা হিমালয় পর্বতমালা (দ্র) থেকে উৎপন্ন নয় বলে একে অহিমালয়ী নদী বলে।

বি. ব.

মেঘনা-গোমতী সেতু

বাংলাদেশের (দ্র) দীর্ঘতম সড়ক-সেতু। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাউসিয়া-দাউদকান্দির মধ্যবর্তী স্থানে মেঘনা-গোমতী নদীর মিলনমোহনার উপর এই সেতু অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ১.৪১ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৯.২ মিটার। পায়ে হেঁটে পার হতে ২৫ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগে। এর স্তম্ভ-সংখ্যা ১৬।

মেঘনা-গোমতী সেতু নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে প্রায় চার শ' কোটি টাকা। জাপানের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এই সেতু নির্মিত হয়। এ জন্য একে 'জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু'ও বলা হয়। জাপানের ওবায়েশি কর্পোরেশনের উপর এর নির্মাণকাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

মেঘনা-গোমতী সেতু এ দেশের সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কারণ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এশিয়া মহাসড়কেরই অংশ। এই সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে রাজধানী ঢাকার (দ্র) সঙ্গে দেশের পূর্বাঞ্চলসহ বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের (দ্র) সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ফেরি পারাপারের অসুবিধা ও সময়ক্ষেপণের বিড়ম্বনারও অবসান ঘটেছে। আগে বাসযোগে/মোটরযোগে সড়ক পথে ঢাকা

www.pathagar.com

থেকে চট্টগ্রাম যেতে সময় লাগত সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় ঘণ্টা, এখন সময় লাগে চার থেকে সাড়ে চার ঘণ্টা।

১৯৯২ সালের মে মাসে মেঘনা-গোমতী সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং নির্ধারিত সময়ের ১৬ মাস পূর্বে ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে এর কাজ শেষ হয়। ১৯৯৪ সালের ১লা নভেম্বর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই সেতু উদ্বোধন করেন। মেঘনা-গোমতী সেতু বাংলাদেশের দর্শনীয় সেতুগুলোর অন্যতম।

সুজ. ব.

মেঘনাদ সাহা [১৮৯৩—১৯৫৬]

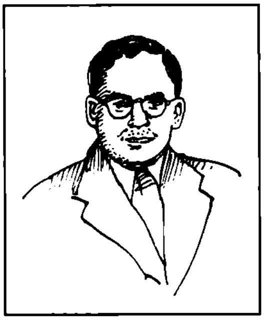

বিখ্যাত বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও দেশসেবক। জন্ম ৬ই অক্টোবর ১৮৯৩, ঢাকা জেলার শেওড়াতলী গ্রামে। মৃত্যু ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, কলিকাতায়। পিতা জগন্নাথ সাহা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কষ্টে পড়াশুনো করেন। ১৯০৫ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (দ্র) যোগাদানের জন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হন এবং জুবিলী স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৯ সালে জুবিলী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (পূর্ববঙ্গের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে) পাশ করেন। ঢাকা কলেজ থেকে আই. এসসি.-তে তৃতীয়, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে গণিতে অনার্সসহ দ্বিতীয় হয়ে বি. এসসি. উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ফলিত গণিতে এম. এসসি. পরীক্ষায় (১৯১৫) প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন।

১৯১৮ সালে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষকতায় যোগ দেন। এখানে গবেষণা করে পরপর দু' বছরে ডি. এসসি. ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (দ্র) পেয়ে পি. আর. এস. হন। ১৯২০ সালে 'থিওরি অব থার্মাল আয়নাইজেশন' বিষয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করেন। আমন্ত্রিত হয়ে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য লণ্ডন (দ্র) ও বার্লিনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। দু' বছর পর ভারতে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখানে তিনি স্কুল অব ফিজিক্স নামে পদার্থবিজ্ঞান-গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৯৩৮ সালে পুনরায় কলিকাতা (দ্র) ফিরে আসেন এবং কলিকাতায় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স গড়ে তোলেন। এটি বর্তমানে সাহা ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত। এ ছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স, ইস্ট বেঙ্গল রিলিফ কমিটি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান।

তিনি লণ্ডনে রয়াল সোসাইটি, ফ্রেঞ্চ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি, বোস্টন অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিয়ন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার ফেলো ও সদস্য ছিলেন।

স. রা.

মেজোস্ফিয়ার ট্রপোস্ফিয়ার দ্র

মেণ্ডেল, গ্রেগর্ ইওহান্ [১৮২২—১৮৮৪]

বংশগত বৈশিষ্ট্যের মূল নিয়ন্ত্রক উপাদান জীন (দ্র) সম্পর্কিত গবেষণা এখন নানাদিকে প্রসারিত। কিন্তু বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারের সূত্র প্রথম আবিষ্কার করেন অস্ট্রিয়াবাসী যাজক গ্রেগর্ ইওহান্ মেণ্ডেল (Gregor Johann Mendel)। সমকালীন বিজ্ঞানীদের অবহেলায় মেণ্ডেল তাঁর জীবদ্দশায় এই অসামান্য আবিষ্কারের স্বীকৃতি ও সম্মান কোনোটাই পান নি।

মঠের বাগানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরদানার গাছ উৎপাদন করে বছরের পর বছর সহিষ্ণু শ্রমসাধ্য গবেষণায় মেণ্ডেল বংশগতির সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন, যা এখন 'মেণ্ডেলীয় উত্তরাধিকারের সূত্র' নামে পরিচিত।

মেণ্ডেল দীর্ঘ গবেষণাশেষে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ করেন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় ব্রুন সোসাইটির পত্রিকায়। তাঁর মতে যে কোনো প্রজাতির দেহগত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে একটি নির্দিষ্ট আঙ্কিক নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ পায়। বর্ণসঙ্করের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই বৈশিষ্ট্যপ্রকাশের নির্দিষ্ট আনুপাতিক হার রয়েছে। এই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনোটি সক্রিয় বা প্রকট (ডোমিন্যাণ্ট), কোনোটি নিষ্ক্রিয় বা প্রচ্ছন্ন (রেসেসিভ)। প্রকট বৈশিষ্ট্যই প্রকাশের দিক থেকে প্রাধান্য পায়। বংশগতির এই নিয়ম জীবজগতের সব প্রজাতির জন্য সত্য।

মেণ্ডেলের জন্ম ১৮২২ সালে এবং মৃত্যু ১৮৮৪ সালে। তাঁর মৃত্যুর ষোল বছর পর ওলন্দাজ উদ্ভিদবিজ্ঞানী হুগো ডি ভ্রিস্ (Hugo De Vries : ১৮৪৮-১৯৩৫), এবং অন্য দুই

www.pathagar.com

উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল কোরেন্স (Carl Correns : ১৮৬৪-১৯৩৩) ও এরিস শের্মাক (Erich Tschermak : ১৮৭১-১৯৬২) বংশগতির সূত্র নিয়ে পৃথকভাবে গবেষণায় একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। বংশগতি সম্পর্কে অগ্রজ মেণ্ডেলের আবিষ্কারের সমর্থনে এই তিন বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করেন। এর পর থেকে মেণ্ডেলীয় তত্ত্বকে কেন্দ্র করে ক্রোমোজোম (দ্র), জীন (দ্র), পরিব্যক্তি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণায় বিজ্ঞানীদের আগ্রহ গড়ে ওঠে। শুরু হয় বংশগতি গিয়ে নতুন যাত্রা।

রু. হা.

মেণ্ডেল্‌সোন্, ফেলিক্স্ [১৮০৯—১৮৪৭]

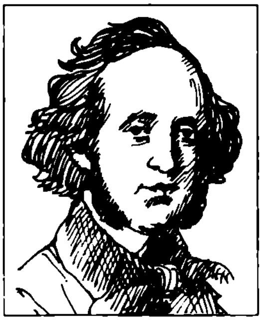

স্বনামধন্য পাশ্চাত্য সঙ্গীতস্রষ্টা। মেণ্ডেল্‌সোনের পূর্ণ নাম : ইয়াকব্ লুড্‌ভিগ্ ফেলিক্স্ মেণ্ডেল্‌সোন্-বার্টোল্ডি (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy)। জার্মানির হামবুর্গে ১৮০৯ সালে জন্ম। সঙ্গীত শিক্ষায় হাতেখড়ি মায়ের কাছে। মায়ের কাছে শেখা শেষ হলে দু' জন শিক্ষকের কাছে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন। এক জনের কাছে বিশেষ করে শেখেন পিয়ানো, অন্য জনের কাছে সঙ্গীততত্ত্ব। মাত্র সতেরো বছর বয়সে 'মিড সামার নাইট্‌স্ ড্রিম' নামে ওভর্চর রচনা করে মেণ্ডেল্‌সোন্ বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮২৯ সালে তিনি ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের (দ্র) কয়েকটি স্থান সফর করলে সেখানে তাঁর সঙ্গীতখ্যাতি বিস্তৃত হয়। ১৮৩৪ সালে বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা শপ্যাঁর (দ্র) সঙ্গে মেণ্ডেল্‌সোনের পরিচয় হয়। এই সময়ে তিনি বিখ্যাত একটি সিম্ফনি (দ্র) ও পিয়ানোসঙ্গীত রচনা করেন। কাছাকাছি সময়ে তিনি ডুসেলডোর্ফের পেরি সঙ্গীতপরিচালকের পদ লাভ করেন ও 'সেইন্ট পল' ওরাটোরিও রচনা করেন। সেখান থেকে মেণ্ডেল্‌সোন্ লাইপ্‌ৎজিগ যান ও গোভাণ্ডহাউজ অর্কেস্ট্রার পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি বাখ্-এর হারিয়ে যাওয়া 'সেইন্ট ম্যাথুজ প্যাশন' সঙ্গীত পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। মেণ্ডেল্‌সোন্ ইহুদি ছিলেন বলে খ্রিস্টানেরা তাঁকে এই পবিত্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করতে বাধা দেয়। সকল বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও মেণ্ডেল্‌সোন্ এই সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু এর কয়েক দিন পরেই মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১৮৪৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেণ্ডেল্‌সোন্‌কে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের শুদ্ধতম রূপকার হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। সিম্ফনি, ওভর্চর, ওরাটোরিও, পিয়ানোসঙ্গীত প্রভৃতি নানা শাখায় মেণ্ডেল্‌সোন্ বহু সংখ্যক ও বহু ধরনের কাজ করেছেন। শুদ্ধতার সঙ্গে সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্যের অপূর্ব মিলন ঘটেছে তাঁর রচনায়। উনবিংশ শতকের তিন সঙ্গীতকার পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিখ্যাত ত্রয়ী হিসাবে উল্লেখিত হন। মেণ্ডেল্‌সোন্ ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন শুমান্ (দ্র) ও শপ্যাঁ।

ক. গো.

মেথিলেটেড স্পিরিট অ্যালকোহল দ্র

মেনিঞ্জাইটিস (meningitis)

মস্তিষ্ক (দ্র) এবং মেরুরজ্জুর ওপরের পাতলা আবরণের প্রদাহকে মেনিঞ্জাইটিস বলে। মেনিঞ্জাইটিস সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

মেনিন্‌গোকক্কাস (meningococcus) ও স্ট্রেপ্টোকক্কাস (streptococcus) নামক রোগজীবাণুর সংক্রমণে মেনিঞ্জাইটিস দেখা দেয়। এর সূচনা আকস্মিক। সচরাচর লক্ষণের মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড জ্বর, বমি, অস্থিরতা, মাথাব্যথা (দ্র) ও খিঁচুনি। রোগীর ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। এণ্টিবায়োটিক (দ্র) ঔষুধ গ্রহণের ফলে বেশির ভাগ রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

যক্ষ্মার (দ্র) জীবাণু (দ্র) থেকেও মেনিঞ্জাইটিস হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিরক্তিভাব, জ্বর, অরুচি, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাব্যথা (দ্র), খিঁচুনি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। চিকিৎসা না পেলে মাথাব্যথা ও বমি বেড়ে যায় এবং রোগী মারা যেতে পারে। তা ছাড়া ভাইরাস (দ্র) সংক্রমণেও মেনিঞ্জাইটিস দেখা দিতে পারে।

মেনিঞ্জাইটিস সাধারণত শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা দেয়। কারণ নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসা না করলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

আ. আ. হা.

মেন্দেলিয়েফ্, দ্‌মিত্রি ইভানভিচ্ [১৮৩৪—১৯০৭]

দ্‌মিত্রি ইভানভিচ্ মেন্দেলিয়েফ্ ছিলেন রাশিয়ার (দ্র) এক

www.pathagar.com

জন রসায়নবিদ। 'পর্যায় সারণি' তাঁর উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

তাঁর জন্ম ১৮৩৪ সালে রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের তোবোল্‌স্ক্ (Tobolsk)-এ। বাবা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পনেরো বছর বয়সে মেন্দেলিয়েফ্ বাবাকে হারান। কয়েক বছরের মধ্যে মাকেও হারান। তিনি জার্মানি ও ফ্রান্সে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেন। পরে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের (দ্র) প্রফেসর হিসাবে শিক্ষকতা করেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক ওজনের (atomic weight) বিষয়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন। মেন্দেলিয়েফ্ ঐ সময়ে আবিষ্কৃত ৬৩টি মৌলকে পারমাণবিক ওজনের উচ্চক্রম অনুসারে সাজিয়ে মৌলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে ফেলেন। এর পর তিনি মৌলগুলোকে সারি (row) এবং স্তম্ভ (column) অনুসারে পুনরায় সাজান। ফলে একই স্তম্ভে অবস্থিত মৌলগুলোর মধ্যে রাসায়নিক মিল বা সাদৃশ্য দেখতে পান। রাসায়নিক মৌলের এই সজ্জার নামই 'পর্যায় সারণি'। মেন্দেলিয়েফ্ এই 'পর্যায় সারণি'র কোনো কোনো স্থান ফাঁকা দেখতে পান, এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে এই ফাঁকা স্থানগুলোতে এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত বা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে এমন মৌলগুলো স্থান নেবে। 'পর্যায় সারণি'র সাহায্যে মেন্দেলিয়েফ্ অনাবিষ্কৃত মৌলগুলোর ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নতুন মৌলগুলোর ধর্ম হবে মৌলগুলো যে-যে স্তম্ভের ফাঁকা জায়গায় স্থান নেবে সে সমস্ত স্তম্ভে অবস্থিত অন্যান্য মৌলের ধর্মের মতো হবে। 'পর্যায় সারণি'র সাহায্যে কয়েকটি মৌলের পারমাণবিক ওজনের গৃহীত মানের ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি (error) ধরা পড়ে এবং পরীক্ষণের সাহায্যে তা নিশ্চিত করা হয়। প্রথম দিকে সে সময়ের বিজ্ঞানীরা মেন্দেলিয়েফের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই কয়েকটি নতুন মৌল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই সন্দেহ দূর হয়, মেন্দেলিয়েফ্ বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন। বাহাত্তর বছর বয়সে ১৯০৭ সালে মেন্দেলিয়েফ্ পরলোকগমন করেন।

হো. আ.

মেরুজ্যোতি অরোরা বোরিয়ালিস দ্র

মেরুপ্রদেশ

৬৬$\frac{১}{২}^{\circ}$ অক্ষাংশ থেকে আরম্ভ করে ৯০° অক্ষাংশ পর্যন্ত মেরুপ্রদেশীয় অঞ্চল বিস্তৃত। শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের উত্তরে মেরুপ্রদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল অবস্থিত। প্রচণ্ড শীতের জন্য এই অঞ্চল ন' মাস বরফে আবৃত থাকে। এখানে গ্রীষ্মকাল মাত্র তিন মাস স্থায়ী। তবে সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে শীত অপেক্ষাকৃত কম। মেরুপ্রদেশের জলবায়ুর অপর নাম তুন্দ্রা অঞ্চল।

মরুভূমিতে প্রচণ্ড গরমের জন্য যেমন কোনো গাছপালা জন্মাতে পারে না, তুন্দ্রা অঞ্চলেও তেমনি অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য কোনো গাছপালা জন্মাতে পারে না। একমাত্র মস (দ্র) ও শৈবাল জাতীয় কিছু উদ্ভিদ এখানে দেখা যায়। প্রাণীর মধ্যে বল্গা হরিণ এখানে বাস করে যা থেকে মাংস, দুধ (দ্র) এবং চামড়ার পরিধেয় বস্ত্র পাওয়া যায়। তা ছাড়া এই মেরু অঞ্চলে শ্বেত ভল্লুক ও কুকুর (দ্র) বাস করে। শ্বেত ভল্লুক মাছ (দ্র) খেয়ে বেঁচে থাকে। এই অঞ্চলে কৃষিকাজ করা

বাঁ পাশে : এস্কিমোরা বরফ খুঁড়ে মাছ শিকার করছে। নিচে : দক্ষিণ মেরুর দৃশ্য

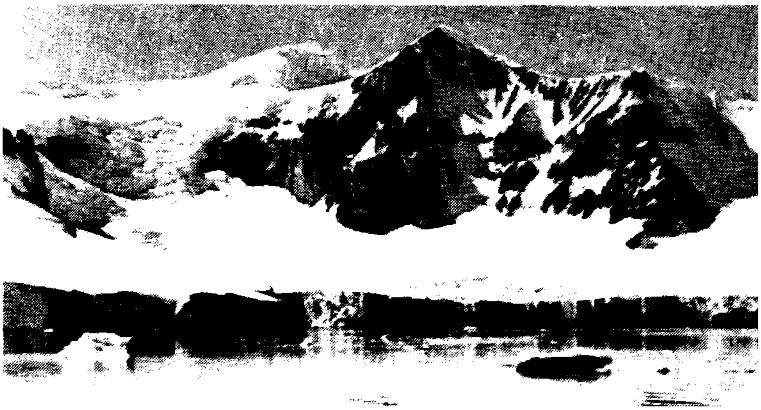

www.pathagar.com

একেবারে অসম্ভব। কেননা বছরের ন' মাসই এখানে বরফ জমে মাটির উপরিভাগ একেবারে ঢেকে রাখে। গ্রীষ্মকালে কোনো কোনো জায়গায় ফুল ফুটতে দেখা যায়। এই মেরু অঞ্চলের বাসিন্দা এস্কিমোরা (দ্র) বরফের ঘরে বাস করে এবং সীল (দ্র) শিকার করে জীবনধারণ করে। এস্কিমোরা স্লেজ (দ্র) গাড়ি টানার কাজে কুকুরকে ব্যবহার করে।

মু. এ.

মেরুরেখা অক্ষ দ্র

মেলানেশিয়া ওশিনিয়া দ্র

মেসোপটেমীয় সভ্যতা

পৃথিবীর (দ্র) প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। মধ্যপ্রাচ্যের (দ্র) ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী-বিধৌত অতি উর্বর উপত্যকায় এই দু'টি নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলের নাম মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক)। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ এবং ৩০০০ অব্দের মধ্যে এক অতি উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। এই সভ্যতা অবিমিশ্র কিছু ছিল না। সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসেরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও অপরিমেয় অবদান রয়েছে এর সামগ্রিক বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধনে।

মেসোপটেমিয়ায় বসতি স্থাপনকারী আদি অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল গম (দ্র)। খেজুর (দ্র) গাছকে তারা অভিহিত করত 'জীবনদায়িনী বৃক্ষ' বলে। খেজুর (দ্র) থেকে তারা তৈরি করত ময়দা ও মধু (দ্র)। প্রথম দিকে জলাভূমির আগাছা দিয়ে তৈরি করা হত কুঁড়েঘর। পরে এ কাজে ব্যবহার করা হতে থাকে এঁটেল মাটির ইট।

এই সভ্যতার শুরুতে যেমন খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, পানি সেচ ও পানি সঞ্চয়সহ সুবিন্যস্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, তেমনি জমিকর্ষণ কাজে কোদালেরও ব্যবহার শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে এই সভ্যতা ছিল কৃষি ও পশুচারণভিত্তিক।

শহর এলাকায় বসবাস করত কারিগরি শ্রেণীর লোকজন। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মধ্যে তারা তামা (দ্র), সোনা (দ্র), ব্রোঞ্জ (দ্র) ও পরে লোহার ব্যবহার আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে কৃষিকাজ ও হস্তশিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। গড়ে ওঠে দাস, স্বাধীন চাষী, কারিগর ও ধনী দাসমালিকদের সমবায়ে ছোট-বড় বহু নগর ও রাষ্ট্র। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মেসোপটেমিয়াই মানবসভ্যতার আদি লীলাভূমি।

সুমেরীয় সভ্যতা : মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশে আক্কাদ ও দক্ষিণাংশে সুমের। এই সুমেরকে কেন্দ্র করেই আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ নাগাদ মেসোপটেমিয়ায় সর্বপ্রথম এক উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। জাতিতে অ-সেমিটিক সুমেরবাসীরাই আদি মেসোপটেমিয়ার জনক। আনুমানিক তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেমিটিক জাতির একটি শাখা দজলা–ফোরাত উপত্যকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। সমাজ ও সভ্যতার দিক দিয়ে অনগ্রসর এই সেমিটিক শাখাটিই স্থানীয় সুমেরীয়দের কাছ থেকে ঘর-বাড়ি তৈরি, জলসেচ, সর্বোপরি লিখনপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান

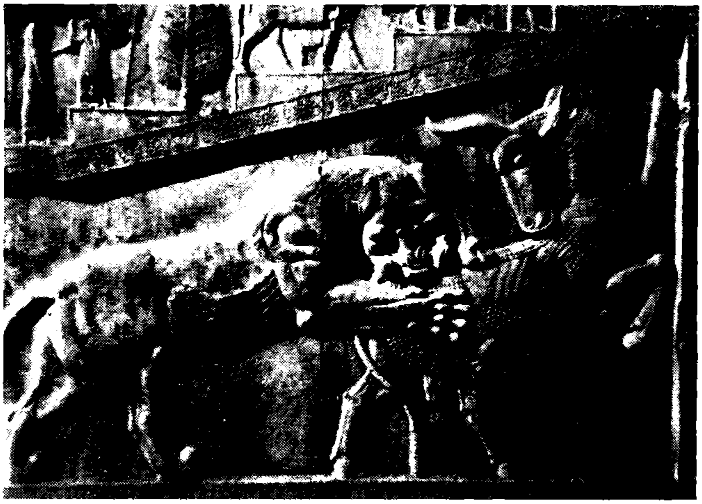

উপরে : অ্যাসেরীয় রিলিফ। ডান পাশে : একটি সুমেরীয় শিল্প—পুরোহিত রাজা গুড়েয়া (খ্রি. পূ. ২৪০০ অব্দ)

www.pathagar.com

লাভ করে। কালক্রমে এই সুমেরীয় ও সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণেই প্রথমে ব্যাবিলনীয় ও পরে অ্যাসেরীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

সুমেরীয়রা সুসভ্য জাতি হলেও সুসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয় নি। বস্তুত সুমের-অধ্যুষিত মেসোপটেমিয়া ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নগররাষ্ট্রের সমষ্টি। প্রাচীরবেষ্টিত এই সব নগর ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রত্যেক নগররাষ্ট্রের এক জন রাজা এবং নিজস্ব দেবতা ছিল। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে রাজাই ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে সুমেরীয় শাসনব্যবস্থায় কোনো রূপ রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য রাজ্যগুলো পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত। এই রকম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমেই উত্তর মেসোপটেমিয়ায় খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দে সুমের-আক্কাদ বা প্রাচীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম সারগন। তিনি জাতিতে ছিলেন সেমিটিক। সারগন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য চার শ' বছর স্থায়ী হয়। কিন্তু আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরাভব-না-মানা সুমের জাতি বিদ্রোহ করে এবং সুমের-আক্কাদ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করে 'নব্য সুমের সাম্রাজ্য'। এই নতুন সম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন দুঙ্গি। তিনিই সর্বপ্রথম সুমের জাতিকে সংঘবদ্ধ করে একটি বিধিবদ্ধ আইন প্রচলন করেন। ইতিমধ্যে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে) অ্যামোরীয় (Amorite) নামে সেমিটিকদের অপর একটি শাখা রাজধানী সুমেরের উত্তরে ফোরাত নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ব্যাবিলনে এসে বসতি স্থাপন করে। দুঙ্গির মৃত্যুর পর অ্যামোরীয় সেমিটিকদের শক্তিমান শাসক হাম্বুরাবি (খ্রিস্টপূর্ব ২১২৩-২০৮১) দোজলা-ফোরাত উপত্যকার নিম্নাঞ্চল অধিকার করে নেন এবং বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলোকে একত্র করে একটি কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা : বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে ব্যাবিলনের অবদান অপরিসীম। এই সভ্যতা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক এবং সমান গুরুত্বসম্পন্ন। ব্যাবিলন সাম্রাজ্যে প্রচলিত হাম্বুরাবির শাসনপদ্ধতি রোমান এবং আধুনিক পাশ্চাত্য আইনি ব্যবস্থাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন ব্যাবিলনে 'কিউনিফর্ম' (দ্র) অর্থাৎ কীলক-আকারের লিখনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতি প্রাচীন মিশরের 'চিত্রলিখন' পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নততর। পাথরে খোদাই করে, নতুবা মাটির তক্তির ওপর তিন কোণা কাঠি দিয়ে লেখা হত। পরে তা রোদে শুকিয়ে নাহয় আগুনে পুড়িয়ে টেকসই করে সংরক্ষণ করা হত। ব্যাবিলনের অধিবাসীরা প্রায় পাঁচ শ' অক্ষর ব্যবহার করত। এসবের বহু নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (দ্র) সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ব্যাবিলনীয়গণ অসংখ্য দেব-দেবীরও পূজা করত। সূর্যদেব মার্দুক ছিল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। এ ছাড়া অশরীরী প্রেতাত্মার শক্তিতে তারা বিশ্বাস করত। ভবিষ্যৎ গণনার ব্যাপারেও তারা অতীব পারদর্শী ছিল। ব্যাবিলনের বিখ্যাত 'শূন্য উদ্যান' পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের অন্যতম।

শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাবিলনীয়রা উন্নত ছিল। কাচ শিল্পের উন্নতিসাধন ও তার প্রসারেও তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। চিত্রাঙ্কনবিদ্যা, ভাস্কর্য, জ্যোতিষশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে (দ্র) তাদের অতুলনীয় পারদর্শিতা ছিল। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্পর্কেও তাদের জ্ঞানের সীমা বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সূর্য (দ্র) ও জলঘড়ির সাহায্যে তারা সময় নিরূপণ করত। বারো মাসে বছর গণনা, চার সপ্তাহে মাস, বারো ঘণ্টায় দিন এবং এক ঘণ্টাকে ষাট মিনিটে ভাগ করার প্রথম কৃতিত্ব ব্যাবিলনীয়দেরই। চন্দ্রগ্রহণ (দ্র) ও সূর্যগ্রহণ (দ্র) সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল যথাযথ। সেই সুদূর প্রাচীন কালেই ব্যাবিলনে ৫৫০ রকমের ঔষধের প্রচলন ছিল। বর্তমান কালের দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির (দ্র) গণনা ব্যাবিলন থেকেই প্রসার লাভ করে।

অ্যাসেরীয় সভ্যতা : মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশে অ্যাসেরীয়গণ প্রাধান্য বিস্তার করে। ক্যাসাইটদের আক্রমণে প্রাচীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে তারা এই সভ্যতার উত্তরাধিকার লাভ করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দের মধ্যেই অ্যাসেরীয়গণ সমগ্র উত্তর মেসোপটেমিয়া দখল করে নেয়। অ্যাসেরীয় সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আশুরবানিপাল (খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৮-৬২৬ অব্দ)।

অ্যাসেরীয়গণ মূলত ব্যাবিলনীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে তাদের নিজস্ব অবদানও কম নয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলাবিদ্যা, কারুশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক উদ্ভাবনী ক্ষমতার ছাপ সুস্পষ্ট।

সম্রাট আশুরবানিপাল্ রাজধানী নিনেভাহ্‌কে এমন সব জমকালো প্রাসাদ ও রাজপথ দ্বারা সুশোভিত করেন যে

www.pathagar.com

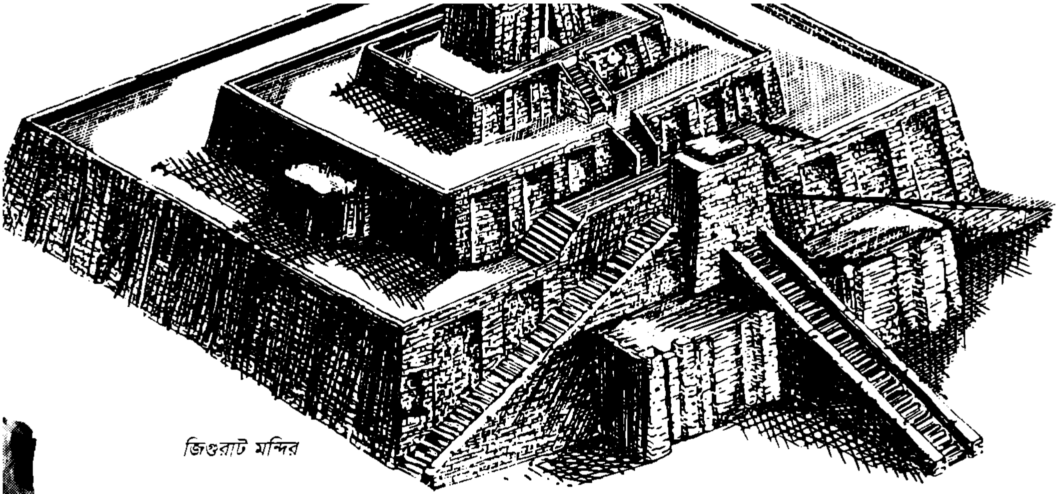

জিগুরাট মন্দির

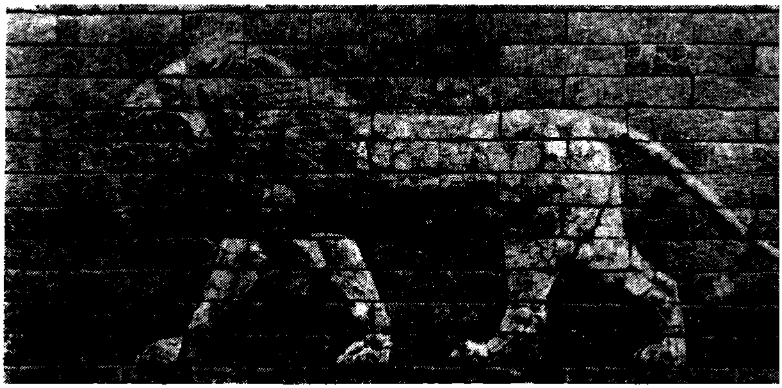

একটি ব্যাবিলনীয় শিল্পকর্ম (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

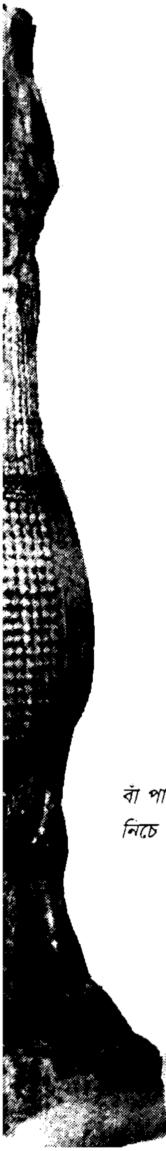

বাদ্যযন্ত্রের মাথায় কারুকাজ করা
গো-মুখ—মেসোপটেমীয় নিদর্শন

বাঁ পাশে : একটি অ্যাসেরীয় ভাস্কর্য (খ্রি. পূ. ৭১০ অব্দ)
নিচে : সুমেরীয়দের সোনার তৈরি শিরস্ত্রাণ (২৫০০ খ্রি.)

www.pathagar.com

তাকে 'সৌরকরোজ্জ্বল নগরী' নামে অভিহিত করা হত। তিনি নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। রাজধানী নিনেভাহ্‌কে তিনি শুধু সামরিক কেন্দ্রেই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও এক বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এমন এক বিশাল পাঠাগার সেমিটিক জগতে যা ছিল সর্ববৃহৎ ও সমৃদ্ধতম।

অ্যাসেরীয় সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত থাকলেও দাসদের অবস্থা মোটামুটি সম্পন্ন ছিল। তবে নারীসমাজের অধিকার নানাভাবে খর্ব করা হয়। এই সমাজেই প্রথম মেয়েদের পর্দাপ্রথার প্রচলন শুরু হয়েছিল। কেবল অভিজাত শ্রেণীর নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের অধিকারী ছিল। তাদের অনেকেই প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

অ্যাসেরীয়গণ প্রথম বৃত্তের ডিগ্রি নিরূপণ এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। জ্যোতির্বিদ্যার (দ্র) ক্ষেত্রে তাদের অবদান অতুলনীয়। তারাই প্রথম পাঁচটি গ্রহ (দ্র) আবিষ্কার করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান (দ্র), রোগ নির্ণয় ও প্রতিকারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

অ্যাসেরীয়দের বলা হয় 'এশিয়ার রোমান'। রোমানেরা যেমন গ্রিক সভ্যতা (দ্র)-কে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিল, অ্যাসেরীয়রাও একই ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে। তাদের সভ্যতার প্রভাব কম-বেশি বিশ্বের সকল জাতির ওপর পরিলক্ষিত হয়।

আ. হু.

মেহেরউন্নিসা জাহাঙ্গীর দ্র

মৈথিলী বিদ্যাপতি দ্র

মৈমনসিংহ গীতিকা

ময়মনসিংহ অঞ্চলের পালাগানগুলোকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে অভিহিত করা হয়। এগুলো ময়মনসিংহ অঞ্চলে লোকের মুখে-মুখে প্রচলিত ও প্রচারিত। এই গীতিকা ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (দ্র) সম্পাদনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ১৯৫৮ সালে প্রকাশ করেন। বর্তমান নেত্রকোণা জেলার অন্তর্গত আইথর নামক স্থানের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে এসব গাথা সংগ্রহ করেছিলেন। এই পালাগানগুলো হল : 'মহুয়া' (রচয়িতা দ্বিজ কানাই), 'চন্দ্রাবতী' (রচয়িতা নয়নচাঁদ ঘোষ), 'কমলা' (রচয়িতা দ্বিজ ঈশান), 'দস্যু কেনারামের পালা' (রচয়িতা চন্দ্রাবতী), 'কঙ্ক ও লীলা' (রঘুসুত, দামোদর, শ্রীনাথ বনিয়া ও নয়নচাঁদ ঘোষের ভণিতাযুক্ত), 'দেওয়ানা মদিনা' (রচয়িতা মনসুর বয়াতী) এবং 'মলুয়া', 'দেওয়ানা ভাবনা', 'রূপবতী' ও 'কাজলরেখা' (এগুলোর রচয়িতার নাম জানা যায় না)। এই ১০টি গাথা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে 'মহুয়া', 'দেওয়ানা মদিনা' ও 'মলুয়া' বিশেষভাবে সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই ১০টি গাথার কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এ ছাড়া নাটকীয়তাগুণ, করুণ রস ও কবিত্বময়তার জন্য উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত। কোথাও-কোথাও এসব পালাগান এখনো গাওয়া হয়। আধুনিক কালে এসব পালাগানের কোনো কোনোটি নাটক হিসাবে অভিনীত হয়ে শহুরে মানুষের মন জয় করেছে।

বি. ব.

মোজেস মুসা (আ.), হযরত দ্র

মোটর গাড়ি

বহুদিন ধরে মানুষ কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গাড়ি চালানো হচ্ছে। আগেকার দিনে ঘোড়ায় (দ্র) বাস টানত। এখনো পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশে ঠেলাগাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, উটে-টানা গাড়ি, কুকুরে-টানা স্লেজ (দ্র) গাড়ি, মানুষে বহনকারী পালকি প্রভৃতির প্রচলন আছে।

পরে অবশ্য মানুষ বিভিন্ন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল, যেমন— জলীয় বাষ্প, বিদ্যুৎ (দ্র), পেট্রোল, ডিজেল তেল ইত্যাদি ব্যবহার করে। এই সব শক্তিকে কাজে লাগাতে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ও গাড়ির প্রচলন হয়েছে। মোটর গাড়ি, মোটর সাইকেল, স্কুটার, বাস, ট্রাক ইত্যাদি চলে পেট্রোল ও ডিজেলের জোরে। যেমন— রেলগাড়ির (দ্র) ইঞ্জিন চলে বাষ্প, ডিজেল ও বিদ্যুৎ-শক্তিতে।

মোটর গাড়ির ইঞ্জিনকে অন্তর্দহন ইঞ্জিন (দ্র) বলা হয়। যেসকল ইঞ্জিনে সিলিণ্ডারের মধ্যে জ্বালানি (দ্র) পোড়ানো হয়, সেগুলোকে অন্তর্দহন ইঞ্জিন বলে। পৃথক চুল্লি এবং বয়লার না থাকায় এ ধরনের ইঞ্জিন আকারে অনেক ছোট হয়। এ ইঞ্জিন মোটর গাড়ি, লরি, উড়োজাহাজ এবং মোটর লঞ্চে ব্যবহৃত হয়। মোটর গাড়ির জ্বালানি হল পেট্রোল বা এ-জাতীয় তেল। মোটর গাড়িতে পেট্রোলের বাষ্প এবং বাতাসের মিশ্রণ দ্বারা যে বিস্ফোরক গ্যাসের সৃষ্টি হয় তা

www.pathagar.com

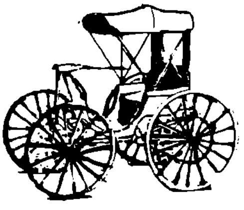

দুরিয়া—১৮৯৩

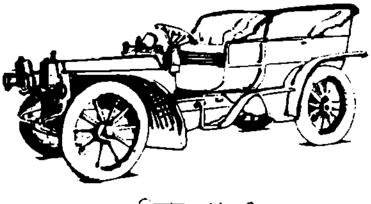

নেপিয়ার—১৯০৪

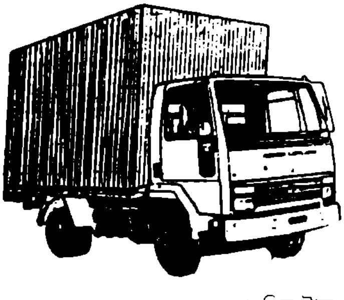

আধুনিক ট্রাক

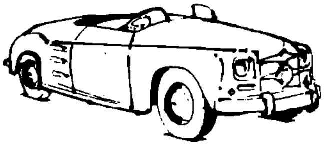

রোভার—১৯৫০

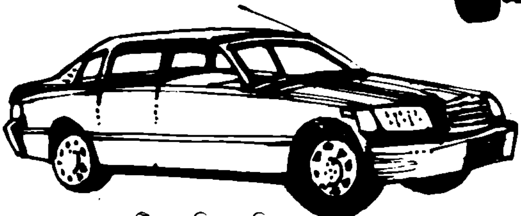

একটি আধুনিক গাড়ি

পিস্টন (দ্র)-গুলোকে চালায়। পিস্টনের শক্তিতে গাড়ির চাকা ঘোরে। প্রায় সকল অন্তর্দহন ইঞ্জিনই চারঘাত প্রণালীতে কাজ করে।

গট্‌লিব্‌ ডাইম্‌লার্‌ (Gottlieb Daimler : ১৮৩৪-১৯০০) এবং কার্ল্‌ বেন্‌ৎস্‌ (Karl Benz : ১৮৪৪-১৯২৯) নামে দুই জার্মান সর্বপ্রথম অন্তর্দহন ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। কার্ল্‌ বেন্‌ৎস্‌ ছিলেন সে যুগের এক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। তিনিই এই ইঞ্জিনচালিত মোটর গাড়ি উদ্ভাবন করেন ১৮৮৫ সালে। এর পর অবশ্য মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের এত বেশি উন্নতি সাধিত হয়েছে যে এটি একটি জটিল জিনিসে পরিণত হয়েছে। এখন দেখা যায় হরেক রকমের গাড়ি আর হরেক রকমের ইঞ্জিন। বর্তমানে মানুষের সব চাইতে বেশি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এই মোটর যান।

মু. এ.

মোতাহের হোসেন চৌধুরী [১৯০৩—১৯৫৬]

মননশীল ও উদার মানবতাবাদী চিন্তার ধারাবাহী প্রবন্ধকার। জন্ম নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুরে ১৯০৩ সালে। পেশাগত জীবনের সূচনা সরকারি কলেজের বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে। পরে ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' (দ্র) ও 'শিখা' (দ্র) গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রবন্ধে যুক্তিবাদ ও উদার মানবতাবাদী চিন্তার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল (দ্র) ও ক্লাইভ বেল-এর চিন্তাধারা দ্বারা তিনি প্রধানত অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর স্বরচিত রচনা স্বকীয়তায় ভাস্কর। কিছু কবিতারও তিনি রচয়িতা।

চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে চাকুরিরত অবস্থায় ১৯৫৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর প্রধানতম সাহিত্যকর্ম প্রবন্ধসঙ্কলন 'সংস্কৃতিকথা' (১৩৬৫ ব.)। এ ছাড়া বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'কঙ্কোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস'-এর ভাবানুবাদ 'সুখ' এবং ক্লাইভ বেলের 'সিভিলাইজেশন'-এর অনুসরণে লেখা 'সভ্যতা' অন্যতম।

আ. হু.

মোৎসার্ট্‌, ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ আমাডেউস্‌ [১৭৫৬—১৭৯১]

সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীত রচয়িতা। অস্ট্রিয়ার সাল্ট্‌স্‌বুর্গে মোৎসার্টের (Wolfgang Amadeus Mozart) জন্ম। পিতা লিওপোল্ড নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর সঙ্গীতক্ষমতা প্রকাশ পায়। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি নিজে থেকে পিয়ানো বাজিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয়। অল্প দিনের মধ্যেই মোৎসার্ট্‌ চমৎকার

www.pathagar.com

করে হার্পসিকর্ড বাজাতে শেখেন। সে সময় থেকে তিনি নিজেও সঙ্গীত রচনা করতে থাকেন। বারো বছর বয়স হতে না হতেই মোৎসার্ট্ স্বাধীনভাবে ও সুন্দর করে বেহালা (দ্র), অর্গ্যান (দ্র) প্রভৃতি যন্ত্র বাজাতে সমর্থ হন। তেরো বছর বয়সে তিনি ইতালি যান ও দু' বছর সেখানকার নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। সে সময় রোমের এক গির্জায় (দ্র) একটি ধর্মসঙ্গীত মাত্র একবার শুনেই সেটিকে নির্ভুলভাবে স্বরলিপিবদ্ধ করে সকলকে অবাক করে দেন। বয়স যখন তেরো তখনই মোৎসার্ট্ একটি অপেরা রচনা করেন। কিছু দিন সাল্‌ট্‌স্‌বুর্গের আর্চবিশপের বাড়িতে চাকুরি করতেও দেখা যায় তাঁকে। মোৎসার্ট্ ছাব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন। পরবর্তী পাঁচ বছরে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অধিকাংশই শেষ করেন। তাঁর বিখ্যাত অপেরা 'ম্যারেজ অব ফিগারো', 'দোন্ জিয়োভানি' সে সময়ের রচনা। বিবাহই মোৎসার্টের কাল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। সংসারখরচ চালাতে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। এত শ্রম তিনি সইতে পারতেন না। ধীরে ধীরে তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। ১৭৯১ সালে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে অভাব-অনটনে জর্জরিত মোৎসার্ট্ মারা যান। ভিয়েনার শহরতলিতে দরিদ্র ভিক্ষুকদের সমাধিস্থলে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয়। পরে তাঁর সমাধিটিকে সনাক্ত করা পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

পরবর্তী যুগের সকল সঙ্গীতরচয়িতাই মোৎসার্টের গভীর প্রশংসা করেছেন। ভাগ্‌নের (দ্র)-এর ধারণায় তিনি ছিলেন মহত্তম প্রতিভার অধিকারী। তাঁকে সঙ্গীতে শুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মোৎসার্টের নৃত্যনাট্য, যন্ত্রসঙ্গীত ও গান আজও পরম আদরে রূপায়িত করা হয়।

ক. গো.

মোনা লিসা (Mona Lisa)

বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর লেওনার্দো দা ভিঞ্চির (দ্র) অঙ্কিত একটি প্রতিকৃতি। এটি 'লা জিওকোন্দা' (La Gioconda) নামেও পরিচিত। প্যারিসের (দ্র) লুভ্‌র্ (দ্র) মিউজিয়ামে এটি সংরক্ষিত। ১৫০৩ থেকে ১৫০৫ সাল অর্থাৎ তিন বছর সময়সীমার মধ্যে এই চিত্র আঁকার কাজ শেষ হয়। অনেকে মনে করেন, এই চিত্র আঁকতে পাঁচ বছর লেগেছিল।

মোনা লিসা

লেওনার্দো দা ভি

বিশ্বের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে 'মোনা লিসা' একটি বিস্ময়কর ও কালজয়ী চিত্রকর্মরূপে বিবেচিত হয়। একে নিয়ে নানা কিংবদন্তিই শুধু প্রচলিত নয়, বিতর্ক ও গবেষণারও অন্ত নেই। 'মোনা লিসা'কে ঘিরে রহস্যময়তার পেছনে কাজ করেছে দুটো জিনিস। এক, মেয়েটির মুখের গড়নভঙ্গি ও হাসি; দুই, তার প্রতিকৃতির পেছনকার পটভূমি।

এই ছবির মডেল কে ছিলেন, তা নিয়েও নানা মত প্রচলিত। কারো মতে, ওটা আসলেই মোনা লিসা বা জিওকোন্দারই প্রতিকৃতি। কারো অভিমত, ওটা ডাচেস অব ফ্রাঙ্কাভিলা কোস্তান্‌জা দ্য আভালোস-এর। আবার কারো অভিমত, ওটা আসলে অন্য এক মহিলার। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি এ ছবি এঁকেছিলেন তাঁর সময়কার ধনকুবের গুইলিয়ানো দ্য মেদিচির জন্য। কিন্তু পাছে মেদিচির পূর্বপ্রণয়িনীর ছবি দেখে বর্তমান স্ত্রী ক্ষিপ্ত হন, সেই ভয়ে তিনি এটির কাজ শেষ হওয়ার পরও রেখে দেন ভিঞ্চির কাছে। অন্য পক্ষের মন্তব্য : ছবিটির মডেল কোনো মহিলা নয়, মহিলার বেশধারী এক জন পুরুষ।

কিন্তু লেওনার্দো-বিশেষজ্ঞদের শেষ অভিমত, এই প্রকৃতির মডেল আর কেউ নয়, ইতালির ফ্লোরেন্সের বিত্তবান নাগরিক ফ্রাঞ্চেস্‌কো দেল্ জিওকোন্দার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মোনা লিসা। ১৫০২ থেকে, মতান্তরে ১৫০৩ সাল থেকে,

www.pathagar.com

তাঁর প্রতিকৃতি আঁকার কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৫০৫ বা ১৫০৬ সালে।

১৫১৬ সালে দা ভিঞ্চিফ্রান্সে যান। সঙ্গে নিয়ে যান তাঁর নোটবইগুলো এবং ঐ প্রতিকৃতি 'মোনা লিসা'ও। ফ্রান্সের শাসক তখন বাইশ বছরের তরুণ যুবক প্রথম ফ্রান্সিস। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ওটা তাঁর কাছেই ছিল। প্রথম ফ্রান্সিসের অধিকারে 'মোনা লিসা' যায় দা ভিঞ্চির মৃত্যুর (২রা মে ১৫১৯) পর। সেখান থেকে পরে স্থান পায় লুভ্র্ মিউজিয়ামে।

'মোনা লিসা'র প্রতিকৃতি অঙ্কনের ঘটনা নিয়ে একটি বিখ্যাত জীবনীভিত্তিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। এটির রচয়িতা রুশ লেখক দ্‌মিত্রি মেরেজ্‌কোফ্‌স্কি। নাম 'লেওনার্দো দা ভিঞ্চির রোমান্স'। এ ছাড়া শুধু 'মোনা লিসা'র হাসি নিয়েও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বহু কবি রচনা করেছেন স্মরণীয় অনেক পঙ্‌ক্তি। তার হাসি আজ রহস্যময় অথচ অপরূপ সৌন্দর্যের এক প্রতীক ও উপমায় পরিণত।

১৯০৫ সালের মাঝামাঝি লুভ্র্ মিউজিয়াম থেকে রহস্যজনকভাবে চুরি হয়ে যায় 'মোনা লিসা'। এই চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত হন বিখ্যাত ফরাসি শিল্প-সমালোচক ও কবি গিওম্ আপলিন্যার। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়। জেল থেকে অবশেষে মুক্তি পান তিনি এবং রচনা করেন প্রবন্ধ 'আমার কয়েদি জীবন'। ১৯০৬ সালে চুরি যাওয়া 'মোনা লিসা' ছবিটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এরপর থেকে লুভ্র্ মিউজিয়ামের যে কক্ষে দা ভিঞ্চির আঁকা প্রতিকৃতি 'মোনা লিসা' সংরক্ষিত, সেখানে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ দর্শক লুভ্র্ মিউজিয়াম পরিদর্শন করে থাকেন কেবল 'মোনা লিসা'র প্রতিকৃতি এক নজর দেখার জন্য।

আ. হ.

মোপাসাঁ, গী দ্য [১৮৫০—১৮৯৩]

ফরাসি ছোটগল্পকার। মোপাসাঁকে (Guy de Maupssant) অপর দুই ফরাসি কথাসাহিত্যিক গুস্তাভ্ ফ্লোবের্ (দ্র) ও এমিল জোলার (দ্র) সার্থক উত্তরসাধক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয়, আধুনিক ছোটগল্পের (দ্র) জনক। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসাবেও তিনি সুপরিচিত।

জন্ম ১৮৫০ সালে ফ্রান্সের নর্মাঁদি-তে। সৈন্য বিভাগে কিছুকাল সক্রিয় দায়িত্ব পালনের পর সরকারি দফতরে কেরানির চাকুরি গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি গুস্তাভ্ ফ্লোবেরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকেই আয়ত্ত করেন সাহিত্যরচনার বাস্তব ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুপম রচনাশৈলী। কোনো কোনো সমালোচক মোপাসাঁকে বাস্তববাদের সর্বশেষ প্রবক্তা হিসাবেও উল্লেখ করে থাকেন।

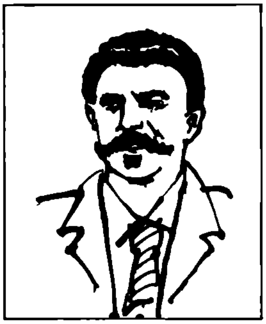

তাঁর জীবনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'দে ভের্স্' (Des Vers : ১৮৮০)—একটি কবিতার বই। তাঁর সাহিত্যগুরু ফ্লোবের এই গ্রন্থে পরিবেশিত কবিতাসমূহের প্রশংসা করলেও সাধারণ পাঠকেরা তেমনভাবে গ্রহণ করলেন না। ঐ একই বছর একটি সাহিত্য সাময়িকীতে তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্প 'বুল্ দ্য সুইফ্' (Boule de Suif) অর্থাৎ ট্যালো নৃত্য প্রকাশিত হলে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। ১৮৮৩ সালে তাঁর আরো একটি বিখ্যাত ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। নাম 'মাদ্‌মোয়াজেল ফিফি'। এই সময় তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাস 'একটি জীবন' (Une Vie) প্রকাশিত হয়। কিন্তু বইটি সরকারি রোষানলে পড়ায় সাধারণ পাঠকদের হাতে পৌঁছুতে পারে নি। এর পর তিনি লিখে যান একাদিক্রমে 'নেকলেস', 'মিস হ্যারিয়েট', ল্য ওর্লা', 'মৎস্য শিকার', 'মুখোমুখি দেখা', 'বসন্তকাল', 'চন্দ্রালোক' ইত্যাদি ছোটগল্প।

১৮৮৫ সালে তিনি রচনা করেন আরেকটি উপন্যাস 'বেল্-আমি'। গ্রন্থটি পাঠক কর্তৃক প্রশংসিত হলেও সমালোচকরা অভিমত দেন, মোপাসাঁ ছোটগল্পে যতখানি সূক্ষ্ম ও গভীর এবং ব্যঞ্জনাধর্মী, উপন্যাসে ততখানি নন।

১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সাল সময়সীমার মধ্যে মোপাসাঁ রচনা করেন তিন শ' ছোটগল্প, ছ'টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, কয়েকটি নাটক এবং একটি ভ্রমণকাহিনী। মোপাসাঁ নির্দিষ্ট কোনো নীতি বা মতবাদ অনুসারী লেখক না হলেও তাঁর অসাধারণ ও প্রখর জীবনবোধ মানবমনের গভীর ও গহনতম রাজ্যকে উদ্ভাসিত করেছে সত্যের আলোকে।

১৮৮৬ সাল থেকে অত্যধিক পরিশ্রম ও শৃঙ্খলাবিহীন

www.pathagar.com

জীবনযাপনের ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। প্রথমে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন, পরে উন্মাদব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শেষোক্ত ব্যাধি তিনি লাভ করেছিলেন পারিবারিক সূত্রে। তাঁর মায়েরও ছিল এই রোগ। রোগ থেকে মুক্তি পেতে সমুদ্র বিহারে যান মোপাসাঁ। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তিনি তাঁর জীবনের শেষ রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। নাম 'La Vie Errante' (লা ভিই এরঁৎ) অর্থাৎ 'ভ্রাম্যমাণ জীবন (১৮৯০)। এর পর তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র তিন বছর। মোপাসাঁ মারা যান ১৮৯৩ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে। জীবনের শেষ তিনটি বছর ছিল তাঁর বড় দুঃসহ। দৈহিক ও মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হয়েছিল পাগলাগারদে। বাংলাসহ বিশ্বের অধিকাংশ ভাষায় মোপাসাঁর রচনা অনূদিত ও বহুল পঠিত। বাংলা সাহিত্যের (দ্র) ছোটগল্পের প্রাথমিক বিকাশ ও ভিত্তি রচনায় তাঁর ছোটগল্পের অবদান ও প্রভাব অনস্বীকার্য।

আ. হ.

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী [১৯২৬—১৯৭১]

মননশীল প্রবন্ধকার, বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যের গবেষক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। জন্ম ১৯২৬ সালের ২২শে জুলাই নোয়াখালি জেলার খালিশপুরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে।

১৯৪৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে অনার্সসহ বি.এ., ১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতী (দ্র) থেকে 'সাহিত্যভারতী' ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৫৩ সালে বাংলায় এম. এ. পাশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে। আমৃত্যু তিনি ছিলেন এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে 'বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার' (১৯৬২), 'রবি পরিক্রমা' (১৯৬৩), 'সাহিত্যের নব রূপায়ণ' (১৯৬৯), 'রঙিন আখর' (১৯৬৩) এবং 'Colloquial Bengali' (১৯৬৩) প্রবন্ধ গ্রন্থ। গবেষণায় তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন ১৯৭১ সালে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দিন তিনেক আগে তিনি আল-শাম্‌স্ (দ্র) ও আল-বদর (দ্র) বাহিনীর সদস্যদের হাতে ধৃত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।

আ. হ.

মোম

কম গলনাঙ্ক (৪০°–৮০° সে.)-বিশিষ্ট এক রকম নরম পদার্থ। এটা উদ্ভিদ থেকে (যেমন কার্নুবা মোম) কিংবা প্রাণী থেকে (যেমন মৌচাকের মোম, ল্যানোলিন) সংগ্রহ করা যায়। এগুলো আসলে উঁচু ফ্যাটি অ্যাসিডের (দ্র) এস্টার। খনিজ মোমও পাওয়া যায়, যেমন—প্যারাফিন (দ্র); এটা পেট্রোলিয়াম (দ্র) পাতনের ফলে পাওয়া যায়।

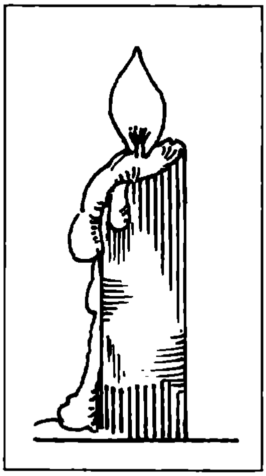

মোমবাতি, পালিশ, ছাঁচ, মডেল ইত্যাদি তৈরি করার জন্য মোম ব্যবহার করা হয়।

সা. এ.

মোর, সেন্ট টমাস ইউটোপিয়া ও কল্পস্বর্গ দ্র

মোর্স কোড আন্তর্জাতিক মোর্স কোড দ্র

মোল্লা নাসিরুদ্দিন নাসিরুদ্দিন মোল্লা দ্র

মোহন লাল [? – ১৭৫৭]

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার (দ্র) অত্যন্ত অনুগত, বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী। তাঁর আদিবাস ছিল কাশ্মীর। সিরাজ বাংলার নবাব হলে তাঁকে দেওয়ানখানার পেশকার পদে নিযুক্ত করেন এবং সেই সঙ্গে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। নিজের প্রতিপত্তিবলে পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা লাভে সক্ষম

www.pathagar.com

হন।

মণিহারির যুদ্ধে অসামান্য সমরনৈপুণ্য প্রদর্শন করে নবাবের বৈরী ভাবাপন্ন প্রতিপক্ষ পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে মোহনলাল জয়লাভ করেন। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে (দ্র) তিনি নবাবের পক্ষে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নবাবের এক আদেশে হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ হলে শত্রুপক্ষের হাতে বন্দি হয়ে নিহত হন বলে জানা যায়।

সুজ. ব.

মোহনা নদী দ্র

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ক্রীড়াসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা (১৮৬৮—১৯৬৮)

জন্ম হাকিমপুরগ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮৬৮ সাল। পিতা আলহাজ গাজী মওলানা আবদুল বারী ও মাতা বেগম রাবেয়া খাতুন। শৈশবে গ্রামের মক্তবে শিক্ষারম্ভ করে মাতা-পিতার নিকট কুরআন শরীফ (দ্র), বুস্তাঁ ও গুলিস্তাঁ অধ্যয়ন করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য পিতার সঙ্গে কলিকাতা (দ্র) ও পাটনায় প্রায় তিন বছর কাটিয়ে হাকিমপুরে প্রত্যাবর্তনের পর একই দিনে কলেরা রোগে মাতা-পিতাকে হারান। তারপর মাতামহের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আশৈশব অনুরাগবশত ইংরেজি স্কুল ছেড়ে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (দ্র) অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের (দ্র) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯১০ সালে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' প্রকাশ করেন। তারপর ১৯২১ সালে উর্দু 'জামানা' ও বাংলা 'দৈনিক সেবক' প্রকাশ করেন। সেবক পত্রিকায় প্রকাশিত নির্ভীক মতামতের জন্য এক বছর কারাবরণ করেন। কারাবাস কালে আমপারার বাংলা অনুবাদ করেন।

মুসলিম সমাজকে জাগাবার জন্য ১৯৩৬ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'দৈনিক আজাদ' প্রকাশ করেন। এ সময় থেকে পাকিস্তান আন্দোলনকে (দ্র) সফল করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হলে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৬২ সালে আবার দৈনিক আজাদের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হল: 'সমস্যা ও সমাধান', 'আমপারার বাংলা অনুবাদ', 'মোস্তফা-চরিত', 'মোস্তফা-চরিতের বৈশিষ্ট্য', 'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম', 'মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাস', 'তফসীরুল কোরআন '(৫ খণ্ড)। তাঁর জ্ঞানগর্ভ সম্পাদকীয় ও অগ্নিস্রাবী বক্তৃতা এ দেশের মানুষের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মৃত্যু ঢাকায় (দ্র), ১৮ই আগস্ট ১৯৬৮।

বি. ব.

মোহাম্মদ ছগীর শাহ শাহ মোহাম্মদ সগীর দ্র

মোহাম্মদ জাকারিয়া [১৯২৩—১৯৯০]

শক্তিমান অভিনেতা ও টেলিভিশন প্রযোজক। তিনি ১৯২৩ সালে বীরভূম জেলার সেকেড্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের একটি মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষে মল্লারপুর ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। পরে বীরভূম জেলার সিনিয়র বেণীমাধব ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হয়ে সেখান থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। আই. এ. ক্লাশে ভর্তি হন হেতমপুর কলেজে। এখানে অধ্যয়নকালে তিনি বামপন্থী রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন।

এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে মোহাম্মদ জাকারিয়া শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটিয়ে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে চাকুরি গ্রহণ করেন। যুদ্ধশেষে তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন এবং এর উদ্যোগে মঞ্চস্থ বিজন ভট্টাচার্যের (দ্র) 'নবান্ন' নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৪৮ সালে বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক শম্ভু মিত্র এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (মহর্ষি) উদ্যোগে 'বহুরূপী' নামে একটি নতুন নাট্যসংস্থার গঠনেও তিনি সবিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। মোহাম্মদ জাকারিয়া 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম।

সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যদল হিসাবে খ্যাত এই দলের উদ্যোগে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হয়, তার অধিকাংশ নাটকেই

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর এই সময়কার অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নবান্ন', 'পথিক', 'ছেঁড়া তার' ও রবীন্দ্রনাথের (দ্র) 'রক্তকরবী' ইত্যাদি।

১৯৬০-৬১ সালে 'বহুরূপী' ছেড়ে তিনি কলিকাতার (দ্র) 'থিয়েটার সেন্টার' নাট্যদলে যোগ দেন। এখানে তিনি অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ জাকারিয়া ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ঢাকায় আসেন। এখানে এসে প্রথমে তিনি চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঢাকা টেলিভিশনের প্রযোজক হিসাবে যোগ দেন। এখানে পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে তিনি যেমন বহু নাটকে অভিনয় করেন, তেমনি প্রযোজনাও করেন বহু অনুষ্ঠান ও নাটক।

১৯৭২ সালে তিনি যোগ দেন দেশের বিখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'থিয়েটার'-এ। এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতিও তিনি। ১৯৮১ সালে তিনি টেলিভিশনের সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালের পর থেকে শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি মঞ্চ কিংবা টেলিভিশনে অভিনয় করতে পুরোপুরি অক্ষম হয়ে পড়েন।

মোহাম্মদ জাকারিয়া বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেন। এসব দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাপান (দ্র), মালয়েশিয়া ও বার্মা (দ্র)।

তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য মঞ্চ-নাটক 'সুবচন নির্বাসনে', 'চারিদিকে যুদ্ধ', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'দুই বোন', 'সেনাপতি', 'ওথেলো', 'এখানে এখন', 'ম্যাকবেথ' ও 'এখনও ক্রীতদাস' ইত্যাদি। এসব নাটকের অধিকাংশই 'থিয়েটার' নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত। তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পথিক', 'বাহানা', 'বেগানা' ও বেহুলা'।

মোহাম্মদ জাকারিয়া তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ যেসব পুরস্কার লাভ করেন, সেগুলো হচ্ছে : 'একুশে পদক' (দ্র), 'শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার', 'মুনীর চৌধুরী সম্মান পদক' ও 'টেনাশিসাস পুরস্কার' ইত্যাদি।

তিনি নাট্যতত্ত্ব বিষয়ক একটি গ্রন্থ ও বেশ কিছু প্রবন্ধেরও রচয়িতা।

শক্তিমান এই অভিনেতা ঢাকায় ১৯৯০ সালের ৪ঠা এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন [১২৯৫—১৪০১ ব.]

মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং বিশিষ্ট সম্পাদক। জন্ম বাংলা ১২৯৫ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ বর্তমান চাঁদপুর জেলার পাইকারদী গ্রামে।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন নানা কারণে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পান নি। পিতার আকস্মিক মৃত্যু অন্যতম। ফলে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নি। পিতার অবর্তমানে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে।

পেশাগত জীবনে প্রথমে তিনি স্বল্প বেতনে স্টিমার কোম্পানির স্টেশন মাস্টারের সহকারী এবং পরে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। শেষোক্ত পেশার সুবাদে তাঁর জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। শিক্ষাদীক্ষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতা তাঁকে সর্বদাই পীড়িত করত। তাই ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা (দ্র) থেকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগ ও সম্পাদনায় প্রকাশ করেন 'মাসিক সওগাত' পত্রিকা। এই পত্রিকাকে ঘিরে সূচিত মুসলমান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সাহিত্য-আন্দোলনকেই পরবর্তী কালে 'সওগাত যুগ' বলে অভিহিত করা হয়।

তৎকালীন গোঁড়া ও অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে 'সওগাত'- সম্পাদক নাসিরউদ্দীনের ভূমিকা ছিল সাহসী পথিকৃতের। সওগাতের পাতায় তিনি দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিক মনীষীবৃন্দেরই শুধু নয়, বিদূষী মহিলাদেরও ছবি, কার্টুন এবং চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি প্রকাশ করতেন। কেবল সচিত্র 'মাসিক সওগাত' প্রকাশ করেই তিনি থেমে থাকেন নি, ১৯৩৩ সালে প্রকাশ করেন 'বার্ষিক সওগাত', একই বছর স্থাপন করেন 'সওগাত কালার প্রিন্টিং প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা এবং সূচনা

www.pathagar.com

করেন 'সওগাত সাহিত্য মজলিস'-এর, যা ক্রমে হয়ে ওঠে মুসলমান কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদার সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য বিষয়ক আলাপ-আলোচনার মিলনকেন্দ্র স্বরূপ। ১৯৩৭ সালে নাসিরউদ্দীনের একান্ত উদ্যোগে কবি কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) 'সওগাত সাহিত্য মজলিস'-এর সঙ্গে যুক্ত হলে তাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। বাংলা ১৩৩৬ সনের ২১শে অগ্রহায়ণে নাসিরউদ্দীনের উদ্যোগে কলিকাতার এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয়ভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সংবর্ধনাসভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (দ্র)। নজরুলের বেশ কিছু বিখ্যাত কবিতা নাসিরউদ্দীনের 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়।

নাসিরউদ্দীন ছিলেন অক্লান্ত সংগঠক-সম্পাদক। 'মাসিক সওগাত-'এর পর তিনি একাদিক্রমে প্রকাশ করেন 'সাপ্তাহিক সওগাত' (১৯৩৪), 'সচিত্র মহিলা সওগাত' (১৯৩৭), 'শিশু সওগাত' এবং ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করেন সচিত্র সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকা। শেষোক্ত পত্রিকার প্রকাশনা এখনো অব্যাহত আছে। ১৯৫০ সালে 'সওগাত' ও 'বেগম' পত্রিকা কলিকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। উল্লেখ্য, সেকালেই 'শিশু সওগাত'-এর প্রচারসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২২ হাজার কপি।

নাসিরউদ্দীনের আরেকটি বিশেষ কৃতিত্ব এখানে যে তাঁর উদার সহযোগিতা-সমর্থন লাভ করেই একাধিক মুসলমান কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক 'সওগাত-'এ কাজ করার সুযোগ লাভ করেন এবং এখান থেকেই তাঁদের সাংবাদিকতা ও সম্পাদনায় হাতেখড়ি হয়।

১৯৮৯ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে তাঁর জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতীয়ভাবে সংবর্ধিত করা হয়। শুধু তাই নয়, জীবিতকালেই তিনি তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একুশে পদক (দ্র), স্বাধীনতাদিবস পুরস্কার, বাংলা একাডেমীর সম্মাননা পুরস্কার এবং ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পদক। এ ছাড়া তিনি ছিলেন বাংলা একাডেমীর (দ্র) ফেলো এবং জাতীয় যাদুঘর (দ্র) ও নজরুল ইনস্টিটিউটের (দ্র) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান।

১৯৭৬ সাল থেকে কবি-সাহিত্যিকদের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে তাঁর নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ' এবং 'সওগাত যুগে নজরুল'।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১০৫ বছর বয়সে ১৯৯৪ সালের ২১শে মে (৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০১) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ বরকতুল্লাহ্, মোহাম্মদ দ্র

মোহাম্মদ মোদাব্বের [১৯০৮—১৯৮৪]

১৯০৮ সালের ৬ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে স্যার আর. এন. মুখার্জি বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এর পর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময় কারাবাস করেন। চাচার নিকট সাংবাদিকতায় প্রেরণা লাভ করেন এবং ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক ও দৈনিক 'দ্য মুসলমান' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। ১৯৩৩ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর (দ্র) 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ সালে দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় বার্তা-সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালে 'বাগবান' রূপে ছোটদের বিভাগ 'মুকুলের মহফিল' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবৎসর শিশুসংগঠন 'মুকুল ফৌজ' গঠন এবং সারা বাংলায় 'বাগবান' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এ যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় আগমন এবং ঐ মাসেই নিজের সম্পাদনায় ১৫ই আগস্ট (৩০শে শ্রাবণ ১৩৫৯) 'পাকিস্তান' নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক 'মিল্লাত' প্রকাশিত হলে তিনি তাঁর প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। তৎকালীন পাকিস্তান রেডক্রস পরিচালিত মাসিক 'জুনিয়র রেডক্রস' (জানুয়ারি ১৯৫৮) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'মুকুল' (ডিসেম্বর ১৯৪৮)-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মোদাব্বের সাংবাদিক হিসাবে যত পরিচিত, ততোধিক পরিচিত শিশুসাহিত্যিক হিসাবে। শিশুদের জন্য তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বই : 'হীরের ফুল' (১৯৩০), 'তাকডুমাডুম' (১৯৩০), 'মিসেস লতা সান্যাল ও আরও অনেকে' (১৯৩৩), 'কিস্‌সা শোন' (১৯৫০), 'ডানপিটের দল' (১৯৬২), 'গল্প শোন' (১৩৭১ ব.) ইত্যাদি। ভ্রমণকাহিনী : 'জাপান ঘুরে এলাম' (১৯৫৯), 'প্রবাল দ্বীপে' (১৯৬৪)। স্মৃতিকথা : 'সাংবাদিকের রোজনামচা' (১৯৭৭)। জীবনী : 'আনলো যারা জীয়নকাঠি'(১৯৪৬); সাধারণ জ্ঞান : 'সন্ধানী আলো' (১৯৪৩)। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় 'জমজম' নামের এক শিশু-পত্রিকায় ১৯৩০–৩১ সালে।

মোহাম্মদ মোদাব্বের ১৯৬৫ সালে শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) এবং ১৯৭৯ সালে 'একুশে পদক' (দ্র) লাভ করেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ২১শে এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

শা. হ.

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, সিপাহি বীরশ্রেষ্ঠ দ্র

মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ইঞ্জিনরুম আর্টফিসার বীরশ্রেষ্ঠ দ্র

মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, সিপাহি বীরশ্রেষ্ঠ দ্র

মোহাম্মদী

সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে 'মোহাম্মদী' রেখে গেছে এক কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়। এই পত্রিকাটি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এমনকি বার্ষিক হিসাবেও প্রকাশিত হয়েছে এবং পরে আবার মাসিক রূপে প্রকাশিত হয়ে সবশেষে লুপ্ত হয়েছে। দৈনিক আজাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁর (দ্র) সম্পাদনায় 'মোহাম্মদী' ১৯০৩ সালের ১৮ই আগস্ট কলিকাতায় (দ্র) আত্মপ্রকাশ করে। তখন এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হিসাবে অন্য এক জনের নাম দেখা যায়। মোহাম্মদ আব্বাস আলী কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুনশী করিম বক্‌স কর্তৃক ১ হক লেন, তাঁতিবাগান, কলিকাতা থেকে মুদ্রিত 'মোহাম্মদী'র সম্পাদক ছিলেন অবশ্য আকরম খাঁ-ই। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী'র আকার ছিল ডিমাই ১/১২, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০ এবং দাম চার আনা বা পঁচিশ পয়সা। প্রথম সংখ্যাটি ছাপা হয় ৫০০ কপি। দ্বিতীয় সংখ্যাতেই স্বত্বাধিকারী হন হাজী আবদুল্লা। তখন ২৬ হক লেন, কলিকাতা থেকে এর প্রকাশনা শুরু হয়। দ্বিতীয় সংখ্যায় পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে ৩৬ হয়।

এ সময় 'মোহাম্মদী'র যে ধর্মসংখ্যাটি বের হয়, তার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৬৭। কিন্তু পাতা বাড়ালেও পত্রিকা চলে নি বলে মনে হয়। কেননা তৃতীয় সংখ্যা থেকেই পত্রিকা ছাপা হয়েছে ৪০০ কপি করে। ধর্মসংখ্যা থেকে পত্রিকার দামও কমিয়ে তিন আনা করা হয়। 'মোহাম্মদী'র ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালের জানুয়ারিতে। ১৯২৭ সালের ৬ই নভেম্বর 'মাসিক মোহাম্মদী' আবার নতুনভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক থেকে যান আকরম খাঁ-ই। তবে তা খায়রুল আনাম খাঁ কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা থেকে তখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছিল। এবার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, দাম সাড়ে চার আনা এবং মুদ্রণসংখ্যা ৪০০০। পরে মোহাম্মদী কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় কলিকাতার ৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে। এভাবে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশনার একুশ বছরে পদার্পণ করে। কিন্তু একবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা (কার্তিক ১৩৫৪) বের হবার পর দু'বছরের জন্য কাগজটি বন্ধ থাকে। উল্লেখ্য, ১৯০৮ সালে ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা থেকে 'মোহাম্মদী' সাপ্তাহিকরূপেও প্রকাশিত হয়। এটি পরবর্তী পর্যায়ে নাজির আহমেদ চৌধুরী এবং তারপর খায়রুল আনাম খাঁ সম্পাদনা করেন। ১৯২২ সালে মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় দৈনিক 'মোহাম্মদী' প্রকাশিত হয়। তবে এ দৈনিক বেশি দিন টেকে নি। ১৯২৭ সালের ৬ই নভেম্বর মাসিক সাহিত্যপত্র হিসাবে 'মোহাম্মদী' নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। এ সময় পত্রিকার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল : 'অন্যতম উদ্দেশ্য, আধুনিক যুগোপযোগী করে ইসলাম (দ্র) ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান।' ধর্মীয় ও সামাজিক বিতর্কে সাধারণত মধ্যপন্থা অবলম্বন করত এ পত্রিকা। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্পষ্টতই উদার ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দিত। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বার্ষিক মোহাম্মদী সাহিত্যপত্র' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম। পাকিস্তান (দ্র) হবার পরও ভারত (দ্র) তথা কলিকাতায় 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র প্রকাশ অব্যাহত ছিল।

'মোহাম্মদী' ছিল 'দৈনিক আজাদ' গ্রুপের কাগজ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পর মওলানা আকরম

www.pathagar.com

খাঁ তখনকার পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় (দ্র) চলে আসেন এবং একবিংশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) থেকে ঢাকার ঢাকেশ্বরী রোড থেকে 'মাসিক মোহাম্মদী' আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'দৈনিক আজাদ'ও ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। এখন পর্যন্ত এর প্রকাশ অব্যাহত আছে, তবে 'মোহাম্মদী' বন্ধ হয়ে গেছে।

আ. কা.

মৌমাছি

মৌমাছি উপকারী পতঙ্গ। পৃথিবীতে (দ্র) প্রায় ২০ হাজার প্রজাতির মৌমাছি আছে। বেশির ভাগ প্রজাতিই মধু (দ্র) ও মোম (দ্র) উৎপাদনে অক্ষম। বাংলাদেশে মধু উৎপাদনকারী তিনটি প্রজাতি রয়েছে। এরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহের সময় ফুলের পরাগায়ণেও সাহায্য করে।

মৌমাছির দেহ মাথা, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত। এদের পা তিন জোড়া ও পাখা দু' জোড়া। লম্বায় ১.৩-১.৯ সেন্টিমিটার। মধু উৎপাদনকারী প্রজাতিগুলো সামাজিক। এরা মৌচাক তৈরি করে বাস করে। মৌচাকে একটি রাণী, ২০০ থেকে ৩০০ পুরুষ এবং ৫০ থেকে ৮০ হাজার পর্যন্ত কর্মী থাকতে পারে।

কর্মীদের তুলনায় রাণী প্রায় ২.৫ গুণ লম্বা ও ২.৮ গুণ ভারি। রাণী প্রতিদিন ১,০০০-৩,৫০০ নিষিক্ত ও অনিষিক্ত ডিম পাড়ে। অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ এবং নিষিক্ত ডিম থেকে রাণী বা কর্মী মৌমাছি জন্মায়। পুরুষগুলো আলসে প্রকৃতির। কর্মীরা চাক বানানো, মোম তৈরি, মধু সংগ্রহ,

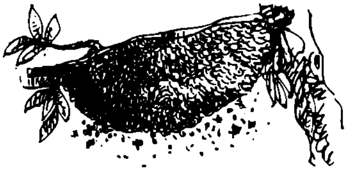

বাচ্চা পালন ইত্যাদি কাজ করে।

এদের জীবনচক্র অন্যান্য পতঙ্গের মতোই। ডিম ফুটে পর্যায়ক্রমে শূককীট, মূককীট ও পূর্ণাঙ্গ মৌমাছির জন্ম হয়। প্রাপ্তবয়স্ক হলে রাণী মৌমাছি পুরুষের সঙ্গে বাইরে বেরোয়, উড়ন্ত অবস্থায় প্রজনন করে। এর পর পুরুষগুলো মারা যায়। রাণী ৫-৮ বছর বাঁচতে পারে। কর্মীরা ১-৩ বছর বাঁচে।

আ. ন. ম. আ. র.

মৌর্যবংশ

মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তাঁর শাসনকাল ৩২৪-৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তাঁর জন্ম, বংশ ও বাল্যকাল সম্পর্কে কিংবদন্তি আছে যে মুরা নাম্নী এক শূদ্র নারীর গর্ভে তাঁর জন্ম। গ্রহণযোগ্য অভিমত এই যে মৌর্য নামক এক ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরামর্শদাতা, প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কৌটিল্যের (দ্র) মন্ত্রণায় ও নিজ বাহুবলে তিনি ভারতবর্ষের বুক থেকে বিদেশী গ্রিক শক্তিকে বিতাড়িত করেন। এ ছাড়া দেশীয় নন্দ রাজকে পরাভূত করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মৌর্যসিংহাসনে আসীন হন। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ৩০০-২৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না।

চন্দ্রগুপ্ত

বিন্দুসার

সম্রাট অশোক

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক (দ্র) মৌর্যসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ২৭২-২৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তিনি মৌর্যবংশ তথা প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ৩৬

www.pathagar.com

বছর রাজত্ব করেন। সিংহাসন লাভের বারো বছর পর কলিঙ্গ যুদ্ধে অসংখ্য জীবনহানির ঘটনায় তিনি মর্মাহত হন এবং বৌদ্ধধর্ম (দ্র) গ্রহণ করে অহিংস নীতির অনুসারী হন। তাঁর আমলে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যবংশ ক্রমে হীনবল হতে থাকে এবং এই বংশের শেষ নরপতি বৃহদ্রর্থ নিজ সেনাপতি কর্তৃক নিহত হওয়ার পর মৌর্যশাসনের সমাপ্তি ঘটে। মৌর্যবংশের শাসনামলে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির চরম বিকাশ সাধিত হয়।

মু. মা.

মৌল

মৌলিক পদার্থ। সকল পদার্থই পরমাণুর (দ্র) সমবায়ে গঠিত। যেসব পদার্থ একই প্রকার পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, তাদের বলে মৌলিক পদার্থ বা মৌল। রাসায়নিক বা অন্য কোনো প্রকার বিশ্লেষণ দ্বারা এসব পদার্থে ভিন্ন ধরনের পরমাণু পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌল আছে যেগুলো প্রকৃতিতে সহজে পাওয়া যায়। এ ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে আরো প্রায় এক ডজন অস্থায়ী মৌল সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অতএব সব মিলিয়ে শতাধিক মৌল পৃথিবীতে আছে। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ এইসব মৌলিক পদার্থের সমবায়ে গঠিত। দুই বা ততোধিক মৌলের সমবায়ে যে বস্তু তৈরি হয় তাকে বলা হয় যৌগ। কঠিন, তরল এবং বায়বীয় এই তিন অবস্থাতেই মৌলিক পদার্থ রয়েছে।

সু. ব.

মৌলবাদ

মৌলবাদ শব্দটি ইংরেজি fundamentalism (ফাণ্ডামেণ্টালিজ্ম্) শব্দের অনুবাদ। ফাণ্ডামেণ্টাল অর্থ মৌল, মৌলিক বা মূলজাত। সে জন্যই ফাণ্ডামেণ্টালিজ্ম্ শব্দের বাংলা সঠিকভাবেই 'মৌলবাদ' হয়েছে। এই যে বলা হল 'মূলজাত' অর্থাৎ মূল থেকে, শিকড় উৎপন্ন হয়েছে, সেই 'মূল' কী ? মূল হচ্ছে ধর্ম। অর্থাৎ আদি থেকেই ধারণাটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। আর সে ধর্ম হল খ্রিস্টধর্ম (দ্র)। খ্রিস্টান জগতে মৌলবাদ নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে তা চালু ছিল। তর্কের শিকড় একটি জায়গায় : বাইবেলে যা লেখা আছে সে সব অক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে মান্য করতে হবে, নাকি পরিবর্তিত পৃথিবীর বাস্তব প্রেক্ষাপট ও মানব-ইতিহাসের অগ্রগতির নিরিখে এবং যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর মান্য করতে হবে ? মৌলবাদীরা আক্ষরিক অর্থের সব কিছু গ্রহণ করে থাকেন। তবে বর্তমান অবস্থা এ রকম— পশ্চিমী দুনিয়ায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিজ্ঞানচিন্তার প্রসার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, দর্শন বিষয়ে নতুন মত ও পথ, ধর্ম ও মানব-কল্যাণের পারস্পরিক সম্পর্কে বিশ্বাস, নানাবিধ সমাজসংস্কার, গণতান্ত্রিক ধারণার চর্চা, ব্যক্তিমানুষের নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন ইত্যাদি এত ঘটনাপ্রবাহ অবিরাম ঘটে গেছে যে সেই স্রোতে ধর্মীয় মৌলবাদের তর্কবিতর্ক কখন ভেসে গেছে কেউ লক্ষ করে নি।

কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে মৌলবাদ নতুনভাবে তৈরি হয়েছে। এবং সেসব দেশে বিষয়টি শুধু ধর্মের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নেই, রাজনীতির সঙ্গে তাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সন্ত্রাস, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও চণ্ডনীতির চূড়ান্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মৌলবাদ। এখন মৌলবাদের রাজনৈতিক রূপের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল।

ইরানে, পাকিস্তানে (দ্র), বাংলাদেশে (দ্র), ভারতে (দ্র), আমেরিকায় (দ্র), জাপানে (দ্র) বা আরো কোনো কোনো দেশে ইসলামী মৌলবাদ, হিন্দু মৌলবাদ, খ্রিস্টান মৌলবাদ, বৌদ্ধ মৌলবাদ ইত্যাদি যেন নতুনভাবে জেগে উঠে মানবতা ও বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হা. মা.

মৌসুমী প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (দ্র) আয়োজিত ২য় বৃহত্তম শিশু সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। বর্ষাকালে শিশুদের ব্যস্ত রাখা এবং তাদের মধ্যে দলগত সমঝোতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৌসুমী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার বিষয় বিতর্ক, জারিগান ও জ্ঞান-জিজ্ঞাসা।

থানা পর্যায় থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রথম স্থান অধিকারী দল জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন করে। জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ দল বিভাগীয় পর্যায় পার হয়ে চূড়ান্ত বা জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণের জন্য

www.pathagar.com

মনোনীত হয়। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

খু. জা.

মৌসুমী বায়ু

আরবি (দ্র) ভাষায় 'মওসুম' শব্দের অর্থ ঋতু (দ্র)। ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে-বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় তাকে মৌসুমী বায়ু বলে। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের ফলে শীত-গ্রীষ্মে ঋতুভেদে স্থলভাগ ও জলভাগের তাপের তারতম্য ঘটে। সেই জন্য মৌসুমী বায়ুর সৃষ্টি হয়। এশিয়ার (দ্র) দক্ষিণ ভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি (দ্র) রেখা অতিক্রম করেছে। গ্রীষ্মকালে সূর্য (দ্র) কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়, ফলে দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের কেন্দ্রভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। তখন এ অঞ্চলে একটি সুবৃহৎ নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় দক্ষিণ গোলার্ধের ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে আগত দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু নিরক্ষরেখা (দ্র) পার হয়ে ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এই জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নামে পরিচিত। ইন্দোচীন (দ্র), জাপান (দ্র), চীন (দ্র) এবং তাইওয়ানে মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয় বলে একে দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলে। উভয় মৌসুমী বায়ু সমুদ্র থেকে পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এবং স্থলভাগে প্রবেশ করে পাহাড়-পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে (দ্র), আসাম ও মায়ানমারে (দ্র) প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে চীন, জাপান, কোরিয়া, ইন্দোচীন উপদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়।

শীতকালে সূর্য মকরক্রান্তি (দ্র) অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে সমুদ্রের উপর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তখন এশিয়ার স্থলভাগ থেকে উচ্চ চাপের শীতল বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলে। মৌসুমী বায়ু আরো দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে বাঁ দিকে বেঁকে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুরূপে অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) দিকে প্রবাহিত হয়।

শীতের মৌসুমী বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে এই বায়ুতে জলীয় বাষ্প না থাকায় সাধারণত এই বায়ুপ্রবাহের ফলে বৃষ্টিপাত হয় না। তবে এই বায়ুপ্রবাহ বঙ্গোপসাগরের (দ্র) উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে যায়। ফলে এই বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা (দ্র) প্রভৃতি স্থানে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়।

মু. এ.

ম্যাগ্না কার্টা (Magna Carta)

১২১৫ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা জন সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইতিহাসে এই চুক্তি 'ম্যাগ্না কার্টা' নামে পরিচিত। সেকালে রাজা প্রায়ই যা খুশি তাই করতে পারতেন। এই চুক্তি রাজার স্বেচ্ছাচারের অধিকার কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ রাজাকেও হতে হয়েছিল নিয়মের অধীন।

ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ইতিহাসে ম্যাগ্না কার্টা প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, রাজা প্রতিনিধিস্থানীয় লোকদের অনুমোদন ছাড়া কারো স্বাধীনতায় বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এই চুক্তির সুপ্রভাব শুধু ইংল্যাণ্ডেই নয়, অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতালিপ্সু রাজা সহজে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চান নি। কিন্তু সকল সামন্ত মিলে রাজা জনকে লণ্ডনের (দ্র) কাছে এক দ্বীপে বন্দি করে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি বিচার বিভাগকেও অনেকটা নিরপেক্ষ করেছিল।

আ. মা.

ম্যাগ্সেসে পুরস্কার

ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রামেন (Ramón Magsaysay : ১৯০৭-৫৭) ম্যাগ্সেসের স্মরণে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৫৮ সাল থেকে ফিলিপাইন সরকার এই পুরস্কার দিয়ে আসছে। মানবকল্যাণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের মান একটি স্বর্ণপদক ও ২০ হাজার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের ড. মুহম্মদ ইউনুস, ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী ও বেগম তাহরুন্নেসা আব্দুল্লাহ্ এই পুরস্কার পেয়েছেন।

খু. জা.

ম্যাঙ্গ্রোভ্ গরান-বন দ্র

ম্যাটসিনি মাৎসিনি, জুসেপ্প দ্র

www.pathagar.com

ম্যাডোনা (madonna)

যিশুজননী কুমারী মেরি, বিশেষ করে ভাস্কর এবং চিত্রকরদের গড়া ও আঁকা তাঁর মাতৃমূর্তি বা ছবি। শব্দটি ইতালীয়, উচ্চারণ 'মাদোনা', তবে বাংলাতে ইংরেজি ভাষার অনুকরণে সকলেই 'ম্যাডোনা' বলে থাকেন।

খ্রিস্টধর্ম (দ্র) প্রবর্তিত হওয়ার আগে চিত্রশিল্পের সূতিকাগার ইতালিতে চিত্রশিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। তবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর সমগ্র খ্রিস্টান জগৎসহ ইতালিতেও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেই চিত্রাঙ্কন বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ এক হাজার বছর ধরে এমনটা চলে।

এর পর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থেই গির্জার (দ্র) দেয়ালে দেয়ালে ও সিলিংএ বাইবেলের (দ্র) কাহিনী ও চরিত্রভিত্তিক ছবি আঁকার কাজ শুরু হয় এবং এসব ছবি সাধারণ মানুষ খুবই ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করলে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সমগ্র খ্রিস্টানজগৎ, বিশেষত ইতালিতে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যশিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। ম্যাডোনা বা যিশুজননীকে নিয়ে এ পর্যন্ত বিশ্বের বহু শিল্পী ও ভাস্কর ছবি এঁকেছেন, মূর্তি গড়েছেন। এদের অনেকগুলোই কালোত্তীর্ণ শিল্পকর্মের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

'জননী ও শিশু' শিরোনামে রেনেসাঁস (দ্র) যুগেও বহু ছবি আঁকা হয়। তবে ইতালির বিখ্যাত চিত্রকর জত্তো কুমারী মাতা মেরিকে প্রথম রক্ত-মাংসের মানবীরূপে আঁকেন। জত্তোর প্রায় এক শ' বছর পর পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রী মাজাচ্চো (১৪০১-১৪২৮) রঙ-তুলি সহযোগে ত্রিমাত্রিকতাময় অঙ্কনরীতিতে 'ম্যাডোনা অ্যাণ্ড চাইল্ড সেইণ্ট অ্যানে' নামে যে ছবিখানির জন্ম দেন, চিত্রশিল্পের ইতিহাসের তা এক বিস্ময়কর কীর্তি।

মহান চিত্রকর রাফায়েল (দ্র)-এর আঁকা 'সিস্তিন মাদোনা' (১৫১৩) আরেক অমর কীর্তি। তাঁর একই বিষয়ভিত্তিক অন্য দু'টি বিখ্যাত শিল্পকর্মের নাম 'মাদোনা দেল গ্রান্দুকা' ও 'মাদোনা দে কাসা তেম্পি'।

ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রে ম্যাডোনা অর্থাৎ মাতা মেরি অমরত্ব লাভ করেছেন পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর মিকেলাঞ্জেলোর (দ্র) 'সন্ত পিটারের পিয়েতা' (১৪৯৮-১৫০০) শীর্ষক ভাস্কর্যমালার ভেতর দিয়ে।

ভারত (দ্র) উপমহাদেশে 'ম্যাডোনা'কে স্মরণে রেখে প্রথম ছবি আঁকেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (দ্র)। তাঁর সেই শিল্পকর্মের নাম 'ম্যাডোনা—১৯৪৩'। তবে এ ছবির

ম্যাডোনা.শিল্পী : ফিলিপ্পো লিপ্পি

পাত্র-পাত্রী মাতা মেরি ও যিশুখ্রিস্ট নন। ১৯৪৩ সালে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মনুষ্যসৃষ্ট মহাদুর্ভিক্ষের পটভূমিতে এক জন কঙ্কালসার মা ও তার কঙ্কালসার ক্ষুধার্ত শিশু তাঁর ঐ ছবির বিষয়বস্তু। তাঁরা যেন বিংশ শতাব্দীর মাতা মেরি ও যিশুখ্রিস্ট।

আ. হু.

ম্যানহাটান প্রকল্প পরমাণু বোমা দ্র

ম্যারাডোনা মারাদোনা, দিয়েগো দ্র

ম্যারাথন (marathon)

খ্রিস্টের জন্মের ৪৯০ বৎসর পূর্বে গ্রিস পারস্যসম্রাটের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পারস্যসম্রাটের সৈন্যবাহিনী ম্যারাথন নামক স্থানে এসে ঘাঁটি গাড়ে। ফিদিপ্পিদিস ছিলেন এক জন অলিম্পিক বীর। ম্যারাথনের কাছে যে গ্রিক সৈন্যবাহিনী ছিল, তার অধিনায়ক তখনি ফিদিপ্পিদিসকে পাঠালেন স্পার্টার সাহায্যের জন্য। সে অক্লান্তভাবে ছুটে, সাঁতার কেঁটে, পাহাড় ডিঙিয়ে স্পার্টাকে তাদের বিপদের কথা জানাল। স্পার্টা সাহায্য পাঠাতে রাজি হল। তারপর সে দ্রুত ফিরে এসে ম্যারাথনে নিজের সৈন্যদলে যোগ দিল। পারসিকদের বিরাট এক সৈন্যদলকে জাহাজে করে এথেন্স আক্রমণ করার জন্য পাঠানো হল। এদিকে বীর সেনাপতি থিলিতিয়াদেস ম্যারাথনে পারস্যের বাকি সৈন্যদের আক্রমণ

www.pathagar.com

জয়ের খবর নিয়ে এথেন্সে ফিদিপ্পিদিস

করে নির্মূল করে দিলেন। তখন তাদের এই জয়ের খবর এথেন্সে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ফিদিপ্পিদিসকে এথেন্সে পাঠান হল। ম্যারাথন থেকে এথেন্সের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার (২৪ মাইলের কিছু বেশি)। ফিদিপ্পিদিস অক্লান্তভাবে দৌড়ে সেই পথ অতিক্রম করে এথেন্সের রাজপুরুষদের কাছে পৌঁছে "নেনিকে কামেন" (আনন্দ করো আমরা জিতেছি) বলেই মাটিতে পড়ে গেলেন আর উঠলেন না।

ফিদিপ্পিদিসের ঐতিহ্যবাহী দৌড়কে অমর করে রাখার জন্য ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড় (২৬ মাইল ৩৮৫ গজ) সংযুক্ত হয় ও আজ পর্যন্ত প্রতি অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

কা. আ. আ.

ম্যালথাস, টমাস রবার্ট [১৭৬৬ — ১৮৩৪]

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক। ম্যালথাসের (Thomas Robert Malthus) জন্ম ইংলণ্ডের সারেতে ১৭৬৬ সালে।

১৭৯৮ সালে ম্যালথাসের 'এসে অন দ্য প্রিন্সিপ্‌ল্ অব পপুলেশন অ্যাজ ইট অ্যাফেক্টস্ দ্য ফিউচার ইম্প্রুভমেণ্ট অব সোসাইটি' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে যে বক্তব্য তিনি তুলে ধরেন, তা-ই পরবর্তী কালে 'ম্যালথাসবাদ' নামে খ্যাত হয়।

ম্যালথাসের তত্ত্বের সারকথা হল : খাদ্য সরবরাহের চাইতে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে বিস্তর ফারাক সৃষ্টি হয়। তাই তাঁর অভিমত, মানুষের জীবনধারণের জন্য জনসংখ্যার হার ও খাদ্যের পরিমাণের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন; কিন্তু তা হয় না বলে জনসংখ্যা খাদ্যের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যায়। ফলে প্রকৃতি দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝড় (দ্র), যুদ্ধ ইত্যাদি দুর্যোগ-দুর্বিপাক সৃষ্টি করে জনসংখ্যার হার কমিয়ে তাকে খাদ্যের পোষণক্ষমতার কাছাকাছি নিয়ে আসে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ম্যালথাসবাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পরে এই মতবাদ বস্তুবাদীরা খণ্ডন করেন।

ম্যালথাস মৃত্যুবরণ করেন ১৮৩৪ সালে।

আ. হ্.

ম্যালেরিয়া (malaria)

ম্যালেরিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয়, পরজীবীঘটিত সংক্রামক একটি রোগ। প্লাজমোডিয়াম প্রজাতির পরজীবীবাহক অ্যানোফিলিস জাতীয় মশার (দ্র) দংশনে মানুষের রক্তে উক্ত পরজীবীর সংক্রমণ ঘটে। ফলে মানবদেহে ম্যালেরিয়া রোগ দেখা দেয়।

ম্যালেরিয়ায় (দ্র) আক্রান্ত হলে নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগীর গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে এবং এক পর্যায়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। এক ধরনের ম্যালেরিয়ায় ৪৮ ঘণ্টা পরপর জ্বর আসে এবং আরেক ধরনের ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে জ্বর আসে ৭২ ঘণ্টা পরপর। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মাথাধরা (দ্র), পেশিতে ব্যথা, যকৃৎ (দ্র) ও প্লীহার আকার বৃদ্ধি, রক্তাল্পতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য কুইনিন (দ্র) বা ক্লোরোকুইন, প্রিমাকুইন, এমোডিয়াকুইন, পাইরিমেথামাইন, ক্লোরোগুয়ানাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

সি. না. হ.

www.pathagar.com

শিশু-বিশ্বকোষ : চতুর্থ খণ্ড

ফ থেকে ম

'বিশ্ব' বলতে আমরা যা যা বুঝি তার সব কিছু নিয়েই বিশ্বকোষ। আমাদের চেনা-জানা পৃথিবী ও মহাবিশ্বের কাহিনী, ইতিহাস ও পুরাকীর্তি, ভূগোল ও সভ্যতার কথকতা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন, সমাজ ও সংস্কার এবং শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনী ও তাঁদের অবদান—এসব কিছু নিয়ে অসংখ্য তথ্য আর তত্ত্ব এখানে রয়েছে। গাছগাছালি কি পাখপাখালি, তাও বাদ যায় নি। গান-বাজনা আছে, খেলাধুলো আছে, সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটার—এসবও আছে। তবে এই বিশ্বকোষের পরিকল্পনা ও প্রণয়ন সবই করা হয়েছে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের কথা মনে রেখে।

দেশের অর্ধশতাধিক বিদ্বজ্জন প্রভূত পরিশ্রম করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর এই 'শিশু-বিশ্বকোষ' বইয়ের ভুক্তিগুলো রচনা করেছেন।

একাধিক খণ্ডে প্রণীত এই বিশ্বকোষের ভুক্তিসংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। আর পৃষ্ঠাসংখ্যা সব মিলিয়ে দেড় হাজারের মতো। প্রতিটি খণ্ডে রয়েছে সহস্রাধিক রঙ-বেরঙের ছবি—মানুষজনের, পশুপাখির, যন্ত্রপাতির। তার ওপর এতে আছে দেশ-বিদেশের মানচিত্র, পতাকা ইত্যাদি। এসব চিত্ররচনা এবং এর বিন্যাস ও অলঙ্করণের দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীগণ।

বিশ্বকোষ আজীবন সঙ্গী হয় ধীমান শিক্ষিত মানুষের। ভুক্তি নির্বাচন তাই এভাবেই করা হয়েছে—'শিশু-বিশ্বকোষ' যেন শিশু-কিশোরদেরই শুধু নয়, বড়দেরও প্রয়োজন মেটায়।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

ISBN : 984-09-0397-7